

আষাঢ়—১৩৫

প্রথম খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বাঙালী না "মুসলমান"

এস-ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট্-ল

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাদের নিজস্ব একটা ভাষা নাই, যে ভাষায় অন্তরের নিগূঢ়তম প্রেরণাকে তারা রূপ দেবার চেষ্টা করে না। ইতিহাসে সেই সব জাতিই অমরত্ব লাভ করেছে—মাতৃভাষার সেবায় যারা সম্যক তৎপরতা দেখিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রীক, হিন্দু, আরব, ইরাণী প্রভৃতি জাতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ইরাণে আরবীয় সভ্যতা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে ইরাণ আরব সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। তা সত্ত্বেও ইরাণীরা কিন্তু তাদের মাতৃভাষার কথা, তাদের মাতৃভূমির কথা ভোলেনি। ফেরদৌসী, রুমী, খাইয়াম, সাদী, হাফেজ প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় ফার্সি ভাষায় যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে, বিশ্ব-সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। সে সাহিত্য ইরাণের মনন শক্তিকে বিশ্ব সভ্যতার দরবারে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে।

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যেমন সাহিত্য সৃষ্টির কারণ হয়েছে, মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ তেমনি শক্তিমন্ত রাষ্ট্রশক্তির, স্বাধীন, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল জীবনের সূচনা করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইদানীং মুসলমান সমাজের একদল প্রতারক স্বধর্ম্মা-বলম্বীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে, দেশপ্রেমের সঙ্গে ইসলামের বিরোধিতা আছে। ভৌগলিক দেশপ্রেম ইসলামিক আদর্শের পরিপন্থী। বাঙলা দেশে এই প্রচার কার্য্য কিছুদিন থেকে খুব জোরের সঙ্গেই চলেছে।

এ আন্দোলন ইতিহাসের অজ্ঞতার উপর, মারাত্মক ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ একান্তভাবে দেশপ্রেমিক ছিলেন। মাতৃভূমি মক্কা থেকে দূরে যেতে বাধ্য হয়েও তিনি তার কথা কখনও ভুলেননি। তাঁর বহু যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধির পিছনে ছিল মাতৃভূমিতে ফেরবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তাঁর উক্তি "হুব্বাল ওয়াতাল মিনাল ইমান"—'দেশ প্রেম ধর্ম্মের অঙ্গ' থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় দেশপ্রেমকে তিনি মানব-জীবনে কত উচ্চে স্থান দিয়েছেন। পারসিক শিষ্য সালমানকে সম্বোধন করে তিনি একবার বলেছিলেন "সালমান, তুমি যদি আরব দেশের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ কর, তাহলে আমার প্রতিই বিদ্বেষের ভাব পোষণ করা হল বলে জানবে।" স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের সৃষ্টি ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম প্রধান আদর্শ। খলিফা ওমার সেনাপতিদের প্রতি আদেশ জারি করেছিলেন তাঁরা যেন আরব দেশের সীমা অতিক্রম করে না যান। অবশ্য যুদ্ধ নীতির দুর্নিবার তাড়নায় সে আদেশ তাদের লঙ্ঘন করতে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে আরবেরা ছিলেন একান্তভাবে স্বদেশপ্রেমিক এবং মাতৃভাষার উৎসাহী পরিপোষক; হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে আরবী ভাষা সাহিত্যের বাহন হিসাবে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সেরূপ না হলে আরবী ভাষা কখনও কোরাণের বাহন হতে পারতো না। আরবেরা একান্তভাবে দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই কোন বৈদেশিক শক্তি তাদের উপর স্থায়ীভাবে আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

আধুনিক জগতে জাতীয়তার আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই পাশ্চাত্য জগতে সম্যকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এসিয়া মহাদেশে জাপানই সর্ব্বপ্রথম এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তারপর এ আদর্শ তুরস্ক, চীন, ইরাণ, মিশর, আফগানিস্থান, আরব প্রভৃতি দেশে ব্যপ্ত হয়ে পড়ে। এই সব স্বাধীন দেশে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই সাহিত্য স্থষ্টির চেষ্টা হচ্ছে, আর শিক্ষা বিস্তার করা হচ্ছে। বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে সাহিত্য স্থষ্টির এবং শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা এসব দেশের লোকেরা এখন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে, তারা তাদের ধর্ম্মও ছেড়ে দিয়েছে। তুরস্ক, ইরাণ, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকেরা মুসলমানই আছে, তবে আধুনিক যুগের প্রয়োজন মত তারা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং কৃষ্টি সাধনার পদ্ধতি বদলে ফেলেছে।

এখন ভারতবর্ষের কথাই ভাবা যাক। একজন পাঞ্জাবী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি পাঞ্জাবী; একজন হিন্দুস্থানী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি হিন্দুস্থানী; একজন সিন্ধী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি সিন্ধী। সকলেই নিজ নিজ দেশের পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ তাদের মুসলমানত্বের বিষয় কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। একজন বাঙ্গালী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু বলবেন তিনি মুসলমান। তার দেশ কোথা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন নোয়াখালী কিম্বা কুমিল্লা; হুগলী কিম্বা বর্দ্ধমান। সোজাসুজি বাঙালী বলে পরিচয় দিতে যেন তাঁর কুণ্ঠা আসে। এ মানসিকতা যতদিন থাকবে, ততদিন কি করে বাঙালী মুসলমান দেশের জীবনে উচ্চ স্থান দখল করতে পারবেন। Inferiority Complex যে তাঁর ডানা বেঁধে রাখবে।

এখন ভাষার কথা নেওয়া যাক। উর্দ্দুভাষীরা উর্দ্দু বলতে কিম্বা লিখতে কোন কুণ্ঠা অনুভব করেন না। সিন্ধীভাষীরা সিন্ধী বলতে কিম্বা লিখতে কোন কুণ্ঠা অনুভব করেন না। পশ্‌তু ভাষীরা পশ্‌তু লিখতে কিম্বা বলতে কোন কুণ্ঠা অনুভব করেন না। বাঙালী মুসলমানের বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। উচ্চপদস্থ এবং অভিজাতবংশীয় (তথাকথিত) বাঙালী মুসলমানেরা বাঙলা বলতে কুণ্ঠা অনুভব করেন, বাঙলা পড়তে কুণ্ঠা অনুভব করেন, আর বাঙলা লিখতেও কুণ্ঠা অনুভব করেন। উচ্চপদস্থ কোন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর বাড়িতে গিয়ে দেখুন, একটা বাঙলা বই কিম্বা সাময়িক পত্র দেখতে পাবেন না; অথচ এই শ্রেণীর কোন হিন্দুর বাড়িতে ওসব জিনিষের ছড়াছড়ি। বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টান্ত আজকালকার যুগে পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। একি কম লজ্জা আর পরিতাপের বিষয়?

আজকাল বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানী শব্দের আমদানী নিয়ে একটা হুজুক চলেছে। মুসলমানদের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দের আমদানীর যে প্রয়োজন আছে সে কথা কোন প্রেমিক বাঙালী মাত্রেই স্বীকার করবেন। কিন্তু তা নিয়ে Percentage কসতে যাওয়া বাতুলতা। যে শব্দ সুষ্ঠু এবং সহজ বোধ্য তাই আনতে হবে। জোর করে অনাবশ্যক আরবী শব্দ আনবার দরকার নাই, আর সংস্কৃত শব্দ আনবারও দরকার নাই। যা সাধারণে বোঝে সেই সব শব্দ চালানই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত। আর নূতন শব্দ সম্পদের জন্ম বাঙলার পল্লী মায়ের কাছে, আমাদের দেশের হাটে বাটে যাওয়াই ভাল। এই ভাবেই তুরস্ক এবং অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে ভাষার সংস্কার চলেছে। আর এই হচ্ছে ভাষার ক্রমবিকাশের সরল, স্বাভাবিক পথ।

বাঙলা সাহিত্যে যে মুসলিম কৃষ্টির সম্যক বিকাশ হয়নি তার জন্য দায়ী হিন্দুরা নন, তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছেন মুসলমানেরা। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্য-বোধ এখনও সম্যক ভাবে জাগেনি। বাঙালী মুসলমান বই কেনেন না, বই পড়েন না। উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাঙলা লেখেন না। এরূপ অবস্থায় মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের প্রকাশ ভঙ্গী সাহিত্যে কি করে প্রবেশ করবে? বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রভাবের অভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে—বাঙালী মুসলমানের অবহেলা এবং ঔদাসীন্য। তাছাড়া গোঁড়ামিও আছে। রাজনীতিতে জোর করে একজন প্রতিভাহীন লোককে ভোটের সাহায্যে মন্ত্রীর পদে কিম্বা অন্য কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা চলে। সাহিত্যে কিন্তু বঙ্কিম কিম্বা রবীন্দ্রনাথের স্থান পেতে হলে, তাঁদের মত দেশের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করতে হলে, স্বভাবদত্ত প্রতিভার দরকার, অমানুষিক সাধনার দরকার। হুজুক করে আর দল পাকিয়ে এ গৌরব লাভ করা যায় না।

মুসলমানী আদর্শের প্রচার করিতে চান করুন, দরকার মত মুসলমানী শব্দের আমদানী করতে চান তাও করুন, তবে একথা ভুললে চলবেনা যে এদেশ কেবল মুসলমানেরও নয়, আর কেবল হিন্দুরও নয়। এদেশ হচ্ছে উভয় জাতিরই পূজনীয়া মাতৃভূমি। উভয় জাতিকে যখন চিরকাল এক সঙ্গে থাকতে হবে, তখন বন্ধুভাবে, ভাই ভাইয়ের মত থাকাই ভাল। পরস্পরের মধ্যে হিংসা এবং বিদ্বেষ কারও পক্ষে মঙ্গলকর হয় না। আর এই হিংসা এবং বিদ্বেষের ফলে যে মানসিকতার স্থষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে সেটী উভয় পক্ষেরই লজ্জা আর কলঙ্কের বিষয়, আর তার বিষময় ফল উভয়কেই সমানভাবে ভোগ করিতে হবে। এই অনিষ্টকর মনোভাবকে বিদূরিত করবার জন্য দরকার একটুখানি সহনশীলতার, আর একটুখানি সহানুভূতির। ধর্ম্ম নিয়ে যে দেশে এত গর্ব্ব—আশাকরি সেখানে এইটুকু উদারতার অভাব হবেনা।

আপনি মুসলমান, মুসলমানী আদর্শ প্রচার করুন; আপনি হিন্দু, হিন্দুত্বের আদর্শ প্রচার করুন। খোদার এই বিশ্বে উভয়েরই স্থান আছে, আরও অনেকের স্থান আছে। তবে একথা ভুলবেন না যে আপনি মানুষ, আর সেই হিসাবে মানুষের

বিশ্বব্যাপী সভ্যতার উত্তরাধিকারী। গ্রীক দার্শনিকের কথায়— man is the measure of things। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে বিরাট, বহুমুখী, ব্যাপক এক সভ্যতার সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সেই বিচিত্র সৃষ্টি-কাব্যে সব জাতিরই দান আছে, সব ধর্ম্মেরই দান আছে, আর সব কৃষ্টিরই দান আছে। তাদের সম্মিলিত প্রেরণা মানবজাতিকে উন্নতজীবনের নিত্য নূতন সন্ধান দিয়েছে। সেই বিরাট প্রেরণাকে অবহেলা করলে আমাদের দশা কূপমণ্ডুকের মতই হবে। আর সেই প্রেরণার নির্দ্দেশ যদি আমরা মেনে চলি তাহলে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের প্রগতিশীল সামবায়িক জীবনের সন্ধান আমরা পাব, আর আশার উজ্জ্বল আলোক তাহলে আমাদের জীবন যাত্রাকে সুগম আনন্দময় করে তুলবে। তখন স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারবো যে নিজ নিজ ধর্ম্ম হিসাবে আমরা হিন্দু কিম্বা মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান কিম্বা নাস্তিক হতে পারি বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা বিশ্ববাসী, নাগরিক হিসাবে আমরা ভারতবাসী, আর জাতি হিসাবে আমরা বাঙালী। সেবার এবং সাধনার সুফলপ্রসূ পথ খুঁজে বের করতে আমাদের বেগ পেতে হবে না।

অনর্গল

[নাটিকা]

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

বিকাশবাবুদের খাইবার ঘর। ঘরের একপাশে খানকয়েক হাল্কা বেতের চেয়ার, দেয়াল ঘেঁসিয়া কয়েকটি কার্পেটের আসন পাতা। এককোণে একটি ছোট তেপায়া টেবিলের উপর রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন, কিছু কেক্ বিস্কুট এবং ফল, একটি কাঁচ-পাত্রে সরবৎ, কয়েকটি রেকাবি ও গ্লাস। ঘরের পুব ও পশ্চিমদিকে একটি করিয়া খোলা দরোজা এবং উত্তরে অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের বিপরীত দিকে একটি পরদা-ঢাকা প্রশস্ত জানালা ও একটি বন্ধ দরোজা। পুব দিকের দ্বার দিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় যাইবার পথ, পশ্চিমের দ্বার বাড়ির ভিতরে যাইবার। এই দরোজার ফাঁক দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ির কিয়দংশ দেখা যায়।

একটি কার্পেটের আসনের উপর বিকাশবাবুর মাতা মেজগিন্নী বসিয়া আছেন। কর্ত্তাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে বিকাশবাবুর পিতা মেজকর্ত্তাই জীবিত। মেজগিন্নীর বয়স হইয়াছে, মাথার চুল পাকা। বিকাশবাবুর স্ত্রী কিছু ফল কাটিয়া রেকাবিতে সাজাইয়া রাখিতেছেন। তাঁহার বয়স ত্রিশের নীচে, অতিশয় সুন্দরী এবং কেশ, বেশ, প্রসাধন নিখুঁত।

যবনিকা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিকের বন্ধ ঘর হইতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল।

মেজ গিন্নী। বিকাশের আপিস থেকে ফেরবার সময় হ'ল মা।

মালিনী। এই যে তাঁর খাবার সাজিয়ে রাখছি। আজকের রসগোল্লাগুলি বেশ ভাল এনেচে। তুমি দুএকটা খেয়ে দেখনা মা।

মেজ গিন্নী। না, না, আগে ছেলে আসুক। ছেলে যে কি জিনিষ তা তো তুমি জানলে না মা।···একি, তোমার দুঃখ হ'ল? আচ্ছা, দাও একটা রসগোল্লা, দেখি একটু মুখে দিয়ে।

মালিনী। (রেকাবিতে চারটি রসগোল্লা ও গ্লাসে সরবৎ ঢালিয়া মেজ গিন্নীকে দিয়া কহিলেন) খেয়ে দেখ। আরো অনেক আছে। ভাল লাগলে আরো দেব।

মেজ গিন্নী। আ-হা-হা—একেবারে এতগুলো দিলে কেন? (খাইতে খাইতে) বাঃ, গণ্শা তো আজ বেশ রসগোল্লা এনেচে। (মেজ গিন্নী খাইতে লাগিলেন। দেখিয়া বুঝা গেল মৌখিক অনিচ্ছা যতই থাকুক, ক্ষুধার অভাব ছিল না। প্রবল আপত্তি সত্বেও মালিনী তাঁহাকে আরো রসগোল্লা দিলেন এবং সেগুলাও পাতে পড়িয়া রহিল না। শেষে মালিনীর পীড়াপীড়িতে একটু কেক্ও খাইয়া ফেলিলেন) বুড়ো বয়সে আদর দিয়ে দিয়ে আমাকে তুমি একেবারে মাটি করে দিয়েছ মা। এখন কি তোমার আমাকে আদর দেবার কথা? যাদের আদর দেবার কথা যাদের আসা উচিত ছিল এতদিন তোমার কোল জুড়ে তারা যে এলই না মা!

মালিনী। ওসব কথা বোলো না মা। (লজ্জিত অথচ কঠিন কণ্ঠে) ওসব আমার ভাল লাগে না।

প্রত্যুত্তরে মেজগিন্নী শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। বাহিরে বিকাশবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মেজ গিন্নী। ঐ বিকাশ এল। আমি এখুনি হাত ধুয়ে আসছি।

মেজগিন্নী অত্যল্পকালের মধ্যেই হাত ধুইয়া আসিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুবদিকে দরোজা দিয়া আপিসের পোষাকপরা বিকাশবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, সুপুরুষ বলা চলে না, তবে বলিষ্ঠ গঠন। কোনো নামজাদা বণিক আপিসে কাজ করেন, সাহেবসুবার মন জোগাইয়া চলিবার দক্ষতা আছে। বেতন ভালই পান।

বিকাশ। আজ ভারি রগড় হয়েছে মা—

মেজ গিন্নী। পাঁচটা বেজে গেছে, আর দেরি করিস নি বিকাশ, যা কাপড় চোপড় ছেড়ে খেতে আয়।

বিকাশ। আজ ছোট সায়েব ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন রগড় করলে মা—

মেজ গিন্নী। না, না, আপিসের গল্প এখন নয়। আপিসের গল্প আরম্ভ করলে আর তোর জ্ঞান থাকে না। যা, কাপড় চোপড় ছেড়ে আয়। ও গণ্শার বৌ, কোথায় গেলি—

বিকাশ। (ভিতরে যাইতে যাইতে) ছোট সায়েব আজ বেজায় রগড় করেচে—

পশ্চিমের দ্বার দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন

মেজ গিন্নী। সায়েবরা আমার বিকাশ বলতে অজ্ঞান। (মালিনীকে) যাও মা, তুমি ওর কাপড় চোপড় সব দেখিয়ে দাও

গে, নইলে ও কিছু খুঁজে পাবে না। হয়তো তোমার চওড়া লাল-পেড়ে সাড়ীটা নয়তো কর্ত্তার নামাবলী পরেই নেমে আসবে। (মালিনী উপরে চলিয়া গেলেন) ও গণ্শার বৌ, কোথায় গেলি—

দাসী গণেশের বৌ প্রবেশ করিল। বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ, বেশ আঁট সাঁট গড়ন, গোলাকার মুখ, চক্ষুর্দ্বয় সতত ঘূর্ণায়মান। খুব মুখভঙ্গী করিয়া কথা কহিবার অভ্যাস।

গণেশের বৌ। কি বলচো বড় মা?

মেজ গিন্নী। বিকাশ এই আপিস থেকে এল। এসময় তোরা সব থাকিস কোথায়, বল্ তো! কতবার বলেছি ছেলে আপিস থেকে এলে হাতমুখ ধোবার জল, তোয়ালে সব ঠিক করে কাছে কাছে থাকবি, ডাকতে না হয়।

গণেশের বৌ। সেই কাজই তো করছিনু বড়মা, তা ঐ আপদের জ্বালায় কি কিছু ঠিক করবার জো আছে গা! রোদে দিতে নে যেয়ে তোয়ালেটা কোথায় ফেলেচে, মাজতে নে যেয়ে জলের বালতি কোথায় রেখে এসেচে, আমি ছিষ্টি খুঁজে মরি।

মেজ গিন্নী। কার কথা বলচিস্?

গণেশের বৌ। কার আবার? ঐ অনামুখোর, ঐ মুখপোড়ার।

মেজ গিন্নী। গণ্শা? তা ওর আজ হয়েছে কি? খাবার কিনে দিয়ে সেই যে কোথায় ডুব মেরেচে, আর দেখা নেই।

গণেশের বৌ। মুখপোড়া আজ আবার গাঁজা খেয়েচে গো। গাঁজা খেয়ে ভোঁ হ'য়ে নিদ্রে দিচ্ছে বড়মা।

মেজ গিন্নী। গণ্শা, গণ্শা—

চোখ মুছিতে মুছিতে গণেশ প্রবেশ করিল। ঘনকৃষ্ণ গাত্রের উপর একখানি লাল রঙের গামছা পাটকরিয়া ফেলা। কাঁচাপাকা গোঁফ, খুব বদ্‌রাগী লোক বলিয়া মনে হয়।

মেজ গিন্নী। এতক্ষণ ছিলি কোথা হতভাগা?

গণেশ। এঁজ্ঞে মাঠান্ ঐ একটু ইয়ে—

গণেশের বৌ। নিদ্রে দিচ্ছিলেন বড়মা, নিদ্রে। সুয্যি পচ্চিমে না হেল্‌লে কুম্ভকয়োবাবুর নিদ্রে ভাঙে না।

গণেশ। চোপ্‌রও, ইউ লো-ক্লাস্ ফিমেল্, চোপ্‌রও।

গণেশের বৌ। শুনচ বড়মা, মুখপোড়া আবার ইঞ্জিরিতে গালমন্দ করতে নেগেচে গো—

মেজ গিন্নী। গণ্শা, তুই এসব ইংরিজি গালমন্দ শিখ্‌লি কোত্থেকে? দিন দিন তোর গুণ বাড়চে না?

গণেশের বৌ। ঐ যে বিমলবাবুর নেত্য খানসামাটি আছে, তারই কাছে এসব শেখা হচ্ছে। নেত্য খানসামা হচ্ছেন ওঁর এয়ার।

গণেশ। মনিবের কাছে তুই আমার নামে লাগাবি ভাঙাবি কেন?

গণেশের বৌ। কি নাগানু ভাঙানু বড়মা? ও কেবল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাইনে নেবে? দাদাবাবুর দশ আঙুলের রোজগার করা ট্যাকা না?

গণেশ। আমি ঘুমুই আর যাই করি, হোয়াট্ ইজ্ ভাট্ ইওর ফাদার—তোর বাপের কি?

গণেশের বৌ। ঐ ঐ শোনো বড়মা, মুখপোড়া আমার বাপান্ত করচে, তাও আবার বাংলা ইঞ্জিরিতে মিশিয়ে।

মেজ গিন্নী। যা, যা, ঐ বৌমা আসচে। তোদের ঝগড়া থামিয়ে নিজের কাজে যা।

গণেশ ও গণেশের বৌ বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালিনী প্রবেশ করিলেন।

মেজ গিন্নী। বিকাশের কত দূর?

মালিনী। আসচেন হাতমুখ ধুয়ে। জান মা, তোমার ছেলের খেয়াল চেপেছে সামনের ছুটিতে উনি আমাকে নিয়ে ওয়াল্‌টেয়ারে যাবেন, সেখানে সায়েবি হোটেলে থাকবেন।

মেজ গিন্নী। দিনরাত সায়েবদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার বিকাশের মতিগতি সায়েবদের মতন হয়ে গেছে।

মালিনী। কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে সায়েবি হোটেলে থাকতে পারব না। এ কি অন্যায় খেয়াল দেখ তো মা।

মেজ গিন্নী। পুরুষ মানুষ—ওদের অমন একটু আধটু খেয়াল না থাকলে শেষে যে বদ্‌খেয়াল হবে মা? ওদের মন জুগিয়ে চলা চাই। দিনরাত দুটো বুড়ো বুড়ীর সেবা ক'রে ক'রে সারা হ'য়ে গেলে। বেশ তো, যাওনা দুজনে একটু ঘুরে এসো। ওয়াল্‌টেয়ার শুনেছি খুব ভাল জায়গা, সমুদ্রের ধারে। খুব সমুদ্র স্নান করবে। বালির ওপর ঘুরে বেড়াবে।

মালিনী। না, মা, সমুদ্রের জলে আর বালিতে রঙ ময়লা হয়ে যাবে। আমি যাবো না। আমি বাবাকে গিয়ে ধরচি।

মেজগিন্নী। তোমার শ্বশুরই তোমার মাথা খেয়েছেন। তাঁর কাছে তোমার সাতখুন মাফ্।

মালিনী। আমার শ্বশুরের মতন লোক ক'জন হয় মা?

বিকাশবাবু আসিলেন। আপিসের পোষাক ছাড়িয়া ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া আসিয়াছেন।

মেজগিন্নী। নে, খেতে বোস্।

বিকাশবাবু চেয়ারেই বসিলেন। মালিনী তাঁহার হাতে মিষ্টান্ন-প্রভৃতিতে পূর্ণ রেকাবি দিলেন। এমন সময় উপর হইতে মেজকর্ত্তা হাঁকিলেন—"ও মেজগিন্নী, আমার চাবিটা কোথায় ফেললুম, খুঁজে দিয়ে যাও ত।"

মেজগিন্নী। যাই, কোথায় চাবি ফেলেছেন, খুঁজে দিয়ে আসি। ভারি তো ইষ্টেট পত্তর, খানকয়েক বই আর জপের মালা, তবু চোরের ভয়েই গেলেন!

প্রস্থান

বিকাশ। আজ দেখছি গণশার দয়া হয়েছে। রসগোল্লা থেকে রসটি চুষে খায় নি। মালিনী, তুমি এইটে খাও।

রেকাবি হইতে একটি রসগোল্লা তুলিয়া মালিনীর মুখের কাছে ধরিলেন।

বিকাশ। দিচ্ছি, খেয়ে নাও না, লজ্জা কিসের।

মালিনী মিষ্টান্নটি মুখে লইলেন।

কাছে সরে এস না মালিনী!…আঃ, কে আবার আসবে! এ বাড়িতে একটুও নিরিবিলি জায়গা পাওয়া যায় না। তাই তো তোমাকে নিয়ে ওয়ালটেয়ারে যেতে চাই দিন কয়েকের জন্তে।

প্রচুর শব্দ করিয়া কাশিতে কাশিতে গণেশ পশ্চিম দুয়ার দিয়া আসিল

গণেশ। বিমলবাবু এয়েচেন হুজুর। হি ইজ্ ড্রঙ্ক্।

বিকাশ। অ্যাঁ?

গণেশ। হি ইজ্ ড্রঙ্ক।

বাক্যব্যয় না করিয়া সমস্ত এঁটো রেকাবি ও গ্লাস উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল

মালিনী। মাতাল হ'য়ে এসেছে। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।

পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমলবাবু প্রবেশ করিলেন। তিনি বিকাশবাবুর বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশী। বয়স ত্রিশবত্রিশ, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মুখে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন। কেশ বেশ অবিন্যস্ত, পা টলিতেছে।

বিমল। কা'কে তাড়াবে বৌদি? আমি যে নিস্তাড়ন চক্রবর্ত্তী। তোমাদের প্রেমালাপ ছেদ করলুম, কিছু মনে কোরো না। আজ সন্ধ্যায় চতুর্গুণ ক'রে ঝালিয়ে নিও। আজ পূর্ণিমা। দেখছ তো বৌদি, মাতাল হ'লে কি হয়, তিথি নক্ষত্তর ভুলি নি। (মালিনী মাথায় কাপড় টানিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।) ঐ যাঃ, বৌদি রাগ ক'রে চলে গেলেন। such is life! জান বিকাশ, তিন দিন ধরে আমার স্ট্রেফ্ লিকুইড্ ডায়েট্ চলছে। খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করি।

তেপায়া হইতে যথেচ্ছ ভোজন করিতে লাগিলেন

বিকাশ। দেখ বিমল, তুমি একটা বিয়ে করো। (একথা শুনিয়া বিমল অত্যন্ত চমকাইয়া বিষম খাইলেন।) ও কি! ও কি! তুমি অমন করচ কেন বিমল? তোমার হ'ল কি?

বিমল। উঃ, বড্ড সাম্‌লে নিয়েচি। হার্টফেল হয়েছিল আর কি!

বিকাশ। বিয়ের কথা শুনেই হার্টফেল! কেন, বিয়েতে তোমার আপত্তিটা কিসের?

বিমল। বিয়েটা অশ্লীল, ওতে চরিত্র নষ্ট হয়, তাই আপত্তি।

বিকাশ। ও, ঘোর এখনো কাটেনি দেখছি।

বিমল। আমি একটিমাত্র খাঁটি নেশাকে অবলম্বন ক'রে চরিত্রটি খাঁটি রেখেছি। স্বচ্ছন্দে চলার পক্ষে একটি নৌকাই যথেষ্ট। দুনৌকায় পা পড়লে পড়তেই হবে।

বিকাশ। স্ত্রীর নেশায় মদের নেশা ভাগবে।

বিমল। উঁহু। এমন অনেক পতিগতপ্রাণা আছেন যাঁদের প্রেমালাপের ধাক্কা সাম্‌লাতে হ'লে মদের মাত্রা বেশী করতে হয়।

বিকাশ। তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার একজন শক্ত নাবিক তো চাই।

বিমল। কেন আমার অ্যাড্‌মিরাল্ নেত্যখান্‌সামা তো রয়েছেন। অথচ তাঁকে সাড়ী দিতে হয় না, গয়না দিতে হয় না, মান ভাঙাতে হয় না।

বিকাশ। বাপের অগাধ সম্পত্তি তুমি এম্‌নি ক'রে উড়িয়ে দেবে বিমল?

বিমল। অনেক পরিশ্রম ক'রে বাবা টাকা রোজগার ক'রে গেছেন, অনেক পরিশ্রম ক'রে আমি তা খরচ করচি।

বিকাশ। বেশ তো, টাকা খরচা করতে চাও তো সৎপাত্রে দান করো।

বিমল। তাই তো করচি। মদের পাত্রের চেয়ে ভাল সৎপাত্র আর কোথায় পাব?

বিকাশ। চুপ, চুপ, মা আসচেন।

বিমল। ভয় নেই। মদ খেলে আমার স্বাভাবিক গুরুভক্তি চতুর্গুণ বেড়ে যায়।

উত্তরের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল

মেজগিন্নী আসিলে বিমল খুব ঘটা করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় ও জামা কাপড়ে মাখিতে লাগিলেন। প্রণাম-নত বিমলের অলক্ষ্যে বিকাশ তাঁহার মাতাকে ইসারায় বুঝাইয়া দিলেন বিমল মদ খাইয়া আসিয়াছে।

মেজগিন্নী। থাক থাক, বাবা, থাক্। আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তোমার সুমতি হোক্।

বিমল। তথাস্তু মাসীমা।

খটাং খটাং করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া মেজকর্ত্তা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এখনো অত্যন্ত সুপুরুষ। ধব্‌ধবে সাদা রঙ, মাথায় টাক, পাকা গোঁফ, সাত্ত্বিক চেহারা। গায়ে নামাবলী।

মেজকর্ত্তা। আমি বেড়াতে যাচ্ছি মেজগিন্নী। তোমাদের কিছুর দরকার থাকে তো বল। গণ্‌শা গেল কোথায়? আমার চটি-জুতো এনে দিক্। একে বিমল? এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? (বিমল আর একদফা প্রণাম করিলেন) আবার মদ ধরেচ বুঝি?

বিমল। আজ্ঞে না। আমি ধরিনি।

মেজকর্ত্তা। তবে?

বিমল। মদই এবার ধরল।

মেজগিন্নী। ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্নার কথা! মেজকর্ত্তা তুমি বেড়াতে যাও। আমি গণ্‌শাকে ডেকে দিচ্ছি। ও গণ্‌শা, গণ্‌শা—

বিকাশ। আমি দু মিনিটের জন্যে আসচি বিমল।

ভিতরে চলিয়া গেলেন

বিমল। (নিম্ন স্বরে) তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টি, ঠিক আমার মতো। ও ওর নেশার চেষ্টায় গেল।

মেজকর্ত্তা। অ্যাঁ?

বিমল। (নিম্ন স্বরে) আজ পূর্ণিমা।

মেজকর্ত্তা। (মেজগিন্নীকে বলিলেন) মদের ঘোরে বক্‌ছে। (মেজগিন্নী গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িলেন) ওরে গণশা, আমার চটি-জুতো—

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। ডাক্তার—

মেজকর্ত্তা। আরে না, না, ডাক্তার নয়, চটিজুতো।

গণেশ। ডাক্তার সায়েব এয়েচেন কর্ত্তাবাবু।

মেজকর্ত্তা। কোন্ ডাক্তার সায়েব?

গণেশ। প্রফেসর মিষ্টার ডক্টর দাস, এম. এ., পি. আর. এস্, পি. এইচ্. ডি.—

মেজকর্ত্তা। ওঃ, আমাদের ডক্টর দাস। যা, যা তাঁকে এখানেই নিয়ে আয়। আজ আর বেড়াতে যাওয়া হল না মেজগিন্নী। তুমি ততক্ষণ ডক্টর দাসের জলখাবার ঠিক করো।

গণেশ চলিয়া গেল এবং মেজগিন্নী ডক্টর দাসের জলখাবার ঠিক করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই ভৃত্য গণেশের আগে আগে ডক্টর দাস প্রবেশ করিলেন। ডক্টর দাস গম্ভীর প্রকৃতির, পণ্ডিত মানুষ, বয়স পঞ্চাশের উপর। তিনি এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু, মেজকর্তাকে চৌধুরীম'শায় বলিয়া ডাকেন, বিমলের সঙ্গেও সুপরিচিত। তিনি মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, মনোবিজ্ঞানের গবেষণা করিতেছেন। অত্যন্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক, এখনি তাহা তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইবে।

মেজকর্তা। আসুন, আসুন ডক্টর দাস, কেমন আছেন? দেখিনি যে অনেকদিন! বসুন, বসুন।

ডক্টর দাস বসিলেন না। মুখে জলন্ত চুরুট লইয়া গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ডঃ দাস। হুঁ।

মুখের চুরুটটাতে একটা টান দিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন গণেশ দাঁড়াইয়া আছে। বিনা বাক্যব্যয়ে চুরুটটি তাহারই হাতে দিলেন। গণেশ সেটিকে লইয়া কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া দু'একবার চুরুটের দিকে, দু'একবার ডক্টর দাসের মুখের দিকে চাহিল। অবশেষে সে চুরুটটি হাতে লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। বিমল হাসিয়া উঠিলেন।

ডাঃ দাস। হাসলে যে বিমল!

বিমল। সার, আপনার চুরুট—

ডঃ দাস। 'অর্গল' মানে কি বল তো।

বিমল। অ্যাঁ!

ডঃ দাস। তোমার কর্ম নয়! চৌধুরীমশায়, where is চৌধুরীমশায়?—এই যে,—here you are! চৌধুরীমশায়, আপনি তো শাস্তর টাস্তর পড়েন, ভাষার ওপর দখল আছে। বলুন তো, 'অর্গল' মানে কি?

মেজকর্তা। নিশ্চয় কোনো নতুন খেয়াল চেপেছে মাথায়।··· 'অর্গল' মানে হুড়কো, যেমন দ্বারের 'অর্গল'।

ডঃ দাস। তাহলে 'অনর্গল' মানে কি হ'ল?

মেজকর্তা। অর্গলের উল্টো, অর্থাৎ বন্ধ নয়, মুক্ত অবাধ। কিন্তু একথা কেন?

ডঃ দাস। Just the word I want—ঐ কথাটিই চাইছিলুম, 'অনর্গল', 'অনর্গল', 'অনর্গল'। কিন্তু আমার চুরোট ফেললুম কোথা? খাচ্ছিলুম না একটা?

মেজগিন্নী। সেটা এইমাত্র যে গণ্শাকে দিয়ে দিলেন ডক্টর দাস।

ডঃ দাস। গণ্শাকে দিয়ে দিলুম নাকি? তা হবে। আমি ভাবলুম জলন্ত চুরুটটা আবার ফেললুম, আগুন ধরে না যায়।··· চৌধুরীমশায়, বড্ড অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছি! এই এতক্ষণ আপনাকে দেখতেই পাই নি। নমস্কার, নমস্কার। একটা আশ্চর্য্য আলোক রশ্মি আবিষ্কার করেছি, মানুষের মনের ওপর তার অসাধারণ ক্রিয়া। সেই কথাটাই ভাবছিলুম। (হঠাৎ মেজগিন্নীকে দেখিতে পাইয়া) এই যে আপনি! নমস্কার, নমস্কার।

মেজগিন্নী। নমস্কার। কি রকম আলোকরশ্মি আবিষ্কার করেছেন ডক্টর দাস?

ডঃ দাস। সেটা মানুষের গায়ে পড়লে তার মনের অর্গল খুলে যায়। যা তার মনের নিরুদ্ধ ভাবনা, চিন্তা, সেগুলাই সে কথায় কাজে প্রকাশ করে। এতে তার কোনো বাধা, কোনো লজ্জা থাকবে না। তারই কি নাম দেব তাই ভাবছিলুম। পেয়েছি নাম—'অনর্গল রশ্মি'।

বিমল। আপনি আবিষ্কার করেছেন সার? কী আশ্চর্য্য!

মেজগিন্নী। কত বড় মহাপণ্ডিত! এদিকে মুখের চুরুট কোথায় গেল তার খোঁজ নেই! একেবারে ছেলেমানুষ, অথচ এত বড় পণ্ডিত—

ডঃ দাস। (অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া) না, না, ঠিক আমি আবিষ্কার করিনি, আমি শুধু শেষটা আবিষ্কার করেছি মাত্র। এ বিষয়ে আগে থেকেই গবেষণা চলছিল নানা দেশে। তবে এই রশ্মিটাকে isolate করতে পারে নি। আমি পোলারাইজ ক'রে—মানে—

মেজগিন্নী। আমরা মুখ্যু মানুষ, ওসব কি আমরা বুঝব ডক্টর দাস। আপনি সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন আপনার আবিষ্কার।

ডঃ দাস। না, না, আমার আবিষ্কার নয়। ১৯৩২ সালে রাশিয়ার ইভনেটোভস্কি, তারপর পোল্যাণ্ডের পিলাটুস্কি, শেষটায় জার্মেনীর ডক্টর লাইস গাং এবং ১৯৩৭ সালে জাপানী ডক্টর ফিকাকাশি—

মেজকর্তা। রক্ষে করুন, রক্ষে করুন। আর অত ইতিহাসের দরকার নেই। এখন আপনার অনর্গল-রশ্মির পরীক্ষা দেখাতে পারেন ডক্টর দাস?

বিমল। ওতে নেশা টেশা হয় সার?

ডঃ দাস। কে বিমল! এতক্ষণ তোমাকে দেখতেই পাই নি। আজ তুমি মদ খেয়েছ বুঝি? দেখুন চৌধুরীমশাই, মদ খাবার ইচ্ছা হয় তো অনেকেরই হয়, আমার হয়, আপনার হয়—কিন্তু আমরা তো মদ খাইনে।

মেজকর্তা। আমার মনে মদ খাবার ইচ্ছা হয়!

ডঃ দাস। না, না, ওতে রাগ করবার কিছু নেই চৌধুরীমশায়। মানুষের মন যখন রয়েছে, তখন ইচ্ছা থাকবে না কেন? যাদের মনের অর্গল শক্ত, তারা সংযমী। যাদের তা নয়, তারা ঐ বিমলের মতো।

মেজগিন্নী। আপনি কিছু খাবেন না ডক্টর দাস? আসুন, এই চেয়ারটায় বসুন। তখন থেকে দাঁড়িয়েই আছেন।

ডঃ দাস। না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি খেয়েই বেরিয়েছি। জানেন তো, আমার স্ত্রী না খাইয়ে আমাকে বাড়ির বার হ'তে দেন না।

মেজ গিন্নী। আপনার স্ত্রী তো এলাহাবাদে তাঁর ভায়ের ওখানে। হঠাৎ ফিরেছেন নাকি?

ডঃ দাস। ও, না, না, তিনি ফেরেন নি। আমার অত খেয়াল ছিল না। তবে দেখুন আমি খেয়েই এসেছি, আর খেতে পারব না। অনেক ধন্যবাদ।

মেজ গিন্নী। এমন অন্যমনস্ক মানুষকে একলা রেখে ভায়ের বাড়ি যেতে হয়!···আচ্ছা, আর কিছু না খান, একটু সরবৎ খান।

ডঃ দাস। (অন্যমনস্কভাবে) আচ্ছা, আচ্ছা।

মেজগিন্নী ডঃ দাসকে একগ্লাস সরবৎ ঢালিয়া দিলেন। তিনি তাহা পান করিয়া শূন্য গ্লাসটি বিমলের হাতে দিলেন। তারপর আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।

মেজ গিন্নী। আর একটু দেব, ডক্টর দাস?

ডঃ দাস। অ্যাঃ? না, না, আর না। অনেক ধন্যবাদ।

মেজ গিন্নী। কেমন লাগল? ভাল হয় নি বুঝি?

ডঃ দাস। ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

মেজগিন্নী ও বিমল উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন।

মেজ গিন্নী। কি খেলেন না খেলেন তাও মনে থাকে না আপনার? ওটা চা নয়, সরবৎ। সরবৎ আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় নাকি?

ডঃ দাস। (অপ্রতিভভাবে) দেখুন আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। আমার সেই অনর্গল-রশ্মির যন্ত্রের বাক্সটা কোথায় ফেললুম চৌধুরী ম'শায়?…ওঃ, হ্যাঁ, সেটা আপনার বাইরের ঘরে রেখে এসেছি।

মেজ গিন্নী। সে কি! আপনার সেই অনর্গল-রশ্মির যন্ত্রের বাক্স আপনি এখানে এনেছেন! আর এতক্ষণ সে কথা বলেন নি!…ও মেজকর্ত্তা, দাও না তুমি পরীক্ষা দাও না মেজকর্ত্তা। দেখি তোমার মনে কোনো—

মেজকর্ত্তা। পরীক্ষা দেব আমি! কেন? তুমি কি মনে মনে আমাকে সন্দেহ করো মেজ গিন্নী?

মেজ গিন্নী। না, না, সন্দেহ করব কেন? এতদিন তবে কি তোমার সঙ্গে বৃথাই ঘর করলুম! তুমি দেখিয়ে দাও সবাইকে, বুঝুক সবাই। চিনুক তোমাকে ভাল ক'রে।

ডঃ দাস। ভাল ক'রে মানুষকে চেনাবার জন্যেই তো এই আলো।

মেজ গিন্নী। এতে কোনো অনিষ্ট হবে না তো ডক্টর দাস?

ডঃ দাস। না, না, অনিষ্ট হবে কেন? এতে শুধু মনের কথাটি বোঝা যাবে। রশ্মিটা খুব মৃদু ক'রে দেব। তাতে তার ফল মাত্র একঘণ্টা থাকবে। তারপর আবার যে-কি-সেই। ঐ একঘণ্টার কথা পরে আর মনেও থাকবে না।

বিমল। অনেকটা মদের নেশার মতন সার।

ডঃ দাস। না, না, এতে নেশা টেশা কিচ্ছু হয় না।

মেজ গিন্নী। তবে আর ভয় কি মেজকর্ত্তা! দাও তুমি পরীক্ষা।

মেজকর্ত্তা। (স্বগত) হুঁ, যদি একটা কিছু করেই বসি, বা বলেই ফেলি, আমার না হয় মনে না-ই রইল, কিন্তু অন্য লোকে তো জানবে!

মেজ গিন্নী। অত কি ভাবছ তুমি মেজকর্ত্তা।

মেজকর্ত্তা। (স্বগত) সেটি হচ্ছে না। পরীক্ষা যদি দিতেই হয় বাড়ীশুদ্ধ সবাই পরীক্ষা দিক, মায় ঝি চাকর পর্য্যন্ত। যাতে পরে কেউ কিছু মনে রাখতে পারবে না।…আর, মেজ গিন্নীর মনে কোনো পাপ আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার।

ডঃ দাস। চুপ ক'রে গেলেন যে চৌধুরী মশায়! আপনার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আপনার মনের অনেকগুলো অর্গল এরি মধ্যে বন্ধ হ'য়ে গেল।

মেজকর্ত্তা। না, না, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একযাত্রায় পৃথক ফলই বা হবে কেন? বাড়ীশুদ্ধ সবাইএর পরীক্ষা নিন।

ডঃ দাস। ওঃ বুঝেচি, বুঝেচি, কোন্‌খানে খট্‌কা। কিন্তু বাড়িশুদ্ধ সবাইএর ওপর পরীক্ষা করলে তার ফলাফল দেখবে কে? একঘণ্টা পরে যে আর কারো কিছু মনে থাকবে না, যে যা দেখবে সব ভুলে যাবে যে!

মেজ গিন্নী। ফলাফল দেখবার জন্যে আপনি থাকুন না ডক্টর দাস।…কিন্তু আমরা কে কি করলুম না করলুম, সমস্ত কথা আমাকে পরে বলতে হবে। কিছু লুকোলে চলবে না।

ডঃ দাস। (হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, বিশেষ ক'রে চৌধুরী ম'শায় কি করলেন সেটি আপনাকে চুপি চুপি জানিয়ে দেব, হা-হা।

মেজকর্ত্তা। (স্বগত) ও দাসটা তো একটা আধপাগলা মানুষ, তায় বেজায় অন্যমনস্ক। কি খায় না খায়, তাই ওর মনে থাকে না। আর আমরা কি করলুম না করলুম তাই বুঝি ওর মনে থাকবে? যদি বেফাঁস কিছু দেখেও ফেলে, হয়তো ভুলেই যাবে। আর যদি না-ই ভোলে, যদি তা রটিয়ে বেড়ায়, তখন ওর যন্তরের দোষ দিলেই চলবে। এতটা এগিয়ে আর 'না' করাটা ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ মেজগিন্নীর কাছে তাহলে আর আমার মান থাকবে না।

ডঃ দাস। আমি রাজী, কিন্তু আমার যন্তর টন্তর ধরবার জন্যে একজন লোক চাই। বিমল হলেই চলবে। তাতে আপনাদের কারো অমত্ নেই তো?

মেজকর্ত্তা। (স্বগত) ঠিকই হ'য়েছে। একটা পাগ্‌লাটে প্রফেসর, আর একটা পাঁড় মাতাল। ও যদি কিছু রটিয়ে বেড়ায়, কেউ বিশ্বাস করবে না, বলবে, মদের খেয়ালে বকছে। (প্রকাশ্যে) বিমল তো ঘরের ছেলে, অমত্ আবার কিসের।

ডঃ দাস। বেশ, তাহলে যান, আপনারা বাড়ীর সবাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। আমি আর বিমল ততক্ষণে যন্তর টন্তর সব ঠিক ক'রে ফেলি।

মেজ গিন্নী। চল, চল, মেজকর্ত্তা, আমার আর দেরী সইছে না। ওঃ, কি কাণ্ড না হবে! বিকাশকে মালিনীকে তুমি সমস্ত বুঝিয়ে বললেই তারা রাজী হবে।

মেজকর্ত্তা। গণ্‌শা আর তার বউকেও বলতে হবে।

মেজ গিন্নী। চাকর বাকরকে আবার এর মধ্যে টানবার দরকার কি?

মেজকর্ত্তা। না, না, আমরা যখন থাকব, তখন তাদেরও থাকা চাই। তুমি কিচ্ছু বোঝনা মেজগিন্নী।

উভয়ের ভিতরের দিকে প্রস্থান

ডঃ দাস। আমি বুঝি।…বিমল, এসো, এখন এ ঘরটাকে খালি ক'রে ফেলতে হবে। এসব চেয়ার টেবিলগুলাকে ঐ উত্তরদিকের ঘরে সরিয়ে রাখতে হবে। তেপায়া টেবিলটা থাক, দরকার হবে। যন্তরটা ওরি ওপর রাখব। তবে বাদ বাকি সব জিনিষ ওঘরে নিয়ে চল। (উত্তরদিকের ঘরের দরজা খুলিয়া উভয়ে এই ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র সেই ঘরে সরাইয়া ফেলিলেন) বিমল, এখন যাও তো, বাইরের ঘর থেকে আমার সেই যন্ত্রটা

নিয়ে এসো তো। দেখো, যেন ভাঙে না। (বিমল বাহিরে চলিয়া গেলেন ও একটি নাতিবৃহৎ কালো রঙের যন্ত্রের বাক্স লইয়া আসিলেন। যন্ত্রটির সাম্‌নের দিকে একটি পুরু লেন্স, যন্ত্রের গা হইতে ইলেক্‌ট্রিকের চাকা তার ঝুলিতেছে। ডক্টর দাস যন্ত্রটিকে তেপায়ার উপর রাখিলেন এবং তারের প্লাগটি ঘরের দেয়ালের 'সকেটে' আটকাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—) ঠিক আছে।

উত্তরের ঘরের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল।

মেজকর্ত্তা, মেজগিন্নী, বিকাশ, মালিনী, গণেশ ও গণেশের বৌ এই ঘরে আসিলেন।

ডঃ দাস। এই যে, আপনারা সবাই এসেছেন। আমি তৈরি। আপনারা সকলে আমার এই যন্ত্রের সামনে, এই পুব দেয়াল ঘেঁসে সার দিয়ে দাঁড়ান।

তাঁহারা সকলে সার দিয়া দাঁড়াইলেন, যেন ছবি তোলাইতেছেন। গণেশ তাহার স্ত্রীকে কহিল—

গণেশ। শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে নি। লেফট্‌ রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ বলে পা ঠুকতে থাক।

গণেশের স্ত্রী। দেখছ বড়মা—

মেজগিন্নী। আঃ গণ্‌শা, থাম্‌ না। দেখ্‌ না, এখ্‌খুনি কি হবে।

ডক্টর দাস যন্ত্রের মধ্যে এক অদৃশ্য সুইচ্‌ টিপিতেই সমস্ত ঘর অন্ধকার হইয়া গেল এবং লেন্সের মধ্য হইতে সুতীব্র নীল রশ্মি বাহির হইয়া সারবন্দী দাঁড়ানো স-ভৃত্য চৌধুরী পরিবারের উপর পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই নীল রশ্মি অন্তর্হিত হইল এবং ঘর আবার আলোকিত হইয়া উঠিল।

ডঃ দাস। বাস্‌, হ'য়ে গেছে।

মেজকর্ত্তা প্রভৃতি সকলে কহিলেন—

বিকাশ। কই কিছুই তো টের পাচ্ছিনে।

মেজকর্ত্তা। আমার যেন কেমন তেষ্টা তেষ্টা পাচ্ছে।

গণেশ। ছবি কবে পাওয়া যাবে হুজুর?

মেজগিন্নী। ছবি নয় রে গণ্‌শা, ছবি নয়। তুই কিছু পাচ্ছিস্‌ কি?

গণেশ। হ্যাঁ, মনে হ'চ্ছে যেন আমার মাথার মধ্যে এরোপ্লেন উড়ছে—ভোঁ ভোঁ ক'রে।

ডঃ দাস। আপনারা একটু ভেতরে যান। এ ঘরটা আমাকে দু'মিনিটের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।

মেজ গিন্নী প্রভৃতি সকলে। ভেতরে যেতে হবে? আচ্ছা, চল, চল—

বিমল ও ডঃ দাস ছাড়া সকলে ভিতরে চলিয়া গেলেন

ডঃ দাস। নাও বিমল, শীঘ্র করো। আমরা ঐ উত্তরের ঘরে লুকিয়ে থাকব। দরোজা বন্ধ ক'রে পরদার আড়াল থেকে দেখব কি হয়। খবরদার, যা দেখবে তাতে উত্তেজিত হ'য়ো না।

যন্ত্র গুটাইয়া লইয়া উত্তরের ঘরের দিকে চলিতে লাগিলেন

বিমল। (চলিতে চলিতে) শুনেই আমার ভয় করছে সার। ধরুন, যদি ভীষণ রকমের কিছু হয়, তাহ'লে?

ডঃ দাস। তাহ'লে তার ব্যবস্থা তো আছেই আমার কাছে। কিন্তু তার দরকার হবে না। মাত্র একটা ঘণ্টা বৈ তো নয়। তুমি ভয় পেও না। এসো।

উভয়ে উত্তরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরোজা ভিতর হইতে বন্ধ করিলেন

কিছুক্ষণ সমস্ত চুপচাপ। তারপর হঠাৎ মেজকর্ত্তা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার গায়ে সেই নামাবলী, পায়ে সেই খড়ম। এবার আর গণেশের কাছে চটিজুতা চাহিলেন না, সটান বাহির হইয়া গেলেন। তারপর মেজগিন্নী এবং গণেশের বৌ প্রবেশ করিলেন। গণেশের বৌ মালিনীর একখানি ভালো জর্জেট সাড়ী পরিয়া আসিয়াছে, মুখে খুব সাদা করিয়া পাউডার ঘষিয়াছে।

মেজগিন্নী। মেজকর্ত্তা অমন ক'রে কোথায় বেরিয়ে গেল রে?

গণেশের বৌ। তা আমি কেমন ক'রে জানব? অত যদি কত্তা-সোহাগী হ'য়েছো তো যাও না, তুমি বেইরে যাও।

মেজগিন্নী। কি বললি! (গণেশের বৌ এর বেশভূষা লক্ষ্য করিয়া) আ মর, বৌমার ঐ দামী শাড়ী তুই পরেছিস্‌ যে! আবার মুখে পাউডার মেখে কী রূপই খুলেছে! যেন মাগুর মাছকে কাটবার আগে ছাই মাখিয়েছে!

গণেশের বৌ। আমার সাজ পোষাক দেখেই ভিরমি যাচ্ছ, আমার মনের কথাটি শুনলে না জানি কি করবে।

মেজগিন্নী। কি তোর মনের কথা শুনি!

গণেশের বৌ। দাদাবাবুকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসি।…যাঃ-বলে ফেলনু মনের কথা!

মেজগিন্নী। কী সর্বনেশে কথা! বিকাশও এর মধ্যে আছে নাকি? আমার সর্বশরীর থরথর ক'রে কাঁপছে। বল্‌, বল্‌—

গণেশের বৌ। না, এ আমার লুকুনো কথা কাউকে বলিনি। তবে আজ আর চেপে রাখতে পারবনি। আমি এক্ষুণি দাদাবাবুকে জানাবো।…আচ্ছা, তুমিই বলতো, আমি কি নেহাৎ কুচ্ছিৎ? ভদ্দর নোকের পাতে দেবার মতো নই?

মেজগিন্নী। তুই আমার ছেলে-বৌয়ের সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিবি?

গণেশের বৌ। সোনার সংসার? আর তুমি আমায় হাসিও না বড় মা। তোমার বউএর গুণপনা তোমার জানতে বাকি নেই। আজো তার ছেলেপুলে হ'ল না কেন?—

মেজগিন্নী। ছোট মুখে বড় কথা! বেরো তুই এখুনি আমার বাড়ী থেকে! বেরো—

গণেশের বৌ। ভয় নেই, ভয় নেই, ওগো যাত্রার দলের ভীমসেন, ভয় নেই। তোমার বাড়ীতে থাকতে এসি নি। তোমার ছেলেটিকে নিয়ে বেইরে যাব।

গণেশের বৌ ভিতরের দিকে যাইতে উদ্যত হইল, মেজগিন্নী অমনি তাহাকে বাধা দিলেন। উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও মারামারি লাগিয়া গেল। চুড়ী ভাঙিল, চুল ছিঁড়িল, কিল চড় ঘুসি বৃষ্টি হইতে লাগিল।

এমন সময় মদের বোতল হাতে করিয়া টলিতে টলিতে মেজকর্ত্তা ঘরে ঢুকিলেন। রাস্তার মোড়ের দোকান হইতে কিনিয়াছেন, পান করিতেও বিলম্ব করেন নাই। তাঁহার পায়ের খড়মজোড়া অদৃশ্য হইয়াছে, গায়ের নামাবলী পাগড়ী করিয়া মাথায় পরিয়াছেন।

মেজকর্ত্তা। বাঃ, বেড়ে কুস্তি হচ্ছে তো! মেজগিন্নী, তুমি যে এমন পালোয়ান ব্যক্তি তাতো জানতুম না। গণশার বৌ, তোর মুখে চুণকাম করেচিস্ নাকি? বাঃ বাঃ, বেড়ে হয়েছে। তোর বাসন মাজা হাতের জোর দেখিয়ে দে দিকি বেটি!…(মদ্যপান) …লড়াই আজকাল কোথায় না হচ্ছে! রথিডং এ হ'চ্ছে, বুথিডং এ হচ্ছে, কিন্তু তবু, ঘরে বসে মদ খেতে খেতে এমন লড়াই দেখতে পাবো এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি (মদ্যপান)

মেজগিন্নী। (যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়া) ও কি মেজকর্ত্তা, তুমি মদ খাচ্ছো! তুমি যে পানটি পর্য্যন্ত খেতে না মেজকর্ত্তা!

মেজকর্ত্তা। আরে বাবা মেজগিন্নী, ওসব পাষ্ট হিষ্ট্রির দরকার কি! তুমি বুঝি ঝি-চাকরের সঙ্গে কুস্তি লড়তে? যুদ্ধ করছিলে, যুদ্ধ করো। আমি ততক্ষণ একটু গালটা ভিজিয়ে নিই। (মদ্যপান)

মেজগিন্নী। (ক্রোধে ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিলেন) আমি এতদিন একটা মাতালের সঙ্গে ঘর করছি! মেজকর্ত্তা, তুমি মাতাল! তুমি মাতাল! আমি তোমার মুখদর্শন করব না।

বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন, গণেশের বৌও সুযোগ পাইয়া বিকাশবাবুর সন্ধানে ভিতরে চলিয়া গেল

মেজকর্ত্তা। আমোদটাই মাটি করে দিলে!

ক্রোধে মাথার নামাবলী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

যুদ্ধ ও গৌরী সেন

অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আধুনিক যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। যুদ্ধরত দেশগুলিকে বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়োগ করিতে হয় এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ ব্যবহার করিতে হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এজন্য প্রতি বৎসর যাহা ব্যয় করিতেছে তাহা প্রায় ধারণার অতীত। পূর্ব্বের হিসাবে একটি বোমারু এরোপ্লেনের খরচ কম পক্ষে পাঁচলক্ষ টাকা। একটা যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে দশ কোটি টাকার কমে হয় না। একদিনে হাজার এরোপ্লেনে জার্মানী আক্রমণ করিতে শুধু পেট্রোলের খরচ কোটি টাকার উপর। এত টাকা আসে কোথা হইতে? গল্পে আছে রাংতা বোঝাই করিয়া গৌরীসেন নৌকা পাঠাইয়াছিল, কিন্তু রাত্রে সব রাংতা রূপা হইয়া যায় এবং গৌরীসেন বড়লোক হয়। তৎপর কাহারও কোন প্রয়োজন হইলে গৌরী সেনের নিকট চাহিলেই টাকা পাওয়া যাইত। আমাদের যুদ্ধরত দেশগুলির টাকা কোন গৌরী সেন কোথা হইতে সংগ্রহ করে? অনেকের ধারণা গবর্ণমেণ্টের টাকার জন্য ভাবিতে হয় না। কয়েক দিস্তা কাগজ ছাপাইলেই হয়। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে সরকারকে কেন টাকার জন্য ধার চাহিতে হয় বা দান করিবার জন্য রায় সাহেবদের নিকট হাত পাতিতে হয়?

কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হইতেছে, যুদ্ধ নিজের দেশের পক্ষে ভাল কি মন্দ, যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া অন্য উপায় ছিল কি না বা এখনও আছে কি না, এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে যুদ্ধ না করিয়া অন্য উপায় নাই। যুদ্ধরত দুই দেশের দুইজন প্রতিনিধি, যেমন হিটলার ও চার্চ্চিল, মল্লযুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয় মীমাংসা করিতে পারিলে খরচ পত্রের কোন কথা উঠিত না। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয় তখন আমাদের আলোচনা করিতে হইবে যে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিলে কম অন্যায় হইবে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে কম ক্ষতি হইবে।

ব্যয়ের দিক হইতে যুদ্ধ পরিচালনার একটি সহজ উপায় আছে। বিনা পারিশ্রমিকে সৈন্য সামন্ত ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং যে সকল মাল মসলার প্রয়োজন—লোকেদের নিকট হইতে বিনা মূল্যে সে সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই উপায় খুব সহজ হইলেও লোকেরা ইহা জবরদস্তিমূলক মনে করিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও যুদ্ধে অথবা যুদ্ধরত শিল্পকর্ম্মে যোগদান করিতে বাধ্য করিলে অথবা কাহারও জিনিষপত্র জোর করিয়া বিনামূল্যে গ্রহণ করিলে সকলেই ইহা অন্যায় ও অবিচার বলিয়া মনে করিবে এবং এই নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি এত প্রবল হইবে যে কোন সর্ব্বশক্তিমান সরকারও ইহা বেশীদিন চালাইতে পারিবে না। সরকার যদি বাছিয়া বাছিয়া এমন লোক বাহির করিতে পারে যাহারা সৈনিক হইলে তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের বেশী অসুবিধা হইবে না এবং এমন সব লোকের নিকট হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন সব জিনিষ গ্রহণ করিতে পারে যাহা করিলে ঐ সকল লোকদের তত ক্ষতি হইবে না, তাহা হইলে এই প্রণালীতে অন্যায় ও অবিচার নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা করা অসম্ভব এবং কোন সুসভ্য সরকারের এমন কর্ম্মচারীবাহিনী নাই যাহারা পক্ষপাতদোষ শূন্য হইয়া ন্যায়ভাবে ইহা করিতে পারে। এই সকল কারণে সাধারণভাবে এই নীতি কোনও সভ্য রাষ্ট্রে অবলম্বন করা হয় না, কিন্তু এই নীতি একেবারে অপ্রচলিত—ইহা বলা চলে না। অনেক দেশেই যুদ্ধে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে এখনও যুদ্ধে যোগদান করা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। যে সকল দেশে ইহা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে সে সকল দেশে অবশ্য সৈনিকদের বেতন দেওয়া হয় কিন্তু সেই বেতনের পরিমাণ সরকার নিজেদের ইচ্ছামত ঠিক করিয়া দেয়। আমাদের দেশে সরকার অনেক স্থানে নৌকা, সাইকেল, মোটরগাড়ী, জাহাজ ও এরোড্রাম বা রাস্তা তৈয়ার করিতে জমি বিক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিনিয়া চলিয়াছে; কিন্তু যেখানেই বিক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রয় করা হয় এবং যেখানে ক্রেতা মূল্য ঠিক করিয়া দেয় সেখানে নীতির দিক হইতে বাধ্যতামূলক কর্ম্মে নিয়োগ (Conscription) অথবা দ্রব্যগ্রহণ (Commandeering) করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সকল দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়া বলা যাইতে পারে সাধারণতঃ অন্য উপায় থাকিলে কোন সভ্য সরকার ইহা করে না। যুদ্ধের জন্য লোক নিয়োগ ও মাল মসলা খরিদ টাকা দিয়া করা হইয়া থাকে এবং এই টাকা সরকার প্রজার নিকট হইতে কর হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপর শুল্ক বসাইলে সরকার বেশী রাজস্ব পায়। জিনিষ পত্রের ব্যবহারকারী হিসাবে আমরা অধিক মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করি এবং ঐ অতিরিক্ত টাকা সরকারের তহবিলে পৌঁছে। ইহার সুবিধা এই—আমরা অনেকেই কি ভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া আমাদের অসুবিধা হইল তাহা বুঝিতে পারি না এবং স্থানীয় দোকানদার বা দ্রব্য-উৎপাদনকারীকে গালাগাল করি। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে—বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আনয়ন করা হয় শুল্ক বৃদ্ধির জন্য সে সকল জিনিষের দাম বাড়িয়া গেলে ঐ সকল জিনিষের উৎপাদন দেশের ভিতর করার চেষ্টা করা হয়। তাহাতে ধনোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সরকার দেশজাতদ্রব্যের উপরও (excess) শুল্ক বসাইয়া

দেয় তাহা হইলে এই সুবিধা থাকে না। যুদ্ধের ধাক্কায় কৃত্রিম সুবিধা পাইয়া কোন কোন শিল্প এইভাবে গড়িয়া উঠিলে এবং ঐ সকল শিল্পের নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষমতা কিছু না থাকিলে শান্তি ফিরিয়া আসিলে ঐ সকল শিল্প নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। তাহাতে শিল্প বাণিজ্যে কিছুটা ওলট্‌পালট হওয়ারও সম্ভাবনা। নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের উপর শুল্ক বসাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, এই শুল্কের ভার প্রধানতঃ দরিদ্রের বহন করিতে হয়। বিলাস দ্রব্যের উপরও শুল্ক বসান যাইতে পারে কিন্তু বিলাসদ্রব্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলে লোকে তাহা কম ব্যবহার করে। সাবান, স্নো, হাতঘড়ী প্রভৃতি ব্যবহার না করিলেও চলে। সেকারণ অধিক শুল্কের জন্য এই সকল জিনিষের দাম বাড়িলে লোক এইগুলি কম কিনিবে। তাহাতে সরকার কম রাজস্ব পাইবে। কিন্তু লবণ, কাপড়, তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক। এইগুলি না হইলে একেবারেই চলে না। সেজন্য দাম বাড়িলেও আমরা পূর্ব্বের মতই কিনিতে বাধ্য। ফলে সরকার অবশ্য রাজস্ব অধিক পায়, কিন্তু এই রাজস্ব আসে দরিদ্রের পকেট হইতে। যাহার টাকা কম তাহাকে যদি অধিক শুল্কভার বহন করিতে হয় তাহা হইলে অবিচার হয়। সেজন্য যাহাদের আয় অধিক তাহাদের নিকট হইতে অধিক আয়কর গ্রহণ করা অন্যায় হয় না। যাহারা বহু টাকা উপার্জ্জন করে তাহাদের নিকট টাকার মূল্য কম। তাহারা অধিক টাকা দিতে পারে। বেশী কর দিতে হইবে এই ভয়ে কেহ কম উপার্জ্জন করিবে না। সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া অর্থোৎপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং আয়-কর বাড়াইয়া দিলে ধনোৎপাদন কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের সময় অনেকেই নানাভাবে অধিক আয় করিয়া থাকে। এই অতিরিক্ত আয় (excess profit) ষোল আনা আদায় করিলে অন্যায় হয় না। যদি কোন কোম্পানী যুদ্ধের পূর্ব্বে শতকরা দশ টাকা লাভ করে এবং যুদ্ধের সময় শতকরা ত্রিশ টাকা লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত বিশ টাকা সরকার গ্রহণ করিলে সেই কোম্পানীর আপত্তি করা উচিত নয়। অতিরিক্ত লাভের কারণ যুদ্ধের জন্য মূল্য বা চাহিদা বৃদ্ধি। কোম্পানীর ইহাতে কোন কৃতিত্ব নাই। ধনবান ব্যক্তিদের সন্তান ও ওয়ারিশগণ নিজের চেষ্টা বা কৃতিত্ব ছাড়া যে সম্পত্তি লাভ করেন তাহার উপর অধিক হারে কর বসাইলে ধনোৎপাদন ব্যাহত হয় না এবং অন্যায় হয় না। এইভাবে মুখ্য ও গৌণ (direct and indirect) কর বসান হয় এবং বর্ত্তমান সকল সভ্য সরকার কর বসাইয়া যুদ্ধের ব্যয় অন্ততঃ অনেকাংশে নির্ব্বাহ করে। এই প্রণালীতে যুদ্ধ চালনা করিলে একটা সুবিধা এই হয় যে, যুদ্ধের আর্থিক ক্লেশ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যায়—ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু থাকে না। বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক ও নাগরিকগণ যুদ্ধের জন্য দায়ী। সুতরাং যুদ্ধের অন্যান্য দায়িত্বের ন্যায় আর্থিক দায়িত্বও তাহাদের। তাহারা যদি নিজেরা সে দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে বহন করে তাহা হইলে অসঙ্গত কারণে যুদ্ধ আরম্ভ করা বা অধিক দিন চালনা করার সম্ভবনা কম। অন্ততঃ ভবিষ্যৎ দেশবাসীর স্কন্ধে কোন গুরুভার চাপান হয় না।

এইভাবে যুদ্ধ চালনার আরও একটি সুবিধা এই যে, ইহাতে জিনিষপত্রের দাম বেশী বাড়িতে পারে না। যুদ্ধের সময় সরকার বহু টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। নানাভাবে এই টাকা লোকেদের নিকট আসে। কেহ সৈনিক হিসাবে বেতন পায়, কেহ বা মালপত্র বিক্রয় করিয়া টাকা পায়। জিনিষপত্রের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও লোকের হাতে অধিক টাকা আসে। জিনিষপত্র কম, কিন্তু সকলেই টাকা পকেটে লইয়া কিনিতে প্রস্তুত। এই অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকে। অবশ্য যুদ্ধের জন্য যাহারা অনেক টাকা পাইতেছে তাহাদের মূল্যবৃদ্ধিতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অনেকের আয় একপ্রকার বাঁধা, যেমন মজুর, চাকুরীজীবী, মহাজন, জমিদার, পাওনাদার প্রভৃতি। এই সকল লোকেদের আয় পূর্ব্ব হইতে নির্দিষ্ট। কিন্তু আয় সমান থাকা সত্ত্বেও জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের কষ্ট অত্যধিক। যেমন ধরা যাক্ মজুর বা কেরাণী। দিন মজুরী একপ্রকার সর্ব্বদেশেই নির্দ্দিষ্ট এবং হঠাৎ তাহা বাড়ান যায় না। পূর্ব্বে যে মজুর ছয় আনা পাইত এখনও সে ছয় আনাই পাইবে কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হেতু এই ছয় আনায় এখন সে পূর্ব্বের পরিমাণ জিনিষ কিনিতে পারিবে না। তাহাকে হয়ত আধপেটা খাইতে হইবে। জিনিষপত্রের এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি বহুলোকের বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়সম্পন্ন দরিদ্রের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু সরকার যদি লোকেদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে কর আদায় করে তাহা হইলে একদিকে লোকেরা যেমন সরকার যুদ্ধের কাজে ব্যয় করে বলিয়া অধিক টাকা পায়, অন্যদিকে সরকার কর বসাইয়া লোকেদের টাকা শোষণ করিয়া নেয়। ফলে লোকেদের হাতে অতিরিক্ত টাকা থাকিতে পারে না এবং জিনিষের দাম অধিক বাড়িতে পারে না।

অবশ্য দেশের ভিতর ঋণ গ্রহণ করিলেও ইহা হয়। দেশের ভিতর হইতে সরকার ঋণ গ্রহণ করিলে ঋণের পরিমাণ টাকা লোকেদের হাত হইতে সরকারের নিকট চলিয়া যায় এবং সরকার ঐ টাকা ব্যয় করিলে তাহা আবার লোকেদের নিকট আসে। সুতরাং লোকেদের হাতে বেশী টাকা থাকে না বলিয়া জিনিষপত্রের দাম বেশী বাড়ে না। বর্ত্তমান যুগে যে ভাবে যুদ্ধ চলে তাহাতে শুধু কর বসাইয়া যুদ্ধের সমস্ত খরচ বহন করা এক প্রকার অসম্ভব। যুদ্ধের ফলে অনেক দেশের সুবিধাও হয়। সুতরাং যে যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমান কাল শারীরিক পরিশ্রম ও অনেকাংশে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, সেই যুদ্ধের ব্যয়ভার ভবিষ্যৎ কাল বহন করিলে খুব অন্যায় হয় না। ঋণ দুই প্রকার হইতে পারে। দেশবাসীর নিকট হইতে সরকার ঋণগ্রহণ করিতে পারে অথবা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন খুব সুবিধা। দেশের ভিতর যে সম্পত্তি আছে তাহাতে হাত দেওয়া হইল না। দেশের ভিতর যে ভাবে ধনোৎপাদন হইতেছিল সে ভাবেই হইতে থাকিবে। বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ অর্থে বিদেশ হইতে মাল মশলা ক্রয় করা যাইবে এবং তদ্বারা যুদ্ধ চালাইলে দেশবাসীর উপর তখনকার মত গুরুভার চাপান হইল না। অনেক সময় বিদেশ হইতে সৈন্য সামন্ত অথবা জিনিষপত্র ব্যবহার করিতে হইলে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নাও হইতে পারে। কিন্তু যখন পরে ঋণের সুদ বা আসল ফিরাইয়া দিতে হইবে তখন দেশবাসীর উপর অধিক কর বসাইতে হইবে এবং যে টাকা বিদেশে পাঠান হইবে ঐ টাকার পরিমাণ জিনিষপত্র দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। দেশের ভিতর ঋণ গ্রহণ করিলে অবশ্য ইহা হইবে না। তখন আভ্যন্তরিক ঋণের সুদ বা আসল ফিরাইয়া দিতে হইলে দেশবাসীর উপর অধিক কর ধার্য্য করিতে হইবে। এই কর একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং সুদ ও আসলের টাকা দেশের ভিতরই অন্য শ্রেণীর লোকের হাতে পৌঁছিবে। ফলে টাকা দেশের ভিতর এক হাত হইতে অন্য হাতে যাইবে কিন্তু দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে না। অবশ্য যে ঋণ করা হইল তাহা দেশের ভিতরই হউক আর বাহিরেই হউক, যুদ্ধের কাজে ব্যয়িত ও নষ্ট হইবে। ঐ টাকা ধনোৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে তাহা হইতে লাভ হইত এবং সুদের জন্য দেশবাসীকে করভারে পীড়িত হইতে হইত না। যুদ্ধ জিনিষটাই শক্তি ও ধনের অপচয়। কিন্তু যদি এই অপচয় করিতেই হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ না করিয়া দেশের ভিতর হইতে গ্রহণ করা মন্দের ভাল। এই ঋণ কি প্রণালীতে শোধ করা হইবে, তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিলেও

মোটামুটি বলা যাইতে পারে ইহা দ্বারা ভবিষ্যতের অল্পবয়স্ক, কর্মক্ষম উৎসাহী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের উপর চাপ অধিক হইবে এবং বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, অনুৎসাহী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপর চাপ কম হইবে।

যখন কর ও ঋণ উভয়ই যুদ্ধ চালনের পক্ষে যথেষ্ট হয় না তখন অনেক সময় কোন কোন দেশের সরকার নিরুপায় হইয়া কাগজের মুদ্রা ছাপাইতে থাকেন। এই মুদ্রা-স্ফীতি (inflation) প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন হইতে পারে। যুদ্ধের সময় সকল দেশেই সোনা রূপার মুদ্রা অপ্রচলিত থাকে এবং কাগজের নোট ছাপাইয়া ঐ নোটগুলিকে আইনসম্মত (legal tender) মুদ্রা করা হয়। সরকারের যখন দরকার তখন এই কাগজের নোট ছাপাইয়া কাজ চালাইতে পারে। অথবা সরকার ঋণ গ্রহণ করিলে ঐ ঋণ যদি দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ হইতে না আসে এবং দেশের ব্যাঙ্কগুলি সরকারকে ঋণ দিয়া ঐ ঋণের উপর ভিত্তি করিয়া টাকা দাদন করিতে থাকে তাহা হইলেও কার্য্যতঃ একই হইবে—দেশের ভিতর মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে। এই প্রণালীর অসুবিধা এই যে, একবার অধিক নোট ছাপাইয়া জিনিষ কিনিতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের দাম বাড়িবে। সেজন্য দ্বিতীয় বার পুর্ব্বের পরিমাণ জিনিষ কিনিতে হইলে আরও অধিক নোট ছাপাইতে হইবে। এইভাবে একবার মুদ্রা-স্ফীতি আরম্ভ করিলে তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে এবং বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়—যে সকল রাষ্ট্র একবার মুদ্রা-স্ফীতি আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের মুদ্রা পরে একেবারে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে।

অতিরিক্ত মুদ্রা বৃদ্ধি করিলে মুদ্রার মূল্য কমে এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়ে। ইহাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও ধনোৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি হইলেও এই প্রাচুর্য্য কৃত্রিম ও অস্থায়ী। টাকার হিসাবে ব্যবসায়ীরা দেখিবে খুব লাভ হইতেছে, কিন্তু এই টাকা দিয়া পুর্ব্বের মত জিনিষপত্র কেনা যাইবে না। যাহাদের সঞ্চিত টাকা আছে তাহাদের টাকা মূল্যহীন হইয়া যাইবে। সারাজীবন কষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি এক হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে সে হয়ত জীবনের শেষভাগে দেখিবে তাহার এক হাজার টাকা পুর্ব্বের একশ টাকার সমানও নয়। এই ভাবে একটি লোকের এক হাজার টাকার মূল্য নষ্ট না করিয়া তাহার নিকট হইতে পাঁচশ টাকা কর হিসাবে গ্রহণ করিলে বোধ হয় তাহার এত সর্ব্বনাশ হইত না। যে ব্যক্তি পুর্ব্বে এক হাজার টাকা ধার করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে সে ব্যক্তি ঐ হাজার টাকা সুদসহ ফিরাইয়া দিলে মহাজন ঐ হাজার টাকা দিয়া সামান্য জিনিষই কিনিতে পারিবে। শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধি সত্ত্বেও পুর্ব্বের মত জিনিষ কিনিতে পারিবে না—জিনিষের দাম বাড়িয়াই চলিবে। মুদ্রা-স্ফীতি একবার আরম্ভ হইলে কিছু সময়ের জন্য সামান্য কয়েকজন ব্যবসায়ী ব্যতীত কাহারও পক্ষে শুভ হয় না। ইহা দেশবাসীর ও সরকারের বিশেষ অমঙ্গল সূচনা করে।

রবীন্দ্রকাব্যে স্বাদেশিকতা

অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কৈশোর হইতেই তিনি এমন এক অতি পবিত্র স্বদেশপ্রীতির আব-হাওয়ার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন যে সেই মহান্ ভাবই তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাল্যকালের সেই স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশসেবার স্বপ্ন ও কল্পনা তাঁহার হৃদয়ের গিরিকন্দর হইতে নির্ঝরের ন্যায় জগৎ প্লাবিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। যখন নানাভাবে দেশমধ্যে নবজাগরণের উষা জাতির হৃদয়-গগন উদ্ভাসিত করিয়া উঠিতেছিল, তখন কবি ছন্দে ও গানে উদ্দীপনাময়ী পদ্য রচনায় সেই উষাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং পূর্ণ সহযোগিতার দ্বারা বাঙ্গালার তথা ভারতের বিরাট্ স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি জাতিকে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাদেশিকতার অপরূপ প্রেরণা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একথা আধুনিক বাঙ্গালী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে যে, একদা রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেদিন তাঁহার রুদ্র বীণায় যে ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসীকে দুর্গমপথের যাত্রার নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার তৎকালীন কাব্যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে ন্যায় ও সত্যের সন্ধান দিয়াছিলেন।

কবি দেখিয়াছিলেন যে আমাদের জাতীয় জীবন নানা আচারের বন্ধনে শক্তিহীন হইয়াছে, আমরা শুধু বাক্‌পটু, আমরা কর্ম্মকুণ্ঠ, আমরা দীনতা ও জড়তার মধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছি, দুর্ব্বল আত্মপ্রসাদে কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছি। তাই কবি স্বদেশ-জননীকে বারবার অনুযোগের সুরে অনুরোধ করিয়াছেন তিনি যেন তাঁহার সন্তানদের 'স্নেহ-গ্রাস' হইতে মুক্তি দান করেন—

"অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি'।
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রৎ প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী করিবারে।"

বঙ্গমাতা যেন স্নেহাধিক্যবশতঃ নানা বিধিনিষেধের বন্ধনে সন্তানদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে কবির চিত্ত ব্যথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছে—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছো বাঙালী ক'রে, মানুষ করোনি।"

কবি বুঝিয়াছিলেন যে, এই জাতি অলস ও ভীরু হইয়া পঙ্গু ও উদ্যমহীন। তাই এই নির্জ্জীব পশ্চাৎ-পদ জাতিকে তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"আগে চল্, আগে চল্, ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কি বা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই।"

* * * *

"বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়
মহা বেগবান্ মানব-হৃদয়
যারা বসে' আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।"

কবি দেখিয়াছিলেন যে জীবন সংগ্রামে সকল জাতিই অগ্রসর হইয়াছে, কেবল নিবর্বীর্য্য ভারত পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে, আমরা "চিরদিন আছি ভিখারীর মত, জগতের পথ-পাশে, যারা চ'লে যায়, কৃপা চক্ষে চায়, পদ-ধুলা উড়ে আসে।" তাই জাতীয় মহাসম্মেলনের

জন্ম কবি যে মহাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও সেই ব্যথার সুরই ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—

"দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব কর্ম্মভার, মিলি সবার সাথে।"

স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার বটে, কিন্তু সেই অধিকার লাভ করিতে হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা কামনা করিয়া তাহার জন্য যোগ্য হইতে হইবে। ভীরুতা সেই বিরাট্ লাভের পরিপন্থী, আবেদন নিবেদনের মোহ উহাকে সুদূর পরাহত করিয়া দেয়। তাই 'দেশের উন্নতি', "দুরন্ত আশা" প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাক্যবীর, আত্ম-প্রত্যয়হীন, পরপদলেহী জাতির বীর্য্যহীনতাকে কশাঘাত করিয়াছেন। তিনি জাতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন—

"কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে' বহে' নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি ক'রলে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান।
আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা যেওনা পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা, সকল ভিক্ষার ছার।"

"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" এই মহতী বাণী তিনি এদেশে পুনঃ প্রচার করিয়া বারবার বলিয়াছেন যে স্বদেশের দুঃখমোচন ভিক্ষার দ্বারা হইবার নয়, নিজের জননীর লজ্জামোচন করিতে হইবে আপনার চেষ্টার দ্বারা, আপনার আত্মত্যাগের দ্বারা, আপনার শক্তির দ্বারা। এই কথা দেশ জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর,
কেনো তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি !
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেনো রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।"

স্বদেশের দৈন্য মোচনের পথনির্দ্দেশও কবি করিয়াছেন, "দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানা-দিগাভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো ; কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।" যতদিন আমরা দেশের সকল জাতি ও ধর্ম্মনির্বিশেষে মিলিত হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা দুরাশামাত্র, এইকথা কবি বারবার বলিয়াছেন, এই জন্যই কবি মঙ্গল-মহোৎসবের পুরোহিত হইয়া আবাহন-মন্ত্র উদ্গীত করিয়াছেন—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান ;
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান !
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার !
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থ নীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।"

"শিবাজী" নামক বিখ্যাত কবিতাতেও কবি এই একই কথা বলিয়াছেন,—

"সে দিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লবো।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী-বসন
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন
করিব সফল।"

কবি সকল সময়ে ভারতকে মহামানবের মিলনভূমি বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই স্থানে সকলের মিলন হইলে ইহা মহাতীর্থরূপে পরিণত হইবে ইহাই কবি কল্পনা করিয়াছেন।

কবি প্রতি পদক্ষেপে জাতিকে ভয় ও অবসাদের সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন ; তিনি চাহিয়াছেন যেন বিপদের কণ্টকাঘাতে বিক্ষত হইয়াও দেশবাসী বলিতে পারে—

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু-বেলা মরার আগে
মরব না ভাই, মরব না।
তরীখানি বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।"

তাই কবি জাতির জন্য মরণজয়ী বীর্য্যের আরাধনা করিয়াছেন, তিনি ভারতদেবতাকে আবাহন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন—

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র
দাও গো জীবন নব।
* * * *
মৃত্যুবরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।"

এই নির্ভীক মৃত্যুতেই কবি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই তিনি শিখজাতির ইতিহাস হইতে অপূর্ব্ব মৃত্যুবরণের বহু দৃষ্টান্ত কাব্যে গ্রথিত করিয়াছেন, গুরু গোবিন্দের অদ্ভুত আত্মদান বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন যে মৃত্যুই শেষ কথা নহে, গুরুগোবিন্দ বিন্দু বিন্দু করিয়া অমর জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কাছে সংশয় নাই, ভয় নাই, দ্বিধা নাই—এমন কি জীবন মরণ কিছুই নাই।

শ্রীঅরবিন্দের নির্ভীক চিত্ত, অকুণ্ঠ আশা, অখণ্ড আত্মপ্রত্যয় ও

দুর্দ্দমনীর উৎসাহ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তিনি অরবিন্দের মধ্যে দেখিয়াছিলেন—"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" তাই কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

এই মৃত্যুজয়ী প্রয়াসের জন্ম চাই মন্ত্র দীক্ষা, সেই মন্ত্র কি হইবে তাহা কবি নববর্ষে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

"নব বৎসরে করিলাম পণ
　　ল'ব স্বদেশের দীক্ষা ;
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
　　হে ভারত লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ পরের বসন
　　তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন না হইব হীন,
　　ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ
　　ল'ব স্বদেশের দীক্ষা ॥"

অতীতের মোহকে প্রশ্রয় না দিলেও ভারতের প্রাচীন আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ বরণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে তিনি প্রকৃত মহত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বিদেশীর অন্ধ অনুকরণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দৈন্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের মহনীয়তাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই এই দেশের ইতিহাসে ও অবদানে কবি যে সকল মহিমময়ী কাহিনীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদিগকেও তিনি "কথা ও কাহিনী"তে ছন্দে রূপ দান করিয়াছেন। কবির মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তাহার অতীতের ধারাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে।

রবীন্দ্রনাথ দেশকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন, বিশেষভাবে বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বার-বার গাহিয়াছেন—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
　　আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥"

এই দেশ-মাতৃকার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্ব মায়ের)
　　আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্ত্তি
　　মর্ম্মে গাঁথা ॥"

দেশজননীকে নিজে ভালবাসিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দেশবাসীকে এই দেশপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক্
　　মুখ তুলে আজি চাহরে।"

কিন্তু দেশজননীকে ভালবাসিতে হইলে দেশের লোকদিগকে ভালবাসিতে শিখিতে হইবে, আত্মপর ভুলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। কবি বলিয়াছেন—

"দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলী,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
　　নির্ভয়ে আজি গাহ রে।"

শত শতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে পিষ্ট স্বদেশবাসীর ব্যথা বেদনায় কাতর কবির চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

ইহাতেই কর্ম্মক্ষেত্রে অসীম শক্তি আসিবে, দেশবাসীর শক্তির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে। ইহাতেই জয়ের সন্ধান দিবে। কারণ—

"আপনার মায়ে মা বলে' ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে'
　　পুণ্য প্রেমের বাতাসে।"

এইরূপে দেশজননীর আহ্বানে পরস্পর মিলিত হইলে প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইবে, তখন আর সাধনার পথে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। জননীর মন্দিরে শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে, মিথ্যা কলহ ও দ্বেষ হিংসায় আর দেশবাসী ব্যাপৃত থাকিবে না। তখনই দেশবাসী বুঝিতে পারিবে—

"সার্থক জনম আমার,
　　জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো
　　তোমায় ভালবেসে ॥"

তখন মনে জাগিবে অসীম আশা, বুকে ফুটিবে অপূর্ব্ব উৎসাহ, কর্ম্মে জাগিবে অদম্য শক্তি। তাই কবি বলিয়াছেন—

"আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥
বল্‌ব, "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ।—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে ॥"

কর্ম্মে শ্রান্তি আসিতে পারে, উদ্যমে নৈরাশ্য আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই চেষ্টা ছাড়িলে চলিবে না। সেই কথাই কবি দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস্,
　　ওরে মন হ'বেই হ'বে।
যদি পণ করে' থাকিস্
　　সে পণ তোমার র'বেই র'বে ॥"

যদি দুর্গম পথ দেখিয়া সবাই ত্যাগ করে, যদি অন্ধকারের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইয়া পথ না দেখায়, তাহা হইলেও ত জীবনের সাধনা, দেশের জন্ম আমরণ প্রয়াস ত্যাগ করিলে চলিবে না। কবি আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
　　তবে একলা চল রে।

একলা চল একলা চল
একলা চল রে॥"

* * * *

যদি আলো না ধরে—
(ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলরে॥"

কবি কর্ম্মক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ভগ্নোৎসাহ দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে' ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না॥"

বাঙ্গালা দেশের মাতৃমূর্ত্তিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই মূর্ত্তির ধ্যানে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছেন—

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী ?"

ওগো মা—

"তোমায় দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে ভারতের জন্য এক আদর্শ স্বাধীনতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস-শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,'
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বাপিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র-সহস্রবিধি চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,'
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত !"

কবির স্বদেশ প্রেম এমনই স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী, ইহা ভিন্ন যে স্বাধীনতা সে মহৎ নামেরই যোগ্য নয় একথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার অপূর্ব্ব প্রকাশ হইয়াছে বঙ্গজননীর মূর্ত্তি কল্পনায়। তিনি তাঁহার জাতীয় কাব্যে বার বার বাংলার রূপকেই ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীর সম্মুখে সেই রূপটিকে প্রকট করিয়া তাহাকে দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাই কবির স্বাদেশিকতার প্রধান সুর আবেগময়ী ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান্‌

* * * *

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান্‌।"

অন্তরসাথী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

রাত্রি যখন বলে—আসি, আসি, দিন বলে—যাই, যাই ;—
ভাবি মনে-মনে, বিজয়ার সুরে আগমনী-গানই গাই।
অন্তরসাথী, তেমনই তোমার চঞ্চল দু'টি হাতে
চম্পককলি পড়িল কি গাঁথা ঝরা-বকুলের সাথে ?

গোধূলি-লগনে এ কি আলো-ছায়া—দেখে' চোখে আসে জল,
যে শিশিরে ফোটে কুমুদী, তা'তেই মুদিত কমল-দল !

বিরহ-মিলন জীবন-মরণ যুগল খঞ্জনীতে
ভৈঁরো আলাপ করে বৈরাগী মিশাইয়া সোহিনীতে !

মাথার দিব্য, হৃদয়-বন্ধু—চুপি-চুপি আজি বল,—
ঐ চাপা-হাসি সত্য, না—ঐ আঁখি দু'টি ছল-ছল ?
ডান হাতে যার দক্ষিণা-দান, ভিক্ষা অন্য হাতে,
অর্থ তাহার বুঝাও বন্ধু, আজি এ বিদায়-রাতে।



বার্হস্পত্যদর্শন *

অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম-এ

'চার্ব্বাক-পঞ্চাশিকা'

বার্হস্পত্য, লোকায়ত, চার্ব্বাক, পৌরন্দর, অজিত বা কম্বলাশ্বতর দর্শনের সূত্রাকারে যে-সকল মূলগ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল তাহা বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেন কিরূপে বিলুপ্ত হইল তাহা নির্ণয় করাও বর্ত্তমানে একটি গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রসিদ্ধ দার্শনিক Plato যেমন অধ্যাত্মবাদের প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ পাশ্চাত্য জড়বাদের পিতা Demokritosএর সমস্ত গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন অধ্যাত্মবাদের প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ ভারতীয় দার্শনিকগণও সেইরূপ বার্হস্পত্যদর্শনের মূল গ্রন্থগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এরূপও হইতে পারে যে, যে দর্শন অতি প্রাচীন যুগে অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়া 'লোকায়ত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই কালক্রমে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং লোকপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনার স্বতন্ত্রসত্তা হারাইয়া ফেলে এবং অন্যান্য দর্শন মতের মধ্যে তাহারা এমন ক্ষীণ আকারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে যে তাহাদিগকে আর স্বতন্ত্র ভাবে চিনিতে পারা যায় না। কিন্তু এই আদি দর্শন যে এক সময়ে বিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা ইহার 'লোকায়ত' নাম এবং প্রত্যেক দর্শন মতের এই মতকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধ্যাত্মবাদী দর্শনগুলির মধ্যে প্রায় সকলগুলিই বার্হস্পত্য মতকে পূর্ব্বপক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিবার জন্য সকল শক্তি ও যুক্তি নিয়োগ করিয়াছে। কে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা দার্শনিকগণই বিবেচনা করিবেন। এই অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ নিজেদের অনীপ্সিত হইলেও পূর্ব্বপক্ষসূত্রগুলিতে আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে বার্হস্পত্যগণের স্বতন্ত্র ভাষায় তাহাদিগের মতগুলির কতকগুলি অংশ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বিরুদ্ধবাদীর কবলে সংরক্ষিত হইয়াও বার্হস্পত্য তাহার প্রাণশক্তি হারায় নাই। স্বতন্ত্রভাবে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া পরে পরে সাজাইয়া যথোপযুক্ত ভাবে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিলে আজিও লুপ্ত উদ্ধার করিয়া বার্হস্পত্য মতের একখানি প্রামাণিক সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রবর্ত্তন করা শ্রমসাপেক্ষ হইলেও অসম্ভব হয় না। নানা স্থান হইতে আমরা বৃহস্পতি, বার্হস্পত্য মতের অজিত, লোকায়ত, চার্ব্বাক, পুরন্দর ও কম্বলাশ্বতর এই কয়জন দার্শনিকের কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ভাগুরিকেও বার্হস্পত্য মতাবলম্বী একজন দার্শনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই ভাগুরির কোনও উক্তি এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। অজিতের কতকগুলি উক্তি পালি ভাষায় সংরক্ষিত আছে। নিম্নে বৃহস্পতি, লোকায়ত, চার্ব্বাক, পুরন্দর ও কম্বলাশ্বতর এই কয়জন দার্শনিকের কয়েকটি উক্তি প্রদত্ত হইল। শ্রম স্বীকার করিলে এইরূপ আরও বহু উক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কোনও শক্তিশালী উদারচেতা দার্শনিক পণ্ডিত যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া বার্হস্পত্য মত সংগ্রহ করেন এবং যথার্থ দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া সেই মতগুলির ব্যবহার করেন তবে যে বার্হস্পত্যদর্শনের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে পঞ্চাশটি সূত্র এবং যে সূত্রটি যে গ্রন্থ হইতে যেরূপ অবস্থায় সংগৃহীত হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল।

(১) পৃথিব্যপ্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি
(২) তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞা
(৩) তেভ্যশ্চৈতন্যম্
(৪) কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ
(৫) কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ
(৬) অনুমানমপ্রমাণম্
(৭) চৈতন্য বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ
(৮) মরণ মেবাপবর্গঃ
(৯) ন ধর্ম্মাংশ্চরেৎ
(১০) এষ্যৎ ফলত্বাৎ
(১১) সাংশয়িকত্বাচ্চ
(১২) কোহ্যবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্য্যাৎ
(১৩) বরমদ্যকপোতঃ শ্বোময়ূরাৎ
(১৪) বরং সাংশয়িকান্নিষ্কাদসাংশয়িকঃ কার্ষাপণঃ
(১৫) শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত এব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ
(১৬) কাম এব প্রাণিনাং কারণম্
(১৭) পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ
(১৮) ইহলোকপরলোকশরীরয়োর্ভিন্নত্বাৎ তদ্ গতয়োরপি চিত্তয়োর্নৈকঃ সন্তানঃ
(১৯) এতাবানেব পুরুষো যাবানিন্দ্রিয় গোচরঃ
(২০) প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণম্
(২১) প্রমাণস্যাগৌণত্বাদর্থনিশ্চয়ো দুর্লভঃ
(২২) কায়াদেব ততোজ্ঞানং প্রাণাপানাদ্যধিষ্ঠিতাদ্যুক্তং জায়তে
(২৩) সর্ব্বত্র পর্য্যনুযোগ পরাণ্যেব সূত্রাণি বৃহস্পতেঃ
(২৪) লোকায়তমেব শাস্ত্রম্
(২৫) প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্
(২৬) পৃথিব্যপ্তে জো বায়ব স্তত্ত্বানি
(২৭) অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ
(২৮) ভূতান্যেব চেতয়ন্তে
(২৯) নাস্তি পরলোকঃ
(৩০) মৃত্যুরেবাপবর্গঃ
(৩১) দণ্ডনীতিরেব বিদ্যা
(৩২) অত্রৈব বার্ত্তান্তর্ভবতি
(৩৩) ধূর্ত্তপ্রলাপস্ত্রয়ী
(৩৪) স্বর্গোৎপাদকত্বেন বিশেষাভাবাৎ
(৩৫) লোক প্রসিদ্ধমনুমানং চার্ব্বাকৈরপীষ্যত এব যত্তু কৈশ্চিল্লৌকিকং মার্গমতি ক্রম্যানুমানমুচ্যতে তন্নিষিধ্যতে।
(৩৬) পশ্যামি শৃণোমীত্যাদি প্রতীত্যা মরণ পর্য্যন্তং যাবন্তীন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্তি তান্যেবাত্মা
(৩৭) ইতরেন্দ্রিয়াভাবেঽপি সত্ত্বাৎ মন এবাত্মা
(৩৮) প্রাণ এবাত্মা
(৩৯) ন স্বর্গো নাপ বর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।

---

* অধুনা বিলুপ্ত মূল সূত্রগ্রন্থের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা।

(৪০) অগ্নিহোত্রং এয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা ॥

(৪১) পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্রকস্মান্ন হংস্যতে ॥

(৪২) মৃতানামপিজন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতৃপ্তিকারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাম্ ॥

(৪৩) গচ্ছতামিহজন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথিতৃপ্তিরবারিতা ॥

(৪৪) স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরি স্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥

(৪৫) যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥

(৪৬) যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভুয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহ সমাকুলঃ ॥

(৪৭) ততশ্চজীবনো পায়ো ব্রাহ্মণৈ বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্ বিদ্যতে কচিৎ ॥

(৪৮) ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ভরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ কুতঃ ॥

(৪৯) অশ্বস্যাত্রহি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমীরিতম্ ॥

(৫০) কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবংমৃগপক্ষিণাঞ্চ।
মাধুর্য্যমিক্ষোঃ কটুতাঞ্চ নিম্বে স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তম্ ॥

উদ্ধৃত সূত্রগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি সূত্র ভাস্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে 'তথাচ বার্হস্পত্যানিসূত্রাণি' এই বলিয়া, শান্তরক্ষিতের তত্ত্ব সংগ্রহের পঞ্জিকাকার কমলশীল 'তথাচ তেষাং সূত্রম্' এই বলিয়া এবং হরিভদ্র সুরি বিরচিত ষড়দর্শন সমুচ্চয়ের তর্ক রহস্য দীপিকাকার গুণরত্ন ও 'লোকায়ত সূত্র বলিয়া' উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৃতীয় চতুর্থ এবং সপ্তম সূত্র শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চম, সপ্তম, ও অষ্টম সূত্র সদানন্দ তাঁহার অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে 'তথাচ বার্হস্পত্যানি সূত্রাণি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন পঞ্চম সূত্রটি নীলকণ্ঠ তাঁহার গীতার টীকায় 'তথাচ বার্হস্পত্যং সূত্রং' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষষ্ঠ সূত্রটি সম্মতি তর্ক প্রকরণ নামক জৈনগ্রন্থের অভয়দেব সূরিকৃত তত্ত্ববোধ বিধায়িনী টীকায় 'তথাহি বৃহস্পতিসূত্রম্' বলিয়া এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ব কৌমুদীতে 'ইতি লোকায়তিকাঃ' এই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তম সূত্রটি শ্রীধর স্বামী তাঁহার গীতার টীকায় 'তথাচ বার্হস্পত্যং সূত্রং' এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নবম হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত ছয়টি সূত্র বাৎস্যায়নের কামসূত্রে 'ইতি লোকায়তিকাঃ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্চদশ সূত্রটি মধুসূদন তাঁহার গীতার টীকায় 'ইতি লোকায়তিকাঃ' বলিয়া পূর্ব্বপক্ষরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যোড়শ সূত্রটি শঙ্কর কর্ত্তৃক তদীয় গীতা ভাষ্যে 'ইতি লোকায়তিক দৃষ্টিরিয়ম্' এই বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সপ্তদশ সূত্রটি কমলশীলকৃত তত্ত্বসংগ্রহের পঞ্জিকায় 'তথাহি তস্যৈতৎ সূত্রম্' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকরণ হইতে তস্য এই পদের লোকায়তিকস্য এই অর্থই পাওয়া যায়। অভয়দেব কৃত সম্মতি তর্ক প্রকরণের টীকায় ও এই সূত্রটি লোকায়তিক সূত্র বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ সূত্র কমলশীল তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকায় লোকায়তিক সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিংশ সূত্রটি সম্মতি তর্ক প্রকরণের অভয়দেব কৃত টীকায় চার্ব্বাক সূত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একবিংশ সূত্রটি উক্ত গ্রন্থেই 'এতচ্চ পৌরন্দরং সূত্রম্' এই বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পুরন্দর বার্হস্পত্য মতেরই একজন সূত্রকার ছিলেন। দ্বাবিংশ সূত্রটি শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে 'তথাচ সূত্রং কায়াদেবেতি কম্বলাশ্বতরোদিত মিতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরন্দরের ন্যায় কম্বলাশ্বতর আর একজন বার্হস্পত্য মতাবলম্বী দার্শনিক গ্রন্থকার। ত্রয়োবিংশ সূত্রটি অভয়দেব কৃত সম্মতি তর্ক প্রকরণের টীকায় 'ইতি চার্ব্বাকৈ রভিহিতম্' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্বিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ পর্যন্ত এগারটি সূত্র কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহার প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে 'তদেতদ্ বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্ব্বাকায় সমর্পিতম্' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উল্লিখিত সূত্রগুলি বৃহস্পতি স্বয়ং রচনা করিয়া প্রচারের জন্য চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের নিকট অর্পণ করেন। পঞ্চত্রিংশৎসংখ্যক সূত্রটি শান্তরক্ষিতকৃত তত্ত্বসংগ্রহের কমলশীল কৃত পঞ্জিকাতে 'পুরন্দর স্ত্বাহ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরন্দরের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুরন্দরের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শান্তরক্ষিত তত্ত্ব সংগ্রহে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন—'লৌকিকং লিঙ্গমিষ্টং চেৎ'। পরবর্ত্তী তিনটি সূত্র সদানন্দ তাঁহার অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের চার্ব্বাক মত প্রদর্শন প্রসঙ্গে—'ইতিকেচিৎ' 'ইত্যপরে' 'ইত্যন্যে' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্মবাদী দর্শনমতগুলির দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া বার্হস্পত্যগণ ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই পরবর্ত্তীকালের বার্হস্পত্যগণকেই সুশিক্ষিত চার্ব্বাক বলা হয়। ইহারা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ মনে না করিয়া লোকপ্রসিদ্ধ অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ভূতচতুষ্টয়বাদ পরিত্যাগ করিয়া আকাশের ও পঞ্চম ভূতত্ব স্বীকার করেন। দেহাত্মবাদ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ মন আত্মবাদ এবং প্রাণাত্মবাদ স্বীকার করেন। সদানন্দের 'কেচিৎ' 'অপরে' এবং 'অন্যে' এই তিনটি পদ পরবর্ত্তীকালের বার্হস্পত্যগণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

সূত্রগ্রন্থেও শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নকামসূত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত সংস্করণ সূত্র ও শ্লোকের সংমিশ্রণে রচিত। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চার্ব্বাক দর্শন ও ঐ মিশ্র ভাষায়ই দেখাইয়াছেন সুতরাং অধুনালুপ্ত বার্হস্পত্য দর্শনের মূল গ্রন্থগুলিও ঐরূপ সূত্র ও শ্লোকের সমাবেশে রচিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা বিশেষ অন্যায্য হইবে বলিয়া মনে হয়না। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে উপরি উক্ত সূত্রগুলির মধ্যে উনচত্বারিংশত্তম হইতে উনপঞ্চাশত্তম পর্য্যন্ত এগারটি শ্লোককে 'বৃহস্পতিনাপ্যুক্তম্' এই উক্তির দ্বারা স্বয়ং বৃহস্পতির রচিত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থকারগণ ও ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে অনেক-গুলিকে চার্ব্বাকের উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই এগারটি শ্লোককেও মূল বার্হস্পত্যদর্শন গ্রন্থের অংশরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কালক্রমে কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক মতবাদ আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বার্হস্পত্য মতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চাশৎসংখ্যক শ্লোকটি ভট্টোৎপলের বৃহৎ সংহিতার টীকায়, গুণরত্নের ষড়্দর্শন সমুচ্চয় বৃত্তিতে এবং ডল্লনকৃত সুশ্রুত টীকায় স্বভাববাদীর মতরূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে স্বভাববাদ বার্হস্পত্য মত হইতে অভিন্ন হওয়াতে ইহাকেও বার্হস্পত্য মত বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপে 'চার্ব্বাক পঞ্চাশিকা' সংগৃহীত হইল।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—চৈতালি—

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"থাকিয়া থাকিয়া মনে হয় প্রকৃতিটাই একমাত্র সত্য, আর মানুষ এর মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত।"

প্রক্ষিপ্ত নয়তো কী! তারায় ভরা আকাশ আর ছায়া-ভরা জল লইয়া এই যে পৃথিবী—এর মাঝখানে আমাদের দাবী কতটুকু! দয়া করিয়া যাহা দিতেছে, তাহাই লইতেছি—যাহা দিতেছে না, আপ্রাণ আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহা মিলিবে না। তবু যাহা দিবার তাহাই কি সহজে দেয়! ল্যাবোরেটরীর অ্যাসিডের গন্ধ আর বুন্‌সেন বার্ণারে অশ্রান্ত সাধনা, কারখানার ডায়নামো আর লোহা-লক্কড় লইয়া তিলে তিলে জীবন পণ করিয়া চলা। তারপরে কৃপণ বর্ষণ। তবুও মনে হয় সব পাইয়াছি।

কী পাইয়াছি। মাথার উপরে নীহারিকা আর নক্ষত্রের জগৎ—রহস্যের তল নাই, কূল নাই, কিনারা নাই। ওদের পংক্তিতে পৃথিবীর আসন কোথায়। শুধু কি ওখানেই? তিন ভাগ জলের মাঝখানে এক ভাগ মাটি জাগিয়া আছে—আর সেই মাটিতে আছে পাহাড়ের শৃঙ্গ—সাহারার মরুভূমি, সাইবেরিয়ার তুষার-প্রান্তর, আর আফ্রিকার কালো অরণ্য। কে কাকে জয় করিয়াছে!

আর মানুষ? মানুষের কয়জনই বা প্রকৃতিকে ছাড়াইতে পারিয়াছে? এক হইয়া আছে তাহারা, জড়াইয়া আছে পরস্পরকে, অবলীন হইয়া আছে পরস্পরের মধ্যে। আর সেইখানেই তো সত্যিকারের জীবনের রূপ। জীবনকে যদি প্রকৃতির দান বলা যায় তবে প্রকৃতি হইতে জীবনকে তো বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তাহার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে ঘুরিয়া চলিবে। তাই এই চর্ ইস্‌মাইলে, এই কালুপাড়ায়—তেঁতুলিয়ার মোহানায় এই সবটা জুড়িয়া মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে।

মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে। মানুষ পৃথিবীর বুদ্বুদ। তবু পৃথিবী লইয়া মানুষ আর মানুষ লইয়া পৃথিবী।

অথচ মানুষ প্রক্ষিপ্ত। শরীর ধর্মের দিক হইতে নয়। যে মন তাহাকে দিক্ হইতে দিগন্তে, শূন্য হইতে শূন্যান্তরে নব নব অভিযানের পথে লইয়া চলিয়াছে, প্রক্ষেপ তাহার সেই মনে। দেহের মধ্যে মন আসিয়া দ্বন্দ্ব শুরু করিয়াছে। তাই যাত্রা চলিতেছে রকেটের গতিতে আকাশটাকে বিদীর্ণ করিয়া—সৌর জগৎ, নক্ষত্র জগৎ, লাখো লাখো কোটি কোটি নীহারিকাকে ছাড়াইয়া।

প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই তো বিস্মৃত মূলকে ভুলিতে চায়—কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া কি সহজ? ইচ্ছা আর দেহ প্রতি পদে পদে পরস্পরকে আঘাত করে—কল্পনা চলিয়া যায় সম্ভাবনার দিগ্‌দিগন্ত পার হইয়া, আর দেহ ঝরিয়া পড়িতে চায় পৃথিবীর সনাতন মৃত্তিকায়।

*

তবু এই প্রক্ষিপ্ত মনোময় মানুষটা একসময় শরীর-ধর্মের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন ল্যাবোরেটরী থাকে না, বয়লারের আগুনের রক্তশিখা তখন মিথ্যা হইয়া যায়। নীহারিকা আর নক্ষত্র-জগতের স্বপ্ন মিলাইয়া যায় ভাব-বিলাসের মতো। তখন আর মানুষ পৃথিবীকে ছাড়াইতে চায় না—পৃথিবীতে লীন হইয়া যায়, জড়াইয়া ধরে তাহাকে; কালো অরণ্য, ঝড়ের তুফান, বিদ্যুতের বজ্রজিহ্বা আর অমার্জিত আদিমতায়।...

..... নিজের কথা ভাবিতেছি।

বর্মী মেয়েটিকে আর দেখিতে পাই নাই। প্রথম প্রথম তাহাকে ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চোখের দিকে তাকাইতে সাহস হয় নাই। তারপর সেই ঝড়ের রাত্রি। সে এক অনুভূতি। মনে হইয়াছিল আমার মৃত্যু হইয়াছে—আমার আত্মার, আমার পৌরুষের। একটা বিশ্রী বিস্বাদ—একটা কটু তিক্ততা সমস্ত চেতনাকে রাখিয়াছিল আচ্ছন্ন করিয়া।

কিন্তু কদিন হইতে মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য আমি সেই বর্মী মেয়েটিকে ভাবিতেছি! তাহার নীল সাপের মত চোখ, তাহার সেই বাঘের মতো দৈহিক ক্ষুধার্ততা। আমার অলস ভাবনার মধ্যে সে আসিয়া তাহার চিহ্ন আঁকিয়া যায়।

আমার প্রক্ষিপ্ত মন—সভ্যতার আলোকে মার্জিত মন—তাহার কি মৃত্যু হইতেছে? চারিদিকের পৃথিবী প্রতিদিন তাহার জারক-রসে আমাকে লইতেছে জীর্ণ করিয়া? আমি কি অনুভব করিতেছি আমার আদিম সত্তা ধূসর ধরিত্রীতে আমাকে আহ্বান করিতেছে?

সব চাইতে বিস্ময়কর বস্তু এই, আমি কি বর্মী মেয়েকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি?"

* * * *

গঞ্জালেস্ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কথাটা বিশ্বাস করা দূরে থাক, সে যেন এখনো তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া গঞ্জালেসের চোখের সামনে খানিকটা হলদে রঙের ধোঁয়া যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—আর সামনের জগৎটা গেল আচ্ছন্ন হইয়া। মাথা হইতে সমস্ত রক্ত সরিয়া আসিয়া যেন হৃৎপিণ্ডে জমা হইয়াছে, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে তার। দুই কানের মধ্যে একটানা একটা তীব্র ধ্বনি তরঙ্গ—যেন এই দিবা-দ্বিপ্রহরেই প্রচণ্ড রবে ঝিঁঝি ডাকিতে শুরু করিয়াছে।

তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরিয়া আসিল তাহার। ডি-সিল্‌ভার কথাগুলি মনের উপর ছুরির দাগের মতো কাটিয়া বসিয়াছিল—এইবার সেই ছুরির দাগ রক্তাক্ত হইয়া আসিল। গঞ্জালেস্ ধীর এবং দৃঢ়পদে ডি-সুজার বাড়ির মধ্যে আসিয়া পা দিল।"

ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইল বৃদ্ধ ডি-সুজা। বকের পাখার মতো সাদা ভ্রূ-জোড়াকে কপালে তুলিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইল গঞ্জালেসের মুখের দিকে। গঞ্জালেসের মনে হইল সে তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে সত্য, কিন্তু সে দৃষ্টি তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেছে বহুদূরে—যেন দূরবীণের কাঁচের মধ্য দিয়া সে আকাশের কোনো একটা গ্রহ বা নক্ষত্রকে বৈজ্ঞানিকের মতো পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

তারপর বলিল, কে?

তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া গঞ্জালেস্‌ও পিছাইয়া আসিল, কিন্তু কাজী সাহেবের মতো চলিয়া গেলনা। জবাব দিল, আমি?

—তুমি? তুমি জোহান? সার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডি-সুজা দু এক পা আগাইতে লাগিল, কেন, কেন এসেছ এখানে?

—আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—গঞ্জালেস্! মিথ্যে কথা। ডি-সুজা চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর অকস্মাৎ একটা প্রবল অট্টহাসিতে সে ফাটিয়া পড়িল, তুমি ধরা পড়েছো জোহান, ধরা পড়েছ। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি তোমাকে।

—সত্যি বলছি আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—সত্যি বলছ! হাঃ হাঃ হাঃ—জোহানও সত্যি বলছে আজকাল। এমন হাসির কথা কেউ কখনো শুনেছে নাকি?

এমন হাসির কথা যে বাস্তবিকই কেহ কখনো শোনে নাই ডি-সুজার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া সেটা আর বুঝিতে বাকী রহিলনা গঞ্জালেসের। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে অকারণে খানিকটা হা-হা করিয়া হাসিল, দন্তহীন মুখের হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ থুথুর কণা ছিটকাইয়া গঞ্জালেসের চোখে মুখে পড়িতে লাগিল। তারপর কী ভাবিয়া সে মুহূর্ত্তে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল।

—আচ্ছা জোহান, তোমার মাথাটা তো ওরা কেটে ফেলেছিল—জোড়া লাগালে কী করে?

গঞ্জালেস্ কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ডি-সুজা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলায় হাত বুলাইতে লাগিল, কেটে ফেললে কি মাথা আবার জোড়া লাগানো যায়?

গঞ্জালেসের মুখের সামনে শোকাচ্ছন্ন উন্মাদ ডি-সুজার টকটকে লাল চোখ জোড়া জ্বলিতে লাগিল, গরম নিশ্বাস আসিয়া আগুনের হল্‌কার মতো তাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্যহারার মতো চলিতে লাগিল গঞ্জালেস্। পোষ্টাপিস পার হইল, খাসমহাল কাছারী ছাড়াইল, তারপর গ্রামের হাট-খোলা পাশে রাখিয়া মুসলমানদের পাড়ার মধ্য দিয়া সে চরের পশ্চিম দিকে আগাইয়া চলিল।

সামনে বিল। বর্ষায় তেঁতুলিয়ার জল আসিয়া বিল আর নদীকে একত্র করিয়া দেয়, তারপর বর্ষার অবসানে ছোট বড় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলখণ্ড লইয়া বিলের সৃষ্টি। মাটির নিবিড় স্পর্শে নোনা জল মিঠা হইয়া উঠিয়াছে, সালুক কোটা শেষ হইয়া গেলেও সমস্ত বিল জুড়িয়া হরিদ্রাভ সালুক পাতা আর গাঢ় সবুজ কলমী শাক লক্ লক্ করিতেছে। ওদিকে দীর্ঘ হোগ্‌লা বন, সেই হোগ্‌লা বনে এক ধরণের ফল দেখা দিয়েছে। দুটি ছোট ছেলে একখানা সুপারীর লম্বা ডোঙায় চড়িয়া হোগ্‌লার সেই ফলগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। ওদিকে একজন লোক একটা টেটা লইয়া ঝুঁকিয়া জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে—মাছ পাইলেই বিঁধিয়া ফেলিবে।

গঞ্জালেস্ একটা টিবির উপর আসিয়া বসিল। শাদা শাদা মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া আছে, আর সেই আকাশ একটা গম্বুজের মতো বাঁকিয়া দূরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশটা আর কিছু নয়—ওই নদীটাই ওখান দিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, শাদা মেঘগুলি ঢেউয়ের মতো সূর্য্যের আলোয় ঝলিয়া উঠিতেছে। বহু দূরে জলের মধ্যে একদল বুনো হাঁস নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, বড় বড় পা ফেলিয়া ঝুঁটিওয়ালা বক বিচরণ করিতেছে দলপতির মতো। আর বকেরই বৃহত্তর সংস্করণ তিন চারটি বিরাটকায় কঙ্ক বা 'কাঁক' পাখী ফণা-ধরা সাপের মতো এই পক্ষী-তন্ত্রকে পাহারা দিতেছে।

গঞ্জালেস্ বসিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিত আকার পাইয়াছে এতক্ষণে। লিসিকে ধরিয়া লইয়া গেছে বর্মীরা, ডি-সুজা উন্মাদ পাগল এবং জোহানকে কাহারা মুণ্ড কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া গেছে। আর সেই সঙ্গে গঞ্জালেসের সমস্ত আশা আর কল্পনা সাবানের বুদ্বুদ হইয়া অসীম শূন্যতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বুকের হৃৎপিণ্ডে যে রক্তধারা আসিয়া পাথরের মতো জমিয়া গিয়াছিল, সে রক্ত ক্রমে তরলতর ও দ্রুততর হইয়া আসিল। তারপর সে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল মস্তিষ্কের মধ্যে। পায়ের তলা হইতে একটা ঘাসের শীস্ তুলিয়া লইয়া সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ একটা ঘুমন্ত হিংসা আসিয়া তাহার আঙুলের ডগায় যেন আশ্রয় লইয়াছে।

ঝুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার চোখ পড়িল মৎস্যলোভী লোকটি টেটার বাঁকা ফলাগুলিতে প্রকাণ্ড একটা কুঁচে মাছকে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাছটা দুমড়াইতেছে, ছট্‌ফট্ করিতেছে।

গঞ্জালেসের আঙুলে হিংসাটা যেন আরো প্রবল—আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিতেছে। তাহার হাত দুইটা কিছু একটা করিতে চায়, যেন কোন একটা বস্তুকে মোচড়াইয়া পিষিয়া ভাঙিয়া না ফেলিলে সে দুইটা আর তৃপ্তি পাইবেনা। গঞ্জালেস নির্ম্মম-ভাবে ঘাসের শীস্ ছিঁড়িয়া চলিল। ঘাসের মধ্য হইতে একটা ছিনে জোঁক মাথা তুলিতেছিল, গঞ্জালেস্ টানিয়া আনিল সেটাকে। তারপর দুই আঙুলে ধরিয়া সেটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেটাকে সহজে ছেঁড়া গেলনা—রবারের মতো সেটা বড় হইয়া চলিল, তাহার পিচ্ছিল শিরা-সর্ব্বস্ব দেহটা আঙুলের মধ্যে শির শির করিতে লাগিল। খানিকটা ক্লেদাক্ত নীলরসে গঞ্জালেসের আঙুল চট্‌চট্ করিতে লাগিল আঠার মতো।

নখের সাহায্যে গঞ্জালেস্ জোঁকটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিল। এতক্ষণে তাহার মনে হইল সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের উত্তর পুরুষ সে—ডেভিড্ তাহার পিতা। শক্তির পূজা করিয়াছে তাহারা—বাহুবলকেই একমাত্র পরম সার ও চরম তত্ত্ব বলিয়া জানিয়াছে। নারীর জন্য কখনো তাহারা আরাধনা করে নাই,

ক্লান্ত তপস্যায় প্রতীক্ষা করে নাই, ইনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের প্রলাপ বলিতেও তাহারা অভ্যস্ত নয়। তাহাদের কাছে নারীর মূল্য একান্ত দেহগত—ছিনাইয়া আনিলেই যথেষ্ট। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতো দূরে ফেলিয়া দিতেও তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে নাই কোনোদিন। ডেভিডের জীবনে কত নারী আসিয়াছে গিয়াছে—তাহার মতো লিসিকে হারাইয়া বুক চাপড়াইয়া কখনো কাঁদিতে হয় নাই তাহাকে।

কিন্তু গঞ্জালেস্! আজ হঠাৎ একটা তীব্র ধিক্কার আর অপমান বোধে বিষাক্ত হইয়া গেল তাহার মন। গঞ্জালেস নিজের অমর্যাদা করিয়াছে, বংশধারার অপমান করিয়াছে, চরম অসম্মান করিয়াছে দিগ্বিজয়ী দুর্মোদ-বীর সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের। কেন সে ছিনাইয়া লয় নাই লিসিকে, কেন সে বাহুবলে তাহাকে আয়ত্ত এবং অংকশায়িনী করে নাই? নিজের জাতিগত গৌরব এবং বিশেষত্বকে অবহেলা করিয়া সে দুর্বলের পথ ধরিয়াছিল, তাই তাহার এই পুরস্কার।

জুতা বাহিয়া আর একটা জোঁক উঠিতেছিল, গঞ্জালেস্ সেটাকে চাপিয়া ধরিল। কোন্ ফাঁকে সেটা গঞ্জালেসের খানিকটা রক্ত খাইয়াছিল কে জানে, সেটাকে ধরিতেই কয়েক বিন্দু ঘন রক্ত জুতার উপর ছড়াইয়া পড়িল। আঙুল দুইটা ভরিয়া গেল সেই রক্তে। কয়েক মুহূর্ত সে সেই রক্তের দিকে তাকাইল—মানুষের রক্ত, সব চাইতে উগ্র নেশা।

শুঁটকি মাছের ব্যবসা, চট্টগ্রামের সেই নিরিবিলি নিবাস। কর্ণফুলির কল্লোলে নারিকেল বীথির মর্মর মিশিতেছে। পেরিরা—মদের বোতল। অনুগৃহীতা সেই বাঙালী মেয়েটা।···মুহূর্তে মনে হইল সব কিছু ব্যর্থ আর অর্থহীন। তাহার সমস্ত চেতনাকে মুখরিত করিয়া সমুদ্রের গর্জন বাজিয়া উঠিল—যেমন করিয়া সাহাবাজপুরের নদীর মুখে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র সেদিন গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল সেইরকম। সেই সমুদ্রের ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া যাহারা পৃথিবী জয় করিয়াছে মনের সামনে তাহাদের ছায়া মূর্তিগুলি আসিয়া দেখা দিল। কালো চামড়ার টুপিতে তাহাদের মাথা আর মুখটা ঢাকা—তাহাদের তামাটে কপাল চোঁয়াইয়া শ্রম-ক্লান্ত ঘামের বিন্দু বড় বড় গোঁফ দাড়ির মধ্যে গড়াইয়া পড়িতেছে। শকুনের মতো চোখ মেলিয়া তাহারা নীল চক্রবালে চাহিয়া আছে—কোথাও শাদা পালের এতটুকু আমেজ পাওয়া যায় কিনা। তাহাদের হাতের মধ্যে বন্দুকের কঠিন নল ঘামে ভিজিতেছে, অবিশ্রান্ত লোহার সাহচর্যে তাহাদের হাতেও মরচে পড়িয়া গেছে যেন। ওদিকে 'টাবেটে'র উপর তাহাদের পিতলের কামান গলা বাড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—মাথার উপরে থর্থর্ করিয়া তাহাদের জাহাজের পাল উড়িতেছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল, যেন ক্ষুধার্ত হইয়া সশব্দে লেহন করিতেছে বিরাট শূন্যতা।

গঞ্জালেস্ উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তাহার মন। যেমন করিয়া হোক, সে ইহার প্রতীকার করিবে, প্রতিষ্ঠা করিবে নিজের পৌরুষকে। যে ভুল তাহার একবার হইয়াছিল, সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে না কোনক্রমেই। আরাকান—আরাকান সে আর কতদূরে! কাজের তাড়ায় সে বহুবার আরাকান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। আর দূর! দূর হইলেই বা ক্ষতি কী। তাহার পূর্বপুরুষেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙাইয়া অবলীলাক্রমে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেছে। আর সে এই সামান্য পথটুকু ডিঙাইতে পারিবে না। পৃথিবীর যেখানে থাক, লিসিকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া হাঁসের আর্তনাদ খানিকটা ঝুটাপুটির শব্দ। গঞ্জালেস্ চাহিয়া দেখিল আকাশ হইতে শিকরে বাজ ছোঁ মারিয়া একটা হাঁসের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যু-কাতর হাঁসের আর্তরব বিলের শান্ত আকাশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

অসংযত অস্থির হাত দুইটাকে কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গঞ্জালেস্ ফিরিয়া চলিল।

জোহানের অপঘাত মৃত্যুর খবরটা থানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। চৌকীদারের মুখে খবর পাইয়া বিরক্ত দারোগা ব্যাপারটা ডায়েরী করিয়া লইলেন। তারপর গোটা তিনেক পান আর এক থাবা জরদা মুখে পুরিয়া ক্ষুব্ধ অসন্তোষে কহিলেন, ব্যাটারা আর চাকরী করতে দেবেনা। খুন আর জখম, খুন আর জখম। দুটি দিন যে ঘরে বসে বিশ্রাম করব তার জো-টি নেই। ইংরেজ রাজত্ব কি একেবারে বানচাল হয়ে গেল, না এরা নো-ম্যান্স্ ল্যাণ্ড পেয়েছে? তুই কি বলিস্ রে ব্যাটা?

শেষোক্ত প্রশ্নটা করিলেন তিনি চৌকীদারকে। চৌকীদার কী বলিবে ভাবিয়া পাইলনা, দাড়ি চুলকাইয়া বোকার মতো হাসিল এবং শংকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে তাহার সজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ বিদ্যমান আছে কিনা।

দারোগা আবার বলিলেন, জলপুলিশ কোথায়?

চৌকীদার কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা তো নেই ওদিকে।

—তা থাকবেন কেন। তাঁরা প্রাণের আনন্দে নৌকো-বিলাস করছেন—সুখের চাকরী তাঁদের। আর আমি সব্বক্ষী দিন নেই রাত নেই—টো টো কম্পানির ম্যানেজারী করে বেড়াচ্ছি। নৌকোয় ঘুরতে ঘুরতে সর্দি কাশি প্রুফ্ হয়ে গেলাম, জল-কাদায় প্রেক্ ওয়াটার প্রুফ। আর ঘোড়া আর সাইকেল্ দাবড়ে হার্নিয়া হয়ে গেল। ছেড়েই দেব এই কচুপোড়ার চাকরী, দেশে গিয়ে জমিতে লাঙল ঠেললে এর চাইতে অনেক বেশি কাজ দেবে।

লাঙল ঠেলিলে অবশ্য ভালোই হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাকরীর মায়াটা দারোগা কাটাইতে পারিলেন না। মুখে যত গর্জনই করুন, ধড়া-চূড়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইল। খুনের মামলা, সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটিতে হইবে, এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।

নৌকাতেও দেড়দিনের পথ। যাতায়াতে তিনদিন। দুজন কন্‌ষ্টেবল লইয়া দারোগা যখন চব্বিশমাইলে আসিয়া দর্শন দিলেন, জোহানের কবন্ধ দেহটা পচিয়া তখন এমন উৎকট দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে যে তাহার এক মাইলের মধ্যেও আগানো যায় না। অসংখ্য সাদা পোকা সর্বাঙ্গে কিলবিল করিতেছে, কালো রস গড়াইতেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। চৌকীদার পাহারার বন্দোবস্ত

করিয়া গিয়াছিল বলিয়াই শেয়াল কুকুরে খাইতে পারে নাই। পচা চামড়ায় পোড়া তামার রং।

কিন্তু দারোগা এতটুকু দ্বিধা করিলেন না, একবারও নাসা-কুঞ্চন করিলেন না। সেই দুর্গন্ধ বিকট বস্তুটাকে পা দিয়া বারকয়েক নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর সেটাকে চালান দিবার হুকুম দিয়া রহমতুল্লা সরকারের বাড়ির দিকে যাত্রা করিলেন। রহমতুল্লা এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কালে-ভদ্রে সরকারী মহিমান্বিত ব্যক্তিরা এ অঞ্চলে পদার্পণ করিলে তাঁহার আতিথ্যই লইয়া থাকেন। রহমতুল্লা মুকুল গাজীর চাচাতো ভাই—তবে একটু বেশি সরকার-ঘেঁষা বলিয়া মুকুল গাজী তাঁহাকে এড়াইয়া চলেন।

জবানবন্দি দিতে ডাকা হইল ডি-সিল্‌ভাকে। ডি-সিল্‌ভা এলোমেলো ভাবে যাহা মনে আসে বলিয়া গেল এবং দারোগা তাঁহার ইচ্ছামতো যাহা খুসি তাহাই টুকিয়া লইলেন। রহমতুল্লার রান্নাঘর হইতে তখন হাঁড়ি কাবাবের চমৎকার গন্ধ আসিতেছিল এবং দারোগা ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছিলেন। তা ছাড়া সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিতে হইবে, রাত্রি ঘনাইয়া আসিলে এদেশের নদীনালায় পুলিশের লোকেও নিজেদের নিশ্চিন্ত এবং নির্ভীক বলিয়া বোধ করে না।

সহরে লইয়া গিয়া সেই বিকৃত গলিত দেহটাকে ডাক্তারি পরীক্ষার পরে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দারোগা থানায় বসিয়া পান আর জর্দা চিবাইতে চিবাইতে লম্বা চওড়া দেখিয়া একখানা রিপোর্ট উপরে দাখিল করিলেন, তাহাতেই মিটিয়া গেল ব্যাপারটা। চরের ক্রিমিন্যাল্ এলাকায় এ সমস্ত জিনিস তো হামেসাই ঘটিতেছে, ইহা লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করিতে গেলে বিশ্রাম লইবার জো থাকে না পুলিশের।

অতএব এই গল্প হইতে জোহানের দাবী মিটিয়া গেল। তাহার আশা, তাহার কল্পনা, লিসিকে লইয়া ভিজাগাপত্তনে সেই ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন—জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই নিঃশেষে নির্বাপিত হইয়া গেল। তাহার এক দূর-সম্পর্কের মাসী—যে তাহার ঘর আগলাইয়া থাকিত, কিছুদিন সে কাঁদা-কাটা করিল, তারপর একদিন নদী পার হইয়া চলিয়া গেল কোথায়। জোহানের ভাঙা-ভিটা ঘিরিয়া জঙ্গল গজাইতে লাগিল, গর্ত খুঁড়িয়া সাপ আর ইঁদুর বাসা করিল—তারপর চরইসমাইলের মন হইতে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছিয়া গেল তাহার স্মৃতি। ভাঙন লাগিয়া মেঘনার মোহনায় ফলে শস্যে সমুজ্জ্বল উপনিবেশ তলাইয়া গেল, আবার নতুন করিয়া মাথা তুলিল নূতন উপনিবেশ—নব সূর্যালোকে, নবতম মানুষের পদপাতের রোমাঞ্চিত সম্ভাবনায়। (ক্রমশঃ)

জাহানারার কবরে

জসীম উদ্দীন

শাহজাহানের আদুরে দুলালী, হেথা কবরের ঘরে
ঘুমায়ে ঘুমায়ে কিসের স্বপন দেখিতেছ যুগ ভ'রে।
গোলাপ ফুলের তুমি প্রিয় সখী, তোমার ফুলের গায়
কোন্ সে রঙের আঘাত পাইয়া ঘুমাইলে মূর্চ্ছায়।
কোন্ সে বাঁশীর বাতাস আসিয়া রঙিন্ পাখীর পাখে
কিবা স্বপনের ঘুমে জড়াইল তব ফুল-দেহটাকে।
কোন্ লুবানের সুবাসে কন্যা মুদিলে সুরমা আঁখি
কোন্ চাঁদিমার জোছনা লইলে সুদীর্ঘ রাতে আঁকি।

কত বুল্‌বুলি ডাকিল তোমারে জেগে ওঠ ফুল-বোন,
কত যে উষসী রঙের আখরে সাজাল ধরার কোন।
তোমার ফুলের যুগ যুগ ঘুম কভু কি পোহাবে নাগো,
কারে সাথে লয়ে কহ তুমি মেয়ে, সুদীর্ঘ রাতি জাগো।
রঙমহলের গোলাব সায়রে ভেসে উঠেছিলে পরি
জল যে হইত আতর তোমার মেহেদী চরণ ধরি।
তব নিশ্বাসে ছড়াত লুবান, কণ্ঠেতে বুল্‌বুলি,
সোনার অঙ্গে জড়ায়ে ঘুরিত রামধনু রঙ্‌গুলি।

কি ছিল তোমার অভাব কন্যা, রঙে মণি মাণিকের,
প্রদীপ জ্বালায়ে বাড়াতে পারিতে সুষমা শ্রীঅঙ্গের।
কি ছিল তোমার অভাব কন্যা, চাঁদের মুকুর লয়ে,
অধর খানিরে দেখিতে দেখিতে তুমি যেতে চাঁদ হয়ে;
রঙমহলের এত যে বিলাস, না চাহিতে সাধ পোরে,
বাসনা সদাই দাসী হয়ে যারে যাচিত বাসনা ক'রে;
কি ক্ষুধা তাহার মিটিত না তবু? মাণিকের ঝিলিমিলি
হেরেমের হরি, তোমারে ভুলাতে পারিল না নিরিবিলি।

কোথায় কাঁদিছে চির ক্ষুধাতুর, গরীবের কুঁড়ে ঘরে
চিৎকারে শিশু রুগ্ন মায়ের শুষ্ক যে স্তন ধ'রে।
মহা অভাবের সঙ্গে জুঝিয়া হায়রান হয়ে হায়!
যুগে যুগে তারা ঝরিয়া পড়িছে মাটীর শীতল ছায়।
তাহাদের কথা স্মরিয়া স্মরিয়া তোমার বালিকা মন।
রুদ্ধ-দুয়ার হেরেমের কোণে করিত যে ক্রন্দন।
হয়ত তাদেরি বোন হ'তে, আর জননী হইতে আর;
আকুলি বিকুলি করিত তোমার স্নেহ-ভরা বুক মার।
হেরেমের মেয়ে বাহিরে আসিতে সাধ্য ছিল না কভু,
অনাহারী ভাই বোনদের কথা ভুলিতে পারনি তবু।
মরণের কালে অভিমানী মেয়ে লিখে গেলে কবিতায়,
আমার কবর রচিও তোমরা দূর্ব্বা ঘাসের ছায়।
যেথায় আমার গরীব ভাইরা ঘুমায় মাটীর তলে
ছোটখাটো কত অপূর্ণ আশা নিভেছে তাদের কোলে।
জীবনে যাদের পাইনিক কাছে, যেন মরণের পরে
একত্র হ'য়ে থাকিবারে পারি তাহাদের কাছে ক'রে।
কবরে আমার গ'ড়নাক তাজ, মর্ম্মর দিও নাক,
শান্ত শীতল দূর্ব্বা শীষেরা স্নেহেতে জড়ায়ে থাক।

শাহ-জাহানের আদুরে দুলালী শাহাজাদী জাহানারা
আর কি কখনও জাগিবেনা তুমি লইয়া জীবন-ধারা?
কতদিন গেল, মোগলের সেই গৌরব দিনগুলি
'নিঠুর কালের চরণে গুঁড়ায়ে হয়েছে ধূসর ধূলি।'
সব-হারা যত মৃত ভাইদের লাসগুলি বুকে করি,
গহন কবরে কাটিতেছে তব সুদীর্ঘ বিভাবরী।

সে রাতের কি গো শেষ হবে নাক, বারেক দেখ গো চেয়ে,
সর্ব্ব-হারারা জাগে দিকে-দিকে জীবনের গান গেয়ে।
এখন তাহারা পদানত হয়ে রবে না ধরার কোলে
অত্যাচারিত চির-বঞ্চিত জাগে জীবনের দোলে।
আজিকে এমন বোন চাই মোরা, তাতারী ঝঞ্ঝার ঝড়ে
বেদেনীর মত আগে আগে চলে বিদ্যুৎ লয়ে করে।

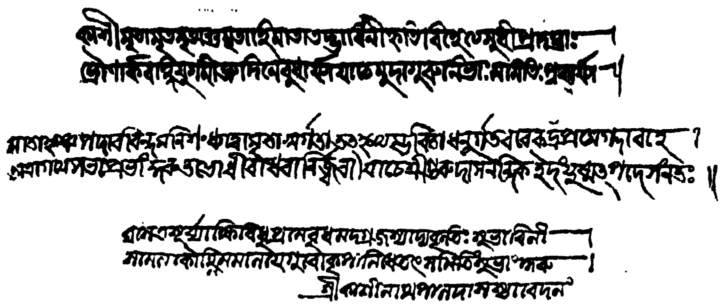
বিক্রমপুরের ইতিহাসের কয়েকটি কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-টি

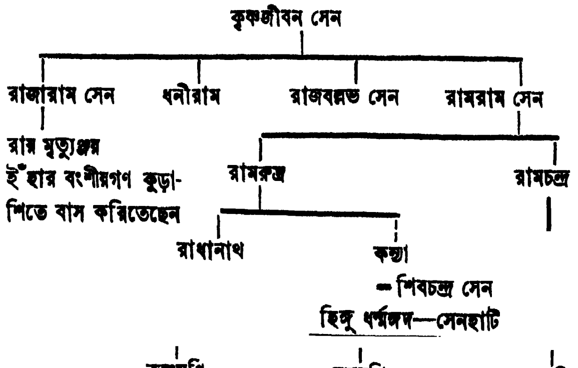
এক বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-টি, আমার নিকট কয়েকখানি পুরাতন চিঠি ও কাগজপত্র পাঠান। তাহার মধ্যে একখানি নিমন্ত্রণ চিঠি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম। চিঠিখানি শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেনগুপ্তোহং লিখিয়াছেন, অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেবলরাম তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে। গত্রীয়ং পত্রী রাজনগর গ্রামাৎ। হায়ুল গ্রামে। পত্রের মর্ম্ম হইতেছে নিম্নলিখিতরূপ :

"কালী মৃতামৃতাশু মৃতাহিমাতা তত্তাবিনীকৃতিবিহেত্য সুধীপ্রদত্তাঃ।
দ্রৌণার্কবহ্নিযুগমাজা দিনে বুধার্য্যা যাচে গুরুনিভাঃ সমিতি প্রকার্য্যা॥"

শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেনগুপ্তোহং



এই পত্রের মধ্যে একটি সীলমোহর (seal) আছে। ঐ সীলমোহরের মধ্যে লিখিত আছে [শ্রীদুর্গায়াঃ প] দাস্তোজেনভশ্রী [গৌরমোহনঃ] এই গৌরমোহন সেনগুপ্ত কে ছিলেন, পূর্ব্বে তাহার সন্ধান জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি সে সন্ধান মিলিয়াছে। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন ছিলেন মহারাজা রাজবল্লভ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম সেনের বংশধর। এখানে বংশলতাটি প্রকাশ করিলাম।



রামরাম সেন মহারাজা রাজবল্লভের চতুর্থ ভ্রাতা। যে গৌরমোহন সেনের সীলের প্রতিলিপি আমরা প্রকাশ করিলাম, তিনি রামরাম সেনের প্রপৌত্র। গৌরমোহন সেন তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কেবলরাম তর্কালঙ্কারকে নিমন্ত্রণ করেন।

কেবলরাম তর্কালঙ্কার যে বিক্রমপুরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা এই নিমন্ত্রণ লিপি হইতে জানিতে পারি। রাজনগর গ্রাম হইতে পত্রিকাখানি প্রেরিত হইয়াছিল।

কেবলরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপাধি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলেন : "গৌরমোহন সেনগুপ্ত লিখিত পত্রখানা এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আমার পিতামহের উপাধি 'তর্কালঙ্কার' লেখা হইয়াছে। আমরা জানি তাঁহার উপাধি ছিল 'বিদ্যালঙ্কার।' একই পরিবারভুক্ত এবং সমসাময়িক আমার জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ। এ কারণে উপাধিতে ভুল হইতে পারে। সঙ্গে একখানি পত্র পাঠাইলাম, তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতামহের নাম একত্র লেখা দেখিতে পাইবেন। আমাদের আদি নিবাস ভাটসার গ্রাম কালীপাড়ার নিকটবর্ত্তী ছিল এবং ইঁহারা কালীপাড়ার জমিদারগণের সভায় ছিলেন। ছেলেবেলা পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট রাজনগরের একুশ রত্ন, নবরত্ন প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি। রাজনগরের দোলমঞ্চ ৬৪ × ৬৪ × ৬৪ হাত ছিল এবং তাহার উপর হইতে ঢাকা নগরী দেখা যাইত। সে সময়ে কালীপাড়া ও রাজনগরের মধ্যবর্ত্তী নদীর বিস্তার অতি সঙ্কীর্ণ ছিল শুনিয়াছি।"

যে দ্বি তী য় পত্রখানিতে শ্রীকেবলরাম বিদ্যালঙ্কারবর এইরূপ লিখিত আছে সেই পত্রখানির প্রতিলিপিও উপরে মুদ্রিত হইল। লিপিকাখানি শ্রীকালীনাথ পাল দাসস্য বেদন—তাঁহার অগ্রজের আত্মকৃতিঃ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ। পত্রিকার এক কোণে লিখিত রহিয়াছে কালীপারা গ্রামতঃ পত্রী ভাটসার গ্রাম।

বর্ত্তমানে চরভাটার এবং চরকালীপাড়া ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত।

এই পত্রিকা দুইখানি হইতে মনে হয় যে কেবলরামের উপাধি বিদ্যালঙ্কারই ছিল।

আর একখানি নিমন্ত্রণ পত্রেও অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেবলরাম বিদ্যালঙ্কারচার্য্যাঃ। শ্রীহরি॰ শরণং পত্রীয়ং পত্রী লোহজঙ্গ গ্রামাৎ আউয়ালা গ্রামে ইত্যাদি।

আমি বিশ্বেশ্বর বাবুকে তাঁহাদের বাড়ীর পুরাতন পুঁথির অনুসন্ধান করিতে লিখিয়াছিলাম, যদি পুরাতন পুঁথি খুঁজিয়া কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পুঁথি বা পত্রাদি পান এজন্য—তদুত্তরে বিশ্বেশ্বর বাবু আমাকে লিখিয়াছেন :—"আমাদের বাড়ীর প্রাচীন পুঁথিসমূহ প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাত্র দু' চারখানি আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি নব্য ন্যায়ের জগদীশী টীকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে। একখানি 'শব্দ শক্তি প্রকাশিকা' আমার নিকট আছে। উহা সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন।

নারায়ণ দাস রচিত একখানি কবিরাজী পুঁথির প্রথম শ্লোক—শ্রীনারায়ণ দাসেন কবিরাজেন ধীমতি প্রতিশংক্রিয়তে দ্রব্যেগুণোয়ং রাজবল্লভঃ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিয়াছিলেন যে 'দ্রব্যগুণ' তাঁহাদের কয়েকখানা আছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে 'দ্রব্যগুণের' কোন পুঁথি পরিষৎ সংগ্রহে নাই কিন্তু "রাজবল্লভ" কয়েকখানা আছে। আমার তো মনে হয় উহা একই পুঁথি। আমার পুঁথিখানার লিপিকাল ১২১৬ সন। পুঁথির শেষ

শ্লোক—ইতি নারায়ণ দাশ কবিরাজ বিরচিতং দ্রব্যগুণ সমাপ্তং॥ শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্ম্মণ স্বাক্ষরচেতি। শ্রীবংশিবদন ঠাকুর স্বাহায়্যেতি। 'বংশীবদন' আমাদের কুলবিগ্রহ কিন্তু উক্ত জীবনকৃষ্ণ শর্ম্মা কে ছিলেন আমার জানা নাই। এই পুঁথিখানির মধ্যে একখানি কলাপাতায় লেখা টোকা আছে। লিখনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় উহা একই পুঁথির সমসাময়িক। ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও জিনিষটি interesting."

একখানি ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি—

অবিভক্ত স্থাবরাদি ধনং ভ্রাত্রোর্মধ্যে একেন বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত মুখভক্তমপি বিদেশ স্থেনাপরেণ স্বত্রাংস্থাংশং যৎ বিক্রীতং তৎ সিদ্ধতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ স্বাক্ষর—শ্রীগঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশানাং শ্রীরামদাস শর্ম্মণাং শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্ শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্ শ্রী শ্রীরামশর্ম্মনাং শ্রীগোলকনাথ শর্ম্মণাম্।

অপর পৃষ্ঠে লিখিত আছে—

পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় মুখোপাধ্যায় দাদামহাশয় শ্রীশ্রীচরণসরোজে—

নবদ্বীপা (?) নিতা পত্রী রামপুরা শ্রীযুক্ত রামসুন্দর দত্তজা নাজির মহাশয়ের বাসাতে পৌচে তিনি অনুগ্রহ প্রকাস পূর্ব্বক পুটিয়া রাজধানীতে ঘাটির মোহরের উপরুক্ত রায় মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন পত্র দরকারি।

এই পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবু সুপণ্ডিত এবং ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি, আমি তাঁহাকে বিক্রমপুরের প্রাচীন পণ্ডিতগণের জীবনী, শিক্ষার স্থান, উপাধি এবং রচিতগ্রন্থাদি সম্পর্কে আমাকে সাহায্য করিতে লিখিয়াছিলাম, তিনি আমাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে প্রাচীন পণ্ডিতগণের বংশধরেরাও এ বিষয়ে একান্ত অমনোযোগী। বন্ধুবর সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ মহোদয়ও বাঙ্গলাদেশের পণ্ডিতগণের জীবনী সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছেন। বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজ এক সময়ে বাঙ্গলা দেশেই নহে, ভারতের বহুস্থানে সমাদৃত হইতেন। তাঁহাদের জীবনী সেকাল ও একালের সামাজিক ইতিহাস সংকলনেও যেমন সাহায্য করিবে, তেমনি তাঁহাদের কৃতিত্বও একালের পণ্ডিতসমাজ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তদানীন্তন এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি মিঃ সি, লিটল্ সাহেবকে যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্টে তিনি বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানের পুঁথি সংগ্রহের বিবরণ প্রদান করেন; তাহাতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের বিবরণও ছিল, আমরা নিম্নে যে চিঠিখানি প্রকাশ করিলাম তাহাতে উহার উল্লেখ আছে।

Notices on Sanskrit Mss.
By
Haraprasad Sastri
Volme X. 1892
From Haraprasad Sastri

To

C. Little Esq. Honorary Secretary
to the Asiatic Society of Bengal.

Dated, Naihati, the 28th. January, 1892.

* * * At the time of Submitting his last report the Raja expected (vide para 19) that the examination of the Jaina Manuscripts of Azimganj would take another year, and the Pandit finished his work in about that time.

* * * He is now working at Dacca. visiting the various places in the parganah of Vikrampur, in which was situated the last Hindu Capital of Bengal and which is a well known seat of learning, the foremost in East Bengal. The places visited in the pargana Vikrampur are Baddanagar, Subhadya, Tantar, Ghatakcr Kola, Jibasar, Tegharia, Sakta, Raninagar, Bharakar, Bibandi, Konda. Noadda, and Gaupara.

* * *

In a math at Ramna in the suburbs of Dacca some manuscripts written in Devanagri character were found; with the exception of these, all the Mss in East Bengal are written in Bengali character. They treat principally of tantric ceremonies.

* * The Pandit of East Bengal read Katantra Grammar and so they have got a large number of treaties of more or less value supplementing the information given in that work. We are getting a very large number of these works. *In medicine too, East Bengal forms as it were a new school and we have already got two large works not yet known to the world.*"

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারি যে সে সময় এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত বিক্রমপুরের অন্তর্গত তন্তর, (তন্ত্র শব্দ হইতেই তন্তর গ্রামের নামের উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়) ঘটকের কোলা, জিউসার (জীবসার), রাণীনগর, ভরাকর, বিবন্দী, গাউপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পারজোয়া পরগণার অন্তর্গত শুভদ্যা, ভড্ডা, শাক্তা প্রভৃতি গ্রামেও পুরানো পুঁথির সন্ধান লইয়াছিলেন।—রমণার কালীবাড়ীর মঠে দেবনাগরী হরপে লিখিত কয়েকখানি পুঁথির সন্ধান পান। তা ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত সমুদয় হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে। আর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য—বিক্রমপুরের পণ্ডিতেরা এবং পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ কাতন্ত্র ব্যাকরণানুরাগী ছিলেন, এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুঁথিই বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। নানা তন্ত্রের পুঁথিও বিক্রমপুর হইতে অনেক পাওয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক পুঁথি বিক্রমপুরে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ যে সুপণ্ডিত এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র হইতে জানিতে পারি যে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ (বিক্রমপুর) হইতে দুইখানি এমন বৃহত্তম চিকিৎসা গ্রন্থ সংগ্রহ করেন যে দুইখানি গ্রন্থ চিকিৎসা জগতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেই অজানা।

আমি এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সেই দুইখানি বৃহত্তম গ্রন্থের সন্ধান পাই নাই।

আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের সভা-সমিতি আছে এবং অর্থশালী বিজ্ঞ চিকিৎসকও রহিয়াছেন অনেক; কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁহারা এ বিষয়ে তেমন আগ্রহশীল নহেন। যদি বাঙ্গলা-দেশের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ একটি আয়ুর্ব্বেদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়া একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে নানাস্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি

[গ্র]ন্থাদি সংগৃহীত হইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে তাহার অনুশীলন ও গবেষণা [চ]লিতে পারে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে আয়ুর্ব্বেদের স্থান বৈজ্ঞানিক [ভ]াবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে [আ]য়ুর্ব্বেদের যে বই দুইখানি সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ [শ]াস্ত্রী মহাশয় * * two large works not yet known to the world—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের [আ]য়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের কি তাহা দেখিবার জন্ত যে কোনরূপ কৌতূহল [জ]াগ্রত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজের এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের, সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী, বৈষ্ণবদের আখড়ায় যে কত শত মূল্যবান্ পুঁথি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কে তাহার সন্ধান লয়! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইলে অনেক কিছু জানিবার সুযোগ ঘটিবে। আমার নিজ গ্রন্থাগারেও আয়ুর্ব্বেদের কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত আছে।

আমার লিখিত বিক্রমপুরের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের জীবনী প্রকাশ করিতেছি এ বিষয়ে আমাকে দেশবাসী সাহায্য করিলে উপকৃত হইব।

এই লাইন

শ্রীসুধাংশু রায় চৌধুরী

মানুষের লাইন। আঁকিয়া বাঁকিয়া সরীসৃপের মত মহানগরীর রাজপথ হইতে সরু গলির ভিতর চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ লাইনে নানা প্রদেশের নানাধর্ম্মের জনতার সমাবেশ। ধনী হইতে দরিদ্র, বালক হইতে বৃদ্ধ সকলেই আশায়, উৎকণ্ঠায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খাঁকি পোষাক পরিহিত যুবকবৃন্দ শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিতে ঘামিয়া উঠিতেছে, লাইনের মাঝে আলোচনার ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে নতুন রূপ ধারণ করিয়া করুণরস ও হাস্যরসে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে। আমিও এই মানুষের লাইনে একটুখানি স্থান দখল করিতে পারিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি।

রবিবার আফিসের তাড়া নাই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, ভগবানকে মনের মাঝে স্মরণ করিয়া, আর একটু সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলাম। সামান্ত কেরাণী, সংসারে অভাব অভিযোগ বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের মত লাগিয়াই আছে। সেই জন্তই হয়ত মনের ঠাকুরকে অত বিশ্বাস করি। সম্মুখের লাইন হইতে প্রতিবাসী নিত্যহরি চট্টোপাধ্যায় ওরফে খুড়ো মুখের জলন্ত বিড়িতে একটি সুখটান দিয়া ধোঁওয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আমার দিকে ঈষৎ ঘাড় ফেরাইয়া বলিলেন 'বুঝলে ভায়া, লাইনের যিনি God অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের কাছে তিনি thanks পাবার যোগ্য, কি বল?'

আমাকে কিছুই বলিতে হইল না, পশ্চাৎ হইতে একজন ছোকরা বলিয়া উঠিল 'নিশ্চই স্যার, আমাদের উচিত তাঁকে মিটিং ক'রে সম্মান দেওয়া।' পশ্চাৎ হইতে আর একজন ছোকরা সুর করিয়া বলিল—'হায় সেদিন কি আর আছে, যেদিন গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্তে কদমের মূলে বসে শৃগালের মত এক সাথে ডেকেছিল, আর কেঁদেছিলো, প্রাণনাথ বলি…'প্রথম ছোকরা বাঁধা দিয়া বলিল—'পেঁচো ফাজলামির একটা সীমা আছে', দ্বিতীয় ছোকরা সুর করিয়া পুনরায় বলিল—'কেলো যখন তখন চ'টে উঠিস ওই তোর বড় দোষ, জানিস না তো গোপিনীগণের অশ্রুজলে সৃষ্টি হ'য়েছিল যমুনা।'

খুড়ো চুপচাপ দাঁড়াইয়াছিল; সহসা নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল 'হে নামহীন, পরিচয়হীন যুবক আমার তুমি সাদর অভিনন্দন গ্রহণ কর', এই লাইনের মাঝে এমন কথা আর কেউ কখন বলেছে? হে যুবক "গোপিনীদের অশ্রুজল" এই বিষয়ে research অর্থাৎ খাঁটি বাঙলায় যাকে বলে গবেষণা তাই কর, universityর সাধ্য কি তোমায় বাধা দেয়! তোমার প্রতিবেশীরা তোমায় নিশ্চয়ই প্রেমচাঁদ উপাধি দেবেন, আমি হলফ্ ক'রে এ কথা বলতে পারি।

সকলেই ক্ষণিকের তরে দম দিয়া হাসিয়া লইলেন।

সমস্ত রক্ষা সমিতির একজন পরিচালক এ, আর, পির দান করা পরিচয় পত্রখানি সকলের নিকট বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া যাইলেন, পশ্চাৎ হইতে একজন সাঁওতাল একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল 'এই বাবু কটা বেজেছেরে?' দূর হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'বলি ও দাদারা, আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে, ব'লতে পারো?' চারিদিক হইতে লাইনের মাঝে নানা রকম অদ্ভুত শব্দ ভাসিয়া উঠিল। খুড়ো জলন্ত বিড়িতে একটি টান দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কাশিতে কাশিতে আমাকে বলিলেন—'বুঝলে ভায়া, আমরা চিরকাল স্বপ্ন দেখতেই ভালোবাসি কষ্ট করতে রাজি নই। না খেয়ে শুকিয়ে মরব সেও ভালো, তবু চেষ্টা ক'রে দেখব না বাঁচতে পারি কি না, সিনেমায় অথবা ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তাতে আমার মত বাবুদের কষ্ট হয় না, যত হয় চাল, চিনি, কেরোসিন, কয়লা সাংসারিক জিনিস কিনতে এসে।'

আগেই বলিয়াছি, আমি সামান্ত কেরাণী, বাজারে ডবল দাম দিয়া জিনিস কিনিতে রাজি নই, আর ক্ষমতাও নাই, খুড়োর কথা হয়ত ঠিক কিন্তু আমার মত যাহারা কেরাণী, যাহারা দিন আনে, দিন খায়, যাহাদের সংসারে পুরুষ বলিতে একটি মাত্র প্রাণী—তাহারা প্রতিদিন কিরূপে এই লাইনের মাঝে সময় কাটাইতে পারে, আমি ভাবিয়া পাইলাম না, পার্শ্ববর্ত্তী একজন ছোকরা মনের দুঃখে বলিয়া উঠিল—'রেলে টিকিট কাটবো লাইন, দোকানে জিনিষ কিনবো লাইন, আফিং, গাঁজার দোকানে লাইন, লাইনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিজেরাই লাইন হ'য়ে গেছি।'

খুড়ো আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'একদিনের একটা খবর বলি ভায়া শোন ; দিন কুড়ি বাইশ আগে শ্যামবাজার থেকে আসছি, তখন রাত্রি প্রায় দশটা, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কলিকাতার জল দাঁড়িয়ে ট্রামগুলির অবস্থা কাহিল, ছাতার দাম দশগুণ হওয়ায় ছাতাও নিজের নাই, কাজেই ভিজতে ভিজতে, গুণ গুণ করে ঠাকুর্দ্দার আমলের রামপ্রসাদী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আসচি, হঠাৎ বাবা বিশ্বনাথের বাহনের সহিত সাক্ষাৎ, ফুটপাত জোড়া করে তিনি শুয়ে আছেন, দু হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললাম—বাবা ষাঁড়েশ্বর, বড় বাজার ছেড়ে এধারে আমদানি কেন বাবা, আর একটু হলেই তোমার স্পর্শে ফুটপাথে যে চিৎপাত হতাম, যাহোক তোমার সাদা চামড়ার গুণেই এবারকার মত উদ্ধার পেলাম।'

লাইনের সকলেই হাসিয়া উঠিল, দক্ষিণ কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাতাল সাধুচরণ সম্মুখ হইতে বলিল—'বেশ তো বাবা জমিয়েছিলে থামলে কেন? বলে যাও, বলে যাও…

খুড়ো পরাজয় স্বীকার করিবার লোক নন ; পুনরায় বলিলেন—'বাবা ষাঁড়েশ্বরকে পেছনে রেখে কালীতলার দিকে এগিয়ে চললাম। খানিকদূর গিয়ে দেখি, একটা বাড়ির সম্মুখে লোকের ভীড়, শুনলাম বিয়ে বাড়ি, বুদ্ধিমানের মত চোক বুজিয়ে ঢুকে পড়লাম, একজন বৃদ্ধ বল্লেন—বান বান পাতা হয়েছে ; মন বলল—যাসনি—যদি ধরা পড়িস, দারুণ অপমান, আমি বললাম, এই দুর্ভিক্ষের বাজারে মান? পরের মাথায় হাত বুলিয়ে দুনিয়াটাই চলছে, আর আমিও একজন সামান্য লোক, খানিক-দূর যেতেই একটি হাফপেণ্ট পরা ছোকরা মিলিটারী কায়দায় বলল—লাইনে দাঁড়ান ··

সম্মুখ হইতে মাতাল সাধুচরণ বাধা দিয়া বলিল—'থাম বাবা থাম, আমায় একটু বলতে দে, হ্যাঁগা মশায়েরা এখানে কি খালি শুনতেই এসেছি কিছু কি বলতে পারবো না?'

সকলেই বলিলেন—'কি বলতে চান বলুন না।'

সাধুচরণ মুখে একপ্রকার বিশ্রী শব্দ করিয়া জড়িতস্বরে টানিয়া টানিয়া বলিল—'সে বড় নোংরা কথা মশাই, তা আপনারা সবাই ভদ্রলোক—যখন শুনতেই চাইছেন তখন বলব বই কি, আলবৎ বলব, একশবার বলব, রাধুশালার মত ছুটাকে নই যে একটুতেই ভয় পাবো, সেদিন কি হয়েছিল বানেন ম'শায়েরা? রাধু বলল—চল না সাধুদা কারখানায় হপ্তা পেয়েছি কিছু মাংস আর কিছু নেশা কিনে নিয়ে আসি; বললাম—'চল···ওরে! বাবা! গিয়ে দেখি প্রভুর দরজায় লাইন লেগে গেছে, আমি ভাবতাম আমিই··· বানেন ম'শায়েরা—কিন্তু দেখি সব বেটাই আমার মত সাধু কত শিক্ষিত ভদ্রলোক গায়ের কাপড়ের তলায়, কেউ বা বাজারের থোলের ভেতরে, কেউ বা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে নিচ্ছে, যাহ'ক ম'শায়েরা কোন রকমে আমরা প্রভুর দরজায় হাজির হয়ে কাজ হাসিল ক'রে এক ছুট···আদর্শ হিন্দুর পাঁঠার দোকানে, জানেন ম'শায়েরা, ওরে বাবা এখনেও লাইন, যার বরাতে যা জোটে কেউ ঠ্যাং, কেউ মাথা কারো বা বরাতে শুধু লেজটুকুই।'

সকলেই হাসিয়া উঠিল। সাধুচরণ ধমক দিয়া বলিল—'আরে থামুন ম'শায়েরা থামুন, এই লাইনে দাঁড়িয়েও আপনাদের হাসি পায়, আমি চরিত্রহীন মাতাল; কিন্তু ম'শায়েরা জিজ্ঞাসা করি কোন লোকটা নেশা ক'রে না যারা নিজের পয়সা খরচ ক'রে সপ্তাহে সপ্তাহে সিনেমার ছবি দেখতে যায়, যারা জুয়া খেলে, যারা দেশ ভ্রমণে যায়, যারা প্রেমের নেশায়……'সহসা একজন পুলিশের দর্শনে সাধুচরণের বাকশক্তি রহিত হইল।

পুলিস সাধুচরণের কাছে আসিয়া বলিল—'কিন্ লাইনমে ঘুষা খওয়া?' সাধুচরণ করজোড়ে বলিল—'দোহাই বাবা ধর্ম্মাবতার পাহারাওয়ালা, আমার জন্ত নয় কম্লির জন্ত আজ দুদিন·……

পাহারাওয়ালা মাতাল সাধুচরণকে টানিয়া লইয়া যাইল। লাইনের সম্মুখে ভীষণ গোলমাল শুরু হইল।

একজন উৎকলবাসী লাইনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, একজন স্বেচ্ছাসেবক সজোরে লাইন হইতে উৎকলবাসীকে বাহির করিয়া দিল। খুড়ো দোক্তা খাওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া স্বেচ্ছাসেবকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কখন দেওয়া হবে স্যার?'

স্বেচ্ছাসেবক কথার উত্তর দেওয়া ভদ্রতা মনে করিল না। গম্ভীর হইয়া দোকানের দিকে যাইল, অপর এক ব্যক্তি হাসিয়া আমাকে বলিলেন—'খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন?'

ঘাড় নেড়ে বলিলাম—'মোটেই না, লাইনে আজ প্রথম দাঁড়িয়েচি ; কিন্তু প্রত্যেকদিন ট্রেণের মাঝে রাস্তার 'পরে অন্না-ভাবে মানুষের যে অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছি তাতে মনে হয় এটা যেন মৃত্যুযুগ।'

খুড়ো বলিলেন—'Exactly, এই দেখনা সেদিন মেদিনীপুর-বাসীদের কি অবস্থা হ'ল, তারপর বর্দ্ধমানে Flood মানে জলপ্লাবনে কত লোক গৃহহারা, কত মা পুত্রহারা, কত পুত্র মা হারা, খবর কে রাখে?'

পার্শ্ববর্ত্তী একটি ছোকরা পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া খুড়োর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—'আপনার দেশলাইটা একবার দিনতো।' খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—'আচ্ছা মক্কেল পাকড়েছো Brother, দেশলাই আমি বুঝলে কি না কেনাই একরকম ছেড়েই দিয়েছি, দোকানের সামনে দড়ি ঝোলে—ব্যাস ধরিয়ে নাও যত খুশী।'

দোকান খুলিল, চঞ্চল হইয়া উঠিলাম, ক্রমশঃই দোকানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলাম, সহসা লাইন ভাজিয়া যাইল, মানুষ আশা করে এক—আর হয় এক ; শুনিলাম দোকান আজিকার মত বন্ধ আগামী কল্য পুনরায় খুলিবে। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল।



পাখীর প্রবাস

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এস্-সি

শরতের সাদা মেঘের সঙ্গে আকাশে ভাসিয়া চলে বলাকার সারি, নদীর চর মুখর হইয়া উঠে চকাচকীর কলরবে। কিন্তু নবনীলিমার সাথী হইয়া যাহারা আসে মলয়ের পরশে তাহারা বিদায় নেয়, আবার দখিনা পবন যাহাদের বরণ করিয়া আনে, বাদল ব্যাকুলবনে তাহাদের



ফ্লেমিংগো (Flamingo)

অনেকের মতে ইহারাই কালিদাস-বর্ণিত রাজহংস। বর্ষা সমাগমে ইহারা উত্তর ভারত পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করে

আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন বিশেষ দেশে বা অঞ্চলে কোন কোন পাখী ঋতুবিশেষে দেখা যায়, অন্য সময়ে এই সব পাখীরা সেই স্থানে একেবারেই থাকে না—হয়ত তখন অন্য কোন অঞ্চলে ইহাদের দর্শন মেলে। এই প্রকার যাযাবর জাতীয় কতকগুলি পাখী আছে যাহারা বার মাস এক জায়গায় বাস করে না, কয়েক মাস প্রবাসে কাটায়। উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল অঞ্চলের পাখীদের বিভাগ করিলে পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণী পাওয়া যায়—(১) গ্রীষ্মের পাখী—শীতের সময়ে ইহাদের দেখা যায় না—(২) শীতের পাখী—গ্রীষ্মে ইহারা থাকে না—(৩) বারমাসের পাখী, ইহারা স্থায়ী বাসিন্দা—(৪) অল্পকালের পাখী, বৎসরের কোন সময়ে কিছুদিনের জন্য থাকে, ইহারা 'পান্থপাখী'। এতদ্ব্যতীত (৫) আরও এক প্রকারের পাখী থাকিতে পারে—যাহাদের বারমাস সমানভাবে দেখা গেলেও শীতঋতুতে যে পাখীগুলিকে দেখা যায় গ্রীষ্মে তাহাদের দেখা যায় না, তাহারা তখন প্রবাসে গিয়াছে, বিদেশীরা তাহাদের স্থলবর্তী হইয়াছে। গ্রীষ্মমণ্ডলে এই প্রকার সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভেদ পরিলক্ষিত না হইলেও মধ্যয়ুরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে এবম্প্রকার শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষে শীতের পাখী প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়, গ্রীষ্মের পাখী আছে বলিয়া স্থির জানা নাই। কোকিল, পাপিয়া, 'বউ কথা কও' প্রভৃতি পাখীরা আমাদের দেশে বসন্ত সমাগমে মধুর স্বরে স্ব স্ব আগমন বিজ্ঞাপিত করে, পক্ষীবিদ্‌রা বলেন বর্ষায় ইহাদের সাড়া পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ইহারা তখন দেশান্তরিত হয় না, নীরবতাই ইহাদের উপস্থিতি গোপন করে—যদিও য়ুরোপীয় অঞ্চলে কোকিল যাযাবর পাখীদের অন্যতম। এতদ্দেশে পাখীর প্রব্রজন বিষয়ে কোন গবেষণা বা পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়া পাখীর প্রবাসগমনের খবর যথাযথ জানা যায় না। য়ুরোপ বা আমেরিকায় প্রবাসী পাখীদের লইয়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালান হইয়াছে এবং বহুস্থানে এতদুদ্দেশ্যে অনেক পর্যবেক্ষণমন্দির আছে—উত্তর সাগরের হেলিগোল্যাণ্ড, বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী রসিটেন ও স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে অবস্থিত ফারো দ্বীপপুঞ্জের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার কানাডা অঞ্চলে ও মধ্যয়ুরোপের নানা স্থানে পক্ষী প্রব্রজন পর্যবেক্ষণ মন্দির (Migration observatory) আছে। ভারতবর্ষে যাযাবর পাখীদের রীতি অনুধাবন করিবার জন্য কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশান্তর্গত ধার রাজ্যের মহারাজা ও তৎপরবর্তীকালে বোম্বাই 'ন্যাচরাল হিস্‌ট্রি সোসাইটির' উদ্যোগে এই বিষয়ে সামান্য কিছু গবেষণা হইয়াছিল।

ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে কোন পাখী কোথায় যায় বা কোন পাখী

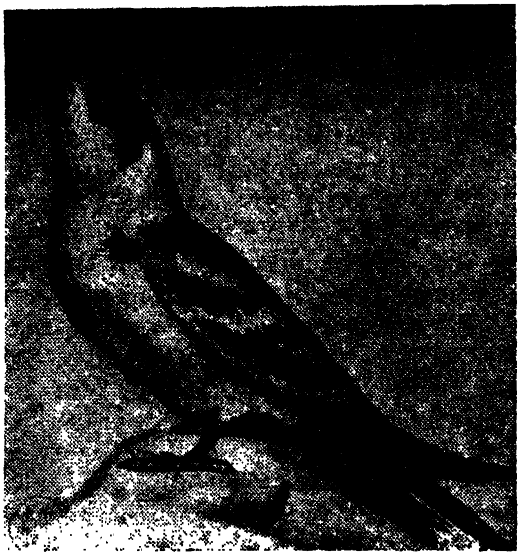


আইবিস (Ibis)

জুলাই মাসে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে ইহাদের একটিকে আংটি পরাণ হইয়াছিল। সেটি মার্চ মাসে বোম্বাই অঞ্চলে ধৃত হইয়াছিল

কোথা হইতে আসে তাহা সম্যক জানিবার জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সমুদ্রবক্ষে দ্বীপ, বাতিঘর বা জাহাজে অবস্থিতি

করিয়া পাখীর আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। দল বাঁধিয়া পাখীরা যখন দেশান্তরে যায় তখন অতি মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ঋতুবিশেষে মেঘমুক্ত আকাশে দেখা যায় দিবারাত্রি ঝাঁকে ঝাঁকে লক্ষ লক্ষ পাখী চলিয়াছে, সে পক্ষীপ্রবাহের আর বিরতি নাই। এই সব পাখীদের



টার্ণ (Tern)

মেরুবাসী এই পাখীদের রাত্রি প্রায় অজ্ঞাত। প্রতি বৎসর ২২০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া দুই মেরুতে আনাগোনা করে

লক্ষ্য করিয়া জানা যায় উহাদের গতিবিধি বা প্রবাসযাত্রার খবর—কোন পাখী কোন দিক হইতে আসিয়া কখন কোন দিকে যায়। দ্বিতীয় আর একপ্রকার ব্যবস্থায় পাখীদের শাবক অবস্থায় বা এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত 'পক্ষীপান্থশালা'র আহার্যের নিমন্ত্রণে সমাগত পাখীদের ব্যাপকভাবে জাল দিয়া বা অন্য-প্রকারে ধরিয়া উহাদের পায়ের সঙ্গে পাতলা অ্যালুমিনিয়মের আংটি পরাইয়া দেওয়া হয়। আংটিতে নম্বর, তারিখ ও ঠিকানা এবং তৎসঙ্গে পাখীটি যাহার হাতে ধরা পড়িবে সেই অজানা শিকারীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত অনুরোধ লেখা থাকে, ধরা পড়িবার স্থান ও তারিখ জানাইবার জন্য। পাখীগুলি দেশান্তরে গেলে সেখানে শিকারী বা অনুরূপ তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে পড়িলে সেই পাখীর হদিস পাওয়া সম্ভব। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে চিহ্নিত পাখীদের খুব অল্পসংখ্যকেরই খবর মেলে কিন্তু যাহারা এই কার্যে নিয়োজিত আছেন তাঁহারা ব্যাপকভাবে পাখীদের চিহ্নিত করিয়া দিয়া এতদ্বিষয়ে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে উত্তর য়ুরোপে ১৭০ হাজার জংলা পাখীকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। গ্রেট ব্রিটেনের বিবরণীতে জানা যায় প্রতি বৎসর গড়ে সেখানে ৫০ হাজার পাখীকে আংটি পরাণ হইয়া থাকে। কোন পাখী কোন পথে কোন দেশে যায় বা কোন দেশ হইতে আসে এই সব তথ্যাদি ছাড়াও পাখীর দাম্পত্যজীবন, পাখীর পারিবারিক রীতি, যৌবন, আয়ুকাল ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের ধারা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্যাদি জানা যায়।

পাখীর দেশান্তরগমনে প্রকারভেদ আছে। কোন কোন পাখী ঋতুভেদে উচ্চস্থান ত্যাগ করিয়া নিচে নামিয়া আসে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নদীনালার ধারে ছোট একপ্রকার পাখী (রেডষ্টার্ট) দেখা যায় উহারা গ্রীষ্মকালে ১৩ হাজার ফিট উঁচুস্থানে থাকে, শীতের প্রারম্ভে তাহারা পর্বতের সানুদেশে (২ হাজার ফিট উচ্চতা) নামিয়া আসিয়া বাস করে।

কতকগুলি পাখী শীতকালে উষ্ণতর স্থানে গমন করিবার উদ্দেশ্যে বিষুবমণ্ডলের দিকে খানিকটা সরিয়া আসে। য়ুরোপের পিনটেল হাঁস (Pintail Duok), ফিল্ডফেয়ার (Fieldfare), রেডউইং (Red wing), ষ্টারলিং (Starling) প্রভৃতি পাখীরা গ্রীষ্মকালে থাকে উত্তর য়ুরোপে, কিন্তু শীত কাটায় দক্ষিণ য়ুরোপে বা উত্তর আফ্রিকায়। ভারতবর্ষে ঘুঘু জাতীয় পাখীদের কোন কোন উপদল গ্রীষ্মকালে মধ্যএশিয়া, চীন, তিব্বত ও জাপানে থাকে এবং শীতকালে পূর্বভারতে ও দাক্ষিণাত্যে আসে।

এতদ্ভিন্ন আরও একপ্রকার পাখী আছে যাহাদের গ্রীষ্ম ও শীতাবাস বহু দূরবর্তী। ইহাদের চরিত্র ও রীতি অতিমাত্রায় বিস্ময়কর। কোকিল, হুইকট, নাইটিংগেল প্রভৃতি পাখী গ্রীষ্মে য়ুরোপের নানাস্থানে ও ইংলণ্ডে থাকে, শীতকালে ইহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার পর সোয়ালো পাখীদের শীতে ইংলণ্ড হইতে সাতহাজার মাইল দূরবর্তী আফ্রিকার নাটালে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে শীতকালে জলের ধারে খঞ্জন (Wagtail) পাখীরা নিরন্তর পুচ্ছ নাচাইয়া ঘোরাফেরা করে, কাদাখোচা (Snipe) পাখী লম্বা ঠোঁট দিয়া কীটপতঙ্গ খুঁজিয়া খায়, গ্রীষ্মকালে উহারা সাইবেরিয়ার বৈকালহ্রদের তীরবর্তী প্রদেশে বাস করে। শীতের দিনে বাংলা দেশের ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, যমুনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীর চরে নানাপ্রকার বুনোহাঁস (ভুলাসিয়া, বিগড়ী, নাগবিগড়ী, শাকনল প্রভৃতি), চকাচকী, কড়হাঁস দেখা যায়। গ্রীষ্ম বা বর্ষায় উহাদের আর দর্শন মেলে না, তখন উহারা সাইবেরিয়া অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের শীত ও গ্রীষ্মাবাস দুই হাজার মাইল দূরবর্তী। বাংলাদেশে বটের পাখীদেরও শীতের পরে দেখা যায় না। উত্তর ভারতে শীতকালে ফ্লেমিংগো (Flamingo) পাখীদের দেখা যায়, বর্ষা সমাগমে উহারা আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য প্রভৃতি দেশে গমন করে। আমেরিকার সোনালী প্লভার (Golden Plover) পাখী জুন ও জুলাই মাসে থাকে মেরুদ্বীপাবলীতে, আগষ্ট মাসে খাদ্যবহুল ল্যাবরাডর অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ও সেপটেম্বর মাসে একটানা সমুদ্র পাড়ি দিয়া আট হাজার মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আমেরিকার



প্লভার (Plover)

প্রতি বৎসর ইহারা ১২০০০ মাইল প্রব্রজন করে

পম্পাস ও আর্জেন্টিনা অঞ্চলে গমন করে এবং মার্চমাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। উত্তর মেরু অঞ্চলের টার্ণ (Arotic Tern) পাখী

সে দেশে শীত সমাগমে এগার হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ মেরু প্রদেশে প্রবাসযাপন করে।

এই সকল নানাদেশের নানাজাতীয় পাখীর প্রবাসভ্রমণরীতি অনুসরণ করিয়া দেখা যায় যে পাখীরা সাধারণত শীতকে এড়াইয়া যাইতে চায়। উত্তর গোলার্ধে শীতকালে উত্তর অঞ্চলের পাখী দক্ষিণে সরিয়া আসে, উহারা দক্ষিণ অঞ্চলে শীতের পাখী, গ্রীষ্ম সমাগমে আবার উত্তরে ফিরিয়া আসে বলিয়া সেই দেশের গ্রীষ্মের পাখী। তবে সকল পাখীর রীতি এক প্রকার নয়। কোন কোন পাখীরা বাসভূমি ছাড়িয়া অনেক দূরে যায় এবং শীতকে একবারে ফাঁকি দেয়; পৃথিবীর যে অংশে যখন গ্রীষ্ম তখন সেই অঞ্চলে গমন করে। ইহারা শীতের ব্যথা জানে না, জীবনে ইহাদের চিরবসন্ত বিরাজিত। পক্ষান্তরে কেহ বা অল্প দূরে যাইয়া সহনীয় শীতের দেশে বাস করিবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব উষ্ণমণ্ডলের দিকে সরিয়া আসে। উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে শীতে যাহারা আসে তাহারা সুদূর উত্তরের বাসিন্দা, গ্রীষ্মের আগন্তুকেরা আসে দক্ষিণ হইতে। এতদ্ব্যতীত বর্ষার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যও কোন কোন পাখী বৃষ্টিবহুল অঞ্চল হইতে শুষ্কতর স্থানে প্রস্থান করে। আমাদের দেশের

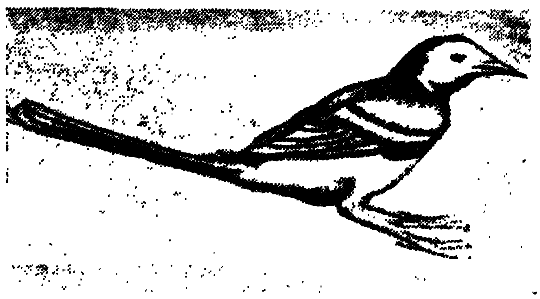


কাদাখোঁচা (Snipe)
বাংলা দেশে শীতের অন্যতম আগন্তুক

পূর্বোক্ত শীতের আগন্তুকেরা আসে উত্তরস্থ শীতের অঞ্চল হইতে। কতকগুলি এখানেই শীত কাটায়, কতকগুলি হয়ত আরও দক্ষিণে যাওয়ার পথে কিছুকাল এখানে অতিবাহিত করিয়া যায়। ভারতবর্ষের হিমালয় অঞ্চলের বহু পাখী দাক্ষিণাত্যে ও ফিলিপাইন দ্বীপে গিয়া শীত কাটায়—গ্রীষ্মে উহারা আবার হিমালয়ে ফিরিয়া আসে।

যাযাবর পাখীরা সকলেই প্রায় গ্রীষ্মকালে এবং উহাদের দুই বাসভূমির মধ্যে উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত শীতলতর স্থানে ডিম দেয়। পাখীরা নিজেরা শীত সহ্য করিতে পারে না তাই গরমের দেশে ছুটিয়া পলায়, কিন্তু শাবকেরা গ্রীষ্মাধিক্যের তপন তাপে ততোধিক কাতর হয় তাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্থানে উহাদের জন্ম হয়।

গ্রীষ্মকালে পাখীরা যেখানে থাকে তাহাকেই তাহাদের বাসভূমি বলিয়া অভিহিত করিলে বলা চলে—শীতের সময় পাখীরা প্রবাসে কাটায়, শীতের অন্তে আসে প্রজননকাল—তখন স্বদেশে ফিরিয়া আসে; সেখানে বাসা বাঁধে, ডিম প্রসব করে, শাবকদের পালন করে, পুনরায় শীত সমাগমে প্রবাসযাত্রা করে। কোন কোন পাখীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মে বাসা বাঁধিবার কালে পুরুষ পাখীরা আগে আসিয়া স্থান নির্বাচন করে, স্ত্রীজাতীয়েরা আসে পরে। যাবার বেলায় শাবকেরা যায় আগে। কিন্তু কোকিলের বেলায় এই নিয়মের



খঞ্জন (Wagtail)
গ্রীষ্ম সমাগমে ভারতবর্ষ হইতে সাইবেরিয়ায় যায়

ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাতা-কোকিল শাবক প্রতিপালনের ভার ধাত্রীমাতা অন্য পাখীর উপর ন্যস্ত করিয়া চম্পট দেয়। অবশ্য এই বিষয়ে সকল পাখীর আচরণ অভিন্ন নহে। সারাজীবন অচ্ছেদ্য দাম্পত্য সম্বন্ধে যাহারা আবদ্ধ, তাহারা অনেকে স্ত্রীপুরুষ একত্রেই যাতায়াত করে।

গমনাগমনকালে যাযাবর পাখীদের অদ্ভুত ভাবে নিয়মানুবর্তী হইতে দেখা যায়। যদিও সহস্রাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইহারা দেশান্তরে যায় তবুও যাওয়া-আসার দিন যেন পঞ্জিকায় দাগ দেওয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। ১৯০৫ হইতে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৯ বৎসর কাল ইংলণ্ডে সুইফ্‌ট পাখীদের আগমনের দিন লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছিল ২০শে এপ্রিলের কাছাকাছি (উর্দ্ধসংখ্যা ৭ দিন আগে বা পরে) উহাদের দর্শন পাওয়া যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত সামান্য ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সকল পাখীরই আগমন ঘড়ির কাঁটার মতন নিয়মিত বলা চলে। কালিদাসের কালেও এটা জানা ছিল, সেখানে দেখিতে পাই রাজহংসের আগমনে শরতের সূচনা হইত এবং দেশত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে উহারা যে চঞ্চল হইয়া উঠিত তাহাতে বর্ষা সমাগমের পূর্বাভাষ পাওয়া যাইত।

প্রবাসান্তে পাখীদের অনেককে বৎসরের পর বৎসর একই স্থানে ফিরিতে দেখা গিয়াছে। ১৯১৪ সালে একটি সুইফ্‌ট পাখীকে ইংলণ্ডের



বুনো হাঁস (Widgeon)
উত্তর ভারতে শরতের পাখী। শীতকালে ভারতবর্ষে চিহ্নিত করিয়া দিবার পর গ্রীষ্মে সাইবেরিয়াতে মৃত হইয়াছে

একটি গ্রামে আংটি পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ১৯১৮ সালে তাহাকে আবার সেই গ্রামের সেই গাছেই পাওয়া গেল, ইতিমধ্যে সে চারিবার আফ্রিকা প্রবাসে গিয়াছিল নিশ্চয়ই। এবারডীনের একটি গ্রামে একটি পক্ষীশাবককে আংটি পরাইয়া দিবার পরের বৎসর তাহাকে আবার



ষ্টারলিং (Starling)

শীতে থাকে মধ্য য়ুরোপে—গ্রীষ্মে যায় উত্তর য়ুরোপে

সেই গ্রামে একই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য সকল পাখীই একই স্থানে প্রতি বৎসর ফিরিয়া আসে এমন নয়, অনেক পাখীই হয়ত নানা কারণে পথভ্রান্ত হইয়া যায়, কিন্তু সামান্য কয়েকটিও যে ঠিক জায়গা চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে এটা কম আশ্চর্য নয়। কোন পাখী হয়ত ভারতবর্ষ হইতে তিন হাজার মাইল দূরবর্তী সাইবেরিয়ায় যায় আবার সেখান হইতে ফিরিয়া আসে, ভারতবর্ষের পরিবর্তে আফ্রিকায় বা ব্রহ্মদেশে যায় না।

দেশান্তর গমনকালে পাখীরা প্রায়শ দল বাঁধিয়া যায়, অনেক সময় এক একটি দলে বহুসংখ্যক পাখী থাকে। ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড বলাকার সারি আকাশে দেখিয়া ছেলের দলে 'বকমামা'কে 'টিপ দিয়া' যাইবার প্রার্থনা জানায়। কিন্তু 'মামা'র সে ডাক শোনার অবসর নাই, সে সুদূরের যাত্রী—হয়ত হাজার মাইল দূরে তাহাকে পাড়ি জমাইতে হইবে। প্রবাসযাত্রায় পাখীরা ১৩০০ হইতে ৬০০০ ফিট পর্যন্ত উর্ধ্বে থাকে। ইহাদের গতিবেগ অনেকক্ষেত্রে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গতি নানাকারণে কম বেশী হইতে পারে। অনুকূল বায়ুপ্রবাহে গতিবেগ অনেক বর্ধিত হয়। মোটামুটি হিসাবে ইহাদের প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৬০ মাইল বেগে উড়িতে দেখা যায়। সকল পাখীর গতিবেগ এক-প্রকার নহে। সারসজাতীয় পাখীরা শরৎকালে প্রত্যহ ১২৫ মাইল ও বসন্তকালে ২৫০ মাইল পর্যন্ত গমন করে এবং ইহারা প্রতিদিন ৬ ঘণ্টার বেশী উড়ে না, বাকী সময়টা আহারান্বেষণ ও বিশ্রামে কাটায়। কোন কোন পাখীকে এক রাত্রিতে ২৫০।৩০০ মাইলও যাইতে দেখা গিয়াছে। সাধারণত পাখীরা একসঙ্গে দীর্ঘকাল উড়ে না। কোন কোন পাখী দিনে উড়িয়া রাত্রিতে বিশ্রাম করে। আবার এমন পাখী আছে যাহারা রাত্রিতে উড়ে, দিনে আহার্য সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। প্রব্রজন ঋতুতে নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সহসা পোঁ পোঁ শব্দে প্রবাসীপাখীরা তাহাদের দেশ অভিযানের বার্তা জানাইয়া যায়। অনেক পাখীরা আবার খুব তাড়াহুড়া করিয়া চলে না। কিছুদূর যাইয়া পথিমধ্যে কিছুদিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করে। ইহারাই দেশ বিশেষে 'পান্থপাখী' বলিয়া অভিহিত হয়। কালিদাসের কাব্যে 'কতিপয়দিনস্থায়িহংসদম্পতি' নামক জনপদের বর্ণনায় পাখীদের এই রীতির উল্লেখ দেখা যায়। গুজরাট অঞ্চলে ফ্লেমিংগো পাখীরা এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত থাকে। ইহাদের গ্রীষ্মাবাস বা শীতাবাস বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোন তথ্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। মনে হয় ভারতবর্ষে ইহারা দূরাগত 'পান্থপাখী'। মেরু অঞ্চলের সোনালী প্লাভার পাখীরা দক্ষিণে যাইবার সময় উত্তর আমেরিকার লাব্রাডর অঞ্চলে আগষ্ট মাসটা অপেক্ষা করে এবং সেখানে থাকিয়া প্রচুর আহার্য গ্রহণ করে, পরবর্তী দীর্ঘ পথ (২৪০০ মাইল) একটানা উড্ডয়নের পাথেয় ও শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য। সমুদ্র পার হইবার সময় অনেক পাখী একসঙ্গে এই রকম দীর্ঘ পথ অবিরাম উড্ডয়ন করে। ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল গতিবেগে উহারা একটানা ৪০।৫০ ঘণ্টা উড়িয়া থাকে। এই অবিরাম উড্ডয়ন কম বিস্ময়ের কথা নহে। কর্ণেল লিণ্ডবার্গ আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, সহস্র সহস্র পাখী ঐ কার্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই করিয়া আসিয়াছে। যাযাবর পাখীদের যাত্রাপথ অনুসরণ করিয়া দেখা গিয়াছে অনেক সময় গমন ও প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সোনালী প্লভার পাখীরা দক্ষিণে যাওয়া কালে লাব্রাডর হইতে নোভাস্কোসিয়া, বারমুদাস হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমানায় পৌঁছে। তারপর সেখান হইতে স্থলভাগের উপর দিয়া আর্জেণ্টিনায় যায়। ফিরিবার পথে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগের ও মেক্সিকো উপসাগরের উপর দিয়া আসে ও যুক্তরাজ্য ও কানাডা অতিক্রম



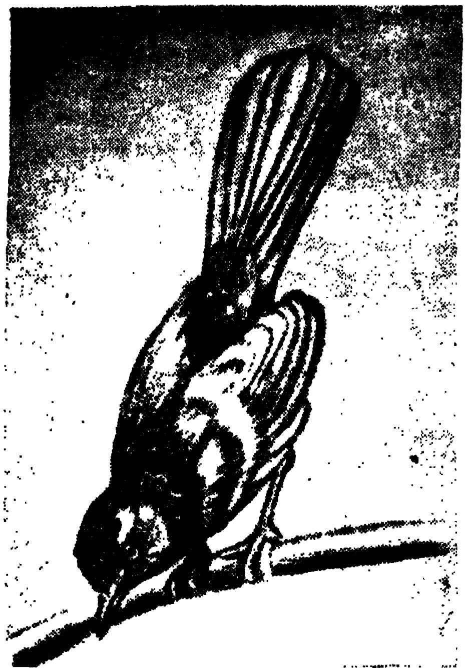
পেঙুইন (Penguin)

সন্তরণ করিয়া ইহারা হাজার হাজার মাইল দূরে গমন করে। কি করিয়া ইহারা পথের নিশানা করে তাহা আজও অজ্ঞাত।

করিয়া উত্তরসাগরে পৌঁছে। ইহাদের প্রত্যাবর্তন পথের দৈর্ঘ্য তুলনায় অনেক কম। আহার্যসংস্থান ও আবহাওয়ায় বৈশিষ্ট্য দ্বারা

পরিচালিত হইয়া পাখীরা এমনি বিচিত্র পথ আবিষ্কার করে বলিয়া মনে হয়।

দেশান্তর গমন যাযাবর পাখীদের স্বভাবগত ধর্ম, নিয়মিত বংশানুক্রমে একই ধারা বহিয়া চলিয়াছে। পাখীদের এই যাযাবরবৃত্তির হেতু কি



নাইটিংগেল (Nightingale)

শীতকালে য়ুরোপ হইতে আফ্রিকায় আসে

এবং কবে কি করিয়া ইহার সূচনা হইয়াছিল? দেশান্তরগমন পাখীর পক্ষে নিতান্ত বিপদসংকুল ও অশেষ আয়াসসাধ্য, তবুও ইহারা কেন এই অভিযানে অভ্যস্থ হইয়াছে? কোন প্রয়োজনে, কিসের তাড়নায় বা কাহার অনুপ্রেরণায় পাখীরা নিয়মিত এই দুই বাসভূমির মধ্যে আনাগোনা করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আজও সম্যক্ পাওয়া যায় নাই। সর্বাগ্রে মনে হয় আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা। দেশ-বিশেষের শীতাধিক্য পাখীর দেশত্যাগের প্রত্যক্ষ হেতু বটে, কিন্তু ঐটুকু সব নয়। শীতের অঞ্চল ত্যাগ করিয়া পাখীরা উষ্ণতর দেশে গমন করে শুধু এই কথাতেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। সোনালী প্লভার পাখীরা যখন উত্তরমেরু অঞ্চল হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় আসে সেই সময়ে মধ্য আমেরিকাতেও অনুরূপ আবহাওয়া থাকে, তবুও উহারা সুদূর দক্ষিণে যায় কেন? খাদ্যাভাব দেশত্যাগের অন্যতম হেতু হওয়া সম্ভব। সোনালী প্লভার পাখীদের যাত্রাপথের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে এটা সত্য বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় আগমনকালে উহারা বহু পথ ঘুরিয়া আসে। বহুকালপূর্বে শীত সমাগমে আহার্যের অপ্রতুলতা দেখিয়া পাখীরা ধীরে ধীরে দক্ষিণে সরিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই সময়ে খাদ্যবহুল অঞ্চলই পাখীরা পরিভ্রমণ করিত এবং ঐ কারণে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ধরিয়া ক্রমে দক্ষিণে আসিত। পরবর্তীকালে উপকূল ত্যাগ করিয়া একটানা সমুদ্র পাড়ি দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় আসাতে সময় সংক্ষেপ হয় দেখিয়া পরবর্তীকালে তাহাতেই অভ্যস্থ হইয়া উঠিল। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এই পথে পাখীরা যখন যেখানে থাকে সেখানে সেই সময়ে আহার্য মেলে। ফিরিবার সময় আহার্য মিলিবে না বলিয়াই ইহারা অন্যপথ অনুসরণ করে এবং প্রজননকাল আসন্ন দেখিয়া দ্রুত ফিরিবার উদ্দেশ্যে তখন সোজা পথে আসে। যাযাবর পাখীরা প্রায়ই পতঙ্গভুক ও ফলভোজী। সাইবেরিয়া অঞ্চলে বসন্তকালে যখন পাখীরা ফিরিয়া আসে তখন সেখানে বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরতের ফলসমৃদ্ধ বৃক্ষাদি তুষার সমাধি হইতে মুক্ত হইতেছে। কোনও দেশে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন দেখা দিলে দেশান্তর-গমন দ্বারা দুই দেশের খাদ্যসম্ভার লুটিবার সুবিধা হয়। আমেরিকায় খাঁচায় আবদ্ধ জাংকো (Junco) পাখী লইয়া পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে উপযুক্ত আহার্য জোগাইলে শীত সহ্য করিতে উহাদের মোটেই অসুবিধা হয় না। দিবামানের হ্রাস ও তৎসঙ্গে আহার্যসংগ্রহের সময়ের স্বল্পতার সঙ্গে দেশত্যাগের নিকট সম্বন্ধ আছে। উত্তর মেরুর টার্ন পাখীরা ঋতুভেদে দুই মেরু অঞ্চলে বাস করিবার ফলে বৎসরে আট মাস দিন পায় এবং বাকী চার মাসও মাত্র স্বল্পক্ষণের জন্য গোধূলির সঙ্গে পরিচিত হয়—জীবনে উহাদের রাত্রিভোগের দুর্দৈব কখনও আসে না। এতদ্ব্যতীত প্রজাবৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্যও শাবক জন্মিবার পরেই আদিম পাখীরা দেশত্যাগ করিয়া পরবর্তীদিগকে সেই সংস্কারের অধিকারী করিয়াছিল। আর্দ্র আবহাওয়া ও বারিপাতের আধিক্যও কোন কোন পাখীর দেশান্তরিত হইবার মুখ্য কারণ হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক কারণ যাহাই থাকুক না কেন, প্রবাস ভ্রমণে পাখীর বংশানুক্রমে প্রাপ্ত দেহগত কারণ রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার হেতু আছে।

উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ও মেরুঅঞ্চলের জলবায়ু বহুকাল পর্যন্ত বর্তমান অবস্থা হইতে মৃদুতর ছিল। সে যুগে গ্রীনউইচ ও গ্রীনল্যাণ্ডের

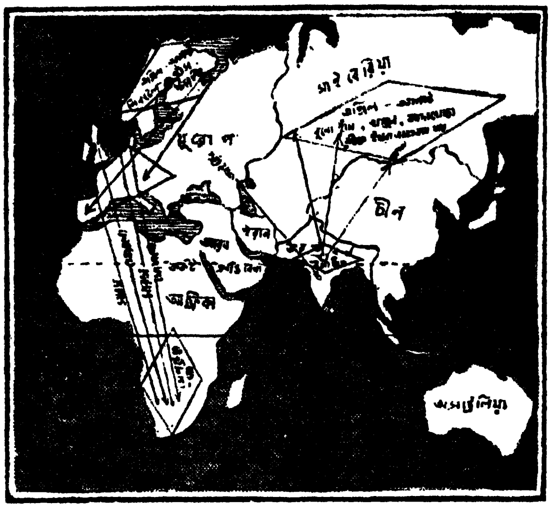


হুইটার (Wheater)

ইহারা দৈশ-অভিযানে অভ্যস্ত

জলবায়ুর বিশেষ তারতম্য ছিল না। ক্রমে ক্রমে হিমানীযুগের (Ice Age) সূচনা হইল এবং উত্তরাঞ্চল ব্যাপকভাবে তুষারাচ্ছন্ন হইতে

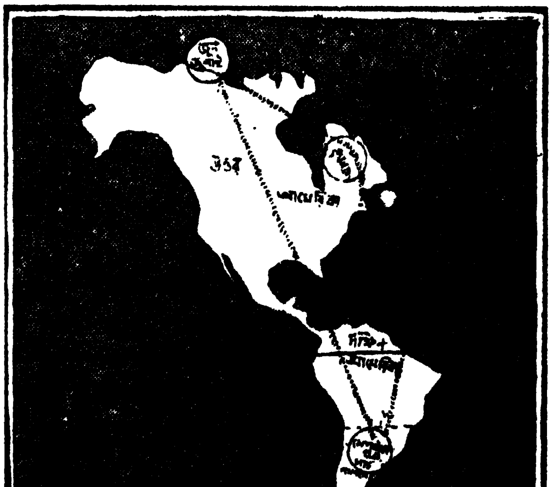
লাগিল। অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ্ শীতের প্রকোপে সর্বাংশে ধ্বংস হইল। কতকগুলি বিশিষ্ট লোমশ পশু ছাড়া ঐ অঞ্চলের অপর প্রাণীরা বিলুপ্ত হইল। পাখীদের মধ্যে যাহারা আসন্ন বিপদের স্বরূপ উপলব্ধি করিল তাহারা পলাইয়া বাঁচিল ; তাহাদের পাখা তাহাদিগকে



নানাজাতীয় পাখীর প্রব্রজন অঞ্চল তীর চিহ্নিত সঙ্কেতে
চিহ্নিত পাখীর পুনরুদ্ধার স্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে
(বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে অঙ্কিত)

ত্রাণ করিল। অপর প্রাণীদের ততটা সুবিধা ছিল না। কেহ কেহ যতটা সম্ভব পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণে সরিয়া আসিল। যখন আবার বরফ গলিতে আরম্ভ করিল স্বদেশের মায়ায় ইহারা আবার উত্তরাঞ্চলে ফিরিয়া আসিল। পর পর কয়েকটি অতিশৈত্যের যুগে এমনি ধারা চলিল। অতীতের সেই সব পাখীর বংশধরেরা আজও পূর্বপুরুষের রীতিকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। হিমানীযুগের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্দিনের সেই শিক্ষার বীজ পাখীর রক্তধারায় অমর হইয়া রহিল। তাই শীতের স্পর্শ পাইবামাত্র পূর্বজাত সংস্কার পাখীকে বৎসরে বৎসরে ঘরছাড়া করে, পাখী ছুটে বাহির পানে। খাঁচায় আবদ্ধ পাখীও যথোপযুক্ত ঋতু সমাগমে চঞ্চল হইয়া উঠে। জীবনে যে পাখী হয়ত শীতের সঙ্গে পরিচিত হয় নাই বা স্বজাতীয়দের কাহাকেও প্রবাস গমন করিতে দেখে নাই তাহাদিগকেও যথাকালে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে। তাই মনে হয় পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও স্বভাবগত ধর্ম যুগপৎ পাখীকে বহির্মুখী করে। কিন্তু একথা স্বীকার করিয়া লইলেও প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। পাখীরা দেশত্যাগের সংকেত পায় কি করিয়া? কে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, কাহার ইশারায় সহসা একদিন পাখী যাত্রা করে মরণসংকুল দূরান্তরে সাতসমুদ্রের পরপারে। আসন্ন শীতের ভয়েই পাখীরা পলায়ন করে এই কারণ যুক্তিসহ নহে ; কারণ যাযাবর পাখীদের বহু পুরুষ হইতেই শীতের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই। বহু সহস্রবর্ষ পূর্বে কোন আদি জনকজননী হয়ত শীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেশান্তরী হইয়াছিল, তৎপরবর্তীগণ শীতের আস্বাদ জীবনে পাইল না। বায়ুর চাপ, উত্তাপ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন পাখীরা কতকাংশে বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয়। শরতের শেষে যখন ধীরে ধীরে উত্তাপ কমিয়া আসিতে থাকে পাখীরা হয়ত তাহা অনুভব করে—বসন্তের তাপবৃদ্ধিও পাখীর মনে সংকেত করে ঘরে ফিরিবার। কিন্তু এ কথাও আবার একান্ত সত্য বলিয়া মনে না করিবার

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক রোয়ান কানাডায় এই বিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁহার প্রাপ্ত সত্য হইতে একথা বিশ্বাস করিবার হেতু পাওয়া যায় যে আবহাওয়ার পরিবর্তন পাখীকে উতলা করিয়া তোলে না। রোয়ান বলেন যে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে যে জৈবিক পরিবর্তন ঘটে তাহাই পাখীকে প্রবাসগমনে উদ্বুদ্ধ করে। দেহব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে—বসন্ত সমাগমে পাখীর যৌনগ্রন্থি (Sex glands) যথা মুষ্ক (Testes) ও জরায়ু (ovary) আকারে বর্ধিত হয় ও শরতের পর ঐগুলি একান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া পড়ে। রোয়ান জাংকো (Junco) পাখীদের লইয়া পরীক্ষা করেন। জাংকো পাখী সেপটেম্বর মাসে কানাডা ত্যাগ করে। পক্ষীগৃহে আবদ্ধ জাংকো পাখীকে ভাল খাদ্য দিলে উহারা শীত সহ্য করিয়া দিব্য বাঁচিয়া থাকে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়া দেখা গেল পাখীগুলি প্রবাসগমনের ঔৎসুক্য দেখাইল না—শীতের ভয় তখন আর নাই বলিয়াই প্রমাণিত হইল। দেহ ব্যবচ্ছেদে পাওয়া গেল উহাদের যৌনগ্রন্থি তখন ক্ষুদ্রতম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অপর আর একদল পাখীকে অপর একটি পক্ষীগৃহে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। এখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থায় 'রাত্রিকে দিন' করিবার ব্যবস্থা ছিল। শরতে যখন দিনের পর দিন দিবামানের দৈর্ঘ্য কমিয়া আসে সেই সময় পক্ষীগৃহে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়া কৃত্রিম উপায়ে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ান হইত। বাহিরে যখন দিবামান ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল, পক্ষীগৃহে আবদ্ধ পাখীদের দিন তখন বাড়িতেছে। কিছুদিন পরেই দেখা গেল পাখীর যৌনগ্রন্থি বর্ধিত হইয়াছে যেমনটি হয় বসন্তসমাগমে। এই পাখীদের ছাড়িয়া দিলে ইহারা উড়িয়া চলিয়া গেল। রোয়ানের এই পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দিনের দৈর্ঘ্য কমিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর যৌনগ্রন্থি ছোট হয়, দিনের দৈর্ঘ্য বাড়িতে আরম্ভ করিলে যৌনগ্রন্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যৌনগ্রন্থির বৃদ্ধির সূচনাতেই পাখী শীতাবাস ত্যাগ করে এবং উহা হ্রাস পাইতে আরম্ভ



সোনালী প্রভার পাখীর প্রব্রজন পথ নির্দ্দেশ

হইলেই পাখীরা গ্রীষ্মাবাস ছাড়িয়া যায়। প্রবাসযাত্রার 'সুইচ' রহিয়াছে যৌনগ্রন্থিতে—যেটা নিয়ন্ত্রিত হয় দিবামানের দৈর্ঘ্য দ্বারা।

এই পরীক্ষাতেও সমগ্র প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কানাডার

পাখীর পক্ষে ইহা সত্য হইতে পারে কিন্তু উচ্চ শীতে, পূর্ব্ব পশ্চিমে বা উষ্ণমণ্ডলের ভিতরেই যাহারা আনাগোনা করে তাহাদের দিবামানের হ্রাসবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা খুব ব্যাপক নহে। এতদ্ভিন্ন যে সকল পাখী উত্তর গোলার্দ্ধ হইতে বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ গোলার্দ্ধে যায় তাহাদের পক্ষেও এই কারণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কানাডার সোনালী প্লভার পাখীরা যখন দক্ষিণ আমেরিকায় যায় তখন সেখানে গ্রীষ্মের সূচনা হইতেছে, সেখানকার অধিবাসী পাখীদের তখন প্রজনন কাল, যাযাবর পাখীরা কিন্তু সেই অঞ্চলে তখন প্রজননে অভ্যস্ত নহে। সুতরাং পাখীর প্রবাসযাত্রার 'সুইচ' কোথায় রহিয়াছে এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর আজও পাওয়া যায় নাই।

যাযাবর পাখীরা শত সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কিরূপে যথাযথস্থানে আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করে—সেটাও অন্যতম বিস্ময়ের ব্যাপার। বহু পাখী হয়ত পথহারা হইয়া মারা পড়ে, পথশ্রান্ত হইয়া অনেক পাখী সমুদ্রগর্ভে সমাধিলাভ করে, সমুদ্র মধ্যস্থিত বাতিঘরের আলোর আকর্ষণে আগত অনেক পাখী ধাক্কা খাইয়া মরে, শিকারী পাখীর হাতে অনেক পাখীর অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা কম, অধিকাংশ যাত্রী পাখীরা নিরাপদে গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়। বৎসরের পর বৎসর পাখীরা দুই বাসভূমিতে আনাগোনা করে—উহাদের পথ সন্ধানের রহস্য অজ্ঞাত। একথা অনেকটা সত্য যে পথনির্দেশে পাখীর প্রখর দৃষ্টিশক্তি অনেকাংশে সাহায্য করে। সৈকতরেখা, নদীর গতিপথ, পর্বতশ্রেণী, সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপাবলী প্রভৃতি যারা পাখীরা পথের নিশানা করে, কারণ দেখা গিয়াছে কুয়াসাচ্ছন্ন দিবসে বা অন্ধকার রাত্রিতে যাত্রীপাখীদের ভিড় কম থাকে। কিন্তু যে সব পাখীরা অন্ধকার রাত্রিতেও চলে বা যাহারা সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তাহাদের পক্ষে ঐগুলি বিশেষ কোন কাজে আসে না। পেঙুইন পাখীরা উড়িতে পারে না, সাঁতার কাটিয়া চলে। উহারা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল হইতে শীতকালে কোথায় যায় জানা নাই। মহাসমুদ্রের মধ্যে উহারা কি করিয়া পথ চিনিয়া চলে? পাখীদের পথ চিনিবার তথ্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও অজ্ঞাত। যে কোন রহস্যই থাকুক না কেন, পাখীদের 'ঘরে ফিরিবার' (Homing) ক্ষমতা অদ্ভুত। শিক্ষিত পায়রাবতেরা শত শত মাইল দূর হইতে বার্ত্তাবাহকের কার্য করে। ইহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কারণ এই উদ্দেশ্যে ইহারা শিক্ষা পায়। 'টার্ণ' পাখীদের পর্দা-ঢাকা খাঁচায় পুরিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহাদের বাহিরের কিছু দেখিবার উপায় ছিল না। জাহাজে করিয়া ৮০০ মাইল দূরে লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার পর দেখা গেল উহারা ঠিক নিজ নিজ নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে—কাহারও লাগিয়াছে ৬ দিন, কাহারও লাগিয়াছে ১২ দিন। চারিটি 'নডি' ও চারিটি 'সুটি'কে ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচায় আটকান অবস্থায় জাহাজে করিয়া বাসস্থান হইতে ৪৬১ মাইল দূরে লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেই জায়গা হইতে বেলাভূমি দেখা যায় না। জাহাজ চলিতেছিল পশ্চিমাভিমুখী। পাখীগুলিকে ছাড়িয়া দিবার পর প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহেও ৭টি পাখী পূর্বদিকে চলিল। বাকী একটি প্রথমে পশ্চিমে গেল দুইশত গজ যাইবার পরেই ফিরিয়া আবার পূর্বদিকে চলিল। বহু প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও ইহাদের ২টি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইল। এই রকম ব্যাপারে পাখী যে ফিরিয়া আসে তাহাতে দৃষ্টি, স্মৃতি, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা কোনটারই কথা আসিতে পারে না। ইহা ত নিছক "ঘরের ডাক"! কেহ কেহ বলেন, পাখীরা স্ব স্ব বাসস্থানের চৌম্বক বিশেষত্ব (Magnetic declination and dip) বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকিবার ক্ষমতা আছে। যেখানেই থাক না কেন, চৌম্বক বিশেষত্বের জ্ঞানে উহারা যথাস্থানে ফিরিয়া আসে। এই মতবাদবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা অনুমান মাত্র।

তবে পাখীর 'ঘরের ডাকের' গোড়ার কথা কি? ইহা কি নিছক জন্মগত সংস্কার? বিজ্ঞান আজও নিরুত্তর—বৈজ্ঞানিক আজও এই রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত। পাখীর প্রবাসযাত্রা সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারই বৈজ্ঞানিকের কাছে অদ্ভুত সমস্যা, কবির মত তাঁহার মনেও প্রশ্ন—'কিসের তরে নদীর চরে চকাচকীর মেলা'।

এই প্রবন্ধের ছবিগুলি আঁকিয়াছেন চিত্র শিল্পী—শ্রীযুক্ত হরদাস ভট্টাচার্য্য।

স্মরণ

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

সকাল ৮৷৷০টা। তবুও কুহেলী আচ্ছন্ন আকাশের ঘোর যেন এখনও কাটে নাই। চারিদিক ভিজাইয়া ঝাপ্সা করিয়া রাখিয়াছে যেন।

অবসন্ন বিগতপ্রায় শীত যাবার আগে একবার জানাইয়া দিয়া যাইতে চাহে বলিয়া মনে হয়।

মিষ্টার ঘোষাল এবং মিসেস ঘোষাল ডাইনিংরুমে চায়ের টেবলে বসিয়া পুত্রকন্যাগণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা আসিলে চা পান আরম্ভ হইবে কিন্তু তখনও সুনম্রা, বিনম্রা ও দেবাশীষ আসিয়া পৌঁছায় নাই। মিষ্টার ঘোষাল চুরুট ধরাইয়া লইয়া মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন ও "ষ্টেট্স্‌ম্যানে" চক্ষু বুলাইতেছিলেন।

মিসেস ঘোষাল টেবলের নিকট প্রাতরাশ তৈয়ারীতে নিযুক্ত বয়কে উপদেশ দিতেছিলেন, "মিসিবাবালোগকে ওয়াস্তে পোচ যে বানায় গা, গরম বানাও গে, নেহি তো খা নেহি সক্তে। ঔর ছোটসাহেবকো আভি দো চাররোজ এগফ্লিপ্ বানা দোও গে, সমঝা?"

নতমস্তকে প্রতিবাক্যে 'জী হুজুর' বলিতে বলিতে বয় টোষ্টে মাখন লাগাইতেছিল।

দ্বিতলে পুত্রের ও কন্যাগণের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে, নিশ্চয় তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে নীচে আসিবার জন্য, কিন্তু এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তাহারা তো জানে যে তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া আছেন।

স্বামীকে একপেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া মিসেস ঘোষাল ডাকিলেন, 'সানু, বেণু, দেবু, তোমাদের এত দেরী হচ্ছে কেন? আমরা তোমাদের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছি যে?' দ্বিতলের সোপানে পদশব্দ সুনম্রার তিরস্কার বিনম্রার প্রতিবাদ শুনা গেল। ক্ষণপরে দ্রুত পদশব্দ ধ্বনিত করিয়া তিন ভ্রাতাভগ্নী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিনম্রা প্রায় ছুটিয়া আসিয়া উপবিষ্টা মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল "আজ এখন আমি খাবনা মা।"

বিস্মিত হইয়া মাতা কহিলেন "কেন রে?"

পিতাও জিজ্ঞাসুনয়ন তুলিয়া নীরবে চাহিলেন।

বিনম্রা জবাব দিবার পূর্ব্বেই ভ্রূ কুঁচকাইয়া জবাব দিল সুনম্রা "আজ নাকি সরস্বতী পূজো, ওঁর গার্লসস্কুলের বন্ধুরা বলেছেন, যে আজ অঞ্জলি না দিয়ে খেলে বিদ্যে হবেনা। তাই আজ উনি অঞ্জলি দিয়ে তবে খাবেন, সকাল থেকে এই বায়না ধরেছেন। আমি তো অঞ্জলি না দিয়ে বি-এ পর্য্যন্ত উঠেছি, কখনও এরকম strange idea মাথায় আসেনি। যত সব ন্যাস্টি ব্যাপার।" অবজ্ঞাসূচক ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া সুনম্রা পিতার দিকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র অগ্রসর করিয়া দিয়া মায়ের জন্ত চায়ে দুধ চিনি মিশাইতে লাগিল।

বিনম্রা মায়ের পিঠে তখনও মুখটা লুকাইয়াছিল, সেই অবস্থায় থাকিয়াই কহিল "হ্যাঁ মা আজ বিজু আমাদের হোলক্লাসকে তাদের বাড়ী অঞ্জলি দেবার নেমন্তন্ন করেছে, আমাদের ফার্ষ্টক্লাসের সব মেয়ে যাবে। আমায় অনেক করে বলেছে মা। আমি অঞ্জলি দিয়ে এসে তবে খাব। আজ ডিম মাছ মাংস কিচ্ছুটি খাবনা মা। তাতে নাকি খুব ভাল হবে।" বিশ্বাসভরা মুখখানি তুলিয়া বিনম্রা মায়ের পানে চাহিল।

স্তব্ধ মায়ের পানে চাহিয়া হয়ত ভাবিল মা তাহার প্রতি রাগ করিয়াছেন, তাই করুণকণ্ঠে পুনরায় মিনতি করিয়া কহিল, "একটি দিন মা, তুমি রাগ করোনা, আমি গরমজলে স্নান করব কিছু ঠাণ্ডা লাগবেনা, তোমার গরদের সাড়িটা পরে গাড়ীতে চলে যাব, ছোট অষ্টিনটা নেবো, এখন তো বাবার দরকার হবেনা, তারপর পূজো হলেই চলে আসব। খুব শিগ্‌গির, তুমি রাগ করোনা মা।" মাতাও করুণ হাসিলেন বলিলেন, "না, না, রাগ করবো কেন? তবে ঠাণ্ডা লাগিওনা, পশমের ব্লাউসটা গায়ে দিও, শালটাও নিও।" অনুমতিপ্রাপ্তা বিনম্রা বিজয়িনীর দৃষ্টিতে একবার দিদির পানে চাহিয়া ক্ষিপ্র হরিণীর গতিতে গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে গেল, ক্ষণপরেই তাহার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল "আয়া গরমপানী গোসলখানামে লাও, ঔর বাহাদুরকো কহ, ছোটা গাড়ী নিকালনা।"

বিস্মিতা সুনম্রা কহিল "সত্যি সত্যি ওকে যেতে দিলে মা?"

মাতা হাসিয়া কহিলেন "হ্যাঁ"।

২

কোন্ বিস্মৃতপ্রায় অতীত আজ বিনম্রার একটি আব্‌দারে উজ্জ্বল হইয়া বিগত ৩০ বৎসর পরে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। তখন তিনি মিসেস ঘোষাল নহেন, তখন তিনি অনিমা ছিলেন। পলতাগ্রামের চাটুজ্জোদের চতুর্দ্দশবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠাকন্যা অনিমা। ঠিক বিনম্রার বয়স এখন প্রায় তাই।

শেষরাত্রের গভীর কুয়াসা তখনও যেন আমগাছের স্তবকভরা হরিদ্রাভ বউলের গুচ্ছকে আপন অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছে। দেখা যায়না। পাখীর অস্ফুট কাকলীধ্বনি সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। কত অজস্র পাখীর অজস্র ডাক। তেমনি ভোরে উঠিয়া তাঁহারা স্নানে চলিয়াছেন একটি দল সঙ্গীসাথী সঙ্গে। আজ আর গরমজলে ঘরে তোলা জলে নাইতে নাই। আজ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পূজার পুষ্প আম্রের বউল চয়ন করিয়া তাঁহারা সবাই মিলিয়া তাঁহাদের গ্রামের দেবগৃহ কালীমন্দিরে যাইবেন।

বিগ্রহসমন্বিত মন্দিরে অন্ত দেবমূর্ত্তি রচনা করিতে নাই, পটে পূজা হয়। তাঁহাদের গ্রামের ওই জাগ্রতা দেবীর মন্দিরে সব দেবতার পূজা সারা হয়—তবে তাহা হয় ঘটে, নয় তো পটে।

বিরাট মন্দিরের বাঁধানো চত্বর ভরিয়া ছেলেমেয়ের মেলা। সবাই আনিয়াছে সাজি ভরিয়া ফুল, আমের বউল, যবের শীষ, আবীর, কাগ, চুয়া, চন্দন, ধূপ, ধুনা, হাতভরিয়া পাঠ্যপুস্তক দোয়াত কলম। বড় বড় জলচৌকি ভরিয়া সেই সব পুস্তক দোয়াত কলম ও পেন্সিলের স্তূপ সাজানো হইয়াছে।

ঝকঝকে পিতলের সিংহাসনে মস্ত বাঁধানো সরস্বতীর পট ক্রমেই যেন ধূপ ধুনার ধোঁয়ায় পুষ্প চন্দনের গন্ধে জীবন্ত অপার্থিব বলিয়া বোধ হইতেছে।

চারিদিক ঘেরিয়া শীতে কম্পমান বালকবালিকাগণের আনন্দ কোলাহল। আজ দেবীর নৈবেদ্য তাহারা সাজাইবে।

তারপর পুরোহিত মহাশয় পূজা করিয়া সকলের হাতে পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া অঞ্জলির মন্ত্র বলিবেন। সেই অঙ্গনভরা পট্টবস্ত্র-পরিহিত আশায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে আনন্দে উজ্জ্বল কিশোর কিশোরী বালক বালিকার দল একত্র গললগ্নীকৃতবাসে পুষ্পাঞ্জলি-পূর্ণহস্তে উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়িতেছে—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদান্ত-বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।"

পুষ্পাঞ্জলি দেবীর চরণে দিয়া বর প্রার্থনা করিতেছে—

'বিদ্যাং দেহি যশং দেহি ধনং দেহি মে।'

সদ্য উদিত সূর্য্যের ভাস্বর কনক-কিরণ পড়িয়া তরুণ মুখগুলিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে।

মাতা ঠাকুরমা পিসিমায়ের দল ততক্ষণে পাথরের থালায় ভরিয়া খিচুড়ী ভোগ ঠাকুরতলায় আনিতেছেন। ছেলেরা আজ নিরামিষ ভোগ খাইয়া থাকিবে।

উপবাসী ভক্তিশুদ্ধচিত্ত নির্ম্মল ফুলের মত শিশুর দল।

তারপর?

অনিমা ভাবিতেছিলেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে বৎসরে আজও সরস্বতী পূজা হয়।

বিদ্যা, ধন, যশ, মান দুই হাত ভরিয়া দেবী সকল বস্তুই তাঁহাকে জীবনে দিয়াছেন।

শিক্ষিত স্বামী, পুত্র, কন্যা, অভিজাত সমাজ, সুখী জীবন ধনের প্রাচুর্য্য। শৈশবে বৎসরের একটি দিনে কত বিশ্বাসে ভক্তিতে যে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া এই সকল প্রসাদ হয়ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আজ আর তাঁহার সেই কথা মনের দ্বারে একটিবারও আঘাত করে না? আশ্চর্য্য!

ধীরে ধীরে পেয়ালাটি সরাইয়া দিয়া অনিমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিত স্বামী পুত্রকন্যার পানে চাহিয়া কহিলেন—"থাক্, আজ আমিও আর এসব কিছু খাব না।"

ব্রহ্মমীমাংসা

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

স্থানান্তরে* বেদান্তসম্মত ব্রহ্মকারণবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ ব্রহ্মকারণবাদে অপরাপর যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান দুই একটা এস্থলে আলোচনীয়।

আপত্তি হইতে পারে যে উপাদান কারণ ও তৎপ্রসূত কার্য্য সমস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ, কার্য্যকারণাত্মক বলিয়া কারণের স্বভাব ও গুণ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হয়। যেরূপ, মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট মৃন্ময় স্বভাবাপন্নই হয়, সুবর্ণময় হইতে পারে না। এস্থলে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ সৃষ্ট হয় কিরূপে? কারণ চেতন স্বভাব হইলে কার্য্যকেও চেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জড় জগৎকে চেতন বলিয়া মনে করা অসম্ভব।

উত্তরে বৈদান্তিকেরা বলিতেছেন যে, কার্য্য যে সর্ব্বদাই কারণের সমস্বভাব হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। কার্য্য কারণাত্মক হইলেও, কারণের সকল গুণই উৎপন্ন কার্য্যে লক্ষিত হয় না; তদ্ব্যতীত কার্য্যে নূতন গুণবিশেষের আবির্ভাবও হইতে পারে, যাহা কারণে নাই। বৈদান্তিকেরা এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখ ও কেশের উৎপত্তি এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকের উৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য দৃষ্টান্ত দুইটি নির্দোষ নহে, যেহেতু চেতন আত্মা অচেতন নখ কেশ প্রভৃতি দেহাংশের উপাদান কারণ নহে, নিমিত্ত কারণ মাত্র। অথবা অচেতন গোময় চেতন বৃশ্চিকের আত্মারও উপাদান কারণ নহে, আশ্রয় মাত্র। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বহু সময়ে থাকে। যথা, দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে যে মিশ্রিত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহাতে এরূপ বহু গুণ লক্ষিত হয়, যাহা সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীর মধ্যে পৃথগ্‌ভাবে নাই। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দুইটী পদার্থের সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইলেও জলদৃষ্ট গুণ ঐ দুইটী পদার্থে স্বতন্ত্রভাবে নাই। রসায়ন শাস্ত্রে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

দুই বা ততোধিক কারণের সংমিশ্রণে ভিন্নস্বভাব কার্য্যোৎপত্তি ব্যতীতও একই কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যেও কারণাতিরিক্ত অথবা কারণ হইতে বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশও লক্ষিত হয়। যথা, বীজ হইতে বৃক্ষের, দুগ্ধ হইতে দধির অথবা সর্ষপ হইতে তৈলের উৎপত্তি। বৃক্ষ মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট—কিন্তু একটি ক্ষুদ্র বীজে এই সকল কিছুই নাই। দধি ঘন ও অম্লগুণবিশিষ্ট, কিন্তু দুগ্ধ তরল ও অম্লত্ববিহীন। তৈল তরল, কিন্তু সর্ষপ তরলত্ববিহীন, কাঠিন্যগুণযুক্ত। তদ্রূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগদুৎপত্তি কিছুই বিচিত্র নহে।

বস্তুতঃ "উপাদানত্ব" শব্দের প্রকৃত অর্থ "উৎপন্ন কার্য্যের সহিত সমস্বভাবত্ব" নহে, কিন্তু "কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্টত্ব" মাত্র। অর্থাৎ, উপাদান কারণে সেই কার্য্য উৎপন্ন করিবার একটা বিশেষ শক্তি বর্ত্তমান আছে। অথবা, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য শক্তিরূপে কারণে প্রচ্ছন্ন থাকে। যথা, উৎপত্তির পূর্বে বৃক্ষ বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তিরূপে বীজেই নিহিত থাকে। উৎপন্ন কার্য্য উপাদান কারণের সহিত সমগুণবিশিষ্টও হইতে পারে, যথা—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন মৃন্ময় ঘট; অথবা ভিন্নগুণবিশিষ্টও হইতে পারে, যথা বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ। কিন্তু উপাদান কারণে তত্তৎ কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্যের সৃষ্টি অসম্ভব। মৃত্তিকায় ঘটোৎপাদিকা শক্তি এবং বীজে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি না থাকিলে ঘট ও বৃক্ষের সৃষ্টি কদাপি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্টতাই উপাদান কারণের প্রকৃত লক্ষণ, অপর কিছু নহে।

ব্রহ্মেও জগদুৎপাদিকা শক্তি নিহিত আছে। ব্রহ্মের অসংখ্য শক্তিসমূচ্চয়ের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ এই শক্তিদ্বয় অন্যতম। চিৎশক্তির সাহায্যে তিনি জীব ও অচিৎ শক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং অচেতন জগৎও ব্রহ্মেরই কার্য্য। এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা চলে না যে, অচিৎ শক্তিবিশিষ্ট হইলে ব্রহ্মকেও জগতের ন্যায় জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি দ্বারা শক্তিমানের স্বভাব ব্যত্যয় ঘটে না। সর্ষপে তৈলোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া সর্ষপ তরলগুণত্ব প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ, অচিৎ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম জড়জগতের স্রষ্টা হইয়াও স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ও অজড়।

ব্রহ্ম কারণবাদে অপর একটি আপত্তি এই হইতে পারে যে, জগৎ যেরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, সেরূপ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তও হইতে পারে না। ব্রহ্মেই জগতের লয় হইলে, অশুদ্ধ জগতের সংস্পর্শে ব্রহ্মও অশুচি হইয়া পড়িবেন, যেরূপ গোময়লিপ্ত মৃন্ময় ঘট মৃত্তিকাপিণ্ডে লয়ীভূত হইলে, মৃত্তিকাপিণ্ডও গোময়লিপ্ত হইয়া পড়ে।

এই আপত্তির খণ্ডনার্থ বৈদান্তিকেরা বলিতেছেন যে, জগৎ ব্রহ্মে জড় জগৎরূপে লয়প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু অচিৎ শক্তিরূপে মাত্র। এই অচিৎ শক্তি ব্রহ্মশক্তি বলিয়া শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। সুতরাং অপ্রপঞ্চিত অচিৎ শক্তি এবং প্রপঞ্চিত জড় জগৎ উভয়ে সমধর্মী নহে।

ব্রহ্মকারণবাদ খণ্ডনার্থ কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব অর্থাৎ অংশবিহীন; সুতরাং জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিলে সমগ্র ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়া যান, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। ফলে ব্রহ্ম ও জগৎ সমপরিমাণ ও অভিন্ন হইয়া পড়েন। অথবা ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের এক অংশ মাত্র জগদাকারে পরিণত হয়, অপরাপর অংশ জগদতিরিক্তরূপে বিরাজ করে। এতৎ পক্ষেও ব্রহ্ম সাংশতা ও বিভজ্যতা হেতু, জড়বস্তুর ন্যায় বিকারার্হ ও পরিবর্তনশীল হইয়া পড়েন। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

পরিণামবাদিগণের মতে যে সকল ব্যক্তি উপরিউক্ত আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান জানেন না। সৃষ্টি আর কিছুই নহে ব্রহ্মের স্বশক্তি বিক্ষেপ মাত্র। সৃষ্টির পূর্বে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শক্তিদ্বয়রূপে তাঁহাতে প্রচ্ছন্ন থাকে। সৃষ্টিকালে তাহারা নামরূপ বিশিষ্ট স্থূল জগৎ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। জগৎ সৃষ্টির অর্থ এই নহে যে, ব্রহ্ম স্বীয় সত্তার অংশবিশেষকে জগদ্রূপে পরিণত করেন। ব্রহ্মসত্তা এক ও অখণ্ডনীয় সমগ্র সত্তা, ইহার অংশ বিভাগ হইতে পারে না। তজ্জন্য শ্রুতি ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি কার্য্যকে ঊর্ণনাভের তন্তুবয়ন কার্য্যের তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ("যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ...তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্"—মুণ্ডকোপনিষৎ ১-১-৭) তন্তুস্রষ্টা ঊর্ণনাভ যেরূপ স্বয়ং তন্তুরূপে পরিণত হয় না, সেইরূপ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মও স্বয়ং অপরিণত থাকিয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন।

সৃষ্টির মূল রহস্য ইহাই। যেস্থলে কার্য্য কারণের পরিণাম, সেস্থলে কারণের দুই প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়:—(১) কারণ কার্য্যে পরিণত অথবা পরিবর্তিত হয়। যথা—সুবর্ণপিণ্ড মৃন্ময় ঘটে পরিবর্তিত হয়। (২)

---

* ভারতবর্ষ, চৈত্র সংখ্যা ১৩৫০।

কারণ স্বয়ং অপরিণত বা অপরিবর্তিত থাকে। যথা ঊর্ণনাভ তন্তুতে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং কার্য্যসৃষ্টির জন্য কারণের কার্য্যরূপে পরিণতি অত্যাবশ্যক নহে। কার্য্যোৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট হইলেই কারণ কার্য্যোৎপাদন করিতে পারে, স্বয়ং পরিণত হইয়া অথবা অপরিণতই থাকিয়া। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং অপরিণত, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত।

অতএব কার্য্যোৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্টত্বই উপাদান কারণের প্রধান ধর্ম। কার্য্যকারণের সমধর্মী অথবা ভিন্নধর্মী হইতে পারে। পুনরায় কারণ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে অথবা স্বয়ং অপরিণত রূপে বিরাজ করিতে পারে। কিন্তু কারণকে কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, নতুবা কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। ইহাই পরিণামবাদের প্রকৃত অর্থ। অদ্বৈত-বৈদান্তিকেরা পরিণামবাদের এই গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইয়াই জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত অথবা মায়ামাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ব্রহ্ম নিয়ত নিরবয়ব পরিবর্তনহীন। সুতরাং ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইতে পারেন না, যেহেতু পরিণতির অর্থই পরিবর্তন। অর্থাৎ মৃন্ময় ঘট যেরূপ মৃৎপিণ্ডের পরিণাম, জগৎ সেইরূপে ব্রহ্মের পরিণাম নহে, কিন্তু সর্প যেরূপ রজ্জুর বিবর্ত, অর্থাৎ রজ্জু না হইয়াও রজ্জুরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র। এস্থলে পরিণামবাদিগণের বক্তব্য এই যে অপরিণত কারণও কার্য্যোৎপাদক হইতে পারে এবং ঈদৃশ সৃষ্টকার্য্যের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নাই। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপ মাত্র, এই অর্থ গ্রহণ করিলে অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম হইতেও জগদুৎপত্তির কোনই বাধা থাকে না।

অতএব উপরি উক্ত বহু বাদবিতণ্ডার খণ্ডনপূর্বক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ এবং ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ *।

উপরে বলা হইল যে ব্রহ্ম বৃহত্তম, উচ্চতম, শ্রেষ্ঠ এই বিশাল জগতের স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংসকর্তা। তিনি অচিন্ত্য, অনন্ত, শক্তিবিশিষ্ট। তাঁহার শক্তির সংখ্যা ও পরিমাণ ক্ষুদ্র মানবের ধারণাতীত। শ্রুতি তাঁহাকে "মহতো মহীয়ান্" (কঠোপনিষৎ ২-২০), মহৎ হইতেও মহত্তর এবং "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" (কঠোপনিষৎ ৬-২), উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারই কঠোর শাসন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত করিতেছে। তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য্য কিরণ বিকিরণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। (বৃহদারণ্যক ৩-৮-৯)।

কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ভীষণত্বই ব্রহ্মের একমাত্র লক্ষণ নহে। বজ্রের ন্যায় কঠোর হইলেও তিনি যে কুসুমের ন্যায় কোমল, ইহা ভুলিলে চলিবে না। তিনি শুধু ভীষণই নহেন, মধুরও ; শুধু ঐশ্বর্য্যশালীই নহেন, অশেষ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শান্তি-কান্তি-সুধানিধি। বস্তুতঃ জাগতিক সকল সৌন্দর্য্য এই ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের কণামাত্র। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম আনন্দময়। তিনি কেবল সৎ ও চিৎ নহেন, আনন্দও। এই জগৎ তাঁহার আনন্দ হইতে উদ্ভূত। পুনরায়, ব্রহ্ম ভক্তবৎসল। তিনিই জীবের পরিত্রাতা। জীবের সকল পাপ হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'হরি' অথবা 'কৃষ্ণ'। জগতের মঙ্গলার্থ তিনি ব্যূহ ও অবতার রূপে ধরাধামে ধন্য করেন। অতএব, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও পরম করুণাময়, জগদতিরিক্ত হইলেও জগদাত্মা, সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অন্তর্যামী, প্রভু হইয়াও সখা। কঠোরতা ও কোমলতা, ভীষণতা ও মধুরতা, এই বিরুদ্ধ গুণনিচয়ের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ ব্রহ্মে পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সগুণ, অনন্তকল্যাণগুণবিশিষ্ট। তাঁহার গুণাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একপক্ষে, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, কঠোরত্ব ইত্যাদি ; অপর পক্ষে, সৌন্দর্য্য, আনন্দ, করুণা, কোমলতা ইত্যাদি। প্রথমশ্রেণীর গুণসমুচ্চয়ের জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভয়ের পাত্র ; দ্বিতীয়শ্রেণীর গুণগ্রামের জন্য তিনি আমাদের প্রীতি ও আনন্দের আকর। শাস্ত্রে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াও বর্ণনা স্থলবিশেষে করা হইয়াছে। কিন্তু 'নির্গুণ' অর্থ হেয়গুণহীন মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্ম সকল সদ্গুণের আকর ও সকল মন্দগুণবিহীন।

ব্রহ্মের স্বভাব, গুণ ও কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা উপরে করা হইল। অতঃপর প্রশ্ন উঠে যে ঈদৃশ অনন্ত গুণশক্তিসম্পন্ন জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বাদি বিষয়ে আমাদের প্রমাণ কি ? ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি ? শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ ও উপায়। তজ্জন্য ব্রহ্মকে বেদান্তে 'শাস্ত্রযোনি' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রের সাহায্য বিনা ব্রহ্মকে আমরা জানিতেই পারিনা। কারণ, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাই অথবা অনুমেয় নহেন। ব্রহ্মের দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আস্বাদ অথবা ঘ্রাণে সমর্থ কোনও ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। অতএব ব্রহ্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নহেন। পুনরায়, অনুমান সাদৃশ্য জ্ঞানমূলক। নিম্নলিখিত অনুমান প্রণালী দেখুন। 'সকল মানবই মরণধর্মী। রাম মানব বিশেষ। সুতরাং, রামও মরণধর্মী'। এস্থলে ইহাই বলা হইতেছে যে, যেহেতু রাম অপর মানবগণের সমধর্মী, সেই হেতু সে অপর সকলের ন্যায় মরণধর্মীও নিশ্চয়। অর্থাৎ রাম ও অপরাপর মানবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে রামও তাহাদের ন্যায় মরণশীল। ব্রহ্মের কিন্তু জাগতিক কোনও বস্তুরই সহিত সাদৃশ্য নাই ; তিনি অসাধারণ স্বভাবগুণবিশিষ্ট। তজ্জন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনও প্রকার অনুমান অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণ।

এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—ব্রহ্মকে কেবল মাত্র 'শাস্ত্রযোনি' অথবা শাস্ত্রগম্য বলা হইলে, মানব মনের বিচারবুদ্ধিরূপ শ্রেষ্ঠ বৃত্তির রোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মননশক্তির ঈদৃশ নিরোধীকরণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্মকে জানিতে হইলে বিচার বুদ্ধির সাহায্যেই জানিতে হইবে ; উহার নিরোধপূর্ব্বক নহে।

ইহার উত্তর এই যে—সাধারণ মানবের মননশক্তি স্বল্প ও সীমাবদ্ধ, অসীমের গ্রহণে অপারগ। সাধারণ মানব আমরা কেবল লৌকিক বিষয়েই চিন্তা ও বিচার করিতে পারি। কিন্তু যাহা অলৌকিক বা জগদতিরিক্ত, তৎসম্বন্ধে কোনও রূপ ধারণা ও বিচার করিতে আমরা অসমর্থ। শ্রুতি ব্রহ্মকে "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২—৪) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম যাঁহাকে মন ধারণা করিতে এবং বাক্য পূর্ণপ্রকাশ করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান শ্রুতিমূলক।

কিন্তু বস্তুতঃ 'শ্রুতি' শব্দের অর্থ কি ? শ্রুতি সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের অনুভবলব্ধ জ্ঞানের আকর মাত্র। ঈদৃশ মহাজ্ঞানী সুধীবৃন্দ অলৌকিক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল দর্শন বা সাক্ষাৎকার করিয়া জগতের কল্যাণার্থ তাহা শ্রুতিরূপে প্রকাশ করিয়া যান। এই 'দর্শন' বা অনুভব জন্য জ্ঞান, সাধারণ প্রত্যক্ষ বা অনুমানমূলক জ্ঞান হইতে ভিন্ন ; অর্থাৎ ইহা সাধারণ বিচারবুদ্ধিমূলক জ্ঞান নহে। দর্শনমূলক জ্ঞান অলৌকিক বিষয়ক, মননমূলক জ্ঞান লৌকিক বিষয়ক মাত্র। প্রথমটী মানব মনের এক অসাধারণ শক্তিবিশেষের ফল, যাহাকে আমরা 'প্রজ্ঞা' (Intuition) নামে অভিহিত করিতে পারি। দ্বিতীয়টী মানব সাধারণ বিচারশক্তির

* 'উপাদানত্ব' উপরে আলোচিত হইয়াছে। 'নিমিত্তত্ব' অর্থ সৃষ্টিপ্রারম্ভে জীবের সহিত তাহার কর্মফলের সংযোগসাধন।

ফল, যাহাকে 'বুদ্ধি' (Reason) বলা হয়। কিন্তু প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি ভিন্ন হইলেও বিরুদ্ধধর্মী নহে। উপরন্তু, বুদ্ধি প্রজ্ঞার সোপান মাত্র। অর্থাৎ, প্রজ্ঞা বুদ্ধির বিরোধকারী নহে ; পরন্তু প্রজ্ঞা বুদ্ধির চরমোৎকর্ষ, পূর্ণ-বিকাশ, প্রকৃষ্ট ও উচ্চতম অবস্থা মাত্র। তজ্জন্যই যাহা প্রজ্ঞালব্ধ, তাহা বুদ্ধিলব্ধ নহে। সাধারণ মানবের পক্ষে বুদ্ধি পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষিবৃন্দ স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ হন্। শাস্ত্র ইঁহাদেরই সাধনালব্ধ সত্যজ্ঞানের ফলমাত্র।

সুতরাং ব্রহ্মকে 'শাস্ত্রযোনি' বলার অর্থ কেবল ইহাই যে—যে অচিন্ত্যগুণশক্তি মহান্ পুরুষ ব্রহ্মশক্তি, অপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য, তাঁহাকে প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট ভাবে জানিতে হইলে পূর্ণ বিকশিত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক। ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব কথার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম মানব বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য। অবশ্য, বুদ্ধির সাধারণ অথবা অপূর্ণ অবস্থায় নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব মানবের ধারণাতীত। কিন্তু, বুদ্ধি চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহার অজ্ঞেয় কিছুই আর থাকে না। ভারতীয় দর্শন মানববুদ্ধির ঈদৃশ অবস্থাভেদ বিশেষরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সাধারণ জীবনেও ইহা প্রত্যহই পরিলক্ষিত হয়। পিতার নিকট যাহা সুবোধ্য, পুত্রের নিকট তাহাই অতি দুর্বোধ্য এবং পুত্র পিতার সাহায্যেই তত্তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাধারণ মানবের দুর্জ্ঞেয়, তাহাই বৈজ্ঞানিকের নিকট সরল ও সহজ এবং সাধারণ মানব বৈজ্ঞানিকের সাহায্য বিনা ঈদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। তদ্রূপ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের সহায়তা ব্যতীত সাধারণ মানব ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পানে ধন্য হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্মজ্ঞানকালে, সাধারণ মানব পক্ষেও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। শাস্ত্র প্রপঞ্চিত তত্ত্বের নির্বিচার গ্রহণকে 'শ্রবণ' নামে অভিহিত করা হয়। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম অবস্থা অথবা সোপান মাত্র। দ্বিতীয় সোপান 'মনন', অথবা গৃহীত তত্ত্বের যুক্তি দ্বারা বিচার ও অনুমোদন। তৃতীয় ও চরম অবস্থা 'নিদিধ্যাসন', অথবা যুক্তি অনুমোদিত তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব। ইহাই বুদ্ধির চরম ও সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা, অথবা প্রজ্ঞা। এতদ্রূপে, সাধারণবুদ্ধি মানব শাস্ত্রনির্দেশানুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, স্বীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং ধ্যান দ্বারা সেই পরোপদিষ্ট তত্ত্বকে স্বীয় সাক্ষাৎজ্ঞানে পরিণত করে।

সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ও বিচারমূলক জ্ঞান সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সাধারণ বিচারমূলক নহে। বস্তুতঃ, দুইশ্রেণীর ব্রহ্মজ্ঞানী দৃষ্ট হয় (১) অসাধারণ বিচারবুদ্ধিশালী অথবা প্রজ্ঞাশীল ঋষি ও আচার্য্যবৃন্দ। ইঁহারা শ্রুতি অথবা অপরের সাহায্য ব্যতীতই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ধন্য হ'ন। (২) সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানব। ইঁহারা প্রারম্ভে শ্রুতির সহায়তায় পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, পরিশেষে বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হন। ব্রহ্মের শ্রুতিগম্যতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞাতার পক্ষেই কেবল প্রযোজ্য। ব্রহ্ম সাধারণ বিচারবুদ্ধির অগম্য বলিয়াই তাঁহাকে 'শাস্ত্রযোনি' বলা হইয়াছে। অবোধ মানব জ্ঞানের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মনে করে যে সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেই সে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। ঈদৃশ অল্পবুদ্ধি মানবের উপদেশার্থই বেদান্ত ব্রহ্মকে শাস্ত্রৈকপ্রমাণক বলিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উপনিষদেও আছে—"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাম্" (কেনোপনিষৎ ২—৩)। অর্থাৎ, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন ; এবং যিনি মনে করেন যে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন নাই।

অতএব স্থিরীকৃত হইল যে সাধারণ মানব পক্ষে ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্য।

সোম

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

অনেক দিনের কথা। তখন আমি কটকে থাকিতাম। একদিন এক ভদ্রলোক একটা হাত-খানেক লম্বা প্রায় শুখনা ডাঁটা দিয়া বলিলেন, এটি বেদের সোমলতা, ঋষিগণ ইহার রস পান করিতেন। আমি আশ্চর্য হইলাম। কারণ, আমি শুনিয়াছিলাম, সোমলতা হারাইয়া গিয়াছে, বহু চেষ্টাতেও কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। তিনি কটক জেলার অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়া নামক স্থানে এক বনের ধারে পাইয়াছিলেন। আমি ডালটি একটা টবে পুঁতিয়া আওতা দেখিয়া এক বেড়ার গায়ে রাখিলাম। অন্যান্য গাছের সহিত ডালটি যথারীতি জল পাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে বাড়িতে লাগিল। পেন্‌সিলের মতন সরু, শিম পাতার মতন সবুজ, কিন্তু পাতা নাই। পর্ব (সন্ধিস্থান) হইতে পাতার উপক্রম হইতে না হইতে খয়রা রং হইয়া শুখাইয়া যায়। কিন্তু শাখা-প্রশাখা বাড়িয়া বেড়া জড়াইয়া ধরিয়া উঠিতে লাগিল। কোন্ ঋতু মনে নাই, দেখি থোবা থোবা ফুল ধরিয়াছে, সাদা সুগন্ধ। শ্বেত অর্কের (আকন্দের) ফুলের মতন, কিন্তু আকারে ছোট। আকন্দের মতন প্রচুর ক্ষীরও আছে, কিন্তু ক্ষীর ঈষৎ অম্ল। কোন কোন ফুল হইতে জোড়া জোড়া, সরু, লম্বা শুঁটী হইয়াছিল। লতাটি অর্কাদিবর্গের। ইহাই কি বেদের সোমলতা? কে জানে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে এই "ভারতবর্ষে" ৺ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম. এ, এম. আর. এ. এস সোম সম্বন্ধে পাঁচ-সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সোম নিষ্পত্র লতা নহে, সপত্র বৃক্ষ ; সে বৃক্ষ আমাদের পরিচিত ভঙ্গা, ইহাই প্রতিপাদ্য ছিল। পূর্বে পূর্বে যাঁহারা সোম অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের ভুল দেখাইয়াছিলেন। তিনি পরে The Soma Plant নামে এক ইংরেজী পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইং ১৯২২ সালে ছাপা হইয়াছিল। আমি সোম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না, তথাপি তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রত্যয় হইল না। মনে হইল, তাঁহার যুক্তি-পরম্পরা ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ। ভঙ্গা—ভাং, বাঙ্গালায় প্রচলিত নাম সিদ্ধি। সিদ্ধি গাছ দুর্লভ নয়, তবে অন্বেষকেরা বেদের সোম কেন খুঁজিয়া পান নাই?

ইহার চারি-পাঁচ বৎসর পরে আমাকে ঋগ্‌বেদের পাঁজি খুঁজিতে হইয়াছিল। ঋষিগণ ৩৬০ দিনে বৎসর গণিতেন। তাঁহারা কেমন করিয়া ৩৬০ দিন নির্ণয় করিলেন? পাঁজি দূরে থাক, প্রথমে এই মূল প্রশ্নের উত্তর জানিতে হইবে। পশ্চিম-দেশীয় বেদ-বিদ্বানদিগের দুই-একখানা বই পড়িলাম। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না। রমেশ-দত্ত মহাশয়-কৃত ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদেও উত্তর নাই। এইরূপ কয়েকখানা বই পড়িয়া মনে

হইল, ঋষিগণ দিবা, রাত্রি, উষা, ঋতু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, সূর্য, অগ্নি, এই কয়েকটি নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিতেন। এমন যে কাঞ্চনবর্ণ মনোহারী চন্দ্র, যাহা আকাশে গমনাগমন করে, যাহার দীপ্তিতে রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হয়, যাহার নিয়মিত ক্ষয়-বৃদ্ধি সকলকেই বিস্মিত করে, তাঁহারা সে চন্দ্র দেখিতেন না? তাঁহার স্তুতি করিতেন না? তাঁহারা কিরূপে মাস গণিতেন? বিদ্বানেরা ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে সোম পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনায় সে সোম এক মাদক ওষধি। ঋষিগণ এই ওষধিকে দেবতা-জ্ঞান করিতেন এবং ঋগ্‌বেদে ১২০টি সূক্তে সে গাছটার স্তব করিয়াছেন। আশ্চর্য বটে! ঋগ্‌বেদে সোমের যে কীর্তি প্রশংসিত হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া পণ্ডিতেরা একটা গাছের কিম্বা তাহার রসের বিবেচনা করিলেন? যেমন, "হে সোম! চতুর্দিকে বৃষ্টি-বারি বাহির কর। তোমার চিরপরিচিত জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হউক" (ঋ ৯।৪১)। "এই হরিতবর্ণ (মূলে 'হরিঃ'। হরি বর্ণ পীতবর্ণ, হরিৎবর্ণ নয়।) সোম দ্যুলোকের জ্যোতিঃ এবং অন্তরীক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন করতঃ অধোগামী জল-সমূহে আবৃত হইয়া গমন করিতেছেন" (ঋ ৯।৪২)। "এই মরণ-রহিত বৃত্র-হননকারী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন" (ঋ ৯।২৮)। (রমেশ দত্তের অনুবাদ।) এইরূপ অসংখ্য স্থানে সোম-দেবতার স্তুতি আছে। প্রকৃত কথা এই, ঋগ্‌বেদে সোম চন্দ্র, ইন্দু নামেও পরিচিত। গুণসাদৃশ্যে ঋষিগণ ওষধি-বিশেষকেও সোম বলিতেন। সেহেতু চন্দ্রের যাবতীয় গুণ উদ্ভিদে থাকিতে পারে না। কোন্ বিশেষণ কোন্ দ্রব্যের তাহা প্রভেদ করিতে না পারিলে সোম বৃক্ষের রূপ ও গুণ নির্ণীত হইতে পারে না। দ্ব্যর্থ নাম প্রয়োগে ও সাদৃশ্য দর্শনে ঋষিগণের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সেই হেতু ঋগ্‌বেদের বহু স্থান দুর্বোধ রহিয়াছে। উল্লিখিত সোম-স্তুতি এবং ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের অপর প্রায় সমুদয় স্তুতি ইন্দ্রযজ্ঞাদিনের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল। সে যজ্ঞ সোম-যাগ। তাহাতে চন্দ্র সোম ও ওষধি সোম, দুই সোমই আসিয়াছে। এখানে ইহার ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। আর এক স্থানে (১০।৮৫।১-৪) এক ঋষি বলিতেছেন, "ঋত-প্রভাবে [আমরা এখন বলি, প্রকৃতির নিয়মে, যদিও তাহার কোন অর্থ নাই।] আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন। ঋত-প্রভাবে সোমও সেই স্থানে আছেন। সোমকে নক্ষত্রগণের ক্রোড়ে রাখা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত সোম, তাহা কেহই পান করিতে পারেন না। স্তোতাগণ সোমকে গুপ্ত রাখিয়াছেন।" এখানে বিদ্বানেরা সোমকে চন্দ্র না ভাবিয়া সোম-রস বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিলেন, এই সূক্ত ঋগ্‌বেদের শেষের দিকে রচিত। তৎকালে সোম শব্দের অর্থ চন্দ্র হইতেছিল। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সোমগাছের নাম চন্দ্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। সূক্তটি ঋগ্‌বেদের অন্তিমকালে রচিত বটে। কিন্তু প্রথমাবধি চন্দ্রের নাম সোম ছিল। এই ভুলে প্রায় শত বৎসর গত হইয়াছে। এই সেদিন ইং ১৯২৭ সালে প্রোফেসর উইন্‌টার্নিৎস্ সাহেব লিখিয়াছেন, বেদের সোম চন্দ্রই বটে।

চন্দ্রের এত উজ্জ্বল দীপ্তির, শীতল রশ্মির কারণ কি? কারণ, চন্দ্র সলিলময়, রবিকর সলিলে প্রতিফলিত হয় (ঋ ১।৮৪।১৫)। চন্দ্রের ক্ষয় হয়, কিন্তু নক্ষত্ররূপী দেবগণ ও পিতৃগণের জরা-মরণ নাই কেন? কারণ, চন্দ্র অমৃতময়, ইঁহারা সে অমৃত পান করিয়া অমর ও নির্জর হইয়াছেন। সূর্য কর পরিপূরণ করেন। ইন্দ্র সে সোম-রস পান করিয়া ধরাতলে বৃষ্টিরূপে প্রেরণ করেন। ওষধি সকল জন্মে ও বাড়ে। মনুষ্য পশ্বাদি সে বারি পান করিয়া জীবিত থাকে। চন্দ্রের সলিল অমৃতই বটে। বৃষ্টিবারি ক্ষীরঘৃতমধু-স্বরূপ। ঋষিগণ নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ জানিতে চাহিয়াছিলেন। কবি উৎপ্রেক্ষা দ্বারা কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এক শ্যেন পক্ষী উন্নত স্থান হইতে সোমকে ইন্দ্রযজ্ঞাদিনে ভূতলে আনিয়াছিল। পুরাণে গরুড় অমৃত আনিয়াছিল। পুরাণে দেবাসুরে ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত পাইয়াছিলেন। এই অমৃত, সোম বা চন্দ্র।

ঋষিগণ আকাশের সোমের গুণ-সাদৃশ্যে এক উদ্ভিদের নাম সোম রাখিয়াছিলেন। এই নাম তাঁহাদের প্রদত্ত প্রিয় নাম। আদ্যকালে এই গাছ নিকটে গ্রামে পাইতেন না, সোম হিমালয়ের মূজবান পর্বতে জন্মিত। মূজবান্‌মুঞ্জবান্, মুঞ্জতৃণাচ্ছন্ন পর্বতপার্শ্বে। (মুঞ্জতৃণ শরগাছ তুল্য, ইহা হইতে সুন্দর চিক্কণ "শর-মাঁজা" দোড়ী হয়। মনুসংহিতায় মুঞ্জের মেখলা।) কৈলাস-দর্শনে যাইতে হইলে মুঞ্জাচ্ছন্ন প্রদেশ পার হইতে হয়। এখানকার সোমগাছ উত্তম বিবেচিত হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পঞ্জাবের নদীকূলে ও কুরুক্ষেত্রের সরোবরের তীরে পাওয়া যাইত। যথা, "যে সোম অতি দূরদেশে, অতি সন্নিহিত দেশে, পঞ্চ জনপদে, কুরুক্ষেত্রের সরোবরে, সরস্বতী প্রভৃতি নদীর তীরে পাওয়া যায়" (ঋ ৯।৬৫।২২,২৩)। অতএব সোম গাছ দুর্লভ ছিল না, পার্বত্যও ছিল না। কৃষিজাত নয়, স্বচ্ছন্দবনজাত। এমন গাছ লুপ্ত হইতে পারে না।

খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দে কৌটিল্য ব্রহ্ম-সোমের অরণ্য ব্রাহ্মণ ও যতিদিগের ভোগের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-সোম নিশ্চয় বৈদিক সোম। কৌটিল্যের সময় তাহার অরণ্য হইয়াছিল। সে অরণ্য গ্রাম হইতে দূরেও ছিল না। পঞ্জাবের নদীতীরের সোম, বিহারের সোমারণ্য কোথায় গেল? নিশ্চয় আছে, বিস্মৃত হইয়াছে। কি নামে হইয়াছে?

ব্রজলালবাবু জানিতেন না, চন্দ্রও সোম। সোম বৃক্ষের উল্লিখিত নিম্নভূমি জন্মস্থানও জানিতেন না। কি দেখিয়া তাঁহার মনে ভঙ্গা আসিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট লেখেন নাই। তিনি পাইয়াছিলেন, বৈদিক গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, উ-শানা নামক বৃক্ষ পর্বতে জন্মে। তাহারা এখানে আসিলে ঋষিগণ শোধন করিয়া সোম করিতেন। ব্রজলালবাবু দেখাইয়াছেন, হিমালয়ের কিরাতদিগের ভাষায় অনেক বিশেষ্য শব্দের আদ্যে উ যুক্ত হয়। সে গাছের তদ্দেশীয় নাম শানা বা শন। শন বা শণ ভঙ্গার নামান্তর। অতএব শণ গাছেরই বৈদিক আর্য নাম সোম। সেই শণ শব্দ হইতেই গ্রীক ভাষায় 'কন্' এবং ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় শব্দ আসিয়াছে।

সোমের দেশীয় নাম শণ ছিল, আমি এই আবিষ্কার সত্য মনে করিয়া সোম-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। দেখিতেছি সোমের উৎপত্তিস্থান ও ভঙ্গার উৎপত্তিস্থান একই। পশ্চিম হিমালয় হইতে আসামের পূর্ব পর্যন্ত ভঙ্গার অরণ্য আছে, হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণেও বিস্তৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ

দিয়া বহু দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছে। বিহারে, মালদহে তাং বৎসর বৎসর বর্ষাকালে উৎপন্ন হয়। সাত-আট পরে শুখাইয়া মরিয়া যায়। ভঙ্গা-বিশেষের যথাকালের পাতা হইয়া বাজারে সিদ্ধি নামে বিক্রয় হইতেছে।

সোম-রস পান করিলে কি ক্রিয়া হইত, ঋগ্‌বেদে ইতস্তত আছে। তাহা একত্র করিলে আয়ুর্বেদে পাওয়া যায়। যথা, খৃষ্ট শতাব্দের ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রদত্ত হইয়াছে।

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিনী পাচনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমদবাগ্‌বহ্নি-বর্দ্ধিনী।

ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া ভঙ্গার নাম। ভঙ্গা কফনাশক, তিক্ত রস, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য পিত্ত বর্ধক, মোহজনক, মদকারক এবং বাক্য ও অগ্নিবর্ধক। ভঙ্গার নাম মাতুলানী অমরকোষেও আছে। (ধুতুরা মাতুল) বিজয়া নামও প্রসিদ্ধ। রাজসাহী জেলায় গঞ্জা বা গাঁজার চাষ হইতেছে। পূর্বকালে গাঁজার ধূমসেবন অজ্ঞাত ছিল। ঋগ্‌বেদে সোম তিক্তরস, লঘু ও পিত্তবর্ধক এই এই গুণ নাই। কিন্তু আর এক গুণ আছে, সোম রসায়ন। মানুষ রসায়ন হইতে দীর্ঘ আয়ুঃ, আরোগ্য, তরুণতা, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল লাভ করিয়া থাকে। চন্দ্রের অমৃত পান করিয়া দেবগণ জরা-মরণ-রহিত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ মনে করিতেন, সোমরস পান করিলে অমৃত তুল্য গুণ হয়।

সোমরস প্রস্তুত করিবার সময় প্রথমে সোমের ডাঁটা, পাতা জলে ধুইয়া লইতে হইত। তাহাতে শুখনা ডাঁটা ও পাতা ফুলিয়া উঠিত। তারপর চর্ম পাতিয়া তদুপরি শিল-নোড়া দিয়া বাটা হইত। পরে কলসের জলে গুলিয়া মেষ-লোম দ্বারা ছাঁকা হইত। পরে এক কলস হইতে অন্য কলসে বারম্বার ঢালা হইত। যে হরিদ্বর্ণ জল পাওয়া যাইত, সে জলের নাম সোমরস। তাহাতে কেহ দুগ্ধ, কেহ দধি, কেহ যবের ছাতু, কদাচিৎ কেহ মধু মিশাইয়া পান করিত। পিষ্টক ও মাংস ভক্ষণের মাঝে মাঝে একটু একটু পান করিত। কেহ কেহ সোমরস সহ্য করিতে পারিত না। কেহ সুগন্ধ, কেহ দুর্গন্ধ মনে করিত। কখন কখন সোম ঘোটা হইত। সিদ্ধির প্রস্তুত-প্রণালীও এই দুই। সিদ্ধি শব্দের অর্থ নিষ্পত্তি। বোধ হয়, পূর্ণ নাম বিজয়া-সিদ্ধি। সোম নিষ্পত্তির বৈদিক নাম অভিষব, উৎপাদন। ইহার অর্থ পচাইয়া, গাঁজাইয়া মাদক করা নয়। দিনের তিন বেলায় তিনবার সেবন হইত। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাড়ী ভিন্ন আর কিছুই মদকর হইতে পারে না। অতএব সোমের পাতাই মদকর হইত।

সোম গাছ কি রকম? সোম ওষধিপতি বটে, অর্থাৎ ওষধির মধ্যে প্রধান। এক স্থানে 'বনস্পতি' হইয়াছে, ইহা অতিশয়োক্তি, কারণ, বনস্পতি বৃহৎ তরু, যেমন অশ্বত্থ। একস্থানে 'বীরুধ' বলা হইয়াছে। যে বনস্পতি, সে বীরুধ হইতে পারে না। বোধহয়, বীরুধ শব্দের অর্থ গুল্মিনী, শাখা-পত্র বিশিষ্ট হইয়া নুইয়া পড়ে। ভঙ্গা গাছও এইরূপ হয়। ভঙ্গার পাতা করাঙ্গুলীর তুল্য বিভক্ত, সোমের পাতাও সেইরূপ। বহু স্থানে সোমের অঙ্গুলীর উল্লেখ আছে। সোমের অংশ ছিল, ভঙ্গারও আছে। সোম নিষ্পত্র কোথাও নাই। রমেশ-দত্ত মহাশয় অনুবাদে ভুল না করিয়া থাকিলে সোম বহুপত্র (ঋ ১।৬৬।৩)। সোম হরিদ্‌ বর্ণ, দুগ্ধ-মিশ্রিত হইলে শ্বেত বর্ণ। আর যে শুভ্রবর্ণ, পীতবর্ণ, অরুণ বর্ণ, পিঙ্গল বর্ণ, লোহিত বর্ণ আছে, সে সব চন্দ্রের বিশেষণ। কাঁচা গাছ পাওয়া যাইত না, যেমন গ্রীষ্মকালে। সুতরাং গাছ ছেঁচিয়া নিঙড়াইয়া রস পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিব্বতী ভাষায় ভঙ্গা গাছের নাম সোমরস।

ঋগ বেদের কালে সোম ও সুরা, দুই-ই ছিল। কিন্তু যজ্ঞ-কর্মে সোমরস এক্ষণেও দেখিতেছি; মদ্যপান অতিশয় নিন্দনীয়, কিন্তু ভঙ্গা-সেবনে নিন্দা নাই। বিহারে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উৎসবকালে ভঙ্গা-সেবন অতিশয় প্রচলিত আছে! পঞ্জাবে গ্রীষ্মকালে ভঙ্গার নাম 'ঠাণ্ডাই'। দয়াশীল লোকে পথিককে দান করেন। বঙ্গদেশে বিজয়া-দশমীর দিন সন্ধ্যাকালে সিদ্ধি-পান বিহিত আছে। বিজয়া-দশমী, যে দশমীতে বিজয়া-পান কর্তব্য, এই অর্থ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে ইহা বৈদিক বিধি। বেদে কপর্দী রুদ্র সোমরস পাইতেন, এক্ষণে তিনি ভঙ্গা পাইতেছেন।

যদি সোম ভঙ্গাই হয়, আর পঞ্জাবে ও বিহারে ভঙ্গা অতিশয় সুলভ, তবে চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায় সোম কাল্পনিক হইল কেন? উভয়েই বহুবিধ রসায়ন-যুক্তি (Recipe) বর্ণিত হইয়াছে। চরক লিখিয়াছেন, সোম নামক ওষধিরাজের পঞ্চদশ পত্র আছে। সোম চন্দ্রের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সোম ওষধিরও তেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এইরূপ আরও সাতটি ওষধির উল্লেখ করিয়াছেন। শেষে লিখিয়াছেন, রসায়ন-সেবীর দিব্য-চক্ষুঃ ও দিব্য-কর্ণ হয়, যোজন সহস্র গতি এবং নিরুপদ্রবে দশ সহস্র বৎসর আয়ুঃ হয়। সুশ্রুত আট ওষধির স্থানে চব্বিশ ওষধির উল্লেখ করিয়াছেন। "সোম এক হইয়াই স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্যভেদে চতুর্বিংশতি প্রকারে ভিন্ন হইয়াছেন। ভগবান্‌ ব্রহ্মাদি স্রষ্টৃগণ জরামৃত্যু-বিনাশের নিমিত্ত সোম নামক অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যথা, অংশুমান্‌, মুঞ্জবান্‌ ইত্যাদি।

সর্ব্ব এব তু বিজ্ঞেয়াঃ সোমাঃ পঞ্চদশচ্ছদাঃ।
ক্ষীরকন্দলতাবন্তঃ পত্রৈর্নানাবিধৈঃ স্মৃতাঃ।

সকল সোমেরই পঞ্চদশ পত্র, সকলেরই ক্ষীর, কন্দ ও লতা আছে, সকলেরই পত্র নানাবিধ। হিমালয়, অর্বুদ পর্বত, নদী ও হ্রদ সোমের জন্মস্থান, কিন্তু অধর্মিষ্ঠ ও কৃতঘ্ন মানবেরা তাহাদের দর্শন পায় না।" সে যাহা হউক, এই সকল সোমের পঞ্চদশ পত্র, চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা, শুক্লপক্ষে এক এক কলা বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্চদশ হয়, কৃষ্ণপক্ষে এক এক কলা হানি হইয়া নিষ্পত্র হয়। ক্ষীর চন্দ্রের পীযূষ, কন্দ একাদশী-দ্বাদশী চন্দ্রের আকৃতি, লতা কলা-চন্দ্রের বক্রতা। দেখা যাইতেছে, চরক-সুশ্রুতের সময়ে লোকে সোম-বৃক্ষ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। সোম দেবভোগ্য অমৃত, মানুষে কোথায় পাইবে? চরক ও সুশ্রুত শণের পত্র, পুষ্প, বীজের গুণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, চরকে (১।২৭।৭৮) শণপুষ্প গ্রাহী, (৬।১৯।৫৪) শণবীজ গ্রহিণী রোগে। সুশ্রুতে (১।৪৬।২৫৯) শণপত্র সংগ্রাহী, (১।৪৬।২৯৮) শণপুষ্প মধুরবিপাক

রক্তপিত্তহর, (৪।২৭।১১) শণফল রসায়ন। "যে নর দুগ্ধের সহিত শণ-ফল সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করে, তাহার বয়স কখন গলিত হয় না।" কিন্তু তখন কি লোকে ভাং খাইত না? আয়ুর্বেদ-কর্তারা ভাঙ্গ-সেবনের গুণ বর্ণনা করিলেন না কেন? ক্ষেত্র-ভেদে দ্রব্যের বীর্যের ভেদ হয়। সকল ভঙ্গার, সকল স্থানের ভঙ্গার, অকালে সংগৃহীত পাতার বাঞ্ছিত মাদক থাকে না। তাহারা উত্তম মদকর ভঙ্গা চিনিত। শণপত্র, শণপুষ্প, সংগ্রাহী শণ-ফল রসায়ন; কিন্তু শণপত্র-রস মাত্রাধিক সেবন করিলে, লোকে বকে, হাসে, গান গায়, মনে করে শূন্যে উড়িয়া যাইতেছেন, ইত্যাদি গুণ লক্ষিত হয় নাই কি? পরিচিত শণই যে দেবদুর্লভ সোম, বোধ হয়, আয়ুর্বেদ-কর্তাদের মনে উদিত হয় নাই। আমি The Soma Plant.—The Indian Historical Quarterly, Vol. xv, 1939 সোম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, দুই-এক স্থানে ছাপার ভুল হইয়াছে।

শণ ভঙ্গার এক নাম, অথর্ব বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শণ গ্রাম্য 'ধান্যে'র একটি শ্রেণী ছিল। ধান্য ধান্যের তুল্য খাদ্যশস্য। ইহার চাষ হইত, শণবীজ ভক্ষ্য ছিল। কৃষি-জাত ও বন্য শণের সূত্র ও বস্ত্র নির্মিত হইত। সে বস্ত্রের নাম শাণ। মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারী শাণবস্ত্র পরিতেন। কি কারণে বলিতে পারা যায় না, অমরকোষে ভঙ্গার এক নাম শণ নাই, কিন্তু হেমচন্দ্রকোষে আছে। ভঙ্গা-শণের সূত্রের সাদৃশ্যে বর্তমান-কালে পরিচিত পীতপুষ্পা শণ নাম হইয়াছে। চলিত বাঙ্গলায় ইহার নাম ফুল-শণ। কারণ পাট-শণ ছিল, আছে। ফুল-শণের বীজে তৈল নাই। বীজ অখাদ্য, বমনকারক। ভঙ্গার কোন গাছে বীজ হয়, কোন গাছে হয় না। যেমন তালগাছের পুং-স্ত্রী ভেদ আছে, ভঙ্গার তেমন আছে। ইয়োরোপে বিশেষতঃ রুষদেশে ভঙ্গার বিস্তর চাষ হয়। বীজ হইতে তৈল এবং অংশু হইতে বস্ত্র হইতেছে। সে বস্ত্রের ইংরেজী নাম কান্‌ভাস্, আমরা বলি কেম্বিস্।

এই প্রবন্ধের আরম্ভে কটকে প্রাপ্ত সোম-লতার বর্ণনা করিয়াছি। ইহা অবশ্য বেদের সোমলতা নয়। বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার কি নাম ছিল? ব্রজলালবাবু লিখিয়াছেন, পণ্ডিত মধুসূদন এক অজ্ঞাতনামা বৈদ্যক গ্রন্থ হইতে সোমের বর্ণনা তুলিয়াছেন। যথা—

শ্যামলাম্লা চ নিষ্পত্রা ক্ষীরিণী ত্বচি মাংসলা।
শ্লেষ্মলা বমনী বল্লী সোমাখ্যা ছাগভোজনম্‌।

সোমা শ্যামলা, অম্লা, নিষ্পত্রা, ক্ষীরিণী, ত্বকে মাংসলা। শ্লেষ্মলা, বমনী ও ছাগভোজন। পূর্বোল্লিখিত সোমলতা এইরূপ, কিন্তু রাজনির্ঘণ্টুতে সোমা আরও দুই গাছের নাম। যথা,

সোমাখ্যা মহিষীবল্লী ব্রাহ্মী হেমলতাঃ স্মৃতাঃ।

মহিষীবল্লী, ব্রাহ্মী ও হেমলতা, এই তিন গাছ সোমাখ্যা। মহিষী-বল্লীই কটকের সোমা। দ্রষ্টব্য, নামটি সোমলতা বা সোমবল্লী নয়। নাম সোমা। বল্লী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এই হেতু সোমা, পুংলিঙ্গ হইলে নাম সোম হইত। সোমের কোন্‌ গুণ সাদৃশ্যে এই লতার নাম সোমা হইল? ক্ষীরিণী বলিয়া? লতাটি ছাগভোজন, মহিষ-ভোজন হইতে পারে, কিন্তু নর-ভোজন হইতে পারে না, কারণ, বমনী। আমি তিন সোমার মধ্যে হেমলতা চিনি না। ব্রাহ্মী বিখ্যাত ঔষধ। ব্রাহ্মী-সেবন করিলে মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতি বৃদ্ধি হয়। অতএব ইহার এক নাম সরস্বতী। সোমপান (অথবা ভঙ্গাপান) করিলে কণ্ঠে সরস্বতীর আবির্ভাব হয়; বোধহয়, এই কারণে ব্রাহ্মী শাকের সোমা নাম হইয়াছে।

আয়ুর্বেদোক্ত সোমলতা ভিন্ন গাছ। ইহার বাঙ্গালা নাম আলগ্‌ লতা, যাহা ভূমিলগ্ন থাকে না। এই লতা বৃক্ষাদনী অর্থাৎ আশ্রয়-বৃক্ষ ভক্ষণ করে। নিষ্পত্র, পীতবর্ণ সরু দোড়ীর আকারে আশ্রয়ের শাখা ছাইয়া ফেলে। (এইরূপ আর এক বৃক্ষাদনী পীতবর্ণ সূত্রবৎ লতা আছে। তাহার নাম আকাশ-বল্লী, বাঙ্গালা নাম আকাশবাণী।) সোমবল্লী, সোমলতা, সোম-ক্ষীরী, দ্বিজপ্রিয়া, যজ্ঞনেত্রী, যজ্ঞবল্লী, ধনুঃ ইত্যাদি অনেক নাম আছে। চন্দ্রবৎ পীতবর্ণ বলিয়া নাম সোমলতা। লতাটি কিঞ্চিৎ ক্ষীরীও বটে। পূর্বকালে অরণিযোগে অগ্নি উৎপাদন করিতে হইত। ঊর্দ্ধ্ব অরণিকে সরু দোড়ী দিয়া টানা হইত। সে দোড়ীর নাম 'নেত্র'। অগ্নি যজ্ঞীয় প্রথম অঙ্গ। সেই নেত্র সাদৃশ্যে সোমলতা যজ্ঞনেত্রী, যজ্ঞবল্লী, দ্বিজপ্রিয়া ইত্যাদি। এইরূপ, অনেক গাছের নামে সোম বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। কোথাও সোম শ্বেত বর্ণ, কোথাও পীতবর্ণ। সোমলতা সোমবর্ণা লতা।

আমার শেষের দিন

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে ধু ধু করে লেলিহান দারিদ্র্য কঠোর
একা আমি বসে দেখি জনহীন গ্রাম মরুময়—
কল্পনার মায়াযুগ আজ দেখি কোথা গেল মোর?
শৈশবের যাত্রাক্ষণে যার সাথে ছিল পরিচয়।
জীবনের কোলাহল গ্রামে গ্রামে আনন্দ প্রচুর
কে কোথায় গেল চলি ছাড়ি নিজ সাধের ভিটায়—
আনন্দের বেণুবনে কোথা সুর তন্দ্রালু মধুর
বিরহের যমলোকে ভরে প্রাণ স্মৃতির জালায়।

জননীর শেষ দিন আজো মাখা গ্রামের কুটীরে
অশোক শেফালী কাঁদে যে ঘরের শূন্য আঙিনায়—
তাহার স্মরণে প্রাণ দূরে আজ ভাসে আঁখিনীরে
স্বদেশ জননী মোর প্রবাসীর আনন্দ কোথায়?
যেথায় যেভাবে রহি হে জননী তোমা ভুলিব না
প্রবাস বিরহী মন নিত্য রবে তোমার কুলায়—
অশ্রুর উৎসব মাঝে কুড়াইব স্মরণের কণা
আমার শেষের দিন তব সাথে লইব বিদায়।

কোচবিহারাধিপতি শ্রীমন্নরনারায়ণ দেবের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মণ এম-এ, বি-সি-এস্

বিগত ১৯৩৮ সনের জুন মাসে মালদহ জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত মির্জ্জাপুর গ্রাম নিবাসী জনৈক মুসলমান কৃষক ভোলাহাট থানার ৩নং জামবাড়ীয়া ইউনিয়নের কোন গ্রামে ভূমিকর্ষণকালে একটী তাম্রপাত্রে রক্ষিত তিন শত প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রার সন্ধান পায়। স্থানীয় দফাদার এই সংবাদ পাইয়া মুদ্রাগুলি ভোলাহাট থানার তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে বুঝাইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় তখন মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এ বিষয় অবগত হইয়া মুদ্রাগুলি আনাইয়া ইহাদের পাঠোদ্ধার করেন। তদবধি মুদ্রাগুলি স্থানীয় বি, আর, সেন মিউজিয়ম গৃহে রক্ষিত আছে।

এই মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশই গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্, নছরৎ শাহ্, ফিরোজ শাহ্ ও মহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলির মধ্যে ছয়টী দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজন্যবর্গের ও দশটী হিন্দুরাজাদিগের নামাঙ্কিত। শেষোক্ত দশটী মুদ্রার মধ্যে পাঁচটী কোচবিহারাধিপতি শ্রীমন্নরনারায়ণদেবের ও বাকী পাঁচটী ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যদেবের। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি গৌড় অঞ্চল হইতে ত্রিপুরাধিপতিগণের আরও কয়েকটী প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোচবিহারাধিপতি নরনারায়ণদেবের মুদ্রাগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোচবিহারের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মুদ্রাগুলির পাঠ নিম্নলিখিতরূপ :—

শ্রীশ্রীশিবচরণ কমল মধুকরস্য

শ্রীশ্রীমন্নরনারায়ণ ভূপালস্য শাকে ১৪৭৭

সবগুলি মুদ্রারই পাঠ ও শকাব্দ এক। একপৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীশিবচরণকমলমধুকরস্য" ও অন্যপৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীমন্নরনারায়ণ ভূপালস্য শাকে ১৪৭৭" লিখিত আছে। ১৪৭৭ শকাব্দে মহারাজ নরনারায়ণভূপ সিংহাসনারোহণকালে এই মুদ্রা প্রচলন করেন বলিয়া মনে হয়। এই সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম কোচবিহারে "নারায়ণী মুদ্রা" প্রচলিত হয়।

একই শাকের মুদ্রা হইলেও মুদ্রাগুলির আকৃতি ও লেখার ছাঁচ বিভিন্ন রকমের। ইহার কারণ হয়ত এই যে তখন বর্ত্তমান যুগের ন্যায় টাঁকশাল ছিল না। বিভিন্ন কারিগর দ্বারা বিভিন্ন ছাঁচে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে হইত। মুদ্রাগুলি খাঁটি রূপার তৈরী—এবং ওজনে এক তরির কিছু বেশী। লেখাগুলি অতি প্রাচীন বাংলা অক্ষরের।

কোচবিহার রাজবংশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী আছে। প্রচলিত প্রবাদ এই যে হাজো নামক এক কোচ সর্দ্দারের হীরা ও জীরা নামে দুই কন্যা জন্মে। জীরার গর্ভে জলপাইগুড়ীর বর্ত্তমান রায়কত বংশের আদিপুরুষ শিশু সিংহ ও হীরার গর্ভে দেবাদিদেব মহাদেবের ঔরসে বিশু বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্বনাথ সিংহ হইতেই কোচরাজবংশ প্রসিদ্ধিলাভ করে। রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানের মতে বিশ্বনাথ ১৪০৫ শকে ২২ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি মিথিলা হইতে মৈথিল ও শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে গুরু ও পুরোহিত করেন এবং পৈতৃক বাসস্থান চিকনা পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া কোচবিহারের সমতলক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪৭৬ শকাব্দে (১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

অতঃপর ১৪৭৭ শকাব্দে নরনারায়ণ রাজা হন। রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যান মতে বিশ্বনাথের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ, মধ্যম নরনারায়ণ ও কনিষ্ঠ চিলারায় বা শুক্লধ্বজ। রাজখণ্ডে বর্ণিত আছে, জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহ নরনারায়ণের বিবাহকালে নববধূকে আশীর্ব্বাদ করেন যে তিনি রাজরাণী হইবেন। কিন্তু বিশ্বনাথের সংসার ত্যাগের পর নৃসিংহের অভিষেকের আয়োজন হইলে, নরনারায়ণের পত্নী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নৃসিংহকে অভিবাদন করিয়া বলেন, "আপনি আমার বিবাহের সময় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমি রাজরাণী হইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনি রাজা হইতেছেন। আমি কিরূপে রাজরাণী হইব? আপনার কথা বোধ হয় মিথ্যা।" নৃসিংহ সস্নেহে বলিলেন, "মা, তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ। তুমিই রাজরাণী হইবে।" তৎক্ষণাৎ তিনি নরনারায়ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার আদেশ দিয়া সংসার বিরাগী হইলেন।

এই বর্ণনা সত্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ নরনারায়ণ বিশ্বনাথের পুত্র এবং নৃসিংহের অনুজ ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক পণ্ডিত রাম সরস্বতীর মতে বিশ্বসিংহের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই; তাহার কন্যার গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য মুদ্রাগুলিতে নরনারায়ণের কোন মহিষীর উল্লেখ নাই। সমসাময়িক হিন্দুরাজাদের মুদ্রায় পাটরাণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে রাজা হইবার সময় নরনারায়ণ অবিবাহিত ছিলেন। আবুল-ফজলের আকবরনামায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে উল্লিখিত আছে যে "বালগোঁসাই (নরনারায়ণ) প্রথমে বিবাহ করেন নাই, তজ্জন্য প্রথমে তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র পাটকুমারকে যুবরাজ স্থির করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভ্রাতা শুক্র গোঁসাইয়ের অনুরোধে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফল লক্ষ্মীনারায়ণ।"(১)

কোচবিহার রাজ্যের কিয়দংশ পূর্ব্বে কামরূপ ও কিয়দংশ পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ তখন তাহাকে বাধা দিতে পারেন নাই।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজা নরনারায়ণ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন।(২) ইহা সত্য নহে। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রায় "শিবচরণকমলমধুকরস্য" এই বিশেষণের উল্লেখ থাকায় তিনি শৈব ছিলেন ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

আমাদের আলোচ্য মুদ্রায় শ্রীমন্নরনারায়ণের নামের শেষে "ভূপাল" শব্দের প্রয়োগ আছে। এই "ভূপাল" শব্দই ক্রমে "ভূপ" শব্দে পরিণত হইয়া অদ্যাবধি কোচবিহার নৃপতিগণের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

নরনারায়ণদেবের আর কোন মুদ্রা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানি না। উপরোক্ত আলোচনা কোচবিহার রাজবংশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য করিলেও আমাদের এই শ্রম সার্থক মনে করিব।

---

(১) বিশ্বকোষ—চতুর্থ ভাগ—কোচবিহার—পৃঃ ৫২২।

(২) গৌড়ের ইতিহাস—২য় খণ্ড—৺রজনী চক্রবর্ত্তী কৃত—পৃঃ ১৬৭।



কথা, সুর ও স্বরলিপি :—জগৎ ঘটক

আবার, আষাঢ় আসিল ফিরে।
কালো কুন্তল এলায়ে—
আকাশ বাতাস ঘিরে ॥
নব যুঁথিমালা গলে—
দোলেরে—আজি দোলে,
কাজল নয়ন ভাসে আঁখি-নীরে ॥

কদম কাননে—কেয়াফুল বনে—
লাগিল পুলক দোলা—
নন্দন-বন-চারী বিরহিনী—কে গো—
এলোরে পথ-ভোলা।
অলকনন্দা মেঘরথে—
আসিল সুরলোক হ'তে—
এলো কি চাহিয়া ধরণীরে ॥

{গা -মা গমা -পা II পা পমা -ধপা মা ¦ জ্ঞা জ্ঞরা সরা -ন্‌া ¦
আ • বা • য়্ আ ষা • • ঢ়্ আ সি ল • ফি • •

সা -া -া -া } | -া -া -া -া I
রে • • • • • • •

া পা -া পা | পা -ধা পা মা | পা ধা ণা -া | -া -া -া -া I
• কা • লো কু ন্ ত ল এ লা য়ে • • • • •

পা পর্সা র্সা র্সা | ণা পা মপধা -মপা | মজ্ঞা -া -া -া | রজ্ঞা -সরা রপা -া II
আ কা শ বা তা স ঘি • • • • রে • • • • আ • • • বা য়্

-া -া -া -া II না -া না না | না -া না না | ধনা -ধনা নর্সা -া | -া -া -া -া I
• • • • ন • ব যুঁ থি • মা লা গ • লে • • • • •

নর্সা -নর্সা পনা -র্সর্া | র্সর্া ণা ণা ণা | পধা -পধা -র্সণা -র্সণা | ধা পা -া -া I
দো • • • লে • • • রে • • আ জি দো • • • • • লে • • •

পা -পধা পা মা | পা ধা ণা -া | ধা -ধর্সা র্সা ণা | ণা পা মপা মজ্ঞা I
কা • • জ ল ন য় নে • ভা • • সে আঁ খি • নী • রে •

রজ্ঞা সরা পা পপা | জ্ঞা জ্ঞরা সরা -ন্া | সা -া -া -া | গা -মা গমা -পা II
আ • ষা • ঢ়্ আ সি ল • ফি • • রে • • • আ • বা • য়্

-া -া -া -া II সা সজ্ঞা জ্ঞা সা | সজ্ঞা -া জ্ঞা -া | সা জ্ঞা মা পা | জ্ঞমা -জ্ঞরা সন্া -সা I
• • • • ক দ ম কা ন • নে • কে য়া ফু ল ব • • • নে • •

মপা -া পা মা | পা ধা ণা ধা | পধা -মপা -া -া | -া -া -া -া I
লা • গি ল পু ল ক দো লা • • • • • • • • •

-পা র্রা র্রা র্রা | না র্সা দা পা | পা দা পা মা | পা -দা দর্সা -া I
ন ন্ দ ন ব ন চা রী বি র হি নী কে • গো •

{পা দা পদা -মপা | (-া -া -া -া | রজ্ঞা সরা রপা -া | -া -পধা -পা -া)} I
এ লো রে • • • • • • • এ • লো • রে • • • • • •

মপা -পমা জ্ঞা রা | সা -া -া -া | -া -া -া -া I
প • • • থ ভো লা • • • • • • •

পা -া পা পা | মা -পা মজ্ঞমা -জ্ঞমা | পা না না না | র্সা -া -া -া I
অ • ল ক ন ন্ দা • • • মে • ঘ র থে • • •

পনা -র্সর্রা -া র্রর্সা | র্সর্রা -া ণা ণা | ধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
আ • • • • সি • ল • • মু র লো • ক হ' তে • • •

পা পদা পদা -মপা | -া -া -া -া | রজ্ঞা সরা রপা -া | -া -া -া -া I
এ লো কি • • • • • • এ • লো • কি • • • • • •

পা পর্সা র্সা র্র্সা | ণা ণা ধা পা | মপধা -মপা মজ্ঞা -া | রজ্ঞা -সরা রপা -া II II
এ লো কি চা হি য়া ধ র ণী • • • • রে • • আ • • • বা য়্

ছোট কথা

শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার

ঠাকুরদা মহাশয়* একদিন পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বঙ্কিমবাবু এসেছিলেন, দেখলাম তাঁর জামার গলার বোতাম খোলা; তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'র, তিনি কি তাঁ'র জামার গলার বোতাম প্রায়ই খু'লে রাখেন?" বঙ্কিমবাবুর সহিত পিতৃদেবের যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি তাঁহাকে সে কথা বলিলেন। শুনিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তিনি একজন সদরওয়ালা মানুষ, তিনি এসব দিকে নজর দেন কেন?" পিতৃদেব আসিয়া বঙ্কিমবাবুর কথা ঠাকুরদা মহাশয়কে বলিলেন; সেই কথা শুনিয়া ঠাকুরদা মহাশয় গম্ভীর হইয়া গেলেন, পরে বলিলেন, "বঙ্কিমবাবুকে ব'ল আমি লক্ষ্য করেছি,

* প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা—সাহিত্যিক গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়।

Geniusরা গলার কাছে কোন বাঁধন, এমন কি গলায় বোতাম দেওয়াও সহ্য করতে পারেন না." সেই কথা পিতৃদেব বঙ্কিমবাবুকে জানাইলেন। শুনিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তিনি ঠিকই Observe করিয়াছেন, আমার Remarks করাটা ঠিক হয় নাই।"

'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণেতা বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহার সহিত তাঁহার বন্ধু বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় ও বাবু কেদারনাথ বসু মহাশয়ও প্রায়ই আসিতেন। একবার তাঁহারা তিন জনে আসিলেন। তাঁহাদিগের আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে রজনীবাবুর একটি কন্যা হয়। কন্যার কি নাম রাখা হইবে তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা হইল; কিন্তু কোন নামই স্থির হইল না। পরদিন রজনীবাবু আসিয়া সকলকে বলিলেন, "নাম ঠিক হ'য়েছে, মেয়ের নাম রাখব 'ছায়া'।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, "এত নামের মধ্যে আপনার এ নাম পছন্দ হ'ল কেন?" তিনি বলিলেন, "বুঝছেন না—মেয়ে যখন বড় হয়ে জামাইকে পত্র লিখবে 'ইতি। তোমারই ছায়া' তখন কেমন শুনাবে!"

একদিন পিতৃদেব রাণাঘাটে যাইতেছিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া নূতন জুতা জোড়াটি খুলিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে থাকেন। সেই গাড়ীতে একজন 'মেম' ছিলেন, সে সময় মেমরা খুব ঘেরাল 'গাউন' পরিতেন। মহিলাটি যখন নামিয়া যান, তখন তাঁহার গাউনে জড়াইয়া পিতৃদেবের একপাটি জুতা একটা প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া যায়। গাড়ী ছাড়িবার পর পিতৃদেব তাহা বুঝিতে পারেন এবং পরের ষ্টেশনে নামিয়া পূর্ব্বের ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করিয়া দেন যে, তাঁহার একপাটি জুতা ষ্টেশনের 'প্লাটফর্ম্মে' পড়িয়া গিয়াছে, তুলাইয়া রাখিবেন, তিনি পরের ট্রেনে যাইয়া লইয়া আসিবেন। পরের ট্রেনে তিনি যাইয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিলেন, "জুতার পাটিটা দিয়া দিন।" ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, "Babu, who will identify?" এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব জুতার দ্বিতীয় পাটিটি কাগজের মোড়ক হইতে খুলিয়া তাঁহার মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "This will identify it।" ষ্টেশন-মাষ্টার হাসিয়াই অস্থির।

মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা তখনকার দিনে প্রায়ই তাঁহার দেশের বাড়ীতে অর্থাৎ চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। একদিন পিতৃদেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন গেলে তখন দুর্গাচরণবাবু (তখনও 'মহারাজ' হন নাই) কি করছিলেন?" পিতৃদেব বলিলেন, "তিনি তখন বিন্তি খেলছিলেন।" ঠাকুরদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর খেলায় কিছু বৈশিষ্ট্য দেখলে?" পিতৃদেব বলিলেন, "তিনি 'পিট' পাইলেই নিচ্ছিলেন; পঞ্চাশ কি শ' করবার জন্য বসে থাকছিলেন না।" ঠাকুরদা মহাশয় বলিলেন, "তাঁ'র character-এর একটা side তুমি লক্ষ্য করেছ। ব্যবসাতেও তিনি প্রচুর লাভের জন্য বসে থাকেন না।"

কাশীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ধাত্রীগ্রামের কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় একবার ঠাকুরদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে আসেন, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয়ের একটি পৌত্র হইয়াছিল। ঠাকুর্দামহাশয় শিরোমণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতির কি নাম রেখেছ?" শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন, "গিরিজা (গিরিজা) মোহন।" শুনিয়া ঠাকুদা মহাশয় বলিলেন, "বা! বেশ নাম হয়েছে। এইবার নাতনী হ'লে তা'র নাম রেখ 'মসজিদ্ মোহিনী'।"

বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে দেওঘর গিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আমাদের দেওঘরের বাড়ী রেলের ধারেই, সেই রেলের অপর পার্শ্বে 'অমৃত বাজার পত্রিকার' শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটি। তিনি তখন রেল লাইনের ধারে বেড়াইতেছিলেন, সারদাবাবুকে দেখিতে পাইয়াই রেল লাইন পার হইয়া আসিয়া বলিলেন, "সারদা, শ্যামও রইল, কূলও রইল! এ কেমন ক'রে পারলে? আমরা ত পারিলাম না!" সেইদিনই সংবাদ আসিয়াছিল, উকিল সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টে জজ হইয়াছেন।

পিতৃদেবের সঙ্গে বারাসতের কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় চুঁচুড়ার দীননাথ ধর মহাশয় ও আমি, বর্দ্ধমানের মহারাজার (মহারাজা বিজয়চাঁদ) সহিত দেখা করিতে তাঁহার গৃহে যাই। সেখানে যাইয়া দীনবাবু একটি সামান্য আসনে বসিতে যান এবং বলেন, "আমি দীন হীন, আমি এইখানেই একধারে বসি।" সেই কথা শুনিয়া মহারাজ বলেন, "সে কি কথা! আপনি 'দীননাথ' আপনি ত সবার মাথার উপরে থাকবেন।"

নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'রেখাক্ষর বর্ণমালা (বাঙ্গালার short-hand) পদ্যে বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রথম চরণ :—

"গণেশ বন্দনা
গোড়ায় মন্দ না।"

আমি যখন বোলপুরে থাকিতাম, তখন পিতৃদেব মাঝে মাঝে সেখানে যাইতেন, একবার তিনি যখন গিয়াছিলেন, তখন দ্বিজেন্দ্রবাবু তথায় ছিলেন। আমাদের খেলা হইবার পরে দেখিলাম তাঁহারা দুইজনে আমাদের খেলার মাঠের পাশে বেড়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়া পিতৃদেব বলিলেন, "দ্বিজেনবাবুকে প্রণাম কর। সেই যে পড়িয়াছ 'গণেশ বন্দনা, গোড়ায় মন্দ না'—তাহা ইঁহারই লেখা", সেই কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবুর অট্টহাসি আরম্ভ হইল। দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসি যাঁহারা না শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সে সকল উচ্চহাস্যের কথা বুঝান শক্ত। জিহ্বা তালুতে ঠেকাইয়া হঃ হঃ…হঃ শব্দে দশ পনর মিনিট ব্যাপী হাসি।

এক সময়ে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রায়ই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন। একদিন দ্বিজেন্দ্র বাবু নগেন্দ্রবাবুকে বলেন, "কাল বৈকালে তুমি এখানে খেয়ে যেও।" দ্বিজেন্দ্রবাবু কিন্তু সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু প্রতিদিন যেমন আসেন সেইরূপ আসিলেন। প্রতিদিন যে সময়ে বাড়ী ফিরেন তাহার পরেও বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পরে তিনি যখন উঠিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনে পড়িল, নগেন্দ্রবাবুকে খাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'নগেন, ফের ফের, তোমাকে যে খেতে বলেছি—তা একেবারেই ভু'লে গেছি, যা' হ'ক আমার যে খাবার আছে এস তা'ই দু'জনে খাই। আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম, নগেন আজ এখনও উঠছে না কেন?"



জঙ্গম

বনফুল

৩৩

ভজহরি প্রমুখাৎ বার্তা শুনিয়া মুকুন্দ পোদ্দার শুধু বিস্মিত নয়; কিঞ্চিৎ বিচলিতও হইলেন। অঙ্কে ভুল করিয়া ফেলিলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয় তেমনি অপ্রস্তুতও হইলেন তিনি একটু মনে মনে। সেদিন নিপুর ব্যবহারে তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই। বস্তুত আজকালকার এই ডেঁপো ছোকরাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ধারণার স্বপক্ষে আর একটা প্রমাণ পাইয়া মনে মনে বরং তিনি খুশীই হইয়াছিলেন। ছোকরা বাড়ি বহিয়া তাঁহাকে বলিতে আসিয়াছিল—'আমি আপনার শত্রু, এ জেনেও যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান করুন'! ময়রাকে রসগোল্লা চিনাইতে আসিয়াছে। অ্যাঁ! ডাহা উজবুক না হইলে এতটা পথ হাঁটিয়া একথা বলিতে আসে কেহ! লোক চরাইতে চরাইতে মাথায় টাক পড়িয়া গেল—কে শত্রু কে মিত্র তাহা তাঁহার এখনও চিনিতে বাকী আছে যেন! মিত্র কে? সব ব্যাটাই তো শত্রু! ঘাড় মটকাইবার সুযোগ পাইলে কোন দেবতা তাহা ছাড়েন? তুই যে শত্রু তা ভাল করিয়াই জানি—কিন্তু সেদিনকার ছোঁড়া তুই, তোর নাক টিপিলে এখনও বোধহয় দুধ বাহির হইবে—আমার সঙ্গে কি শত্রুতা করিবি তুই! তোর মুরোদ কত? লাগাহুরি করিয়া একথা বলিতে আসিবার মানে কি। ডাহা উজবুক না হইলে এ কাজ করে কেহ! নিপুর প্রতি পোদ্দার মহাশয়ের সেদিন সস্নেহ অনুকম্পাই হইয়াছিল একটু। নেহাৎ পাগোল একটা! একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"বেশ, বেশ—আপনি যে শত্রু তা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু শত্রুরও উপকার যদি করি আমি, কার কি বলবার আছে তাতে! আপনি মানুষ তো, ভারতবাসী তো, হিন্দু তো, আপনি বিপন্ন হয়েছেন এইই যথেষ্ট নয় কি, অত শত্রু মিত্র বিচার করার কি দরকার? গোটা কয়েক টাকা দিয়ে যদি আমি সাহায্যই করি আপনার—কার চণ্ডী অশুদ্ধ হবে তাতে—অ্যাঁ—কি বল ভজহরি? দাও ওঁকে পঞ্চাশটা টাকা দাও, নোট নেবেন না, খুচরো—আর হাত ঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দাও। কথার নড়চড় করবার লোক নই আমি—"

নিপু বলিয়াছিল—"আপনার কাজ কিন্তু আমি করব না—"

"আপনার ধর্ম্ম আপনার কাছে—" বলিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলি চকচক করিয়া উঠিয়াছিল। কেবল নিপুর উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া থাকিবেন এমন কাঁচা লোক তিনি নন। ইতিমধ্যে আরও দুই তিনজন লোক মারফত তিনি সুন্দরবল্লভকে খবর পাঠাইয়াছেন। কেনারাম চক্রবর্ত্তীকেই হাত করিবার ফিকিরে আছেন তিনি। আরও হাজার খানেক টাকা কবুল করিলেই লোকটা তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়িবে বেশ বোঝা যাইতেছে। কেবলমাত্র নিপুর মতো চ্যাংড়ার সাহায্যেই তিনি যে এত বড় জমিদারিটা কিনিয়া ফেলিবেন এ হাস্যকর আশা তাঁহার কোনদিনই ছিল না। তবে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও যখন কাঠবিড়ালীকে উপেক্ষা করেন নাই তখন তাঁহার মতো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা করিবে কোন সাহসে। স্পষ্ট ভাষায় শত্রুতা ঘোষণা করিলেও তাই তিনি কাঠবিড়ালীটার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। এত লম্ফ ঝম্ফ তো, টাকা ও ঘড়িটা কিন্তু বেশ হাত পাতিয়াই লইল! তাহার পর অবশ্য আর কোন খোঁজখবর পান নাই ছোকরার। রাখেনও নাই। ভাবিয়াছিলেন টাকা কয়টা বোধহয় জলেই গেল। এই ভাবিয়া কেবল সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন যে ছোকরা আর যাই করুক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অন্তত করিবে না। যে ছিদ্র দিয়া বুড়বুড়ি কাটিবার সম্ভাবনা ছিল চাঁদির চাকতি দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল। ভজহরির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পর কিন্তু এ বিশ্বাস টেঁকাইয়া রাখা শক্ত হইল। ছোটলোকদের মধ্যে এ অঞ্চলে তাঁহার যত খাতক ছিল সকলেই সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে! সকলেই বলিতেছে যে আর এক পয়সাও সুদ তাহারা দিবে না। দশ কিস্তিতে আসলটা তাহারা পাঁচ বৎসরে ক্রমশঃ শোধ করিয়া দিবে। তাহাতে যদি পোদ্দার মহাশয় সম্মত না থাকেন মকোদ্দমা করিতে পারেন। সকলের মুখেই এক বুলি এবং বুলিটি নিপুবাবুই না কি সকলকে মুখস্থ করাইতেছেন!

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "অন্নছত্রে আজকাল লোক খাচ্ছে কত?"

"দশজন খাবার কথা, খায় কিন্তু বারো তেরোজন, মানা করলে শোনে না—এসে বসে' পড়ে—"

"কাল থেকে একশ' জনের আয়োজন কর। একটা তরকারিও বাড়িয়ে দাও। কি তরকারি দিচ্ছ আজকাল, ক'দিন যেতেই পারি নি—"

"শাক বেগুন মুলো দিয়ে একটা ঘণ্ট হয়েছিল আজ"

"লাউ শস্তা আজকাল, লাউয়ের তরকারি কর একটা কাল থেকে—"

"যে আজ্ঞে"

"আর যারা যারা সুদ মাপ চায় তাদের বোলো—আমার সঙ্গে যেন দেখা করে তারা। বোলো যে তোদের বিপদে আপদে আমরাই চিরকাল করেছি চিরকাল করব। আজ হঠাৎ নিপুবাবুর কথায় নেচে মরছিস কেন তোরা। ভাল করে' বুঝিয়ে বোলো, বুঝলে। দুটো মিষ্টি কথা বলতে শেখো—"

"যে আজ্ঞে"

ভজহরি চলিয়া গেল। পোদ্দার মহাশয় স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার চোখে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

৩৪

ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশী।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। অতিশয় অসহায়ভাবে শঙ্কর গরুর গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া শুইয়াছিল। মন্থরগতিতে

গ্রাম্য পথে গাড়ি চলিয়াছে, মুশাই গাড়ি হাঁকাইতেছে, শঙ্কর ভাল করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না এখন কি করা উচিত। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে লক্ষ্মীবাগে স্বচক্ষে সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহার মনন-শক্তিই যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য সত্যই যে এরকম হওয়া সম্ভব তাহা সে কল্পনাই করে নাই। সত্য সত্যই কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে একদল উন্মত্ত জনতা আসিয়া মারপিট লুঠতরাজ করিয়া মণিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। মণির মাথা কাটিয়া গিয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় সে এখন সদর হাঁসপাতালে। তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুলাব সিং দখল করিয়া বসিয়াছে। মণির ঘরে মণিরই বিছানায় বসিয়া লোকটা সদলবলে আসর জমাইয়াছে। দলে আছে কেনারামের পুত্র জীবন, রাজীবের পুত্র গদাই, প্রমথ ডাক্তার ও স্থানীয় বেহারী উকীল দুইজন। ফুলশরিয়া মদ পরিবেশন করিতেছে। প্রাঙ্গণে জনতার মধ্যে ছিল করিম, কারু, হরিয়া, রহিম, কর্পূরা, পুরণ, চেনা শোনা আরও কত লোক—সকলেই তাহাদের প্রজা। সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া চোরের মতো লুকাইয়া পড়িল সব। লুকাইল না কেবল গুলাব সিং এবং ফুলশরিয়া। গুলাব সিং গোঁফে চাড়া দিয়া একপাত্র মদ আগাইয়া দিয়া বরং সম্বর্দ্ধনাই করিল তাহাকে। স্বয়ং দারোগা সাহেবকে সে হাত করিয়াছে। শঙ্করবাবুকে তাহার কি ভয়। ফুলশরিয়া একপাশে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। ফুলশরিয়া! এই ফুলশরিয়া নিপুদাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, নিজের গহনা বেচিয়া অসুস্থ হরিয়ার চিকিৎসা করিয়াছিল, এখন ডাকাতের দলে মদ পরিবেশন করিতেছে। পরিধানে চমৎকার একটি ছাপা-বোম্বাই শাড়ি! একদিন তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল, সে-ই কেবল কোথাও গেল না। একধারে একটু সরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করিম কারু রহিম কর্পূরা প্রত্যেকের মুখ একে একে আবার তাহার মনে পড়িল। বিশেষ করিয়া ইহাদের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেককে আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে সে···সেদিন নিজে জামিন হইয়া ছাড়াইয়া আনিল—দুইদিন যাইতে না যাইতে ডাকাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! দিনে দুপুরে! কেবল অভাবের তাড়নাতেই তাহারা এসব করিতেছে এ অজুহাতে আর মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। অভাব নয়, ইহাই উহাদের স্বভাব। স্বভাব? স্বভাবই যদি হয়, তাহার জন্যও কি উহাদের দায়ী করা যায়? বহু যুগের নানা অভাবই কি উহাদের স্বভাব গঠন করে নাই? শুধু অন্নাভাব বস্ত্রাভাব নয় শিক্ষার অভাব। তখনই আবার মনে হইল জীবন চক্রবর্ত্তী, গদাই দত্ত, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন বেহারী উকীল, গুলাব সিং—ইহাদের কিসের অভাব আছে। ইহারাই তো আসল ডাকাত, কারু করিমরা তো উহাদের চালিত যন্ত্র মাত্র। শিক্ষা? জীবন চক্রবর্ত্তী, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন উকীল ইহাদের কি শিক্ষার অভাব ছিল? ইহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে সে শিক্ষা পাইলে করিম কারুদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইত কি? রামলাল কি উন্নত হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। কাকের ঠোঁট সোনা দিয়া, পা মাণিক দিয়া এবং ডানা মুক্তা দিয়া অলঙ্কৃত করিলেও কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। কাককে রাজহংস করিবার তাহার এ আগ্রহ কেন? নিমগাছের তলায় দুধ ঢালিলেই তাহাতে আম ফলিবে এ দুরাশা সে কেন করিতেছে! কেন করিতেছে চিন্তা করিতে গিয়া অনিবার্য্যভাবে তাহার মনে হইল করিতেছে নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য, করিতেছে তাহার আর কিছু করিবার নাই বলিয়া। যে শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ সেই শিক্ষাই অপরকে জোর করিয়া গিলাইবার এই সাড়ম্বর আয়োজনের অন্য অর্থ আর কি হইতে পারে। তাছাড়া তাহার নিজের কি এমন যোগ্যতা আছে, কি এমন চরিত্রবল আছে যাহার জোরে সে সমাজ-সংস্কার করিবার স্পর্দ্ধা করে? বাহাদুরি করিয়া সেদিন উৎপলের দেওয়া সিগারেটটা প্রত্যাখ্যান করিল বটে কিন্তু মনে মনে তাহার স্ত্রীকে কামনা করিতে তো তাহার বাধিল না। সে নিজেও কি কম পরস্ব-লোলুপ? যে শিক্ষা তাহার নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে নাই, সেই শিক্ষা দিয়া সে সমাজ-সংস্কার করিবে? সে নিজেই তো ভণ্ড!

"মুশাই"

"কি বাবু"

"এখানে কাছাকাছি কোন দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে?"

"কোশিস্ করলে সে মিলতে জরুর"

"দেখ তো"

মুশাই গাড়ি থামাইয়া নামিয়া গেল। শঙ্কর শুইয়াছিল উঠিয়া বসিল। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দ্দিকে। একা একা তাহার কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। চারিদিক নির্জ্জন, কোথাও আলোর লেশমাত্র নাই। গরুর গাড়ির আলোটাও নিবিয়া গিয়াছে। মুশাইটা গেল কোথায়। এখানে সিগারেট কোথা পাইবে। না পাঠাইলেই হইত। শঙ্কর মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিতে পাইল দূরে একটা আলো আসিতেছে। আলো, না আলেয়া? না, আলোই বোধহয়। কাছাকাছি তো কোন জলাভূমি নাই। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটু কাছাকাছি হইলে প্রশ্ন করিল—"কে?"

কোন উত্তর নাই। আর একটু কাছে আসিলে শঙ্কর দেখিতে পাইল একজন স্ত্রীলোক, সঙ্গে কেহ নাই। এত রাত্রে একা এই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে কে এ!

"কৌন্ হ্যায়, কাঁহা যায়ে গা"

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িল। আলোটা একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কে, শঙ্করবাবু না কি"

শঙ্কর চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কুন্তলা!

"এত রাত্রে একা কোথা চলেছেন?"

"শিবমন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছি"

"এত রাত্রে শিবমন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছেন!"

"হ্যাঁ। আজ শিবরাত্রি যে"

"একা কেন?"

"মণিঠাকুরপোর খবর পেয়ে উনি হাঁসপাতালে চলে গেলেন, চাকরটারও অসুখ করেছে, তাই একাই যাচ্ছি। কি আর হবে"

"আর কোন সঙ্গী পেলেন না"

"কই আর পেলুম"

কুন্তলা একটু হাসিল। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। শঙ্করের মনে হইল সে হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—থিয়েটার সিনেমা হইলে অনেক সঙ্গী মিলিত কিন্তু এই শীতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবপূজা করিতে যাইবে কে।

"বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি"

"না থাক"

কুন্তলা চলিয়া গেল। শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ওই মেয়েটার তুলনায় নিজেকে কেমন যেন খেলো বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই সে নিজের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। নূতন যুগের নূতন পারিপার্শ্বিকে যাহারা পুরাতন প্রথাকে অবুঝের মতো আঁকড়াইয়া আছে তাহারা কি সত্যই শ্রদ্ধেয়? ইনি রামলালের শিক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিষ্ঠাভরে শিবরাত্রি করিতেছেন। মনে মনে কথাটা বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিজেই তো সে এতক্ষণ এই শিক্ষার তুচ্ছতার কথা ভাবিতেছিল। চিন্তার সূত্রটা কেমন যেন হারাইয়া গেল। নিজেরই অন্তরের পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবর্ত্ত ফেনাইয়া তুলিল। একবার মনে হইল শিবরাত্রি করায় কি এমন মহত্ত্ব আছে? আছে শুধু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ এবং তাহা বজায় রাখিবার জেদ। পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তঃসারশূন্য? সত্যই কি ইহা অন্তঃসারশূন্য? নূতন যুগের নূতন ঢেউয়ের মুখে যে হালকা শোলাটা নাচিয়া বেড়াইতেছে তাহারই অন্তর পরিপূর্ণ, আর যে পর্ব্বত সমস্ত ঢেউ সত্ত্বেও অটল হইয়া আছে সেই অন্তঃসারশূন্য? সহসা ইহার কোন সদুত্তর মাথায় আসিল না, তবু কিন্তু নূতন যুগের নূতন দাবী যে একটা আছে তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। নূতন যুগের সে অভিনব দাবীটা কি? কামউনিজম্? তাহাও কি পুরাতন মনোবৃত্তিরই পুনরাবর্ত্তন নয়? শক্তিমান শ্রমিক জরাগ্রস্ত ধনিকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে ইহাতে অভিনবত্ব কোথায়? শক্তিমান চিরকালই অশক্তের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে। তবে? নূতন যুগের নূতন দাবীটা যে কি তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। একটু পরেই মুশাই আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল তাহার অসাধ্য কিছু নাই, ঠিক এক প্যাকেট সিগারেট কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়াছে। কুন্তলার নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গভরে অবজ্ঞা করিবার জন্যই শঙ্কর যেন সাড়ম্বরে একটা সিগারেট ধরাইল এবং অপ্রস্তুত মুখে ফস্ ফস্ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শূরবংশীয় হরিরাজের বারাণসী তাম্রশাসন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

গত কার্ত্তিকমাসের ভারতবর্ষে বারাণসীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি মূল্যবান্ তাম্রলিপির পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তাম্রশাসনটির বৈশিষ্ট্য লেখবিদ্যাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় সকল দিক হইতে ইহার মূল্য বিচার করিতে সমর্থ হন নাই। অবশ্য তাঁহার পাঠের ত্রুটি এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের মুদ্রাকরপ্রমাদ বিশেষজ্ঞের নিকট মারাত্মক নহে। তাম্রশাসনটি আবার আমার কয়েকজন অবিশেষজ্ঞ বন্ধুকেও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ আমাকে লিপিতে উল্লিখিত শূরবংশীয় রাজগণের সহিত বাংলার কিংবদন্তীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কেহ বা এই লিপির শশাঙ্ককে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সহিত অভিন্ন ধরিয়া প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, তাম্রশাসনটি একবার স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। সেজন্য গত বড়দিনের বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন উপলক্ষে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের খোঁজ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রতিলিপির উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

লিপিবিদ্যার দিক হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান তাম্রশাসনের কালনির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহাতে যে লিখনশৈলী অনুসৃত হইয়াছে, উহাকে সাধারণতঃ দক্ষিণভারতীয় বলা হইয়া থাকে। আধুনিক বোম্বাই অঞ্চলের কতিপয় প্রাচীন লিপির সহিত এই তাম্রশাসনের অক্ষরের সাদৃশ্য দেখা যায়; উদাহরণস্বরূপ ত্রৈকূটক, আদি-চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশের লিপিমালার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার মনে হয়, এই লিপির আম্রকমধ্য সুরতের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত পর্দিতে আবিষ্কৃত ত্রৈকূটকরাজ দহ্রসেনের তাম্রশাসনের (৪২৬ খ্রী°) আম্রকার সহিত অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। এই ধারণা সত্য হইলে, আলোচ্য তাম্রশাসনটি সুরত অঞ্চলের কোন নরপতির কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তদঞ্চলবাসী কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বাংলাদেশের সহিত এই লিপির এবং ইহাতে উল্লিখিত শূরবংশের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে মনে করিবার কারণ নাই। এখন কথা এই যে, শাসনটি বারাণসীতে আসিল কিরূপে? এই প্রশ্নের সদুত্তর আছে। অনেক সময় তাম্রপট্টের অধিকারী ব্রাহ্মণেরা তীর্থ গমনের সময় মূল্যবান্ দলিল সঙ্গে লইতেন; কারণ অধিকারীর অনুপস্থিতিতে গৃহ হইতে উহা অপহৃত বা বিনষ্ট হইলে জমিতে বেদখল হইবার ভয় ছিল। আবার তাম্রশাসনসহ বারাণসীতে তীর্থভ্রমণে আসিয়া দৈবাৎ কাহারও ৺বিশ্বেশ্বর প্রাপ্তি ঘটিলে, শাসনটি সেখানেই থাকিয়া যাইত। ঠিক অনুরূপ কারণে দ্বাদশশতাব্দীর কামরূপরাজ বাঙালী বৈদ্যদেবের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কমৌলি নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য তাম্রশাসনের ভাষায় কিছু কিছু প্রাকৃত ব্যাকরণ ও উচ্চারণের প্রভাব দেখা যায়; যথা—ক্রিতাভ্যনুজ্ঞো, দত্তাথা, বঙ্শ, হরিরাজ্জা, আম্ক, অনন্তমহাদেবীসন্তকীয় ইত্যাদি। পালিতে সন্তক শব্দটি ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়; যেমন—অম্হসন্তক = আমাদের। আবার সম্পত্তি অর্থে শব্দটির বিশেষ্য রূপেও প্রয়োগ দেখা যায়। বর্ত্তমান লিপিতে শব্দটি এই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভূয়েঃ পঞ্চাশৎ, হস্তঃ প্রামোতি প্রভৃতি স্থলে উপধ্মানীয়ের ব্যবহার লক্ষিত হয়। রেফ ও র-ফলা যোগে সাধারণতঃ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটিয়াছে। অনেক স্থলে সন্ধি অবহেলিত হইয়াছে।

শাসনটি শাল্মলপুর নামক স্থান হইতে প্রদত্ত। ইহাতে শূরবংশীয়

নরপতি হরিরাজ, তাঁহার পিতা নিষ্ঠুররাজ এবং পিতামহ কোত্তগ্রহরাজের উল্লেখ আছে। শান্তনপুর এবং শ্রীমকোত্তগ্রহরাজ স্থলে যথাক্রমে শান্তুনপুর এবং শ্রীমৎকোত্তগ্রহরাজ লেখা লিপিকরের উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বর্ত্তমান তাম্রশাসনের বৈশিষ্ট্য এই যে, নরপতি হরিরাজ এবং তদীয় প্রধানা মহিষী অনন্তমহাদেবীকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহামাত্রগণ শাসনটি প্রদান করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, রাজার অনুজ্ঞা ব্যতীত মহিষীর স্বীয় সম্পত্তির অন্তর্গত ভূমি হস্তান্তর করিবার অধিকার ছিল না। মৌর্য্যবংশীয় অশোকের লিপিতে সে যুগের সর্ব্বপ্রধান স্তরের রাজকর্ম্মচারিগণকে মহামাত্র সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণভাবে মহামাত্রের উল্লেখ ব্যতীত মৌর্য্যলিপিতে ধর্ম্মমহামাত্র, অন্তমহামাত্র, স্ত্র্যধ্যক্ষমহামাত্র, নগরব্যবহারকমহামাত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট বিভাগীয় কর্ম্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য বারাণসী লিপি হইতেও মহামাত্রদিগকে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারি। এস্থলে রাজার প্রতিনিধিরূপে তাঁহারাই ভূমি দান করিতেছেন। আবার শাসনের শেষে মহামাত্রগণেরই মঙ্গলকামনা করা হইয়াছে। গণস্থবিরক (গণের প্রধান অর্থাৎ সঙ্ঘপতি) শব্দ এবং বার বার গণশব্দ ব্যবহার করিয়া মহামাত্রদিগের সকলের সংহিত দায়িত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যাহা হউক, মৌর্য্যপরবর্ত্তীযুগের লেখমালায় মহামাত্রসংজ্ঞক কর্ম্মচারীর অধিক উল্লেখ নাই; কিন্তু বারাণসী লিপি হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রনীতি হইতে মৌর্য্যযুগের স্মৃতি খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। মহামাত্রদিগের গণের উল্লেখ অন্য কোথাও দেখি নাই। লিপির শেষে "দৃষ্টং" শব্দটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। পল্লব, বাকাটক প্রভৃতি রাজবংশের তাম্রশাসনে এই শব্দ লিপির প্রথমভাগে দেখা যায়। ইহার অর্থ "পরীক্ষিত"; শাসনটি যে সরকারী দপ্তরখানার কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক পরীক্ষিত এবং অনুলিখিত হইয়াছিল, ইহা হইতে সেই বিষয় জানা যায়।

দত্তভূমির পরিমাণ বুঝাইতে "ভূমেঃ পঞ্চাশদেকা" লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একা বা অনুরূপ শব্দের উল্লেখ লেখমালায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দটিতে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে। কিন্তু এই শব্দের পরে প্রায় ছয়টি অক্ষর লিখিবার স্থান শূন্য রহিয়াছে। এই স্থলে যদি কোন লিখিতব্য অংশ বাদ পড়িয়া থাকে, তবে পূর্ব্বের শব্দটিকে অসম্পূর্ণ স্বীকার করিতে হয়। এখানে অঙ্কে পঞ্চাশ লিখিবার অভিপ্রায় ছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায় না। লিপিকর-প্রমাদও অসম্ভব নহে। মহামান শব্দের ব্যবহারে বুঝা যায়, রাজ্যে একটি ক্ষুদ্রতর মানেরও প্রচলন ছিল; অর্থাৎ সাধারণতঃ মাপিবার কার্য্যে যে দৈর্ঘ্যের দণ্ড ব্যবহৃত হইত, ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত ভূমি মাপিবার সময়ে তদপেক্ষা দীর্ঘ দণ্ড ব্যবহার করা হইত। লিপিশেষের তিনটি শ্লোকের মধ্যে দুইটি অসংখ্য লিপিতে উদ্ধৃত দেখা যায়। তৃতীয় শ্লোকটি নূতন। উহাতে ভাষা ও ছন্দের কিছু ত্রুটি আছে।

উপরে আমি সংক্ষেপে হরিরাজের বারাণসী লিপির মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের কোন প্রবন্ধ ইংরেজিতে প্রকাশিত হইলে, আমার বক্তব্য বিস্তারিত করিয়া লিখিব। নিম্নে বারাণসীলিপির পাঠ এবং বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

হরিরাজের বারাণসী তাম্রশাসন

প্রথম ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

১। স্বস্তি (॥*) শান্তনপুরাদনেকসমরশতবিজয়িশূর-
২। বংশ[১]ললামভূতস্য শ্রীমকোত্ত[২]গ্রহরাজনপ্তু[র্নি]ষ্ঠু(র*)-
৩। রাজসূনোর্হরিতুল্যগুণবিক্রমধামনাম্নো হরিরা-
৪। জস্য যুক্তাদ্বরবংশ্যা প্রধানমহিষ্যা অনন্তমহাদে-
৫। ব্যা হরিরাজ্ঞা চ বিজ্ঞা[৩]প্ত্যনুজ্ঞো গণস্থবিরক-
৬। গোপ্ত গোবিন্দ নারায়ণ ম[া]তৃবৎস গণবৎস নাগ-

দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা

৭। [কুমার দামুক স্কন্দ কোক]টিক শশাঙ্ক বিষ্ণুদে-
৮। ব [প্রভাকরাদি]র্মহামাত্রগণঃ সর্ব্বানাম্[৪]ক
৯। নগরবাস্তব্যান্সবালবৃদ্ধপরিজনপুরস্সরান্ স-
১০। প্রক্রিতি[৫]কাম্বনিকটবর্ত্তিকগ্রামনিবাসিনশ্চ সংপূ-
১১। জ্য ইমমর্থমাবেদয়তি (।*) বিদিতমস্তু ভবতাং যথাস্মা-
১২। ভির্ম্মহামাত্রগণেন অনন্তমহাদেবীসন্তকীয় এবাম্রক[৬]-

দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

১৩। নগরে মহামানেন ভূমেঃ পঞ্চাশদেকা[৭]
১৪। কৌণ্ডিন্যসগোত্রেভ্যঃ সম্যগুপনিষৎসিদ্ধান্তবিদ্ভ্যঃ সোমস্বা-
১৫। মিভ্যঃ [মহাকার্ত্তিক]পৌর্ণমাস্যাং[৮] উদকপূর্ব্বং প্রতিপাদিতা[৯]
(।*) অত এ-
১৬। [তেষামাচন্দ্রার্কার্ণবক্ষিতিসমকালমেতামনু]ভুঞ্জতাং[১০] শূরব-
১৭। ং[শ][১১]প্রভবেন বা অন্যেন বা বিষয়পতিনা ন কেনচি-
১৮। দপ্যন্তরায় উৎপাদ্য ইতি ॥ আহুশ্চ ধর্ম্ম-

তৃতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা

১৯। শাস্ত্রকারাঃ
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি
২০। ভূমিদঃ (।*)
আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসে(ৎ*) (॥*) ১
২১। স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা[১২] যো হরেত বসুন্ধরাং[১৩] (।*)
গবাং[১৪] শতসহ-
২২। স্রস্য হন্তুঃ প্রাপ্নোতি কিল্বিষং[১৫] (।*) ইতি (॥*) ২
[গোপ্তঃ[১৬] পিতৃয়ো] ব্রহ্ম-
২৩। হা [স্তেয়ী] সুরাপো গুরু[তল্প]গঃ (।*)
[ভবন্তি ভ]স্ম এতানি ব
২৪। এতা[১৭]ন্মুদ্ধরিষ্যতি (॥*) ৩
স্বস্তিরস্তু[১৮] মহামাত্রগণস্য ॥ দৃষ্টং[১৯] ॥

বঙ্গানুবাদ

মঙ্গল হউক। শান্তনপুর হইতে বহুশতরণজয়ী শূরবংশের ললামভূত, শ্রীমৎ কোত্তগ্রহরাজের পৌত্র, নিষ্ঠুররাজের পুত্র, হরির ন্যায় গুণবিক্রমধামনামা হরিরাজের উপযুক্তবংশসম্ভূতা প্রধানা মহিষী অনন্ত-মহাদেবী এবং স্বয়ং হরিরাজ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহামাত্রসঙ্ঘের প্রধান গোপ্ত এবং গোবিন্দ, নারায়ণ, মাতৃবৎস, গণবৎস, নাগকুমার, দামুক, স্কন্দ, কোক্কটিক, শশাঙ্ক, বিষ্ণুদেব, প্রভাকর প্রভৃতি মহামাত্রদিগের সমস্ত বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্যাদি ও স্ত্রীলোকসহ আম্রকনগরবাসী বণিকদিগকে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া এই বিষয়টি জানাইতেছেন।—"আপনারা অবগত হউন যে, আমাদের মহামাত্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনন্তমহাদেবীর জায়গীরভুক্ত আম্রকনগরে মহামানের মাপে পঞ্চাশৎ ভূমিখণ্ড কৌণ্ডিন্য গোত্রীয়, সম্যক্ উপনিষৎসিদ্ধান্তবিৎ সোমস্বামীকে মহাকার্ত্তিক পূর্ণিমাতিথিতে উদকপূর্ব্বক দান করা হইল। অতএব শূরবংশ-সম্ভূত অথবা অপর কোন বিষয়পতি (জেলার শাসক) কেহ যেন চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র ও পৃথিবীর অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত এই ভোগকারীর ভূমিভোগে কোনরূপ বাধা উৎপাদন না করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন, 'ভূমিদানকারী ষাট হাজার বৎসরকাল স্বর্গে সুখভোগ করেন; ভূমির প্রত্যাহরণকারী ও তাহার অনুমোদক ঠিক ততকাল নরকে বাস করে। নিজদত্তই হউক, পরদত্তই হউক, ভূমি যে প্রত্যাহরণ করে, তাহার এক

লক্ষ গোহত্যাকারীর পাপ লাভ হয়। গোহত্যাকারী, পিতৃঘাতী, ব্রহ্মহত্যা, চৌর, সুরাপায়ী এবং গুরুদারগামীর যে পাপ হয়, সেইরূপ পাপ ভূমিপ্রত্যাহরণকারী ব্যক্তির হইয়া থাকে।" মহামাত্রসঙ্ঘের মঙ্গল হউক। শাসনটি পরীক্ষিত।

পাদটীকা

১। বংশ
২। শ্রীমৎকোভপ্রহরাজ ?
৩। হরিরাজেন চ কৃতা॰
৪। সর্ব্বানাম্রক॰
৫। প্রকৃতি॰
৬। এবাম্রক॰
৭। পঞ্চাশদেকাঃ ?
৮। ॰মাত্রান্
৯। প্রতিপাদিতাঃ ?
১০। ভুক্তয়াং
১১। বংশ। এ স্থলের ভাষা হইতে এবং শূররাজগণের বিরুদাবলী হইতে বোধহয় এই নৃপতিগণ কুম্ভরাজ্যের শাসক ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা মূলে ত্রৈকূটক মহারাজগণের অধীন বিষয়পাতমাত্র ছিলেন এবং ঐ বংশের অধঃপতনের সুযোগে কিঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনের সুযোগ পাইয়াছিলেন।
১২। দত্তাং বা
১৩। বসুন্ধরাম্।
১৪। গবাং
১৫। কিল্বিষম্।
১৬। গোঘ্নঃ শব্দটি তুলিয়া দিলে শ্লোকটির অনুষ্টুভ্ ছন্দ ঠিক হয়। শ্লোকটির প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের ভাষায় কিছু সামঞ্জস্যের অভাব আছে।
১৭। এতাম্॰ ?
১৮। কত্যায়
১৯। দুষ্টম্।

বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়

প্রথম দিন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটে গিন্নীকে বিশুর মা বলছিল—"বিশু যে আমার আজও প্রাণে বেঁচে আছে দিদি—এ শুধু বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়! নইলে—ও ছেলে কি আমার এতদিন থাকতো ?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী বিশুকে ভালরকমই জানেন। এ বাড়ীতে তাঁরা আসবার দু'একদিনের মধ্যেই বিশু এসে আলাপ পরিচয় ক'রে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে গেছে। তারপর থেকে যখন তখন সে একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে উৎপাত শুরু করে দেয়। বলে—"মাসি! কি রাঁধছ? দাও না একটু চেখে দেখি!"

দিব্যি গাঁট্টা-গোট্টা বল্ল-বাঁটুল ছেলে। বয়স প্রায় চৌদ্দ-পনেরো হবে। লোহার ভাঁটার মতো অটুট স্বাস্থ্য। এ হেন ছেলে যে কি কারণে বেঁচে থাকতে পারে না—সেটা পাশের বাড়ীর গিন্নী কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে না-পেরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"কেন বোন তুমি অমন সব অলক্ষণে কথা বলছো? ষাট্! ষাট্! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিশু তোমার অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক। বলতে নেই, ভগবানের দয়ায় ছেলেত তোমার রুগ্ন নয় ভাই!"

বিশুর মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—"ঐ যা বললে দিদি! ভগবানের দয়ায়! ভগবানের দয়া না হ'লে কি ছেলে আমার পাঁচ পাঁচবার মরে বাঁচে?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে অবাক! চোখ দুটি তাঁর বিস্ময়ে একেবারে গোল হ'য়ে কপালে উঠে পড়লো! রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—"ওমা কী হবে! তুমি বলো কি দিদি? পাঁচ পাঁচবার! আহা! মরে যাই গো! বাছার আমার কী হয়েছিল বলো তো? ছেলে-বেলায় বুঝি টাইফয়েড্—"

"—শত্রুর টাইফয়েড হোক!" বিশুর মা একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

পাশের বাড়ীর গিন্নী একটু থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বললেন—"তবে বুঝি ওলাউঠো—কলেরার মতো কিছু—"

বাধা দিয়ে বিশুর মা গর্জ্জন করে উঠলো—"যমের ওলাউঠো ধরুক! আমার ছেলের কেন হ'তে যাবে? তোমার এসব কি কথা বাছা! মুখের কি একটু রাখ-ঢাক নেই?"

অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে পাশের বাড়ীর গিন্নী বললেন—"সেত বটেই! আমারই ভুল হয়েছে ভাই! ওলা-উঠোয় মানুষের দেহ একেবারে ছেঁচে দিয়ে যায়! তা বলতে নেই, বিশুর আমাদের শরীর তো যেমন—"

কথা শেষ হবার আগেই বিশুর মা রুখে উঠলো—"দেখ বাছা, ছেলের আমার শরীর নিয়ে খুঁড়ো না। আজ শনিবার—এটাও কি তোমার খেয়াল নেই? তুমি কেমনতর মেয়েমানুষ গা? বলে কতো ঘী দুধ খাইয়ে বিশুকে আমার মানুষ করেছি। তোমাদের মতো পাঁচজনের নজরে নজরে ছেলে আমার আধখানা হয়ে গেছে!"

বিশুর মা'র একথা শুনে পাশের বাড়ীর গিন্নী নিজেকে একটু অপমানিত বোধ করলেন। চটে উঠে মনে মনে বললেন 'ওই যদি ওঁর ছেলের আধখানা চেহারা হয়, পুরো চেহারা না জানি কি ছিল!' প্রকাশ্যে একটু সলজ্জ হেসে বললেন—"না বোন, না, আমি তা' বলিনি। তোমার ছেলে আমার ছেলে কি আর ভিন্ন? আমি কি ভাই বিশুধনকে খুঁড়তে পারি? পাঁচ-পাঁচবার মরে বেঁচেছে বলছিলে, তাই ভাবছিলুম বুঝি শক্ত কিছু ব্যামোয় ধরেছিল বাছাকে? এই যেমন ধরো নিউমোনিয়া—ডিপথিরীয়া—প্লেগ—"

"ষাট ! ষাট্ ! তুমি কি সর্ব্বনেশে মেয়ে গো ! যত বিদখুটে ব্যারবাম জিভের আগায় জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ ? তোমার মত মারাত্মক জীব পাশে থাকতে কি ছেলে আমার বাঁচবে—?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার যথার্থ ই রেগে উঠলেন। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে রীতিমতো বিরক্তি ফুটে উঠল। অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন—"এতদিন যদি বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় ছেলে তোমার পাঁচবার মরেও বেঁচে থাকতে পারে তাহলে—

পাশের বাড়ীর গিন্নীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশুর মা বললে—"সেইকথাই তো তোমায় বলতে যাচ্ছিলুম দিদি ! তা তুমি শুনলে কই ?—যত অলুক্ষণে রোগের নাম করতে শুরু করলে ! বলতে নেই, বাবার দয়ায় বিশু আমার অসুখ বলে কখনো কিছু জানে না। সেই যা ছোটবেলায় টিকে হবার আগে একবার হাম নাট খেয়ে গিয়ে ছেলে আমার এখন-যায় তখন-যায় হয়েছিল ! পাড়ার শীতলাঠাকুরুণের বামুন উদয় ভট্চার্য্য সেবার ছেলেকে আমার ভাল করে দেয়। মা শীতলা যেন উদয়ের কথায় উঠতেন বসতেন ! আহা, বেচারা গেলোও তাই মায়ের অনুগ্রহ হয়ে ! সেই যে গো—যেবার ফাগুন-চোত্তে রাক্কুসে মারিগুটির মহামারিতে দেশ উজোড় হয়ে গেল—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুধু বললেন—"হুম !" বেশ বোঝা গেল তাঁর রাগ তখনও যায় নি।

বিশুর মা বলে চললো—"বাছা, আমার যেই একটু সেরে উঠলো—নিয়ে পালিয়ে গেলুম একেবারে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে ! ওর কি আর এই বাংলা দেশের ভেতো শরীর দিদি ? পশ্চিমে ডাল-রুটি খেয়ে ছেলে আমার বলতে নেই একটু যেন ছিরি (শ্রী ?) ফিরিয়ে এসেছিল। কিন্তু এলে কি হবে—?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী অসাবধানতা বশতঃ আবার বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন—"এখানে ফিরেই বুঝি ম্যালেরিয়া ধরেছিল ?…" কিন্তু, অতি কষ্টে তিনি জিহ্বা সংযত করে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে রইলেন।

বিশুর মা উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলো—"কিন্তু এলে কী হবে ? নিয়তি ফিরছিল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝেচ কি না ! আসছিলুম গেঁয়োর খাল দিয়ে শালতি চড়ে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী। বিশু তখন সবে দু'বছরের। বড় দামাল দুষ্ট ছেলে। তাকে কোনও মতে কোলের মধ্যে সামলে নিয়ে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা পেটো-বোটের ঢেউয়ের ঘা লেগে শালতিখানা দুলে উঠে কাত হয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না-পেরে আমি পিছুবাগে উলটে পড়লুম। কোল থেকে ছেলে আমার ছিটকে একেবারে খালের জলে ঝপাৎ করে পড়ে গেল !

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে শিউরে উঠলেন। উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে বললেন—"কী সর্ব্বনাশ ! তারপর ?"

বিশুরমা একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠে বললে—"সর্ব্বনাশ ? আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে আমার সর্ব্বনাশ হবে ?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী ভাবলেন "কী বিপদ ! এর সঙ্গে কথা বলাও তো মুস্কিল ? তিনি উঠে পড়লেন। বললেন আজ উঠি দিদি, বেলা গেল। হাঁড়ি হেঁসেল সব পড়ে আছে—"

বিশুর মা গালে হাত দিয়ে বললে—"তুই কি পাষাণ রে ! জলজ্যান্ত ছেলেটা ধড়ফড়িয়ে খালের জলে পড়ে গেল—আর তুই দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁড়ি হেঁসেল করতে চললি—তোদের কি কঠিন প্রাণ !"

বিশুরমা অপ্রতিভ হয়ে আবার বসলেন ও কুণ্ঠিতভাবে বললেন—হ্যাঁ দিদি, বলো তো, চট্ করে বিশুর কথাটা শুনেই যাই। তারপর কী হল ? তুমি বুঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ছেলেকে ডাঙায় তুললে—!"

"নাও কথা ! বলে—সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার ভার্য্যা ? আমি কি তখন খাড়া ছিলুম যে জলে ঝাঁপ খাব ? আমি ত তখন শালতির ওপর চিৎপাত ! কানে শুধু একটা হট্টগোল এসে পৌঁছল—"গেল ! গেল ! গেল !" ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তেই বুঝতে পেরে আমি আর উঠলুম না। শালতির পাটার উপরই গড়াগড়ি খেয়ে—বুকফাটা কান্না শুরু করে দিলুম—বিশুরে ! বাপরে ! ধন আমার !—"

বিশুরমা রীতিমতো মড়া কান্না শুরু ক'রলে দেখে ভীত হয়ে পাশের বাড়ীর গিন্নী তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন—"চুপ চুপ ! দিদি—করছো কি ? পাড়ার লোক শুনতে পেয়ে যে এখনি ছুটে আসবে ! ভাববে সত্যিই বুঝি বিশুর কিছু—"

বিশুরমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—"সত্যি না ত কি মিথ্যে বলছি ?—বিশু আমার গেঁয়োর খালে তলিয়ে গেলে কী হ'ত বলতো—দু'বছরের কচি শিশু—ছেলে ত নয়—যেন ননীর পুতুল—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন "ছেলেকে বাঁচালে কে দিদি ?—"

"কে আবার ? যিনি সবার মরণ-বাঁচনের মালিক ! বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং ! নইলে ওরকম অবস্থায় জলে পড়লে দু'বছরের বাচ্ছা কি বাঁচে ?" কথাটা বিশুরমা বেশ গর্ব্বের সঙ্গেই বললে !

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার যথার্থ ই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বিহ্বল ভাবে বললেন—"দিদি, তোমার কী ভাগ্য ! স্বয়ং ভগবান বিশ্বনাথকে তুমি সশরীরে দর্শন করেছ'। তোমাকে দেখলেও পুণ্যি ! সার্থক ছেলে গর্ভে ধরেছিলে। বিশুর জন্তেই ত বিশ্বনাথকে দেখতে পেলে ?"

বিশুরমা এবার বিরক্ত হয়ে বললে—"তুইত ভারি ন্যাকা মেয়েমানুষ দেখ্ছি ! বলি, ঠাকুর দেবতা কি সশরীরে দেখা দেন না কি ? তবে, হাঁ, মনে হ'ল বটে তিনিই আমার বিশুকে কোলে করে এনে আমার কোলে ফিরিয়ে দিলেন !"

পাশের বাড়ীর গিন্নী ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন—"সে কী রকম ?"

বিশুরমা ধমক দিয়ে বললে"—তোর যে আর সবুর সইছে না লো ! বলতেইত বসেছি তোকে সব। মন দিয়ে শোননা—বিপদভঞ্জন নারায়ণ মধুসূদনের কৃপায়—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন—"এই যে বললে তুমি বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং—"

বিশুরমা আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ! বললেন—"তোর মতো নাস্তিক মেয়েত' আমি কখনো দেখিনি ? হ্যাঁরে ! তোরা কি হিঁদুর ঘরে জন্মাসনি ? একথা কি কখনও শুনিসনি যে হরিহর একাত্মা ! যিনিই নারায়ণ তিনিই শিব—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী শেষটা শোনবার জন্ত অধীর হয়ে উঠছিলেন, আর কথা না বাড়িয়ে বললেন—"অপরাধ হয়েছে দিদি, মাপ করো। আমি বুঝতে পারিনে। তারপর কি হ'ল ?"

"হবে আর কি? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ওতো আর আমার যেমন তেমন ছেলে নয় যে জলে পড়লেই ঘটি বাটির মতো ডুবে যাবে?" বলে বিশুর মা বেশ গর্ব্বের সঙ্গেই চারিদিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিল।

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার অতি সাবধানে বললেন—"তা ত বটেই?"

বিশুরমা বলে চললো—"মা কালী রক্ষে করলেন! দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী আমার নাড়ী-ছেঁড়াধন ফিরিয়ে দিলেন। সেখানে তখন জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছিল। খোকন গিয়ে পড়লো সেই জালে—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—"তাই বলো দিদি! ধড়ে আমার প্রাণ এল এতক্ষণে! খোকোন তাহলে জলে পড়েনি—জালে পড়েছিল?"

"আ মর্ মাগী! তুই কি রকম ন্যাকা বলতো? বলি জল না হ'লে কি জেলেরা ডাঙায় জাল পেতে বসেছিল?" বলে রোষকষায়িত নেত্রে বিশুরমা পাশের বাড়ীর গিন্নীর মুখের দিকে চাইলে।

পাশের বাড়ীর গিন্নী ভীত হয়ে উঠে বললেন—"ওমা! তাও তো বটে! জল না হলে জাল ফেলবে কোথা? জালত আর তারা রোদে শুকোতে দেয়নি যে ডাঙায় বিছবে?—তারপর দিদি?"

বিশুরমা ক্রোধ সম্বরণ করে নিয়ে একটা ঢোক গিলে মুখে আর একটা পান ও খানিকটা দোক্তাপুরে বললে—"তারপর কি হ'ল—না, খোকা যেই জালে গিয়ে পড়ল জেলেরা অমনি নিশ্চয় বড় গোছের রুই কাত্‌লা পড়েছে মনে করে তাড়াতাড়ি সড় সড় করে টেনে জাল গুটিয়ে ফেললে। খোকা তখন জালে জড়িয়ে পরিত্রাহি কাঁদছে!—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী পরম আগ্রহে বললেন "তারপর?"

"তারপর আর কি? আমার কোলের ছেলে কোলে ফিরে এল! বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং যেন ধীবর-মূর্ত্তি ধ'রে আমার বিশুকে আমার কাছে দিয়ে গেলেন।"

পাশের বাড়ীর গিন্নী বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—"বাবার দয়ায় কি না হয়?"

বিশুরমা বললে—"যা বলছিস বোন—নইলে সেবার যখন বিশু ছাদ থেকে পড়ে—"

পাশের বাড়ীর গিন্নী উঠে পড়ে বললেন—"ওটা কা'ল শুনব দিদি!"

(দ্বিতীয় দিন)

শ্রীরাধারাণী দেবী

পরের দিন দুপুরে পাশের বাড়ীর গিন্নী কিন্তু আর বিশুরমা'র কাছে এলেন না। বিশুরমা কিছুক্ষণ তার অপেক্ষায় থেকে পান দোক্তার কৌটা হাতে নিয়ে নিজেই পাশের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। পাশের বাড়ীর গিন্নী তখন ঘরের মেঝের মাদুর বিছিয়ে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন। বিশুরমাকে সশরীরে উপস্থিত হতে দেখে ভয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বিশুরমা কোনোদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে মাদুরের একপাশে জাঁকিয়ে বসে পড়ে বললেন, "কই গো! কাল যে তুমি আসবে বলে এলে, কিন্তু আজ গেলে না কেন?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী আমতা আমতা করে বললেন—"ভাত খেয়ে উঠে আজ শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো দিদি, তাই ভাবলুম একটুখানি গড়িয়ে নিই, তারপরে তোমার ওখানে যাব। তা ভাই, তুমি এসে ভালই করেছ।"

বিশুরমা বললেন, "আসব না? তুমি বলো কি ভাই? শেষে কি আধকপালে ধরে মরবো? কাল যে তোমাকে বাবা বিশ্বনাথের দয়ার গল্প বলছিলুম, সে তো শেষ হয়নি বলা।"

পাশের বাড়ীর গিন্নী মনে মনে প্রমাদ গণলেন। বিশুরমা একবার বকতে শুরু করলে সহজে থামবে না। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঘরসংসারের কাজের ক্ষতি হবে। কিন্তু উপায়ই বা কি? বাড়ী বয়ে গল্প করতে এসেছেন ভদ্রমহিলা!

বিশুরমা ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন—"কী ভাবছো দিদি? কাল কোন অবধি শুনেছো, এই তো? কাল বিশুর ছাদ থেকে সেই পড়ে যাওয়ার কথা শুরু করেছিলুম, ঠিক মুখে তুমি উঠে পড়লে।"

পাশের বাড়ীর গিন্নী নিরুপায় হয়ে করুণ ভাবে বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার কথা বলেছিলে বটে। বিশু বুঝি একতলার ছাদ থেকে—"

বিশুরমা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"একতলার ছাদ?—তুমি যে দেখি যা' মুখে আসে তাই বলে যাও!! আমার বাপের বাড়ী একতলা? ঘাটালের ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যের নাম তিনটে জেলার লোক জানে। চকমেলানো তেতলা বাড়ী—ঠাকুরদালান—চণ্ডীমণ্ডপ—রাসমঞ্চ—"

বিশুরমা হয়তো আরও ফর্দ দিতেন, কিন্তু পাশের বাড়ীর গিন্নী চট্ করে বললেন—"ও মা! তা আর জানিনি? তোমার বাপের বাড়ী—সে তো শুনেছি ঠিক রাজবাড়ীরই মতো! তা' বিশু কি—"

খুশী হয়ে বিশুরমা হেসে বললেন—"তবে আর বলছি কি বোন? মামার বাড়ীর ছাদ থেকেই তো পড়েছিল সেবার। তখন ওর বয়েস বছর আষ্টেক হবে। ডাগর হয়েছে। মামাতো ভাইয়েদের সঙ্গে ছাদে গেল ঘুড়ি ওড়াতে। সেকেলে বাড়ীর ন্যাড়া ছাদ জানইত, ছেলে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখতে দেখতে কখন যে পিছু হেঁটে কার্ণিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল নিজেই টের পায়নি। তারপর যেই তার মামাতো ভাইয়েরা প্যাঁচের টানে ঘুড়ি কেটে দিয়েছে, অমনি 'ভো-কাট্টা—' বলে আহ্লাদে লাফ্ দিতে গিয়ে একেবারে তেতলার ছাদ থেকে উল্টে পড়ে গেল নীচে—"

পাশের বাড়ীর গিন্নীর দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—"ওমা! কী হবে? ছেলে যে গুঁড়ো হয়ে যাবার কথা!"

বিশুরমা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো বটেই বোন! ছেলেকে কি আর জ্যান্ত ফিরে পেতুম?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী বললেন, "এবারও নিশ্চয়ই ওকে বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেছিলেন?"

"—সে আর বলতে! বাবা বিশ্বনাথের দয়া না থাকলে আমার বিশুকে আজ তোমরা কি কেউ চখে দেখতে পেতে?" জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন বিশুরমা।

পাশের বাড়ীর গিন্নী কৌতূহলে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "—কেমন করে বাবা সেদিন বিশুকে রক্ষা করলেন দিদি?"

ধীরে সুস্থে হাতের কৌটা খুলে বিশুরমা একটা পান আর খানিকটা দোক্তা মুখে পুরে ঠোঁট চেপে বললেন—"বাবার দয়ার কি সীমা আছে? রাজু ধোবা আমার বাপের বাড়ীর রজক। ভাগ্যে সেদিন রাজু খিড়কীর পুকুরে আমাদের বড়ো মশারীটা কেচে বাগানের গাছে গাছে বেঁধে টাঙিয়ে শুখুতে দিয়েছিল! পড়বি তো পড় ছেলে আমার গিয়ে পড়লো ঠিক সেই মশারীর চালের উপরে। বাবা বিশ্বনাথ যেন কোল পেতে দাঁড়িয়েছিলেন ওকে ধরবার জন্তেই।"

"—উঃ, বড্ড বেঁচে গেছে তো দিদি!" পাশের বাড়ীর গিন্নী বললেন, "শুনেত ভাই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!"

"—উঠবে না? বলে গাঁ'শুদ্ধ লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল—তুমি তো ছেলেমানুষ! শমনের থেকে ছেলেকে ফিরে পেয়েছি দিদি। বিশু আমার যমের মুখ থেকে ফিরে পাওয়া ছেলে।" বলে বিশুরমা আর একবার অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করলেন।

পাশের বাড়ীর গিন্নী বললেন—"বাবা বিশ্বনাথ দেখছি এবার রজকরূপে এসে তোমার বাছাকে বাঁচিয়েছেন। সেবার ধীবর রূপে—"

কথাটা তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে বিশুরমা বলে উঠলেন "তাই কি এক আধবার? এমন কতোবার যে হয়েছে শুনলে তোমার চক্ষু স্থির হয়ে যাবে! তবে বলি শোনো—সে একবার কালীপূজোর সময় বাজী তৈরী করবে বলে বায়না ধরে আমার কাছে দু'টো টাকা চেয়ে নিলে। তখন ওর বয়েস বছর বারো হবে। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে জুটে বাজী তৈরী করতে গেছল। আমি মনে করেছিলুম, তুবড়ী টুবড়ী এই রকম কিছু আতসবাজী বানাবে বোধহয়। হতভাগা ছোঁড়াগুলো যে ওকে কুবুদ্ধি দিয়ে ভুঁই পটকা, বোমা এই সব সর্বনেশে-বাজী তৈরী করতে পরামর্শ দিয়েছে কে জানে? একরাশ কলেরাপটাশ মোমছাল গান পাউডার এনে হতচ্ছাড়া ছেলেগুলো বোমা বানাতে বসেছিল। নারকেলের মালায় ভরে যখন পাট জড়িয়ে বাঁধছে—বিশুর তখন খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। সে উঠে এসেছিল বাড়ীর ভিতরে জল খেতে। এমন সময়ে বলবো কি বোন! বাইরের ঘর থেকে এমন একটা বিকট আওয়াজ এল যেন একশোটা বজ্রাঘাতের আওয়াজের চেয়েও বেশি তার শব্দ! ঘরবাড়ী সমস্ত থর থর করে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই কাণে এলো ছেলেগুলোর 'বাপরে! মারে!' হাঁউ মাউ ভীষণ চীৎকার। 'দেখ দেখ কী হোলো!' সবাই ছুটলুম বাইরের ঘরে। গিয়ে দেখি চারিদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। বিচ্ছিরী বিদ্ঘুটে বারুদের দুর্গন্ধে নাকে কাপড় চাপতে হোলো। বোমা ফেটে চোট খেয়েছে ছেলেগুলো সব কটাই। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। কারুর হাতের সব কটা আঙুল উড়ে গেছে। কারুর পা একোঁড় ওকোঁড়! একজনের মাথার খুলি ফেটে চৌচির!! কামারদের সেই ছেলেটা তো তখুনিই মারা গেল। অন্তগুলো ছ'মাস হাসপাতালে পড়ে থেকে—কাণা খোঁড়া হুলো হাবা—এক একটা এক একরকম হয়ে বাড়ী ফিরলো।"

পাশের বাড়ীর গিন্নী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"ভাগ্যে বিশুর তেষ্টা পেয়েছিল দিদি! তুমি ঠিকই বলো, মারে কৃষ্ণ রাখে কে—"

বিশুর মা খুব জোরে হেসে উঠে বললেন—"আ মর্! "মারে কৃষ্ণ" কী রে! বল্ "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "ওই—ওই হোলো গো। তাই বলতেই চেয়েছিলুম। মুখ্যু মানুষ, উল্টো করে বলে ফেলেছি। তা' বাবা বিশ্বনাথ এবার পিপাসা রূপে এসে তোমার ছেলেকে রক্ষে করেছেন ভাই।"

বিশুর মা বললেন, "ও কথা কি বলছো দিদি! এই তো মাত্র হপ্তা দুয়েক আগের কথা। বিশু আমার ইস্কুল থেকে ফিরছে, হঠাৎ একটা ষাঁড় ক্ষেপে তেড়ে আসছে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে রাস্তা পার হয়ে এধারের ফুটপাথ থেকে ওধারের ফুটপাথে উঠতে যাবে ঠিক সেই মুখে একটা মস্ত হাতীর মতো মিলিটারী ল্যরী আসছিল গোঁ গোঁ শব্দে ওদিক থেকে। ছেলে পড়লো ধাক্কা খেয়ে একেবারে সেই মিলিটারী গাড়ীর তলায়।"

পাশের বাড়ীর গিন্নী শিউরে উঠে বললেন "ওমা কী হবে! তারপর? ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তো?"

বিশুর মা দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন—"শত্রুর ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাক। আমার বিশু বাবা বিশ্বনাথের দোর-ধরা। বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং ওকে বাঁচিয়ে দিলেন। ও পড়েছিল লম্বালম্বি-ভাবে উপুড় হয়ে সোজা সেই মিলিটারী ল্যরীর তলায়। গাড়ী চলে গেল ওর উপর দিয়ে। রাস্তায় ভীড় জমে গেল। সকলেই হায় হায় করছে। এমন সময়ে দেখা গেল বিশু গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বাছার গায়ে আমার আঁচটুকু পর্য্যন্ত লাগেনি।"

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে গম্ভীরভাবে বললেন—"একেই বলে দিদি—যথার্থ—বিশ্বনাথের দয়া। তোমার উপরে ভগবান প্রসন্ন, নইলে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কখনও কোথাও ঘটতে শুনিনি। তবে হ্যাঁ, চোখে দেখে এসেছি বটে একবার।"

বিশুর মা একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"সে আবার কেমন কথা গো? যা' কখনো কাণে শোনোনি বলছো, তা' চোখে দেখলে কী রকম?"

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার একগাল হেসে বললেন—"ওমা! তা' জানোনা বুঝি দিদি? একবার আমার বড় মেয়ে আমাকে কোথায় যেন কোন হাউসে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেছলো। সেখানে সব জ্যান্ত ছবি দিদি, কথা বলে, গান গায়। সেই বায়োস্কোপের ছবিতে দেখেছিলুম, রেলের ইঞ্জিনে কাটা পড়েও বেঁচে উঠলো, বন্দুকের গুলি খেয়েও মরলো না, জাহাজ থেকে অগাধ সমুদ্রের মাঝ মধ্যিখানে ফেলে দিলেও সাঁতার কেটে ডাঙায় এসে উঠলো, প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়ালো। তুমি বাপু বিশুকে একটু সাবধানে রেখো। বায়োস্কোপের লোকেরা যদি ওর সন্ধান পায় নিশ্চয় ওকে ধরে নিয়ে যাবে!" কথাটা শুনে বিশুর মায়ের মনটা সত্যিই এত খারাপ হয়ে গেল যে জবাব দেওয়ার কথা আর মনে এলনা। আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী চলে গেল।

বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈতের অমর-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়া যেমন চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের জন্যও নদীয়া তেমন জগদ্বিখ্যাত। বিদ্যা-চর্চার বিবরণ ও জ্ঞানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নদীয়ার ইতিহাস।

আমি এইরূপ একজন মহাত্মার কথাই আজ সুধীজন সমাজে নিবেদন করিতে প্রয়াস পাইব। ইঁহার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দেবগ্রাম একসময়ে সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল এবং ঐতিহাসিকদিগের মতে এইখানেই কল্যাণবর্ম্মা প্রভৃতি বর্ম্ম-বংশীয় নৃপতিবর্গ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ দেবগ্রামেই ব্যাকরণাদি বাল্যকালের পাঠ সমাপনপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে নরোত্তমঠাকুরের শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য্যের পুত্রগণ সৈয়দাবাদের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও নিকট তিনি ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। সৈয়দাবাদ নিবাসী রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। (১) তদবধি তিনি গুরু-গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাদি আলোচনায় অতিবাহিত করিতে থাকেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিমত্তায় বিশ্বনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সৈয়দাবাদেই "অলঙ্কার কৌস্তুভের" তৎকৃত "সুবোধিনী" টীকা সম্পূর্ণ হয়। (২)

বিবাহিত হইলেও বাল্য হইতেই বিশ্বনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে তিনি সংসার ত্যাগ করিতে বাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্রের (৩) অনুমতি লইয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়াই তিনি তাঁহার অমর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ রচনা করিয়াছিলেন,—

"করিলেন বাস রাধাকুণ্ড সমীপেতে।
রচিলেন বহু গ্রন্থ ব্যাপিল জগতে॥"

তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা "সারার্থ-দর্শিনী"ও এইখানেই পরিসমাপ্ত হয়। (১৭০৪ খৃঃ অঃ) (৪) ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বিখ্যাত পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যে শ্রীশ্রীব্রজধামের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে পাথুরিয়াঘাটায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। কাজেই তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই—ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণির কেবল পূর্ব্ব বিভাগ রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। এই ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিই প্রথম পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে ৪৫ জন কবি রচিত ৩০১টি পদ ত্রিশটি ক্ষণদা অর্থাৎ উৎসব রজনীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষণদার প্রারম্ভেই একটি গৌরচন্দ্র বিষয়ক ও একটি নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ আছে। বিশ্বনাথ নিজেও সুকবি ছিলেন। "হরিবল্লভ" ও "বল্লভ" ভণিতায় তিনি অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে অপরাপর কবির সহিত তাঁহার স্বরচিত পদগুলিও উদ্ধৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কোন পদ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে নাই। বিশ্বনাথের স্ব-রচিত পদগুলি বড়ই মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী। রচনাভঙ্গি এরূপ চিত্তাকর্ষক যে উহা এইখানে একটু উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্ন্যাসগ্রহণান্তর নিমাই শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে আগমন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ এই সংবাদ নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট জানাইলে, শচীমাতা "দুখিনীর ধন" নিমাইকে দেখিতে আসিবার জন্য তাঁহার সহচরীকে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন—

"হেদেগো মালিনি সই অদ্বৈত মন্দিরে চল যাই।
নিমাই আইলা তাহা কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশ-হীন কেমনে দেখিব।
দণ্ডকমণ্ডলু দেখি পরাণ তেজিব॥
ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
দুখিত বল্লভ যায় কান্দিতে কান্দিতে॥"

এই কয়েকটী কথায় মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম-বিগলিত যে করুণ মূর্ত্তিখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নহে।

বিশ্বনাথ যে সমুদয় টীকা ও গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৩৬ খানির পরিচয় পাওয়া যায় প্রধান প্রধান কয়েকখানির নাম :—(১) সারার্থ-দর্শিনী (ভাগবতের টীকা), (২) সারার্থ-বর্ষিণী (গীতার টীকা), (৩) সুবোধিনী (অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকা), (৪) সুখবর্ত্তিনী (আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূকাব্যের টীকা), (৫) বিদগ্ধ মাধবের টীকা, (৬) আনন্দ-চন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা), (৭) শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, (৮) স্তবামৃত লহরী, (৯) চমৎকার-চন্দ্রিকা, (১০) প্রেম-সম্পুট, (১১) গোপীপ্রেমামৃত, (১২) গোপাল-তাপনীর টীকা, (১৩) ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু, (১৪) উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ, (১৫) ভাগবতামৃত কণিকা, (১৬) রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা, (১৭) মাধুর্য্য কাদম্বিনী, (১৮) ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী, (১৯) গৌরাঙ্গলীলামৃত, (২০) সঙ্কল্প কল্পদ্রুম, (২১) স্বপ্নবিলাসামৃত, (২২) গৌরগণোদ্দেশ চন্দ্রিকা, (২৩) চৈতন্য-চরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা, (২৪) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সংস্কৃত টীকা।

ইহার মধ্যে ভাগবত, গীতা, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, উজ্জ্বলনীলমণি, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, বিদগ্ধ-মাধব প্রভৃতির টীকা প্রামাণিক বলিয়া আজও বৈষ্ণব-সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে। কাব্যগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, প্রেম-সম্পুট, স্বপ্ন-বিলাসামৃত প্রভৃতি বড়ই হৃদয়গ্রাহী, বড়ই উপাদেয়। বিশেষতঃ প্রেম-সম্পুট কাব্যে তিনি রাধা-প্রেমের যে সুন্দর বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমন উপদেশপূর্ণ। (৫) ভক্তি রসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ভাগবতামৃতকণা, উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ এই তিনখানি গ্রন্থ, শ্রীপাদরূপ গোস্বামী বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘু-ভাগবতামৃত, এবং উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্তসার। গোস্বামি-পাদের কঠিন তত্ত্ব-সম্বলিত গ্রন্থগুলির সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করিয়া বিশ্বনাথ সাধারণের যে কতদূর উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশ্বনাথের আর এক কীর্ত্তি চৈতন্য-চরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকা প্রণয়ন। ইহাতে ভাষা-জননীর যে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের এত সৌভাগ্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঁচিয়া থাকিলে যে বিশ্বনাথকে তিনি কি বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বিশ্বনাথের সমুদয় গ্রন্থই ভক্তিপ্রধান। এই জন্য তিনি শ্রীপাদ্ জীব

---

(১) নরোত্তম বিলাস—গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় প্রসঙ্গে বর্ণিত (বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত)।

(২) সৈয়দাবাদবাসি শ্রীবিশ্বনাথাখ্য শর্ম্মণা চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী।

(৩) ইঁহারা তিন সহোদর—জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ এবং বিশ্বনাথই কনিষ্ঠ।

(৪) রসঋষিষড় ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
গুরু র্ম্মতাং দিতে বাধে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

(৫) প্রেম-সম্পুট—রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৮)

গোস্বামী প্রভৃতির পরে বৈষ্ণব-সমাজের নেতারূপে পূজিত হইয়াছিলেন। বিশ্বকে ভক্তিপথ প্রদর্শনের জন্য ও ভক্ত-চক্রে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া চক্রবর্তী ; এইরূপে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার নাম ব্যাখ্যাত হইত,—

বিশ্বস্যনাথরূপোহসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রেবর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়া ভবৎ॥

যৎকালে বিশ্বনাথ রাধাকুণ্ড তটে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় গোবিন্দ ভাষ্য ও অপরাপর বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ তৎসকাশে উপনীত হন। বলদেব তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া জয়পুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নেতারূপে শাস্ত্রার্থ-বিচারে জয়লাভ করেন এবং ফলস্বরূপ তথাকার গোপালদেবের সেবাধিকার প্রাপ্ত হ'ন। তদবধি জয়পুরে, বিশ্বনাথকে আপনার গুরু স্থানে ধ্যান করিতেন।

ফলতঃ, অদ্ভুত বৈরাগ্যে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, অগাধ শাস্ত্রবিদ্যায়, অলৌকিক ভক্তিতে ও মধুর কবিত্বে, বিশ্বনাথ যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায়শই বিরল।

বিশ্বনাথ বহুদিন হইল এ মরধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত হইবার অনেকেরই সৌভাগ্য হয় না। বাঙালীর ধন, বাঙালী ভাল করিয়া চিনে নাই। বোম্বাই প্রদেশের জাম্বিয়া এষ্টেটের অধীন শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানের মঠটীই এখন এই মর-জগতে তাঁহার একমাত্র স্মৃতি-কথা।

একখানি খাম

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

তাইতো, খামখানা এখানে কে ফেলে গেল! হাতে নিয়ে ঘুরছিল বোধ হয়, এখানে বসে বিশ্রাম করবার সময় ফেলে গেছে। লোকটি বড় অন্যমনস্ক দেখছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এমন সময় আবার সে ফিরে এসে খোঁজ করবে, তাতো মনে হচ্ছে না। এতক্ষণে হয় তো ট্রাম তাকে বাড়ী পৌছে দিলে।

লোকটি কি করে? চাকরী-বাকরী করে বোধ হয়। অফিস ফেরত ময়দানে একটু হাওয়া খেতে এসেছিল। খামটা নিশ্চয় আজ বাড়ী থেকে এসেছে। কত দূরে বাড়ী? অনেকদিন বাড়ী যায় নি, মনটা তাই চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। খোকাটা পা পা করে হাঁটে, দুহাত বাড়িয়ে সবাইকে ধরতে যায়। টুমুর তো আর কথা নেই, রোজ বিকেলে মোটরবাসের শব্দ পেলেই বলবে, বাবা আসছেন। কত অনুরাগ, কত বিরহকাতর প্রতীক্ষা! তাইতো, স্ত্রীর চিঠিখানা ভদ্রলোক এমনভাবে ভুলে ফেলে গেল!

কিম্বা তা নাও হতে পারে। এটি হয়তো কোন বেকারের চাকরীর দরখাস্ত। সমস্ত দিনটা ঘুরে ঘুরে কেটেছে, অবশেষে শ্রান্ত হয়ে এখানে এসে বসতে মৃদুমন্দ হাওয়ায় একটু ঘুমের আমেজ এসেছিল, হস্তচ্যুত হয়ে খামখানা কখন যে পড়ে গেছে, তার খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে চমকে চেয়ে দেখেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে, ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠেছে দূরে দূরে, ব্যস্ত হয়েছে বাড়ী ফেরবার জন্যে। কয়েক মাইল পথ হাঁটতে হবে শ্রান্ত শরীরের চেয়েও শ্রান্ত মনকে বহন করে। তাহলে তার ভুল হওয়া আশ্চর্য নয় দেখছি।

হয়তো এও না হতে পারে, হয়তো এটি কোন কবির কবিতা। কবিতাটি হয়তো কাগজে পাঠাবে কি না পাঠাবে, ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার রাগরক্তিম সলাজ মুখখানি চোখে পড়েছিল। ঈর্ষা জেগেছিল মনে সেই সঙ্গে চন্দ্রদেবকে আকাশে হাসতে দেখে। যে কবি পৃথিবীর সকল প্রণয়ীর মধুগুঞ্জন নিবেদন করে পৃথিবীর সকল প্রণয়িনীর কাছে, সে আজ ঈর্ষায় বশীভূত হল, এটা তো আশ্চর্যের কথা। খামখানা ভুলেছে, তাতে ক্ষতি নেই, নিজের বাড়ীর ঠিকানা আজ ভুল করবে না তো?

কিন্তু এমনও হতে পারে, যা ভাবছি তা নয়, এটি কোন প্রণয়ীর চিঠি। কত মধুসিঞ্চিত করে, কত চিন্তা ও ভাষার সঙ্গে রফা করে, কত প্রীতিপ্রদ পরিশ্রম করে লেখা চিঠিখানি! নির্জনতায় যখন লেখনী চলছিল, ছায়ামূর্তিতে প্রিয়তমা এসে দাঁড়িয়েছিল, হেসে বলেছিল, এত ভাবনা কর কেন আমার জন্যে? বরমাল্য তো তোমাকেই আমি দেব। উদ্বেগ ব্যাকুল নয়নে প্রণয়ী অস্ফুটে কি বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছিল তার দুস্তর ভাবনার কলস্রোত, তার উৎকণ্ঠা, আকুতি, কতটুকু থেকে যে কত বড় ব্যাপার ঘটতে পারে, চাপল্যময়ীদের কাছে অচপলদের সেটা সহজবোধ্য করা সামান্য কথা নয়। হায়, এমন আবেগ, এমন অনুভূতি, এমন ভালবাসা আর কোন বয়সের চিঠিতে পাওয়া যাবে। কুমার চিত্তের অনুরাগের কি তুলনা মিলে? সমস্ত চিঠিখানি একখানি প্রেম কাব্য। কি দুঃখের কথা, এমন চিঠিখানি ফেলে গেল।

খামখানা আমাকে ভাবিয়ে তুললে দেখছি। খুলে দেখব একবার? পরের চিঠি খোলাটা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে লেটার বক্সে ফেলে দিয়েই যাই না কেন? মনটা কিন্তু খুঁৎ-খুঁৎ করছে। সত্যি, খাম জিনিসটা চিরকাল একটা জটিল রহস্য। হাতে নিলে বুঝবার উপায় নেই, হাতে মধু দিলে, না আগুন দিলে। যে খাম এক মুহূর্তে নাচিয়ে তুলতে পারে, সেই খামই আবার লুটিয়ে কাঁদাতে পারে, কারুর সর্বনাশের খবর তার নিজের হাতে এর চেয়ে মর্মান্তিক উপায়ে দেওয়া যায় না; তার রাজ্য-লাভের খবরও এর চেয়ে চকিতপ্রীতিকরভাবে মিলতে পারে না। খাম শুধু গোপনীয় কথারই সমষ্টি নয়, খাম একটি সংবাদপত্র—পাড়াপ্রতিবেশী, নিকট ও দূরস্থিত আত্মীয় পরিচিত মিলিয়ে একটি সংসারের ইতিবৃত্ত। এমন প্রার্থিত বস্তুও বেশী নেই। যে পায়, সে ভাবে, সে সব পেল; যে পায় না, সে ভাবে, তার কিছু নেই। খামই সংসারের বন্ধন; যার জীবনে খামের প্রয়োজন নেই, তার সংসারগ্রন্থি কত শিথিল।

একটি খামের ভেতর শত সহস্র নমস্কার, লক্ষ কোটি প্রণাম, অজস্র ভালবাসা, শত সহস্র চুম্বন; একটি খামের ভেতরই আবার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস, নীরব বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, করুণ অশ্রুবিন্দু।

নাঃ, আর অপেক্ষা করতে পারি না। অপরাধ একটু হোক, কে আর দেখবার আছে, খুলেই ফেলি।

ও হরি, এ যে আমারই চিঠিখানা। পকেট থেকে কখন টুপ করে পড়েছে। কিছুই নেই, শুধু পুরোণ কতকে কয়েকটা ছোট কাগজ। তাহলে ভাবনার কিছু নেই, বাঁচা গেল। খাম সত্যিই একটা মুস্কিলের জিনিস।

স্বর্ণ বিক্রয় সমস্যা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা। যুদ্ধকালীন সরকারের যে ভুল সিক্কা নীতি ও অর্থনৈতিক ত্রুটী বিচ্যুতি আজ ভারতবাসীর জীবনকে এক চরম দুর্দ্দশার পথে টেনে এনেছে, সেই সব অতীতের ভুলগুলিকে আজ আবার সরকার আংশিকভাবে সংশোধন করতে চাওয়া সত্ত্বেও আমরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও অন্যান্য ভোগ সামগ্রীর ঘাটতিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে যখন আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম, সরকারী তরফ থেকে সেদিন বিদেশ থেকে কিছু কিছু মাল আনাবার ব্যবস্থা করা হল; সরকার একবার বিবেচনা করেও দেখলেন না যে এতে আমাদের নবজাত শিল্পগুলি কিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা রেলগাড়ীতে যাত্রীর অস্বাভাবিক ভিড়ের কথা নিয়ে কিছুদিন হৈ চৈ করলাম, ফলে গত রেলওয়ে বাজেট পেশের সময় যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল ভিড় কমাবার উদ্দেশ্যে শতকরা ২৫৲ টাকা হারে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করবার প্রস্তাব করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দেশব্যাপী প্রতিবাদের দরুণ, সরকার এখনকার মত সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন। (১) তারপর আমরা সরকারের যুদ্ধব্যয় নীতি যা আজ আমাদের ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি নামক এক কুটিল সর্পের সম্মুখে এনে ফেলেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠি। বিলেতের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বাবদ বহুদ্রব্য এদেশ থেকে খরিদ করে চলেছেন, আর তার মূল্য নিজেদের কাগজী মুদ্রা ষ্টার্লিংএ পরিশোধ করছেন। আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই সব ষ্টার্লিংএর পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে নোট ছাপিয়ে এদেশের বিক্রেতাদের পাওনা মিটাচ্ছেন এবং এই হ'ল ভারতে আজ মুদ্রাস্ফীতির কারণ। আমরা প্রতিবাদ করে জানাই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের ঋণ ষ্টার্লিংএর পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিয়ে পরিশোধ করতে বাধ্য করা উচিত। কারণ, যেহেতু ষ্টার্লিং শুধুমাত্র একটি কাগজের মুদ্রা এবং এর পশ্চাতে স্বর্ণের কোনরূপ বন্ধন নেই, সুতরাং যে কোন দিন, বিশেষ করে যুদ্ধের পর ষ্টার্লিংএর অবচয় (depreciation) ঘটতে পারে। তাহলে আমাদের পাওনা ষ্টার্লিংএর মূল্যও অনেক পরিমাণে কমে যাবে এবং সেই পরিমাণে আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এছাড়া আমি আরও বলি(২) যে ষ্টার্লিংএর পরিবর্ত্তে সোনা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলে, এদেশে মুদ্রাস্ফীতিরও অনেকটা প্রতিকার হবে। কারণ সোনার পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কাগজী মুদ্রা ষ্টার্লিংএর মত যত খুসী ছাপান বা তৈরী করা যায় না। কাজেই সোনার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে হলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হয়ে এদেশে তাঁদের খরিদের পরিমাণ কমাতে হবে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কও আর এত প্রচুর নোট ছাপিয়ে মুদ্রা-স্ফীতির সুযোগ পাবে না।

গত প্রায় দশমাস যাবৎ আমেরিকা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফত এদেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ বিক্রয় করে চলেছে এবং তাতে যে টাকা তারা যোগাড় করছে তা দিয়ে এদেশে যুদ্ধসংক্রান্ত তাদের মাল খরিদের আংশিক খরচ তারা মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। সোজা ভাবে দেখতে গেলে এ অনেকটা আমরা যা চেয়েছিলাম, ঠিক তাই। অর্থাৎ সোনা দিয়ে তারা এদেশের মাল খরিদ করছে। কিন্তু তবু কেন আবার আজ ব্রিটেন ও আমেরিকার এই স্বর্ণ বিক্রয় নীতির বিরুদ্ধে আমরা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছি, কেনই বা এ ব্যাপারটিকে আমরা আবার সন্দেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছি? কারণ যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি খুবই গভীর। এই প্রবন্ধে আমরা সে বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করব।

যুদ্ধ ও স্বর্ণের মূল্য—গত বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্দ্দিনের পূর্ব্বে বাইশ-তেইশ টাকায় এক ভরি সোনা পাওয়া যেত। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান (Gold Standard) ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং তাতে তাদের মুদ্রা ষ্টার্লিংএর কিছু অপচয় (depreciation) ঘটে। ভারতীয় মুদ্রা টাকা, ষ্টার্লিংএর সহিত প্রতি টাকা ১ শিলিং ৬ পেনি হিসেবে সংযুক্ত ছিল। তাই বিনাদোষে ষ্টার্লিংএর সঙ্গে সঙ্গে টাকারও সেই পরিমাণে অপচয় ঘটল। মুদ্রার অপচয়ের অর্থই হল যে সেই মুদ্রায় পূর্ব্বাপেক্ষা কম দ্রব্য খরিদ করতে পারা যায়—অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালে যে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়, তাতে দ্রব্যের চাহিদা এতই কমে যায় যে তা আর বিশেষ বৃদ্ধি হতে পারল না। কিন্তু আমেরিকা সেই সময় প্রচুর পরিমাণে সোনা কিনতে থাকে, কাজেই সোনার চাহিদা কমল না। ফলে, সেই দুর্দ্দিনে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমে গেলেও সোনার মূল্য ২২৲ টাকা থেকে ১৯৩১ সাল হতে হঠাৎ পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ টাকায় উঠতে এসে ঠেকে। আর এই সময় হতেই স্বর্ণরপ্তানি আরম্ভ হয়ে ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা বিদেশে চলে যেতে থাকে।

তারপর এসে পড়ল বর্ত্তমান যুদ্ধ। যুদ্ধে মুদ্রাস্ফীতির জন্য ভারতীয় টাকার অপচয় ঘটল এবং এতে টাকার ক্রয় শক্তি কমে যাওয়ায় সর্ব্ববিধ দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সোনাও একটি দ্রব্য বিশেষ এবং তাই এর মূল্যও বাড়ল। কিন্তু সোনা শুধু সাধারণ দ্রব্যই নয়, এতে লোকে ধনবিয়োগ করতে পারলে নিরাপদ মনে করে। তাই সোনা মজুত করবার হিড়িক ও ফটকা লাভের জন্য সোনার দর গত বৎসরের মাঝামাঝি প্রায় একশত টাকায় ওঠে। এই ফটকা বন্ধ করিবার জন্য পরে কেন্দ্রীয় সরকার সোনা কেনাবেচার উপর কতকগুলি নিষেধ জারী করায়, এর মূল্য কমে প্রায় আটাত্তর টাকায় এসে ঠেকে। তারপর গত ১৭ই আগষ্ট থেকে আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোম্বাই ও অন্যান্য কেন্দ্রে প্রায় ৭১ টাকা তোলা হিসেবে প্রচুর পরিমাণে সোনা বিক্রী করতে থাকায় সাধারণ বাজারের দরও ঐ মূল্যে নেমে আসে। গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্তই দুইকোটি পাউণ্ড মূল্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ ভরি সোনা এই ভাবে বিক্রী হয়েছে।

স্বর্ণ বিক্রয়ের রহস্য—কিন্তু এই স্বর্ণ কোথা হতে আসছিল? এত বড় একটা ব্যাপার এতদিন ধরে চলছিল, অথচ কারা এবং কি উদ্দেশ্যে এত সোনা বিক্রী করছিল, এ সমস্ত বিষয়ে সরকার আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখেছিলেন। গত নভেম্বর মাসেও অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান বলেন যে এ সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে ('in the public interest') কাহাকেও জানান হবে না। অবশেষে গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি অর্থসচিব আমাদের উৎকণ্ঠা কিছু কমালেন। আমরা তাঁর নিকট অন্তত এইটুকু জানতে পারলাম যে আমেরিকা ও ইংলণ্ড তাদের নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে এই সোনা রিজার্ভ

(১) এ সম্বন্ধে লেখকের লিখিত গত ৫ই মার্চের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" (এলাহাবাদ সংস্করণ) প্রকাশিত "Increase in Railway Fares and the problem of Inflation" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

(২) লেখকের লিখিত ১১ই জুলাই, ১৯৪৩ সংখ্যায় "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত "মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ব্যাঙ্কের মারফত ভারতবর্ষে বিক্রী করছে এবং সেই টাকা দিয়ে তাদের ভারতবর্ষে যুদ্ধসংক্রান্ত মাল খরিদ ও অন্যান্য খরচের কিয়দংশ ব্যয় নির্বাহ করছে। গত বাজেট বক্তৃতায় অর্থসচিব এই স্বর্ণ বিক্রয় নীতির প্রশংসা করে আরো জানালেন যে এতে নাকি মুদ্রাস্ফীতিরও কিছু প্রশমন হবে ('It has: materially supplimented other antinifiationary measure')। কারণ, তাঁর মতে ভারতে বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে আজ যুদ্ধের বাজারে অনেক টাকা এসে জমেছে। (৩) সেই সব অর্থ দ্বারা অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর (consumption goods) চাহিদা না বাড়িয়ে তা তারা এই স্বর্ণ খরিদে নিয়োগ করবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের গত ১৫ই মার্চের বৈঠকে একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারের অর্থবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সি, ই, জোন্স আরও বললেন যে এই সোনা বিক্রয়ের টাকা ছাড়া ভারতের বাকী ঋণ আমেরিকা ডলার (৪) দ্বারা ও ইংলণ্ড পূর্ব্বের মতই ষ্টার্লিং দ্বারা শোধ করছে। পন্থাটিও খুবই ভাল। কারণ পূর্ব্বে তারা তাদের ঋণ কখনই সোনা দিয়ে পরিশোধ করে নি। আজ তারা অন্তত কিয়দংশ খরচ সোনা দিয়ে মিটাচ্ছে। তবে আমরা আবার আজ প্রতিবাদ করি কেন? কিন্তু আমাদের বরাতই মন্দ,—

'অভাগা যে দিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়।'

রহস্যের উদ্‌ঘাটন—সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ্‌টাউন সহরে, ইউনাইটেড পার্লিয়ামেণ্টের এক বিতর্ক সভায় এতদিনের গুপ্তকথা সব বেফাঁস হয়ে গেছে। সেখানকার অর্থ সচিব মিঃ হফ্‌মায়ার জানিয়েছেন যে ১৯৪০ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংলণ্ডের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তিতে স্থির হয় যে দক্ষিণ আফ্রিকা উক্ত ব্যাঙ্ককে প্রতি আউন্স ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং দরে যুদ্ধের সময়ে সোনা বিক্রি করবে। এই সোনা ইংলণ্ড এখন ভারতের বাজারে ১৬ পাউণ্ড দরে বিক্রয় করে প্রায় শতকরা নব্বুই পঁচানব্বুই টাকা লাভ করছে। এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ও শীঘ্রই যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ প্রারম্ভে এই চুক্তি নাচক করে, দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেই উচ্চদরে সোজাসুজি ভারতে সোনা বিক্রী করে লাভবান হতে পারে, সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। জেনারেল স্মাটস্‌ তাদের সান্ত্বনার জন্য অবশ্য বলেছেন যে ভারতে বর্ত্তমানে সোনার বাজার হল চোরা বাজার, তাই দক্ষিণ আফ্রিকা তাতে যোগদান করে লাভবান হতে চায় না। সুতরাং বোঝা গেল যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে সোনা বিক্রয়ে সুযোগ দিয়ে চোরা বাজারের সহায়তা করছেন।

গত ১৭ই এপ্রিল আবার কেপ্‌টাউনে পরিষদের একটি বৈঠকে ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠে এবং জানান হয় যে ইংলণ্ড তাহাদের নিকট হতে আজও প্রতি আউন্স সোনা ১৭১ শিলিং দরে কিনে আমেরিকাকে ১৭৩ শিলিংএ এবং ভারতকে ৩২০ শিলিংএ বিক্রী করে প্রচুর পরিমাণে লাভবান হচ্ছে।

১৯৩১ সনে সোনার দর বেড়ে প্রতি ভরি ৩৫।০৬ টাকা হলে দেশব্যাপী আর্থিক দুর্দ্দিনে পেটের জ্বালায় আমাদের দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে সোনা বিক্রী করতে আরম্ভ করে এবং আমেরিকা সেই সমস্ত সোনা কিনে নিয়ে বসে থাকে। এইভাবে আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হয়ে চলে যায়। এই যুদ্ধে সময় মত নানারূপ সতর্কতা অবলম্বন করায়, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিশেষ মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন হতে পারেনি। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের মত সোনার দরও সেখানে সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। সে দেশে আজ সোনার দর প্রায় ভরি প্রতি ৪২।৫৩ টাকা। আর সেই সোনা আমাদেরই রিজার্ভব্যাঙ্ক মারফত ভারতবর্ষে তারা প্রায় সত্তর থেকে আশী টাকায় বিক্রী করে লাভবান হচ্ছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এতে কপর্দ্দকও লাভ নেই, অথচ চোরা বাজারের বদ্‌নামও কিনতে হচ্ছে। লাভও গেল পেটও ভরল না। কিন্তু উপায় কি? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।

স্বর্ণের অকস্মাৎ মূল্য বৃদ্ধি—পূর্ব্বেই বলেছি যে গত সনের আগষ্ট হতে রিজার্ভব্যাঙ্ক প্রতি ভরি সোনা ৭১ টাকায় বিক্রয় করতে থাকায় স্বর্ণের বাজার দরও ঐ দামে নেমে আসে। গত মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কিন্তু অকস্মাৎ সোনার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাতের মধ্যে নোটের তাড়া গুঁজে দলে দলে বোম্বাই ও অন্যান্য কেন্দ্রের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মুখে লোক ভিড় করতে থাকে। ২১শে মার্চ্চ থেকে ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে রিজার্ভব্যাঙ্ক প্রায় ১৫ লক্ষ সোনা বিক্রী করে ফেলে। এতদিন ব্যাঙ্ক ৭১ টাকা দর রাখতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু আর হয়ে উঠল না। বাজার দর ব্যাঙ্কের দরকে ছাড়িয়ে চলে গেল। সোনার ফাটকা বাজার ও লোকের মজুতের স্পৃহা এতই বেড়ে গেল যে পরদিন হতে সে চাহিদা মিটাবার জন্য রিজার্ভব্যাঙ্কও বাজার দরকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। এইভাবে মার্চ্চ মাসের শেষদিন সোনার দর প্রায় ৮১½ টাকায় আসিয়া ঠেকে।

সৌভাগ্যক্রমে তারপরই বাজারে যেন শিথিলতা দেখা গেল। ইতিমধ্যে রয়টারের সংবাদ এল যে গবর্ণমেণ্ট নাকি পারস্য থেকে এক কোটি ষাট লক্ষ আউন্স রূপা জোগাড় করেছেন ও বাজারে তা শীঘ্রই বিক্রয় হবে। এই সংবাদে রূপা খরিদের আশায় লোকেরা সোনার উপর চাহিদার চাপটা যেন একটু কমিয়ে দিল ও সোনার দর আবার একটু পড়ে গেল। গত ২৩শে মার্চ্চ থেকে ৩০শে মার্চ্চ অবধি এই কয়দিনে মাত্র বোম্বাইয়েই রিজার্ভব্যাঙ্ক মারফত প্রায় কুড়ি লক্ষ তোলা সোনা বিক্রী হয়েছে।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ ১। জাপানীদের আসাম আক্রমণ—এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনেকে নিজেদের টাকা দিয়ে সোনা কিনে মজুত করে রাখবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়।

২। গত বাজেট বক্তৃতায় অর্থ সচিব জানিয়েছেন যে ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী হৈমন্তিক অধিবেশনে কৃষি সংক্রান্ত সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উপর যাতে মৃত্যুকর (Death Duties) বসে তার জন্য বিল পেশ করবেন। মৃত্যুর পর সম্পত্তির কিছু অংশ এইভাবে সরকারের কবলিত হবে এই আতঙ্কে বহু ধনী লোক নিজেদের সম্পত্তির পরিবর্ত্তে সোনা মজুত করে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। এ কারণেও সোনার চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। যুদ্ধে অন্যান্য জিনিষের মূল্য প্রায় তিন চার গুণ বেড়ে গেছে, কিন্তু সোনার দাম সে যায়গায় বর্ত্তমানে রয়েছে প্রায় দ্বিগুণে। তাই স্বর্ণ আজ বাজারে অন্যান্য দ্রব্য থেকে সস্তা। একথা বাজেট বক্তৃতায় অর্থ সচিবও সেদিন আমাদের জানিয়েছেন। তাই সোনা কিনে মজুত করে রাখার ঝোঁকও আজ মানুষের খুব বেশী।

৪। যুদ্ধে কতকগুলি লোক হঠাৎ নবাব হয়েছে। টাকা রাখবার যায়গা আর তারা পাচ্ছে না। সোনাকেই তারা সব চেয়ে নিরাপদ স্থান মনে করে।

৫। বর্ত্তমানে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় ও সোনার থেকে রূপার দাম বেশী। তাই সোনা কেনাটাকে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

(৩) এ সব বিষয়ে সমালোচনার জন্য লেখকের লিখিত জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ সংখ্যা ভারতবর্ষে "কৃষক, কৃষি-আয়কর ও জমিদার" প্রবন্ধটি অথবা *Calcutta Review* **July, 1943**তে লেখকের **"A study in inflation and its Remedy"** প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

(৪) এ সম্বন্ধে লেখকের লিখিত *Amrita Baxar Patrika* **(Northern India edition) March 8 1944**তে প্রকাশিত **"Problem of India's Dollar Balance"** প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ফটোগ্রাফার

শ্রীভানু রায়

একটা ফটো তুলিয়া রাখিবার প্রয়োজন ছিল খুবই। বন্ধু নবীনচন্দ্র প্রেম-ঘটিত অসবর্ণ বিবাহ করিয়া বেনারস চলিয়াছেন, পথিমধ্যে যুগলকে, অতর্কিতে পাকড়াও করিয়াছি এবং ষ্টেশনের ছোট্ট কোয়াটারে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া বন্ধ করিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম—সহর থেকে একটা ফটোগ্রাফার ডেকে এনে, ছবি তুলিয়ে তবে ছুটী। আর পাশের ছোট্ট ঘরে হবে ফুলশয্যে,—আমি আছি পাত্‌বো এ ঘর থেকে কেমন? বন্ধুবর কেমন যেন সামান্ত অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বন্ধু পত্নী, বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর করিলেন—হ্যাঁ এক কাজ করুন সন্তোষবাবু, অমনি সহর থেকে ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পোলাওএর চাল, আর কিছু মাংস নিয়ে আস্‌বেন—পাকস্পর্শটাও সেরে ফেলা যাবে,—আর automatically আপনার ভাতটাও মারা যাবে! আপনার বন্ধুর জাত ত লেখাপড়া করে মেরে দিয়েছি আপনারটা ভাত খাইয়েই শেষ করে দিই—কেমন?—হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম—যথা আজ্ঞা—!

সহর ঠিক বলিতে পারা যায় না—উত্তর বিহারের বেশ বড় একটা গঞ্জ গোছের! মালপত্তরের আমদানী রপ্তানী হয় খুবই—রেল এবং নৌকা উভয় যোগেই! বাজারটার খানিক দূর দিয়াই অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতিতে গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। ষ্টেশনে নূতন বদলি হইয়া আসিয়াছিল সহর সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাই তখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। কয়েকটা বড় চিনির আড়তদারদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল ষ্টেশন হইতে, তাহারা মাল ছাড়াইতে, প্রায়ই আসিত বলিয়া! তাহাদেরি একটা গদিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তস্‌বীর খিচ্‌নেওয়ালা কিসিকো মিলেগা কি নেহি? শিওপূজন সিং কলিকাতায় বহুদিন কাটাইয়া, চিনির কারবার করিয়াছে। পরিষ্কার বাংলায় উত্তর করিল—ফটোগ্রাফার?—নেই কি মশাই—খুব ভাল আছে! সিধে গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে গিয়ে, শেষ মাথায় দেখবেন—একটা খাপ্‌রার বাড়ীতে, সাইন বোর্ড ঝুলছে—মিথিলেশ প্রসাদ সিং ফটোগ্রাফার! অত ভাল ফটোগ্রাফার আপনার পাটনাতেও মিলবে না। তার এক একটা ক্যামেরার দাম কি মশাই তুতিন হাজার টাকা। সবই ত গেছে, আছে শুধু ওই ছাই পাপগুলো—হ্যাঁ দেখুন যাচ্ছেন যখন—একটা গাড়ী নিয়ে যান—সে ভদ্রলোক হাঁটতে পারবেন না—বাতে পঙ্গু কিনা?

উপদেশ মোতাবিক্ একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া মিথিলেশ প্রসাদের দরজায় যখন হাজির হইলাম, তখন বেলা প্রায় পড় পড়। সন্ধ্যা হইয়া গেল, ফটো তুলিবার অসুবিধা হইবে—তাই তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়াই দরজায় ঘা দিয়া দেখি, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ! কড়া ধরিয়া খুব জোরে জোরে নাড়িতে লাগিলাম এবং মাঝে মাঝে কান পাতিয়া রহিলাম ভিতর হইতে কেহ সাড়া দেয় কিনা, শুনিবার জন্ত! খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করিবার পর, কে যেন ভিতর হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম! খুট্ করিয়া দরজার ছিট্‌কানীটা খুলিয়াই দরজাটা এতটুকু ফাঁক করিতেই একেবারে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। শুধু চোখোচোখিই বা বলি কেন, আমি দরজাটা এত ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম যে ঠিক আমার মুখের খুব সামনেই তাহার মুখ আসিয়া পড়িল! আমি অপ্রতিভ হইয়া একটু পিছাইয়া গেলাম! তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—ফটোগ্রাফার সাহাব হ্যায়!

পরিষ্কার উর্দ্দুতে আমাকে ভিতরে বসিতে বলিয়া সে চলিয়া গেলো। সর্ব্বাঙ্গ কাল বোরখায় আবৃত রহিয়াছে—ছোট্ট পা দুখানি, আর দুহাতের আঙ্গুলগুলি চোখে পড়িল। পশ্চিমে অনেক দিন রহিয়াছি—দেখিয়া তাহাকে মুসলমান বলিয়াই মনে হইল। মিথিলেশ সিংহের বাড়ী মুসলমান কেন? ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! ঘরের ভিতর বসিয়াই দেয়ালের চারিদিকে চাহিতেই অনেকগুলি ছবি চোখে পড়িল! সুন্দর করিয়া ফটোগুলি বাঁধান রহিয়াছে এবং ছবিগুলা তোলাও হইয়াছে খুব ভাল। শিওপূজন মোটেই বাড়াইয়া বলে নাই, ফটোগ্রাফার খুব ভালই। উঠিয়া পড়িয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবিগুলা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু একি? ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! সব কটা ছবিতেই জীবনের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যগুলিই যেন সযত্নে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। পাঁচ ছয়টা ছবিও শ্মশান ঘাটেই তোলা হইয়াছে। দুই চারিটী ছবি বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের। মৃত শিশু মায়ের কোলে বন্যার জলে ভাসিয়া চলিয়াছে! খানদুয়েক বোধহয় রেলওয়ে দুর্ঘটনার! দেহ হইতে মাথা প্রায় বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে! দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! আশে পাশে চাহিয়া দেখিলাম জীবনের চিহ্নমাত্র কোথাও যেন বিদ্যমান নাই! তাড়াতাড়ি চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িলাম! এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। ঘরের কোণে একটা কাঁচের আলমারীতে, একটা পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে! গা-টা হঠাৎ যেন কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল! রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, গাড়োয়ানটা গাড়ীর মাথায় বোধ হয় বসিয়া ঝিমাইতেছে! ঘোড়া দুটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ঠুক্ ঠুক্ শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া গেলো। সামনে চাহিয়া দেখি, ঠিক নাটকে অভিনয়ের সাজাহান যেন আমারি সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। একহাতের ক্র্যাচ্‌টা ঘরের কোণে রাখিতে রাখিতে সম্ভাষণ করিলেন—আদাব বাবু সাহেব! তাহার পর আরাম কেদারা গোছের একটা হেলান চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন—তস্‌বীর খিচওয়ালা হ্যায় বাবু সাহেব? আমি মাথা নাড়িয়া তাহার কথায় সায় দিলাম! তাহার পর আবার প্রশ্ন করিলেন—কেয়া হুয়া থ্যা?—আমি এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে পারিলাম না—তবে, উত্তর দিবার ছলে বলিলাম—সাদি হুয়া! বিষাদের হাসিতে সারা চোখ মুখ ভরিয়া তুলিয়া বলিলেন—আরে ভাই সাহাব সাদি ত হোতিই হ্যায়—মগর উস্‌কি বাদ্? আমি কেমন

যেন অপ্রস্তুত হইয়াই বলিলাম—উসুকি বাদ কেয়া—আভি ত ফ্রিম সাদি হবেই হ্যায়।

একটু যেন বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিলেন—তব্ হামরা পাশ আয়া কোঁও। দেখ্তা নেহি সাম্‌নে? তিনি বোধহয় ছবিগুলার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছিলেন—আমার দৃষ্টি কিন্তু গিয়া পড়িল কঙ্কালটীর উপর। পূর্ব্বোক্ত কঙ্কালটী আলমারীর কাঁচের ভিতর হইতে যেন বাহিরে আসিয়া পড়িতে চায় এমনিভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সামনের দিকে।

আমার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। কেন যে ভয় করিতেছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এদিকে বেলাও পড়িয়া যাইতেছে। আলো থাকিতে না গেলে, আর ফটো তোলার সুবিধা হইবে না। বৃদ্ধের দিকে আর একবার চাহিয়া অনুরোধ করিলাম। তিনি সাফ্ জবাব দিয়া দিলেন, বিয়া সাদির ফটো, তিনি তোলেন না মোটেই।

গাড়ীটা দাঁড়াইয়াই ছিল। অকারণ ভাড়াটা যখন লাগিয়াই যাইবে তখন একেবারে বাজারটা করিয়াই গাড়ীতেই ফিরিব, ঠিক করিলাম। একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আদাব বাবু সাহেব—শুনিয়া চাহিতেই দেখি, তিনি পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে যাইতেছেন।

গাড়ী করিয়া আর বেশী দূর যাইতে হইল না। খানিক দূর গিয়াই ঘোড়া দুটা হঠাৎ যেন থমকাইয়া দাঁড়াইল। একটা গুরু গুরু আওয়াজ মাটির ভিতর হইতে ফুঁড়িয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। ধূলা বালি উড়িয়া আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিল। ঘোড়া দুটা বিশ্রী চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাগিল। গাড়োয়ানটা হঠাৎ টাল সামলাইতে না পারিয়া রাস্তার পাশের বড় নালাটার ভিতরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। বোম্ টোম্ ছিঁড়িয়া ঘোড়া দুটা ঊর্দ্ধশ্বাসে, যেদিকে পারিয়েছে ছুটিয়া চলিয়াছে। কুকুরগুলা কাতরভাবে কেঁউ কেঁউ করিতে সুরু করিয়াছে। তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িতেই মাথাটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেলো। কট্ কট্ করিয়া পায়ের তলার মাটী কাটিয়া চলিয়াছে। দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। চক্ষের নিমেষে দূরে মাগ্নীরামের কাটরাটা একটা লম্বা জাহাজের মত, বার দুই দুলিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। অর্দ্ধেক গঞ্জটা, চোখের সামনে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে একটা বিরাট ভূমিকম্প এইমাত্র হইয়া গেল। নিজেকে নিরাপদ বুঝিয়াই নবীনদের মনে পড়িল। রেলওয়ে কোয়াটারে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, বাহিরে যদি আসিতে না পারিয়া থাকে। তখন ভূমিকম্প থামিয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। ষ্টেশনের কোয়াটারের সামনে আসিতেই দেখি, যে সম্মুখের প্রকাণ্ড মাঠটায় রেলের সকলে জমায়েত হইয়া আছেন...আর তাহাদের সম্মুখে, ছোট ছোট কোয়াটারগুলি, তাসের ঘরের মতন ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। ছুটিয়া কোয়াটারের দিকে যাইব, দেখি, ষ্টেশন মাষ্টার হাত চাপিয়া ধরিয়াছেন—পাগল হয়েচো সন্তোষ—যাবে কোথায় এখন—এখনি আবার shaking হতে পারে। অগত্যা দাঁড়াইয়া পড়িলাম। তারপর আবার বলিলেন—তোমার অত ব্যস্ত হবার কি আছে বাপু? না হয় Reliving Trunkটা যাবে যেতে দাও, দেখ্ছো ত আমাদের অবস্থাটা—ছেলে পিলে নিয়ে এই শীতে... তারপর তোমার বৌদির প্রায় পুরো কিনা—বুঝছেই পাচ্ছ আতান্তরটা—বেশ আছো ভায়া, বিয়ে থা করনি—নির্ঝঞ্ঝাট।

তাঁহাকে কি বলিব, তখন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না কেমন করিয়া বলি, যে আমার কোয়াটারে দুইটী প্রাণী বন্দী হইয়া খানিক পরে, কোয়াটারে প্রবেশ করিয়া দেখি—যে লোহার কড়িটা তাহাদের দুইজনকে যেন পিষিয়া ফেলিয়াছে। বড় ঘরের ছাদটা ধ্বসিয়া তাহাদের মাথার উপর পড়িয়াছে। কি করিব, ষ্টেশন মাষ্টারকে খবর দিলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন—এখন কিছু করা নয়—রেলওয়ে কোয়াটারের ব্যাপার—জি আর পিকে খবর দাও, তা না হলে ফ্যাসাদ হবে শেষে—যত সব শুকনো উপসর্গ। জি আর পিকে সংবাদ দেওয়া মাত্র দারোগা আসিয়া লাশ দুটা দেখিয়া গেলেন। খানিক পরে দেখি, দারোগা সাহেবের মোটর সাইকেলের সাইড কারে মিথিলেশ প্রসাদ সিং—ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া সকলকেই বোধ হয় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আদাব! চমকিয়া উঠিলাম। তাহার পর দারোগা সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিয়া মিথিলেশ প্রসাদ বলিলেন—নেহি দারোগা সাব—হাম ঠিক কর্ লেঙ্গে আভি কাফি লাইট্ হ্যায়!

চাহিয়া দেখিলাম, মিথিলেশ প্রসাদ নিবিষ্ট মনে ক্যামেরা ফিট্ করিতেছেন—দুই বগলে ক্র্যাচ দুটার উপর ভর দিয়া বেশ খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া।

নির্ব্বিকার

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

অজ্ঞাত ভবিষ্যের পানে চেয়ে চলি,—
আশা আর নিরাশার পথের কাঁকর কাঁটা অবিরাম দলি!
বৈশাখের খর-রোদে তৃষিত চাতক হায়! মাথা খুঁড়ে মরে,
ব্যাকুলিয়া ক্লান্ত পাখা, তৃষ্ণা-বারি অন্বেষণ করে।
তুমি আর আমি চলি তৃষিত চাতকসম পথ হতে পথে,
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় নাকো—ব্যর্থ মনোরথে
তাই পুনঃ ফিরে আসি, আপনার নির্জ্জন কুটীরে।
দীর্ঘ সূত্রে গেঁথে চলি—তবু হায়! আশা জালটীরে।
প্রলুব্ধ লোলুপ দৃষ্টি ফিরে ফিরে চায়—
মায়াময় চক্র তলে নিষ্পিষ্ট মানব দেখা তবু ঘুরে হায়!
মরা আর বাঁচা নিয়ে চলে দেখি, দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
নির্ব্বিকার হতে যদি চাও—নীলকণ্ঠসম তবে পান কর বিষ।

যোগ

ডাক্তার শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম্‌-বি

যে বিজ্ঞান সাধন করিলে ইচ্ছাশক্তির বলে মন ও শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপন দ্বারা আত্মার উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মাকে জানা যায়—সেই বিজ্ঞানই যোগ।

বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ যোগ কি তাহা নানা ভাবে বলিয়াছেন। যোগ কি বলিতে গিয়া কেহ যোগ প্রথাকেই যোগ বলিয়াছেন। কেহ আবার



যোনিমুদ্রা

যোগ অভ্যাসের পন্থাকে যোগ বলিয়াছেন। কেহ আবার যোগ অভ্যাসে মনের ও দেহের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাকে যোগ বলিয়াছেন। আবার কেহ যোগের চরম ফল বা সিদ্ধিকেই যোগ বলিয়াছেন।

এখন কয়েকটী সূত্র ও শ্লোক লইয়া সমালোচনা করিলে, যোগ বলিতে কি বুঝায় তাহা হয়তো বোঝা যাইতে পারে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই যোগ। যোগ সাধন করিলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। যে কোন প্রকারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় তাহাই যোগ।

সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।

সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই যোগ। মনকে নিশ্চিন্ত করিতে হইলে, সকল চিন্তা দূর করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিলে তবে চিন্তা শূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কাজেই মনের নিরোধ বা মনের নিরোধ ফল বা উহার উচ্চ বা পর অবস্থান নিশ্চিন্ত অবস্থা।

কিন্তু আবার শাস্ত্রে রহিয়াছে :—,

যোগাম প্রাণয়ো যোগ স্বয়জো রেতসোস্তথা।
সূর্য্যচন্দ্র সমাযোগো জীবাত্মা পরমাত্মনো॥
এবন্তু দ্বন্দ্ব জালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে॥

অর্থাৎ দুইটী বিপরীতের মিলনই যোগ। সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ীর মিলন ঘটান অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর সংযোগ। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সুষুম্না নাড়ী উন্মুক্ত করা। ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা দিয়া ও পিঙ্গলা দক্ষিণ নাসিকা দিয়া প্রবাহিত হয়। মধ্যস্থিত নাড়ী সুষুম্না। এই নাড়ীগুলির বিষয় বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার প্রাণ অপান বায়ুর সংযোগই যোগ। স্বভাবতঃ প্রাণ বায়ু হৃদি স্থানে ও অপান বায়ু গুহ্যে থাকে। কাজেই দুই বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দুইটী বায়ুর মিলন সংঘটন করাই যোগ। ইহার প্রকৃত তথ্য, প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা মূলাধার ও অনাহত চক্রদ্বয়ের মধ্যে ক্রিয়া সংযোগ ঘটান। প্রাণ অপানের সংযোগ ঘটান, সুষুম্না পথ উন্মুক্ত অবস্থার সাপেক্ষ। সূর্য্য চন্দ্রের মিলন, সুষুম্না উন্মুক্তি ও প্রাণ অপানের সংযোগ, এই তিনই এক প্রাণায়াম সাধনে হয়। সূর্য্য চন্দ্রের মিলন ঘটাইতে গেলে সুষুম্না পথ উদ্‌ঘাটন বুঝাইয়া থাকে, সুষুম্নার উন্মুক্তির উপর প্রাণ অপানের সংযোগ নির্ভর করে। একটী অপরটীর উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাধন পন্থায়, এই তিনটী কার্য্যই এক প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। যখন এইগুলি সাধিত হয় তখন যোগসাধনজনিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সুষুম্না নাড়ীর পথ উন্মুক্ত করিবার চেষ্টাতেই প্রাণ অপান একীভূত হয়। প্রাণ অপান একীভূত হইলে সুষুম্না পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়।

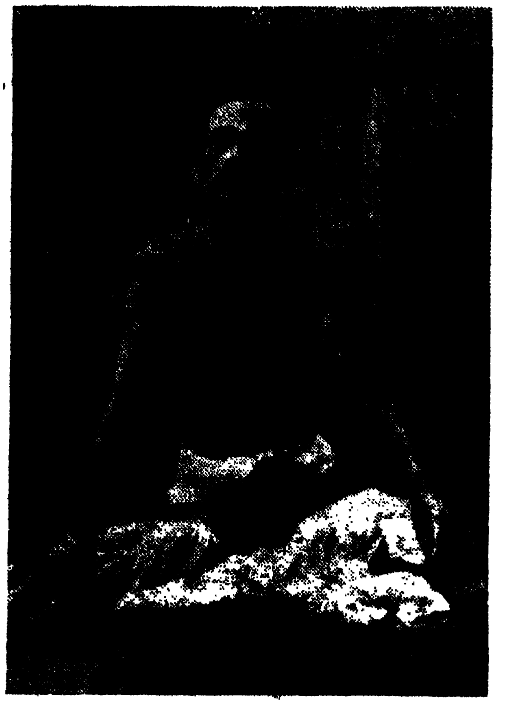
উন্মুক্ত সুষুম্না পথে প্রাণ অপান বায়ুকে বিচরণ করানই যোগ। আরও রহিয়াছে, রজো বিন্দু মিলনই যোগ। রজঃ মূলাধারে, যোনি স্থানে ও মস্তকে অবস্থান করে। এতদুভয়ের মিলনই যোগ। উহা মিলিত



প্রাণায়াম

প্রাণ অপানকে উন্মুক্ত সুষুম্না পথ দিয়া আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে লইয়া যাওয়ার সাপেক্ষ। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ও মিলিত বায়ুর সহিত উঠিয়া শিবের

সহিত মিলিত হন। ইহা যোনিমুদ্রা বুঝায়। এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনীই জীবাত্মা ও সহস্রারস্থিত মহাশিবই পরমাত্মা, তাই পরোক্ষে জীবাত্মা



খেচরীমুদ্রা সমাধি

পরমাত্মায় মিলনই যোগ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—যে কোন পন্থায় চিত্তকে একাগ্রীভূত করা যায় ও চিত্তকে চিন্তাশূন্য করা যায় তাহাই যোগ। উপরোক্ত শিবশক্তির মিলনে চিত্তের একাগ্রতা সাধন হয়। একাগ্রতার মূল কারণ—মিলিত প্রাণ অপান, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিসমেত সহস্রারে শিবের সহিত মিলিত হয়েন। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—উচ্চতম স্নায়ুমণ্ডলির, যে নিম্নতর স্নায়ু গুচ্ছের কার্য্যের উপর যে শমিত প্রভাব বিস্তার করে তাহা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে উঠাইয়া লওয়া। ইহাতে দেহ কাষ্ঠবৎ, সমাধি অবস্থা ধারণ করে। দেশের কার্য্য ও তদ্‌বিকাশ-জনিত চিত্তবিকার হেতুই চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগ করা যায় না। তাই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উর্দ্ধে উঠিলেই চিত্ত একাগ্র হয়। কিন্তু একাগ্র চিত্তও মনের কার্য্য, তাই তৎপরে নাদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে, চিত্ত যখন জ্যোতির্বিন্দুতে লয় হয়, তখন চিত্তও নিরালম্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উহাতে মনও লয় পাওয়ায়, উর্দ্ধতম মস্তকের চিত্ত রেখার স্থানও নিষ্ক্রিয় হওয়ায়, স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে ম্রিয়মাণ মৃতবৎ অবস্থায় পৌঁছায়। ইহাই সমাধির শৈথিল্য অবস্থা। বিজ্ঞানের কোন শারীরিক বা মানসিক চর্চ্চার প্রথা অবলম্বন করিয়া যোগের সমাধি স্তরে পৌঁছান যায় না। যৌগিকসাধন প্রণালীতে সাধন করিলে অবশ্যই ৪০ দিনে সিদ্ধিলাভ ঘটে। যোগের আরম্ভ স্তরের অবস্থাগুলি, বিজ্ঞানের মতে বোঝান কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। যোগসাধন ও তাহার ফল কয়েক স্তর পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে বোঝা যায়। তবে যোগের অতি উচ্চ স্তরগুলি বুঝা একটু স্থির বুদ্ধির কার্য্য। বৈজ্ঞানিকদিগের পক্ষে যোগ বুঝিয়া উঠা শক্ত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। যোগ, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে তবে বুঝা যায়।

ক্রিয়া যুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
ন শাস্ত্র পাঠ মাত্রেণ যোগ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

ন বেশ ধারণং সিদ্ধেঃ কারণং ন চ তৎকথা।
ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ॥

এই যোগসাধনের মূলে কতকগুলি মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিবার নিয়ম-কানুন রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যোগ পন্থা সাধন করিতে বিশেষ যত্নবান হইলেও এই যোগ শিক্ষার্থীর যে মনোভাব প্রয়োজন তাহা গঠন করিতে না পারায়, তাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চার ভাবে লইয়া সাধন করিয়া আদৌ উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে না পারিয়া, যোগের পন্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া ফেলেন। যোগসাধনের ফলে এমন স্তরে পৌঁছান যায় যে স্তরে, দেহ ও মনের ভাব বিজ্ঞান আজও উপলব্ধি করেন নাই ও যতদিন না যৌগিক প্রথায় সাধন করিবেন ততদিন পারিবেনও না। সাধারণতঃ যোগীগণ বৈজ্ঞানিক নহেন, তাই তাঁহারা যোগের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিতে অক্ষম, কিন্তু তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের জ্ঞানের বহির্ভাগেও অনেক উচ্চস্তরে আরোহণ করেন। বৈজ্ঞানিক যোগসাধন করিয়া, বিজ্ঞান যে অবস্থার পর আর উপলব্ধি করিতে অক্ষম, সেই অবস্থার ভাব বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, বিজ্ঞানের জ্ঞান কিছু বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এতদ্ভিন্ন, যোগের সাধন করিয়া উহার পন্থা ও ফল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যক্ত করিলে, লুপ্তপ্রায় যোগশাস্ত্র পুনরুদ্ধার হইতে পারে। যোগ গুরুমুখী থাকিয়া আসিতেছিল। উহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য মতে এই যোগমার্গ দিয়া, জিহ্বা ও উপস্থের সংযম দ্বারা ত্যাগ আনয়ন করিয়া মুক্তিলাভ করা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় শুদ্ধ প্রেম ভক্তিমার্গ মাহাত্ম্য প্রচারের প্রভাবে যোগসাধনা এখন সন্ন্যাসী-দিগের মধ্যেও বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্ত্রের উচ্চ পঞ্চমকার সাধনাও যোগসাধনা। যোনি মুদ্রাযোগে জপ করিলে অতি সত্বর মন্ত্র সিদ্ধি ঘটে। ছাঁচে ফেলিয়া দেহ মনকে গঠন করিতে যৌগিক পন্থার তুল্য আর পন্থা নাই।

যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো মষ্যেকচিত্ততা।

যোগসাধনের ফল একাগ্রচিত্ত ও জ্ঞান। ইহাই আসল সাধনের উদ্দেশ্য। তবে—যোগসাধনে শরীরের ও মনের অপরিসীম বল হয়। বৃদ্ধও যোগ-সাধন করিয়া বালকের ন্যায় হইতে পারে।

কাম কামনায় আবদ্ধ মানব মাত্রেই বার্দ্ধক্য এড়াইতে চাহেন নাকি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদের সে মনোরথ সফল করিতে সক্ষম হইয়াছেন? মায়াপাশ ছিন্ন করিতে হইলে যোগবল আশ্রয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আনাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তয়ে মম॥

বিজ্ঞানের শীর্ষে যে শিল্পকলা, যাহাতে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পূর্ণতম স্বরূপ বিকাশ হয়, তাহার প্রকাশ ও উপভোগও যোগ সাধনায় সম্ভব হয়। সারস্বযোগীভি পীত শুক্র শিবতি পণ্ডিতাঃ। সূক্ষ্মত্ব হইতে স্থূলত্ব, কৃশত্ব হইতে গুরুত্ব, হ্রস্বত্ব হইতে দৈর্ঘ্য, মাংসপেশীর স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কুঞ্চন অবস্থা, ও তাহা হইতে অনাকুঞ্চন অবস্থা ও তৎপরে সম্পূর্ণ শৈথিল্য বা ঢিলা অবস্থা, এইরূপ দেহের পরিবর্ত্তনের সহিত একজোটে মুখের পরিবর্ত্তন ও মুখে সম্পূর্ণ চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হইতে একাধারে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকারভাব, অতি সহজেই যোগ সাধনায় সম্ভব, অন্য কোনও শিল্প, বিজ্ঞানে, আজিও সম্ভব হয় নাই। সূক্ষ্ম স্নায়ু-মণ্ডলীর মধ্য দিয়া স্থূল শরীরের উপর, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, বিনা আয়াসে, যে আধিপত্য স্থাপন করা হয়, তাহাই যোগ প্রভাব বিস্তার করা।

আমরা জানি ধনুষ্টঙ্কার রোগে, রোগীর বিশেষতঃ শিরদাঁড়ার মাংস-পেশীগুলি কিরূপ শক্তির পরিচয় দেয়। যোগী সাধনকালে ঐরূপ অবস্থ

ইচ্ছায় আনয়ন করেন। তন্দ্রা উৎপত্তি করা ও তৎকালীন বেদনা সহ্য করিয়া মনের শক্তি ও দৃঢ়তা বর্দ্ধিত করে। প্রাণায়াম অভ্যাসে দেহের অণু পরমাণু এক অদ্ভুত শক্তি অর্জ্জন করে। যোনি মুদ্রা অভ্যাস ফলে, মস্তক ও মেরুদণ্ডের উপর সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা জন্মায়। উহাতে শরীর ব্যাধিশূন্য হয় ও অসীম শক্তি আনয়ন করে। খেচরী মুদ্রা ও সমাধি সাধন দ্বারা বিশ্রাম উপভোগ করিয়া ক্ষয় নিবারণ করা হয়। বিপরীতি করণী মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও দেহে রোগ প্রতিষেধক শক্তি সঞ্চিত হয়।

যোগ দশবিধ হইলেও শিবসংহিতা অনুযায়ী চারিপ্রকার যোগের আভাষ দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

১। মন্ত্রযোগ

গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শোধনাদি করিয়া মন্ত্র জাগাইতে হয়। এইরূপ মন্ত্রের জপ করিয়া যে মনোলয় হয় তাহাই মন্ত্র যোগ। মন্ত্র জপকালে, শিব, শক্তি, বায়ু ও মনকে একত্র করিয়া, দেবতা ও মন্ত্রকে অভিন্ন ভাবিয়া জপ করিতে হয়—অর্থাৎ যোনি মুদ্রা-যোগে জপ। এরূপভাবে সাধন করিলে সত্বর মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি শিবতুল্য, তাঁহার ইচ্ছায় সকল কার্য্যের সিদ্ধি ঘটে। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে মন্ত্রসাধন সহজসাধ্য।

২। লয়যোগ

লয়যোগ যৌগিক যোগের একটী উচ্চ অবস্থা মাত্র। হঠযোগ সাধন করিয়া লয়যোগে নাদধ্বনি শ্রবণ ও জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া রাজযোগ অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। আত্মজ্যোতিতে মন নিমজ্জিত হইয়া রাজযোগের দ্বিধাভাববর্জ্জিত মনের নিরালম্ব অবস্থায় উপনীত হইতে হয়।

৩। হঠযোগ ও ৪। রাজযোগ

সূর্য্য ও চন্দ্রের মিলন ঘটানই হঠযোগ। কাহারও কাহারও মতে বলপূর্ব্বক বায়ুকে সংযম করিতে হয় বলিয়া হঠযোগ কহে। আবার হঠাৎ সিদ্ধি হয় বলিয়া হঠযোগ কহে। হঠযোগ ও রাজযোগ—উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। হঠকারিতা দ্বারা—কতকগুলি উৎকট আসন বা ধৌতি সাধন করা—হঠযোগ নহে—ঐরূপ সাধনা শিবসংহিতায় নিষিদ্ধ বলিয়া উক্তি করা আছে। হঠযোগ হইতে ধাপে ধাপে রাজযোগ মার্গে পৌঁছাইতে হয়। প্রাণায়াম মুদ্রাদি হঠযোগের পন্থায় অভ্যাস করিয়া নাদশ্রবণ ও জ্যোতি দর্শন করিয়া—কেবলি কুম্ভক স্তর দিয়া রাজযোগে পৌঁছানই সহজ পন্থা। যথেষ্ট কেবলী কুম্ভক করিতে সক্ষম হইয়া—এই অবস্থায় চিত্তকে নিরাশ্রয় করিলেই রাজযোগ সাধিত হয়। কুম্ভকাদি সাধন বাদ দিয়া কয়জন পরমহংসদেবেরও তৎকৃপা প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, রাজযোগে পৌঁছাইতে পারেন ধারণা করা কঠিন।

যোগের অঙ্গ

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। এই আটটী অঙ্গ। কেহ কেহ যম নিয়ম বাদ দিয়া ষড় অঙ্গ বলেন। আবার কেহ কেহ ষড়অঙ্গ ও ধৌত প্রকরণ একটী উপাঙ্গ বলিয়া লিখিয়াছেন। মুদ্রা সাধন প্রাণায়াম বিশেষ। আধুনিক কতিপয় উর্ব্বর মস্তিষ্কের উচ্চশিক্ষিত, সাধকমণ্ডলী, শেষোক্ত, ধ্যান, ধারণা দিয়া সমাধি



সমাধি

প্রাপ্ত হইতে যত্নবান। যোগের স্তরগুলি, নিষ্ঠার সহিত ক্রমপর্য্যায়ে সাধন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঋষিদিগের মতের উপর বিধান দিতে যাওয়া, কাল অনুযায়ী আপাততঃ সুখসাধ্য হইলেও ফলদায়ী হইবে না। ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীত সাধনা বিড়ম্বনা। *

* এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রগুলি লেখকের স্বয়ং।

এতদিন পরে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

এতদিন পরে চিনিবে কি মোর কবিতা ?
একদিন তারে চিনেছিলে তুমি অনীতা।
আমার কবিতা আপনার করে,
লিখেছিলে তুমি মুকুতা আখরে,
মনের পরতে রেখা এঁকেছিলে
ভুলেছ কি তুমি সবি তা ? কবিতা অনীতা ?
সেদিন আকাশে রঙীন স্বপন,
রঙে রঙে কত লিখিল লিখন,
তোমার আমার নয়নে গগনে,
একই ছবি আঁকে সবিতা। কবিতা অনীতা ?
যত রঙ ছিল তুলির লিখনে
যত জল ছিল কবির নয়নে,
আজ সব মিশে গগনে পবনে,
গানে গানে সুরধনী তা' অনীতা ?

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ব্রিটেনের আর্থিক অনটন

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ব্যয়বাহুল্য যুধ্যমান প্রত্যেক দেশের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে। এই যুদ্ধের মারাত্মক ব্যয় মিটাইতে ব্রিটেনের মত শক্তিশালী দেশও এখন প্রকাণ্ড এক সমস্যার মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে আমেরিকা হইতে ব্রিটেন যে পণ্য কিনিত তাহার জন্ত তাহাকে দিতে হইত নগদ মূল্য; তাছাড়া ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে এক ভারতবর্ষ ছাড়া ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি প্রত্যেককেই পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছে। এইভাবে নগদ মূল্যে জিনিষ কিনিয়া যুদ্ধ চালাইতে চালাইতে ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা যখন অত্যন্ত অসচ্ছল হইয়া আসিল এবং আমেরিকা যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়িল, তখন হইতে কতকটা নিজের গরজেই আমেরিকা ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে মাল জোগাইয়া আসিতেছে। প্রভূত ব্যয়বাহুল্যে ব্রিটিশ সরকারের বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে লগ্নী অর্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সেই সব প্রতিষ্ঠান হইতে মুনাফা ও অর্থ হইতে সুদ হিসাবে যাহা পাওয়া যাইত, সেইগুলি এখন আর পাওয়া যাইবে না। ইহার উপর ইংলণ্ডে মাল বেচিয়া লাভের পয়সায় নিজের ঘাটতি শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে এমন দেশের সংখ্যা বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে নিতান্ত নগণ্য নয়। যুদ্ধের পরে সেইসব বাজারে ব্রিটিশ পণ্য বিশেষ সম্ভব হইবে না। ক্যানাডা মহাসমরের প্রথম দিকে চালানী পণ্য বাবদ ২৫ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণ ব্রিটেন হইতে আনিয়া আমেরিকার নিকট হইতে সেই স্বর্ণের বিনিময়ে যন্ত্রপাতি কিনিয়া বহু নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই সব শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের দ্বারা ক্যানাডা তাহার নিজের অভাব মিটাইবে, বাহিরের কোন দেশ ক্যানাডায় ঐ সকল বেচিয়া লাভবান হইতে পারিবে না।

সকলেই জানেন, ব্রিটেন স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ নয় এবং এই যুদ্ধের খরচ জোগাইতে পাওনাদার রাষ্ট্র হইতে তাহাকে ক্রমে দেনাদার রাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে এই দেনা শোধ করাও তাহার পক্ষে প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। যুদ্ধের সুযোগে পৃথিবীর পরমুখাপেক্ষী রাষ্ট্রগুলি যদি তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার মত শিল্প সংস্কার করিয়া লয়, বাজারের অভাবে ইংলণ্ডের মত শিল্পজীবী দেশের পক্ষে সেদিন নিছক বাঁচিয়া থাকাও কঠিন হইবে। যুদ্ধের আগেকার দেনা শোধ করিয়া ভারতবর্ষের এখন ব্রিটেনের নিকট হইতে আট শত কোটি টাকার বেশী পাওনা হইয়াছে, এই পরিমাণ যুদ্ধের পরে অবশ্যই একহাজার কোটিতে পৌঁছাইবে। ইংলণ্ড যুদ্ধের পরে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্ত ঋণ শোধে বিলম্ব করিতে পারে এই আশঙ্কায় যথা-সম্ভব উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংগুলি কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে বিলাতে জমা ষ্টার্লিং ঋণের পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতি আনিয়া শিল্পপ্রসারের জন্ত ভারতবর্ষে এখন একটি বড় আন্দোলন চলিতেছে। ভূমধ্যসাগরের পথ অপেক্ষাকৃত নির্বিঘ্ন, তাছাড়া পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ চালাইতে ভারতবর্ষের সাহায্য উত্তরোত্তর অধিকতর স্বীকৃত হইতেছে, ইটালী ও আফ্রিকায় যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের কৃতিত্ব প্রদর্শনও ভারতের দাবীর যৌক্তিকতার উপর কিছু পরিমাণ প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করিবে। এই সব নানা কারণে অনিচ্ছা থাকিলেও নিরুপায় ব্রিটেনকে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ভারতের প্রস্তাবে রাজী হইতে হইবে। ভারতের বাজার ব্রিটেনের বহুকালের ভরসাস্থল, সম্প্রতি আমেরিকার মাথা গলানোতে এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি-জনিত ভারতে সামান্ত শিল্পপ্রসারে ইংলণ্ডের বাণিজ্যগতি এদেশে ব্যাহত হইতেছে; তবু ইংলণ্ডের আশা ভবিষ্যতে তাহারা এদেশে তাহাদের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্ত ভারতের শিল্পে অনুন্নত অবস্থার সুযোগ লইতে তাই আটল্যান্টিক চার্টারের অর্থ-নৈতিক ধারা ব্রিটেন গভীর মনোযোগের সহিত রচনা করিয়াছে। যুদ্ধের সময় যাহাতে ভারত শিল্পের দিক হইতে খুব আগাইয়া না যায় তাহার জন্ত ভারত সরকার বহু বিধিনিষেধ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদিও ভূতপূর্ব্ব ষ্টেটসম্যান সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসন প্রভৃতি মনীষী মনে করেন ভারতে শিল্পপ্রসারে এই চল্লিশ কোটি লোকের মাথাপিছু সামান্ত আয়বৃদ্ধি হইলেও যে বিরাট বাজারের সৃষ্টি হইবে তাহার সুবিধা ইংলণ্ডের মত বহুপরিচিত দেশের পক্ষে গ্রহণ করা যত সহজ হইবে অন্ত কাহারও পক্ষে তত সহজ হইবে না; ইংলণ্ডের বাণিজ্য কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু ঠিক বিপরীত কথা ভাবেন। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একখানি সরকারী ইস্তাহারে লেখাও হইয়াছে—The intensive development and diversification of Indian industries now occuring is expected to reduce United kingdom Post-war export to still lower level যাহা হউক, বর্ত্তমানের মত ব্রিটেনের ভারতে বাণিজ্যের গতি প্রতিকূল হইতে থাকিলে তাহার প্রচণ্ড ক্ষতি হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের বাজার যদি হাতছাড়া হয় এবং ডোমিনিয়নের অন্যান্ত দেশগুলি যদি নিজেদের অভাব মিটাইবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া লয়, তখন ইংলণ্ড কিভাবে যে যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবে, তাহা সম্প্রতি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষেরও চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর আগেকার অধিকার হারাইবার পর যুদ্ধের দরুণ বৈদেশিক ও দেশীয় দেনা শোধ করার দায়িত্ব পালন করিতে ব্রিটেনের কর্ত্তৃপক্ষকে শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইবে। ভারতবর্ষের সহিত ভাল ব্যবহার করিলে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক রাজনৈতিক সুবুদ্ধির পরিচয় দিলে অধিকতর আর্থিক স্বচ্ছল ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বিরাট বাজারে ব্রিটেনের স্থান চিরকাল স্থায়ী হইত। গত ১৩ই মে ব্রিষ্টলে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সমর সচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ্ যে কথা বলিয়াছেন, ব্রিটেনের আর্থিক স্বার্থের দিক দিয়া তাহা যথেষ্ট মূল্যবান। স্যার গ্রীগ বলিয়াছেন:—"ঋণ বা অতিরিক্ত কর স্থাপনের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম না দিতে পারিলে স্বর্ণ তহবিলের অপেক্ষা না রাখিয়া নোট ছাপিতে হয়—অথবা যুদ্ধের আয়োজন কমাইয়া দিতে হয়।" মহাসমরের সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে ব্রিটেন আজ এমন এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন উপরোক্ত দুটির মধ্যে কোন পথই তাহার পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতের হাজার অসুবিধার ঝুঁকি লইয়াও ঋণসংগ্রহ করিয়া তাহাকে যুদ্ধ চালাইতে হইতেছে। যুধ্যমান ব্রিটেন বর্ত্তমানে তাহার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যুদ্ধের পরে অসামরিক ব্রিটেন কিভাবে দেনা শোধের ব্যবস্থা করিয়া জীবিকা-সংস্থানের আয়োজন করিবে তাহা আটল্যান্টিক চার্টারের শিল্পে অনুন্নত চীন বা ভারতের কণ্ঠরোধকারী অর্থ-নৈতিক ধারাগুলি পাঠ করিয়াও অনেকেই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছেন না।

*   *   *   *   *

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ক্ষমতা

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট শিকাগোতে মণ্টোগোমারী ওয়ার্ড কোম্পানীর কারবার আটক করিয়াছিলেন। ঐ সম্পর্কে অনেক তদন্তের পর যুক্তরাষ্ট্র সেনেটের আইন সাব-কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, নিয়মতন্ত্র অনুসারে ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের নাই।

সংবাদটি পাঠ করিয়া ভারতবাসীর মনে স্বার্থের অতীত আনন্দের উদয় হইবে। আমেরিকা স্বাধীন দেশ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার স্থান আজ সর্ব্বজন স্বীকৃত। আটল্যানটিক চার্টার, ফিলাডেলফিয়া চার্টার প্রভৃতিতে বিশ্বের শক্তিমান ও দুর্ব্বল সকলের জন্য তাহার সহানুভূতিবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই দেশে প্রজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি গ্রাস করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসীর স্বাধীন ভোগাধিকারের উপর খেয়ালের বশে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। সেনেটের সাব কমিটির এই মন্তব্যে রুজভেল্ট ব্যক্তি হিসাবে হয়তো অপমানবোধ করিতে পারেন, কিন্তু যে শাসন পরিষদের তিনি সভাপতি, তাহার নিয়মতান্ত্রিক ঔদার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গর্ব্ব অনুভব করা উচিত। সভাপতি স্থায়ী পদ নয়, আগামী নির্ব্বাচনে হয়তো তাঁহাকে সাধারণ প্রজায় পরিণত হইতে হইবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শাসনদৈতিক উৎকর্ষের যে প্রমাণ তিনি তাঁহার মর্য্যাদার মূল্যে করিয়া গেলেন, সেই নীতি যতকাল কার্য্যকরী রহিবে—দুর্ব্বল আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ শক্তিমানের ভয়ে ততদিন বিঘ্নসঙ্কুল হইবে না। ভারতবাসী হিসাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্নের বস্তু, সেই স্বপ্ন আমেরিকায় বা যেখানেই সার্থক হউক, আমাদের মন নিরপেক্ষ আনন্দে ভরপুর না হইয়া পারে না।

* * * *

হীরক-শিল্পের কর্ম্মীবৃন্দ ও ভারতবর্ষ

যুদ্ধের পূর্ব্বে বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে হীরক কাটার ও পালিস করার অনেকগুলি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীবৃন্দের অধিকাংশই যুদ্ধের চাপে পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আগে পৃথিবীর মোট হীরক শিল্পীর শতকরা ৮০ ভাগ আন্তওয়ার্প ও শতকরা ১৭ ভাগ আমষ্টারডাম যোগাইত, কিন্তু জার্ম্মানী ডানকার্ক জয় করিবার পর ইহাদের একদল ইংলণ্ডে আসিয়া কাজ সুরু করিয়াছে এবং আর একটি বড় দল আটল্যানটিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় বাসা বাঁধিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকায় মাত্র ৩০০জন হীরকশিল্পী ছিল, বর্ত্তমানে সেখানে হীরক শিল্পীর সংখ্যা ৩৫০০। অনেক শিল্পী পলাইয়া প্যালেষ্টাইনে আশ্রয় লয় এবং ফলে প্যালেষ্টাইনের হীরক শিল্পীর সংখ্যা ২০০ হইতে ৩০০০ হাজারে আসিয়া পৌঁছায়। এইভাবে যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, প্যালেষ্টাইন, কিউবা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে হীরক কাটিবার ও পালিস করিবার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার আদিযুগ হইতে হীরকের মূল্য স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল রত্নের চাহিদা যথেষ্ট এবং ব্যবসা-ক্ষেত্র বৃহৎ। ভারত সরকার যদি চেষ্টা করিতেন, সর্ব্বহারা গৃহহীন এই শিল্পীবৃন্দের ধনকতককে ভারতে আশ্রয় দিয়া ভারতবর্ষে নূতন ও বহু প্রয়োজনীয় একটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার যে মোহ তাঁহাদের আগ্রহ নষ্ট করিয়া দেয়, এই শিল্পের বেলায় তো সে সমস্যা উঠে না।

* * * *

ভারতের বৈদেশিক সম্পত্তি কিনিয়া লইবার প্রস্তাব

দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তালিবায় এষ্টেটস্ নামক বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানটির যে সকল চা ও কফি বাগান আছে, জনৈক ভারতীয় ধনী সেই সম্পত্তিটি ২৬ লক্ষ টাকা মূল্যে কিনিয়া লইবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটির বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ ভারত সরকারের অনুমতি সাপেক্ষভাবে প্রস্তাবকারীর নিকট হইতে শতকরা দশটাকা অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হয়তো এই বিক্রয় ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু তবু এই ধরণের সংবাদ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর নূতন আলোক সম্পাত করিবে। বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সারা দেশে উর্ণনাভের মত বিস্তৃত হইয়া অবিরাম যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে এবং মুনাফাবৃত্তি অব্যাহত রাখিবার লোভে শাসনযন্ত্রের উপর পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তারের যে দুশ্চেষ্টা করিয়াছে, তাহা আজ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবাসী এই দুর্নীতির প্রতিবাদ করে নাই এমন নয়, কিন্তু টাকার জোরে প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষ যেমন আন্দোলনের মুখ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পরোক্ষ স্বার্থের চাপে শাসনকর্ত্তাদের দিক হইতেও ভারতবাসী সহানুভূতিসূচক বিশেষ কোন সাড়া পায় নাই। আত্মরক্ষার সাধনা এমনি করিয়া এদেশে বারবার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ভারত মিত্রপক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বহু সাহায্য করিতেছে। ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী ইংলণ্ড আমেরিকার বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন। নিঃস্ব এই দেশের পক্ষে ইহার চেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার কল্পনা করা যায় না। যুদ্ধে বৃটেনকে মাল যোগাইয়া ভারতের বহু পরিমাণ ষ্টার্লিং ইংলণ্ডে উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, এইগুলির পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিয়া দেনা শোধ করিবার সামর্থ্য এখন ইংলণ্ডের নাই, অথচ মুদ্রা হারের দৌরাত্ম্যে ভবিষ্যতে আমরা প্রাপ্য টাকা পুরাপুরীভাবে ফেরৎ পাইব কিনা তাহাও এখন হইতে বলা যায় না। এ অবস্থায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, ব্রিটেনে ভারতের জমা ষ্টার্লিং বণ্ডের বিনিময়ে ভারত সরকার যদি ভারতের ব্রিটিশ কারবারগুলি কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভারতবাসী প্রভূত উপকৃত হইবে। ট্রাম কোম্পানী, ইলেকট্রিক কোম্পানী, পাটকল, খনি, চা বাগান, রেলপথ, নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বাবদ মুনাফা হিসাবে রাশি রাশি টাকা প্রতি বৎসর ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, ভারত সরকার যদি ইচ্ছা করেন, এই শোষণ হইতে এদেশকে তাঁহারা অনায়াসেই রক্ষা করিতে পারেন। অনেক ভারতবাসী বৈদেশিক সম্পত্তি কিনিয়া লইতে প্রস্তুত, ভারত সরকার মধ্যস্থ হইলে তাঁহারাও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিবেন। 'ভারত সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহ ষ্টার্লিং বণ্ডের পরিবর্ত্তে কিনিয়া পরে ভারতবাসীর নিকট ঐগুলি বিক্রয় করিলেও তাহাদের যথেষ্ট লাভ থাকিবে। অনেকের আশা ইংলণ্ডে জমা ষ্টার্লিং বণ্ডের দ্বারা যন্ত্রপাতি আনাইয়া ভারতে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা হইবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণাদি নীতিতে এবং ভারত সরকারের ডিফেন্স রুল ও প্রায়রিটি এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাডভাইসারী প্যানেল অব মেসিনারী এণ্ড ষ্টোরস'এর দৌলতে ভারতে শিল্প প্রসার সম্বন্ধে ভারত সরকারের ঔদাসীন্য এখনই অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয়, ভারত সরকার বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলে অকেজো ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের সত্যকার সদ্ব্যয় হইবে। বর্ত্তমানে ইনফ্লেশন বন্ধ করিবার এবং ভবিষ্যতে জাতীয় আয় লক্ষণীয়ভাবে বাড়াইবার ইহা শ্রেষ্ঠ সুযোগ। তবে যে ভারত সরকার ভারতের চরম আর্থিক দুর্দ্দিনেও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে ভারতের বাজারে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং বা প্রায় ১১০ টাকা লাভ করিতে দেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল বড় বড় আশা করায় সত্যকার কোন মূল্যই হয় তো পাওয়া যাইবে না।

* * * *

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণী

গত ২৭শে মের নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকার

কিমার্নসিরাবদের সহিত একজন ঊর্দ্ধতন ভারতীয় কর্মচারীর ঘরোয়া আলোচনার আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইয়া ভারতে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার ব্যবসায়ীবৃন্দ টাকা খাটাইতে আসিয়াছেন লাভের আশায়, তাঁহাদের পক্ষে বাজারের অনুকূল অবস্থা কামনা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানে বিদেশীর পক্ষে খুব আশাপ্রদ নহে, সুতরাং বিদেশী ব্যবসায়ীগণ এদেশে টাকা ঢালিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। অতীতের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ভারতরূপ কামধেনু পশ্চিমের, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের কাছে কতখানি লোভের বস্তু ছিল এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্ত যাহারা আসিতে পারেন নাই, ভারতের রেলপথ খুলিবার সময় বা ভারত সরকারের নানা ঋণপত্র বাহির করিবার সময় টাকা ধার দিবার জন্ত ইংলণ্ডে তাঁহারা কি ভাবে প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। এদেশের চা বাগান, খনি ও পাটকলগুলিতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ যে পরিমাণ লাভ করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাচীরের ইষ্টকগুলি তাঁহারা সোনা দিয়া তৈয়ারী করিতে পারিতেন। এই প্রাপ্ত মুনাফাবৃত্তি যখন এদেশে শিকড় গাড়িতেছিল, তখনও ভারতে এখনকার মত আত্মোপলব্ধি হয় নাই। ভারতের জাতীয় জাগরণের পর হইতে এইরূপ বৈদেশিক শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি এমনি কায়েমী হইয়া গিয়াছে যে হাজার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের থামান সম্ভব হয় নাই। আজ বহু দুঃখ সহিয়া ভারতবাসী শিখিয়াছে যে, বিদেশী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যতই সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা এদেশের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। আমেরিকার ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করিতে এদেশে আসিতে দিতে ভারতবর্ষের কোন অধিবাসীই ইচ্ছাপ্রকাশ করিবে না। তবে শিল্প প্রসারে বৈদেশিক অর্থ না আনিলে আর্থিক অবচ্ছল আমাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন। আমরা যদিই বা বিদেশ হইতে টাকা আনিয়া এদেশে শিল্প প্রসার করি, টাকা ধার দিবার সময় বিদেশী ধনীগণকে পরিষ্কার জানাইয়া দিতে হইবে, তাঁহাদের প্রদত্ত টাকার জন্ত নির্দ্ধারিত সুদ ছাড়া আর কোন সুযোগ তাঁহাদের আশা করা চলিবে না এবং প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের উপর তাঁহারা কোনদিন প্রভাব-বিস্তারের দুশ্চেষ্টা করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের বণিক ও ধনিকদের শোষণ নীতির চাপে পড়িয়া ভারতবর্ষের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়াই এখন আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা; ইহার উপর ভারতবর্ষ নূতন করিয়া বিদেশী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এদেশে স্থাপন করিতে দিতে পারে না। শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, ঋণ হিসাবে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে বিদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা চলে, কিন্তু সেজন্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করা আর সঙ্গত হইবে না। অবশ্য আমরা যাঁহাদের শাসন ব্যবস্থার অধীনে আছি, তাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মত করিয়া এদেশের স্বার্থ দেখেন না; তবু আমরা আশা করি, নূতন করিয়া ব্যবসা ফাঁদিতে আসিয়া এই সহজ কথাটুকু সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, জন্ কোম্পানী আমলের ভারতবর্ষ আর বর্ত্তমানের ভারতবর্ষ এক বস্তু নয়।

আরাধ্যা

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

অতীতের সেই কোন্—মধু যামিনীতে—
অনাহূতা—তুমি অযাচিতে!
এ মন মন্দিরে মম—এসেছিলে—নৃত্য ছন্দে ধীরে—
অয়ি গো কবিতা রাণি! গীতকণ্ঠে—নূপুর মঞ্জিরে!
ভুবন ভুলান ওই রূপ নিরখিয়া—
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ কবি হিয়া!

ত্রিদিব সুষমা ছানি' নিরজনে কবি—
অপরূপ লাবণ্যের ছবি!
এঁকেছিল,—রূপ রস—গীত গন্ধ—ছন্দ উপাদানে!
মূর্ত্ত হয়ে এলে তুমি—করুণায়—মম অনুধ্যানে,
মানসী—বাস্তবরূপে—দেখা দিল আসি!
তৃপ্ত হ'ল এ চির-পিয়াসী।

মানস মন্দিরে দেবী নিত্য বিরাজিতা,
অয়ি মোর চির আরাধিতা!
অধমের তুচ্ছ ক্ষুদ্র—অর্ঘ্য তার—হাসি মুখে লয়ে
সেবকে করেছ ধন্য—কাব্য-লক্ষ্মী!—দীনে তুষ্ট হ'য়ে!
জীবন-সায়াহ্নে আজ ইহাই মিনতি,
এই কৃপা রেখ দীন প্রতি!

করুণায় দিয়েছিলে সেবা অধিকার,—
এই মোর মহা পুরস্কার!
এর বেশী এ জীবনে অন্য কিছু করি না কামনা,
পার্থিব সম্পদ যশে,—চিরদিন নিস্পৃহ-বিমনা—
থাকি যেন,—আকাঙ্ক্ষার মোহ হতে দূরে,
বিরাজিত থাক' চিত্ত পুরে!



সাময়িকী

নববর্ষ—

শ্রীভগবানের দয়ায় ভারতবর্ষের বয়স ৩১ বর্ষ শেষ হইয়া বর্ত্তমান আষাঢ় সংখ্যা হইতে ইহার দ্বাত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়, তাহার বিচারের সময় এখনও হয় নাই। প্রথম সম্পাদক স্বর্গত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে আদর্শের স্বপ্ন মনে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও সফল করিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন নাই। তাহার পর রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রমুখ যাঁহাদের উপর ভারতবর্ষ পরিচালনার ভার পড়িয়াছিল, তাঁহারা যথাশক্তি সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আজ ভারতবর্ষকে এই গৌরবের আসন দান করিয়া গিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষের নববর্ষের প্রথম দিনে আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সকলের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতেছি। যে পাঠক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সাহায্য ভারতবর্ষের সাফল্যের অন্যতম কারণ, তাঁহাদিগকে আজ আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আজ এই শুভদিনে সকলের নিকট এই প্রার্থনা জানাই যেন, গত ৩১ বৎসরের প্রতিদিন যেমন আমরা সকলের শুভ কামনা লাভ করিয়াছি, বর্ত্তমান বর্ষেও যেন তাহা লাভ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারি।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্মিলন—

গত ৩০শে ও ৩১শে বৈশাখ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল-প্রতিবাদ সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সম্মিলনে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এইরূপ—"জনসাধারণ কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্য লইয়া একটি অসাম্প্রদায়িক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের জন্য যে দাবী করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সরকার যদি বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিলটিকেই বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তবে এই সম্মিলনের অভিমত এই যে, প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি স্বতন্ত্র আত্মকর্তৃত্বশীল বোর্ড গঠন করা হউক। এই বোর্ডের ভিত্তি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র শিক্ষার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহার দ্বার জাতিধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। যে সকল শিক্ষায়তন এই বোর্ডের অনুমোদন লাভ করিবে ও যত সংখ্যক ছাত্র ঐ সকল শিক্ষায়তনে বিদ্যার্জ্জন করিবে, সরকারকে সেই অনুপাতে ঐ বোর্ডকে অবশ্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। যদি সরকার এই সঙ্গত দাবীতেও কর্ণপাত না করেন, তবে হিন্দু ও যোগদানেচ্ছু সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য অবিলম্বে একটি স্বাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি প্রদেশে প্রস্তাবিত বিলের ব্যবস্থা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিতই হয়, তবে এই সম্মিলন হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছে, তাঁহারা যেন ঐ বোর্ডে না থাকেন। এই সম্মিলন সমস্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটী ও ছাত্রগণের অভিভাবকদিগকে অনুরোধ করিতেছে—তাঁহারা যেন এই বোর্ড এবং যে কোন স্কুল এই বোর্ডের অনুমোদন চাহিবে, তাহাকে বর্জ্জন করেন।"

কলিকাতায় দুগ্ধ সমস্যা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার জানাইয়াছেন, কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইহার অনেকগুলি কারণ দেখা যায়। (১) কলিকাতায় যে পরিমাণ লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। শুধু দুগ্ধ কেন, সকল খাদ্যদ্রব্যেরই দারুণ অভাব দেখা যাইতেছে (২) পশু খাদ্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাদ্যাভাবে গরু বা মহিষ এখন আর পূর্ব্বের মত দুধ দেয় না (৩) মাংসের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অধিক দামের লোভে বহু লোক দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ মাংসবিক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে। এ অবস্থায় কি করিয়া যে দুধের অভাব পূরণ করা যাইবে, তাহা বলা কঠিন। সহরে সন্দেশ, রসগোল্লা, দধি প্রভৃতির জন্য যে দুধ ব্যবহার হয়, তাহা বন্ধ করিয়া দিলে ঐ দুধে দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে বাঁচান যাইতে পারে। দুগ্ধ একটি প্রধান খাদ্য—কাজেই দুগ্ধ সমস্যা সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের ব্যাপক কার্য্য-ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অন্যদেশ হইতে এ সময়ে ছাগল, গরু, মহিষ প্রভৃতির আমদানীর জন্যও কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এখনই খাঁটি দুধের দাম ১ টাকা সের হইয়াছে। পরে দাম আরও কত বাড়িবে, কে বলিতে পারে?

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—

বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাহিত্যিক অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় অল্পকাল রোগ ভোগের পর গত ১লা জুন রাত্রে তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে তিনি ছাত্রগণের

বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইলেও তিনি কবি, সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার লিখিত 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' 'জোনাকী' 'পর্ণজা' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার সরল মধুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি সুরসিক ও সুগায়ক ছিলেন। বহু সাহিত্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের সভ্য ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও কবি-সাহিত্যিকের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। মৃত্যুকালে পত্নী, একমাত্র কন্যা ও সহোদর ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মৎস্যের অভাব—

বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র নদী, নালা, সমুদ্র প্রভৃতি থাকায় বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইত এবং বাঙ্গালার লোক মাছ খাইত। এ দেশে ভাল খাওয়ার অর্থ ছিল—মাছ-ভাত খাওয়া। কিন্তু সেই মাছও গত কয় মাস ধরিয়া দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং কোথাও দুই টাকা সেরের কম দামে মাছ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরও হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মৎস্যের চাহিদা পূরণের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বরফের অভাবে দূর দেশ হইতে মাছ আনা যায় না। পেট্রলের অভাবে পেট্রল লঞ্চে মাছ আনিবার উপায় নাই। মফঃস্বলের মাছধরা নৌকাগুলি গভর্ণমেণ্ট নষ্ট করিয়া দেওয়ায় লোক মাছ ধরার সুবিধা হারাইয়াছে। তাহার উপর বাঙ্গালায় মাছ-খাওয়া লোকের সংখ্যা সম্প্রতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সময়ে গভর্ণমেণ্ট নানাভাবে সাহায্য দান করিয়া যদি মাছের চাষ বাড়াইবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে কিছুদিন বাদে মাছ আর আদৌ পাওয়া যাইবে না।

পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রী—

খান বাহাদুর নবাব সার মহম্মদ জামাল খান লেহারী ও মেজর নবাব আসিক হোসেনকে পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এইবার মোট মন্ত্রীর সংখ্যা হইল ৭ জন—তন্মধ্যে ৪ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু ও একজন শিখ। এই মন্ত্রিসভা স্থায়ী হইলেই ভাল।

পণিকালয় বন্ধের চেষ্টা—

১৯৩৩ সালে কলিকাতায় পতিতালয় বন্ধের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন পাশ হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্য্যকরী হয় নাই। গত ৩০ বৎসরে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি উক্ত আইনে অভিযুক্ত হইয়াছে। বৎসরে ৮।১০টি করিয়া মাত্র নাবালিকাকে পতিতালয় হইতে উদ্ধার করা হয়। ১৯২৩ সালের আইনানুসারেও তাহাই হইত। সেজন্য সম্প্রতি লেডী অবলাবসু, ইন্দিরা দেবী চৌধুরী, মিসেস্ এন-সি-সেন প্রভৃতি এক আবেদন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন—বোম্বাই ও মাদ্রাজে যেমন গণিকালয় বন্ধ করা হইয়াছে, কলিকাতায়ও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মিঃ নূর আহমদ এ বিষয়ে যে বিল করিয়াছেন, সে বিষয়ে সকলকে অবহিত হইতে তাঁহারা অনুরোধ করিয়াছেন।

ভোগের জন্য চাউল—

গভর্ণমেণ্ট রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত করিলেও গৃহদেবতার ভোগের জন্য এ পর্য্যন্ত চাউল দানের ব্যবস্থা করেন নাই। এ বিষয়ের প্রতিবাদে ভাটপাড়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় গত বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে চাউল ও অন্যান্য রেশন করা খাদ্যদ্রব্য বর্জন করিয়াছেন। দেখা যাউক, ইহাতেও যদি কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয়।

পরলোকে বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়—

ডাক্তার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৮ই বৈশাখ কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৩ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় বিভিন্ন দেশের কন্সালের কাজ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিদেশীয় কন্সাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন ও মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিকের মৃত্যু—

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের 'বাৰ্ত্তাদীপিকা'র সম্পাদক তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫শে এপ্রিল ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ২৭ বৎসর সম্পাদকের পদে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ৩৭ বৎসর ওকালতী করিয়াছিলেন এবং ১৯ বৎসর স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন।

খাদ্যাভাব—

বাঙ্গালা দেশের লোকদিগকে কয়লা, লবণ, চিনি, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে গত প্রায় এক বৎসরকাল ধরিয়া কিরূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ২৫শে বৈশাখ সে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। কলিকাতার মত সহরেও লোক কয়লা, চিনি বা গুড় সংগ্রহ করিতে পারে না। মফঃস্বলে কেরোসিনের অভাবে সকলকে অন্ধকারে থাকিতে হয়। এ কথা আমরা ও বার বার উল্লেখ করিয়া বিফল হইয়াছি। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন ?

শ্রীযুক্ত সুরেশ বৈদ্যের মুক্তিলাভ—

শ্রীযুক্ত সুরেশ বৈদ্যের বয়স ৩৩ বৎসর, তিনি বিলাতে থাকিয়া সাংবাদিকের কাজ করেন। তাঁহাকে সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়া বাধ্য করা হইলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন ও সেজন্য তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি আপীল করায় তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। রায়ে বলা হইয়াছে, বৃটিশ সৈন্যদলে যোগদান সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ভারতীয়গণের উপর প্রয়োগ করা অবৈধ।

শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার—

কলিকাতার নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দারের মত কম বয়সে ইতিপূর্ব্বে কেহ কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হন নাই।



মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার

১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৩১ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৩৩ সালে আই-এ পাশ করেন। তাহার পর বি-এ পড়িবার সময় ১৯৩৪ সালে ২০ বৎসর বয়সে ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত রামচন্দ্র পোদ্দার জয়পুর শিকর রাজ্যের রাণীগড়ের অধিবাসী। রামচন্দ্র ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় ব্যবসা করিতে আসেন এবং পরে সাওয়ালেস ও বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর বেনিয়ান হইয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালে আনন্দীলাল প্রথম কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন—পরে ১৯৪০ সালে পুনরায় কাউন্সিলার হইয়া ১৯৪৩ সালে ডেপুটী মেয়র হইয়াছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যে সুপণ্ডিত।

মেদিনীপুরে শিক্ষক সম্মিলন—

বিগত ৯ই এপ্রিল সমগ্র-বাঙ্গালা-শিক্ষক-সম্মিলনীর দ্বাবিংশ অধিবেশন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের পৌরহিত্যে, মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী তমিজুদ্দিন খাঁন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সরকার মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে সকল বিষয়ের অবতারণা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় যে তাঁহার ন্যায় নেতার সভাপতিত্বে আগামী এক বৎসরে সম্মিলনীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এই দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে চারিশতেরও অধিক শিক্ষক-প্রতিনিধি উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। ঝাড়গ্রামের বিদ্যোৎসাহী রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের সৌজন্যই অধিবেশনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের প্রধান। কারণ তিনি একদিকে যেমন অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন অপরদিকে তেমনি, দূরাগত অতিথি ও অভ্যাগতবর্গকে আমন্ত্রণে ও সাদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর শেষ কথা—

মহাত্মা গান্ধী গত ২৫শে মে তারিখে ডক্টর মুকুন্দরাম রাও জয়াকরকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—"অসুস্থ হইয়া মুক্তিলাভে আমি সুখী হই নাই। ইহা আমার পক্ষে লজ্জাজনক। আমার মনে হয়, আমি সুস্থ হইলেই গভর্ণমেণ্ট আবার আমাকে গ্রেপ্তার করিবে। গ্রেপ্তার না করিলেই বা আমি কি করিতে পারিব? আমি আগষ্ট মাসের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারি না। তাহাই আমার জীবনের সর্ব্বস্ব।"

ইহার পর আর কিছু চিন্তা করিবারও অবসর থাকিতে পারে না।

মিঃ মহম্মদ রফিক—

কলিকাতার নূতন ডেপুটী মেয়র মিঃ মহম্মদ রফিক সাহেব খ্যাতনামা ব্যবসায়ী হাজি দোস্ত মহম্মদের পুত্র। তাঁহারা পাঞ্জাব চিনিয়ালের অধিবাসী। হাজি সাহেব ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মিঃ রফিক ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে মিঃ রফিক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের



ডেপুটী মেয়র মহম্মদ রফিক

কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়া উভয় স্থানেই কাজ করিতেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি

ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন এবং নিজ ব্যবসা সম্পর্কে ১৯৩৬ সালে জাপান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি মুসলেম চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

পরলোকে সরোজনাথ ঘোষ—

কয় মাস রোগভোগের পর প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় গত ২৮শে বৈশাখ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার



সরোজনাথ ঘোষ

কলিকাতা চেতলাস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর দৈনিক বসুমতী ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'শতগল্প গ্রন্থাবলী' তাঁহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন।

ব্লড্ ব্যাঙ্ক বা রক্তদান কেন্দ্র—

কলিকাতা ১১০ চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে সম্প্রতি যে ব্লড্ ব্যাঙ্ক বা রক্ত দান কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, তথায় গত ১৬ই মে কলিকাতার সাংবাদিকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেখানকার কার্য্য দেখান হইয়াছে। যে কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্ত লইয়া তথায় গচ্ছিত রাখা হয় এবং প্রয়োজন মত দুর্ব্বল ব্যক্তির শরীরে তাহা ইনজেক্সন করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লোক উপকৃত হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার পার্ব্বতীচরণ সেন ব্লড ব্যাঙ্কের ইতিহাস ও উপকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ সম্প্রতি কলিকাতাস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি গত ১১ই মে সন্ধ্যায় ১নং পার্ক ষ্ট্রীটে সোসাইটী গৃহে কলিকাতার সাংবাদিকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সোসাইটীর বিবিধ কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নিজে সেদিন সকলের নিকট সোসাইটীর প্রাচীন ইতিহাসও বিবৃত করিয়াছিলেন। সোসাইটী প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া এদেশের সংস্কৃতি প্রচারে যাহা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা উচিত।

আই-এ ও আই-এস্-সি পরীক্ষার ফল

১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ১০জন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—(১) স্বদেশ-রঞ্জন দত্ত গুপ্ত, রিপণ (২) প্রহ্লাদচন্দ্র জানা, বঙ্গবাসী (৩) অমল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর (৪) জগৎচন্দ্র শর্ম্মা, গৌহাটী কটন (৫) অমিতাভ ঘোষ, রঙ্গপুর (৬) রাজলক্ষ্মী দেবী, মৈমনসিংহ আনন্দমোহন (৭) অজিতকুমার বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর (৮) রেবা দাশগুপ্ত, আশুতোষ (৯) বিশ্বনাথ লাহিড়ী, রঙ্গপুর (১০) মীরা দেব, শ্রীহট্ট। আই-এস্-সি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ১০জন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—(১) শান্তিব্রত ঘোষ, রঙ্গপুর (২) দীনেশচন্দ্র মিশ্র, বিদ্যাসাগর (৩) সুনীল রায়চৌধুরী, বঙ্গবাসী (৪) অশেষপ্রসাদ মিত্র, বঙ্গবাসী (৫) ধনঞ্জয় নন্দিপুরী, রিপণ (৬) শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, রঙ্গপুর (৭) অজিতকুমার দাসগুপ্ত, প্রেসিডেন্সি (৮) রণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রেসিডেন্সি (৯) মনীষা বসু, স্কটিশচার্চ্চ (১০) রামদাস বৈরাগী, বাঁকুড়া। অজিত দাসগুপ্ত ও রেবা দাসগুপ্ত বর্দ্ধমানের জেলা জজ মিঃ কুলদাদাস গুপ্তের পুত্র-কন্যা, সুনীল রায়চৌধুরী অধ্যাপক মহীতোষ রায়চৌধুরীর পুত্র এবং অমিতাভ ঘোষ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র।

কানপুরে রবীন্দ্র দিবস পালন—

গত ২৫শে বৈশাখ, কানপুর আর্য্যনগর প্রবাসী বাঙ্গালী 'আমরা সকলের' উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ডাঃ হরিদাস সেন। রবীন্দ্র জীবনী আলোচনা, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আবৃত্তি ছিল সভার অঙ্গ। আবৃত্তি করেন নৃপেন ঘোষ, সুধীন গাঙ্গুলী, শ্যামল বসু—গণেশ ঘোষ, গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীত বসু, সুধাংশু বসু এবং ভবানী চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-প্রশস্তি আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর "জনগণ মনঅধি-নায়ক" সমবেত সঙ্গীতের দ্বারা সভার কাজ শেষ করা হয়।

বরিশালে হিন্দু সম্মিলন বন্ধ—

৩রা ও ৪ঠা জুন বরিশাল জেলার উদয়নগরে বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতাবের সভাপতিত্বে যে হিন্দু সম্মিলন হইবার কথা ছিল, তাহা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা আইনের বিধান অনুসারে ১লা জুন বন্ধের আদেশ দিয়াছেন। খুলনা জেলার বাগেরহাটে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সরকারী আদেশে বলা হইয়াছে।

মন্ত্রীদলে ভাঙ্গন—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই ব্যাপারে মন্ত্রীদলের বহু সদস্য ক্রমে ক্রমে দল ত্যাগ করিতেছেন। দুইজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র কুমার ও শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—বেতনের মোহ ত্যাগ করিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদের তপশীলভুক্ত জাতির সদস্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস, ধনঞ্জয় রায় ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ পূর্ব্বে সরকার পক্ষে ছিলেন। তাঁহারাও শিক্ষা বিলে গভর্ণমেণ্ট নীতির প্রতিবাদে দলত্যাগ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে তুষারকান্তি সম্বর্দ্ধনা—

'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ গত ২৪শে মে মাদ্রাজে যাইয়া স্থানীয় তামিল ভাষার দৈনিকপত্র



শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

'দীনাসারী'র উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ উদ্বোধন সভায় মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি, রাজাগোপালাচারী সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিনই মাদ্রাজ মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তুষারবাবুকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করিয়া মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের সময় মাদ্রাজ হইতে যে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, সে সকলের উল্লেখ করিয়া তুষারবাবু মাদ্রাজবাসীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিদেশে বাঙ্গালী সাংবাদিকের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে বাঙ্গালীমাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

কিশোর কল্যাণ—

গত ২৮শে মে অপরাহ্নে বালীগঞ্জ ৪২।এ হাজরা রোডস্থিত "নিরালা" ভবনে 'কিশোর-কল্যাণে'র প্রথম মিলন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'কিশোর-কল্যাণে'র কিশোর-কিশোরীগণ মহাত্মা গান্ধীজীর কারামুক্তিতে আনন্দপ্রকাশ করিয়া একটি উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। কুমারী পাঁপড়ি সেন, মঞ্জু বোস, উমা সেন, মঞ্জুষা সেন, মমতা বোস, কৃষ্ণা সেন, দীপালী রায়, শীলা সেন, শিবানী রায়, শীলা বসু, মীরা সেন, মঞ্জুরী দাশগুপ্ত, টপসী সেন, বিজয় বসু, শঙ্কর রায়, দেবব্রত বসু ও তপন মিত্র উৎসবে সঙ্গীত-নৃত্য এবং কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পল্লীর দুঃস্থ জনগণের সেবায় 'কিশোর-কল্যাণে'র সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হইবে।

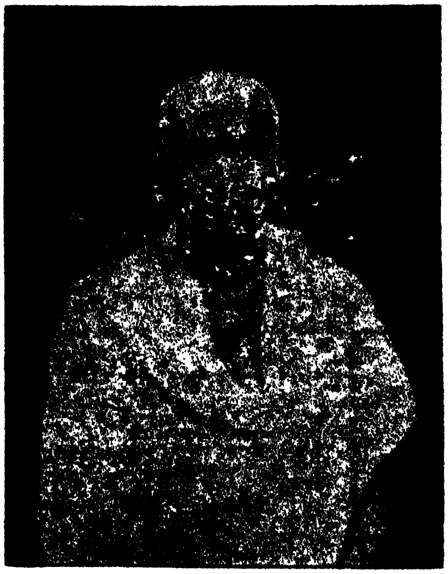
পরলোকে তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়—

তরুণ সাহিত্যিক—'ভারতবর্ষের'-"চলতি ইতিহাস" লেখক তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় এক বৎসর যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া গত ৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবারে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনকড়ি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। 'বঙ্গশ্রী' ও 'প্রবর্ত্তকে' তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হইত। ভারতবর্ষে "চলতি ইতিহাস" শীর্ষক নিবন্ধে বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত আলোচনা বহুদিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য রচনাও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। তিনি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন ও অকৃতদার ছিলেন। তিনকড়ির ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র, সদাপ্রফুল্ল ও অমায়িক-স্বভাব যুবক আজকাল বিরল।

পরলোকে প্রমথনাথ তর্কভূষণ—

বাঙ্গালার পাণ্ডিত্য গৌরবের শেষ নিদর্শন ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ৭৯ বৎসর বয়সে তিন বৎসর কাল রোগ ভোগের পর কাশীলাভ করিয়াছেন। ৫ দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ২ বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামেই তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা তারাচরণ তর্করত্ন কাশীরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সর্ব্ব ভারতে পরিচিত ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। পরে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতদ্বৈধের ফলে তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। হিন্দু



প্রমথনাথ তর্কভূষণ

বিশ্ববিদ্যালয় ২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে ডি-লিট্ উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম

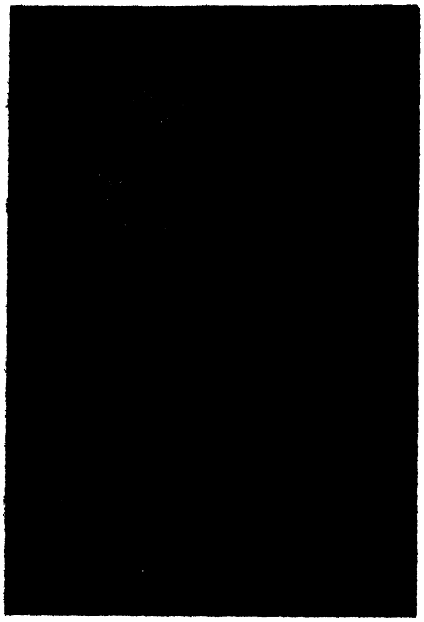
সেবক ছিলেন এবং বহুবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে মূল ও শাখা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, সেজন্ত তিনি উদারনীতিক মতাবলম্বী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর কখনও পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

স্যার আরদেশীর দালাল—

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবার জন্ত সার আরদেশীর দালালকে বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্ততম সদস্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। ব্যবসায়ী জগতে সার আরদেশীর সুপরিচিত। তিনি আগামী ১লা আগষ্ট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অগ্রসর হইবে।

পরলোকে মৈমনসিংহের মহারাজা—

মৈমনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী গত ২৭শে মে শনিবার সকাল দশটার সময় কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র



শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী

৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ১৮৮৬ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং অপুত্রক মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০৭ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান, কিন্তু পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৯১৩ সালে তিনি রাজা ও ১৯২০ সালে মহারাজা উপাধি লাভ করেন। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু আন্দোলনের তিনি অন্ততম নেতা ছিলেন। দানশীলতার জন্ত তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্তা রাখিয়া গিয়াছেন। জমীদারগণের স্বার্থরক্ষায় যেমন তিনি অবহিত ছিলেন, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্তও তেমনই তাঁহাকে সর্ব্বদা সচেষ্ট দেখা যাইত।

শুভবিবাহ—

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অন্ততম স্বত্বাধিকারী ৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্তা কল্যাণীয়া ইরাদেবীর সহিত কলিকাতা ভবানীপুরের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব রায় শ্রীযুক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমারের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নব-দম্পতীর জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হউক এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

ঢাকায় দাঙ্গার ফল—

ঢাকা সহরে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতেছে, তাহার ফলে সহরের তিনটি বিশিষ্ট অঞ্চলে মোট ২২ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই এই অর্থদণ্ডের দুঃখভোগ করিতে হইবে। ঢাকার আর্থিক অবস্থা এমনই ভাল ছিল না। তাহার উপর এই পাইকারি জরিমানার ফলে লোকের দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না।

কলিকাতার পথে নিরন্নের দল—

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন—"কলিকাতার পথে পুনরায় নিরন্নেরদল অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে। গৃহস্থ বধূ পুত্র কন্তার হাত ধরিয়া মফঃস্বল হইতে সহরে আসিয়া নিতান্ত বিপাকে পড়িয়া পথে দাঁড়াইয়াছে—দেখিলেই বোঝা যায়। ইঁহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্ত পুলিসী ব্যবস্থাও পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও দেখিতেছি বটে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি।"

ঢাকা হাঙ্গামা সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব—

গত ১৪ই মে হইতে ঢাকা সহরে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অতুল সেনের প্রস্তাবে গত ১৯শে মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক মুলতুবী প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ সুরাবর্দ্দী জানাইয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী হাঙ্গামা শান্ত করিবার জন্ত ১৮ই মে ঢাকায় গিয়াছিলেন—গভর্ণমেণ্ট হইতেও দাঙ্গা থামাইবার জন্ত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বার বার এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ঢাকার মত বড় সহরের অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইয়া যাইতেছে।

রোমারোলাঁ ভাল আছেন—

১৬ই মে তারিখে লোকার্ণো হইতে সুইটজারল্যাণ্ডবাসী অধ্যাপক এডমণ্ড প্রিভট সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীকে জানাইয়াছেন যে তিনি ও রোমা রোলাঁ ভাল আছেন। মহাত্মা গান্ধী প্রিভটের পুরাতন বন্ধু। মহাত্মাজী ১৯৩১ সনে লণ্ডন হইতে ফিরিবার

পথে ঐ অধ্যাপকের অতিথি হইয়াছিলেন। গত ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে রোমা রোলাঁ মারা গিয়াছেন। এখন সকলে জানিয়া সুখী হইবেন যে তিনি ভাল আছেন। তিনি মহাত্মাজীর ভক্ত এবং মহাত্মা গান্ধীর একখানি জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

পরলোকে ডাক্তার অতুল রক্ষিত—

ডাক্তার অতুল রক্ষিত মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ফাইলেরিয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে বি-এস্‌-সি,



ডাঃ অতুল রক্ষিত

এম-বি পাশ করিয়া লণ্ডনের ডি-এম্‌-আর-ই, ডাব্লিনের এল-এম্‌ ডিগ্রী লইয়া রেডিওলজিষ্ট হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জাপান জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কাজের অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি Nature Cure Home নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসেবা, রসজ্ঞতা, ভদ্র ও মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যবহার সকলের নিকট তাঁহাকে প্রিয় করিয়াছিল।

ডক্টর নবগোপাল দাস—

ডক্টর শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস আই-সি-এস বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্রোলার ছিলেন। তিনি সম্প্রতি বাঙ্গালার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটীর সেক্রেটারী ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শিল্প ও শ্রম বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী হইয়াছেন। ডক্টর দাস সুপণ্ডিত ব্যক্তি—তাঁহার দ্বারা পুনর্গঠন সম্পর্কে দেশ উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

দিল্লী সেকেণ্ডারী বোর্ডের গৃহীত গত মার্চ্চ মাসের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নয়া দিল্লীর রাইসিনা বেঙ্গলী বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হইতে তিনটি বালক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বালক তিনটির নাম যথাক্রমে শ্রীমান মিহিরকুমার দাস, শ্রীমান অশোককুমার সেন ও শ্রীমান সলিলকুমার রায়চৌধুরী।

গভর্ণর ও কারখানা শ্রমিক—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি-কেসি গত ২১শে মে রবিবার বাঙ্গালার সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের সহিত তিন ঘণ্টাকাল কলিকাতার সন্নিহিত কারখানা-সমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যদি শ্রমিকদের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি বিধান করা হয়, তবেই মঙ্গলের কথা।

সার উষানাথ সেন—

'এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার ও ম্যানেজিং এডিটর সার উষানাথ সেন মহাশয় ভারত গভর্ণমেণ্টের চিফ প্রেস এডভাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আগামী ১লা জুন হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। সার উষানাথ বাঙ্গালী এবং কলিকাতায় তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। আমরা তাঁহার এই উচ্চ সম্মানলাভে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মেডিকেল ছাত্রবৃন্দের সেবাব্রত—

বাঙ্গালার বন্যাপ্লাবিত ও রোগ সংক্রামিত অঞ্চলে যে ভয়াবহতার চিহ্ন দেখা গিয়াছে সে সব ক্ষেত্রে সেবা প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত পরিশ্রম ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত অবসাদগ্রস্ত লোকের



বামদিক হইতে চেয়ারে—মিঃ সলিল ঘোষ (সেক্রেটারী), ডাঃ কালিচরণ দে, মিঃ অমল ঘোষ
দণ্ডায়মান—মিঃ দিলীপ রায়, মিঃ ভবানীপ্রসাদ অধিকারী

উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার মহামন্বন্তরের মধ্যে বহু সেবা প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের সেবা করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া চিকিৎসকগণ এবং মেডিকেল ছাত্রগণের আপ্রাণ সেবা প্রশংসার্হ। কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ এ বিষয়ে পুরোভাগে দাঁড়াইয়া সেবাব্রতের দীক্ষা লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই মহাপ্রাণতা ও সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়াছি।

পরলোকে কুমারশঙ্কর রায়—

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা দেশসেবক তেওতার (ঢাকা) জমীদার কুমারশঙ্কর রায় মহাশয় গত ২৪শে বৈশাখ পরলোক গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৮৯ সালের ৫ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে তিনি হাইকোর্টে উকীল রূপে যোগদান করেন, পরে ১৯২১ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার আত্মীয় ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে তিনি দেশবন্ধুর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কুমারশঙ্করের কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় ও জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত। কুমারশঙ্করের পিতা পার্ব্বতীশঙ্কর রায় ১৯০৭ সালের স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মোহনমেলা ও কলিকাতা প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯০৭ সাল হইতেই কুমারশঙ্করও দেশসেবার সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি বাংলা কবিতা লিখিতেন এবং ছাত্রদের জন্য 'প্রকৃতি পরিচয়' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।



কুমারশঙ্কর রায়

দাবী, না ভিক্ষা—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত বি-জি খাপার্দে বেজওয়াদায় এক সভায় বলিয়াছেন—'মিঃ জিন্না যুদ্ধ করিয়া পাকিস্থান অর্জ্জন করিতে চান না, তিনি চান—বৃটেন মুসলমানদিগকে তাহা ভিক্ষা দিবে।'

কলিকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি—

বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারীর প্রথম দিন হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত কলিকাতায় মোট ২৫১০১জন লোক মারা গিয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ের মধ্যে ১০৪০৩জন লোক মারা গিয়াছিল। এই মৃত্যুহার বৃদ্ধি সহরে বিষম উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে।

আরও বাঁচিতে চাই—

গত ১০ই মে জনৈক বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় চিকিৎসক জুহুতে মহাত্মা গান্ধীকে কিছু আয়ুর্ব্বেদীয় টনিক প্রদান করিলে মহাত্মাজী তাঁহাকে বলিয়াছেন—আমি আরও অনেকদিন বাঁচিতে চাই। আপনার ঔষধ কি আমাকে আরও ২৫ বৎসর জীবিত রাখিবে?

সাগরদাঁড়িতে মাইকেল স্মৃতি—

গত ১৭ই মে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন হলের দ্বারোদ্ঘাটন ও মহাকবির মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব হইয়া গিয়াছে। তবু এতদিন পরে মাইকেলের স্মৃতিরক্ষা করা হইল।

রঙ্গপুর জেলা বোর্ড—

গভর্ণমেণ্টের আদেশে রঙ্গপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলবী আবু হোসেন সরকার এম-এল-এ-কে ঐ পদ হইতে অপসারিত করিয়া মৌলবী আমেদ হোসেন এম-এল-এ কে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নমুনা।

দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক হুমাউন কবীর বাঙ্গালা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের দানের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যকল্পে উপযুক্ত মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুরীর জন্য এক প্রস্তাব দিয়াছেন। সভাপতি ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। অধ্যাপক কবীরের প্রস্তাব গৃহীত হইলে এই দুর্দ্দিনে বহু দুঃস্থ সাহিত্যিক উপকৃত হইবেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীমান গুরুদাস গোস্বামী ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম নিবাসী। তিনি পেগু সহরে প্রাথমিক বিদ্যালাভ করেন ও ইং ১৯৩৪ সালে পেগু গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে ব্রহ্মদেশীয় হাই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। রেঙ্গুন ইউনির্ভাসিটি কলেজে প্রবেশ করিয়া তিনি এক বৎসরেই আই-এ পাশ করেন এবং ইং ১৯৩৮ সালে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গৃহীত বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।



শ্রীমান গুরুদাস গোস্বামী

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মিলন—

গত ১লা ও ২রা জুন কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটস্থ কর্পোরেশন কমার্সিয়াল মিউজিয়াম হলে কালনার কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলন

হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ, সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় উদ্বোধন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ধম্বন্তরি পতাকা উত্তোলন করেন। কবিরাজ শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলের সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

পরলোকে ব্যারণ জয়তিলক—

ভারতে সিংহল গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি সার ব্যারণ জয়-তিলক দিল্লীতে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে কলম্বো প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিমানযোগে যাইবার সময় পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ কলম্বোতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রস্তাব—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গত দিল্লী অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচার বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়টি বিশেষ আলোচনার যোগ্য। (১) রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর লোক শিক্ষা সংসদ হইতে সম্প্রতি যে বাঙ্গালা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, বহু পরীক্ষার্থী সেই পরীক্ষায় যোগদান করিয়া তাহা পাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতা, ঢাকা বা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অথবা যুক্তপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কেহই সেই পরীক্ষাগুলি স্বীকার করেন না। যাহাতে ঐ পরীক্ষাগুলি স্বীকার করিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদিগকে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ প্রভৃতি পরীক্ষায় শুধু ইংরাজিতে পরীক্ষা দিতে দিয়া পূর্ণ সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী দেন, সে জন্য তাঁহাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। (২) লোক শিক্ষা সংসদ ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পরীক্ষা যাহাতে একযোগে গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়জনকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—(ক) শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (খ) ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) শ্রীযুক্ত অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও (ঙ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। (৩) কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় যে বাংলা পাঠ্য আছে, তাহা অতি কম। ঐ পাঠ্যের মান যাহাতে কলিকাতার ম্যাট্রিকুলেসনের বাঙ্গালার মানের সমান হয়, সেজন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং স্বর্ণলতার পরিবর্ত্তে অপর কোন পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গালার চিত্র—

সন্তোষের মহারাজকুমার শিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন রায় বর্ত্তমানে কাশীধামে আছেন। গত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের পর তিনি রঙ্গীন



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　শিল্পী—রবীন রায়

গালা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি অঙ্কিত করিয়া তাহা রেড্ ক্রস ফাণ্ডের সাহায্যকল্পে ইউ-পি-গভর্ণমেণ্টকে দান করেন্। উহা ইউ-পি-গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ ৫০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া অর্থ রেড্ ক্রস ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। এই সঙ্গে শিল্পীর সহিত সেই চিত্র প্রকাশিত হইল।

এতদিন পরে

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

এতদিন পরে, জীবনে আমার
　　এলো ফিরে মধুমাস,
মলয় আজিকে আনিল বহিয়া
　　সুরভি কুসুম বাস!
প্রিয়তম তুমি এতদিন পরে,
　　আমারে কি বুকে ল'বে,
আমায় মাঝারে তোমারে লভিব,
　　এমন ভাগ্য হ'বে?
তৃষিত অধরে ঢালিবে কি আজ,
　　তোমার অধর সুধা,
বাসনা আমার হ'বে কি সফল,
　　মিটিবে প্রাণের ক্ষুধা?

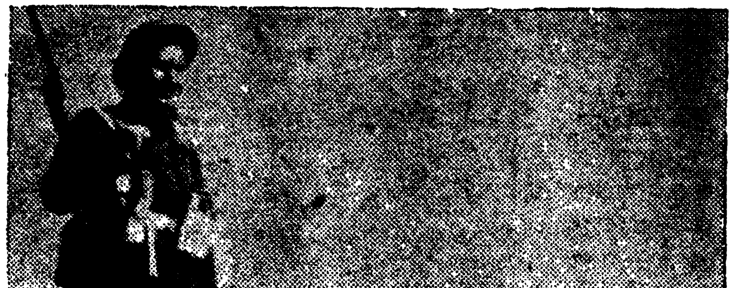
জনমে জনমে, লক্ষ জীবনে
　　তোমায় পাবার আশা,
তোমার মাঝারে মিটিবে কি মোর,
　　নিখিলের ভালবাসা?
আসিয়াছ যদি, আজি প্রাণনাথ,
　　বাঁধ মোরে ফুলডোরে
সোহাগে আদরে, পুলকে আজিকে
　　পাগল কর গো মোরে।
এস এস আজ, ভরা জোছনায়,
　　বহিছে ফুলের বাস,
মরণে আজিকে নাহি আর ক্ষোভ,
　　পূর্ণ আমার আশ!

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

মণিপুর ও ব্রহ্ম রণাঙ্গন

মণিপুর রণাঙ্গনে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য এখনও আশানুরূপ হয় নাই। কোহিমা অঞ্চলে জাপানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইলেও এখনও নাগা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। কাজেই, এই অঞ্চল এখনও নিরাপদ নয়; বর্ষাকালে নাগা পাহাড় হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করা অসাধ্য হইতে পারে। কোহিমা-ইম্ফল রাস্তা এখনও বিচ্ছিন্ন; বিষেণপুরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলও সম্পূর্ণরূপে শত্রুর কবলমুক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ ইম্ফল এখনও অবরুদ্ধ।



দক্ষিণ-রোমে মিত্র পক্ষের সৈন্যবাহিনী

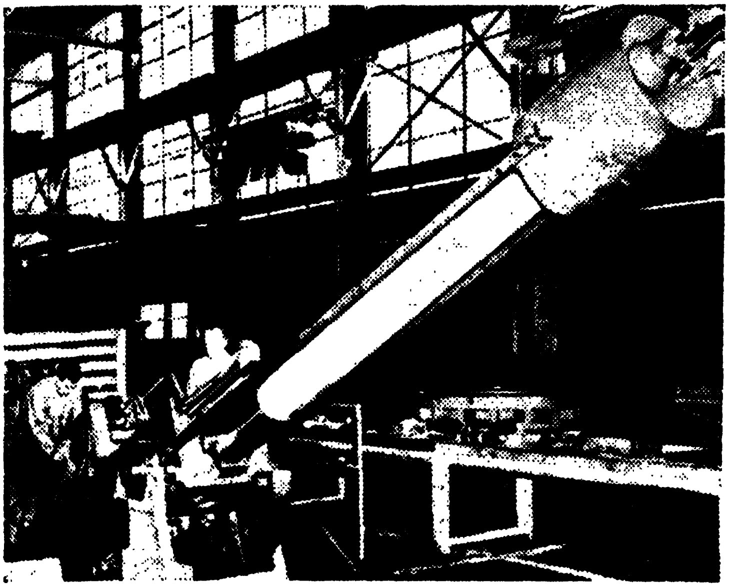
এই সময় উত্তর ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। জেনারল মেরিলের সেনাবাহিনী মিচিনার বিমানঘাঁটী অধিকার করিয়াছে। চিন্দিৎদের আক্রমণে মিচিনার সহিত ভামোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মিচিনা সহরের কতকাংশই এখন সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত। ওদিকে চীনের য়ুনান প্রদেশ হইতে চীনা সৈন্য উত্তর ব্রহ্মের সহযোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি তাহারা টেন্‌চাংএর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই স্থান হইতে মিচিনার অভ্যন্তরে যুদ্ধরত ষ্টিলওয়েলের সৈন্যের ব্যবধান মাত্র ৫০ মাইল। উত্তর ব্রহ্মে জাপানীদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থায় মিচিনার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জাপানীরা এই সহরটি রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

মণিপুর অঞ্চলে জাপানের তৎপরতা এবং উত্তর ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রগতি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত নয়। মিচিনা অধিকার করিয়া উত্তর ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষ যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে যে নূতন লেডো রোড্ নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা পুরাতন বর্ম্মা রোডের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে। ফলে চীনের সহিত স্থলপথে বহির্জ্জগতের সংযোগ স্থাপিত হইবে। চীনের সহিত বহির্জ্জগতের সংযোগ এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধি জাপানের পক্ষে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার কারণ। কাজেই, মিচিনায় সে প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিরোধ করিতেছে। এদিকে মণিপুর অঞ্চলে তৎপর হইয়া জাপান উত্তর ব্রহ্মের সহিত ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিতে সচেষ্ট। বর্ত্তমানে কোহিমা বিপদমুক্ত হওয়ায় উত্তর-পূর্ব্ব আসামের জল ও স্থলপথের সংযোগ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়াছে। কিন্তু বর্ষাকালে এই বিপদ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। উত্তর-পূর্ব্ব আসামের সংযোগ-সূত্র যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে উত্তর ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে সম্মিলিত পক্ষের সেনা যদি বর্ষার পূর্ব্বে মিচিনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে মণিপুর রণাঙ্গনে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে; উত্তর ব্রহ্মের সরবরাহ-সূত্রে বঞ্চিত হওয়ায় এই রণাঙ্গনের জাপ-সেনা বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে। এদিকে আসামে জাপানের তৎপরতা যেমন উত্তর ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টা, তেমনি সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য ও উত্তরব্রহ্মে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসামে জাপানের তৎপরতা ব্যর্থ করিতে প্রয়াসী। অবশ্য উভয় পক্ষের ইহা আশু সামরিক উদ্দেশ্য মাত্র। ইহা ব্যতীত, দূরবর্ত্তী সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই উভয় পক্ষের আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারল ম্যাক্-আর্থারের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ চলিতেছে। আমেরিকান্ সৈন্য সম্প্রতি নিউ গিনির উত্তর-পশ্চিমে বিয়াক দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। এখান হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব মাত্র ৯ শত মাইল। বিয়াকিতে

জাপানীদের উপস্থিতির ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এখন আর নিরাপদ নয় ; সর্ব্বোপরি পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত জাপানের সংযোগসূত্রও বিপন্ন হইয়াছে। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যারোলিন্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত



আমেরিকায় নব-নির্ম্মিত বন্দুকগুলি এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা হইয়া থাকে

ক্রুক্ পোতাশ্রয়ে এবং পনেপে মার্কিণ বিমানবাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে। সম্প্রতি খাস জাপানের ৬ শত মাইল দূরবর্ত্তী একটি দ্বীপে মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহা জাপানের পক্ষে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার বিষয় ; কারণ দূরপাল্লার মার্কিণ বিমানবাহিনীর পক্ষে ৬ শত মাইল পথ দুর্লঙ্ঘ্য নয়। ওদিকে কিউরাইল্ দ্বীপপুঞ্জেও মার্কিণ বিমানবাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে।

খাস জাপানে প্রত্যক্ষ আঘাত, ফিলিপাইন্‌সে প্রত্যক্ষ অভিযান এবং চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে "সেতুমুখ" (bridgehead) স্থাপন জেনারল ম্যাক্-আর্থারের লক্ষ্য। এই ত্রিবিধ লক্ষ্যের দিকে তিনি ধীরে ধীরে এবং সুনিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। বর্ত্তমানে যে বিমান-আক্রমণ চলিতেছে, উহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৈন্য অবতরণ করাইবার প্রাথমিক আয়োজন। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তরাঞ্চলে আলিউসিয়ান্‌সে মার্কিণ সেনা প্রতিষ্ঠিত আছে ; এখন তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিয়াকিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সব স্থান মার্কিণ সেনার পরবর্ত্তী আঘাতের ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইবে।

ইতালীয় রণাঙ্গন

বহুকাল নিষ্ক্রিয়তার পর এখন ইতালীয় রণাঙ্গনে তৎপরতা দেখা দিয়াছে ; রোম অধিকারের জন্য সম্মিলিত পক্ষের দৃঢ় প্রয়াস চলিতেছে। ইতালীতে পশ্চিম উপকূলে দুইটি স্থানে সম্মিলিত পক্ষের সেনা যুদ্ধরত ছিল—রোমের দক্ষিণে আঞ্জিও অঞ্চলে এবং ক্যাসিনোর নিকটে। এই দুইটি স্থানের সেনাবাহিনী পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া প্রবল বেগে রোমের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; এখন তাহারা রোম হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে আলবান্ পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছে। রোমকে সুরক্ষিত করিবার জন্য জার্ম্মান গুস্তভ্ লাইন ও হিট্‌লার লাইন নামক দুইটি ব্যূহশ্রেণী রচনা করিয়াছিল। সম্মিলিত পক্ষের সেনা এই দুইটি ব্যূহশ্রেণী ভেদ করিয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলেও সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য কিছু আগাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইতালীর রাজনৈতিক সমস্যার সাধনে অর্থাৎ বাদোগ্‌লিও গভর্ণমেণ্টের প্রসার সাধিত হওয়ায় ইতালীর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জনসাধারণ সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার পরিপূর্ণ সুযোগ এখন লাভ করিয়াছে ; জার্ম্মানীর অধিকৃত ইতালীতে প্রতিরোধ-আন্দোলন এখন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

ইতালীয় রণাঙ্গণে বহুকাল রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা চলায় মনে হইয়াছিল যে, ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির প্রত্যক্ষ অভিযান আরম্ভ হইবার সময় ইতালীতেও তৎপরতা আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে এই তৎপরতাকে সমর সমালোচকরা ইউরোপ অভিযানের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। মনে হয়, ইতালীয় রণাঙ্গনে জার্ম্মান বাহিনীকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য—এখান হইতে ; অন্যান্য রণাঙ্গনে তাহার সৈন্য অপসারণ অসম্ভব করিবার উদ্দেশ্যেই সম্মিলিত পক্ষ এই অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানদিগকে উত্তর ইতালীতে আরও ঠেলিয়া



আমেরিকার এ্যাড্‌মিরাল হাল্‌সি

দিতে পারিলে আড্রিয়াতিকের অপর তীরে যুগোস্লেভিয়ার গেরিলাদের সহিত সংযোগ রক্ষা সহজ হইবে, অদূর ভবিষ্যতে বল্‌কানে ব্যাপক রণক্ষেত্র সৃষ্টিও সম্ভব হইতে পারে। তৃতীয়তঃ রোম সম্মিলিত পক্ষের

অধিকারভুক্ত হইলে ইতালীয় জাতির প্রতি উহার যে নৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে, তাহাও উপেক্ষণীয় নয়।

লাল ফৌজের নিষ্ক্রিয়তা

সেবাস্তোপোলের পতন এবং সমগ্র ক্রিমিয়ার মুক্তি ব্যতীত রুশ রণাঙ্গনে আর কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নাই।

লাল ফৌজ এখন নিষ্ক্রিয়। গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে মার্শাল জুকভ ও কনিয়েভ, যখন পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন মনে হয় নাই যে, গ্রীষ্মকালের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থায় লাল ফৌজ এইরূপ দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকিবে। এখন ক্রমেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপরতার সহিত পরবর্তী ব্যাপক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ইউরোপ অভিযানের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া এক সঙ্গে আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা হয়ত স্থির হইয়াছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আঘাত হানিবার জন্যই রুশ বাহিনীর এই প্রতীক্ষা ও আয়োজন। সমর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে লাল ফৌজ



আমেরিকান সৈন্যগণ নিউ-ব্রিটেনে পদার্পণ করিয়াছে

যখন তৎপর হইবে, তখন একই সময় বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে; তবে, মধ্য রণাঙ্গনে আক্রমণ বেশ প্রবল হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি জার্সীর নিকট জার্ম্মানী পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা জার্ম্মানীর ব্যাপক অভিযানের প্রথম পাঠ নয়; জার্ম্মানী এখন রুশিয়ার অভিযান প্রতিরোধের জন্য যে আয়োজন করিতেছে, জার্সীতে আক্রমণ তারই অঙ্গ। অনেক সময় পূর্ব্বাহ্নে আক্রমণ পরিচালন প্রতিরোধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

গত মে দিবসে (১লা মে) মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার বাণীতে বলেন—"জার্ম্মান সেনাবাহিনীকে এখন আহত পশুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই পশু এখন তাহার ক্ষতস্থান শুকাইবার জন্য নিজ গুহায় অর্থাৎ জার্ম্মানীতে ফিরিয়া গিয়াছে। গুহায় অবস্থিত আহত পশুও কম বিপজ্জনক নয়। আমাদের দেশকে এবং আমাদের মিত্রশক্তিকে নিরাপদ করিবার জন্য এই আহত পশুকে অনুসরণ করিয়া তাহার গুহায় যাইয়া আঘাত করা প্রয়োজন।......সোভিয়েট ভূমি হইতে জার্ম্মান সৈন্যকে বিতাড়িত করা অপেক্ষা এই কাজ যে অধিকতর দুঃসাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্র যদি সমবেতভাবে আঘাত করে, পূর্ব্বদিক হইতে আমাদের এবং পশ্চিম দিক হইতে আমাদের মিত্রশক্তির আঘাত যদি সমবেতভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে এই কার্য্য সফল হইতে পারে। এইরূপ একযোগে আঘাত করিলে হিটলারী জার্ম্মানী যে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মঃ ষ্ট্যালিনের শেষের কথাগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সহিত একযোগে রুশ বাহিনীর পরবর্তী অভিযানের কথাই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও সম্ভব; মঃ ষ্ট্যালিন হয়ত পুনরায় তাঁহার প্রতীচ্য মিত্রদের দ্রুত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কেবল বিমান আক্রমণ পরিচালনে অথবা ইতালীয় রণাঙ্গনে সামান্য তৎপরতায় কর্ত্তব্য সম্পাদন হইল মনে করিলে হিটলারী জার্ম্মানীকে চূর্ণ করা যে অসাধ্য হইবে, তাহাই হয়ত তিনি ইঙ্গ-মার্কিণ মিত্রদের আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সে যাহা হউক, মঃ ষ্ট্যালিনের উক্তিতে এই কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, নাৎসী জার্ম্মানী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইবার পূর্ব্বে রুশিয়া বিরত হইবে না; সোভিয়েট ভূমি শত্রু-মুক্ত হইলেই তাহার দায়িত্ব শেষ হইল বলিয়া সে মনে করিবে না। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রাথমিক আয়োজন স্বরূপ পশ্চিম ইউরোপে প্রবল বিমান আক্রমণ চালাইতেছেন। এই বিমান-আক্রমণের ফলে জার্ম্মানীর প্রতিরোধকেন্দ্র ও সংযোগসূত্রগুলি চূর্ণ হইবার পর সম্মিলিত পক্ষের প্রত্যক্ষ অভিযান সত্যই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ সময় সোভিয়েট বাহিনীও প্রচণ্ড বেগে প্রত্যাঘাত আরম্ভ করিবে। এই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি না করেন, অথবা করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে রুশ সেনা বসিয়া থাকিবে না; এতদিন তাহারা যেমন একাকী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, সেইরূপ একাকীই পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতা

তিন মাস পরে গত ২৪শে মে মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনের প্রতি অস্বাভাবিক সহানুভূতি প্রকাশ, তুরস্ককে ভর্ৎসনা এবং ফরাসী মুক্তি পরিষদকে এখনও ফ্রান্সের অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট বলিয়া স্বীকারে অনিচ্ছা—ইহাই এই বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য।

সম্প্রতি স্পেনের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির এই মর্ম্মে এক চুক্তি হইয়াছে যে, স্পেন জার্ম্মানীকে উল্‌ফ্রাম্ সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং তাহার বিনিময়ে সম্মিলিত পক্ষ স্পেনকে তাহার প্রয়োজনীয় তৈল সরবরাহ করিবেন; স্পেন গভর্ণমেন্ট ট্যাঞ্জিয়ার ও স্পেনীয় মরক্কো হইতে অক্ষশক্তির দূতাবাস তুলিয়া দিবেন এবং জার্ম্মান গুপ্তচরদিগকে বিতাড়িত করিবেন; যে সব ইতালীয় বাণিজ্য-পোত স্পেনীয় বন্দরে আছে, স্পেন গভর্ণমেন্ট তাহা সম্মিলিত পক্ষের হস্তে অর্পণ করিবেন; রণপোত সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য সালিস নিযুক্ত হইবে।

এই চুক্তিতে স্পেনের মনোভাব পরিবর্ত্তনের বিশেষ লক্ষণ নাই ; ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কূটনৈতিক বিজয় হইয়াছে—এই কথাও বলা চলে না। জার্ম্মানীর সহিত স্পেনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই ; ইতালীর রণপোতগুলিও সম্মিলিত পক্ষের হস্তে প্রদান করা হইবে না। অথচ, স্পেন তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় তৈল পাইবে। অথচ স্পেন জার্ম্মানীকে নানারূপ সমরোপকরণ প্রদান করিয়া সাহায্য করিতে বলিয়াই তাহাকে তৈল সরবরাহ পূর্ব্বে বন্ধ করা হইয়াছিল।

মিঃ চার্চ্চিল অকস্মাৎ ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনের প্রেমে গদগদ হইয়াছেন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, স্পেনের রাজনৈতিক ব্যাপার তাহার নিজস্ব বিষয় ; সে সম্পর্কে অন্যের হস্তক্ষেপ অনুচিত। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার নিশ্চয়ই সে দেশের জনসাধারণের নিজস্ব বিষয় ; (অবশ্য সব ক্ষেত্রে মিঃ চার্চ্চিল এই কথা স্বীকার করেন না)। কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ ফ্রাঙ্কোকে নির্ব্বাচন করে নাই ; ইতালীর সৈন্যের সাহায্যে, জার্ম্মানীর আনুকূল্যে এবং মিঃ চার্চ্চিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদের লজ্জাকর ষড়যন্ত্রের সুযোগে ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। এ হেন ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের গদিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা স্পেনীয় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়—উহার কণ্ঠরোধের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। ৩।৬।৪৪

দ্রষ্টব্য—এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর ইতালীতে সম্মিলিত পক্ষের সেনা রোম অধিকার করিয়াছে। বৃটেন হইতে উত্তর ফ্রান্সে সম্মিলিত পক্ষের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হয় ত রুশ বাহিনীর অভিযানও আরম্ভ হইবে। ইউরোপীয় সমরাঙ্গনের এই নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' বিস্তারিত আলোচনা করিব।

'সংসার দর্পণ'

শ্রীসুবোধকুমার রায়

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংসার দর্পণ' মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে দুই একটা কথা এই প্রবন্ধে উপস্থিত করবো। আজিকার সাহিত্য জগতে যুবক কেদারনাথের পরিচয় একরকম অজ্ঞাত বল্লেই চলে। কেন না—তাঁর যৌবনের সৃষ্টি, যৌবনের দান সমস্তই প্রায় লুপ্ত হ'তে বসেছে। ১৩০০ সালে লেখা 'রত্নাকর' নাটক, তাঁর সঙ্কলিত "গুপ্ত বা লুপ্ত রত্নোদ্ধার" পুস্তকও আজ লুপ্ত প্রায়।

"সংসার দর্পণ" মাসিক পত্রিকা হিসাবে খুব উচ্চ শ্রেণীর না হ'লেও কেদারনাথ বা তাঁর সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানিকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা চলে না। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়—১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এবং দু'বৎসর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'য়ে শেষ হয় ১২৯৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। প্রথম তিন সংখ্যায় সম্পাদকের নাম নেই, ৪র্থ সংখ্যা থেকেই কেদারনাথকে সম্পাদকরূপে দেখতে পাই। দর্পণের লেখক সংখ্যা অতি অল্প। কেদারবাবুর সমসাময়িক ও বন্ধু জনকয়েক স্থানীয় সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির লেখাই এই দর্পণের প্রধান অবলম্বন। আমি তাঁদের সেই সকল লেখা বা দর্পণের সমালোচনা করতে চাই না, কেন না সমালোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, তবে এই সুযোগে সেই সব জ্ঞানী গুণী ও সুধীগণের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অবান্তর হ'বে না।

যুবক কেদারনাথের সর্ব্বকর্ম্মে সহকর্ম্মী ও বন্ধু ছিলেন—দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাধারে কবি, বক্তা ও সুলেখক। এই পত্রিকায় সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী প্রবন্ধ আছে তাঁরই। কবিতাও আছে গুটি কয়েক। পত্রিকা পরিচালনায় তিনি ছিলেন কেদারনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। দ্বিতীয় বর্ষ, ১০ সংখ্যা প্রকাশিত হ'বার পর কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ কেদারবাবু চলে যান মীরাটে, কাজেই শেষ দুই সংখ্যায় যাবতীয় ভার বিপিনবাবুকেই গ্রহণ করতে হ'য়েছিল। বিপিনবাবুর চরিত্রগুলি নির্ম্মল, তেজস্বী ও নির্ভীক ; সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও ভারতীয় জীবনযাত্রার ধারায় নিষ্ঠা ছিল দৃঢ়। পশ্চিমা সভ্যতার প্লাবন এসে ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ সবকে ভেঙ্গে চুরমার করে নিয়ে যাচ্ছে তা তিনি সহ্য ক'রতে পারেন নি। প্রগতির নামে নিজেদের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতাকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় হস্তে লেখনি ধারণ করেছিলেন। মাত্র ৩০।৩১ বৎসর বয়সেই ইহধাম ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু এই দর্পণে রেখে গেছেন তাঁর অদম্য উৎসাহ, উদ্যম, কর্ম্মনিপুণতা ও নানা ভাব ভাবনার পরিচয়।

দক্ষিণেশ্বরের আর একজন সাহিত্যিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও "সন্ন্যাসীর অঙ্গন" নামে একটী অতি সুন্দর নক্সা আছে এই দর্পণে। তিনি ছিলেন অধ্যাপক। সমাজ সংস্কার ও সমাজে শিক্ষা বিস্তারই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু। পরিণত বয়সে স্বামীজীর সঙ্গে সহকর্ম্মী হিসাবে অনেক কাজই তিনি করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর দান—'কন্যাদায়' ও 'যোগা' নাটক।

এই গ্রামেরই বৈজ্ঞানিক হরিপদ ভট্টাচার্য্যের 'তাপ' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে দর্পণে। আর আছে "রামপদাবলী"র কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। কবি রামচন্দ্র সম্বন্ধে ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই সূত্রে একটা কথা বলে রাখি,—১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্ত-পদাবলী' পুস্তকে কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি॥
ইত্যাদি

গানটী রামলাল দাস দত্তের নামে ছাপা হ'য়ে গেছে। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভুল সংশোধন ও সাধারণের অবগতির জন্যে ১৩৫০ সাল, শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রামচন্দ্র ছিলেন স্বভাব কবি। সংসার দর্পণে প্রকাশিত তাঁর 'জীবন-স্রোত' কবিতাটী এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারলাম না।—

"বরিষার খর-স্রোতে সৌরভ ধুইয়া গেছে
যূথিকা অবাক হ'য়ে চেয়ে,
নিদাঘেতে শুষ্ক প্রাণ শিলাবক্ষে বেলাভূমি।
ম্লান মুখে রয়েছে পড়িয়ে।
নীরব সঙ্গীত যার নীরব ত্রিতন্ত্রী তার
স্বরগুলি ভাসিয়ে বেড়ায়,
সুখ সব ফুরায়েছে অতীতের কোলে শুয়ে
স্মৃতিগুলি করে হায় হায়।

শৈশব সরল হাসি ক্ষুদ্র শেফালিকা দল
ভূঁয়ে পড়ি কাঁদে লুটাইয়ে,
কৈশোরে কোমল হাসি প্রভাতের শেষ তারা
ভাস্করে গেল মিলাইয়ে।
অতৃপ্ত বাসনা বক্ষে যৌবন চমকি চায়
জরার ভীষণ বেশ হেরি,
আঁখি পালটিয়ে দেখে শৈশব অনেক দূরে
কাছে জরা মৃত্যু সহচরী।

প্রকৃতির কারাবাসে চিরবন্দী কৃতদাস
মহাকাল কঠোর শাসনে,
অদৃষ্ট শৃঙ্খলে বাঁধা করিতেছি আর্ত্তনাদ
বাসনার অঙ্কুশ তাড়নে।

তাপ দগ্ধ হৃদয়ের উত্তপ্ত বাসনাগুলি
মরুভূমি রেখেছে করিয়ে,
শোকভার নয়নের লবণাক্ত অশ্রুজল
জলনিধি দিয়েছে ভাসায়ে।

বিষাদ কালিমা ছায়া জগতের শিরে শিরে
হাহাকারে পূরিত ভুবন,
অগাধ জলধি শুধু বিষাদের অশ্রুজল
হতাশের নিশ্বাস পবন।"

(১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ)

দর্পণের এই ক্ষুদ্র লেখকগোষ্ঠির মধ্যে এক কেদারনাথ ছাড়া বর্ত্তমানে আর কেউই ইহজগতে নেই। যাঁদের সাথে নিয়ে এই পথে তাঁর যাত্রা সুরু হ'য়েছিল তাঁরা সকলেই বহুপূর্ব্বে ছেড়ে চলে গেছেন তাঁকে।*

'সংসার দর্পণে' 'সৎ মা' উপন্যাস, 'নন্দী শর্ম্মার নোট বুক', কবিতা ও নানা বিষয়ের লেখা প্রবন্ধগুলি থেকে কেদারনাথের নানা বিষয়ের জ্ঞান ও বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় পাই, আর বিশেষতঃ প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর একধারে সমাজকে গড়ে তোলবার, সমাজকে শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা, অন্যধারে কথা-সাহিত্য, রস রচনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত হাস্যরসপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা।

'সংসার দর্পণে' তাঁর কবিতা আছে ১৫টী যা এতাবৎ তাঁর কোন পুস্তকেই সন্নিবেশিত হয় নি। কাশীর কিঞ্চিৎ বা কেদারনাথের অন্যান্য যে সকল কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে বর্ত্তমান পাঠক-সমাজ পরিচিত এই কবিতা-গুলি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কোনটা বা ঐতিহাসিক বিষয় বস্তু উপলক্ষ করে, কোনটী বা প্রাকৃতিক বর্ণনা। দর্পণের কবি কেদারনাথ যেন সৃষ্টির বাসনায় চঞ্চল।

"আমি ত' পরাণ ভরে ভালবেসে যাই"

এ কবিতা প্রেম-ধর্ম্মী যৌবনের, প্রেমিক কবির যৌবনের গান। সেই সময়েই রবীন্দ্র কাব্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে লিখেছেন "পরমায়ু" আবার বৈষ্ণব কবিদের ঢং ও ভঙ্গী বজায় রেখে লিখেছেন "ব্রজবিরহিনী"। সেই সুন্দর কবিতাটী আপনাদের শুনিয়ে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করছি।

"প্রাণ বাঁচে না সখি পিয়া পরদেশ—
কেয়সে জীয়ব কহ তাই,
মলয় মারুতে সখি অঙ্গ অবশ
কহ কহ প্রিয়জন তুয়া সুধাই।

যব যমুনা কুলেতে ফিরে আঁখি হামারি
উথলে পরাণ মোর যমুনা তরঙ্গে,
প্রাণনাথ হিয়া অতি কঠিন তোমারি
কহ কাহে লহনাক দুঃখীনীরে সঙ্গে?

জীয়ত মরত মোর হৃদয় শ্মশান,
চয়ন কোরো না আর ফুল মোর লাগি,
জনত না হেরি সেই পিয়া প্রাণধন—
করি দেও চিতা,মোই পরাণ তেয়াগি।

কোয়েলার কুহুরব অঙ্গ বিঁধিছে,
সজনি লো হিয়া গেল জ্বলি,
পুঃন পুঃন ডাকে সখি পরাণ দহিছে,
নিবার তাহারে সবে মেলি।

যব মন লেহি যাহ পিয়া যাঁহা রহত,
কহ তাঁহে মিনতি হামারি,
তুয়া লাগি দুঃখী বিরহিনী হিয়া ফাটত,
কেয়সে রহত নিয়ারী।

শশী তু কহ মোই পিয়া কেয়সে গোঁয়াই,
মোর লাগি ভাবে কি কথন,
সার প্রাণেশে করি সব সাধ গেই,
বারেক দেখাও মোই প্রিয় শ্যামধন।

সহকারে মাধবী তুষেনা পিয়ারে,
মাধব বিহনে তার নাহি সুখ কখে,
জলদবরণ বিন দশ দিশ নিহারে,
পৃথিবী শ্মশান দেখে প্রাণ তার দিছে।

বিমরষ বৃন্দাবন ব্রজরাজ নাহি,
বাঁশরি, নীরব নীরব গোপবালা--
যমুনা উছলি বহে আঁখি জল পাই,
দেখিলে কদম্ব মূল বাড়ি ওঠে জ্বালা।

সমীরে সরিলে বন চকিতে তাকাই,
ভাবে বুঝি পীতধড়া ঐ দেখা যায়,
পাতি পাতি দেখে কোথা মাধব লুকাই,
নিশদিন গোঁয়াইয়ে মাধবে না পায়।

মরণ হয়েছে আজ নিঠুর সে কালা,
প্রাণ ছড়ি দেহ ধরি কোন সুখ বল,
মরণ রমন দুহুঁ হোলো জপমালা,
সমাধি করহুঁ চল যমুনাকি জল।

গাগরি টুটিবে কে ঘাঘরি লুকাই,
কোথা গেলে পাই দরশন,
অলিকুল চল মোরে পন্থ দেখাই,
জানত কোথা সে চরণ
কবি কহে সে পথ মরণ।"

---

* দর্পণে আরও দুই একজন লেখক আছেন যাঁদের পরিচয় আমার জানা নেই।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টিম ওয়ার্ক ঃ

খেলার মাঠ ফিরতি এক উৎসাহী দর্শক আনন্দের আতিশয্যে দিশেহারা হয়ে বাস-যাত্রীদের খবর পরিবেশন করছিল। খবরটা জার্মাণ বা জাপানীর আত্মসমর্পণ নয়, রুশ জার্মাণ যুদ্ধের সন্ধি কিম্বা ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবময় সাফল্য নয়—তবে লড়াইয়ের খবর বটে, খেলার মাঠের। মাঠে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে, যা নাকি অপর সকল খবরকেও ছাপিয়ে গেছে। লীগের নিম্নস্থান অধিকারী সে বছরের শীর্ষস্থান অধিকারীর অপরাজেয় গৌরব স্তম্ভ এক পদাঘাতে ধূলিসাৎ করে এক গোলে হারিয়ে দিয়েছে। খবরটায় তাক লাগে বৈকি। অপর এক ভদ্রলোক অনুযোগ করে আরম্ভ করলেন, সে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ, অদৃষ্টের পরিহাস আর কি! যুদ্ধটা Bad Luck Vs Good Luck, বিজিত দলের খেলোয়াড়রা খেলার সর্ব্বক্ষণ বিজয়ী দলের থেকে ভাল খেলেছে, গোল দেবার সুযোগও পেয়েছে চতুর্গুণ বেশী। ভাল খেলেও মন্দ ভাগ্যের জন্তে হেরে গেল।

সর্ব্বক্ষণ ভাল খেলে গোল দেবার বেশী সুযোগ পেয়েও হেরে যাওয়ার মধ্যে যদি ব্যক্তিগতভাবে কোন খেলোয়াড়ের খেলার ক্রটিবিচ্যুতি পরাজয়ের কারণ হিসাবে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে এ অক্ষমতা একজনের নয় সমস্ত দলের। ফুটবল খেলায় অন্ততম দর্শনীয় এবং উল্লেখযোগ্য এই টিম ওয়ার্ক।

কোন দলের খেলোয়াড়দের পরস্পর বোঝাপড়ার অভাব থাকলে তাদের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের কোন মূল্য থাকে না। এমন কি বিপক্ষের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল খেলোয়াড়দের সম্মেলিত শক্তি এবং টিম ওয়ার্কের কাছে তাদের পরাজয় আশ্চর্য্যের নয়। নিজ নিজ ব্যক্তিগত কৌশল দেখিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা দলের পক্ষে মারাত্মক। এর অর্থ নয় খেলোয়াড়দের খেলার বিশেষত্বকে (originality) উপেক্ষা করা। অপর খেলোয়াড়দের গোল দেবার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের প্রাধান্ত দেওয়াটাই বা দোষনীয় এবং এ দুর্ব্বলতা খেলায় প্রকাশ পেলেই বিপক্ষদল লাভবান হবে। খেলার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে খেলোয়াড় যত শীঘ্র খেলার অবস্থা উপলব্ধি ক'রে নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তৎপর হবে সে হবে নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। কোন নির্দ্দিষ্ট একটি পন্থা অবলম্বন ক'রে গতানুগতিক পন্থায় খেলার নির্দ্দেশ অনুসরণ করার মধ্যে খেলায় যেমন কোন বৈচিত্র্য নেই তেমনি সাফল্যের আশাও কম। বিপক্ষ অল্প সময়ের মধ্যেই আক্রমণ দলের অভ্যস্ত পন্থা আয়ত্বে এনে নিজেদের প্রাধান্ত বিস্তার করতে পারবে। খেলার দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নব নব পন্থা উদ্ভাবনে সমস্ত দলকে সেই পন্থায় সুপরিচালিত করার দক্ষতাই প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার পরিচয়। ভাল খেলোয়াড়দের উপর বিপক্ষের প্রখর দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই। সুতরাং খেলার ধারা পরিবর্ত্তনে তাদের বার বার বল না পাঠিয়ে দলের অপর unmarked খেলোয়াড়দের বলটি দিতে



ইংলণ্ড বনাম ইউরোপের অবশিষ্ট দলের
খেলার একটি দৃশ্য

হবে, তার পারদর্শিতার কোন বিচার না করে। ভাল খেললে তাকেই সুযোগ দিতে হবে বেশী। আহত খেলোয়াড়ের কাছে বল পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। বিপক্ষের দুর্ব্বল অঞ্চল অনুসন্ধান করে সেইদিকে আক্রমণ চালানই কার্য্যকরী। বিপক্ষদল প্রচণ্ড আক্রমণে এক গোলের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে খেলা 'ড্র' করতে দৃঢ়বদ্ধ হলে শেষ কয়েক মিনিটের সময়ে অগ্রগামী দলের ইনসাইড খেলোয়াড়রা পিছিয়ে আসবে দলের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করতে। ঐ সময়ে বিজয়ী দলের ফরওয়ার্ডরা 'W' চিহ্নিত

আকারে অবস্থান ক'রে খেলবে। খেলার জয়লাভের অদম্য উৎসাহ দোষণীয় নয় কিন্তু 'Over confidence' বহু ক্ষেত্রেই পরাজয় টেনে আনে। অভাবনীয়ভাবে কয়েক গোলে অগ্রগামী হয়ে কখনও খেলোয়াড়রা খেলায় শৈথিল্য দেখাবে না। এ নীতি খুবই ক্ষতিকর। মনে রাখতে হবে 'kick off'এর দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই একটি গোল করা যায়। বিজিত দল হতাশ না হয়ে পড়ে কোন সুযোগে দলকে সম্মেলিত করতে পারলে অগ্রগামী দলের পক্ষে পুনরায় আক্রমণে এবং শৈথিল্য বর্জনে তাদের গতিরোধ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এইভাবে তিন চারটি গোল পরিশোধ ক'রে বিজিত দলকেই শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ের সম্মান পেতে দেখা গেছে। ফুটবল খেলার ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল নয়। সুতরাং সুনিশ্চিত জয়ের জন্ত বিপক্ষকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করতে হবে এবং বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হবে।

কর্ণার কিক্‌ঃ

কর্ণার কিক থেকে আমরা গোলের খুব বেশী আশা করতে পারি; কারণ কর্ণার কিক থেকে বহু দর্শনীয় গোল দিতে দেখা গেছে। রক্ষণদল নিজের গোল লাইনের বাইরে বলটি পাঠালে আক্রমণ দল কর্ণার ফ্লাগ থেকে ফ্রি কিক পায়। এই ফ্রি কিক থেকে সোজাসুজি গোল দিতে পারা যায়। সুতরাং একজন নির্ভরশীল খেলোয়াড়ের উপর কর্ণার কিকের ভার দিতে হবে। যে কোন খেলোয়াড়ই কর্ণার কিক করতে পারে তবে সাধারণত উইং ফরওয়ার্ডদেরই কর্ণার কিক করতে দেখা গেছে। ব্যাক কিম্বা সেণ্টার হাফের উচিত নয় কর্ণার কিক করতে অগ্রসর হওয়া। কারণ বিপক্ষের রক্ষকভাগ একবার বলটি প্রতিরোধ করে তাদের আক্রমণভাগে পাঠাতে পারলে আক্রমণ দলের ব্যাক কিম্বা সেণ্টার হাফ দ্রুতগতিতে পিছিয়ে আসতে পারবে না, খেলার মোড় ঘুরে যাবে। পর পর দু'তিনটি কর্ণার কিক নির্ভুল ভাবে না মারতে পারলে অপর খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়া উচিত।

কর্ণার কিক কয়েক পদ্ধতিতে করতে দেখা গেছে। গোলরক্ষকের দক্ষতা বিচার ক'রে এবং বাতাসের গতি অনুযায়ী কর্ণার কিকের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

ডান পায়ের ইনস্টেপ (instep) দিয়ে কর্ণার কিক ক'রে বলটি চমৎকার ভাবে গোলের মুখে ফেলে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা যায়। এই শ্রেণীর কিকে বলটি গোল লাইনের ঠিক ভিতর দিয়ে খুব উঁচু দিয়ে যায়, ব্যাকও হেড করতে পারে না। গোলরক্ষকও বলের উচ্চতা দেখে বলের গতি ঠিক অনুমান করতে না পেরে ছেড়ে দেয়। বলটি কিন্তু হঠাৎ গতি পরিবর্ত্তন ক'রে বিপক্ষের দূরের গোলপোষ্টের দিকে আক্রমণ দলের ইনসাইড খেলোয়াড়ের মাথার নাগালের মধ্যে পড়ে। বলটির swing অবস্থায় হেড দিয়ে গোলে পাঠাতে ইনসাইড খেলোয়াড়ের বেশ সুবিধাই হয়। এই অবস্থায় গোলরক্ষক বলের গতি অনুধাবন করতে না পেরে পরাস্ত হয়। ইনস্টেপ দিয়ে কর্ণার কিক করার প্রধান অসুবিধা যে, বলটি টাচলাইনের বাইর দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তা ছাড়া সুদক্ষ গোলরক্ষক এই শ্রেণীর বলের গতি অনুসরণ করে তৎপরতার সঙ্গেই বলটি 'পাঞ্চ' করে বিপদ গণ্ডীর বাইরে পাঠায়।

বাঁ পায়ের ইনস্টেপ (instep) দিয়ে নির্ভুল কর্ণার কিক সব সময়েই বিশেষ কার্য্যকরী হয়। গোল লাইনের বাইর থেকে নিজের গোলের দিকে মুখ করে খেলোয়াড় দৌড়ান আরম্ভ করবে এবং বৃত্তাকারে (circular) বাঁ পা চালিয়ে কিক করবে। কিক করার সময়ে বাঁ পাটি কর্ণার ফ্লাগের মধ্যস্থ গোললাইন অতিক্রম করে যাবে। এই শ্রেণীর কিক করতে যথেষ্ট স্থান থাকবে কিন্তু অনেক খেলোয়াড়ই ফ্লাগের উপর প্রচণ্ড কিক মেরে বসতে পারে এই আশঙ্কায় নির্ভুল ভাবে বলটি কিক করতে পারে না। মন থেকে এই আতঙ্ক মুছে ফেলতে হলে খেলোয়াড়রা নিয়মিত ভাবে কর্ণার 'কিক' অভ্যাস করবে। বলের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে ফ্লাগের কথা ভুলে গিয়ে। কর্ণার কিক করতে গিয়ে খেলোয়াড়রা অনেক সময় বলটি গোল লাইনের বাইরে পাঠিয়ে ভুল করে বসে।

বাঁ পায়ের ইনস্টেপ দিয়ে কর্ণার কিক মারলে কিন্তু বলটি কখনও গোললাইনের বাইরে গিয়ে বিপক্ষের সুবিধা ক'রে দিবে না। বলটি প্রথমে বক্রাকারে নিকটবর্ত্তী গোল পোষ্ট থেকে অনেকটা বাইর দিয়ে যাবে, গোলরক্ষক এই অবস্থায় বলটি পাঞ্চ করতে পারবে না। তারপর বলটি গোলের ভিতরের দিকে বেঁকে যাবে আক্রমণ দলের ইনসাইডের মাথা বরাবর বিপরীত গোলপোষ্টের দিকে। জোর বাতাসে এই শ্রেণীর কর্ণার কিক বিপক্ষের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। বাতাস এবং বলের ঘূর্ণন (spin) বলটিকে বারের তলা দিয়ে গোলে প্রবেশ করায়, গোলরক্ষক বলের এই গতি পরিবর্ত্তন অনুমান করতে পারে না। এই শ্রেণীর কর্ণার কিকের একটা সুবিধা যে, জোর বাতাসেও গোলের মুখে দলের ইনসাইডের নাগালের মধ্যে বলটি আয়ত্তে এনে ফেলা যায়। বাতাসে ডান পায়ের ইনস্টেপ দিয়ে কর্ণার কিক বিশেষ কাজের নয়। বাতাসের বিরুদ্ধে বলটি সতর্কতার সঙ্গে কিক করেও দেখা যাবে বলটি কেন্দ্রস্থলে পৌঁছবার পূর্ব্বে গোললাইনের অনেক পিছন দিয়ে গেছে।

ডান পায়ের 'টো' দিয়ে কর্ণার কিক :

শান্ত আবহাওয়ায় এই শ্রেণীর কিক কার্য্যকরী। বাতাসে এইভাবে কিক ক'রে বলটি নির্ভুলভাবে লক্ষ্য স্থানে পাঠান যায় না। তা ছাড়া বলটি খুব উপরে যাওয়ায় ফলে বিপক্ষের ব্যাক এবং গোলরক্ষক যেমন position নেবার সময় পাবে তেমনি এদিকে আক্রমণদলের ইনসাইড খেলোয়াড়ের পক্ষে বলটি হেড দিয়ে গোলকরা অসুবিধা হবে। ইনস্টেপ কিকের মতই গোলের থেকে বলটিকে বাইরে পা দিয়ে swing করা যায়। এই ভাবে বাঁ পায়ের ঘূর্ণনে (swing of the left foot) বলটি কিক ক'রে গোলের মুখে বক্রাকারে আনা সম্ভব। জোর বাতাসে এই দুই শ্রেণীর কিকই বিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত ক'রে।

কর্ণার সটের সময় আক্রমণ দলের যে কোন লম্বা খেলোয়াড়রা হেড করবার জন্তে বিপক্ষের গোলের মুখে যাবে এবং সটের পর প্রথম সুযোগেই নিজের স্থানে ফিরে আসবে।

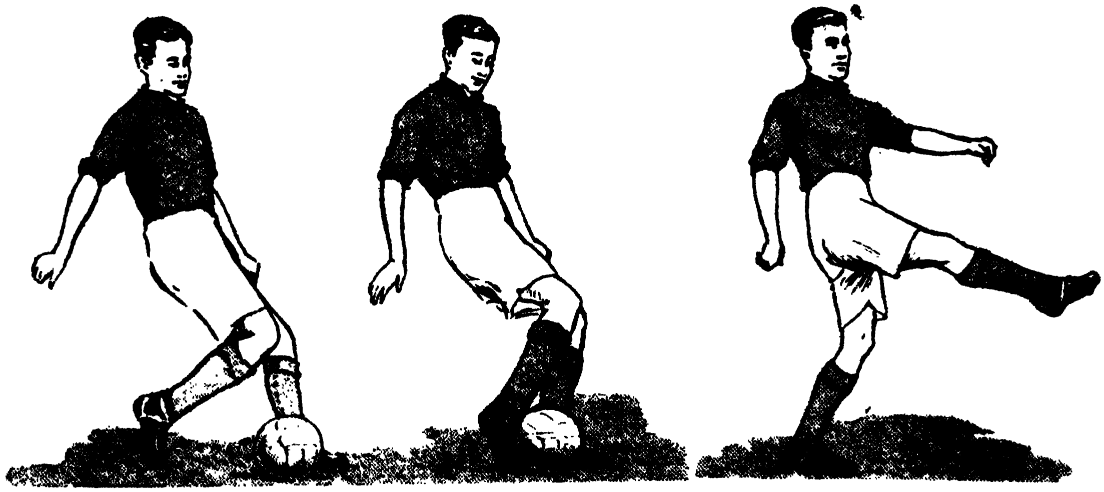
বল কিকিং ঃ

ফুটবল খেলায় মূলসূত্রগুলির সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রধানতঃ পা দিয়েই বলটি কিক ক'রে খেলা হয়। নামও সেই কারণে ফুটবল। সুতরাং বলটি কি ভাবে কিক করতে হবে তার প্রসঙ্গ আরম্ভ করি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় বল কিক করা তো সহজ, সজোরে পা চালিয়ে বলের উপর প্রচণ্ড এক লাথি মারলেই হ'ল। এর জন্ত অনুশীলন বা ফুটবল শিক্ষকের নির্দেশ নেবার প্রয়োজন কি। বলের উপর ঠিক একই ভাবে পা চালালে চলবে না; যে সব কিক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয় সেগুলি অভ্যাস এবং নির্দেশ ব্যতিরেকে আয়ত্বে আনা যায় না।

স্থির এবং সচল বলে কিক করা একরকম নয়, ভিন্নরূপ। একজন আনাড়ি খেলোয়াড় বল থেকে প্রায় একগজ দূরে থেকেই পা চালিয়ে বলটি কিক করতে সুবিধা মনে করে। এই পদ্ধতি কিন্তু ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলায় সম্পূর্ণ অচল, হকি কিম্বা গল্‌ফে অসঙ্গত নয়। পা চালিয়ে বল কিক করার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করে ফুটবলের উপর বিজ্ঞানসম্মত কিক করতে হবে। এখানে ক্রিকেট খেলায় অফ্-ড্রাইভের কথা উল্লেখ করা যায়। অফ্ ড্রাইভে বল এবং ব্যাটের মিলন স্থলের যতদূর সম্ভব সন্নিকটে রাইটহ্যাণ্ড খেলোয়াড় তার বাঁ পাটি স্থাপন করবে। খেলোয়াড়ের পা বলের নিকটবর্ত্তী না হলে 'ষ্ট্রোক' জোর হবে না। অনুরূপ ব্যাপার ফুটবল খেলাতেও হবে।

বল কিক করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, বাঁ পাটি যতদূর সম্ভব বলের পাশে রেখে সম্মুখভাগে পায়ের উপর জোর দিতে হবে এই সঙ্গে বলের দিকে বাঁ কাঁধটিও ফিরিয়ে দিবে। বলটির উপর চোখ দুটী নিবদ্ধ রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলে খেলোয়াড়ের মাথা বলের উপরিভাগেই থাকবে। এই সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড় ডান পাটি পিছনে নিয়ে যাবে, হাঁটু বেঁকিয়ে ডান পাখানি পিছনে কিছুটা বাইরে যাবে, 'টো' ঘুরে যাবে, ইনষ্টেপ সরল রেখায় অবস্থান করবে। পায়ের এই ভঙ্গিমায় পা দুখানি পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ অবস্থায় থাকবে। হাত এবং বাহু আলগা রেখে সুবিধাজনক অবস্থায় তাদের স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে হবে। এইবার বাঁ পায়ের হাঁটুর জোরে বলের উপর কিক করতে হবে। ইনষ্টেপ এবং 'টো' সর্ব্বদাই সোজা রাখতে হবে নিচের দিকে, ইনষ্টেপই সর্ব্বপ্রথম বলটি খেলবে, 'টো' নয়। বলের উপর চোখ নিবদ্ধ থাকবে, বিশেষতঃ কিক করার মুহূর্ত্তে। বলের উপর জোর কিক করতে গিয়ে পায়ের গতি কখনও সংযত করবে না, অর্থাৎ বলের গতি পথের দিকে পাখানি যতদূর সম্ভব লম্বা হয়ে যাবে। বলটি কিক করার পর এক মিনিটের জন্ত ডান পায়ের ভঙ্গি হবে একেবারে সোজা, বলের গতি পথের দিকে মুখ ক'রে থাকবে পায়ের টো। সমস্ত পা, টো এবং ইনষ্টেপ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করবে। ডান পায়ের এই ভঙ্গি মুহূর্ত্তের জন্ত। খেলোয়াড় কখনও পায়ের 'টো' উপর দিকে রাখবে না। তারপর শরীরের ভার ঐ পায়ের উপর পড়বে সামনের দিকে, ডান পাখানি মাটিতে পৌঁছে যাবে।

প্রথম চিত্রে স্থির বল কিক করার নির্ভুল পদ্ধতি দেখান হয়েছে। প্রথম চিত্রে দেখতে পাব খেলোয়াড়ের ডান পায়ের সঞ্চালন ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। ডান পায়ের ঋজু ইনষ্টেপ এবং বলের পাশে বাঁপায়ের চমৎকার অবস্থান দেখতে পাব। তা ছাড়া আরও কতকগুলি লক্ষ্য করবার আছে যেমন, বাহুর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, সম্মুখভাগে বাঁ কাঁধের অবস্থান, এবং বলের উপর নিবদ্ধমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।



ড্রাইভ : স্থির বল মারবার তিনটি অবস্থা :—বাম ও ডান পা, কাঁধ, বাহু এবং চোখের অবস্থান লক্ষণীয় ছবি—সুশীল ব্যানার্জি

দ্বিতীয় চিত্রে বল এবং পায়ের সংঘর্ষ দেখান হয়েছে। এখানে ডান পায়ের হাঁটুর উপর বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাঁটু ঠিক বলের উপরই অবস্থান করছে, এবং ডান পায়ের ইনষ্টেপ ও 'টো' সিনবোনের সঙ্গে এক সরল রেখায় আছে। এই থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে বলটি মাটি ছুঁয়েই যাবে, উঁচুপথে যাবে না। বলটি কিক ক'রে যতদূর সম্ভব তাকে পা দিয়ে অনুসরণ করেছে। দেহের সমস্ত শক্তি এখন সম্মুখভাগে প্রয়োগ করা হয়েছে।

তৃতীয় চিত্রে 'Eollow through' দেখান হয়েছে। বলটি কিক করার সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের এই যে ভঙ্গি, Follow through' নামে বর্ণিত হয়েছে। ডান পাখানি পূর্ণতম বিস্তৃতি

নিয়ে সরল রেখায় অবস্থান করছে, পায়ের 'টো' বলের প্রতি লক্ষীকৃত, খেলোয়াড়ের দৃষ্টি পায়ের টোয়ের উপর এখনও নিবদ্ধ। দেহের ব্যালেন্সের এবং প্রচণ্ড কিকের জন্ম ডানবাহু পিছনে গেছে, বাম বাহু সামনে এগিয়ে এসেছে। এই ভঙ্গি এক নিমেষের জন্ম, পরমুহূর্তেই খেলোয়াড়ের ডান পাখানি মাটিতে পৌঁছে যাবে।

স্থির বল ডান পায়ে কিক করতে গিয়ে (১) সমস্ত সময় বলের উপর চোখ রাখতে হবে (২) বাঁ পাখানি যতদূর সম্ভব বলের পাশে রাখতে হবে (৩) ডান পাখানি পিছনে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে (৪) বলের উপর প্রচণ্ড কিক মারতে হবে। (৫) ডান পাটি পূর্ণতম বিস্তৃতিতে সরল রেখায় মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বলের গতিপথের দিকে অগ্রসর হবে।

দু'পায়ে বল কিক করার অভ্যাস না থাকলে খেলায় প্রাধান্য লাভ করা সম্ভব নয়; কেবলমাত্র এক পায়ে বল কিক করার অভ্যাসের ফলে প্রত্যেকের কি রকম অসুবিধা হবে উল্লেখ করছি। ব্যাকের এই দুর্ব্বলতায় ফরওয়ার্ড খেলোয়াড় প্রচণ্ড বেগে একপাশ দিয়ে বল নিয়ে 'shotting range'এর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারবে। এই অবস্থায় সেণ্টার হাফ কেবলমাত্র একদিকের উইংয়েই বল পাশ দিতে বাধ্য হলে বিপক্ষের রক্ষণভাগ আক্রমণ ব্যর্থ করতে সুবিধা পাবে। রাইট হাফ বাঁ পায়ে বল কিক করতে অক্ষম হ'লে প্রধানত দলের রাইট ইনসাইড এবং সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে বলটি পাশ করবে। নিজের দিকের রাইট আউটকে বাঁ পায়ে প্রয়োজনীয় দ্রুত পাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না যদি সে কেবলমাত্র ডান পায়েই বলটি কিক করতে অভ্যাস করে। এর ফলে রাইট আউট যথাযথ সময়ে বল না পেয়ে আক্রমণ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না।

গোলরক্ষক কেবল উইংয়ের একদিকেই বলটি Pant ক'রে কিক করলে এ দুর্ব্বলতার সুযোগে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা যথাসময়েই গোলরক্ষকের অভ্যস্ত লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে বলটির সম্মুখীন হবে।

মাঠের মধ্যিখান থেকে দলের যে কোন খেলোয়াড়কে যে কোন পায়ে বল কিক করে পাঠাবার দক্ষতা সেণ্টার ফরওয়ার্ডের অবশ্য থাকা উচিত। ইনসাইড এবং সেণ্টার ফরওয়ার্ডদের উপরই গোলে বল লক্ষ্য করার দায়িত্ব বেশী। কিন্তু এরা এক পায়েই বল কিক করা অভ্যাস ক'রে গোলের দিকে অগ্রসর হলে গোলরক্ষক তাদের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করে যথাসময়েই গোলে position নিয়ে দাঁড়াতে পারবে এবং ফরওয়ার্ড সোজা বলটি কিক করলে তা প্রতিরোধ করা তার পক্ষে শক্ত হবে না। কারণ বহু পূর্ব্বেই গোলরক্ষক ফরওয়ার্ডের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। যে কোন অবস্থায় পিছন থেকে বলের পাশ সংগ্রহ করা, বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা এবং কর্ণার কিক করার সাফল্য নির্ভর করছে দু'পায়ে বল কিকের অভ্যাসের উপর। সাধারণত একজন খেলোয়াড় দু'পায়ে সমানভাবে কিক করতে পারে না। দু'পায়ের যে কোন একটি অপরটির তুলনায় দুর্ব্বল থাকে। কিন্তু তাই বলে দুর্ব্বল পাটিকে বিশ্রাম দিয়ে সবল পাখানি দিয়ে খেললে চলবে না, দু'পায়েই সমানভাবে বল কিক করার অভ্যাস করতে হবে। অনুশীলনের ফলে দুটী পায়ই সমান শক্তিশালী হতে পারে। একটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হ'লেও ক্ষতি নেই।

বল কিক করতে গিয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে নীচু কিক বেশী কার্য্যকরী উঁচু কিকের থেকে। খেলোয়াড়রা দর্শকদের উৎসাহে কখনও উঁচুতে বল পাঠাবে না। অবিশ্যি সঙ্কটকালে বিপক্ষের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের অতিক্রম করতে গিয়ে ব্যাক বলটিতে জোর কিক মেরে উঁচুতে পাঠাতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে দিয়ে মাটি ঘেঁষে বলটি পাঠাবার সুবিধা এবং সময় থাকলে কখনও মাথার উপর বল পাঠানো উচিত না।

অনেক সময় বিপক্ষের নিকট উপস্থিতির জন্ম বলটি 'ভলি' মেরে কিম্বা ট্র্যাপ করে আয়ত্বে আনার আর সময় থাকে না। এই অবস্থায় কাঁধ উঁচু বলগুলি মাথা দিয়ে খেলা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে খুব তাড়াতাড়ি খেলা যায় না। তবে মাথা দিয়ে বল খেলা পা দিয়ে বল খেলার মত নির্ভুল বা জোর হয় না। সুতরাং যেখানে ভলি বা ট্র্যাপ করার সময় এবং সুযোগ থাকবে সেখানে মাথা এগিয়ে দেওয়ার কোন লাভ নেই বরং ক্ষতি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (১ম পর্ব্ব)--১৷৷০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাহু"—১৷৷০
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "দাবী"—২৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "সূর্য্য নগরীর গুপ্তধন"—১৷০
সব্যসাচী প্রণীত শিশু-উপন্যাস "মৃত্যু-দূত"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহন ও ছুই"--২৲,
"বন্ধুমোহন"—২৲
শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বিপ্লব"—১৸০
বনফুল প্রণীত উপন্যাস "জঙ্গম" (২য় ও ৩য় অধ্যায়)—৩৲
শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণীত নাটিকা "মীরপুরের মেলা"—৷০
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন প্রণীত "বাংলা সাহিত্যের খসড়া"—২৲
প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কিশোর উপন্যাস "সিন্দুর বন্ধন"—৷৶০
শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" ১৩৫১—১৷৷০
শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত "গ্রহে উপগ্রহে"—৷০
শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী অনুদিত "মানুষ কি করে বড় হল"—১৷৷০
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "চলচ্চিত্র"—২৲
শ্রীহুবিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত লিখিত "যুদ্ধ যখন থামবে"--১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মৃত্যু : ১৬ই জুন ১৯৬৪



শ্রাবণ—১৩৫১

প্রথম খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ্ ডি

(১)

বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার নূতন নাটক লিখিয়াই ইহা সর্ব্বজনবোধ্য হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্ম তাঁহার নিরক্ষরা দাসীকে পড়িয়া শোনাইতেন। দাসীর বোধশক্তির মাপকাঠিতে ইহা উত্তীর্ণ হইলে তবে তিনি ইহার সাফল্য সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। এই পাঠকালে নাটকের পাত্রপাত্রীদের ব্যবহৃত ভাষার সহিত নিজের কথাবার্ত্তার ভাষার ঐক্য অনুভব করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে ঐ ভাষাকেই সাহিত্যিক অভিধানে গদ্য বলা হয়। তখন সে চমৎকৃত হইয়া আবিষ্কার করিল যে সে অজ্ঞাতসারে চিরজীবনই গদ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

এই সত্য গল্পটীর মধ্যেই সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব-রহস্যটী নিহিত আছে। অতি প্রাচীনকালের সাহিত্যে পদ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের একটা মুখ্য কারণ—সাধারণ কথোপকথনের চিরপরিচিত ভাষার যে সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে এই সত্যের কুণ্ঠিত ও বিলম্বিত উপলব্ধি। আখ্যায়িকা, তথ্যবিবৃতি, বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় অধুনা বিশেষ ভাবে গদ্যের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির উপরেও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রায় অষ্টাদশশতক পর্য্যন্ত পদ্যেরই একাধিপত্য ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে ভ্রমণকাহিনী, রন্ধনদ্রব্যের তালিকা, সাধারণ বাদ-বিতণ্ডা ও কথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত পদ্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৈষ্ণব চরিত-কাব্যগুলিতে ও চৈতন্যদেবের জীবনের বহিরঙ্গ ঘটনাসমূহ এমন কি বৈষ্ণবদর্শনের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার ও আলোচনা পদ্যের এই অতি-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে কবিত্বশক্তির প্রাচুর্য্য তাহা নহে, গদ্যের সাহিত্যিক সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস। যে ভাষায় আমরা প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি প্রকাশ করি, বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি, প্রতিবেশীর সহিত কুশলপ্রশ্ন আদান-প্রদান করি, বাজারে জিনিস কিনিতে দর-দস্তর করি, সময় সময় ঝগড়া-বিবাদের মুহূর্ত্তে যাহার ইতর-জনোচিত অপব্যবহার করি, যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার তুচ্ছতার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসপত্রের ন্যায় যাহা কলঙ্কস্পৃষ্ট ও ধূলিমলিন, তাহাকে যে আবার মাজিয়া ঘষিয়া সাহিত্যিক দেবপূজার কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, তাহার ভিতর দিয়া যে উচ্চাঙ্গের প্রকাশক্ষমতা ও সাহিত্যের অম্লান দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা বহুদিন পর্য্যন্ত লেখকের মনে উদয় হয় নাই। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গদ্যের ভাষা ও ছন্দ মৌখিক কথাবার্ত্তায় সীমাবদ্ধ ছিল, মানুষের মুখ হইতে সরস্বতীর বীণার তারে সঞ্চারিত হয় নাই;

চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা ও হাটবাজার হইতে সাহিত্যের আসরে উন্নীত হয় নাই। আজকাল পত্তের রাজ্যে গত্তের অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। এ অভিযোগ সত্য হইলেও গত্তের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সুদীর্ঘ নির্ব্বাসনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। পত্ত জ্যেষ্ঠাধিকারের সুবিধা লইয়া গত্তের যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, বয়ঃপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জ্যেষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান চালাইয়াছে। প্রকৃতির-প্রতিশোধের মত সাহিত্যেরও একটা প্রতিশোধ আছে।

বঙ্গ সাহিত্যে গত্তের বিলম্বিত আবির্ভাব অতিশয় দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল প্রথানুগত্যের ফল। প্রকাশরীতির নূতনত্ব নির্ভর করে বিষয় ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্যের উপর। প্রাক্-ইংরেজ যুগের সাহিত্যে এই উভয়েরই একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। যেখানে দেব-মাহাত্ম্য-প্রচার ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপন লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনও এই উদ্দেশ্যের দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে প্রচলিত পত্তরীতির উল্লঙ্ঘনের কোন প্রেরণা অনুভূত হয় না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে যে প্রবল ভাববন্যা বাঙ্গালীর জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল তাহাতে কাব্যপয়ারের শান্ত, নিয়মিত বন্ধন উপচাইয়া পদাবলীর বিচিত্র ছন্দে ও অননুভূত-পূর্ব্ব আবেগ-গভীরতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং ইহার প্রভাব গত্তাভিমুখী না হইয়া বরং উহার বিপরীতগামী হইয়াছিল। এই ভাবোন্মাদের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বস্তু-নিষ্ঠাও বৈষ্ণব-লেখক-গোষ্ঠীর চিত্ত অধিকার করিয়া তাহাদিগকে তথ্য-বিবৃতি ও জীবনচরিত রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। এই মনোবৃত্তির ফলে গত্তের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবানুরক্তির সহিত তুলনায় ভক্তি-বিহ্বলতা প্রবলতর হওয়ায়, এই রচনাগুলি মুখ্যতঃ কাব্যধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং প্রকাশরীতি ও পয়ারের মোহ কাটাইয়া বস্তুতন্ত্রতার প্রতীক্ গত্তে পৌঁছাইতে পারে নাই।

(২)

বাংলা কাব্যে এই পয়ার-প্রাধান্য গত্তরীতির উদ্ভবকে আধুনিক-কাল পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখার আর একটা কারণ। সনাতনপ্রথার অনুবর্ত্তনকারীদের পক্ষে পয়ারের উচ্ছ্বাসহীন নিস্তরঙ্গপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়ার মত আরামদায়ক আর কিছু ছিল না। বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে ইহা এমন একটা সহজ মসৃণতা লাভ করিয়াছিল, লেখকের বক্তব্য ও মনোভাবের সহিত ইহার এমন একটা চেষ্টাহীন সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সমস্ত কাব্যপ্রচেষ্টা অতীতের এই কারুকার্য্যহীন সাধারণ ছাঁচে, যেন একটা অনিবার্য্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চাহিত। পয়ারের মধ্যে পত্তরীতির ছদ্মবেশে গত্তরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই খাঁটি গত্তের প্রয়োজনীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বাস্তবিক, এই অতি প্রচলিত ছন্দে গত্ত-পত্তের এক সাম্যভাবমূলক মিলন দেখা যায়। পয়ারের প্রত্যেকটী চরণ যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ,সরল ভাবের unit; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাতে গত্তের অন্বয়ের পর্য্যন্ত নিখুঁত অনুবর্ত্তন বজায় আছে। আখ্যায়িকা বিবৃতি, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, বাদ-প্রতিবাদ ও কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের যে সমস্ত অঙ্গে বিশুদ্ধ কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ড খুব উচ্চ না হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহার উপযোগিতা অসাধারণ। ইহার বিস্তার পাঠক অপেক্ষা নিরক্ষর শ্রোতার সীমাবদ্ধ ধারণা ও স্মৃতিশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নিয়ন্ত্রিত—ইহা যেন শিশু কাব্যরসিকের তৃপ্তির জন্ত ক্ষুদ্র ঝিনুকে রস-পরিবেশন। ইহার ছোট ছোট বাক্যাংশে গ্রথিত, সহজবোধ্য ভাবাবিন্যাসের মধ্যে ধ্বনি-প্রবাহের বাহুল্য নাই; অনেকগুলি পয়ার একসঙ্গে পড়িলে তাহাদের সমতাল-বিন্যস্ত মৃদু পদক্ষেপের অন্তরালে অতি ক্ষীণ অলঙ্কারশিঞ্জিতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কণ্ঠসংযোজিত কৃত্রিম সুরের দ্বারাই যেন তাহাদের সূক্ষ্ম অন্তঃসঙ্গীতের অভাব পূরণ করিতে হয়। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কবির হাতে পড়িলে এই ছন্দের উচ্চাঙ্গের কবিত্বের বা শিল্পকার্য্যের বাহন হইতে কোন বাধা নাই। কৃত্তিবাসের "সীতাহরণে রামের বিলাপ" পরিচ্ছেদে এক একটী পয়ার যেন মর্ম্মভেদী বেদনার দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছেদকাতর স্বামীর নয়ন কোণে সঞ্চিত পতনশীল এক একটী অশ্রুবিন্দুর অনবদ্য কাব্যরূপ। শিল্পকুশল 'ভারত চন্দ্রের হাতে এই স্থূল, আটপৌরে ছন্দ যেন সুনিপুণ মণিকার কর্ত্তৃক পালিশ করা হীরক হারের চোখ-ঝলসান দীপ্তি বিকীরণ করিয়াছে। তথাপি ইহাও সত্য যে এই গত্তোপম ছন্দ অনেক অক্ষম কবিকে প্রলুব্ধ করিয়াছে; অনেক ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি-যশঃপ্রার্থী কবিতার পুষ্পকরথে এই মন্দগতি, শ্রমক্লান্ত অশ্বযুগল জুড়িয়া কাব্যলোকের অমরত্বায় উন্নীত হইতে বৃথায় গলদঘর্ম্ম হইয়াছে। এমন কি বৈষ্ণব চরিতকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত ছন্দপাত ভয়ে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিয়া এই শিথিল-বিন্যস্ত ছন্দের স্থিতিস্থাপকতার অপব্যবহার করিয়াছেন —ইহার মধ্যে রসনারুচিকর ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা, মহাপ্রভু-চরণরেণুপূত, শ্রুতিকর্কশ দাক্ষিণাত্য জনপদের নাম ও কর্ণপীড়াকর দার্শনিক পরিভাষা প্রবেশ করাইবার আগ্রহাতিশয্যে ইহাতে বাড়তি অক্ষর সংযোজনা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের বহিরাঙ্গিক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে পয়ার ছন্দের সরল লৌহদণ্ড অবলম্বন করিয়া কাব্যজগতের অনেক ত্রিশঙ্কু কবিতার স্বর্গ ও গত্তের মর্ত্ত্য এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে লম্বমান ছিলেন—এই অবলম্বনটুকু না থাকিলে তাঁহারা বহুপূর্ব্বেই সরাসরি গত্তের নিম্নলোকে অবতরণ করিতে বাধ্য হইতেন।

কিন্তু সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত হইলেও এই শতাব্দীগুলি ধরিয়া গত্ত একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। পত্তের সঙ্গে গত্তের একটা প্রভেদ এই যে গত্তকে পত্তের ন্যায় সৃষ্টিপ্রেরণার অপেক্ষা করিতে হয় না; নিতান্ত বাস্তব প্রয়োজনেই ইহার অনুশীলন অপরিহার্য্য। সংবাদের আদান-প্রদান, দলিল দস্তাবেজ সম্পাদন, বৈষয়িক আদেশ জ্ঞাপন ইত্যাদি জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত উপলক্ষে, সাহিত্য রচনার বিন্দুমাত্র প্রেরণা বা গভীর আবেগ অনুভব না করিয়াও গত্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রয়োজনমূলক গত্ত-ব্যবহার সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও, তাহার অপ্রভূত। ভাষা প্রয়োজনের পথ ধরিয়া যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, যতটা প্রকাশশক্তি আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া ইহার যাত্রাপথের পাথেয় হয়। সাহিত্য-সৌধের ভিত্তির যে অংশ মাটীর নীচে প্রোথিত থাকে, তাহা এই স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োগের উপযোগী রচনারীতি। গত্তভাষা যে

মুহূর্ত্তে কণ্ঠ ও জিহ্বা হইতে লিপিবদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা অজ্ঞাতসারে, যত সামান্য ভাবেই হউক না কেন, সাহিত্যিক শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীনতা স্বীকার করে। কথিত বাণীর অনর্গল অজস্রতা লেখনীমুখে, কতকটা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করা আকার-সংক্ষেপের মধ্যে আত্মসঙ্কোচন করিতে বাধ্য হয়। অভিপ্রায়ের সুষ্ঠু প্রকাশের তাগিদ ও বোধগম্যতার দাবী ইহার অপরিমিত স্ফীতিকে ঝরাইয়া ফেলিয়া ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও গতিশীলতা বাড়াইবার চেষ্টা করে। তারপর একদিন ইহা প্রয়োজনের গণ্ডী ছাড়াইয়া মননশীলতা ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির রাজ্যে পদক্ষেপ করে ও উহার আঁট-সাঁট, কর্ম্মপটু, অনুশীলন-দৃঢ় শরীরটার চারিদিকে ধীরে ধীরে যৌবনের লাবণ্য-রেখা ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

(৩)

ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে গদ্য সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস-সঙ্কলনে আমরা এই ব্যবহারিক গদ্যকে কার্য্যতঃ অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। ইহার প্রথম কারণ যে এতাবৎকাল এতৎসম্বন্ধীয় উপকরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই; দ্বিতীয় কারণ এবম্বিধ রচনায় সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অভাব! এইজন্যই আমরা গদ্য সাহিত্যের উৎসমুখ হিসাবে (১) শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, (২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী ও (৩) রাজা রামমোহন রায়কে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এক হিসাবে এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ সঙ্গত, কেননা ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম স্থূল-প্রয়োজন-নিরপেক্ষ হইয়া গদ্যরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য হিসাবে জ্ঞান-বিতরণ, ভাষা-শিক্ষণ ও ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্ক পরিচালন বিষয়কর্ম্ম-নির্ব্বাহ অপেক্ষা উচ্চতর ও সাহিত্যের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু ইহাদিগকেই গদ্য-রীতি প্রবর্ত্তনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আরোপ করিলে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার একটা ফাঁক থাকিয়া যায়। ইঁহারা বাক্য-বিন্যাসরীতি ও শব্দ নির্ব্বাচনের কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ নিজ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে। কেননা ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ইঁহারা কখনই শূন্য বায়ুমণ্ডলের উপর ইঁহাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। প্রচলিত ব্যবহারিক গদ্য রীতিই ইহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল—যে অস্ত্র তাঁহাদের হাতের কাছে তৈয়ারী ছিল তাহা লইয়াই তাঁহারা সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তি খননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কাঠামোকেই তাঁহাদের নিজ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক দাবী অনুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও আরবী-পারসী গদ্যের প্রভাবে উৎপন্ন ও উভয় জাতীয় ভাষা হইতে আহৃত শব্দ সমষ্টির সমাবেশে গ্রথিত বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত রচনাই তাঁহাদের পথিপ্রদর্শক ও গতি-নিয়ামক হইয়াছিল।

সৌভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় রচনা এখন বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' একজন লেখক দুইটী শাস্ত্রীয় পাঁতি বা অনুশাসনের নমুনা প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমার কর্ত্তৃক তৎপুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত একখানা গার্হস্থ্য প্রয়োজনমূলক পত্র নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে গ্রন্থ এই সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দিল্লীর সরকারী দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন'। এই সুসম্পাদিত, উপাদেয় গ্রন্থে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলের প্রধানতঃ রাজনৈতিক আবেদন-নিবেদন-মূলক ১৬৯টী পত্র সবিস্তারে উদ্ধৃত ও নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পত্রগুলি সাহিত্যিক গদ্য রচনা আরম্ভ হইবার প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী—কাজেই ইহারা, সাহিত্য-প্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল এই অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে মূল্যবান সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য ইহা হয়ত সত্য যে আদালত বা রাজসভার ভাষা ঠিক সাংসারিক জীবনে ব্যবহার্য্য সহজ ভাষার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নহে—তাহা কতকাংশে কৃত্রিম। রাজপ্রতিনিধিকে সম্মান জানাইবার উপযুক্ত বাঁধা গৎ ও মুসলমান আমল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত আরবী-পারসী-শব্দ-বাহুল্য এই ভাষাকে কিয়ৎপরিমাণে আড়ষ্ট, বিকৃত ও ভারাক্রান্ত করিয়াছে। তথাপি ইহাও ভাষা-বিজ্ঞান-সম্মত সত্য যে রাজসভার ভাষা নিজ কৃত্রিম মর্য্যাদার জোরেই সাধারণ চল্‌তি ভাষাকে প্রভাবিত করে—এইরূপ ভাষার অনুকরণই গ্রাম্য সমাজে পর্য্যন্ত সুরুচি ও উচ্চ সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ অভিনন্দিত হয়। মোটের উপর ইহা নিঃসন্দেহ যে মিশনারি সাহেবেরা ও সিবিল সার্ব্বিসের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা সম্পূর্ণ সংস্কৃত প্রভাবগ্রস্ত ছিলেন না তাঁহারা এই পত্রাবলী ব্যবহৃত ভাষাকেই নিজ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হাতে যে ভাষা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা ইহারই বিষয়োপযোগী পরিবর্ত্তনের ফল।

(৪)

এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে। প্রথমতঃ ইহাতে আরবী-পারসী শব্দের অতি-প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়। ডাঃ সেন তাঁহার ভূমিকায় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই অধুনা অব্যবহৃত ও অবোধ্য। নিছক রাজপুরুষদিগকে খুসী করিবার জন্য ও রাজসভা-নির্দ্দিষ্ট আদব-কায়দার খাতিরে যে শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছিল, তাহারা বাহ্য-প্রলেপের মত ভাষার অঙ্গ হইতে কালপ্রবাহে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, জাঁকজমকশালী ময়ূর-পুচ্ছের ন্যায় আপনা হইতেই স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি আরবী-পারসী শব্দ কৃত্রিম প্রয়োজন ও ফ্যাশানের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভাষার অস্থি-মজ্জার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে। ব্যবহারের সময় কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ চিনাইয়া না দিলে আমরা তাহাদিগকে বৈদেশিক আহরণ বলিয়া চিনিতে পারি না। মনে হয় যে, যে পরিমাণে বৈষয়িক প্রয়োজনের পরিবর্ত্তে আন্তরিক আবেগ ভাষা-প্রয়োগের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ধার-করা শব্দ-সম্পদ, তা সংস্কৃতই হউক বা আরবী-পারসীই হউক, সতেজ প্রাণশক্তি ও সক্রিয়তা হারাইয়া অব্যবহৃত বস্তু-স্তূপের গুদামজাত হইতে থাকে ও কালক্রমে তাহা শব্দতাত্ত্বিক

ছাড়া আর সকলের স্মৃতি হইতে বিলীন হয়। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দুইখানি পত্র হইতে দেওয়া যাইতে পারে। ১৪ ও ২৮নং পত্রে মহারাণী কমতেশ্বরী যথাক্রমে নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের গুরুতর শাস্তি ও রাজ্য পরিচালনার 'হস্তচ্যুত ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত আবেদন জানাইতেছেন। এই দুই পত্রে যেখানে যেখানে হৃদয়াবেগের মাত্রা সাধারণ সৌজন্তপূর্ণ ও স্বার্থসিদ্ধিমূলক প্রার্থনার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে সেখানেই ভাষার মধ্যে তাড়িত শক্তির সঞ্চার হইয়াছে ও আরবী-পারসী শব্দসম্ভার বায়ু-তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্তায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। অত্যন্ত আড়ষ্ট, প্রাণহীন শব্দ-প্রয়োগের পিছনেও যে লুক্কায়িত প্রাণশক্তি থাকে ও আন্তরিক আবেগের সংস্পর্শে ইহার স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা এই জাতীয় উদাহরণ হইতেই সুস্পষ্ট হইবে।

এই অচিরগত অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা একটা বর্ত্তমান প্রচেষ্টার সম্ভবতা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। অধুনা কোন কোন মুসলমান লেখক বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী-পারসী শব্দ প্রবর্ত্তন করিয়া ইহাতে মুসলমান সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রচলিত বৈদেশিক শব্দের ক্রমিক বিলোপই এই চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছে। ঝরিয়া পড়া পাতাকে গাছের মূল ও শাখা-প্রবাহী রসধারার সঙ্গে পুনঃসংযুক্ত করা যায় না। প্রত্যেক ভাষারই আহরণের যুগ আছে—তাহার পর আসে দৃঢ়ীকরণ ও সুনিয়ন্ত্রণের যুগ। আহরণের যুগ শেষ হইলে বাহির হইতে নূতন শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ভাষায় এই শক্তি শোষণাস্তিকতার বিন্দু (point of saturation) পৌঁছায় ও তাহার একটা নিজস্ব প্রকৃতি পাকাপাকি রকম নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। তখন যে সমস্ত শব্দ প্রয়োজনের বাহির-দেউড়ি উত্তীর্ণ হইয়া ভাষার অন্তরের অন্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদিগকেও যেমন বহিস্কৃত করা যায় না, তেমনি নূতন অতিথিকেও আবাহন করিয়া আনা যায় না। ভাষার দুর্ব্বোধ্য প্রকৃতিরহস্য নিজ প্রয়োজনমত সংস্কৃত ও মুসলমানী উভয়বিধ আকর হইতেই শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে; এখন ইহা পণ্ডিত ও মৌলবীর তোয়াক্কা না রাখিয়া, কোন বিশেষ সাংস্কৃতিক কত্তোয়াকে উপেক্ষা করিয়া, নিজ বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথে সিদ্ধি অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এখন যদি কেহ জোরপূর্ব্বক একদিকে 'ইয়ম্মদ', 'হর্য্যক্ষ' ও অপরদিকে 'তকবীর', 'মোখালিফ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, তবে উহাতে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য রচিত হইতে পারে, উহা গোটা বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য হইবে না।

আগামীবারে সমাপ্য

অনর্গল

(নাটিকা)

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

প্রকাণ্ড ভারি একটা সুট্‌কেস্ অতি কষ্টে টানিতে টানিতে মালিনী আসিলেন, তাহার পিছন পিছন আসিলেন বিকাশবাবু

বিকাশ। কি মালিনী, অমন ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

মালিনী। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) যমের বাড়ী। যাবে আমার সঙ্গে?

বিকাশ। যমের বাড়ী তো শুধু হাতে গেলেই চলে। সঙ্গে আবার বাক্স প্যাঁট্‌রা কেন?…রাগ হয়েছে মালিনী? ছিঃ, লক্ষ্মীটি, চলো আমরা ছাদে যাই। আজ পূর্ণিমা।

মালিনী। খবরদার, আমার গায়ে হাত দিওনা বলছি! তোমার ছোঁয়া লাগলে গা আমার ঘেন্নায় শিউরে ওঠে।

বিকাশ। কেন, আমি কি অস্পৃশ্য, অশুচি?

মালিনী। তার চেয়েও বেশী—তুমি নরাধম, কামুক, লম্পট, নীচ।

বিকাশ। বটে!

মালিনী। এতদিন সহ্য করেছি তোমায়, মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আর পারি না সহ্য করতে। তাই চলে যাচ্ছি।

বিকাশ। সত্যি ক'রে বল তো মালিনী, তুমি আমায় ভালবাসোনা, না? কোনো দিনই বাসো নি।

মালিনী। তোমায় ভালবাসা!—

"ক্লেদ ঘন চাটুবাক্যে বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার
কলুষ-কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার।
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায়
আলোক-বঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্টক্ষেন উঠে বুদ্‌বুদ দিয়া—ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
আকুলিতে থাকে কিলি বিলি—"

বিকাশ। থাক, থাক, আর বলতে হবে না। আমি যে তোমার স্বামী, সে কথাও কি ভুললে?

মালিনী। তা তুমি একটি মুহূর্ত্তও ভুলতে দিয়েছ কি? স্বামী! প্রভু!—কিন্তু প্রণয়ী তুমি নও, কোনো কালে ছিলে না। তোমার সঙ্গে থাকার নাম ব্যাভিচার—বিবাহের মন্ত্রপূত ব্যাভিচার।

বিকাশ। ব্যাভিচার! আজ দশবছরের বিবাহিত জীবনের পর এই তোমার ধারণা?

মালিনী। ধারণা নয়, সত্যি।

বিকাশ। তোমার প্রণয়ী কেউ আছে?

মালিনী। আছে, যম।

বিকাশ। তবে?

মালিনী। তবে আবার কি! তোমাকে তাই ব'লে প্রণয়ী ভাবতে পারি না। মনের স্বপ্ন দিয়ে যাকে প্রণয়ী ব'লে গড়েছি সে কোনোদিন তুমি নও।

বিকাশ। কেন নই? আমাকে শুধু কি করতে হবে বলে দাও।

মালিনী। হায় রে বাঙালী স্বামী, রমণীর মনের ওপর জোর খাটাবে!

বিকাশ। তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে কাউকে ভালবাসো। কে সে, কে সে?

মালিনী। তাতো বেসেছিই। একজনকে নয়, অনেককে। যাকে যখন ভাল লেগে গেছে, তখনি মনে মনে তাকে ভালবেসেছি।

বিকাশ। কেন বেসেছ? এতো অন্যায়।

মালিনী। মন তোমার বিনা মাইনের বাঁদী নয় যে তার ওপর জুলুম খাটবে।

বিকাশ। এই তোমার শেষ কথা?

মালিনী। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। তাই আমি চলে যাবো।

বিকাশ। চলে যাবে! আমার মানসম্ভ্রম সমস্ত খুইয়ে তুমি চলে যাবে! কখনো তোমায় যেতে দেব না। আইন আছে আমার স্বপক্ষে।

মালিনী। হৃদয় দিয়ে বশ করতে পারলে না, আর আইন দিয়ে বশ করবে?

বিকাশ। না পারি, তোমার সামনে আমি বুকফেটে মরে যাবো। পাষাণী তুমি, আমাকে মেরে ফেলে তারপর যেখানে খুসী চলে যেয়ো।

মালিনী। তো তো, মেলোড্রামা!

গণেশের বৌএর প্রবেশ। মুখে আরো বেশী করিয়া পাউডার এবং ওষ্ঠধরে গাঢ় করিয়া 'লিপষ্টিক্' ঘষিয়া আসিয়াছে

গণেশের বৌ। বালাই ষাট্, তুমি মরবে কেন দাদাবাবু! তাহলে আমিও যে বাঁচবনি! দাদাবাবু, তুমি আমায় নাও। আমি বুকে ক'রে রাখব।

বিকাশ। হায় রে কপাল! আমায় ভালবাসতে আর কেউ জুটল না, জুটল গণ্শার বৌ।

মালিনী। কেন, এ তো ভালই হ'ল। তুমি যা চাও তা ওর কাছে খুব বেশী করেই পাবে। বাইরের প্রভেদ তোমাদের অনেক থাকলেও অন্তরের পরিচয় তোমাদের একই।

"গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।"

গণেশের বৌ। (মালিনীকে) তুমি আমার দাদাবাবুকে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছ, চুপ করো, আর কড়া কথা বলতে পারবে নি। (বিকাশকে) আহা মরে যাই, চাঁদমুখখানি শুকিয়ে গেছে, এসো, আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমার কত আদর করব, গান শোনাব—কেত্তন গান। আমি খুব ভাল কেত্তন জানি, শুনবে দাদাবাবু—

(গানের সুরে) "আউর সখি মদ পির পির মাতি
মাঁয় বিনা পিয়ে মদ মাতি।"

মালিনী। তোমার বাবুকে ছেড়না গণ্শার বৌ। দেখছ না, বাবুর মন একটু একটু টলছে। তোমার তূণে যত অস্ত্র আছে সব প্রয়োগ করো।

বিকাশ। ছিঃ গণ্শার বৌ, এসব কি কেলেঙ্কারী করছ। যাও, তোমার কাজে যাও। তুমি দাসী, দাসীর মতো থাকো। একে দাসী, তায় তোমার বয়েস হয়েছে। ছিঃ—

গণেশের বৌ। আমায় তেড়িয়ে দিলে, আমি গলায় দড়ি দেব গো—আমায় তেড়িয়ে দিলে!

রোরুদ্যমান অবস্থায় ভিতরে চলিয়া গেল

মালিনী। ঐ হ'ল আসল কথা, বয়েস হয়েচে। বয়েস না হ'লে তোমার মতন লোক যে কি করত তা বলা যায় না।

বিকাশ। চুপ করো মালিনী। আর তোমার শ্লেষ করবার দরকার নেই। আমি যে নীচ তা খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু তুমি কি? তোমার মধ্যে যে-নীচতা, যে-ভণ্ডামি রয়েচে সে যে আরো বেশী ভয়ানক। তোমায় অন্তরে অন্তরে চেয়েছি বলেই তোমায় কাছে ডেকেছি। তাকে যতো দুর্বাক্যের দ্বারাই কলঙ্কিত করো, তবু এটা তো ঠিক যে আমি আর কারো কাছে যাই নি। আমার এই চাওয়াটা খুব স্থূল, খুব অসংযত হ'লেও এর মধ্যে কোনো ভণ্ডামি ছিল না, ন্যাকামি ছিল না। ছিল কি? সত্যি ক'রে বলো।

মালিনী। না, তা ছিল না, কারণ সেটা এমন অসংযত যে তার মধ্যে আর কোনো অসংযমের স্থানই ছিল না।

বিকাশ। হুঁ। আর তুমি আমাকে মনে মনে ঘৃণা ক'রেও মুখে পতিব্রতা স্ত্রীর অভিনয় ক'রে গিয়েছ আজ দীর্ঘ দশবচ্ছর ধরে। তোমার সূক্ষ্ম সৌখীন প্রণয়ের রুচি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-কবিতা আওড়ালে, তাতে তোমার নিজের ভণ্ডামি কি ঢাকা পড়ে গেল ভেবেছ?

মালিনী। সূক্ষ্ম সৌখীন নয়, সত্যি যা আমি তাই বলেচি। তোমাকে আমি ভয় করি নে, ভয় দেখিয়ে তুমি যে আমাকে বশ করবে, ভণ্ড ব'লে গাল দিয়ে যথখুসী তোমার রসনা কলুষিত করতে পার—তবু সত্যি যা তা বলবই। আমার এ দেহের ওপর তোমার অবাধ স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করতে দিতে আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করেচে। আমার এ দেহ তোমার নয়, এখানে ভগবান আছেন—এ আমার ভগবানের আসন।

বিকাশ। এই তো ভণ্ডামি। তোমার ঐ দেহকে যদি ভগবানের আসনই ভেবে থাকো, তাহলে এই অত্যুগ্র প্রসাধনে তাকে অমন লোভনীয় ক'রে তোলা কেন? প্রত্যঙ্গের প্রহরব্যাপী মার্জনে আর লেপনে, স্নো-পাউডার ক্রীম আর লোশানে কোন্ ভগবানের আরাধনা করো মালিনী? কি, চুপ ক'রে রইলে যে? হ্যাঁ জানি, তুমি বলবে পুষ্পকে চন্দন মাখিয়ে তবেই দেবতাকে দিতে হয়। কিন্তু যে-ফুল দিয়ে মানুষ ভগবানকে পূজা করে, সে-ফুলকে পেঁয়াজবাটা, রসুন আর লঙ্কার গুঁড়া মাখিয়ে মদের চাট তৈরি করে কি?···কি মালিনী, মুখ নীচু ক'রে রইলে যে!

মালিনী স্তম্ভিত ভাবে নিরুত্তর রহিলেন

···তবে কি তোমার মন ভিজেচে, তবে কি এবার থেকে আমায় ভালবাসতে পারবে মালিনী? এস, নতুন জীবন আরম্ভ করি।

মালিনী। না, না, না। আমি শুধু তোমাকেই ঠকাই নি, নিজেকেও ঠকিয়েছি! নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ে যা লুকোচুরিই

না খেলেছি! আমায় একলা থাকতে দাও, একলা থাকতে দাও!

দুই হাতে মুখ চাপিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

সহসা গণেশের বৌ আসিয়া বিকাশের হাত ধরিল

বিকাশ। (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) আশা নেই, আমার আর কোনো আশাই নেই।

গণেশের বৌ। আর তুমি ঐ পোড়ারমুখীর পিত্যেসে থেক নি দাদাবাবু। এসো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বুক ফেটে যায়!

বিকাশকে টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া গেল

মেজকর্ত্তা আসিলেন। এবার আর হাতে মদের বোতল নাই। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন

মেজকর্ত্তা। মিজগিন্নি—মেজগিন্নি কোথা গেল?

ভিতরের দিক হইতে গণেশ প্রবেশ করিল

মেজকর্ত্তা। (খুব ভাল করিয়া গণেশের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি কি মেজগিন্নি নও?

গণেশ। এঁজ্ঞে না কর্ত্তাবাবু, আমি গণ্শা।

মেজকর্ত্তা। তা তুই মেজগিন্নি না হ'য়ে গণ্শা হলি কেন রে বেটা, একথার উত্তর দিতে পারিস?

গণেশ। এঁজ্ঞে পারতুম বাবু, আমার মন খারাপ হয়ে আছে নইলে পারতুম।

মেজকর্ত্তা। কেন? তোর আবার মন খারাপ হ'ল কিসে রে বেটা? বিশ বচ্ছর চাকরি করচিস, কই কোনোদিন তোর মন খারাপ হয়েচে একথা তো শুনি নি।

গণেশ। এঁজ্ঞে কর্ত্তাবাবু, আমি আপনার পুরোণো চাকর, আমার সব কথাই তো আপনি জানেন।

মেজকর্ত্তা। কিছু কিছু জানি বটে, সব কথা তোর কেমন ক'রে জানব রে বেটা! তুই লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা খাস, সে কথা জানি।

গণেশ। (ক্রন্দন রুদ্ধস্বরে) আমার পরিবার আমায় ভালবাসে নে বাবু।

মেজকর্ত্তা। কেন? তোর পরিবার বেটীর আবার হ'ল কি যে সে তোকে ভালবাসে না!

গণেশ। আমার পরিবার বিকাশবাবুকে ভালবাসে। তার হাত ধ'রে তাকে ছাদে টেনে নিয়ে গেছে।

মেজকর্ত্তা। কী সর্বনাশ! মেজগিন্নিকে ডাক। মেজগিন্নি এখুনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিক।

গণেশ। এঁজ্ঞে না বাবু, কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাবো। আপনার অনেক নিমক খেয়েছি, আপনার পায়ে ধরি কর্ত্তাবাবু, (পদধারণ) আমায় যেতে দিন।

মেজকর্ত্তা। ওরে হতভাগা বেটা, পা ছাড়, পা ছাড়। দেখছিস নে, এখনো আমার পা টলছে। তুই যদি পা ধরিস, আমি পড়ে যাবো যে।...তুই চলে যাবি? কোথায় চলে যাবি?

গণেশ। এঁজ্ঞে আপনার দয়ায় দেশে কিছু জমিজমা আছে, সে সব আমার ভায়ের নামে দানপত্তর ক'রে আমাদের কোনো চা বাগানে চলে যাবো। জন্মের মতো চলে যাবো, আর ফিরবনি।

মেজকর্ত্তা। বেটার বিনয় দেখ না! তবে এতদিন যে তোর পরিবারকে গালমন্দ করতিস, মার-ধোর করতিস, আজ তোর সে তেজ গেল কোথা?

গণেশ। এঁজ্ঞে যখন ভাবতুম সে আমাকে ভালবাসে, তখন তাকে বকেছি মেরেছি। আজ জানি সে কেউ নয় আমার, তবে আর জোর খাটাব কেন?

মেজকর্ত্তা। বেটা বুদ্ধির বৃহস্পতি! ওরে হতভাগা, আজই তো জোর খাটানোর দরকার।

গণেশ। না বাবু। আমি ছোটো লোক, আমার অত বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। আমি শুধু এই বুঝি, যে চায় না, তার দায় হ'য়ে পড়ে থাকতে নেই।

মেজকর্ত্তা। হুঁ, তোর কথাটা নেহাৎ ফেলবার মতো কথা নয়। তবে যা, তোর ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকগে যা। কাল সকালে চ'লে যাস্। যাই, মেজগিন্নি কোথায় গেল দেখে আসি।

গণেশ ও মেজকর্ত্তার বাড়ীর ভিতর প্রস্থান

উত্তরের ঘরের দরোজা খুলিয়া বিমল ও ডক্টর দাস এই ঘরে আসিলেন

বিমল। উঃ, ও ঘরে দমবন্ধ হ'য়ে প্রায় মারা গেছি সার। কিন্তু, এসব কি দেখলুম! একেবারে অবিশ্বাস্য! ভোজবাজী!

ডঃ দাস। দেখ্‌ছ তো, মানুষের মনের মধ্যে কতরকম ইচ্ছা লুকিয়ে বাস করে। বলিষ্ঠমনের অর্গল তাদের অন্ধকারেই বন্ধ ক'রে রাখে। এই ধরো, মাত্‌লামি করার ইচ্ছাটা চৌধুরী ম'শায়ের চেয়ে তোমার বেশী নয়।

বিমল। নয়ই তো! মাতাল হ'য়ে কী উৎপাতই না করছেন! আমিও তো অমনি ক'রে থাকি! সে আমার নেত্য-খানসামা জানে।

ডঃ দাস। তোমার হাস্যজনক দুর্বল দিকটা নিজেই দেখতে পেয়েছ তাহ'লে। এবার থেকে সাবধান হও।

বিমল। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন সার? সমস্ত পৃথিবীটাকে এইরকম ক'রে আপনার 'অনর্গল-রশ্মি' সেবন করিয়ে দিলে মিথ্যাচার, শঠতা, প্রবঞ্চনা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের মুখোস খুলে গিয়ে তার আসল রূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়বে।

ডঃ দাস। আসল রূপ তুমি কোন্‌টাকে বলো বিমল? পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা দলবেঁধে মানুষের মনে পাশাপাশি বাস করে। সব ইচ্ছাই মানুষের আসল ইচ্ছা। তাই একই মানুষ অবস্থা বিশেষে দেবতা, অবস্থা বিশেষে দানব। তবে সচরাচর মানুষ ভালোমানুষীর মুখোস প'রে থাকে বটে।

বিমল। এক গণ্শা ছাড়া। এমনিতে সে কী বদরাগী আর কটুভাষী। অথচ যখন তার খুব রাগ করবার কথা, তখন একটিবার জোর খাটালে না, একটিবার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত জানালে না!

ডঃ দাস। ওরাই তো জীবনে সত্যি নিরাসক্ত হ'তে পেরেছে বিমল।

সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল

বিমল। ঐ, ওঁরা আসচেন। চলুন, চলুন সার আমরা লুকাই।

ডক্টর দাস ও বিমল আবার উত্তরদ্বার দিয়া অন্তর্হিত হইলেন

মেজকর্ত্তা ও মালিনী প্রবেশ করিলেন

মেজকর্ত্তা। মা লক্ষ্মী, তুমি বালিসে মুখগুঁজে অমন ক'রে কাঁদছিলে কেন মা? কেউ কি তোমায় কটু কথা বলেচে?

মালিনী। না বাবা।···তুমি আমায় আর মালক্ষ্মী ব'লে ডেকো না। আমি তোমার মুখের ও ডাককে কলঙ্কিত করেচি।

মেজকর্ত্তা। কে বলে এ কথা! আমি আমার মাকে চিনি নে!

মালিনী। আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা।

মেজকর্ত্তা। জিজ্ঞেস করো মা, কি কথা জিজ্ঞেস করবে।

মালিনী। তোমার ছেলের আর আমার মধ্যে তুমি কি কোনোদিন কিছু লক্ষ্য কর নি?

মেজকর্ত্তা। করেছি। তোমার গভীর বিতৃষ্ণা, মা লক্ষ্মী।

মালিনী। এ তুমি লক্ষ্য করেছ বাবা? কী আশ্চর্য্য!

মেজকর্ত্তা। করেছি বই কি মা। বুড়ো মানুষের চোখকে যতটা অকেজো ভাবো, আসলে ততটা নয়।

মালিনী। আমি এতদিন তোমার ছেলেকেই দোষ দিয়ে এসেছি, কিন্তু জানো বাবা, আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমি নিজেকেও প্রবঞ্চিত করেচি।

মেজকর্ত্তা। কেন মা তুমি একথা বলচ? আমি তো তোমার কোনো দোষই দেখতে পাই নি।

মালিনী। সে তুমি আমাকে স্নেহ করো বলে। স্নেহ অন্ধ। আমার এই দেহকে আমি ভগবানের পূজার আসন করিনি, আমি—

মেজকর্ত্তা। ও, তুমি তোমার সাজসজ্জার কথা বলচ মা? ওরে পাগলী মা, সোনায় কখনো কলঙ্ক লাগে? সোনা সোনাই থাকে।

মালিনী। না, না, না, অমন ক'রে তুমি আমায় প্রশ্রয় দিও না। আমি মস্ত ভণ্ড। এখন আমি কি করব, আমায় ব'লে দাও বাবা।

মেজকর্ত্তা। খুব লোককে জিজ্ঞেস করেছ মা। আমি যে ভণ্ডের রাজা। সারাটা জীবন কেমন ভণ্ডতপস্বী সেজেছিলুম! দেখছ তো মা, শেষে মাতাল হয়েচি।

মালিনী। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার ওতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি যে মেয়েমানুষ বাবা, আমার ভণ্ডামি ঈশ্বর সইবেন না। এবার যেন একটা ভূমিকম্প আমার অন্তর থেকে নাড়া দিয়ে উঠ্ছে, এবার আমার আর রক্ষা নেই।

দুইহাতে মুখ চাপিয়া রহিলেন

মেজকর্ত্তা। অমন ক'রে কাঁপছ কেন মা? শান্ত হও, শান্ত হও।

মালিনী। কিন্তু আমি যে পথ দেখতে পাচ্ছি নে বাবা। যে-মন প্রণয়-বিমুখ, আমি তাকে কেমন ক'রে আমার স্বামীর দিকে ফেরাব?

মেজকর্ত্তা। (মালিনীর মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে কিছুক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিয়া) সত্যিই তো, কেমন ক'রে ফেরাবে মা?

মালিনী। তুমি তাঁর বাপ হ'য়ে এমন কথা বলতে পারলে?

মেজকর্ত্তা। আমি যে তোমারও বাপ, মা লক্ষ্মী। (মালিনী মেজকর্ত্তার পদধূলি মাথায় লইলেন) ওঠো মা। শোনো আমার কথা। তুমি সত্যি সত্যি, অন্তরে অন্তরে ভগবানকে মানো তো?

মালিনী। মানি বাবা।

মেজকর্ত্তা। তবে তুমি তাঁকেই শরণ নাও। তিনি বলেছেন—মামেকং শরণং ব্রজ। তুমি তোমার যা কিছু আছে সব তাঁকেই দাও, নিজেকে নিঃস্ব ক'রে, রিক্ত ক'রে তাঁকেই দিয়ে দাও। আর কারোকে দিও না, আর কিছুকে দিও না, তাঁকেই দাও। তাহলেই তোমার সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে।

মালিনী। আমি তো বুঝতে পারচি না বাবা, কেমন ক'রে ক'রে তা হবে?

মেজকর্ত্তা। ঠিক কেমন ক'রে হবে তা আমিও জানি না, অত বুদ্ধি আমার নেই। তবে এটুকু জানি, যে নিশ্চয় হবে। সেই রাজাধিরাজের রাজ্যে কেমন ক'রে কি যে ঘটে যায়, তা তিনিই জানেন, আমরা কেউ জানি নে। তবে এটুকু জানি, সব সমস্যার বজ্রবন্ধন ফুলের মালা হ'য়ে যায় কেবল তাঁরই দয়া হ'লে।

মালিনী। তোমার কথায় আমার অন্তর সায় দিয়ে বলচে, হবে, হবে, তোর হতেই হবে। এই কথাটি আমি এখুনি লিখে রাখব, পাছে অবহেলায় ভুলে যাই। বড় গর্ব করেই বলেছিলুম বাবা, এ দেহমন ভগবানের আসন। কিন্তু চলেছিলুম অন্যপথে। তিনি নিজে কেন আমায় ডেকে নিলেন না, বাবা?

মেজকর্ত্তা। তিনি নিজেই তো ডেকে নিলেন মা। আমরা যখন চাই, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি ক'রে চাই। হাঁকডাকেই আমাদের এমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে তাঁর ডাকটা আমাদের কানেই আসে না। তিনি যে হাঁক ডাক কিছুই করেন না মা, শুধু বুকের কাছটিতে এসে জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন—শুধু মিনতির সুরে তাঁর বীণা বাজে। আজ সেই তিনিই যে তোমাকে ডাক দিয়েছেন মা।

মালিনী। আমি এখানেই থাকব, এই সংসারের একটি কোণে। কোথাও যাবো না। দিনরাত তাঁকে ডাকব, তুমি আমায় পবিত্র করো, পবিত্র করো। তুমি আমায় গ্রহণ করো, গ্রহণ করো। যত নির্য্যাতন সইব, ততই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে আমার প্রতীক্ষা। যত নিন্দা আর যত অত্যাচার আমায় দূরে ঠেলে ফেলে দেবে সবার কাছ হতে, ততই কাছে আসবে আমার প্রাণের ঠাকুর। আজ আর আমার ভয় নেই, ভয় নেই।

ভিতরে চলিয়া গেলেন

মেজকর্ত্তা। এই তো ঘটে গেল! ওরে অবিশ্বাসী, এই তো তোর চোখের সামনেই ঘটে গেল! তুই প্রণাম কর! প্রণাম কর!···(কিছুক্ষণ তাঁহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে বাক্য সরিল না)···ঠাকুর, তুমি বড়ো একচোখা। কত সহজেই দয়া হ'ল তোমার এই মেয়েটির ওপর, আর আমি আজ সত্তর বচ্ছর ধরেও তোমার নাগাল পেলুম না। কোনোদিন কি পাবো? কোনোদিন কি পাবো?

ভিতরে চলিয়া গেলেন

ঢং ঢং করিয়া উত্তরের বন্ধ ঘর হইতে আটটা বাজিল

ডক্টর দাস ও বিমল উত্তরের দ্বার খুলিয়া এঘরে আসিলেন

বিমল। ধন্য আপনার আলোক-রশ্মি। মালিনী-বৌদির মধ্যে যে এমন একটি মীরাবাঈ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে বাস করছেন, আপনার আলোকরশ্মি না থাকলে কে তা দেখতে পেত।

ডঃ দাস। ও কথা বোলো না। ওঁর আলোর রশ্মিতে আমার আলোকরশ্মি ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে গেছে বিমল।

যবনিকা

মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্ত

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের সময় হইতেই বোধহয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতন সুরু হয় এবং তাঁহার প্রথম পুত্র স্কন্দগুপ্তের সময় হইতে শেষ গুপ্তরাজগণের বংশাবলী এবং সময়নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দামোদরপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি তাম্রশাসন প্রজের ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক অধীত হইবার পূর্ব্বে শেষ গুপ্তরাজবংশের মুদ্রা ব্যতীত, একটি মাত্র ঐতিহাসিক উপকরণ আমাদের জ্ঞাত ছিল। ইহা যুক্তপ্রদেশে গাজীপুর জেলার অন্তর্গত ভিটরী গ্রামে প্রাপ্ত রাজকীয় শিলমোহর এবং মহারাজাধিরাজ নরসিংহ গুপ্তের অজ্ঞাতনামা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পরম ভাগবতো মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। অধুনা প্রাচীন নালন্দা এবং বারাণসীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটি শিলালেখ এবং রাজকীয় শিলমোহরের উপর উৎকীর্ণ লিপি আমাদের কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছে। ইহাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯১৫ সালে মিঃ হ্যারল্ড হারগ্রীভ্‌স বর্ত্তমান সারনাথ এবং প্রাচীন মৃগদাবের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুইটি বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। মূর্ত্তি দুইটির পাদপীঠে লিপি উৎকীর্ণ ছিল। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৫৪ গৌপ্তাব্দে (৪৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দ) ভিক্ষু অভয় মিত্র নামক এক ব্যক্তি কুমারগুপ্ত নামক এক রাজার রাজত্বকালে এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ ভিক্ষু অভয় মিত্র ১৫৭ গৌপ্তাব্দে (৪৭৬-৭৭ খৃঃ অব্দ) মহারাজ বুধগুপ্তের রাজত্বকালে আর একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাচীন মৃগদাবে প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিন বৎসরের মধ্যে মধ্যদেশে দুইটি গুপ্তসম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ এবং রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। কুমারগুপ্তের পরে প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার পর্য্যালোচনা করা এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ১৪৮ গৌপ্তাব্দে মুদ্রিত (৪৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দ) একটি রজত মুদ্রা ব্যতীত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের আর কোন শেষ নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। উপরিলিখিত ভিটরী গ্রামে প্রাপ্ত কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম নাই এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরগুপ্তের নামের পূর্ব্বে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি উপাধি হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে বোধ হয় দুই ভ্রাতায় বিরোধ হইয়াছিল। কিন্তু ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতানুসারে স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত সম্ভবতঃ একই ব্যক্তির নামান্তর মাত্র। কিন্তু নিম্নে বর্ণিত নালন্দায় প্রাপ্ত দুইটি রাজকীয় শিলমোহরের লিপি তাঁহার মত সমর্থন করে না। ইহাতেও স্কন্দগুপ্তের স্থায় পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত এবং তদীয় পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের নাম পাওয়া যায় না। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে ১৪৮ গৌপ্তাব্দে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যান্তের তারিখ এবং সারনাথে প্রাপ্ত মূর্ত্তির পাদপীঠের উৎকীর্ণ লিপি প্রমাণ করে যে, ১৫৪ গৌপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং এই কয়বৎসরের মধ্যে তিন জন গুপ্তসম্রাট সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা পুরগুপ্ত, তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত এবং তাঁহার বালক কিম্বা শিশুপুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত। দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সময়ে দুইটি রাজকীয় শিলমোহর আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহার মাতার নাম মিত্রদেবী। এই কুমারগুপ্ত বোধহয় তিন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ ১৫৭ গৌপ্তাব্দে অভয় মিত্রের লিপি অনুসারে মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে পুরগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি এবং তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই এবং স্কন্দগুপ্তের রাজ্যান্তের নয় বৎসরের মধ্যে ১৫৭ গৌপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্ত মগধের সুপ্রাচীন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বুধগুপ্তের সহিত পুরগুপ্ত এবং দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের প্রকৃত সম্বন্ধ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। যদি নালন্দা প্রত্নতত্ত্বাগারে রক্ষিত বুধগুপ্তের রাজকীয় শিলমোহরটি সম্পূর্ণ থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম। কিন্তু নিয়তির ক্রূর পরিহাসে ইহার অর্দ্ধাংশ কালের করাল কবলে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং নূতন কিছু আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে মতামত দেওয়া অসম্ভব। তবে যেরূপভাবে নালন্দায় আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজকীয় শিলমোহরটি লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে বুধগুপ্ত বোধ হয় পুরগুপ্তের ঔরসজাত। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র এবং আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের নাম নরসিংহগুপ্তের পরে উক্ত গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গুপ্তরাজবংশাবলীর মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। তবে দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্তের সহিত মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত না হইলেও তিনি যে গুপ্তরাজবংশের সম্রাট ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বুধগুপ্তের কয়েকটি শিলালিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে সারনাথে প্রাপ্ত অভয় মিত্র দ্বারা ১৫৭ গৌপ্তাব্দে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ; ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৭ গৌপ্তাব্দের বৈশাখ মাসের সপ্তমীতে অভয় মিত্র নামক একজন বৌদ্ধভিক্ষু কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে সারনাথ প্রত্নতত্ত্বাগারে সংগ্রহরক্ষক হিসাবে কর্ম্ম করিতেছিলাম। ঐ সময়ে E. I. Rly. ডাফ্‌রিণ ব্রীজ নামক গঙ্গার উপরে যে সেতু আছে তাহার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ইহার জন্য যুক্তপ্রদেশের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে, এলাহাবাদ হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত যে পাকা সড়কটি গিয়াছে, সেই সড়কের বারাণসীর সহরের মধ্যস্থিত অংশ বিশেষ রাজঘাট উপত্যকার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার কথা হয় এবং খননে যদি কোন প্রত্নসম্পদ পাওয়া যায় তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সারভেয়ারসিয়ার পণ্ডিত উত্তমচাঁদ শর্ম্মা নির্দ্দিষ্ট হন। আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী পণ্ডিত মাধবস্বরূপ বৎস কর্ত্তৃক তাঁহার কর্ম্ম পরিদর্শন করিবার জন্য আদিষ্ট হই। সেই সময় পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীগণ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে নির্ম্মিত একটি উদ্যানবাটিকার প্রাকার ধ্বংস করিতেছিলেন। ইহার ভিত্তিমূল প্রাচীন হর্ম্ম্যরাজির ধ্বংসাবশেষ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আমি একটি নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ পাই। স্তম্ভটির চতুর্দ্দিকে বিষ্ণুর চারিটি অবতারের মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং একপার্শ্বে আমি একটি লিপি খোদিত দেখিতে পাই। ইহার প্রথম পংক্তিতে "রাজাধিরাজ বুধ" এই

কথাটি আমি পড়িতে পারি। পরে তত্ত্বগায় মার্জনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুমারগুপ্তের পরে উত্তরাপথের পূর্ব্বভাগে ও পশ্চিমভাগে যে গুপ্তাব্দ প্রচলিত ছিল সেই দুইটির মিশ্রবর্ণে মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের রাজত্বকালে, বোধ হয় ১৫৭ গৌপ্তাব্দে এই লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই শিলালিপিটি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব প্রকাশিত করিবার ভার পাইয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করা অসম্ভব। অনেকের ধারণা যে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর আত্মকলহে এবং হূণ-প্লাবনে গুপ্তসম্রাটগণ হীনবল হইয়া সামান্য প্রাদেশিক নরপতিরূপে রাজত্ব করিতেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মকলহের কথা বিশ্বাস করেন না একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভিটরী গ্রামে প্রাপ্ত রাজকীয় শিলমোহরে এবং নালন্দায় প্রাপ্ত বুধগুপ্তের শিলমোহরে নরসিংহগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের নাম উল্লেখ না থাকায় এই অনুমানই হয় যে স্কন্দগুপ্তের পরে এবং দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সময়, মগধের গুপ্তরাজবংশে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৫৪ গৌপ্তাব্দ হইতে ১৫৭ গৌপ্তাব্দের মধ্যে বুধগুপ্ত শিশুকুমারগুপ্তকে সিংহাসন হইতে অপসারণ করিয়া নিজে রাজত্ব আরম্ভ করেন। প্রাচীন মালব দেশের অন্তর্গত ইরাণ নামক স্থানে ১৬৫ গৌপ্তাব্দের শিলালিপি, দামোদরপুরে আবিষ্কৃত ১৬৩ গৌপ্তাব্দের তাম্রলিপি এবং ১৭৫ গৌপ্তাব্দে মুদ্রিত বুধগুপ্তের রজতমুদ্রা বুধগুপ্তের মধ্যদেশে, মগধে ও গৌড়দেশে রাজত্বের প্রমাণ দেয়। সুতরাং তাঁহার সময়ে মগধের শেষ গুপ্ত রাজবংশ যে অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণাভাব আছে।

ক্ষুধা

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

(১)

সকালবেলার শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর পদচিহ্ন রেখে ওরা চ'লে যায় প্রত্যহ সহরে। মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের মতই ওদের জীবন-যাত্রা বক্কিম ও শিথিল হ'য়ে আসে ক্রমে ক্রমে—। মাথার ওপর ভার চাপিয়ে ওরা ছোটে—সর্ব্বহারা উটের মত সাহারার তপ্ত বালুর বুকে! সে পথ অন্য-কারও নয়—ওদেরই……। ওরা মাড়িয়ে চলে সকালবেলার শিশির-ভেজা সতেজ ঘাসগুলোকে, আর ওদের মাড়িয়ে চলে দেশের ধনতান্ত্রিক-সম্প্রদায়। মানুষের রক্তে মানুষ করে তৃষ্ণা নিবারণ!

সকালবেলায় আমি বাইরের ঘরের দুয়ারটা খুলে বসি হুঁকো হাতে। সারা রাত ঘুম আসে না। সকাল সকাল উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তামাক নিয়ে বসি রোজই। ওরা যায় মোট নিয়ে সহরে। বিক্রী ক'রে চাল আনবে, তবে হাঁড়ি চাপ্‌বে। আফিং গিয়েছে ফুরিয়ে। ওদেরই একজনকে দিই পয়সা। ঝিরঝিরে হাওয়া আসে ভেসে—গতরাত্রির স্বপ্নেভরা ঝোপের ভিতর থেকে—। জেলেপাড়ায় পঞ্চুর মা সুর ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করে—'ওরে আমার পঞ্চু কোথায় গেলি রে'……ইত্যাদি। তামাকের ধোঁয়ায় পঞ্চুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তির অবস্থাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। ঘড়ি-ধরা নিয়মে রোজই আমরা এই সময়ে এসে মিলি: সকালবেলায় তামাক নিয়ে বসি আমি; পঞ্চুর মা পঞ্চুকে ডাকে ফিরে আসতে; ওরা চলে সহরে লক্ষ্মীর খোঁজে……।

বড় ছেলেটা মাস দুয়েক হ'ল বউ নিয়ে চ'লে গিয়েছে চাকরীস্থানে। বোললাম এ সময় বউমাকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।—বললে অসুবিধা হচ্ছে—জানি ত থাক্‌বে নাই। চলেই যাবে। উপার্জ্জক্ষম হ'য়ে পর্য্যন্ত কোন দিনই থাকেনি। আজও থাক্‌বে না। কি মনে হয়েছে—বুড়ো বাপের সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে।' নাতিটা ক'দিনেই খুব পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলো—ছেলেমানুষ কিনা! বলে দাদু, তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে? চল না আমাদের ওখানে? কত বড় বড় মটর আছে, বায়স্কোপ আছে—চল না দাদু? ওর চোখে কৌতূহল! বলে—, রেলগাড়ী ক'রে যাব: তুমি, আমি, বাবা, মা কেমন? চোখটা স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে আসে! বলি—, না দাদু, তুমি যখন চাকরী করবে তখন যাব। ক্ষুন্নমনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর উত্তর দেয়: হুঁ—।

দুপুরের রোদে সারা পৃথিবীটা রুগ্ন মানুষের মতই ঝিমুতে থাকে। দূরের মাঠের বিবাগী হাওয়া কেঁদে ফেরে ঘরে ঘরে। সহর থেকে বাড়ী ফেরে পণ্যজীবীর দল।

চোখে ঘুম আসে না। তবু চুপ ক'রে শুয়ে থাকি গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে। চোখ বুঁজতেই মনে হয় নাতিটার কথা। ক'দিন থেকে দুপুরবেলায় আমার কাছেই এসে শুয়ে থাক্‌তো। তারপর যেদিন ওরা চ'লে যায় সেদিন ওর কি কান্না! আমি যাবো না—বাবা তোমার, পায়ে পড়ি—আমায় নিয়ে যেও না! আমি দাদুর কাছে থাক্‌বো—ওর মা এসে জোর ক'রে তুলে নিয়ে গেল গাড়ীতে—।……মনে পড়ে পঞ্চুর কথা। ওর মাকে ও খুব ভালবাস্‌তো। কোনদিনও এতটুকু অনাদর করেনি। সকালবেলায় উঠে মাছ ধরতে যেতো নদীতে। তারপর সেই মাছ বাজারে বিক্রী করে চাল আন্‌তো, আর আন্‌তো ওর ছোট ছেলেটার জন্য একটা ক'রে মিষ্টি। সেবার মাছ ধ'রতে গিয়েছিলো নদীতে। জাল বুঝি বেঁধে গিয়েছিলো নীচে! ডুব দিয়ে তুলতে গেল আর উঠল না! গড়গড়ার নলটা একসময় যায় মুখ থেকে প'ড়ে। পঞ্চুর মার কান্নার শব্দটা যেন আবার নূতন ক'রে মনের মধ্যে গুণ গুণ্ ক'রে কাঁদতে থাকে……।

কদিন থেকেই গরমটা পড়েছে একটু বেশী। তাই মাঝ রাতে ঘুমটা ভেঙে যায়। মনে হয় রাতটা যেন অনেকটা বড় হ'য়ে গিয়েছে। আলোটা জেলে এক ক'লকে তামাক সাজি। হারাণ তাঁতির বাড়ীতে ওর গলার কাঁপা আওয়াজ শুনতে পাই। ওর ছেলেটার হ'য়েছে বিকার। কদিন থেকে অবস্থাটা যেন একটু খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ডাক্তার আনিয়েছিলো একদিন—বলেছে—আমার দ্বারা হবে না; সহর থেকে বড় ডাক্তার আনাতে। ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছে ওর ছেলে

এখন? ঘরের ভিতর থেকেই উত্তর দেয়: আজ্ঞে, একটু ভাল ব'লেই ত মনে হচ্ছে। কথা যায় ফুরিয়ে। আস্তে আস্তে হুঁকোটা রেখে শুয়ে পড়ি।

রাত বোধ হয় শেষ হ'য়েই এসেছে। প্রভাতের প্রথম আলো পূর্বদিকের কোণ ঘেঁসে ঠেলে বার হ'তে চায়। বৃন্দাবন বাবাজী টহল দিয়ে ফেরে এই পথে। যারা সহরে ছুটবে মাথায় মোট নিয়ে তারা বোধ হয় এখন উঠেছে। চতুর্থ প্রহরের সমাপ্তির কথা জানাবার জন্ম শেয়ালের দল সুর ভাঁজবার জোগাড় করে।

উঠে পড়ি বিছানা ছেড়ে। হারাণের বাড়ীতে যেন একটু বেশী রকম কথাবার্তা শুনতে পাই। মনটা কেমন যেন উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছে রে তোর ছেলে? হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে হারাণ! বলে—চাটুজ্যে-মশায় ছেলেটা কেমন করছে এখন! তাড়াতাড়িতে চটিটাও পাইনে খুঁজে। খালি পায়েই ছুটে যাই ওর বাড়ীতে। গিয়ে দেখি ছেলেটার ত মুমূর্ষু অবস্থা। বলি—মুখে একটু জল দে হারাণ। হারাণের বউ যাত্রাদলের পতনের মতই ছিটকে এসে পড়ে আমার পায়ের ওপর। ওর গগনভেদী কান্নার শব্দ পৌঁছাতে পারেনা বিশ্বদেবতার কাছে। ছেলেটা একটু শান্তিতেও মরতে পারনা। ওর প্রাণবায়ু কখন হঠাৎ ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত দেহ ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে যায়। হারাণ বুকটা চেপে ধ'রে কেঁদে ওঠে ছেলেমানুষের মত। কি বলবো! কার বিরুদ্ধে কার কাছে কি নালিশ জানাবো! সান্ত্বনার ভাষা পাইনে খুঁজে। আস্তে আস্তে ফিরে আসি ঘরে। বুকটা আমারও যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। কোথায় এই রকম একটা আঘাত যেন পুরানো হ'য়ে শুকিয়ে এসেছিলো। সেটা আবার পুনরায় নূতন ক'রে জেগে ওঠে। কাঁদতে ইচ্ছা করে হাউ হাউ ক'রে হারাণের মতই। চুপ ক'রে বসে থাকি। ওদের কান্না যেন ক্রমশই আসে ফুরিয়ে।

(২)

সেদিন ছিলো রবিবার। বিকালের দিকে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম আমার বাড়ীর পাশেই যে মাঠটা এতদিন প'ড়েছিলো, সেখানে জনকয়েক সাহেব কি দেখছেন ঘুরে ফিরে। জানলাম ওঁরা ওখানে একটা চটকল বসাবার সঙ্কল্প করছেন। আমাদের এখানে পাটের চাষ হয় প্রচুর। সুতরাং অনায়াসে এখান থেকে চট্ তৈরী ক'রে সহরে চালান দিতে পারবেন। দু' একমাসের মধ্যেই নাকি এখানে উঠবে বিরাট এক চট্‌কল। কর্মক্লান্ত গ্রামের বুকে আবার জাগবে কোলাহলের ঝড়। আর এর কল্যাণে আমাদের অনাহারী মজুরদের মুখের গ্রাস হ'য়ে উঠবে সচল—সঙ্কল্পটা মন্দ নয়।

কিছুদিন পরে একদিন দেখা যায় সত্যিই ওখানে গ'ড়ে উঠলো বিরাট এক চট্‌কল। কুলি-মজুরদের হুল্লোড়ে আর চটকলের একঘেয়ে গোঁয়ান শব্দে জায়গাটা হ'য়ে উঠলো জীবন্ত। এতদিন মরা মানুষের মতই নিশ্চল হ'য়ে পড়েছিল জায়গাটা। কেবল সময়ে সময়ে নৈশ রাত্রির ভ্রাম্যমান পশুদের যাতায়াতে ওর সুপ্তিভরা নিস্তব্ধতা হ'য়ে উঠতো ব্যাহত, আবার কখনও বা রাতচোরা মানুষের এই রকম নিরিবিলিতে অভিযান পর্ব্ব সুরু হোতো, তাতে ওর কিছুটা অবকাশ হরত যেতো দিবে। চাষীদের খুব একটা সুবিধা হ'য়ে গেল। ওরা অন্যান্য চাষ ফেলে রীতিমতো পাট চাষ আরম্ভ ক'রে দিলো। হাতের কাছে এরকম আশাতীত দু'পয়সা নেবার আশা ওরা ত্যাগ করতে পারলোনা। সাহেব বাবুরাও তাদের চালের একটা ভালরকম ফসল দেখে বেশ একটু খুশী হ'য়ে উঠলেন। এটা নাকি ওঁদের শোষণ-নীতির একটা ভূমিকা।

চট্‌কলের কাছেই মাটির ঘরে বাস করে তেঁতুল আর কামিনী। বছর খানেক হোলো ওদের বিয়ে হয়েছে। সংসারে ওরা দুটী মাত্র প্রাণী। আগে তেঁতুল একাই খাটতো, বেশ চ'লে যেতো দুজনার। কিন্তু এখন আর চলেনা। চালের দর গিয়েছে অসম্ভব বেড়ে। তাই ওরা দুজনেই ওই চটকলে কাজ নিয়েছে।

সেদিন তেঁতুল একাই গিয়েছিলো কাজে। কামিনীর শরীরটা বেশ ভাল ছিলনা তাই ও যায়নি। ফড়িং এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো—সামনের দাওয়ায় কামিনী ছিলো ব'সে। বল্লো: কাজে যাস্‌নি তুই কামিনী? কামিনী ওর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বল্লো, না।

কেনরে?

—জ্বর হয়েছে।

আমারও কাল থেকে জ্বর হয়েছে। এগিয়ে এল ফড়িং। কামিনীর সুমুখে দাওয়ায় বস্‌লো। কামিনী ওর দিকে চাইতেই দেখ্‌লো ও হাস্‌ছে। বল্লো, হাস্‌ছিস যে বড়?

বারে! হাস্‌বোনা! তোরও জ্বর হয়েছে, আমারও হয়েছে তাই ভাবছি—

কামিনী উদাসভাবে বল্লো, হুঁ, তুই বাড়ী যা; তাড়ি খেয়ে এসেছিস্?

মাইরি বলছি খাইনি! সেদিনও তাড়ি খেয়ে তোদের বাড়ী গিয়েছিলাম—কই সেদিনত তাড়িয়ে দিস্‌নি। আমার কিন্তু মনে হয় সেদিনের মত মাতাল আমি রোজ রোজই হই। কিন্তু তুই ত আর এখন আমার নেই।

কোনদিনই বা তোর ছিলাম—ঝাঁঝাঁলো সুরে কামিনী বলে—

একটা বছর আগেকার কথা ফড়িংএর মনে পড়ে। কামিনী-দের বাড়ীর পাশেই ছিলো ওর বাড়ী। ছেলেবেলা থেকেই ওদের সঙ্গে ওর জানাশোনা। কামিনীর বাবা পাঁচকড়ি ছিলো ফড়িংএর জ্যাঠামশাই। ফড়িংকে ওদের বাড়ীর সবাই খুব ভালবাসতো। পাঁচকড়ির মেয়ের সঙ্গে ফড়িংএর যে বিয়ে হবে এ বিষয়ে আর কারুর মনে কোন সন্দেহই ছিলনা। তারপরে একদিন ফড়িংএর বাবা গেল মারা। সংসারের ভার এসে পড়লো ওর ওপর। পাঁচকড়িকে টাকা দিয়ে বিয়ে করাটা আর ওর পক্ষে সম্ভব হোলোনা। কিন্তু ফড়িং কোনদিনই ওর আশা ত্যাগ করেনি।

একদিন কামিনী গিয়েছিলো ঘাটে জল আনতে। ফড়িং তখন দাঁড়িয়েছিলো রাস্তার ওপর। কামিনী হঠাৎ ওকে অন্ধকারে দেখেই চম্‌কিয়ে গিয়েছিলো! পরে চিনতে পেরে বলেছিলো, ও! তুই—একটু হেসে আবার বল্লো আমি মনে ক'রেছিলাম অন্য কেউ।......

অন্ত কেউ হতে যাবো কেনরে ? তা তুই আমার একটা কথা শুনবি কামিনী ? কামিনী মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

তুই আমায় বিয়া করবিনে ?

ক'রবো ত ! তোর টাকা কোথায় ? পাঁচকড়িকে টাকা তুই কোথা হ'তে দিবি ?

আমি তোর পা ছুঁয়ে ব'লছি দু'মাসের মধ্যেই সব টাকার যোগাড় ক'রে ফেলব আমি। তুই ভাবিসনে কিছু !

ভাববো কেনরে ? তোর লেগে ? তারপর ওরা দুজনে দুপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আর আজকের কথা ভাবলে মনে হয় সে কামিনী যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ; ফড়িং ওখান থেকে উঠে বাড়ী চ'লে আসে।

সন্ধ্যার পর তেঁতুল ফিরে এলো চটকল থেকে জর নিয়ে। আগের দিনও ওর শরীরটা ভাল ছিলনা, তার ওপর হাড়ভাঙা খাটুনি। তাই আজ আর সামলাতে পারেনি। খাটুনির তুলনায় মজুরি কিছুই নয়, তবু যাহোক ঐ চট্কলের দৌলতে দুটো খেয়ে প'রে বেঁচে আছে ওরা। পাটের কুচিগুলো যখন নাকে মুখে এসে ঢোকে, তখন যেন দম্ আটকে আসতে থাকে। যন্ত্র দানবের সাথে সমান তালে চলতে হয় মাটীর গড়া এই নগণ্য মানুষকে। ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহজীবী মানুষ ; পণ্যমূল্য বিক্রী করে নিজেদের যক্ষ-কুবেরের পণ্যশালায়। কামিনী তাড়াতাড়ি তেঁতুলের গায়ের তাপ পরীক্ষা ক'রে ওকে শুইয়ে দেয় দাওয়ার ওপর। কামিনীর খুব মায়া হয় ওর দিকে চেয়ে। পাঁজরার হাড়গুলো সব গিয়েছে বেরিয়ে, একটা একটা ক'রে গোনা যায় যেন। শুধু কামিনীর জন্তই খেটে খেটে ওর চেহারাটা এরকম হয়েছে। আগে কি বলিষ্ঠ চেহারা ছিলো ওর। কামিনীকে কাছে ডেকে ও বলে—

আমি বোধ হয় আর বেশীদিন বাঁচবোনা, না রে ?

কামিনী মনে মনে শিউরে ওঠে ! ও কথা বলতে নেই। কেন তোর কি হয়েছে—জ্বর কি লোকের হয়না ?

তেঁতুল চুপ ক'রে কি ভাবে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে :

আমার থেকে থেকে মনে হয় কি যেন ভিতরে আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে—যেন কোন একটা রাক্ষস আমার হাড় মাংস সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, আর সেই সময় বুকটা আমার ধড়ফড় করে। তখন আমি আর দাঁড়াতে পারিনা।

কথা বলার পর ও হাঁপাতে থাকে শ্বাস-ওঠা রুগীর মত। কামিনী আস্তে আস্তে ওর বুকে হাত বুলোতে থাকে। ও যায় একসময় ঘুমিয়ে।

(৩)

আজকাল বিকালের দিকে রোজই যাই বেড়াতে নদীর ধারে। ভালও লাগেনা এই একঘেয়ে জীবন-যাপন ক'রতে। দেশব্যাপী হাহাকার প'ড়ে গিয়েছে। চাষী-মজুরদের কষ্টটাই হয়েছে সব চেয়ে বেশী। ধান হয়নি এবার মোটেই। সারাদিন খেটে যা পায় তা দিয়ে ওরা এক সের চালও কিনতে পারেনা। অথচ বাড়ীতে হয়ত চার পাঁচটী প্রাণী সারাদিন উপোষ ক'রে চেয়ে থাকে ওদেরই আশাপথের দিকে,—ওরা চাল নিয়ে ফিরবে তবে হাড়ি চাপ্‌বে। কাজের শেষে ওরা যখন বাড়ী ফেরে তখন ওদের দিকে চাইলে মনে হয় জীবন-সংগ্রামে ওরাই ক'রছে সংগ্রাম ! মরণকে কি রকমে ফাঁকি দিয়ে ওরা চলেছে সমুদ্র-মন্থনে। অমৃত পান ক'রে ওরা ফিরবে অমর হ'য়ে। ওদের প্রত্যেকেরই চেহারা দেখলে মনে হয় এককালে ওদের দেহে ছিল রসের সঞ্চার, আজ আর তা নেই। যেন ফেলে এসেছে ওই রক্ত-মাংসে-গড়া দেহটাকে যন্ত্রদানবের নীচে। পিষে গিয়েছে ওদের দেহ শুদ্ধ মন। নিংড়ে নিয়েছে শাঁসালো তাজা রক্ত, আর তাতেই হয়েছে প্রভুদের তৃষ্ণা নিবারণ।

মনে হয় আজ দেশে চালের দর এত বেড়ে গিয়েছে তার কি কারণ শুধু ওই জিনিষটার অভাব ! আজ যদি অনুকূল কুণ্ডু, ভজহরি সা, এদের আড়ত লুট করা যায়, বেরুবে না কি দু'পাঁচশো মণ চাল। তবে—পুঁজিবাদী মহাজনেরা রাখবে চাল জমিয়ে আড়ত ভর্ত্তি ক'রে, আর দেশের লোকে পাবে না খেতে, এতবড় অবিচার মানুষ সহ্য করে কি ক'রে ? ওই ধনতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কি কোন ব্যথাই লাগে না এই দেশব্যাপী হাহাকারে—?

নিতাই মাইতির দোকানে সন্ধ্যার সময় জমায়েত হয়েছিলো অনেকগুলি লোক। পাঁচু মণ্ডল ওদের মধ্যে থেকে বল্‌লো, এই যে এত অভাব দেখা দিয়েছে দেশে, রাজার কাছে এ সব জানালে কি কোন প্রতিকারই হয় না খুড়ো ?

—নিতাই বল্‌লো, প্রতিকার আর কি হবে।

ভিমু বাগ্‌দি বললো, কথাটা কেমন হোলো দাদা? এই সহজ জিনিসটা আর তোমরা বুঝলে না ! আমাদের একমাত্র রাজা আছেন ভগবান। তিনি যদি বাঁচান তবেই আমরা বাঁচবো ; নইলে নয়। কথাটা খুবই সত্যি। এই যে ওদের আড়তে এত চাল বাঁধাই আছে, তার একটা কণাও কি কেউ বার ক'রতে পারছে ? বার ক'রবে কারা ? এই যে শত শত মূক অসহায় প্রাণী না খেয়ে শুকিয়ে থাকে তবু কোন প্রতিবাদ করে না। নিরীহ ভাল মানুষটীর মত চোখ বুঁজে চুপ ক'রে থাকে—খেতে না পেলে ঘরে ব'সে কাঁদে, বাইরের জগতকে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না। সভ্য পৃথিবীর বুকে দিনের পর দিন সভ্য মানুষের দল আসে—তারা গ'ড়ে তোলে সভ্যতাকে আধুনিক ছাঁচে তাদের খুসী মত ; তাতে এই উলঙ্গ চাষী-মজুরদের কিছুই এসে যায় না। এরা খেতে না পেলে অপরাধীর মত চুপ ক'রে বসে থাকে আর সভ্য জগতের মানুষেরা খাওয়ার আধিক্যে মেদ বৃদ্ধি করে। অপরের ভাল দেখতে পারে না, তাই একে বন্য পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যের ওপর, দিনের পর দিন চালায় অভিযান—জীবনের অপব্যয় করে ইচ্ছামত—তবু ত ভোগ ক'রতে দেয় না অপরকে।

ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারেই এসে পড়েছি কোন সময়। দেখি ওদের ঘরের সব ছোট ছোট বৌয়েরা জল আন্‌তে চলেছে। শতছিন্ন কাপড়ে বাইরের লজ্জাকে ঢাক্‌বার চেষ্টা করে ওরা, কিন্তু দৈন্য ওদের ভিতরের লজ্জাকে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যায়। ওই যে ক্ষীণকায় মূর্ত্তিগুলো পিঁপড়ের সারি দিয়ে চলেছে—দেখে মনে হয় কত অসহায় ওরা ! কি ভীরু চাহনি, আর কি সন্তর্পণ পদক্ষেপ ! রাস্তা দিয়ে চ'লে যাই আমি, ওরা দাঁড়ায় পাশে আমারই দিকে পিছন ক'রে। ছেঁড়া কাপড়টাকে অকারণে

একস্থান হ'তে অন্যস্থানে টেনে এনে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করে! পারে না, এক জায়গায় ছেঁড়াকে ঢাকতে গিয়ে অন্য জায়গায় ছেঁড়াকে বড় ক'রে তোলে। আমার চোখে ভেসে ওঠে ওদের নগ্নরূপ, দারিদ্র্যের উলঙ্গ প্রকাশ। ওদের যৌবনপুষ্ট তনু অকালে রসের অভাবে কুঁচকে শীর্ণ হয়ে যায়—দেখলে চোখে জল আসে। এই আমাদের নির্য্যাতিতা উপেক্ষিতা বাংলার বধূ। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মতই এরা সকল অত্যাচার, অবিচার নীরবে সয়ে যায়। এদের না আছে অনুভূতি—না আছে হৃদয়াবেগ—না আছে ভাল-মন্দ বিচার ক'রবার শক্তি। সমাজ এদের পা ভেঙে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, প্রতিবাদ করবার ভাষা দেয় নি মুখে, শুধু রেখেছে দুটো সজল আঁখি আর তার কাতর চাহনি। অথচ এরাই যুগ যুগ ধ'রে ধৈর্য্য ধ'রতে শিখিয়ে আসছে মানুষকে—কখনও বা সীতারূপে, আবার কখনও বা সাবিত্রীরূপে এসে এরাই আবার এক সময় বেহুলা হ'য়ে আমাদেরই ঘরে আসে—লখীন্দরকে বাঁচাবার জন্য, আবার দময়ন্তীর মত বনে বনে স্বামীর সন্ধানে ঘোরে—তবু নিজেদের বাইরের জগতের কাছে বিলিয়ে দেয় না। এদেরই কথা ভাবতে ভাবতে চলি বাড়ীর দিকে—পথে তেঁতুলের বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়াই; দেখি অন্ধকারে কে যেন ওদের ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করি, কে?

থতমত খেয়ে উত্তর দেয়—আজ্ঞে; আমি ফড়িং।

এত রাত্রে তুই এখানে?

আজ্ঞে; তেঁতুলের জ্বর কিনা তাই দেখতে এসেছি।

জানি ও কাকে দেখতে এসেছে। ওর কুৎসিত দৃষ্টি বাড়ীর চারিপাশে কাকে খুঁজছে তাও জানি। যৌবনরূপী এই আত্মঘাতী টর্পেডো কোন মালবাহী জাহাজকে তলিয়ে দেবে তাও জানি। আজকে মানুষ খেতে না পেয়ে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ফিরছে, আর ও এখানে কিসের ক্ষুধা মিটাতে এসেছে? বাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিই।

(৪)

দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মানুষ রোগে, শোকে, অনাহারে নানা ভাবে মারা যাচ্ছে। মহামারী আরম্ভ হ'য়েছে। দেশে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। চাষীদের মধ্যে যারা কিছু ছোলা পেয়েছিলো জমিতে, তারা ছাতু খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। ভাতের আস্বাদ অনেকদিন হয় ভুলে গিয়েছে। ছাতু খেয়ে লোকে কলেরায় ভুগছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সমান তালে চলেছে। পাট চাষ ক'মে যাওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে চটকল উঠে গিয়েছে। মানুষ বাঁচবার কোনও উপায় না খুঁজে পেয়ে পাঁচ সাতটা ইউনিয়ান থেকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লেখা হোলো, 'দেশের লোক না খেয়ে, অখাদ্য খেয়ে মহামারীতে উজাড় হ'তে চলেছে। এর একটা কোন আশু ব্যবস্থা না ক'রলেই নয়'। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে 'রিলিফ-কমিটি' গঠন ক'রতে। যথা সময়ে প্রত্যেক ইউনিয়ানে 'রিলিফ-কমিটী' পাঠান হোলো—তাঁরা 'রিলিফ-কাণ্ড' নিয়ে দেশের লোকের মধ্যে অমৃত ভাগ ক'রতে এলেন। মেয়ে পুরুষ ও বালক প্রত্যেকেই পাবে কাজ। গ্রামে যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা প্রতি বর্ষাতেই খারাপ হ'য়ে যায়, সেটাকে পাকা করবার ব্যবস্থা হোলো। প্রতিদিন প্রত্যেক ইউনিয়ানে প্রায় হাজার লোক কাজ পেলো। সারা দেশে যে অর্থসমস্যা দেখা দিয়েছিলো, তা আংশিক ভাবে দূর হোলো। দেশের লোক তবুও একবেলা খেয়ে বাঁচবার পথ দেখলো।

আজ ক'দিন থেকেই তেঁতুলের অসুখটা যেন বেড়েই চলেছে। বুকজুড়ে কাশি—তবু কামিনীকে একাই যেতে হোলো কাজে। কতদিন আর না খেয়ে থাকতে পারে! হোলোই বা সে একা—সে কি কাউকে ভয় করবে নাকি? এই যে এত অভাব দেখা দিয়েছে, তবু ত কারুর কাছে ও হাত পাতে নি। ফড়িং নিজে সেধে ওকে টাকা দিতে এসেছিলো। ও নেয় নি। জানে ফড়িং কেন ওকে টাকা দিতে চায়!

কাজ থেকে ফেরবার পর তেঁতুল ওকে বারণ করলো, তুই আর ওখানে কাজে যাসনে কামিনী! কামিনীও কারণটা বোঝে। মানুষগুলো ওর দিকে যে রকম বিশ্রীভাবে তাকায়—যেন ওকে গিলে খেতে চায়। কামিনী ওসব গ্রাহ্য করে না—কাজ না ক'রলে কি উপোস ক'রে মরবে?—যে যা করে করুক; সেদিকে ওর তাকাবার সময় নেই। কিন্তু এভাবেও ওর বেশী দিন যায় না।

রাস্তার কাজ এক সময়ে যায় ফুরিয়ে। আবার কোথায় এসব লোক লাগবে তারই একটা 'প্ল্যান' আঁটা হয়। এদিকে কামিনী যা পেত তা ওর একলার পক্ষেই যথেষ্ট নয়; তার ওপর আবার রুগ্ন তেঁতুল! আজ দুদিন যাবৎ কাজ নেই ওর হাতে। কাল থেকে আবার আরম্ভ হয়েছে ওদের দুজনের উপোস, তেঁতুলের জন্যই ওর যত ভাবনা—

সন্ধ্যার পর ফড়িং ওদের বাড়ীতে আসতেই ও সোজাসুজি ওর কাছে দুটো টাকা চেয়ে ব'সলো। ফড়িংও নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রলো। টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফড়িং যে কদর্য্য ইঙ্গিত ক'রলো তাতে কামিনী চমকে গেল না বটে, কিন্তু কোথায় যেন খুব বড় রকমের একটা আঘাত পেলো। মাত্র হাড় কখানি বুকে ধ'রে শুয়ে আছে তেঁতুল, ওর দিকে চেয়ে কামিনীর চোখে জল এল। কামিনী তেঁতুলকে আস্তে আস্তে ঘুম পাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যে ক্ষুধার তাড়নায় ফড়িং আজ দুমাস যাবৎ সময়ে অসময়ে তেঁতুলের বাড়ীর চারিপাশে ঘুরছে, সে ক্ষুধা হয়ত কামিনীর খুব বেশী ছিল না—কিন্তু পেটের ক্ষুধাকে কামিনী জয় করে কেমন ক'রে? বিশেষ ক'রে তেঁতুলের মুখের দিকে চেয়ে ও তাকে অস্বীকার করতে পারে না।



স্বর্ণ বিক্রয় সমস্যা (২)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

যবনিকার অন্তরালে

আমেরিকা ও ইংলণ্ড ভারতে তাদের যুদ্ধ ব্যয় সোনা দিয়ে মিটাচ্ছেন একথা শুনতে খুব মধুর হলেও এর পিছনে যে লুকোচুরির খেলা চলছে তা যেমনই কৌশলপূর্ণ, তেমনই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে সোনার মূল্যকে এদেশে আন্তর্জাতিক মূল্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। কাজেই ওসব দেশে সোনার দাম কম হলেও এদেশে তার প্রভাব পড়তে পারে না। এইভাবে কৌশলে ভারতবর্ষে সোনার মূল্যকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়ে রেখে ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে এই বর্দ্ধিত মূল্যে আমাদেরই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফত স্বর্ণ বিক্রয়ের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি, আমেরিকা আমাদের দেশ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা দরে গত ১০।১২ বৎসর ধরে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ কিনে নিয়েছে। আজ সেই সোনাই আবার ভারতে সত্তর—পঁচাত্তর টাকায় বিক্রী করে যে আড়াইগুণ লাভ করছে তা দিয়েই সে তার এখানকার খরচ চালাবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। ঘরের থেকে একপয়সাও দিতে হল না, মাঝখান থেকে ফাটকা লাভের টাকায় বিদেশে সৈন্য সামন্তের এত বড় একটা খরচও চলে যাবে। আমাদেরই টাকায় আমাদেরই ঋণ পরিশোধ করার এত বড় একটা সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করা তাদের মত বুদ্ধিমান জাতের পক্ষে অসম্ভব। কথায় বলে,

যার শিল, যার নোড়া,
তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

ইংলণ্ডের পক্ষেও সেই একই কথা। সে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রতি আউন্স সোনা ১৭১ শিলিং দরে কিনে, ভারতে ৩২০ শিলিং দরে বিক্রী করে সেই লাভের টাকায় ভারতে তার যুদ্ধের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ করছে। সে দেশে আজ সোনার দর ভরি প্রতি প্রায় বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ টাকা। সুতরাং দেশের বাজারে সোনা কিনে ভারতে বিক্রী করলেও তাতে তাদের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ টাকা লাভ থেকে যায়।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার জেরেমী ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জোন্স দুজনেই আলোচনা কালে স্বর্ণ বিক্রয়ের প্রশংসা করে বলেছেন যে এতে করে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার হবে। কারণ এই সোনা প্রচুর পরিমাণে কৃষকদের হস্তগত হচ্ছে, কাজেই যুদ্ধের বাজারে যে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা কৃষককুলের হস্তগত হয়েছে, তা এই ভাবে স্বর্ণে নিয়োজিত হওয়ায় ঐ অর্থ অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে তাদের মূল্য বৃদ্ধি করার সুযোগ পাচ্ছে না। এখানে প্রশ্ন দুটি। প্রথম, যুদ্ধে কৃষকের উন্নতি হয়েছে কিনা, তা এখনও সন্দেহজনক। লেখকের মতে কৃষি উন্নতির গালভরা কথা একেবারেই কাল্পনিক এবং এর বিরুদ্ধে আমি বহু যায়গায় বলেছি ও লিখেছি।* দ্বিতীয় কথা, এই স্বর্ণ প্রকৃতই কৃষকের হস্তগত হচ্ছে কিনা। গত মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে যে ভাবে অকস্মাৎ সোনার দর হু হু করে বেড়ে গেল, তাতেও স্পষ্টই মনে হয় যে এর ক্রয়-বিক্রয় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ফাটকাবাজ ব্যক্তি ও যুদ্ধে রাতারাতি বড়লোকদের মধ্যেই বিশেষ করে সীমাবদ্ধ।

উচিত মত কার্য্য হত যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ ইংলণ্ডের ও আমেরিকার মাত্র এজেন্টের কাজ না করে সে নিজেই ওদের থেকে ওদেশে প্রচলিত মূল্যে সোনা কিনে নিয়ে আমাদের এখানে বিক্রী করত। এতে যে লাভ থাকত তাতে করে আমাদের উপর করের বোঝাও কিছু কমত এবং এই লাভের টাকা যদি যুদ্ধের পর আমাদের আর্থিক উন্নতির বাবদ সরিয়ে রাখা হয় তা 'হলে বর্ত্তমানে মুদ্রাস্ফীতিরও কিছু উপশম হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যখনই ভারতের কোন লাভের কথা আসে, আমাদের কর্ত্তাদের যেন সেই সময় বিশ্ব-প্রেম উথলিয়া উঠিতে থাকে। এই স্বর্ণ বিক্রয়ের সম্বন্ধে আলোচনা কালে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত ২৭শে মার্চ্চের অধিবেশনে অর্থসচিব স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে ভারত এই প্রচণ্ড সংগ্রামে মিত্রপক্ষের সঙ্গে আর্থিক আদান প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে কখনই বেণে-মনোভাবাপন্ন হয়ে চলতে পারে না—"India's financial obligations were those of an ally and not of a bania".

খুবই ভাল কথা! জিজ্ঞেস করি এই বেণে-বুদ্ধি আজ কাদের মধ্যে প্রবল, আমাদের না মিত্রপক্ষীয়দের? কৃত্রিম উপায়ে ভারতে সোনার দর চড়িয়ে রেখে অন্য দেশের সস্তার সোনা এদেশে এই দুর্দ্দিনে প্রায় আড়াইগুণ মূল্যে বিক্রী করায় শুধু যে বেণে ভাবই প্রকাশ পায় তা নয়, এ যে একটা ফাটকাবাজী বুদ্ধিও বটে। আমরাও ত মিত্রপক্ষের একজন। আমাদের মাথায়ই বা কাঁঠাল ভাঙ্গার এত বড় একটা সুব্যবস্থা কেন? অর্থ সচিবের এই বৈষ্ণব-মন বছর দুই-তিন পূর্ব্বেই বা কোথায় ছিল? ১৯৪০-৪২ সনে ইংলণ্ড যখন আমাদের দেশ থেকে রূপা কিনতে আরম্ভ করে, সে সময় সে দেশে রূপার দাম বেশী থাকলেও আমাদের দেশে তখন প্রচলিত সস্তা দামেই তারা তা কিনে নেয়। রূপার বেলা যে বন্দোবস্ত হয়েছিল, আজ সোনার বেলায় সে বন্দোবস্ত না হয়ে তার বিপরীত পন্থাই বা কেন করা হল? এ সব হল তর্কের জিনিষ, বৈষ্ণব ভাবের বিরোধী। তাই কর্ত্তারাও এ সম্বন্ধে নিরুত্তর। তাঁদের মতে,

ভক্তিতে মিলয়ে বস্তু
তর্কে বহুদূর।

তবে হাঁ, অর্থসচিব সম্প্রতি একটা উত্তর দিয়েছেন বটে। তিনি জানিয়েছেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচ্চ দরে এদেশ থেকে জিনিষ পত্র কিনছে, স্বর্ণ বিক্রয়ের দর সেই হিসেবে এখনও কম রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে পাটজাত ও তুলাজাত দ্রব্য এবং গম, আটা প্রভৃতি কণ্ট্রোল দরে কিনেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রায় যুদ্ধ পূর্ব্বের দাম অপেক্ষা শতকরা একশত টাকা বা আরোও বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। সে যায়গায় সোনা মাত্র শতকরা সত্তর টাকা বেশী দরে বিক্রয় হচ্ছে। অর্থসচিবের এ যুক্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে খুবই চমৎকার মনে হলেও এরমধ্যে প্রকাণ্ড এক গলদ রয়ে গেছে। এখানে এই দুরকম দ্রব্যের দাম কম বেশীতে কিছু আসে যায় না। প্রশ্ন হল লাভের পরিমাণের। সোনা বিক্রী করে বিদেশীরা যে শতকরা সত্তর টাকা লাভ করল, সেটা হল একেবারে তাদের নীট মুনাফা। কিন্তু ভারতবাসী কণ্ট্রোল দরে যুদ্ধ পূর্ব্বের মূল্য হতে শতকরা একশত টাকা বেশী দরে মাল বিক্রয় করল বলেই যে তাদের সেই একশত টাকাই লাভ রয়ে গেল তাত আর নয়। সে মালের তৈরী খরচও বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সুতরাং লাভও স্বর্ণের তুলনায় খুবই সামান্য।

তারপর তারা এদেশ থেকে মাল কিনছে কণ্ট্রোল দরে। সোনায়

---

* লেখকের লিখিত *Modern Review*, March, 1944 এ "The Agricultural Income-tax" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

যেলোই বা সে রকম কন্ট্রোল দর বেঁধে দিয়ে সেই দরে তাদের সোনা বিক্রী করতে বাধ্য করা হবে না কেন ? উপযুক্ত পন্থা হল, আমরা কন্ট্রোল দরে তাদের নিকট মাল বিক্রী করে যে লাভ করি মোটামুটি একটা আন্দাজ করে, ওদের দেশে সোনার প্রচলিত দামের উপর সেই পরিমাণে লাভ বসিয়ে, এই দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত সোনা কিনে নেওয়া উচিত। তা হলে আমাদের ঘরের টাকা অনেক পরিমাণে ঘরেই থেকে যায়।

এই স্বর্ণ বিক্রয়ের পশ্চাতে আর একটা উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। স্বর্ণ দিয়ে ভারতের আংশিক পাওনা না মিটালে ইংলণ্ডকে সেই পরিমাণে ষ্টার্লিং দিয়ে তা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ষ্টার্লিংএর বোঝা আজ ইংলণ্ডের ঘাড়ে এতই চেপে গেছে যে যুদ্ধের পর এত ঋণ পরিশোধ করতে তাকে যথেষ্টই বেগ পেতে হবে। সুতরাং সস্তার সোনা অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে বিক্রী করে ঋণ পরিশোধের পন্থাটিকে তারা কোন মতেই তাচ্ছিল্য করতে পারে না।

শুধু যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা আজ সস্তায় কেনা সোনা বেশী দামে ভারতে বিক্রী করে লাভবান হচ্ছে তাই নয়; যুদ্ধের পর যখন সোনার দাম পড়ে যাবে, সে সময় কোন কৌশলে এই সোনাই আবার কিনে নিলে, তাদের ঘরের সোনা আবার ঘরেই ফিরে যাবে। মাঝখানে ফাটকা লাভের প্রচুর অর্থে এদেশে তাদের যুদ্ধের ব্যয় অনেক পরিমাণে মিটে গেল।

স্বর্ণ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেওয়া সরকারের কর্ত্তব্য

(ক) পূর্ব্বেই বলেছি কি কারণে আজ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ থেকে সোনার দর অনেক কম। ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানির উপর নিষেধ উঠে গেলে ওদেশের সস্তার সোনা প্রচুর পরিমাণে এদেশে আমদানি হতে থাকবে। এই ভাবে সোনার যোগান (supply) বেড়ে গেলে, এদেশেও তার দর কমে যাবে। সুতরাং মিত্রপক্ষও আর ফাটকা লাভের সুযোগ পাবে না।

সোনার দাম পড়লে, তার দেখা দেখি অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও কিছু কমার সম্ভাবনা। অতএব সোনার উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে এতে মুদ্রাস্ফীতিরও কিছু প্রশমন হবার আশা আছে।

(খ) বৈদেশিক বাট্টার হার (Foreign Exchange Ratio) কমিয়ে দেওয়া :—

বর্ত্তমানে বিলেতের সঙ্গে আমাদের টাকার মূল্য ৬ পেনি (অর্থাৎ ১৮ পেনি) দরে বাঁধা আছে। যুদ্ধে মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে টাকার অপচয় (depreciation) ঘটায় এ দেশে দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেছে অর্থাৎ ভারতীয় টাকার মূল্য কমে গেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে দ্রব্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাদের পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর মূল্য বিশেষ কমে নাই। সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বে ওদেশে ১ শিলিং ৬ পেনি দরে যে জিনিষ পাওয়া যেত তার মূল্য এদেশে এক টাকা থাকলেও আজ আর তা নেই। আজ এদেশে এক টাকায় তার চেয়ে অনেক কম জিনিষ বা স্বর্ণ পাওয়া যায় অর্থাৎ ততখানি দ্রব্য বা স্বর্ণ কিনতে হলে আজ এদেশে এক টাকার থেকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। সুতরাং সেই হিসেবে এখন এক টাকার বৈদেশিক বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি থেকে অনেক কম হওয়া উচিত। কিন্তু সরকার এখনও উক্ত হারই বজায় রেখেছেন। অধুনা একটি পুস্তিকায় * আমি দেখিয়েছি যে টাকার উক্ত মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হতে নেমে মাত্র ১০ পেনিতে দাঁড়িয়েছে এবং বর্ত্তমানে টাকার বাস্তবিক মূল্য ঐ দশ পেনিই হওয়া উচিত। আজ যদি তা করা হয় তবে এদেশে সোনা বিক্রী করে বিদেশীদের আর লাভ থাকে না। কারণ দশ পেনিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ওদেশে পাওয়া যায়, এদেশে সেই পরিমাণ স্বর্ণের দাম হল আজ এক টাকা। কাজেই ওদেশের খরিদ বা প্রচলিত মূল্য ও এদেশের বিক্রয় বা প্রচলিত মূল্যে কোন পার্থক্য না থাকায় সেখানে লাভ করাও আর তাদের বরাতে হয়ে উঠবে না।

(গ) গভর্ণমেন্টের রৌপ্য বিক্রয়

(গ) পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে গত মার্চ্চের শেষের দিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট পারস্য দেশ থেকে ৫০০ টন রূপা এনেছেন। সকলেই আশা করেছিল যে এই রূপা সরকার এবার বাজারে বিক্রী করবেন। কিন্তু আজ অবধি তা হয়ে উঠেনি এবং জানা গেল যে রূপা নাকি মুদ্রার জন্ত ব্যবহৃত হবে। সত্য বটে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রৌপ্যের তহবিল খুবই কমে গেছে। ঠিক কতটা কমেছে, তা আমাদের বুঝবার উপায় নেই ; কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে এক টাকার নোটকেও রূপার তহবিলের সঙ্গে একই হিসেবে দেখান হয় এবং আমাদের মনে হয় উক্ত তহবিলে এক টাকার নোটের অঙ্কটাই খুব বেশী। যা হোক, গবর্ণমেণ্টের এখন আরো রূপা যোগাড় করে বাজারে বিক্রী করা উচিত। বর্ত্তমানে সোনার দরে ও রূপার দরে এখনও তারতম্য দেখা যায় ও প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির দর বেশী। সরকার রূপা বিক্রী করলে, রূপার দামও কিছু কমার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ রূপা কেনাটাকে বেশী সুবিধাজনক বলে মনে করে। এই রৌপ্য বিক্রয়ে মুদ্রাস্ফীতিরও প্রশমন হবে।

(ঘ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ খরিদ

(ঘ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ খরিদ—ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে এ দেশে সোজাসুজি স্বর্ণ বিক্রয় করতে না দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয় সোনা বিক্রি করে তার জন্ত ভারত গভর্ণমেন্টকে তাদের বাধ্য করা উচিত। এর জন্ত মোটামুটি এইভাবে একটা দর ঠিক করে নিলেই চলবে। ওদের দেশে বর্ত্তমানে সোনার যে দর প্রচলিত আছে তার উপর এদেশে ওদের নিকট মাল বিক্রী করে বর্ত্তমানে আমাদের যে পরিমাণ লাভ থাকে তার একটা মোটামুটি হিসেব সেটা যোগ করে নিয়ে সেই দরে ওরা যত সোনা দিতে চায় সমস্তই কিনে নিলে চলবে। ধরুন, ওদের দেশে যদি এখন ৪২ টাকা সোনার ভরি হয় তবে ২।৩ টাকা আনবার খরচ এবং শতকরা প্রায় ১০।১২ টাকা লাভ ধরলে, আরো ৫।৬ টাকা লাভ রেখে, এই ৫০ টাকা দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইংলণ্ড ও আমেরিকার নিকট থেকে সোনা কিনে নিতে পারে।

এই সোনার কিছু অংশ ভারত সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশে ৫৫ বা ৬০ টাকা দরে এ দেশবাসীর নিকট বিক্রী করতে পারে। এতে ভারত সরকারের যে লাভ রইল, তাতে আমাদের উপর করের বোঝাও কিছু কমবে এবং এই লাভের টাকা যদি যুদ্ধের পর দেশের আর্থিক উন্নতির জন্ত এখন থেকে সরিয়ে রেখে দেয় তবে মুদ্রাস্ফীতিরও কিছু প্রশমন হবে। বাকী অংশ দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব স্বর্ণ তহবিল বৃদ্ধি করতে পারে। আজ কাগজী মুদ্রা বা নোট এত অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে যে এর পশ্চাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে সোনা জমা ছিল, তার পরিমাণ এতই কমে গেছে যে তা আজ শতকরা পাঁচ ভাগেরও কম। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার স্বর্ণতহবিল বৃদ্ধি করতে পারলে মুদ্রা বা কারেন্সীর উপর লোকের আবার আস্থা ফিরে আসবে এবং তা করবার এই হল সুবর্ণ সুযোগ।

শুধু এই নয়। যুদ্ধের পরে আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। তখন সরকারের হাতে সোনা থাকলে অনেকটা খরচ উঠে যাবে। ভারতের আটজন মুখ্য ব্যবসায়ী মিলে এই সেদিন ভারতের জন্ত যে একটি আর্থিক পরিকল্পনা (Economic develop-

---

* *The Ten Pence Rupee* (Student Friends, Allahabad, -181-)

ment plan) করেছেন, তাতেও তাঁরা প্রয়োজনীয় দশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে তিনশ কোটি টাকা দেশের এই সোনার থেকে যোগাড় করবার হিসেব দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁদের এই পরিকল্পনা সমালোচনাকালে দেখিয়েছি * কি করে তাঁদের এই তিনশ কোটি টাকার সোনা দেশবাসীর নিকট থেকে তখন যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

যুদ্ধের পর নিকট ভবিষ্যতে সোনার দাম বাড়বার কোন কারণই নেই। সুতরাং লাভের আশায়ও দেশবাসীরা সরকারের নিকট সরকারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সোনা বিক্রী করবে না। কিংবা নিকট ভবিষ্যতে খুব একটা আর্থিক সঙ্কট বা দুর্দ্দিনের আশাও কম; সুতরাং গত ১৯২৯ সাল থেকে আরম্ভ হওয়া দুর্দ্দিনেও লোকে পেটের দায়েও সোনা বিক্রী করবে না। কাজেই এখন থেকে ভারতীয় সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি ঐ পরিমাণ সোনা মজুত বা জমা করে রাখে তবে সেই সময় প্রয়োজন মত সেই সোনা দ্বারা অর্থ যোগাড় করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

অবশেষে আমেরিকাকেও ভেবে দেখা উচিত যে ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল দেশের জন্ত তাঁরা যে এক কারেন্সী প্ল্যান করেছেন তাতে যদি যুদ্ধের পর ভারতকে যোগদান করতে হয়, তবে উক্ত প্ল্যানের নিয়মানুযায়ী এ দেশকে অনেক সোনা কারেন্সী প্ল্যানের তহবিলে জমা রাখতে হবে। আজ যদি আমেরিকা তাই' এ দেশে সোজাসুজি স্বর্ণ বিক্রয় না করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ভারতীয় সরকারের নিকট তা বিক্রী করে তবেই আমাদের পক্ষে তাঁদের সেই কারেন্সী প্ল্যানে যোগদান করা সম্ভব হয়ে উঠবে। নইলে এত সোনা আমাদের সরকার কোথায় পাবে?

একটা কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। যুদ্ধের পর মুদ্রাস্ফীতি কমলেও ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এবং এই প্রবন্ধে যে সব কারণ আলোচনা করা হল সেই সব কারণে ভবিষ্যতে অন্যান্য জিনিষের সহিত সোনার দরও নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। সুতরাং যাদের মধ্যে আজ অন্যের মত এত উচ্চ মূল্যে স্বর্ণ মজুতের স্পৃহা দেখা যাচ্ছে, তাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে একটা অহেতুক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হয়ে সোনা জমিয়ে শেষকালে যদি দেখা যায় যে তার মূল্য বহুল পরিমাণে পড়ে গেছে, তবে আর আপশোষের অবধি থাকবে না।

* লেখকের লিখিত *Amrita Ba ar Patrika*, (Northern India Edition) March 12, 1944. "Economic Development Plan and the Problem of Finance", প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

মাতাল

শ্রীবিমল সেন

কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া 'তা' নয়', 'তা হইতেই পারে না' প্রভৃতি কথা বলিয়া মনকে চোখ ঠারিবার চেষ্টা করিয়া শেষে স্বীকার করিতেই হইল যে, আমার সেই সাময়িক অনিদ্রার একমাত্র কারণ হইতেছে, পার্শ্বপ্রদেশে গৃহিণীর অনুপস্থিতি।

তিনি গোঁসা করিয়া অন্য ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন!

কথাটা স্বীকার করিয়াই লজ্জিতভাবে আবার মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিলাম—গুপ্-গে! ঐ ঘরে ইঁদুরগুলো যখন হুড়মুড় করিয়া এটা-সেটা ফেলিতে আরম্ভ করিবে এবং তিনি যখন ব্যাপারটাকে মুখোসপরা-খুনে-ডাকাতদের-আক্রমণ সন্দেহ করিয়াই ছুটিয়া আসিয়া পুনরায় এই বিছানায় উঠিবেন এবং আমাকে পাড়ার লোক ডাকিতে বলিবেন—তখন আমি একটি কথাও কহিব না। বরং, আরও জোরে নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘর কাটাইতে থাকিব।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল।

সহসা আমাদের সামনের গলি হইতে কে যেন পুরুষকণ্ঠে অত্যন্ত সন্তর্পণে ডাক দিল—সুচি!

সুচি আমার গৃহিণীর ডাক নাম।

মিনিটখানেকের পরই আবার. শোনা গেল—অ-সুচি, চুপটি করে উঠে এসে দোরটা খুলে দাও দিকি···খুব আস্তে!

উঠিয়া বসিলাম। এদেশে গৃহিণীকে ঐ নামে ডাকিবার মত লোক এক আমি ছাড়া আর তো কেহই নাই। তাহা ছাড়া কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম লোকটা মদ খাইয়াছে—মাতালদের মত জড়ান কথা।

—খুব সাবধানে কিন্তু সুচি! তোমার পাশের ঐ গোঁয়ার-গোবিন্দটি যেন টের না পায়। তাহলে কিন্তু স-স-ব্বোনাশ!

জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নীচেই একটি 'অন্ধ গলি।' আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটার ঠিক মাঝখান দিয়া এই গলিটি অপরদিক অবধি গিয়া শেষ হইয়াছে। বাড়ীটাতে ছোট ছোট অনেকগুলি ফ্ল্যাট্ আছে। সেই সব ফ্ল্যাটে যাইবার সদর দরজা এই গলির ভিতরই। জনসাধারণের যাতায়াতের পথ ইহা নহে। গলির ভিতর আলোর ব্যবস্থা নাই। দোতালার জানালা হইতে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, লোকটা আমাদেরই ফ্ল্যাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐভাবে ডাকিতেছে।

লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মাতাল হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হই;—গুণ্ডা বদ্‌মায়েস জাতীয় নহে। তখন শীতকাল। কিন্তু ওভার-কোটটা 'দলা পাকাইয়া' বগলে চাপিয়াছে। পরণে 'শ্লীপিং'-স্যুটের পাত্‌লুন। বয়স্ক লোক আমাদের নীচের বৈঠকখানার বন্ধ জানালার গরাদে ধরিয়া সে অসম্ভব টলিতেছিল। মনে হইতেছিল, যে-কোন মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইতে পারে।

আশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু তদপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক আশ্চর্য হইলাম যখন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাশের ঘর হইতে গৃহিণীর ভীত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'কে?'

লোকটা বলিল—আহা, আস্তে···আস্তে···

—কাকে চান? (গৃহিণীরই কণ্ঠস্বর)

—তোমাকে। নীচে এসো।

—কে আপনি? কি চান এখানে? (কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর)

—আহা, আমি গো-গোইন্দো গো!. চিনতে পারছ না? উঠে এসো চুপি চুপি।

আর চুপ করিয়া থাকাটা ভাল মনে হইল না। পুরুষকণ্ঠে হুকার ছাড়িলাম—কে আপনি, মশাই?

—আমি গোইন্দো।

—তা তো বুঝলুম ; কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছি না। কোত্থেকে আসছেন ?

লোকটা উত্তর দিল—তুমি কে, বাওয়া ? অত চেঁচাচ্ছ কেন ? পাড়ার লোকে টের পাবে যে !…সুচিকে ডাকো…তার 'হাসব্যাণ্ড' যেন টের না পায়।

হঠাৎ খেয়াল হইল, লোকটা নিশ্চয়ই বাড়ী ভুল করিয়াছে। ফ্ল্যাটগুলি একই ধরণের। আমাদেরও অনেকবার ভুল হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে অনুভব করিলাম, গৃহিণী আসিয়া আমার কচ্ছ-লগ্ন হইয়াছেন। ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—ওগো, লোকটা নিশ্চয়ই কোন গুণ্ডো-টুণ্ডো হবে। সামনের বাড়ীর অতুলবাবুদের ডাকো শীগ্‌গীর…

যাক, গৃহিণীর 'গোঁসা' ঘুচিয়াছে। অন্ততঃ আজ রাত্রে আর একলা শুইবার সাহস হইবে না। খোস-মেজাজে বলিলাম—নাঃ, গুণ্ডো নয় ; বাড়ী ভুল করেছে, তুমি তো পাড়াময় ঘুরে বেড়াও, এ গলিতে সুচি নামে আর কেউ আছে নাকি ?

—কৈ না তো ! বলিয়াই কিন্তু তিনি আমার কাছা ছাড়িয়া দিলেন। কণ্ঠস্বরও একমুহূর্তে বদ্‌লাইয়া গেল। কহিলেন—ও, আমি বুঝি সারাদিন পাড়াময় টো টো করে ঘুরে বেড়াই ? সাত্‌টা দাসী-চাকর আছে কি না যে, আমার আর খেয়ে কাজ থাকে না…

বলিতে বলিতে বীরবিক্রমে পুনরায় পাশের ঘরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অথচ, আমি সরল মনেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম !

—আঃ, অ-সুচি ! আসছ না কেন ? ঠাণ্ডায় হিম হয়ে গেলুম যে, বাওয়া ! মেজাজ হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেল। বলিলাম—মশাই, ভাল চান তো সরে পড়ুন—বাড়ী ভুল করে এখানে আর হল্লা করবেন না।

লোকটা বলিল—বাড়ী ভুল ? কে বল্‌লে ? এই বাড়ীই তো ; আমার হবে বাড়ী ভুল ?

গোলমাল শুনিয়া পাশের বাড়ীর অতুলবাবুও তাঁহার দোতালার ঘরের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার কাছে ব্যাপারটা সব জানিয়া লইয়া বলিলেন—নেমে এসো না। দেখা যাক, ব্যাপার কি।

হ্যারিকেন হাতে লইয়া নীচে আসিলাম ; অতুলবাবুও আসিলেন। লোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'দেখুন, এখানে ও নামে তো কেউ নেই। আপনি'…লোকটা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। সামলাইয়া লইয়া বলিল—'নিশ্চয়ই আছে…এই বাড়ীতেই থাকে।…কিন্তু, আই অ্যাম্ ভেরি সরি, এত রাত্রে আপনাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম !'

অতুলবাবু বলিলেন—আপনি ভুলই করেছেন। পাশেই ঠিক এই রকমের আর একটা গলি আছে। হয়ত, সেখানে…

—নো, স্যার ! দিস্ ইস্ দি হাউস্ !…অ, সুচি, এসো না ভাই ! কী মুস্কিলে পড়ে গেলুম দেখ।

অতুলবাবু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—আপনি এখানে থাকেন না ?

—নাঃ, সুচি থাকে—সু-সুচি।

—তিনি আপনার কে হন ?

—আমার 'রিলেটিভ'…খুব মধুর সম্পর্ক বাওয়া !…এই রাত্তিরেই ছুটে আসতে হল। 'ভেরি ইম্পর্টেন্ট' কাজ যে ! কাল সকালে তো আর টাইম হত না। সুচি আমার শ্যালিকা, স্যার।

—আপনার নাম কি ?

—আমার নাম গোইন্দো !

এমন সময়ে আমাদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলিয়া এক ভদ্রলোক হ্যারিকেন হস্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইনি মাত্র এক সপ্তাহ হইল কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছেন। তখন অবধি আমাদের কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার আগ্রহ দেখান নাই। ভদ্রলোক আসিয়াই মাতালটিকে সম্বোধন করিয়া অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিলেন—'একি কাণ্ড বাঁড়ুজ্জে মশাই ? এত রাত্রে, এই অবস্থায় এখানে এসে হট্টগোল করতে আপনার লজ্জা হল না ? কি চান এখন ?'

লোকটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল—'এই যেঃ, তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ?' তারপর, আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—'এ হ'ল সুচির হাস্‌ব্যাণ্ড—আমার ভায়রা। চমৎকার লোক ; কিন্তু, ভারি গোঁয়ার মশাই। দেখুন, ঠিক বাড়ী চিনে এসেছি কি না।'

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটি যে সত্য 'গোঁয়ার-গোবিন্দ', তাহা তাঁহার মেজাজ দেখিয়াই বোঝা গেল। তিনি একেবারে 'তিরিক্ষি' হইয়া বলিলেন—'দেখুন বাঁড়ুজ্জে মশাই, আপনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। যান—এক্ষুণি চলে যান এখান থেকে।'

লোকটি সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল—'আরে যাচ্ছি যাচ্ছি ; চটছ কেন ? মোষ্ট্ ইম্পর্টেন্ট কাজ বলেই না ছুটতে ছুটতে এলুম !…তোমারই 'লাইফ অ্যাণ্ড্ ডেথের' ব্যাপার, বাওয়া। এই নাও, পড়ে দেখ।'

বলিয়া, একখানা অফিস-খাম আগাইয়া দিল। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক সেটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি এ ?

লোকটি বলিল—হোরেস সায়েব তোমার চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে। কাল ভোরেই তোমাকে তার বাংলোতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেরী করে যেয়ো না ভায়া ;—তাহলেই হোরেস সায়েবের পাটনার সেই অন্য 'ক্যাণ্ডিডেট্‌টাকে নিয়ে নেবে। ভেরী ইম্পর্টেন্ট !…হুঁ, হুঁ, বাওয়া, হোরেস সায়েব এই শর্মার কথায় ওঠে আর বসে। আমি নিজে সুপারিশ করেছি—চাকরির কথাটা পাকা করে নেবার জন্যে আজ ব্যাটাকে নগদ পনের টাকার হুইস্কি খাইয়ে দিলুম—তার পরও তোমার চাকরি হবে না ? ইয়ার্কি নাকি ?'

কিন্তু পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক এতবড় সুখবরটি পাইয়াও কিছুমাত্র মেজাজ বদ্‌লাইলেন না। তেমনি অভদ্রভাবেই বলিলেন—'আচ্ছা, বেশ করেছেন। এখন, যান দেখি এখান থেকে। ভদ্রলোকের পাড়ায় আর মাতলামী করবেন না।'

বলিয়াই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। মাতালটি কিন্তু তাঁহার প্রস্থান লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—'ভেবেছিলাম বাড়ী ফেরবার

পথে চিঠিখানা তোমাকে দিয়ে যাব। কিন্তু, নেশার ঝোঁকে সোজা বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত; তারপরই একেবারে ফ্ল্যাট্—খাওয়া-দাওয়া কিস্সু হল না। হঠাৎ, ঘুম ভেঙ্গে দেখি রাত্তির দুটো বাজে! সব্বোনাশ! সকাল হলেই যে তোমাকে যেতে হবে, দেখা করতে। অম্‌নি উঠে পড়লুম—কুছ্ পরোয়া নেই, হাম্ আভি জাগা। ভাবলুম, এই বিদেশে এসে এত দুঃখু-কষ্টের মধ্যে পড়েছ—এমন 'ফাইন' চাকরিটা হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও যদি আমার গাফিলতির জন্যে ফস্কে যায়, তাহলে দুনিয়ায় আমার মত নরাধম আর কে থাকবে? হাম্ এত রাত্তিরেই জাগা।···কিন্তু, এবার দুচিকে ধরে একদিন আচ্ছা করে 'কিস্তি' না খেয়ে ছাড়ছিনি, বাওয়া!'

বলিয়া হি হি করিয়া হাসিতে গিয়া হিক্কায় হাসি আটকাইয়া গেল।

'ব্যাপারটা' এতক্ষণে পরিষ্কার হইল। পাশের বাড়ীর 'ভদ্রলোক'ও মানুষ, আর ঐ ঘোর মাতালটিও মানুষ! কিন্তু, দু'জনে কত প্রভেদ!

লোকটিকে যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে তাহার ভায়রাটি অনেক পূর্বেই দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন, তখন সে অনেক চেষ্টার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'ও তাই নাকি? বেশ লোক বাওয়া!···এবার তা'লে কেটে পড়ি···'

চলিতে গিয়া তাহার পা দুইটা এমন ভাবেই টলিতেছিল যে, মনে হইল, আজ রাত্রে তাহার বাড়ী পৌঁছান অসম্ভব। হয়ত রাস্তায় মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে।

অতুলবাবু সহসা অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিলেন। বিনীত-আগ্রহে কহিলেন—বাঁড়ুজ্জে মশাই, এত রাত্রে আপনি আর বাড়ী ফিরে যাবেন না। চলুন, আমার বাড়ীতে রাতটা থেকে, কাল সকালে যাবেন।

লোকটি চোখ টানিয়া টানিয়া কিছুক্ষণ অতুলবাবুর দিকে চাহিল। শেষে বলিল—'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, ইউ আর এ পারফেক্ট জেণ্টল্‌ম্যান··কিন্তু, আমি ঠিক বাড়ী পৌঁছে যাব। মনে করবেন না আমি মাতাল হয়েছি। সারারাত হেঁটে বেড়াতে পারি।···গুড্ নাইট, স্যার!··'

টলিতে টলিতে তিনি অগ্রসর হইলেন।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

১

শত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, রত্নপ্রসবিনী বঙ্গজননীর ক্রোড় আলোকিত করিয়া একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন কে জানিত যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিবে—



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"এই * * * পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিত—
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্পের উদয় হইবে,—

"এক ধর্ম্ম রাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্নবিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

সেই স্বাভাবিক মানব ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য পশুবলের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না, কারণ,—

"যেই রাজ্য অসিধারে
স্থাপিত, সে পারাবারে
বালির বন্ধন তুচ্ছ; মানব-হৃদয়
কার সাধ্য অসি-ভরে করিবে বিজয়?
যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম্ম,
শাসন নিষ্কাম কর্ম্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি ধর্ম্ম, * * নহে পশুবল।"

তিনি এই শক্তির সাধনা করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য-সম্পাদনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন—

"ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত,
শিখাব একত্ব মর্ম্ম;—
এক জাতি, এক ধর্ম্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!"

এবং দিব্যদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের উন্নতির পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং জাতীয় জীবন তরী সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন—

"উন্নতির পথ ছায়া-পথের মতন,
—প্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতাময়,—
রহিয়াছে প্রসারিত, সেই পথে, প্রভো,
জাতীয় জীবন-তরী দিব ভাসাইয়া।"

তাঁহার সাধনার বলে জাতীয় ঐক্য বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হইয়াছিল, বহু সাধককে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তিনি উদাত্ত স্বরে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন,—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

তিনি দেশে যে নবজাগরণ আনিয়া ছিলেন ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা যে প্রতিষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র ও মনোমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জাতীয় ঐক্যসম্পাদনে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী লালমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের মহাসভা উন্মাদিনী বাণী শ্রুত হইয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী আনন্দমোহন, রমেশচন্দ্র ও ভূপেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ জ্ঞান দেশবাসীর চক্ষুরুন্মীলিত করিয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ত্যাগী কর্ম্মবীরগণের স্বদেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গ জাতির সমক্ষে নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠান তীক্ষ্ণধী বাঙ্গালীর প্রভাব বর্জ্জিত হইয়া কোন পথে পরে পরিচালিত হইল তাহা জানিনা, কিন্তু মনে হয় উমেশচন্দ্রের ন্যায় নেতা থাকিলে আজিকার এই ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় উন্মত্ত ভারতবাসী ভিন্ন পথ অবলম্বন করিত, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা লইয়া কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মশক্তি খর্ব্ব করিত না, প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও দেশকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারিত।

আজ তাই উমেশচন্দ্রকে আমরা স্মরণ করিতেছি, তিনি অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারাজীব ছিলেন বলিয়া নহে, যিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের সম্মানিত পদ অধিকার করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের এডভোকেট জেনারেল বা ভারতের ব্যবস্থা সচিবের পদপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া নহে, তাঁহাকে এক মহা জাতির অন্যতম স্রষ্টারূপে, যিনি প্রগাঢ় রাজনীতিক জ্ঞান, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম, অনন্যসাধারণ সত্যনিষ্ঠা এবং মানবের জন্মগত অধিকার রক্ষায় প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাদ্বারা দেশবাসীর সমক্ষে এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে খিদিরপুরের অন্তর্গত সোনাই গ্রামে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে ডিসেম্বর ধর্ম্মপ্রাণ গিরিশচন্দ্রের ঔরসে সাধ্বী সরস্বতী দেবীর গর্ভে উমেশচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রজ সর্ব্বানন্দী মেলের গুণানন্দ ছোট ঠাকুরের সন্তান বংশসম্ভূত ছিলেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ 'বেণী সংহার' নাটক প্রণেতা ভট্টনারায়ণ বঙ্গাধিপ আদিশূর কর্ত্তৃক কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে আনীত হন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ভট্টনারায়ণের বংশধরগণ অনেকেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার স্বর্গারোহণের বৎসর দুই পূর্ব্বে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার বংশলতা প্রস্তুত ও নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে বিতরিত করিয়াছিলেন। বংশলতা প্রণেতৃগণের কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ইতিহাসের সত্যতা পরীক্ষার অক্ষম প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া আমরা এই প্রস্তাবে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব, কারণ এই বংশলতা প্রকাশের দ্বারা উমেশচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি বিদেশীয় বেশ ভূষা, চিন্তাধারা, আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়াও জীবনের সায়াহ্নেও বিস্মৃত হন নাই যে তিনি ভারতবাসী এবং ভারতীয়গণের মধ্যে হিন্দু, এবং হিন্দুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের বংশধর বলিয়া অভিমান তিনি চিরদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার দেহাবশেষের উপর যে স্মৃতিশিলা স্থাপিত হয় তাহাতেও ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ আছে—"ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ' নামক রোগে মৃত স্বদেশ প্রত্যাগমনোন্মুখ হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহাবশেষ এই স্থানে সমাহিত হইয়াছে।"

১। ভট্টনারায়ণ—২। বরাহ—৩। বৈনতেয়—৪। বিবুধেশ—৫। সুবুদ্ধি—৬। সুতন্দ—৭। ভরাপই—৮। ধবল—৯। মহাদেব—১০। মকরন্দ—১১। বিনায়ক—১২। বন্দী—১৩। ঈশান—১৪। লক্ষ্মণ—১৫। হরি—১৬। বশিষ্ঠ—১৭। সর্ব্বানন্দ—১৮। বলভদ্র—১৯। গুণানন্দ—২০। নারায়ণ—২১। মধু—২২। প্রাণবল্লভ—২৩। গণেশ—২৪। রামশঙ্কর—২৫। পীতাম্বর—২৬। গিরিশচন্দ্র—২৭। উমেশচন্দ্র—

উমেশচন্দ্রের পিতামহ একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বকীয় চেষ্টায় বিত্ত উপার্জ্জন করত দেশবাসীর মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হাবড়ার আট ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বাগাণ্ডা গ্রামে পীতাম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কলিকাতার



পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার আত্মীয় সিমতলা নিবাসী রামনারায়ণ মিশ্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রামনারায়ণ বা নারাণ মিশ্র তৎকালে সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণি কলিয়ার সাহেবের অফিসে বেনিয়ান বা দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালী এটর্ণি কেহ ছিলেন না এবং ইংরাজ এটর্ণিরা এইরূপ ইংরাজীতে অভিজ্ঞ দেওয়ানের সাহায্য না লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। ইঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং নারায়ণ মিশ্রও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। পীতাম্বর প্রথমে জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে নারায়ণ মিশ্রের উপদেশে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তখন এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না, দুই চারিজন যাঁহারা ইংরাজী জানিতেন তাঁহাদের নিকট গিয়া শিক্ষা করিতে হইত। শিক্ষালাভের পর পীতাম্বর কিছুদিন তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে শিক্ষকতা করেন, পরে নারায়ণ মিশ্র তাঁহাকে কলিয়ার সাহেবের অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি ব্যবহারশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। নারায়ণ মিশ্রের পর তদীয় পুত্র হেরম্ব মিশ্র কলিয়ার সাহেবের বেনিয়ান হন এবং কিছুদিন পরে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে পীতাম্বর তৎপদে অভিষিক্ত হন। এই কলিয়ার সাহেবের অফিস পরে ক্রমান্বয়ে কলিয়ার এণ্ড বার্ড, কলিয়ার বার্ড এণ্ড গ্রাণ্ট, বার্ড এণ্ড গ্রাণ্ট, গ্রাণ্ট এণ্ড রেমফ্রি, গ্রাণ্ট, রেমফ্রি এণ্ড রজার্স নামে পরিচিত হয়।

পীতাম্বর প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন যে মৃত্যুকালে বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইঁহার সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—"তিনি সর্ব্বতোভাবে একজন অদ্ভুত লোক ছিলেন এবং সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অবস্থায় পরলোকগমন করেন তথাপি তিনি এককালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং এই অর্থ তিনি দান (সত্য কথা বলিতে কি সময়ে সময়ে অপাত্রে দান) করিয়া যান। আমার যখন নয় বৎসর বয়ঃক্রম প্রায় পূর্ণ হয় তখন তিনি ১২৬০ সালে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা দশমী তিথিতে জীবনলীলা সম্বরণ করেন।"

উমেশচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর তারিখে একখানি পত্রে লিখিয়া-



শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিলেন যে তিনি একখানি নোটবহি হইতে পীতাম্বরের মৃত্যুর ইংরাজী তারিখ দেখিতে পাইয়াছেন—১০ই ডিসেম্বর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ।

পীতাম্বর তিনবার বিবাহ করেন। সেকালে এক পত্নীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করা কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে বিরল ছিল না। পীতাম্বরের প্রথমা পত্নী করুণাময়ীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা এবং শম্ভুচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র নামে দুই পুত্র, দ্বিতীয়া পত্নী কর্পূরময়ীর গর্ভে পাঁচ কন্যা ও গিরিশচন্দ্র নামে এক পুত্র এবং কনিষ্ঠা পত্নী দয়াময়ীর গর্ভে শিবচন্দ্র, রাজেন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, বটুবিহারী ও কালীচরণ নামক পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পীতাম্বরের এই আট পুত্র ও সাত কন্যার মধ্যে উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্রই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন. প্রথমা পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র, বটুবিহারী ও কালীচরণ এটর্ণির অফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র ডাক্তার ডফের নিকট খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, রাজেন্দ্রকে ৺নারায়ণ মিশ্রের পুত্র হেরম্ব মিশ্র দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং ভৈরবচন্দ্র তারাচরণের পুত্র উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন এবং পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শিবচন্দ্রের পুত্র পৌত্রগণ সকলেই কৃতী ব্যারিষ্টার ধর্ম্মযাজক, সিভিলিয়ান প্রভৃতি হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র ও ভৈরব হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার সকল খুল্লতাতকেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবার পর গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে এবং হিন্দু স্কুলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। উমেশচন্দ্র তদীয় পিতৃদেব সম্বন্ধীয় স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন :

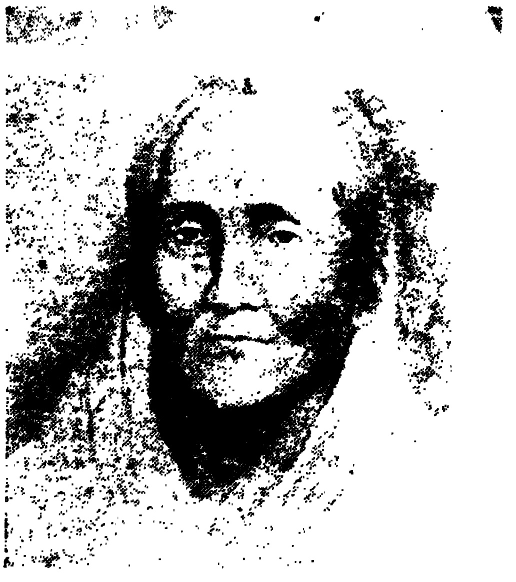
"১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র মিষ্টার কর্ণ্ড রজার্স নামক এটর্ণির নিকট শিক্ষানবিশী কেরাণী (articled clerk) হন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যথারীতি এটর্ণি পরীক্ষা দিবার কথা; কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁহার স্কন্ধে একটি বৃহৎ পরিবারের ভার পতিত হয় এবং যেহেতু তাঁহার বেতন অধিক ছিল না, তাঁহাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইত এবং তাঁহার অফিসে যাইতে বিলম্ব ঘটিত। উক্ত অফিসের কর্ত্তা মিষ্টার আর্কিবল্ড গ্রাণ্ট ইহাতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে তাঁহার মাসিক বেতন দেড়শত টাকায় বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন কিন্তু সকাল সকাল তাঁহাকে আসিতে হইবে। গিরিশচন্দ্র অল্পদিনের জন্য সকাল সকাল আসিতে পারিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় তাঁহার অফিসে আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইহাতে গ্রাণ্ট সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন যে যথাসময়ে অফিসে না আসিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে। এই সময়ে শোভাবাজার রাজপরিবারের একটি বড় মোকদ্দমা সুপ্রীম কোর্টে চলিতেছিল এবং এই মোকদ্দমায় মেসার্স গ্রাণ্ট রজার্স কয়েকজন প্রতিবাদীর পক্ষে এবং মেসার্স অ্যালান এণ্ড জজ অপর কয়েকজন প্রতিবাদীর পক্ষে এটর্ণি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেসার্স গ্রাণ্ট এণ্ড রজার্সের মক্কেলদের কেসটি গিরিশচন্দ্রের হস্তে ছিল এবং তিনি একটি জবাব তাঁহার অন্যতম মক্কেল ও পরমবন্ধু মহারাজা বাহাদুর কমলকৃষ্ণকে প্রেরণ করেন। মিষ্টার অ্যালান মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এই জবাবটি দেখেন এবং উহার মুন্সীয়ানা দেখিয়া এরূপ চমৎকৃত হন যে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কোন্ কাউন্সেল উহার মুসাবিদা করিয়াছেন। উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল কোনও কৌন্সেল নহেন, গ্রাণ্ট এণ্ড রজার্সের শিক্ষানবীশ কেরাণী গিরিশচন্দ্র উহা লিখিয়াছেন। এই সময়ে মিষ্টার অ্যালান সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিবার সংকল্প করিতেছিলেন এবং অফিসের কার্য্যাদির ভার অর্পণের জন্য কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করেন গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার সহযোগিতা করিতে সম্মত করাইতে পারেন কিনা? মহারাজা বলিলেন—মিষ্টার গ্রাণ্টের সহিত গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটিয়াছে এবং গিরিশচন্দ্রকে পদচ্যুত করিবেন বলিয়া গ্রাণ্ট তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া অ্যালান সাহেব তৎক্ষণাৎ ২৫০৲ মাসিক বেতনে গিরিশচন্দ্রকে নিজ অফিসে নিযুক্ত করেন। কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেব গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং অ্যালান সাহেবের অফিসে তাঁহার যোগদানের বিপক্ষে নানা আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। ফলে গিরিশচন্দ্র দুই মাস বাটীতে বসিয়া বসিয়া অ্যালান সাহেবের বিশেষ অনুরোধে ২৫০৲ করিয়া বেতন লইতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রাণ্ট ও অ্যালান সাহেবের গিরিশচন্দ্র ঘটিত ব্যাপার এটর্ণির সভায় বিচারের জন্য প্রেরিত হইল এবং এই সভা অ্যালান সাহেবের অনুকূলে রায় দিলেন। গিরিশচন্দ্র ইহার পর অ্যালান সাহেবের অফিসে যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া মিষ্টার রজার্স-এর নিকট গিরিশচন্দ্রের যে articleship ছিল তাহা হস্তান্তর করিতে অনুমতি দিলেন না এবং উহা বাতিল হইয়া গেল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র অ্যালান সাহেবের সহিত নূতন articlesএ আবদ্ধ হইলেন। মিষ্টার অ্যালান এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে গিরিশচন্দ্রকে সকাল সকাল অফিসে আসিতে হইবে এবং কিছুদিন গিরিশচন্দ্র সকাল সকাল অফিসে গিয়াছিলেন। কিন্তু ২৫০৲ টাকায় তাঁহার সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া তিনি পুনরায় প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় অতিরিক্ত কাষ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মিষ্টার অ্যালানের অফিসে যাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অবশেষে মিষ্টার অ্যালান যখন অবগত হইলেন যে ৪০০৲ টাকা বেতন পাইলে গিরিশচন্দ্র অনন্যকর্ম্মা হইয়া অফিসে সকালে আসিতে পারিবেন তখন তিনি তাঁহার বেতন বৰ্দ্ধিত করিয়া ৪০০৲

করিয়া দিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এটর্ণি মিষ্টার লণ্ডস্লায়ের অবসর গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র এই বেতন পাইতেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে গিরিশচন্দ্র এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে অফিসের অন্যতম অংশীদার করা হয় এবং অফিসের নাম হয় অ্যালান জজ এণ্ড বনার্জী।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে গুজব রটিল যে এটর্ণি-দিগকে আপীল বিভাগে ওকালতী করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে ভীত হইয়া অ্যালান এটর্ণি শ্রেণী হইতে নাম কাটাইয়া উকীলরূপে কায করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে অফিসের নাম হয় জজ এণ্ড বনার্জী।"

গিরিশচন্দ্রই বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম এটর্ণি। তিনি এটর্ণিরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন কিন্তু পিতার স্থায় মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন, দেবসেবা ও সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া মৃত্যুকালে তাদৃশ বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। উমেশচন্দ্রের একখানি পত্র পাঠে প্রতীত হয় যে পৈত্রিক বাসতবাটি দায়গ্রস্ত হইয়াছিল এবং দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বাড়ীটি উমেশচন্দ্র বন্ধক হইতে মুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত কয়েক-খানি বাড়ীতে মাসিক ২১০৲ টাকা মাত্র আয় ছিল। পিতার মৃত্যুকালে উমেশচন্দ্র বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন নাই এবং অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার জননী সরস্বতী দেবী হাইকোর্ট হইতে লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেশন লইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত রাজেন্দ্র ও ভৈরব-বাবু জামিন হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রও দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী সরস্বতী দেবী ভারতবিশ্রুত স্মার্ত্ত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের



সরস্বতী দেবী

প্রপৌত্রের পৌত্রী। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হিন্দু আইন সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরামর্শদাতা ছিলেন এবং স্তর উইলিয়ম জোন্সের আদেশে সঙ্কলিত ইঁহার হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সার কোলব্রুক ইংরাজীতে অনুবাদিত করেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সরস্বতী দেবী সাতিশয় বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। পিত্রাদেশে গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার গোবিন্দ দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই বিবাহের ফলে গিরিশচন্দ্রের তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, যথা কৈলাসচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, সত্যধন এবং মোক্ষদা, সুখদা, গঙ্গা, পতিতপাবনী ও রাজলক্ষ্মী। উমেশচন্দ্রের ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইঁহাদের মধ্যে কেবল গঙ্গা দেবীই উমেশচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন, কিন্তু উমেশচন্দ্র চিরদিন তাঁহাকে সহোদরার ন্যায়ই দেখিতেন।

১। কৈলাসচন্দ্র শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন উমেশ-চন্দ্রের বয়ঃক্রম ২।৩ বৎসর মাত্র।

২। সত্যধন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতে এম্-এ



সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাভূষণ উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় এটর্ণি হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের জীবিতকালে তিনটী কন্যা সন্তান রাখিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইনি স্বর্গারোহণ করেন।

৩। মোক্ষদা দেবী তখনকার দিনে একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। বহুবাজারের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের কন্যা ব্রহ্মময়ীর পুত্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মোক্ষদা



মোক্ষদা দেবী

দেবীর স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বীরভূম ও পরে ভাগলপুরের সরকারী উকীল ছিলেন। মোক্ষদা দেবী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'বনপ্রসূন' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনি হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটির উত্তর স্বরূপ "বাঙ্গালীর বাবু" নামক যে দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'সফল স্বপ্ন' নামক একটি ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাসও প্রণয়ন করেন। ইঁহার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসেবা জীবনের সায়াহ্নেও পরিলক্ষিত হইত। ৮০ বৎসর বয়সে ইনি ইঁহার প্রিয় দৌহিত্র বিগত মহাযুদ্ধে ইঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত কাঞ্চেন কল্যাণ-কুমার মুখোপাধ্যায়ের যে জীবনচরিত বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন (১৩৩৫ সাল) সেই 'কল্যাণ প্রদীপ' পাঠ করিলে তাঁহার অপূর্ব্ব মানসিক শক্তি ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্র ৺সতীশচন্দ্র ব্যারিষ্টার এবং সুরেশচন্দ্র এটর্ণি হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের পুত্র শৈলেশচন্দ্রও এটর্ণি।

৪। উমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় ভগিনী সুখদা দেবীর তিন পুত্র বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও দেবেশ্বরের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবেশ্বর একজন এটর্ণি।

৫। উমেশচন্দ্রের তৃতীয়া (বৈমাত্রেয়) ভগিনী গঙ্গাদেবীর পুত্র হয় নাই। তাঁহার দৌহিত্র সনৎকুমার গাঙ্গুলী উকীল হইতে জেলা জজ হইয়াছিলেন।

৬। উমেশচন্দ্রের চতুর্থা ভগিনী রাজলক্ষ্মীর সহিত মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল ৺সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। উঁহার পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ আলিপুরে ওকালতী করিতেন।

৭। উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগ্নী রাজলক্ষ্মীর সহিত বিখ্যাত Florist এস-পি-চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণের বিবাহ হয়। ইঁহার কোন সন্তান হয় নাই। (ক্রমশঃ)

ছোটনাগপুরের 'হো' জাতি

শ্রীমুরারীমোহন দাস

ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ও শাল মহুয়ার ছায়াছন্ন অরণ্য প্রদেশে যে সকল কৃষ্ণকায় অনার্য্য জাতি বাস করে কোল বা 'হো' জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহারা বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তবাসী সাঁওতাল, খাড়িয়া, জোয়ার প্রভৃতি জাতির সহিত একই গোষ্ঠীভুক্ত। 'হো' দিগের একটি শাখার নাম 'মুণ্ডা'। 'মুণ্ডা' কথাটি এক কালে রাজা বা দলপতি (head-man) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, কিন্তু কালক্রমে সেই সকল দলপতিদিগের বংশধরেরা 'মুণ্ডা' নামক সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, আসলে 'মুণ্ডা'গণ 'হো' জাতিরই অন্তর্গত।

ইহাদিগের ভাষায় 'হো' কথার অর্থ মানুষ। কোন্ সুদূর অতীতে ইহারা নিজেদের 'মানুষ' জাতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিল এবং কোন্ হেতুমূলে করিয়াছিল তাহা ভাবিবার বিষয়। হয়ত পশুজগৎ হইতে নিজেদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহারা 'মানুষ' এই সাধারণ নামে নিজেদের অভিহিত করিয়াছিল। ইহাদ্বারা এই কথাই বুঝায় যে—যখন এই নাম-করণ হয়, সে যুগে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বা সমাজে বিভক্ত হয় নাই;—হইলে মানবের সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্দটি একটি শ্রেণী বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইত না।

আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য করিলে এই জাতির অতি প্রাচীনত্বের ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়।—নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মানব জাতি অতি আদিম অবস্থায় অঙ্গভঙ্গি দ্বারা পরস্পরকে মনের ভাব বুঝাইত। তাহার পর একটিমাত্র স্বরবিশিষ্ট (Mono-Syllablic) শব্দ দ্বারা ভাবের আদান প্রদান চালাইত। মানুষ বুঝাইতে 'হো' এই একাক্ষরী শব্দ ব্যবহারটিও মানব জাতির শৈশবাবস্থারই পরিচয় বলিয়া মনে হয়।

'হো'রা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণকায় ও কষ্টসহিষ্ণু। সাধারণতঃ শান্ত শিষ্ট ও সরল প্রকৃতির; পুরুষ অপেক্ষা নারীদিগের স্বাস্থ্য উন্নততর, ইহারা যেন এই পৃথিবীর মানুষ নহে—মুখে সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে প্রাণখোলা হাসি ও কণ্ঠে লাগিয়া আছে গান। যখন ফুলের সাজে সাজিয়া এই বন-বালা কোল-তরুণীরা তরুণ-দের বাঁশীর সুরে সুরে হেলিয়া নৃত্য করিতে থাকে তখন স্বতঃই মনে হয়—অতীতে হয়ত ইহাদিগকেই কিন্নরী বলা হইত।

কোন কোল পল্লীতে পদার্পণ করিলে প্রথমেই ইহাদের কুটীর গুলির অতি পরিচ্ছন্নতা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মসৃণ করিয়া লেপা পোঁছা মাটির দেওয়াল গৃহস্বামিনীর রুচি অনুযায়ী লাল, কাল বা শাদা রংয়ে রঞ্জিত। একপ্রকার বন্যতৃণ পোড়াইয়া তাহার ছাই দিয়া কাল রং, গিরিমাটি দিয়া লাল রং ও একপ্রকার খনিজ মাটি দিয়া দেওয়ালগুলি শাদা রং করা হয়। 'গৃহস্বামিনী'র রুচি অনুসারে বলিলাম এই জন্য যে—কোল পরিবারে এই সকল এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর প্রভাব অধিক লক্ষিত হয়।

এই অনাড়ম্বর কুটীরগুলির মতই ইহাদের অধিবাসীদিগের শান্তিপূর্ণ নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা প্রণালীও বড় সুন্দর। অভাব-বোধ ইহাদের অতিঅল্প এবং সেই জন্য অভাবের তাড়নাজনিত দুশ্চিন্তাও অল্প। অর্থনীতির হিসাবে ইহারা দরিদ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু অভাবের অনুভূতি যাহার নাই দারিদ্র্য তাহার মানসিক শান্তি নষ্ট করিতে পারে না। ইহারা এক কথায় ঠিক যাহাকে বলে "Forgetful of yesterday and Careless of to-morrow."

ক্ষেতে খামারে, বনে জঙ্গলে কঠোর পরিশ্রমের পর দিনের শেষে যখন গলাগলি করিয়া নারী পুরুষের দল গান করিতে করিতে ঘরে ফিরে, তখন তাহাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিলে মনে হয় না যে ইহারা এইমাত্র শ্রম করিয়া ফিরিতেছে। তাহার পর সান্ধ্য পান ভোজনের পর উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে আরম্ভ হয় তরুণ তরুণীর সমবেত নৃত্য গীত।

কোল জাতীয়েরা সাধারণতঃ কৃষিজীবী। ইহারা ধান, কোদো, গঁদ্‌লী, কুত্থি, সরিষা, গুঞ্জা প্রভৃতি কয়েক প্রকার শস্যের চাষ করে, বনজাত আলু, প্রভৃতি কয়েক প্রকার মূল ও জাম, কাঁটাল, মহুয়া, চার, কেঁদ, কুল প্রভৃতি ফল ইহাদের অন্ন সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান করে আজকাল অনেকে খনি, কারখানা

বা অন্তত্র দিন মজুরী করিয়াও জীবিকা অর্জন করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে কোথাও ভৃত্যের কাজ করিতে দেখা যায় না।

ইহারা ভাতের সহিত 'রাণু' নামক একপ্রকার দ্রব্য মিশাইয়া উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত করে, ইহার নাম ডিয়াং বা হাঁড়িয়া—আর চোলাই করা মদকে বলে 'আর্কি'। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদ্যপান করিয়া থাকে। ইহা কোল সমাজে দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, বরং ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই ধরা হয়। নারী অপেক্ষা পুরুষেরা অধিকমাত্রায় পানাসক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে ধূমপান করিতে দেখা যায় না, পুরুষেরা শাল পাতায় তামাক জড়াইয়া চুরুটের মত করিয়া ধূমপান করে। দূরে কোথাও যাইতে হইলে কেহ কেহ তামাক, শালপাতা ও আগুন জ্বালাইবার জন্ত একটুক্‌রা হাল্‌কা কাঠ ও পেন্সিলের মত মোটা একখানা কাঠি সঙ্গে রাখে। মাটিতে বসিয়া পা দিয়া কাঠের, টুক্‌রাটির এক প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কাঠিটি খাড়াভাবে উহার উপর বসাইয়া দুই হাতের সাহায্যে দড়ি পাকানোর পদ্ধতিতে জোরে জোরে ঘুরাইতে থাকিলে, ঘর্ষণের ফলে নরম কাঠের যে গুঁড়ো বাহির হয় তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। তাহার পর শুক্‌না পাতা ইত্যাদি দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই কৌশলটি যে অতি আদিম কালের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইহাদের গানের কয়েকটি সুর ও বাদ্যের কয়েকটি তালমান আছে। এক উৎসবের নৃত্য, গীত, বা তাল লয়, অন্যটিতে ব্যবহৃত হয় না। নব বর্ষার মেঘ-মেদুর দিনের 'চাতম্' পরবের উচ্চ বিলম্বিত সুর-লহরী ফাল্‌গুনের বা পরবের (ফুলোৎসবের) দ্রুত তালের ভাবোচ্ছল সুরের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। দূরাগত উৎসব সঙ্গীতের সহজ সরল সুরগুলি শ্রোতাকে চমৎকৃত করে। ইহাদের স্বভাবজাত নৃত্যগীত, ভাবাবেগ ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু।

কিন্তু কোন প্রকার কার্য্যকরী শিল্পে বা অর্থকরী কর্ম্মে ইহাদের কিছুমাত্র পটুতা বা আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ কঠোর শ্রম শক্তি দেখিলে ইহা যে শ্রমবিমুখতাপ্রসূত একথাও বলা চলে না। ইহারা যেন একান্তই এক কাব্য জগতের জীব। শুধু নাচিয়া গাহিয়া, হাসিয়া খেলিয়া এক নিশ্বাসে জীবনের সবটুকু মাধুর্য্য ভোগ করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতে চায়—সংসারের লাভক্ষতির হিসাবের সময় বা ইচ্ছা ইহাদের নাই। অথচ ভারতের লৌহ ও তাম্র নিষ্কাসনের কার্য্য একদিন ইহারাই করিত। সিংভূম জেলার নানা স্থানে লৌহ ও তাম্রমলের স্তূপ আজিও ইহাদের অতীত শিল্প-জীবনের সাক্ষ্য দেয়। কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও তন্তুবায়ের কাজও ইহারা করিত, কিন্তু এখন ক্রমশঃ সে সকল ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

কোলদিগের কোন বার, তিথি বা মাসের নাম নাই। প্রকৃতিভেদে বৎসর মোটামুটি জেটে (গ্রীষ্ম), গামা (বর্ষা) ও রাবোং (শীত)—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত।

কোল ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা সংস্কৃত ও সংস্কৃতের অপভ্রংশের অনুরূপ। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল—তাহা গভীর গবেষণা-সাপেক্ষ। সহজেই একথা মনে হইতে পারে যে প্রাচীনকালে আর্য্য-সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের ভাষার মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ বিকৃত আকারে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যাপারটি কিছু জটিল হইয়া উঠে। কারণ সংস্কৃত ছিল কেবলমাত্র পণ্ডিত সমাজের ভাষা—সেই সমাজের সংস্পর্শে বহুদিন বসবাস করিলে তবে ইহা সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু নানাবিধ কারণে ইহাও অসম্ভব। প্রথমতঃ ঘোরতর শত্রুতা হেতু আর্য্য অনার্য্যের একত্র অবস্থান কল্পনাতীত ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিকগণের মতে অনার্য্যগণের মধ্যে যাহারা আর্য্যদিগের দাস্য স্বীকার না করিয়াছিল, তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এমতাবস্থায় আর্য্য ভাষা ইহাদের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

পক্ষান্তরে ইহাই বরং অধিকতর সম্ভব যে—যখন বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইহাদের একদল আর্য্যগণের আশ্রিত হইল তখন তাহাদের ভাষায় কিছু কিছু শব্দ ও আর্য্যদিগের হাতে মার্জ্জিত হইয়া প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতের শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিল। অনার্য্যদিগের দেশ যদি 'আর্য্যাবর্ত্ত' আখ্যা পাইতে পারে, অনার্য্য রীতিনীতি যদি আর্য্য সভ্যতার নামে চলিয়া যায়, এমন কি অনার্য্যগণও যদি আর্য্য-হিন্দু সমাজ গঠন করে, তাহা হইলে কেবল অনার্য্য ভাষার বেলায়ই বা এইরূপ সমীকরণ অসম্ভব বলিব কেন?

কোল জাতীয়দিগের সমাজ ব্যবস্থা অতি মাত্রায় কঠোর। তবে আজকাল অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সমস্ত হিন্দু জাতিকেই ইহারা বলে 'দিকু'; দিকু অর্থে বিদেশী। কোনও কোল যদি দিকুর প্রদত্ত অন্ন পানীয় গ্রহণ করে তাহা হইলে সমাজে সে পতিত হয়। শুধু তাহাই নহে—অন্ন গ্রহণকারী যদি স্ত্রীলোক হয় তাহা হইলে তাহার আত্মীয়স্বজনগণ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অবশ্য সামাজিক ভোজ-আদি দিয়া তাহাদের পাতিত্য অপনীত হইতে পারে, কিন্তু অপরাধিনী আত্মীয়াকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিতে হয়।

যদি কোন অনূঢ়া তরুণীর মাথায় কোন পুরুষ সিঁদুর লেপিয়া দেয় তাহা হইলে অন্য কোন পুরুষ তাহাকে বিবাহ করে না—সে একজনের বাক্‌দত্তা বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ বিবাহ অসম্ভব হয় তাহা হইলে ঐ কন্যাকে হয় সারা জীবন কুমারী থাকিতে হইবে—আর নয়ত যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া শুনা যায়—তাহা অতি রোমাঞ্চকর, ঐ কন্যাকে শ্বাপদসঙ্কুল বনের মধ্যে একটি গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত। তিনদিন তিন রাত্রির মধ্যে কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে হত্যা না করিলে তবেই সে নিষ্পাপ ও অন্যের গ্রহণযোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ অপরাধে অপরাধী পুরুষকেও অতি কঠোর সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত।

বিবাহ ব্যাপারে আদিমকালের কন্যা-হরণ প্রথা এখনও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রকার বিবাহের নাম "রাক্ষস বিবাহ"। বিবাহার্থী কোল যুবক মনোনীত তরুণী কন্যার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে এবং সুযোগ পাইলেই—তাহাকে বলপূর্ব্বক নিজের বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে কন্যা এবং তাহার সঙ্গিনীগণ ভাবী বরকে কিল চড় মারিয়া, আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু বরের বন্ধুবান্ধব উপস্থিত থাকিলেও কেহ তাহাকে এই যুদ্ধে সাহায্য

করে না। একাকীই নারী বাহিনীর সহিত জুঝিয়া ভাবী বধূকে লইয়া পলাইতে হয়। তাহার পরের দিন কন্যার অভিভাবকগণ সন্ধান লইয়া হরণকারীর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হয়। তখন বিবাহার্থী তাহাদের প্রার্থিত পণ দিতে স্বীকার করিলেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যায়, অবশ্য বিবাহে যদি কুলগত বাধা না থাকে। এই পণ গরু, ভেড়া বা মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু দ্বারা প্রদত্ত হয়।

মাটি দিয়া প্রস্তুত একটি বেদীর উপর বর কন্যা পাশাপাশি দাঁড়ায়। দুইজনের হাতে মদ্যপূর্ণ দুইটি সাল পাতার ঠোঙা দেওয়া হয়। তাহার পর বরের পাত্র হইতে কন্যা ও কন্যার পাত্র হইতে বর পান করিলেই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান শেষ হইল, পরে নৃত্যগীত ও পান ভোজনেই বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়।

ইহারা দেবগাম, পূর্ত্তি, কালুণ্ডিয়া, সয়ে, তিউ প্রভৃতি কতকগুলি, কিলি বা গোত্রে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যেও স্বগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সকল 'কিলির' সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাহা বলা শক্ত। এক একটি কিলির লোকেরা এক একটি প্রাণীকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, কখনও তাহাকে হত্যা করে না বা তাহার মাংস ভক্ষণ করে না।

কোল ভাষা কেবল কথ্য ভাষা। ইহাদের কোন বর্ণমালা নাই কাজেই কোন পুস্তকাদিও নাই। কিন্তু প্রাচীন কাহিনী প্রভৃতি বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির আখ্যায়িকাও আছে। ইহাদের মতে প্রথমে শুধু জলই ছিল। সিংবোঙার (সূর্য্য) ইচ্ছা মাত্র ঐ জলে একটি জোঁক, একটি কাঁকড়া ও একটি কচ্ছপ জন্মলাভ করে। অনন্তর ভগবান সিংবোঙা তাহাদিগকে অনন্ত বারিধির তলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে আদেশ করেন। কাঁকড়া ও কচ্ছপ পর পর চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিল না। অবশেষে জোঁক ভগবানের আদেশক্রমে একবিন্দু কর্দ্দম তুলিয়া আনিল। সেইটুকু দিয়া তিনি ওটাদিশুম্ (পৃথিবী) গড়িলেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৃণ ও বৃক্ষলতায় ধরিত্রীর নগ্ন কলেবর আচ্ছাদিত হইল। তাহার পর পশু এবং সর্ব্বশেষে পক্ষী সৃষ্টি করিলেন। পক্ষী সর্ব্বপ্রথম যে দুইটি ডিম পাড়িল, তাহা হইতে বাহির হইল একটি বালক এবং একটি বালিকা—পৃথিবীর আদি মানব মানবী—তোতাহাড়াম ও তোতাবুড়ি। তখন সিংবোঙা মানব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহাদিগকে একটি পাহাড়ের গুহায় লইয়া রাখিলেন। এই পাহাড়ের নাম মারাংবুরু (বড় পাহাড়)। কিছুকাল পরে সিংবোঙা আসিয়া দেখিলেন বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও এই আদি দম্পতীর যৌন-চেতনার উদয় হয় নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে 'ইলি' নামক মদ্য প্রস্তুত করিতে ও পান করিতে শিখাইয়া দিলেন। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ইহাদের আট পুত্র ও আট কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহারা আটটি দম্পতীরূপে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করে ও মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি আটটি জাতি সৃষ্টি করে। *

এই শ্রুতি সর্ব্বত্র এক প্রকার বলিয়া মনে হয় না। কিছু কিছু পার্থক্য আছে এমন কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়।

অনেক অদ্ভুত ও অর্থহীন কিম্বদন্তী কোল সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। যেমন—অমুক পাহাড় অমুক পাহাড়ের বড় বা ছোট ভাই। নিশুতি রাতে পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাতায়াত করে। 'অদ্ভুত' বলিলাম বটে, কিন্তু আমাদের পৌরাণিক যুগেও পাহাড় পর্ব্বতের চলিবার ফিরিবার ক্ষমতা ছিল। মৈনাক পাহাড় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য মুনিকে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিয়াছিল, উমা আমাদের গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা। তাহা হইলে ইহাদের বিশ্বাসকেই বা অদ্ভুত বলি কেমন করিয়া ?

প্রেতাত্মার প্রভাব ইহাদের উপর অত্যন্ত অধিক। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মড়কের ভয়ে গ্রামবাসীরা মিলিয়া পশু পক্ষী বলি দিয়া মড়কের ভূতকে তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে। বাত্যা, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রেতাত্মার শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। কাহারও কোন কঠিন ব্যারাম হইলে—তাহা প্রেতাত্মার প্রভাবজনিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই সকল অনুষ্ঠান গ্রামের বাহিরে কোন নির্জ্জন স্থানের একটি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে সম্পাদিত হয়। এইরূপ ভূতাশ্রিত গাছকে 'জাহিরা' এবং ঐ ভূতকে 'জাহিরা বোঙা' বলা হয়। ভূত শান্তির এই সকল অনুষ্ঠান অতিশয় গুহ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং স্ত্রীলোক বা বালকবালিকাদিগকে উহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। অন্য সময়েও সকলে ঐ গাছের প্রতি যথেষ্ট শঙ্কা পোষণ করে ও যথাসাধ্য সান্নিধ্য এড়াইয়া চলে।

ইহাদিগের বিশ্বাস—মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মা আপন গৃহে আত্মীয়স্বজনগণের নিকট অদৃশ্য ভাবে বসবাস করিতে থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক গৃহে একটু করিয়া পৃথক স্থান ঐ আত্মাগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ আত্মাদিগকে বলা হয় 'ওয়া হোম কো', গৃহস্থ প্রত্যহ এই সকল প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য অন্ন পানীয়ের অগ্রভাগ দান করিয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় হাড়াম-বুড়ি বাখ্‌রা, (পিতৃপুরুষের ভাগ)।

এই সকল প্রেত-পূজা ব্যতীত আর যে সকল উৎসবাদি কোলসমাজে প্রচলিত আছে তাহাদিগকে বলা হয় 'পরব', মাগে পরব বা পরব, হেরো পরব, জমুয়া ও এরকার্বা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমস্ত পরবেই উৎসব-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব ভেদে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রকার ভেদ আছে।

বা-পরব বা ফুলোৎসব ফাল্গুন চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার কোনও বার তিথির হিসাব নাই। শালগাছে ফুল দেখা দিলেই এই উৎসবের সময় হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। একটা মজার কথা এই যে কোল নারীরা অতিমাত্রায় ফুল-প্রিয় হইলেও এই ফুলোৎসবে ফুল পরে না। ফুলের জন্মোৎসব বলিয়া এই উৎসবে ফুলকে বৃন্তচ্যুত করিতে নাই।

* বর্ত্তমান সময়েও প্রকৃত প্রস্তাবে কোলারিয়ান জাতির আটটি শাখার অস্তিত্ব দেখা যায়। Encyolopedea Britanicaতে পাওয়া যায় "The principal languages of the Kolarian groups are :—Santali, Munderi, Ho, Karwa, Kharia, Juang, Kurku, Savar,

Some of them are separated only by dialectical differences."

বড় সুন্দর এই ফুলোৎসব! বসন্তের প্রথম উন্মাদনা বনে বনে জাগিয়া উঠিয়াছে, শিমুলে পলাশে দুই চারিটি করিয়া রক্ত-রাঙা ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—এমনি দিনে একটি পুষ্পিত পাদপকে ঘিরিয়া দলে দলে তরুণ তরুণীর গীতিমুখর নৃত্য! পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিম দিকপ্রান্তে চলিয়া পড়ে, নিশার অন্ধকার পূবের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—কাহারও সেদিকে দৃকপাত নাই। নৃত্যপরা তরুণীদিগের লীলায়িত অঙ্গভঙ্গি, বৃত্তাকারে মন্থর আবর্ত্তন, তালে তালে চঞ্চল পাদক্ষেপ— নর্ত্তক নর্ত্তকীর স্বপ্নালু ভাবাবেশ দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। মন চলিয়া যায় কোন রূপকথার রাজ্যে।

ইহারা যাহা কিছু দেখে বা অনুভব করে, তাহাই গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে। কাজেই ইহাদের চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে গান। রেলগাড়ী চড়িয়া তরুণী চলিয়াছে—রাত্রির অন্ধকারে দূর হইতে ষ্টেশনের আলো দেখা গেল, গাড়ী ষ্টেশন পার হইয়া আবার অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কোথা হইতে একটা মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, তরুণীর মনে লাগিল সুরের দোলা—সে গাহিয়া উঠিল :—

"টেশনো জিলিমিলি, টেশনো নীরেত্তানা,
বাবুকো বৈবরঙ্গী বেটা বানামো সাড়িত্তানা!"

(অনুবাদ)

আলোকে ঝলমলি টেশন ছুটে যায়,
ধনীর দুলাল কে গো—বাঁশরী বাজায়!

ইহাদের প্রেমের গানগুলি যেন, আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগকেও ছাড়াইয়া যায়। নবীন প্রেমিক নায়িকাকে দেখিয়া গাহিতেছে :—

বা কেডা রিবা রিবা, স্থপিৎকেডা রাঙানাচা,
নিদা সিজি ওকোয় রুতু তানা
আমা নাগেন্ জিগী ল-তানা!
আঁছু তাডায়্, শাঁকোম তাডায়্ হাটরে দো হিসির মেনা
আমা নাগেন্ জিগী ল-তানা!
যতন করে চুল বেঁধেছ, তায় পরেছ ফুল,
রাত্রি দিবস বংশী বাজে—মনে ধরায় ভুল,
গলায় শোভে কণ্ঠমালা,
শাঁখের বলয় হাতের বাহার
মরি কি ঝুমুর্ ঝুমুর্ বাজে—মল পরেছ পায়,
ও রূপসী তোর লাগি যে হৃদয় জ্বলে যায়!

অমনি রসিকা প্রেমিকা চটুল চোখে বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া গাহিয়া উঠিল :—

আলম্ মাইরি কা কাপাজিয়া—
আমা নাগেন-ল-তানা হিয়া,
আমো ডিণ্ডা—আঁইও ডিণ্ডা
দা চাটু জেসন বিণ্ডা,
আলম্ মাইরি কা কাপাজিয়া
আমা নাগেন ল-তানা হিয়া!"
দোহাই তোমারে সখা—নীরব থাকো থাকো,
হিয়া যে জ্বলে গেল—ওকথা বলো নাকো,
আমি যে কুমারী সখা তুমিও কুমার—
দোঁহারি হৃদে আঁকা ছবিটি দুজনার।
'তোমার লাগি মোর হৃদয় জ্বলে গেল—
অনূঢ়া বালারে কি একথা বলা ভাল?

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বপ্ন

যাদুকর পি-সি-সরকার

অন্ততঃ একবারও জীবনে স্বপ্ন দেখেন নাই এমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নাই। প্রত্যেকে নিজের জীবন-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন যে কতদিন কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত পাওয়া যায়। রূপকথা এবং উপকথায় আমরা স্বপ্নের কত অদ্ভুত কথা জানিতে পারি। রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন দৈত্যের মত বলিষ্ঠ লোকেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, পরদিন প্রভাতে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজা হুকুম দিলেন যে রাজ্যের দৈত্যের মত বলিষ্ঠ লোকেরা সমস্ত বন্দী থাকিবে। নতুবা হবুচন্দ্র রাজা এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন যাহার অর্থ ভাবিয়া ভাবিয়া গবুচন্দ্র মন্ত্রী একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছেন, রাজার স্বপ্নে দৃষ্ট 'হিং-টিং-ছট্'এর কোন হদিসই মিলিতেছে না। কিম্বা আধুনিক যুগের রাজকুমার প্রবাল দ্বীপে বাড়ী তুলিবার আর সাগর থেকে ঝিনুক এনে তার সোপান গড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কোন কোন ভাগ্যবানের স্বপ্ন ফলিতেছে আবার অনেকে হয়ত তাহার স্বপ্নের কোন অর্থই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না। কেন এমন হয়? কবিদের মধ্যে অনেকে 'নিশার স্বপন'কে অসম্ভব ও অলীক কিছুর সঙ্গেই কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বপ্ন একটা মহা রহস্যময় আলো-আঁধারে কোন ব্যাপার। তাঁহারা হয়ত মনে করেন স্বপ্নের কোনই সার্থকতা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে স্বপ্ন অমূলক কিছু নয়, প্রত্যেকটি স্বপ্নের পশ্চাতে আছে কোন নিগূঢ় রহস্য। বর্ত্তমান শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ গবেষণা দ্বারা স্বপ্নের অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভিয়েনার সুপ্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিদ ডাক্তার ফ্রয়েড তাঁহার পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে স্বপ্নকে সহজ, সরল ও সাধারণের সহজ বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা যে সমস্ত স্বপ্ন দেখিয়া থাকি উহাতে অবাস্তব বা আধিভৌতিক কিছুই নাই—উহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। সাধারণের নিকট ইহা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মনে হইলেও ইহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কারণ আছে। ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত এই নূতন তথ্যাবলী পৃথিবীর সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ (প্রমাণ পাইয়া) সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি যে স্বপ্ন সচরাচর দেখিয়া থাকেন স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে উহার পশ্চাতেও রহিয়াছে "আপনার দমিত ইচ্ছার কল্পিত তৃপ্তি।" অবশ্য আরও কয়েক কারণে স্বপ্ন দেখা যাইতে পারে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে স্বপ্ন দর্শনের প্রধান কারণ দৈহিক (physiological) বা শারীরিক। যেমন কয়জন ঘুমাইয়া আছেন তখন বৃষ্টি আসিয়া তাঁহার পা ভিজিতে আরম্ভ করিল এবং তিনি সঙ্গে

সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলেন যে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে পুকুরে তিনি সাঁতার কাটিতেছেন। সম্ভবতঃ হয়ত ঘুমের সময় তাঁহার পায়ে মশারির দড়ি কিম্বা কিছু জড়াইয়া গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে জঙ্গলে তিনি কোন হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন এবং পায়ে লতাপাতা আটকাইয়া যাওয়াতে তিনি মোটেই দৌড়াইতে পারিতেছেন না। কিন্তু এইভাবে সমস্ত স্বপ্নের কারণ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে স্বপ্নের সঙ্গে শারীরিক কোন কারণই নাই, কাজেই বুঝা যায় যে স্বপ্নদর্শনের ব্যাপারে মানসিক (mental) কারণের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মতে মানুষের যে সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই অথবা যে সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পথে যথেষ্ট বাধা আছে, সেই সব ইচ্ছা স্বপ্নে পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিলে মনে অশান্তির সৃষ্টি হয় কিন্তু ঘুমাইলে কল্পনার সাহায্যে উহা পূর্ণ হয় এবং মনে শান্তি আসে। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নই মনকে শান্তি দেয়। সুস্থ মানুষ সাধারণতঃ স্বপ্ন কম দেখে পক্ষান্তরে দুর্ব্বল ও শিশুরাই সাধারণতঃ বেশী স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ইহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রুগ্ন লোকের মনের উপর কল্পনা বা চিন্তা সহজে যত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সুস্থ ও সবলদের উপর তাহা সম্ভব নয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম লোকদের অতৃপ্ত বা অকার্য্যকরী কামনা কম থাকে কাজেই তৃপ্তির কল্পনাও তাহার কম থাকে কিন্তু শিশুদের ও রুগ্নদের মনে অতৃপ্তির কথা সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। সুতরাং স্বপ্নে তাহাদের কামনা তৃপ্তির ইচ্ছাই প্রকটিত হয়। শিশু যখন স্বপ্ন দেখে যে সে অনেক চকোলেট খাইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে সে চকোলেট খাইতে ভয়ানক ইচ্ছুক অথবা ঐ দিন তাহার চকোলেট খাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের বৈষম্যের জন্য নানা কারণে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। তবে সকল লোকের স্বপ্নই নিম্নোক্ত তিন কারণের যে কোন এক কারণমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই যেমন (১) শৈশবের কোন স্মৃতি বা ইচ্ছা (২) যেদিন স্বপ্ন দেখা যায় সেইদিনকার অথবা তৎপূর্ব্বকার কোন আধ্যাত্মিক চিন্তার অস্পষ্ট স্মৃতি (৩) কোন দমিত ইচ্ছার কল্পিত তৃপ্তি।

কি কি প্রকারের ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হইতে দেখা যায় তাহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে প্রথমতঃ জ্ঞানগত ইচ্ছা যাহার পূর্ণতা লাভে কোন প্রকার বাধা নাই। যেমন শিশুদের চকোলেট খাওয়ার স্বপ্ন দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানগত ইচ্ছা কিন্তু তার পূর্ণতা লাভের পথ যথেষ্ট বাধাপূর্ণ। অধিকাংশ স্বপ্নেই এই ধরণের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যেমন আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি এবং আমার ইচ্ছা হইল তাহাকে আমার নিজের নিকট একান্ত-ভাবে পাইতে। কিন্তু এই ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ অসামাজিক বলিয়া আমি আমার মন হইতে এই ইচ্ছাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া দিয়াছি কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম যে তাহার সহিত আমার মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন স্বপ্নে অবচেতন মনের ইচ্ছাই অধিক পূর্ণ হইতে দেখা যায়। তাঁহাদের মতে অধিকাংশ অবচেতন ইচ্ছাই কামমূলক। ফ্রয়েড বলেন যে প্রত্যেক মানুষ তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে দুইটী প্রধান লক্ষ্য লইয়া। প্রথমতঃ কাম চেষ্টা (Sex urge)। দ্বিতীয়তঃ বড় হইবার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। (এস্থলে বলা আবশ্যক যে কাম (sex)কে তিনি অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আলোচ্য প্রবন্ধে সে আলোচনার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া তাহা বর্ণিত হইল না।) মানব দেহে কাম একটি বৃত্তি এবং এই বৃত্তির ইঙ্গিত অতি শৈশব হইতে পাওয়া যায়। কামবৃত্তির প্রধান রূপের নাম কামচেষ্টা। এই কামচেষ্টা নানাভাবে হইতে পারে এবং কামপাত্রও নানারূপ হইতে পারে। সাধারণ নীতি অনুযায়ী পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা কিন্তু নারীতে নারীতে এবং পুরুষে পুরুষে গভীরভাবে আকৃষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। এই ধরণের প্রেমের নাম সমকামিতা (Homosexual instinct)। স্বপ্নে অনেক সময়ে মানুষের অবচেতন সমকামিতা ইচ্ছার পূর্ণতা হইতে দেখা যায়। আরও কতকগুলি ক্রিয়া কামমূলক আছে, যেখানে কামচেষ্টা শুধু রতিক্রিয়ায় পর্য্যবসিত থাকে না। ইংরাজীতে ইহাকে Masochism, Sadism, Exhibitionism ও Observationism বলা হয়। Masochism অর্থ মর্ষণকাম অর্থাৎ কামপাত্র দ্বারা পীড়িত হওয়া, Sadism অর্থ সাধন রতি অর্থাৎ কামপাত্রকে পীড়ন করা, Exhibitionism অর্থ কামপাত্রকে নিজের রূপ দেখান ও Observationism অর্থ কামপাত্রের রূপ দেখা। ইহার প্রত্যেকটি কামমূলক বলিয়া স্বপ্নে আমাদের এই অবচেতন কামচেষ্টার পূর্ণতা ঘটে। সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট এই সমস্ত বিষয় অবান্তর মনে হইলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইহার প্রভাব খুবই বেশী। এ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা সহজবোধগম্য হইবে।

স্বপ্নে অনেক জিনিষ সোজাসুজি দেখা দেয় না। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Symbolisation অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট ঘটনাকে বা ভাবকে অন্য কোন স্থূল জিনিষে প্রতীকরূপে দেখা দেয়। মানুষের মনের দ্বারে একটি সদাজাগ্রত প্রহরী (censor) আছে এবং সে সর্ব্বদা সমস্ত অসামাজিক ইচ্ছাকে মনের অন্তস্তলেই আটক করিয়া দেয়। কিন্তু ঘুমের সময় প্রহরী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং অবচেতন স্তর হইতে অসামাজিক দমিত ইচ্ছাসমূহ আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করে। প্রহরীর ভয়ে উহারা সোজাসুজি দেখা না দিয়া প্রতীকরূপে দেখা দেয়। স্বপ্নে যে সমস্ত প্রতীক সাধারণতঃ দেখা দেয় মনোবিদ্‌গণ উহার প্রত্যেকটির অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রতীকগুলি যৌনভাবের প্রতিরূপ। স্বপ্নের আরও দুইটি বিশেষত্ব আছে যথা সংক্ষেপন (Condensation) ও অতিক্রান্ত (Displacement). সংক্ষেপন বুঝিতে গেলে ফ্রয়েড কর্ত্তৃক বর্ণিত সেদেশের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা চলে। একবার একজন মেমসাহেব স্বপ্ন দেখেন যে জানালা বন্ধ করিতে যাইয়া তিনি একটি পাখীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণতঃ এ রকম ঘটনা জীবনে খুবই কম হইতে দেখা যায় বিশেষ করিয়া উক্ত মেমসাহেবের জীবনে ঐরূপ ঘটনা কোনদিনই ঘটে নাই। ফ্রয়েড তখন ঐ স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিয়া জানিতে পারিলেন যে উক্ত মেমসাহেব সেইদিন সন্ধ্যাকালে একটা জীবন্ত বিড়ালকে গরম জলে নিক্ষেপ করিবার একটি গল্প পড়িয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে তিনি নিজেও প্রজাপতি জাতীয় একটি পোকাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর্সেনিক দিয়া প্রজাপতি হত্যা করা তাঁহার খেয়াল ছিল, জীবজন্তুর উপর তাঁহার মায়া খুবই কম ছিল। শুধু তাহাই নহে, যে জাতীয় প্রাণী তিনি জানালা বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার স্বপ্ন দেখেন সে বৎসর ঐ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে খুব মড়ক লাগিয়াছিল। ছেলেরাও ঐ পাখী হত্যা করিত এবং বিশেষ করিয়া একজন লোককে তিনি একটা পাখীর ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মেয়েটিও কীট-পতঙ্গের ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া খেলা করিত ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মেমসাহেবের স্বপ্নটির পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত কারণ যথেষ্টই রহিয়াছে—উহা মোটেই অর্থহীন নহে। অনেকগুলি কারণ একত্র হইয়া একটি স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই একত্রীভূত হওয়াকে সংক্ষেপন (Condensation) বলা হয়।

বায়োস্কোপে আমরা যেরূপ ছবি দেখিয়া থাকি স্বপ্নেও আমরা সেইরূপ পরপর পরিষ্কার ছবি দেখিতে পাই। বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ সবই সারিভাবে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। তবে স্বপ্নে দৃষ্ট ছবির কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই, ভবিষ্যৎ হয়ত বর্ত্তমানের আগে আসিতেছে আবার বর্ত্তমান অতীতের পরে চলিয়া যাইতেছে এইরূপ এলোমেলো ভাবকেই ইংরাজীতে Displacement এবং বাংলায় অতিক্রান্তি বলে। হয়ত আমি স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্ন দেখিয়াছি অর্থাৎ স্বপ্ন দেখিতেছি যে জাগিয়া উঠিয়া পুনরায় ঘুমাইয়াছি এবং সেই ঘুমে দৃষ্ট স্বপ্নটি পরমুহূর্ত্তে জাগিয়া

সকলকে ঘুমাইয়া দিয়েছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তখনও স্বপ্নই দেখিতেছি। অথবা হয়ত পরীক্ষার পূর্ব্বে ছাত্র ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে যে পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সে উহা হইতে সংগোপনে সমস্ত টুকিয়া লইতেছে এবং ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিতেছে অথচ এই দৃশ্যটি সে নিজেই দেখিতেছে। স্বপ্নে দৃষ্ট এই ঘটনাবলীর ক্ষণিক সমাবেশ ভারী কৌতূহলোদ্দীপক।

এক প্রকারের স্বপ্ন আছে যাহা প্রত্যেকেই জীবনে অন্ততঃ দুই একবার দেখিয়াছেন। পাঠকবর্গ নিজেদের দৃষ্ট স্বপ্নাবলীর কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন যে নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করা, উঁচু জায়গা হইতে পতন, হাতী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর পাল্লায় পড়া, জলে পড়া, দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া, অর্থলাভ, বাঞ্ছিতজনের সহিত মিলিত হওয়া ইত্যাদি। কাহারও রাত্রি সুখস্বপ্নে প্রভাত হয় আবার কাহারও দুঃস্বপ্ন শেষই হইতে চাহে না। ইহার মধ্যে নগ্ন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইবার স্বপ্নটি সার্ব্বজনীন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘুমের ঘোরে যখন হঠাৎ কাপড় খুলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় আছেন তখন এই স্বপ্ন হইয়া থাকে। এখানে শারীরিক কারণ বিদ্যমান। কিন্তু ঐরূপ না থাকিয়াও যখন লোকে নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করা স্বপ্ন দেখেন সেখানে মনোবিদ্‌গণ বলেন যে স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁহার শিশুকালের সরল অসঙ্কোচ ভাবটি ফিরিয়া পাইতে চাহেন। দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াটা মেয়েদের সার্ব্বজনীন স্বপ্ন। মেয়েরা স্বপ্ন দেখেন যে ভীমাকার দৈত্যের মত ডাকাত দল লাঠি ও বর্শা হাতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা বাঁচিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়া ঐ ডাকাতের হস্তস্থিত লাঠি ও অস্ত্রের আঘাত খাইতেছে। ফ্রয়েড এই স্বপ্নের ডাকাতের আক্রমণকে কামজ আক্রমনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনোবিদদের মতে উচ্চস্থান হইতে পতন নৈতিক অধঃপতনের ইচ্ছারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বপ্নে এরোপ্লেনে চড়িয়া বেড়ান, দোলনায় দোল খাওয়া বা উড়িয়া বেড়ান অর্থ যৌন ক্ষুধার পরিতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা। স্বপ্নে দৃষ্ট রাজা, পুলিশ, শাসন কর্ত্তা প্রভৃতি পিতার প্রতীক, রাণী মাতার প্রতীক এবং গৃহ শরীরের প্রতীক। এদেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে সাপ স্বপ্ন দেখিলে মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হয়, ফুল দেখিলে বিবাহ হয়, জল সন্তান ভাগ্যের সূচনা করে ইত্যাদি। ইহাতেও ঐ প্রতীকের ক্রিয়াই অনুভূত হয়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একটি কথা সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে সে মারা গিয়াছে, নতুবা বলিবেন যে স্বপ্নে দেখিলাম আমার অসুখ হইবে জাগিয়াই দেখি যে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি কিংবা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয় কি করিয়া এবং স্বপ্নে ঔষধই পাওয়া যায় কিরূপে? ইহারও প্রত্যেকটির বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। স্বপ্ন কখনও ভবিষ্যৎ বলিতে পারে না। কেউ স্বপ্ন দেখিল যে তাহার আত্মীয় মারা গিয়াছে আর কিছু দিন পর সেই আত্মীয় মারা গেল, ইহা হঠাৎ ঘটিয়া থাকে অনেকটা কাকতালীয়বৎ। কেউ স্বপ্নে দেখিল যে সে বিদেশে গিয়াছে। এখানে দেখা যাইবে যে বিদেশে যাওয়ার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা তাহার মনের মধ্যে সুপ্তভাবে অবচেতন স্তরে আছে। স্বপ্ন দর্শনের পর সর্ব্বদাই সে বিদেশ যাত্রার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি কখনও হঠাৎ উহা সফল হয় তখন আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে স্বপ্নটি ফলিয়াছে। কেহ হয়ত তাহার পিতার মৃত্যু স্বপ্ন দেখিল। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে সেই লোকটির শিশুকালের মনঃসমীক্ষণ করা প্রয়োজন। শিশুকালে সে নিশ্চয়ই তাহার পিতাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত এবং তাহার পিতার মৃত্যু কামনা করিত। (এই ইচ্ছা কিন্তু প্রত্যেক শিশুর মনেই বিদ্যমান। ছেলে তাহার পিতাকে এবং মেয়ে তাহার মাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। শুধু তাহাই নহে, শুনিয়া অবাক হইবেন যে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মনে বিধবা হইবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যেক মানুষের আত্মহত্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। মনের সদাজাগ্রত প্রহরী (censor) এই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয় এবং চিন্তার মোড় ফিরাইয়া দেয়। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ মৃত্যুকে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ করিয়া অনেক সময় 'অনুপস্থিতি' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কথাটা শুনিলে যদিও সকলেই একবার শিহরিয়া উঠিবেন কিন্তু একথা সত্য যে তিনিও একদিন ঐরূপ মৃত্যু কামনা করিয়াছেন।) শিশু মনের এই ইচ্ছাটি পরিণত বয়সে স্বপ্নে সফল হয়। কিন্তু স্বপ্নে দৃষ্ট এই ঘটনাটি স্বপ্নদ্রষ্টা ভুলিয়া যান। এইরূপ ঘটনা 'ভুল' হইবার যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক কারণ ভবিষ্যতে 'ভুল' সম্পর্কে আলোচিত হইলে তখন তাহা বুঝিতে পারিবেন। একদিন হঠাৎ যখন তাহার পিতা সত্য সত্য মারা যায় তখন তাহার মনে হয় সত্যই ত স্বপ্নে 'আমি আমার মৃত্যুঘটনা দেখিয়াছিলাম।' ইহা ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণ আছে যেমন ব্যথা পাইবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। 'ব্যথা' সম্পর্কেও ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে। কেহ যদি স্বপ্নে দেখে যে তাহার পায়ে ভীষণ ব্যথা হইয়াছে এবং কিছুদিন পর সত্য সত্যই পায়ে ব্যথা হয়। সে সম্পর্কে মনোবিদ্‌গণ বলেন যে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ নানাবিধ কাজে ব্যাপৃত থাকে কাজে কাজেই তাহার শরীরের ছোটখাট কোন অসুখ বা যন্ত্রণার কথা সে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ঘুম আসিলে মনের প্রহরী নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখন শারিরীক (physiological) কারণে ঐ ছোট খাট অসুস্থতার কথা স্বপ্নে ভাসিয়া উঠে। ঘুম হইতে উঠিবার পর স্বপ্নদ্রষ্টা ঐ অস্বাচ্ছন্দ্যতার কথা পুনরায় ভুলিয়া যান কিন্তু স্বপ্নের কথা মনে থাকে। এক্ষেত্রেও ঐ ভুলের খেলা লক্ষ্য করিবার বিষয়। লোকটি তাহার ব্যথার কথা ভুলিয়া যাইবার পর শেষে যেদিন ব্যথা বেশী হইয়া দেখা দেয়, সেদিন তাহার ঐ পায়ের ব্যথা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের কথা স্মরণে আসে। কাজেই স্বপ্নেদৃষ্ট অসুখ ফলবতী হইল।

স্বপ্নে ঔষধ পাওয়ার কথা ও প্রত্যাদেশ হওয়ার কথাও প্রায়ই শুনা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নে ঔষধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় এরূপ শুনা গিয়াছে। মনোবিদ্‌গণ ইহারও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রোগী বা তাহার প্রতিনিধি তাহার একটি প্রবল ধারণা লইয়া ধর্ণা দিতে থাকে 'কিসে ব্যাধিমুক্ত হইবে'। এই দৃঢ় ইচ্ছাটিই তাহার মনের সচেতন এবং অবচেতন সর্ব্ববিধ স্তরেই ঘুরিতে থাকে কাজে কাজেই স্বপ্নে তাহার ইচ্ছার তৃপ্তি হয় অর্থাৎ রোগেদমনের ইচ্ছাটা নানা উপায়ে স্বপ্নে সফল হয়। কেহ ঔষধের খোঁজ পায় এবং কেহ বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার আদেশ পায়। আসলে এই ঔষধ বা প্রক্রিয়ার খোঁজ রোগীর অবচেতন মনের কথা। স্বর্গ হইতে কোন দেবতাই বলিতে আসেন না। হাতে যে ঔষধ পাওয়া যায় ঐটা অনেক সময় মন্দিরের লোকেরা ঘুমন্ত রোগীর হাতে গুঁজিয়া দেয়। রোগীর 'বিশ্বাস' হইল ঐ ঔষধেই তাহার রোগ সারিবে এবং সেই জোরেই সে ভাল হয়। বিশ্বাসদ্বারা এইরূপভাবে রোগমুক্তির কথা ইতিপূর্ব্বেই ১২শে আষাঢ় ১৩৬৯ সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। সেখানে দেখাইয়াছিলাম প্রাচীন গ্রীস, এসিয়া মাইনর, ইতালী, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে রোগীগণ কিভাবে মন্দিরদ্বারে ধর্ণা দিয়া নিজেদের ব্যাধিমুক্ত করিত। কিভাবে রোগীগণ মন্দিরে রাত্রিযাপন করিত এবং স্বপ্নমধ্যে দেবতারা আসিয়া রোগারোগ্যের উপায় বলিয়া দিতেন। স্বপ্নে এরূপ দেখা যাইত যে দেবদেবীগণ ব্যথিতের পার্শে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন বা ব্যথার স্থানে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। স্বপ্ন-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচারে ঐ একই ফলাফল পাওয়া যাইবে। রোগ যে বিশ্বাসের জোরে ও 'অটোসাজেশন'-এর জোরে সারে তাহা বলাই বাহুল্য। এই 'অটোসাজেশন' সম্বন্ধেও বিগত ১ই শ্রাবণ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকাতে আলোচিত হইয়াছে।

স্বপ্নের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা লিখিয়াই প্রসঙ্গ শেষ করিব। কেহ কেহ বলেন 'স্বপ্নে আপন দেখিলে পর হয়' যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'Dreams should be interpreated in the reverse' এই

বিপরীত ভাবকে Inversion বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যদি স্বপ্নে দেখা যায় এক ব্যক্তি অপরকে হত্যা করিতেছে তখন বুঝিতে হইবে ঐ (স্বপ্নে নিহত) ব্যক্তিটিরই প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবার ইচ্ছা আছে। মনোবিদগণ বলেন যে বাস্তব ক্ষেত্রের চিন্তাসমূহ অনেক সময় সেই চিন্তার বিপরীত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের প্রহরীর ক্রিয়াতেই যে ঐরূপ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ধরণের স্বপ্ন অধিকাংশই অসামাজিক (unsocial) ধরণের হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক ব্যক্তি কিসের স্বপ্ন দেখেন তাহার সবগুলি সঠিক জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক কিছুই জানিতে পারা যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বা মনঃসমীক্ষণের ক্রিয়ায় স্বপ্ন যে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। এখন হইতে আপনি যে সমস্ত স্বপ্ন দেখেন তাহার খুঁটিনাটি মিলাইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন আপনি নিজেই চমকিত হইবেন উহা কি ভাবে আপনার মনের দমিত ইচ্ছা কলিত তৃপ্তিমাত্র। স্বপ্ন বিশ্লেষণে কখনও কোন খুঁটিনাটি বাদ দিতে নাই, স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ত মনে করিতে পারেন যে ঐ সমস্ত ছোটখাট অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনই সার্থকতা নাই কিন্তু যিনি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবেন তাহার নিকট কিছুই অকিঞ্চিৎকর নহে। তাহার নিকট এই তুচ্ছ অংশগুলির প্রয়োজনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

যাহা হউক ফ্রয়েড ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী স্বপ্নতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া উহা আমাদের অনেকটা সহজ বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন।* মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বপ্ন আর আধা আলো ও আধা আঁধারে ঘেরা রহস্যময় কিছু নহে। এ কথার সত্য মিথ্যা বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপরই রহিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কবিতায় তাঁহার কবি-ধর্ম্মটিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাঁহার সম্বল একটি বীণা বা বাঁশরী। তিনি বলেন, তাঁহার কাছে কেহ যেন সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা না করে। যাহাতে মানুষের সমাজ, সংসার বা রাষ্ট্রের কোন শ্রেয়ঃ বা সুবিধা হইতে পারে তাঁহার কাছে এমন কিছুর প্রত্যাশা নাই। লৌকিকতা ব্যবহারিক জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির কোন হদিশ তাঁহার কাব্যে মিলিবে না। 'বকুলবনের পাখীকে' আমরা যে চোখে দেখি কবিকে সেই চোখেই দেখিতে হইবে। কবির জীবন অকারণ উল্লাস ও অনাবশ্যক রসবিলাস দিয়া গড়া—সেখানে কোন কর্ম্মের স্থান নাই।

'আবেদন' কবিতায় কবি তাঁহার জীবনদেবতা বা রসলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—'নিকুঞ্জের অনুচর আমি তব মালঞ্চের হ'ব মালাকর।' বাণীরূপা জীবনদেবতা তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি, বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত, তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন।
রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে হবে তোর ঘর,
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

সৈন্য, সেনাপতি, মন্ত্রী ও অমাত্যগণ যে কাজ করে, কবির কাজ সে শ্রেণীর নয়। কবির কাজ শুধু মালাগাঁথা। ইহাকে কাজ বলিবে, বল। মহারাণীর সেবায় ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে তাহার ঘর, রাজসভায় তাহার ঠাঁই নাই। সাধারণ লোকের এই মালঞ্চের মালাকরের সহিত কোন সম্পর্কও নাই। এখানে কবি বলিতে চাহিতেছেন—"কর্ম্মক্ষেত্রে—যেখানে কার্য্যক্ষেত্রের জনতায় কর্ম্মীরা কর্ম্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্য্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" (চিত্রার ভূমিকা)।

কবি তাঁহার রচনাকে প্রদীপের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন—কিন্তু এ প্রদীপে কোন গৃহ, উৎসব ক্ষেত্র বা সভাস্থল আলোকিত হইবে না, এ প্রদীপ স্রোতের জলে অকারণে ভাসিয়া যায়। এ প্রদীপ আকাশ-প্রদীপ হইয়া শূন্য গগন কোণে অকারণে দীপ্তি বিস্তার করে অথবা এ প্রদীপ দীপালীতে লক্ষ দীপের সঙ্গে অকারণে জ্বলিতে থাকে।

কবি তাঁহার উপাস্যের নিকট নিজের জীবনযাপনের পরিকল্পনা দিয়া বলিয়াছেন—

"ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র।"
দেখ কত জন মাগিছে রতন ধূলি
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,
ভরি নিতে চাহে কেহ বিত্তের ঝুলি
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।

আমার এসব কিছুই চাই না।

"নগরের হাটে করিব না বেচা কেনা
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে।
পাবো না কিছুই রাখিব না কারো দেনা
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।"

আমি শুধু তরুতলে বসিয়া নানা ছন্দে বীণা বাজাইব।"

আর একটি কবিতায় কবি বলিয়াছেন—তিনি বিশ্বরাজের সিংহদুয়ারে বাঁশী বাজাইবার ভার পাইয়াছেন। তাঁহার আর কোন কাজ নাই। এ বাঁশী তিনি বাজাইয়া চলিবেন—থামিবেন না। কিন্তু কে শুনিবে? দলে দলে লোক আপন আপন বোঝা বহিয়া চলিয়া যায়—তাহারাই ক্ষণিকের জন্য পথের ধারে বোঝা ফেলিয়া যখন বিশ্রাম করে, তখন বাঁশীর গান তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে। এই বাঁশীর গান শুনিয়া, তাহারা যে পাখীর গান কখনো শোনে নাই, সেই পাখীর গান কান পাতিয়া শোনে। যে ফুল কখনো তাহাদের চোখে পড়ে নাই—সে ফুলের তাহারা আদর করে—"যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পায় যেন হারা ধন"।

কিন্তু কবি সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাঁশী বাজান না। কে শুনিল—না শুনিল তাহাতে তাঁহার আসে যায় না। তিনি আত্মানন্দে বিভোর। লোকের চিত্তরঞ্জন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কাব্য রচনা করেন না। আত্মতৃপ্তিই তাঁহার পুরস্কার। তাঁহার মধ্যেই যে রসজ্ঞ কবি-পুরুষটি বিরাজ করিতেছেন—তাঁহার রসাদর্শের অনুমোদিত হইল কিনা তাহাই জানিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা। জীবনদেবতা কবিতায় তাই কবি বলিয়াছেন—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?

'ভোরের পাখী' কোন কাজে লাগে না, কিন্তু সে একটা কাজ অন্ততঃ

করে—সে সকলের ঘুম ভাঙায়। কারণ, সে ভোর না হইতেই ভোরের খবর রাখে। রবীন্দ্রনাথ ভোরের পাখীর সঙ্গে কবিকে উপমিত করিয়াছেন। প্রত্যাসন্ন নব যুগের অগ্রদূত, কবি। যদি কান পাতিয়া শোন—তাহা হইলে শুনিবে—নব যুগের ভোরের পাখী বলিতেছে—

"প্রথম আলো পড়ুক মাথায় নিদ্রা ভাঙা আঁখির পাতায়
জ্যোতির্ম্ময়ী উদয়-দেবীর আশীর্ব্বচন মাগো।"

সাধারণ লোকের সঙ্গে এই কবির সম্পর্ক কিছুই নাই। সাধারণ তাহাকে চিনে না। তাহাদের চিনিবার প্রয়োজনও নাই।

"মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ডরে"

যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে—সাধারণ লোক তাহাকেই কবি বলিয়া মনে করে। 'গগন মূরতি গোপন চারী' কবিপুরুষটিকে তাহারা চিনেও না।

কিন্তু কবি সকলকেই চিনেন। তাই তিনি বলেন—

"তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে,
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতি রবে।
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কই তাহারে।"

এই কথাই কবি 'পুরস্কার' কবিতায় আরও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কেবল মানুষের কথা নয়, ইহাতে প্রকৃতির কথাও আছে।

"অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে ঝর্ঝর সঙ্গীতে।
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশ-হারা
সেথা হ'তে টানিল'ব গীতধারা ছোট এই বাঁশরীতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি 'দিব আমি সেই গীত আনি',
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থ ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাবো ঘনতর ছায়া
ক'রে দিয়ে যাব বসন্ত-কায়া বাসন্তী-বাস-পরা।
মুখ হাসি আরও হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হ'বে নয়নের জল,
স্নেহ-সুধামাখা বাস গৃহতল আরও আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে',
আরেকটু স্নেহ শিশু-মুখ'পরে শিশিরের মত রবে।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়কটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর তার পরে ছুটি নিব।"

কবি তাঁহার কবিধর্ম্ম ও কবিব্রতের কথা এই সকল কবিতায় বলিয়াছেন বটে—কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কতটুকু? তাঁহার কবি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী—অন্তর মাঝে বসি অহরহ মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া তাহাতে আপন সুর মিশাইতেছেন—কবির প্রেমে আপন রাগিণীর সংযোগ করিতেছেন—গানে গানে তাহার দিক্ ভুলাইয়া দিতেছেন। তাই কবি বলিতেছেন—

"যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছি কাহার বারতা কারে শুনাবার তরে।"

কবি যেন এই দেবতার হাতের বীণাযন্ত্র—ব্যথায় হৃদয়ের তারগুলি পীড়ন করিয়া এই দেবতা যেন মর্ম্মমাঝে মূর্চ্ছনা তুলে গীতঝঙ্কার ধ্বনিত করিতেছেন। কবি যেন—বিশ্ব দেবতার মহামন্দির তলে ঐ দেবতার হাতে জ্বালা প্রদীপ। কবি তাঁহার জীবনদেবতার 'স্বেচ্ছাবন্দী দাস'।

কবি তাঁহার জীবননিয়ন্ত্রী অন্তর্যামিনীর হাতের যন্ত্র হইয়া গান গাহিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মহত্তর ব্রত তিনি হারাইয়াছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়াছেন—

"কেন নিয়ে এলে তব মায়া রথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে
কেন রাখিলে না সবার জগতে জনতার মাঝখানে?"

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি? সোনার ধানের তরীতে তাঁহার ঠাঁই নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশও করিয়াছেন—কিন্তু তাহা ক্ষোভ মাত্র। তাহাতেও তিনি তাঁহার মহত্তর ব্রতের সন্ধান লাভ করেন নাই। কবি তাঁহার কবিজীবনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নাই—সেই সঙ্গে তাঁহার কবিজীবনের কোন দায়িত্বও গ্রহণ করেন নাই। তাই তাঁহার রচনার অর্থসঙ্গতির জন্যও তিনি দায়ী নহেন।—

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার
কেহ এক বলে কেহ বলে আর
আমারে শুধায় বৃথা বার বার দেখে তুমি হাস বুঝি?

কবি বলেন— অর্থ কি, আমি তার কি জানি?
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে থাক
যতদিন থাকে ততদিন থাক
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধুলার মাঝে।

আমার ইহাতে কোন দায়িত্ব নাই।

কবি এজন্য কোন পুরস্কার চাহেন না—ফলাফলের জন্য দায়ী তিনি নহেন—কাহারও কাছে তাঁহার কোন দাবি নাই—তাঁহার গান বা দানের জন্য কিছুই প্রত্যাশা করেন না। নিজের সৃষ্টির জন্য কোন মমতাও পোষণ করেন না। এ যেন নিজেকে অহংবোধহীন নিমিত্ত মাত্র মনে করিয়া কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ।

সমগ্র জগতের সহিত তাঁহার গানের বা কবি জীবনের লীলার কোন সম্পর্ক আছে কবি তাহা যেন স্বীকারই করেন নাই। কোকিল মুকুলিত সহকারবৃক্ষে বসিয়া পঞ্চমে কূজন করে—বসন্ত ঋতু তাহাকে কূজন করায় তাই সে—কূজন করে। তাহার নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই। এই কূজন কাহারও কাহারও কাণে প্রবেশই করে না—আবার কাহারও বা কাণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে—কত স্মৃতি কত স্বপ্ন জাগায় তাহার মনে—তাহার সমস্ত জীবনকে আলোড়িত করিয়া তুলে। কোকিল সে কথা জানেও না—জানিতে চায়ও না। নির্ব্বিকার চিত্তে সে কূজন করিয়াই চলে। কবি যেন এই বসন্তের কোকিলেরই মানবরূপ।

এই সকল কবিতায় কবি তাঁহার যে জীবন-সত্তার কথা বলিয়াছেন, তাহা কবির জীবন ব্রত সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য নয়। এই গুলিতে তিনি তাঁহার জীবন দেবতাকে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী তুমি অন্তর-বাসিনী—

এইরূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু এই জীবনদেবতাই যে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্ররূপিণী—এই সত্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। "জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে দুইই সত্য, আকাশ ও ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।" জীবনদেবতা শুধু কবির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী ও নিয়ন্ত্রী নহেন—তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনেরও অধিষ্ঠাত্রী। তাই তিনি বহির্জগতে বিচিত্ররূপিণী। কবি জীবনদেবতার ঐ বিচিত্ররূপের আহ্বানে ও সাড়া দিয়াছেন—এবার ফিরাও মোরে কবিতায়। কবি নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন—

"সংসারে সবাই যবে সারা ক্ষণ শতকার্য্যে রত
তুই শুধু ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী। ওরে তুই ওঠ আজি।"

তারপর কবি বহির্জগতে মানব জাতির দুঃখদুর্গতির চিত্র অঙ্কন করিয়া নিজেকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—কেবল বাঁশী বাজাইবার জন্ত কবির জন্ম নয়—আত্মকেন্দ্রিক হইয়া আত্মানন্দে বিভোর থাকাই কবির ব্রত নয় —বহির্জগতেও কবির মহাব্রত আর্ত্তকণ্ঠে রহিয়াছে—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা.
ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ইত্যাদি।

নিজেকে আহ্বান করিয়া কবি আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

কবি তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লও সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষ পট। এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

'রঙ্গময়ী কল্পনার কাছ হইতে বিদায় লইয়া কবি তাই মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে মুহূর্ত্তের জন্তও কর্ম্মহীন জীবনের এক প্রান্ত তরঙ্গায়িত করিতে, দুঃখকে ভাষা দিতে, স্বর্গের অমৃতের জন্ত গভীর পিপাসায় সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতে' চাহিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার বাঁশীতে শেখা সুর, তাঁহার বাঁশীতে গাওয়া গান ধন্ত হইবে।

এহো বাহ্য। বিচিত্রের এটা একটা রূপ, কিন্তু ইহা তাহার প্রাকৃত রূপ। ইহাতেই কবির ব্রত শেষ নয়। বৃহত্তর জগতে বিচিত্রের একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে—তাহার আহ্বানেও কবিকে সাড়া দিতে হইবে।

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুব তারা
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।—

তাহাতেও শেষ নয়—জীবনসর্ব্বস্ব ধন জন্ম জন্ম ধরিয়া কবি যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন—তাঁহাকে চিনেন আর নাই চিনেন, তাঁহারই অভিসারে কবিকে যাইতে হইবে।

যাহার উদ্দেশে মানব-যাত্রী ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতের মধ্য দিয়া মহাব্রত শিরে ধরিয়া, অন্তর প্রদীপখানি সাবধানে জ্বালাইয়া, যুগ হইতে যুগান্তরে যাত্রা করিয়াছে, যাহার আহ্বানে নির্ভীক প্রাণে সে সঙ্কট-আবর্ত্ত মাঝে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বক্ষ পাতিয়া সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ছুটিয়াছে, প্রেমের ইন্ধনে হোমহুতাশন জ্বালিয়া হৃৎপিণ্ডকে উৎপাটিত করিয়া রক্ত পদ্মের ন্যায় পূজোপহার দান করিয়া মরণে প্রাণকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে, যাহার চরণে মানী তাহার মান, ধনী তাহার ধন, বীর তাহার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, তাহার উদ্দেশেই কবিকে অনন্তের পথে যাত্রা করিতে হইবে। তাঁহাকেই অন্তরে ধারণ করিয়া সুখে দুঃখে অবিচলিত ও প্রতি দিবসের কর্ম্মে নিরলস থাকিয়া সকলকে সুখী করিয়া জীবন-কণ্টক-পথে একাকী চলিতে হইবে।

কবি আশা করেন—

তার পরে দীর্ঘ পথ শেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্ত পদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। হয়ত ঘুচিবে দুঃখ নিশা
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেমতৃষা।

কবির জীবন-ব্রত সম্বন্ধে কবি এই কবিতার মধ্য দিয়া যাহা বলিয়াছেন —তাঁহার কাব্য সাধনার মধ্য দিয়া তাহা স্তরে স্তরে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা অনুসরণ করিতে হইলে কবিব্রতের এই স্তরগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কবির অকারণ আনন্দে ফেনিলোচ্ছল যৌবনের সার্থকতা শুধু গানেই বটে, শুধু দায়িত্বহীন কাব্যকূজনেই বটে. কিন্তু কবির সমগ্র জীবনের সার্থকতা তাহাতে নয়—প্রত্যেক কবির জীবনেই মহত্তর ব্রত আছে। কবি কোকিল নয়—কবি মনুষ্যত্বের সর্ব্ববিধ সম্পদে মণ্ডিত মহা মানুষ। মানবধর্ম্মের যাহা মহত্তম ব্রত সাধনা তাহাও কবিকেই করিতে হইবে। সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়াই এই ব্রত পালিত ও উদ্‌যাপিত হইতে পারে। ব্যবহারিক জগতের শ্রেয়: সাধনের সহিত এই ব্রতের হয়ত কোন সংযোগ নাই। কবি যৌবনে গুঞ্জন রত মধুকররূপে কাব্যে যে মধু সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার সহিত আমাদের লৌকিক জীবনের ক্ষুৎ-পিপাসার কোন সম্পর্ক ছিল না। আবার সুপরিণত বয়সে তিনি ধ্যান-সিন্ধু মন্থন করিয়া তাঁহার কাব্যে যে অমৃত সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাও ছিল তেমনি সর্ব্ববিধ লৌকিক প্রয়োজনের অতীত। রবীন্দ্রনাথের কবিব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে ব্যবহারিক জগতে নয়, আধ্যাত্মিক লোকে। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন—তিনি ঋষিও—আধ্যাত্মিক জগতের —চিন্তানায়কও—দেশে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বার্ত্তাবহ—ঋত্বিক— সত্যদ্রষ্টা ও মহাসত্যের প্রচারক।

কয়লা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

একটী ঘটনা চক্ষের সম্মুখে ঘটিলে, উপস্থিত দ্রষ্টাদের প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্রভাবে উহার বিবরণ জানিতে চাহিলে প্রায়ই প্রত্যেকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভে অবস্থিত কোনও বস্তুর পরিমাণ সম্বন্ধে যে সকলে একমত হইবেন, তাহা আশা করা যায় না। তাহা ছাড়া, ব্যবহারিক জগতে কয়লার গুণের উপর নির্ভর করিয়া নানা নাম আছে; * সেখানেও পরিমাণ লইয়া মতদ্বৈধতার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পৃথিবীর কত নিম্নস্তর হইতে কয়লা তুলিয়া লাভজনকভাবে কাজ চলিবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতরা

* কয়লার কার্ব্বণ অংশ ও বিভিন্ন শ্রেণী :—
এ্যানথ্রাসাইট (Anthracite) শতকরা ৯৩ হইতে ৯৫ ভাগ কার্ব্বণ A শ্রেণী
সেমি-এ্যানথ্রাসাইট

কখনই একমত নহেন ; সুতরাং পৃথিবীর মোট কয়লা ভাণ্ডারের আলোচনা করিতে গেলে মোটামুটী অনুমানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়।

অনুমান, সকলপ্রকার কয়লা ৭,৩৯,৭৫৫ কোটী ৩০ লক্ষ টন পৃথিবীর ভাণ্ডারে জমা আছে ; তাহার মধ্যে মুখ্য বা প্রকাণ্ড কয়লা একচতুর্থাংশেরও কম বলিয়া অনুমান করা হয়। মহাদেশ হিসাবে ধরিলে আমেরিকার সর্ব্বাধিক পরিমাণ কয়লা অবস্থিত ; পরিমাণ, ৫,১০,৫৫২ কোটী ৮০ লক্ষ টন। তাহার পরেই এশিয়া মহাদেশের স্থান, এবং পরিমাণ ১,২৭,৯৫৮ কোটী ৬০ লক্ষ টন বলিয়া ধরা হয়। পরে ইউরোপ ৭৮ হাজার ৪১৯ কোটী টন, ওশিয়ানিয়া ১৭ হাজার ৪১ কোটী টন এবং আফ্রিকা ৫ হাজার ৭৮৩ কোটী ৯০ লক্ষ টন।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিভিন্ন প্রকারের কয়লা এবং তাহাদের স্বতন্ত্র পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

প্রতি মহাদেশে কয়লার আনুমানিক পরিমাণ

	A	B ও C	D	মোট
	কোটী টন	কোটী টন	কোটী টন	কোটী টন
ওশিয়ানিয়া	৬৫·৯	১৩,৩৪৮·১	৩,৬২৭·০	১৭,০৪১·০
এশিয়া	৪০,৭৬৩·৭	৭৬,০০৯·৮	১১,১৮৫·১	১,২৭,৯৫৮·৬
আফ্রিকা	১,১৬৬·২	৪,৫১২·৩	১০৫·৪	৫,৭৮৩·৯
আমেরিকা	২,২৫৪·২	২,২৭,১০৮·০	২,৮১,৪৯০·৬	৫,১০,৫৫২·৮
ইউরোপ	৫,৪৩৪·৬	৬৯,৩১৬·২	৩,৬১৮·২	৭৮,৪১৯·০
মোট	৪৯,৬৮৪·৬	৩,৯০,২৯৪·৪	২,৯৯,৭৬·৩	৭,৩৯,৭৫৫·৩

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ১৫০ কোটী টন কয়লা সমস্ত দেশ হইতে উৎখাত হইয়া থাকে ; তাহার মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বপ্রধান, প্রায় ৪৬ কোটী টন ; তাহার পরেই যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডমএর স্থান হইলেও আমেরিকার প্রায় অর্দ্ধেক। যুদ্ধের হাঙ্গামায় অনেক দেশেরই সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না ; তথাপি কতক পুরাতন অঙ্ক এবং কতক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দেখা যায় পরে জার্ম্মাণী, রুশ, প্রত্যেকেই ১৯৪০ সালে ১৫ বা ততোধিক কোটী টন এবং জাপান, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, ভারতবর্ষ, বেলজিয়ম, চায়না, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য, চেকোস্লোভেকিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যাণ্ড, কানাডা ও মাঞ্চুরিয়া প্রত্যেকেই ৫ কোটী হইতে হ্রাস পাইয়া ১ কোটী টন পর্য্যন্ত কয়লা উঠাইয়াছে। স্পেনের অংশ ৮৮ লক্ষ টন। তাহার পরই তুরস্ক মাত্র ত্রিশ লক্ষ টন এবং অপরাপর দেশ হইতে আরও কম উঠিয়াছে।

এ্যান্থ্রাইসাইট ও হাই কার্ব্বণ বিটুউমিনস্ (High carbon bituminons)	৮০	„	৯০	„	„	B_1 „
বিটুউমিনস্ (Bituminons)	„	৭৫	„	৯০	„ „	B_2 „
লো-কার্ব্বণ (Low carbon) বিটুউমিনস্	„	৭০	„	৮০	„ „	B_1 „
ক্যানেল (Cannel)	„	...		...		C
লিগ্‌নাইটিক (Lignitic) বা সাব্-বিটুউমিনস্	„	৬০	„	৭৫	„ „	D_1 „
লিগনাইট (Lignite)	„	৪৫	„	৬৫	„ „	D_2 „

Monograph on Mineral Resources with special reference to the British Empire—Coal—

J. H. Ronaldson, M. I. M. E, F. G. S., etc London (1920)

* N. Ronaldson, Lodon 1920, loc cit.

পৃথিবীতে উৎখাত কয়লার পরিমাণ

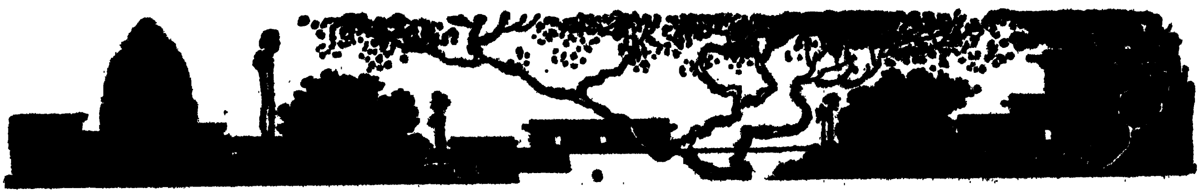
(১৯৪০)

মোট—১৫০,০০,০০,০০০ টন

দেশ	হাজার টন
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A)	৪৫,৬৫, ৮১
যুক্তরাজ্য (U. K.)	২৩, ০৬,৫৮ (১৯৩৮)
জার্ম্মাণী	১৮,৬০,৭৯ („)
রুশ গণতন্ত্র (U. S. S. R.)	১৪,৬৮,০০
জাপান	৫,৩০,০০ (১৯৩৮)
ফ্রান্স	৪,৬৫,০০ („)
পোল্যাণ্ড	৩,৮১,০৪ („)
ভারতবর্ষ	২,৬৪,৯৬
বেলজিয়ম	২,৫৬,০৫
চীন	১,৭৮,০০
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য (Un. of S. Africa)	১,৭৯,৯৩
চেকোস্লোভাকিয়া	১,৩৮,১৪ (১৯৩৮)
অষ্ট্রেলিয়া	১,৩৭,৫২ (১৯৩৯)
নেদারল্যাণ্ড	১,২৮,৬১ („)
কানাডা	১,০৬,২৮
মাঞ্চুরিয়া	১,১০,০০
স্পেন	৮৮,৪৯
তুরস্ক	৩০,১৯
ইন্দোচীন	২৯,৫৬
ইটালী	২০,২৫ (১৯৩৯)
পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জ	২০,০৯
চিলি	১৯,৩৭
ব্রেজিল	১৩,৩৬
হাঙ্গেরী	১২,০৭
নিউজীল্যাণ্ড	১১,৬৩
দক্ষিণ রোডেসিয়া	১১,১৮ (১৯৩৯)

১০ লক্ষ টনের কম ও ৫ লক্ষ টনের বেশী : মেক্সিকো, কলম্বিয়া। ৫ লক্ষ টনের কম ও ২ লক্ষ টনের বেশী: স্পিটস্‌বার্জেন (১৯৪০-৪ লক্ষ টন), নাইজিরিয়া, মালয়, পর্টুগাল, রুমানিয়া, সুইডেন, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)



জঙ্গম

বনফুল

৩৫

ভিতরে উত্তেজিত হইলে উৎপল বাহিরে খুব শান্ত হইয়া পড়ে। ভ্রূ-উত্তোলন করা, পা দোলানো, গোঁফে তা দেওয়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষগুলি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়, এমন কি তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও অচঞ্চল হইয়া পড়ে। শঙ্কর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন এইরূপ তুরীয় অবস্থায় সে নীচের ঘরে বসিয়া রেডিও শুনিতেছিল। শঙ্কর ঢুকিতেই সে রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিল। প্রবেশ করিয়াই শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "খবর জান ?"

"খুব জানি। জাপানীরা সিটাং নদী পেরিয়ে আঠারো মাইল এগিয়েছে। রেঙ্গুন যায় যায়—"

"সে খবরের কথা বলছি না। মণির কথা বলছি। মণির খবর জান ?"

"মণির খবর তোমার জানবার কথা, আমার নয়"

"জমিদারি কিন্তু তোমার এবং মণি তোমারই প্রজা"

"সেটা কাগজে কলমে, আসল মালিক তুমি—"

বলিয়া সে হাসিল। শঙ্করের ইচ্ছা করিতে লাগিল উৎপলের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া দিতে, ছেলেবেলায় চটিয়া গেলে যেমন মাঝে মাঝে দিত। কিন্তু সে ছেলেবেলা আর নাই, উৎপলের সে ঝুঁটি নাই, সে উৎপলও আর নাই বোধ হয়। তাই সে সব কিছু না করিয়া কেবল বলিল "ননসেন্স"।

একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

শঙ্করের আগমনে এবং কথাবার্ত্তায় উৎপলের উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছিল। তাহার চোখের স্বাভাবিক কৌতুক দীপ্তিও ফিরিয়া আসিয়াছিল। শালটা সর্ব্বাঙ্গে ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিল—"তাহলে ভণ, শ্রবণ করি"

"তুই কিছুই শুনিস্ নি ?"

"বৈশম্পায়ন না বল্‌লে তো জন্মেজয়ের শোনবার কথা নয়। মহাভারতের ট্র্যাডিশন্ ওলটাই কি করে' বল"

শঙ্কর আরম্ভ করিতে যাইতেছিল উৎপল বলিল—"দাঁড়াও"

সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে উৎপল চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিল।

"আমাকেও দে একটা"

উৎপল ভ্রূ উত্তোলন করিল এবং একটু হাসিল। শঙ্করও হাসিতে যোগ দিল বটে কিন্তু মনে মনে সে যেন দমিয়া গেল।

মণির ব্যাপার সমস্ত শুনিয়া উৎপল বলিল, "আমাকে কি করতে বল"

"ব্যবস্থা কর"

"আমার ব্যবস্থা কি তোমার পছন্দ হবে"

"দেখ্, ফের যদি ওরকম করে' কথা বলিস এক ঘুসি মারব তোকে"

উৎপল হাসিল।

শঙ্কর বলিল, "ওরকম করে' গা বাঁচিয়ে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করতে হবে"

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, অর্থাৎ হঠাৎ ভাবপ্রবণ হয়ে তুমি যদি বাধা না দাও খুব ভাল ব্যবস্থা হতে পারে"

"আমার আপত্তি হবে কেন,"

উৎপল নীরবে বাম-গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

"কি ব্যবস্থা করতে চাও ?"

"বিকট রকম, অর্থাৎ ব্লিৎস্ ক্রিগ্"

"মানে ?"

উৎপল কিছুক্ষণ নীরবে গোঁফে তা দিল, তাহার পর বলিল, "শোন তাহলে। প্রথমেই ওই দারোগাটাকে টাকা দিয়ে হাত করতে হবে। গুলাব সিং যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশী দিয়ে আমাদের স্বপক্ষে আনতে হবে ওকে। দ্বিতীয়—জীবন চক্রবর্ত্তীর নামে কেসটা তুমি 'উইথড্র' করবে ভাবছিলে—তা না করে' 'ফুল্ কোর্সে' চালাতে হবে সেটা। তৃতীয়, রাজীব দত্তর ধানের গোলা আর পাটের গুদোমে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি, পরের সম্পত্তি নষ্ট করার মজাটা বুঝুন একবার ভদ্রলোক—তার আগে অবশ্য একটা ওয়ার্নিং দিতে পার—খেসারৎ স্বরূপ যদি হাজার টাকা দেন মাপ করতে পার এবারকার মতো। চতুর্থ, তোমার ওই নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে আজই জবাব দিয়ে দাও—আজই যেন তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ করেন—জবাব দেবার আগে থামে বেঁধে চাবকে দিলেও মন্দ হয় না। পঞ্চম—ওই গুলাব সিংকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। মণির হয়ে কেউ ওর নামে থানায় গিয়ে নালিশ করে' আসুক, আমাদের এলাকায় ওর যত মহিষ আছে সব আড়গড়া দিয়ে দাও, আর মুখে মুখে প্রচার করে' দাও (অর্থাৎ কথাটা যেন ওর কানে গিয়ে পৌঁছয়) যে ওর মাথাটা কেউ যদি কেটে এনে দিতে পারে তাকে হাজার টাকা বখশিস্ দেব আমরা। ষষ্ঠ—তোমার ওই লেফ্-ডাক্‌স্'দের—ফরিদ কারু আর কি কি নাম বলছিলে সেদিন, ওদের প্রত্যেককে ডেকে এনে বেশ করে চাব্‌কাও—তারপর বলে দাও যে ওরা যদি সব মণির স্বপক্ষে সাক্ষী না দেয় সর্ব্বনাশ করে দেব ওদের। সপ্তম—এ অঞ্চলের বেহারি বাঙালী যত উকিল মোক্তার আছে সবাইকে মণির তরফে নিযুক্ত করে' ফেল—যে দু'জন ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন তাঁরা যদি আমাদের পক্ষে আসতে রাজি না থাকেন তাঁদেরও আসামী করে' ফেল—আসামী করাই ভাল বোধ হয়। নবম—এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় পুলিশ কোর্স নিয়ে মণির সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কর—"

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

"এত না করলে হবে না ?"

"হবে না। হবে না—হবে না—খোল তলোয়ার এসব তৈয়ার

নহে তেমন। অবশ্য তোমার যদি মনে হয় বাঘের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে ফল হবে, করে' দেখতে পার—আমি কিন্তু সে সবের মধ্যে থাকব না।"

সিগারেটটা শেষ হইয়া আসিয়াছিল সেটা ফেলিয়া দিয়া উৎপল আর একটি ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তুমিও আর একটা ধরিয়ে ব্যাপারটাকে প্রণিধান কর। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি একটু—"

উৎপল চলিয়া গেল। শঙ্কর আর সিগারেট ধরাইল না। নীরবে বসিয়া রহিল। সে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। উৎপল কি ঠাট্টা করিতেছে? না, তাহা তো মনে হইল না! প্রয়োজন হইলে সত্যই সে যে এমন বীভৎস রকম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে তাহার সম্বন্ধে এ ধারণা তো শঙ্করের ছিল না কখনও। তাহার ধারণা ছিল উৎপল খামখেয়ালী এপিকিউরিয়ান মাত্র। তাহার আপাত-সৌম্য পেলব মূর্ত্তির অন্তরালে যে এমন একটা রাক্ষস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছিল। মণি এবং গুলাব সিংয়ের কথা ভুলিয়া শঙ্কর উৎপলের কথাই ভাবিতে লাগিল। আবাল্য পরিচিত উৎপলের মধ্যে এই অপরিচিত ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দেখিয়া মানব চরিত্রের বিবিধ সম্ভাবনা বিষয়েই আর একবার সে সচেতন হইল যেন। কিছুক্ষণ আগে ফুলশরিয়াকে দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। এতগুলি ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠানের তালিকা বেশ নির্ব্বিকার ভাবে দিয়া গেল তো! শক্তি আছে বলিতে হইবে। তখনই মনে হইল শক্তি যে আছে তাহা তো তাহার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শক্তি না থাকিলে কেহ কি নিজের স্ত্রীর জবানীতে প্রেম-পত্র লিখিয়া বন্ধুর নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারে? শক্তি না থাকিলে কেহ কি এতটাকা এমন অবহেলাভরে খরচ করিতে পারে? এত বড় সম্পত্তির সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আজ পর্য্যন্ত কোন প্রশ্ন করে নাই—কোন জবাবদিহি চাহে নাই। শক্তি আছে বই কি! এ শক্তির সম্মুখে কিন্তু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া রহিল। প্রতীকার-স্বরূপ উৎপল যাহা করিতে চাহিতেছে তাহাতে সায় দিবার শক্তি তাহার যে নাই! প্রতিশোধের কথা সে-ও যে ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়, কিন্তু সাধীর কবিতাটা মনে পড়িতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কুকুর কামড়াইয়াছে বলিয়া কুকুরকে কামড়াইতে হইবে! তোমার যদি মনে হয় বাঘের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পড়লে ফল হবে, করে' দেখতে পার···উৎপলের কথাগুলি মনে পড়িল। সত্যই কি উহারা বাঘ? সত্যই কি এ উপমা খাটে? পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল এখনই তো সে নিজেই উহাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিতেছিল! উহারা সত্যই যে পশু ছাড়া আর কিছু নয়—অন্তরের অন্তস্তলে নিজেই কি সে একথা বিশ্বাস করে না? উহাদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে যে কোন ফল হইবে না ইহা কি সে নিজেই অনুভব করিতেছে না? তবে? এই পশু সমাজে তাহার কি করিবার আছে। নখদন্ত বিস্তার করিয়া উহাদের সহিত কলহ করিবে, না দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের পশুত্ব লইয়া নৈতিক হাহাকার করিবে? এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া অন্য আর কি করিবার আছে। পশুকে মানুষ করা? তাহার তো কোন সম্ভাবনাই নাই। যাহা করিলে পশু সত্য সত্যই মানুষ হয় তাহা করিবার সুযোগ এই পরাধীন দেশে কোথায়! এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় রাজনৈতিক আইনের নিক্তিতে ওজন করিয়া! হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-বেহারী প্রত্যেকের মন রাখিয়া, ধর্ম্ম-রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় তাহার ফলে মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয় না—পশু ছদ্মবেশী হয় মাত্র। তবে? কি কর্ত্তব্য এখন? সে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, মনে হইল একটা বিপুল অরণ্যে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

"কি ঠিক হল"

উৎপল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

"আর একটা সিগারেট ধরাও না"

সিগারেট কেসটা আগাইয়া দিল। শঙ্করের মনে হইল তাহার চক্ষু দুইটি যেন কৌতুকে নাচিতেছে। মনে হইবামাত্র তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। অযৌক্তিকভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া বসিল, "তোমার জমিদারিতে তুমি যা ইচ্ছে করতে পার, যেখানে খুশি আগুন দিতে পার, যাকে ইচ্ছে চাব্‌কাতে পার—কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব কি না ঠিক করতে পারি নি এখনও"

উৎপল কিছু বলিল না। নীরবে একটি সিগারেট তুলিয়া লইল।

শঙ্কর বলিয়া চলিল—"কতকগুলো অসহায় লোককে ধরে চাব্‌কানো, অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে আগুন দেওয়া, গরীব কর্ম্মচারীদের ওপর অত্যাচার করার মধ্যে সত্যিকার পৌরুষের কোন লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি হয় তো পাচ্ছ—"

"আমিও পাচ্ছি না"

"তবে?"

"আমি মণির কথা ভাবছি। কতকগুলো হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করেছে এই কথাই মনে হচ্ছে খালি। ঠিক কি করলে জগতের সম্মুখে নিজের পৌরুষ প্রদর্শন নিখুঁত হবে সে চিন্তা আমার মাথায় আসে নি"

"বেশ, তাহলে যা ভাল বোঝ কর"

"আমার কথা শেষ করতে দে আগে। একটা কথা জানিস্?"

"কি"

"বাথরুম নামক স্থানটি অতি উত্তম স্থান। ওখানে গেলে হু হু করে' অনেক ভাল ভাল চিন্তা মাথায় আসে, বোঁ বোঁ করে' বড় বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ আমি খুব ভাল একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি হঠাৎ"

"কি সেটা"

"আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না, যা করবার তুমিই কর"

রাগে শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে লইয়া খেলা করে—তাহার সন্দেহ হইল উৎপলও তাহার সহিত তেমনই খেলা করিতেছে।

"তুমি কিছুই করবে না কেন"

"ভাবছি, শুধু শুধু তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে"

"আমার ব্যক্তিগত কষ্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি"

"সম্পর্ক আছে বই কি। তুমিই তো সব, ব্যক্তিই তো আসল তাই"

উৎপলের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে বিড়াল ইঁদুরের উপমাটা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সহসা তাহার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল। স্কুলের ফুটবল ম্যাচে সে একবার খেলিতে চাহে নাই। উৎপল সেবার ক্যাপ্টেন ছিল। আসিয়া ধরিয়া পড়িল খেলিতেই হইবে। "তুইই তো সব—তুই না খেললে আমরা দাঁড়াতেই পারব না" —বহু বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপলের কথাগুলি সহসা যেন ভাসিয়া আসিল। সেই উৎপল কি এখনও আছে?

"ভুরু কুঁচকে দেখছিস কি"

"তোমার কাণ্ডটা। বিপদে পড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে এলুম—তুমি তা না দিয়ে কতকগুলো আজগুবি কসরৎ দেখাচ্ছ কেবল"

"পরামর্শ তো দিয়েছি, এখন তদনুসারে চলা না চলা তোমার ইচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যা করবে তাই হবে"

"প্রতিশোধ না নিলে এর প্রতিকার হবে না?"

"আর কি উপায় আছে বল"

শঙ্কর বলিতে পারিল না। বস্তুত সেও আর কোন উপায় ভাবিয়া পাইতেছিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

"অত দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। তুমি ধীরেসুস্থে ভেবে-চিন্তে যা হয় কোরো। আপাততঃ আর একটা কাজ করা যেতে পারে বরং—"

"কি"

"এই অসময়ে সুরমার কাছ থেকে এক কাপ করে' 'কফি' আদায় করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। আমি বলাতে ফ্ল্যাট্‌লি 'না' বলে' দিলে—তুমি যদি চাও—"

"আমারও এখন খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই"

"বাই জোভ!"

উৎপল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শিস্ দিতে লাগিল।

"আমি ছুটি চাইছি ভাই"

"তার মানে!"

"আমি এখান থেকে কয়েক দিনের জন্যে পালাতে চাই। এ সমস্যার সমাধান তুমিই যা ভাল বোঝ কর"

"ছাট্‌স্ নট্ শঙ্কর-লাইক্! পালাবি?"

শঙ্করকে কে যেন কশাঘাত করিল। যদিও সে অবিলম্বে ঠিক করিয়া ফেলিল যে পলাইবে না, তবু বলিল—"কিছুদিন ছুটি নিতে ইচ্ছে করছে"

"কেন"

"এসব নোংরামির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না"

"পল্লীসংস্কার মানেই তো আবর্জ্জনা সাফ করা"

"দেশের লোক খুন করা নয়"

"দেশের লোকই যদি আবর্জ্জনা হয়ে ওঠে তাহলে তাও করতে হবে বই কি"

"কিন্তু যে দেশের লোক এককালে মনুষ্যত্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল সে দেশের লোক যে কারণে আবর্জ্জনায় পরিণত হচ্ছে সেই কারণটা দূর করবার চেষ্টাই কি সংস্কার নয়?"

"কে অস্বীকার করছে তা! রিসার্চ্চ করে' রোগের কারণটা বার করবার চেষ্টা কর। কিন্তু রোগাক্রান্ত যে ব্যক্তিটি সত্যি মারা গেছেন দেশের লোক হলেও তাঁকে পুড়িয়ে ফেলাই তো আমি উচিত মনে করি—"

রিসার্চ্চ করবার দরকার নেই। রোগের কারণ অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে, আর মারা আমরা সবাই গেছি, পোড়াতে হলে দেশসুদ্ধ সবাইকে পোড়াতে হয়, তোমাকে আমাকে সবাইকে—

"যদি দরকার হয় তাই করতে হবে—"

"আমার মতে কিন্তু তার দরকার নেই। দস্যু রত্নাকরকে পুড়িয়ে ফেললে বাল্মীকিকে পাওয়া যেত না। হাজার খারাপ হলেও মানুষ আবর্জ্জনা নয়। আজকের বিলাসী মিষ্টার গান্ধি কাল মহাত্মা গান্ধিতে বিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারেন, আজ যে দুর্ব্বল জীর্ণ শীর্ণ কাল সে স্যাণ্ডো। মানুষের ইতিহাসে এ সব উদাহরণ মোটেই বিরল নয়"

"নারদ সেজে তাহলে গুলাব সিংয়ের কাছে যাওয়া যাক চল। কিছুই বলা যায় না, লোকটা সত্যিই হয়তো মহাকাব্য লিখে ফেলতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা যে আছে তর্কের খাতিরে সে কথা মানতেই হবে—"

উৎপলের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল। শঙ্কর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না। নিজেরই আলোচনার সূত্র ধরিয়া সে এক ভিন্ন লোকে উপনীত হইয়াছিল—যেখানে দীন দরিদ্র বালক প্রতিভাবান ফ্যারাডেতে পরিণত হয়, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তপস্বী বুদ্ধে রূপান্তরিত হন, সামান্য সৈনিক দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়নের শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ওঠেন—

"বাই জোভ! সহসা এত দয়া—"

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল সুরমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিছনে বেয়ারা কফির সরঞ্জাম বহন করিয়া আনিতেছে।

কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সুরমার আবির্ভাবে নূতন ধরণের একটা উত্তেজনা তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা আলো নিবিয়া গিয়া আর একটা রঙীণ আলো যেন জ্বলিয়া উঠিল। শুধু তাই নয় নিমেষ মধ্যে সে নিজের সহিত সেই পুরাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল "অন্যায় করিতেছ, ভুল করিতেছ, পাপ করিতেছ, চুরি করিতেছ। বন্ধুপত্নীকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হইবার অধিকারও তোমার নাই। নির্ব্বিকার থাক"—প্রাণপণে সে নির্ব্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনার কাছে একবার যাব ভাবছিলাম"

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল সুরমার শুভ্র কপোলে কয়েকটি চূর্ণ অলক কাঁপিতেছে। শুভ্র নির্ম্মল কপোল—আরক্তিম নয়।

"কেন"

"গুলাব সিং লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন, সব শুনেছেন তো। আমি আজ দুপুরে কুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে কথা দিয়ে এসেছি এর প্রতিকার আমরা করবই"

"কি বললেন তিনি"

"বিশেষ কিছু বললে না, আজকাল বেশী কথা বলে না সে আর। শুধু বললে অরাজক দেশে বাস করছি মুখ বুঁজে সবই সহ্য করতে হবে। আমি কিন্তু সহ্য করব না, এর একটা প্রতিবিধান করুন—"

"এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বল নি তো—"

বিস্মিত উৎপল প্রশ্ন করিল।

"জানি তোমাকে বলা বৃথা"

উৎপল ভ্রূ যুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইল।

"শেষ পর্য্যন্ত শঙ্করবাবুকেই সব করতে হবে। রেডিও আর যুদ্ধ নিয়ে যা মেতেছ তুমি আজকাল—"

"না মেতে উপায় কি। শত্রুবাহিনী দ্বারে হানা দিয়েছে"

এ কথায় কোন মন্তব্য না করিয়া সুরমা শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওই মেড়ো জমিদারটাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরা, মানে বাঙালীরা, সত্যিই ভেতো নই। পারবেন তো?"

"নিশ্চয়ই"

অতর্কিতে কথাটা শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বলিল, "উৎপলের সঙ্গে এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। উৎপল তো একেবারে সপ্তমে চড়তে চায়"

"চড়াই উচিত" এই বলিয়া সুরমা কফির কাপটা উৎপলের দিকে আগাইয়া দিল। শঙ্করও এক কাপ লইল, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। কফিতে এক চুমুক দিয়া উৎপল বলিল, "শঙ্করের কিন্তু ইচ্ছে—"

"না, আমি ভেবে দেখলাম তুমি যা বলছ তাই ঠিক। ও ছাড়া উপায় নেই"

"শঙ্করবাবুর কি ইচ্ছে"

সুরমা প্রশ্ন করিল।

"ও বলছিল—"

উৎপলের কথায় বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, "দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ এই বর্ব্বর নীতিকে মানতে ইচ্ছে করছিল না আমার। অন্যতর কোন উপায়ে এ সমস্যার সমাধান হয় কি না আলোচনা করছিলাম—"

"আলোচনা করতে পারেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আপনাকে বর্ব্বর নীতিই মানতে হবে, তার কারণ আসলে আমরা এখনও বর্ব্বরই আছি। যীশু খৃষ্ট বা বুদ্ধের বাণী আজও আমাদের মুখের বুলি মাত্র। তদনুসারে কোনদিন আমরা চলি না। এখন চলতে চেষ্টা করলে সেটা ভীরুতা বা ভণ্ডামির নামান্তর হবে। নয় কি?"

অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসি মুখে সুরমা কথাগুলি বলিল। শঙ্কর নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিরাট একটা বীরত্ব করিয়া সুরমার চোখে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রবল বাসনা সহসা তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। উৎপলের মুখে যে কথা শুনিয়া সে এতক্ষণ তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিতেছিল—সুরমার মুখে ঠিক সেই একই কথা শুনিয়া সুরমাকে অতিশয় হৃদয়বতী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা সে নিজেই নিজেকে মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল—"নারীস্তাবক পশুটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কোন যুক্তি আর টিঁকিবে না!"—ব্যঙ্গ করিল কিন্তু বিহ্বলতা কমিল না। কফি পান করিয়া সোৎসাহে সে উৎপলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল কি উপায়ে গুলাব সিং এবং তাহার দলকে বিদলিত করা যায়।

শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল।

ভাবিতেছিল—ক্ষতি কি! বিশেষ একটা যুক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অসুখী হইবার কি হেতু থাকিতে পারে। সুখে বাঁচিয়া থাকাটাই আসল জিনিস। আনন্দই কাম্য, যুক্তি নয়। যত বড় যুক্তিই হোক না তাহা যদি পারিপার্শ্বিককে শেষ পর্য্যন্ত নিরানন্দময় করিয়া তোলে তাহা হইলে সে যুক্তি মানিবার সার্থকতা কি? আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানোই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—কি হইবে একটা বিশেষ মতবাদ লইয়া? সুরমাকে একটু খুশী করিতে গিয়া সে যদি আগেকার মত পরিবর্ত্তনই করিয়া থাকে—কি এমন ক্ষতি তাহাতে। সুরমাকে খুশী করিয়া সে আনন্দ পাইতেছে ইহাই তো মত-পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। উৎপলের বিপক্ষেও সে যুক্তি খাড়া করিয়াছিল স্বীয় চিত্তকে আনন্দিত করিবার জন্যই। আনন্দহীন যুক্তির মূল্য কি। বিবেক? বিবেকও একটা সংস্কার, তাহাকেও বারম্বার ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। মরিয়া হইয়া শঙ্কর নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া সে অন্যায় কিছু করে নাই। সুরমাকে খুশী করিবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন? পরস্ত্রীকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইবার কি অধিকার আছে তাহার, এই পুরাতন প্রশ্নটারও একটা উত্তর সে খাড়া করিয়াছিল। বারম্বার নিজেকে বলিতেছিল—মুগ্ধ করে তাই মুগ্ধ হই। সন্ধ্যা ঊষা জ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হই, সুরমাকে দেখিয়াও তেমনি মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার মতে মত দিয়া আনন্দ পাইতেছি। মুগ্ধ হইতে ক্ষতি কি। আর তো কিছুই করিতেছি না।⋯ ⋯অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে পথ হাঁটিতে লাগিল।⋯বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিল বাড়ির সামনে একটা পালকি রহিয়াছে। পালকি করিয়া কে আসিল! বেয়ারারা বারান্দার একধারে বসিয়াছিল তাহারা উঠিয়া আসিয়া সংবাদ দিল বাবু গুলাব সিংয়ের জেনানা রুক্মিণী দেবী আসিয়াছেন এবং তাঁহার অপেক্ষায় অন্দরে অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ? ভিতরে গিয়া দেখিল রুক্মিণী দেবী অমিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন। শঙ্করকে দেখিয়া স-সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কারান্তে অবগুণ্ঠনটি একটু টানিয়া দিয়া নতনেত্রে নতমস্তকে দাঁড়াইয়াই রহিলেন। রুক্মিণী দেবীর রূপ দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। স্বর্ণাভ গৌরবর্ণ, নিটোল নিখুঁত মুখশ্রী, আয়ত ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দু'টি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরিধানে একটি কালো-পাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি। শঙ্করের মনে হইল স্বয়ং বৈদেহী যেন তাহার ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

"ম্যয় মাফি মাংনে আয়ি হুঁ—"

মৃদুকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া তিনি অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপ হি সব কহিয়ে"

অমিয়া বলিল, "ইনি গুলাব সিংয়ের স্ত্রী, লক্ষীবাগের দাঙ্গার সম্পর্কে এসেছেন। স্বামীর হয়ে মাপ চাইতে এসেছেন উনি। বলছেন এ ঘটনার জন্য উনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত। মণিবাবুর

চিকিৎসার যা খরচ লাগে তা উনি দেবেন. স্বামীকেও লক্ষীবাগ ছেড়ে আসতে বাধ্য করবেন। স্বামী যদি ওঁর কথা না শোনেন তাহলে স্বামীর বিরুদ্ধে উনি নিজে গিয়ে কোর্টে এজাহার দেবেন বলছেন, তোমরা যদি মকোর্দ্দমা কর। কিন্তু তার বোধ হয় দরকার হবে না, কারণ ওঁর বিশ্বাস স্বামী ওঁর কথা রাখবেন! উনি অনুরোধ করতে এসেছেন তোমরা আগে থাকতে যেন ওঁর নামে কোন কেস কোরো না। কারণ মকোর্দ্দমা করা ওঁর স্বামীর একটা নেশা—একবার যদি শুরু হয়ে যায় ওঁকে থামানো শক্ত হবে। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস স্বামী ওঁর কথা রাখবেন, মকোর্দ্দমা করতে হবে না—"

অমিয়া যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রুক্মিনী দেবীর দিকে চাহিল। রুক্মিনী দেবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তাঁহার বক্তব্য যথাযথ উক্ত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আঁচল হইতে একখানি হাজার টাকার নোট খুলিয়া অমিয়ার হাতে দিতে গেলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "কি ও"

"উনি মণিবাবুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজার টাকা দিতে চাইছেন"

শঙ্কর বলিল, "আমরা তা নিই কি করে। মণিবাবুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তিনি ভাল হয়ে আসুন তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যদি নিতে চান নেবেন"

রুক্মিনী দেবী নোটটা ক্ষণকাল ধরিয়া থাকিয়া আনতমস্তকে শঙ্করের কথাগুলি প্রণিধান করিলেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে সেটি আবার আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল—"আপনি যে এখানে এসেছেন তা কি গুলাব সিং জানেন?"

রুক্মিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে জানেন না। তাহার পর অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন। অমিয়া শঙ্করকে জানাইল—"ওঁর স্বামী অন্ত আর একটি মকোর্দ্দমার তদ্বির করতে সদরে গেছেন, এখানে নেই তিনি—"

"ও"

রুক্মিনী দেবী আবার অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন।

অমিয়া বলিল, "উনি জিগ্যেস করছেন তাহলে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন তো? তোমরা কিছু করবে না তো?"

শঙ্করকে বলিতেই হইল যে ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটিয়া গেলে তাহারা আর কিছুই করিবে না। বলিয়াই কিন্তু দুঃখিত হইল সুরমার মুখটা মনে পড়িল।

রুক্মিনী দেবী নমস্কারান্তে চলিয়া গেলেন।

অমিয়া বলিল, "দই ক্ষীর কলা সন্দেশ কত কি এনেছে দেখবে এস"

"খুকী কোথা"

"যমুনিয়া পারুলদের বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে"

"এত রাত্রে সেখানে কেন?"

"সমস্ত দিন ঘুমিয়েছে, চোখে ঘুম নেই, কেবল আমাকে বিরক্ত করছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে কি জান? মানাভে রং মাখিয়ে লজেনচুস্ করে দাও। এত দুষ্টু হয়েছে!"

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও একটু হাসিল।

"তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন"

শঙ্করের শুষ্ক মুখ ও প্রাণহীন হাসি অমিয়ার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর আর একটু হাসিল।

"কি যে টো টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছ এ ক'দিন মণিবাবুর ব্যাপার নিয়ে। নাওয়া-খাওয়ার পর্য্যন্ত ঠিক নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"উৎপলের বাড়িতে। খিদে পেয়েছে, খাবার ঠিক কর"

"খিদে পাবে না? সেই কোন কালে দুটি খেয়ে বেরিয়েছ! বেগুনগুলো ভেজে ফেলি, কুটে রেখে এসেছি—"

অমিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। শঙ্কর ইহাই চাহিতেছিল। সত্যই তাহার ক্ষুধা পায় নাই, তাহার মনে হইতেছিল অমিয়ার মনোযোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। নির্জ্জনে বসিয়া সে নিজের সহিত বোঝাপড়া করিতে চায়। সিগারেট ধরাইয়া বাহিরের ঘরটাতে গিয়া সে বসিল। বসিয়াই মনে হইল সে অন্যায় করিতেছে। ঘোরতর অন্যায়। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবার স্বপক্ষে যে সব যুক্তি সে এতক্ষণ খাড়া করিয়াছিল মনে হইল তাহা অর্থহীন, দুর্ব্বল মনের মূঢ় লোলুপতা মাত্র। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া মানে বৃহত্তর সর্ব্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহা করা কি উচিত? তাছাড়া মনের এই কাঙালপনা আত্মসম্মানহানিকর নয় কি? সুরমা না হয় খুবই সুন্দর, কিন্তু যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিবে অমনি তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে হইবে? সেদিন তো সে নিজেই এক বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তির বিলাত-ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিল। মনে হইতেছিল লোকটা বিলাতে গিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গিয়াছে যেন! সেখানকার চাকরাণি হইতে সুরু করিয়া সমস্ত কিছুই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি পদেই এদেশের সহিত ওদেশের তুলনা করিয়া গদগদ কণ্ঠে ওদেশের স্তুতি এবং এদেশের নিন্দা করিতে করিতে ভদ্রলোক বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন যেন! একটা গ্রাম্য বর্ব্বর যেন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া কৃতার্থ নয়নে হাইকোর্ট দর্শন করিতেছে। ভারতীয় বলিয়া তাহার মনে যেন কিছুমাত্র গর্ব্ব নাই, বিলাতী ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আত্মসম্মানশূন্য লোকটা লোভে ক্ষোভে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিজের আচরণও কি ঠিক অনুরূপ নয়? সুরমা সুন্দর, কিন্তু অমিয়াও কি কম সুন্দর? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তাহার মনের গ্লানি যেন কাটিয়া গেল। সে বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল—অমিয়াও সুন্দর—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অমিয়াও সুন্দর বই কি!

"কোথা তুমি"

"এই যে বাইরের ঘরে"

অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

"তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করবে, আজ তোমার একখানা চিঠি এসেছিল দিতে ভুলে গেছি"

"কার চিঠি"

"খামের চিঠি, খুলি নি, মেয়েলি হাতের লেখা"

মুচকি হাসিয়া অমিয়া ড্রয়ার হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল।

"বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, রুটি গরম করছি, এস তুমি"

অমিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমাকে চেনেন না। আমরা পলাশপুরে থাকি, আমার স্বামীর নাম লোকনাথ ঘোষাল। অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। ইতিপূর্ব্বে ওঁর মুখে আপনার যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে বিশ্বাস আছে যে আপনি নিশ্চয় এ বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।৺ পলাশপুর আপনার ওখান থেকে বেশী দূর নয়—দয়া করে যদি একবার আসেন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবেন। চিঠিতে আমার বিপদের কথা লেখা যাবে না। আসুন একবার। বেশী বিপদে না পড়লে আপনাকে এ অনুরোধ আমি করতাম না। ওঁকে না জানিয়ে গোপনে আপনাকে চিঠি লিখলাম, দেখবেন উনি যেন না জানতে পারেন। আশা করি যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আসবেন। ইতি

বিনীতা—শ্রীমতী হররমা দাসী

পত্রটি পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইল, কিন্তু বাহিরে যাইবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে উৎপলকে সমস্ত কথা একটি পত্রযোগে জানাইয়া সে পলাশপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। উৎপলের সহিত দেখা করিল না। কারণ তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেই সুরমার সহিতও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। এ লোভনীয় সম্ভাবনার সুযোগ লইতে তাহার সাহস হইল না। (ক্রমশঃ)

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের গোড়ার কথা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হলেই তুমুল তর্কবিতর্ক স্বাভাবিক, কেননা, দেশের ভবিষ্যৎ ও জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে দেশের শিক্ষা প্রণালীর উপর। বিলেতে চার্চিল সাহেবের উপর তাঁর স্বদেশীয়দের অগাধ বিশ্বাস থাকলেও চার্চিল গভর্ণমেণ্টের প্রথম পরাজয় ঘটেছে ওদেশের শিক্ষাবিল সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কি বেতন হবে এই নিয়ে মতবিরোধ ঘটে এবং তাই নিয়ে কমন্স সভায় সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটে। অবশ্য চার্চিল সাহেব তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটিকে আস্থা-অনাস্থার পর্য্যায়ে দাঁড় করিয়ে সরকারের স্বপক্ষে আস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেন,—কিন্তু তবু ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং শিক্ষা বিল নিয়ে গভীর মতবিরোধ থাকতে পারে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। এ কথা মনে রাখলে কিছুদিন হতে বাংলার আইন সভায় যে হট্টগোল চলছে তাতেও লজ্জিত হবার কোনও কারণ থাকে না। পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতির গোড়ার কথা হচ্ছে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য। একেবারে মৌলিক ব্যাপারে অমিল থাকলে পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি চলতে পারে না। গত শতাব্দীতে বিলেতে পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি সুচারুভাবে চলা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ হুইগ ও টোরী উভয় দলই দেশকে কি ভাবে পরিচালিত করলে জাতীয় উন্নতি হতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক অংশেই মৌলিক নীতিতে একমত ছিলেন। যথা, অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ এবং অপর দেশকে শোষণ করে স্বদেশের সমৃদ্ধি সাধন করতে কোনও দলেরই ইতস্ততঃ ছিল না। গ্ল্যাডষ্টোন পর্য্যন্ত আয়র্লণ্ডের ব্যাপারে বিফল হয়েছিলেন তা হতেই এ কথা বোঝা যায়। বিলেতে শ্রমিক দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দলগত মতবিরোধ আরও গভীর এবং মৌলিক হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বিলেতের শ্রমিক দল একটা অপূর্ব্ব বস্তু, সোণার পাথরবাটী। স্বদেশের ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের শ্রমিকদের স্বপক্ষে দু-চারটা বুলি কখনও কখনও আওড়ালেও বিদেশের ব্যাপারে তাঁরা অন্যান্য দলের সঙ্গে একমত—অপর দেশ শোষণে, সাম্রাজ্য সংরক্ষণে তাঁরা কনজারভেটিভ বা লিবারল দলের সমান অংশীদার। বিলেতে পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতির কাঠামোটুকুও যে এখনও বজায় আছে তা এই কারণেই। তা না হলে ওরকম শাসন ব্যবস্থা ভেঙে যেত, কারণ তখন একদল অপর দলকে কোনও ক্রমেই শাসনভার দিত না, ভোটে পরাজয় হলে বাহুবল প্রয়োগ করত। বিলেতেও এ ঘটনা ঘটেছে। ক্রমওয়েল ও পার্লামেণ্টের কাহিনী স্মরণীয়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়, নানা দেশে পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি ভেঙে পড়েছে। হিটলার ভাবতে পারেন নি যে পার্লামেণ্টের মর্য্যাদা রাখবার জন্য প্রয়োজন হলে অপর দলের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, কেননা অপর দলের হাতে সরকারী কর্ত্তৃত্ব পড়লে দেশের এত বড় সর্ব্বনাশ হবে বলে তাঁদের ধারণা ছিল যে সেই সর্ব্বনাশ নিবারণ করবার জন্য প্রয়োজন মত পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে দিতেও তাঁরা ইতস্ততঃ করেন নি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাঁরা পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা (এবং সেই সঙ্গে স্বাধীন জনমতের অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি) রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছেন তাঁরা এদেশে এমন একটা কাণ্ড করে তুলছেন এবং এমন কুপ্রবৃত্তি খুঁচিয়ে তুলছেন ও তার প্রশ্রয় দিচ্ছেন যাতে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য। এই বিলটা নিয়ে মতবিরোধ খুব গভীর এবং মৌলিক হয়ে উঠেছে। তার দুটী প্রধান কারণ আছে। বহুদিন হতেই সরকারপক্ষ ধুয়ো তুলেছেন, এদেশে শিক্ষার বেশী প্রসার হচ্ছে, এত প্রসার ভাল নয়। যে দেশে এখনও শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর সে দেশে শিক্ষার প্রসার বেশী হচ্ছে এ কথা বলা যে কত বড় নিষ্ঠুর এবং মর্ম্মান্তিক পরিহাস তা কল্পনাও করা যায় না। ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশ ছাড়া অন্য কোনও দেশে এরকম ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস সে দেশের সরকারের হোত না। আসল কথা, শিক্ষার প্রসার হলে দেশে জনজাগরণ হবে এবং সে জনজাগরণ সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল নিশ্চয়ই হবে না। বিশেষতঃ, বাংলার মাধ্যমিক বিভালয়গুলির অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। নিম্নলিখিত হিসেব হতে শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের উৎসাহের কিছু আভাস মিলবে:—

বালকদের উচ্চ ইংরাজী বিত্যালয়, ১৯৩৬-৩৭ সাল

	সরকারী বিত্যালয়	ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড পরিচালিত	মিউনিসিপ্যাল বোর্ড পরিচালিত	সাহায্য প্রাপ্ত	সাহায্য পায় না	মোট
মান্দ্রাজ	১২	১০৫	৬০	১৯৮	১	৩৭৬
বোম্বাই	১৯	...	২১	১৭৭	২০	২৩৭

বাংলা	৬২	...	৪	৫৫৭	৫৯৮	১২০১
যুক্তপ্রদেশ	৫৮	...	৬	১৫০	৫	২১৯
পাঞ্জাব	৮৩	৩২	.৯	১৮০	২৯	৩৪৩
বিহার	১৮	...	...	১০১	৭৯	১৯৮
উড়িষ্যা	৫	৬	...	১৯	৩	৩৩

দেখা যায়, বাংলার শিক্ষালয়ের সংখ্যা যেমন অন্যান্য প্রদেশের বেশী, সেগুলির অধিকাংশই (৬৮টা বিদ্যালয় ছাড়া আর সব কয়টাই) বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত—তার মধ্যে আবার অর্দ্ধেকের বেশী বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। এগুলির উপর সরকার খুশী মত হুকুম চালাতে পারছেন না, কেন না এদের অস্তিত্ব শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধা স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শিক্ষার বিস্তারের জন্ত যেটুকু কাজ করেছে তার চেয়ে তার কর্ত্তব্য অবহেলা করেছে, বা করতে বাধ্য হয়েছে অনেক বেশীই। কোনও উপযুক্ত সুন্দর পরিকল্পনা বা খুব বেশী ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় দেন নি। কিন্তু তবু বিশ্ববিদ্যালয় দেশের আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন সেইকারণেই সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেশের জনসাধারণ ও সরকারের দ্বন্দ্বেরই একটা দিক্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ ত্রুটী নেই একথা কোনও শিক্ষাব্রতীই বলবেন না,—বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মপন্থা দেশের হাওয়া বদলের আগে আগে চলতে পারে নি, পেছনে পেছনেও আসতে পেরেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই ত্রুটীর সুযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার হরণ করে যাঁরা একটা সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট ও সরকারের প্রভাবাধীন একটা বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার তুলে দিতে চান তাঁরা আসলে শিক্ষা-সংস্কারের নামে শিক্ষা সংহারেরই সুব্যবস্থা করেছেন। এই কারণেই মতবিরোধ এত গভীর হয়ে উঠেছে। যুক্তিতর্ক চলছে না। একপক্ষে 'হাঁ' অপরপক্ষে 'না' বলা ছাড়া মাঝামাঝি অন্ত কিছু বলার উপায় নেই। যাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিরোধিতা করছেন তাঁরা জানেন যে বর্ত্তমান ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। কিন্তু রোগ সারাতে গিয়ে রোগীকে হারাতে তাঁরা রাজী নন। সে কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এই আকারে স্থাপিত হলে সেটা আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষার প্রসারের পক্ষে এত ক্ষতিকর হবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রয়োজন হলে তাঁরা অ-পার্লামেণ্টারী ব্যবহার করতে লজ্জিত হচ্ছেন না। বর্ত্তমানে যাঁরা মন্ত্রিত্ব দখল করে আছেন তাঁরাও এরকম ব্যবহার করেছিলেন। আসলে, এটা এত মৌলিক ব্যাপার যে সেখানে পার্লামেণ্টারী ভব্যতার খাতির রাখা চলে না। মতবিরোধ এত গভীর হবার আর একটা কারণ আছে। সুসংহত জাগ্রত জনমত সরকারের পক্ষে সুখবর নয়—সুতরাং জনমতের সংহতি নষ্ট করার চেষ্টা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁরা ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন আগা খাঁ ডেপুটেশনের সময় হতে সরকার বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থরক্ষার কথা কি কারণে তুলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের রোপিত বীজে বিষবৃক্ষ জন্মেছে। কোনও কোনও সম্প্রদায় মনে করছেন, তাঁদের স্বার্থ অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থ হতে বিভিন্ন এবং সে হিসেবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, এমন কি শিক্ষার ক্ষেত্রেও, তাঁদের আলাদা ব্যবস্থা চাই। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক নয়। দেশের সমাজ বিবর্ত্তনের ধারা সেদিকে নয়। সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারায় আমরা যে অবস্থায় পৌঁছেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশঃ ক্ষয় পাচ্ছে এবং একদিকে ধনিক-সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কৃষাণ মজুরেরা গড়ে উঠছে। এ অবস্থায় আমাদের প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে এই রকম অঘটনকেও আমাদের কাজে লাগানো যেতে পারে কি উপায়ে। এতদিন বিদেশী মূলধনের সঙ্গে এদেশী ভৌমিক সম্প্রদায়ের সন্ধি বলবৎ ছিল। কিন্তু সমাজ বিবর্ত্তনের অলঙ্ঘ্য নিয়মে ভৌমিক সম্প্রদায় নষ্ট হয়ে এল ও সেই সঙ্গে এদেশী মূলধন গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। এদেশী মূলধন যদি ওদেশী মূলধনকে নষ্ট করতে পারে, ভাল কথা। তাহলে বোঝা যাবে আমরা সমাজ বিবর্ত্তনের ধারায় আর এক ধাপ অগ্রসর হলাম, কারণ এদেশী মূলধন যদি কোনও বিপ্লব আনতে পারে সে বিপ্লব বড় জোর বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বেশী কিছু না হলেও তা হতে অন্ততঃ এই কথাটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের হাত হতে এদেশ রক্ষা পেল। লেনিন বলেছিলেন যে স্বদেশে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্ত যেমন ধনিক সম্প্রদায়ের বিনাশ দরকার, বিদেশে ওরকম শ্রমিক বিপ্লব হবার আগে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হবার প্রয়োজন আছে। প্রথমে বৈদেশিক মূলধনের বিনাশ না হলে স্বদেশী ধনিকসম্প্রদায়কে লড়বার ক্ষমতা শ্রমিক সম্প্রদায়ের হওয়া সম্ভব নয়। পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীন দেশে শ্রমিক বিপ্লবের চেষ্টা একই কর্ম্মধারার দুটী দিক্। আমাদের দেশে যে সময় ধনিক সম্প্রদায় সবে গড়ে উঠছে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সূচনাও সে সময় ঘটেছে। এটা একটা অভূতপূর্ব্ব যোগাযোগ। সুতরাং আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে, কি উপায়ে বিদেশী মূলধনের কর্ত্তৃত্ব দূর করা যায়, অথচ বৈদেশিক প্রভুত্ব দূরীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশী ধনিক সম্প্রদায়কে কর্ত্তৃত্ব করার সুযোগ না দিয়ে জনগণের প্রাধান্ত রাষ্ট্রশক্তিতে স্থাপনা করা যায়। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে জননায়কদের দুটী বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। প্রথমতঃ, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ সেই স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন। আমাদের সমাজের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ধারা এইদিকে। কোনও কোনও সম্প্রদায় আর্থিক সমৃদ্ধি বা সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমান পর্য্যায়ে না থাকলে সেই সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ স্বার্থের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করা সহজ—কিন্তু তাতে সামগ্রিক অগ্রগতির পথে বাধাই হবে। এক্ষেত্রে যে যে সম্প্রদায় পেছিয়ে আছেন তাঁদের অগ্রগতির বেগ বাড়িয়ে দিয়ে অন্ত সম্প্রদায়ের সমান পর্য্যায়ে এনে দিলে বিশেষ-স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রলোভন হয়তো কার্য্যকরী হবে না। কিন্তু সম্প্রতি যে চেষ্টা চলছে, তা এর বিপরীত। যাঁরা পেছিয়ে আছেন তাঁরা এগোবার চেষ্টা না করে অপরদের পিছনে টেনে তাঁদের সমান করার চেষ্টা করছেন। এ হতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার দাবী যে কতখানি কৃত্রিম এবং তাতে আসল স্বার্থসিদ্ধি কার হবে এ কথা বোঝা কঠিন হয় না।

কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন যে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই আত্মকর্ত্তৃত্ব দিতে হবে, তা না হলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান হবে না। একটী এই মতাবলম্বী 'ঘোষণা' হতে উদ্ধৃত করছি :—"নিজস্ব স্বাধীন মতানুযায়ী শিক্ষালাভ করার সুযোগ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তাদের এই মহান দায়িত্ব (শিক্ষার পুনর্গঠন) পালনে অংশ গ্রহণ করানো সম্ভব। এই কথা মনে রাখলে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের পৃথক্ ভাবে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।" তাঁদের মতে "বোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারী এবং সরকার মনোনীত সভ্যদের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটাই বিলের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ।" এই যুক্তির মধ্যে একটা অতি চতুর ফাঁকি আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিভিন্ন এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের নিজেদের যুক্তি অনুসারেই তাঁদের পৃথক্ নির্ব্বাচন নয়, পৃথক্ বোর্ডের দাবীই মেনে নেওয়া উচিত। যদি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন না করলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা হতে পারে না এ রকম আশঙ্কা হয়, তা হলে এমন আশঙ্কাও অন্যদের

এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে করা চলবে যে এক বোর্ডেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। সেজন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন বোর্ড স্থাপন করতে হবে। যাঁরা সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতার অজুহাতে পৃথক্ নির্ব্বাচন সমর্থন করেন অথচ পৃথক্ বোর্ডের সমর্থন চান না তাঁদের এই অদ্ভুত যুক্তির আসল অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা সাম্প্রদায়িক সমস্যাটিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখছেন সে দৃষ্টিভঙ্গীতেও যেটা logical solution সেটিকে তাঁরা গ্রহণ না করে এমন একটী বোর্ড স্থাপনা করবার পরামর্শ দিচ্ছেন যেখানে কলহ ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই কলহের প্রশ্রয় দিলে কার লাভ সে কথা বলা বাহুল্য। যখন পারিবারিক বিরোধ ঘটে তখন এক বাড়ীতে থেকে মারামারি করার চেয়ে অশান্তি চরমে ওঠবার আগে পৃথক্ বাড়ীতে বসবাস করা অনেক ভাল নীতি। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে পারিবারিক বিরোধ এতই গভীর যে একত্র থাকা চললো না তাঁরা যে কেন তফাৎ বাড়ীর পরামর্শ না দিয়ে একই বাড়ীতে অনেকগুলি দরজা ফোটাবার পরামর্শ দিচ্ছেন তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। এতে কলহের অবসান হয় না, উপরন্তু চোর ডাকাতের প্রবেশের সুযোগ বাড়ে। সরকারী প্রভাবই যদি বোর্ডের পক্ষে মারাত্মক হয়, তাহলে এমন একটা বোর্ড স্থাপন করা দরকার যেটা আত্মকলহে অন্তর্বিভক্ত নয় এবং যেটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দেবে না। যাঁরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত এবং সাম্প্রদায়িক কলহে প্রতিশ্রুত হয়ে এই বোর্ডের সভ্য হবেন তাঁরা কি বোর্ডের উপর সরকারী প্রভাব বৃদ্ধিরই সুযোগ বাড়াইবার ব্যবস্থা করবেন না ?

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের নামে যাঁরা এই রকম কলহ বৃদ্ধির পরামর্শ দেন তাঁরা প্রচ্ছন্নভাবে জাতির প্রাণশক্তিকে আঘাত করছেন এ কথা বলা অন্যায় হবে না। সমাজের ও জাতির একটা প্রাণধর্ম্ম থাকে, তার বিবর্ত্তনের একটা নিজস্ব ধারা আছে। সেই ধারায় যদি কোথায়ও বাধা আসে তাহলে সেই বাধাটাকে দূর না করে ধারা বদল করতে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। সমাজ শরীরের এক অংশে রোগ প্রবেশ করলে সেই রোগটাকে দূর করাই দরকার, সেই রোগটাকে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত করার চেষ্টা সাধুবুদ্ধির পরিচয় নয়। যাঁরা এই রকম চেষ্টা করেন তাঁরা হয় অজ্ঞানতাবশতঃ এইরকম কাজ করতে পারেন, আর না হয় তাঁরা জ্ঞানপাপী। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই তাঁরা সাম্প্রদায়িক সমস্যার আসল সমাধানের কোনও চেষ্টা না করে জাতির পশ্চাদ্‌গতিরই ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ বস্তুতঃ অভিন্ন, আপাততঃ যদি বা কোথায়ও বৈষম্য ঘটে থাকে সেটা সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আমাদের বিকৃত সমাজ বিবর্ত্তনের অনিবার্য্য ফল। অথচ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী এই কথাটা মেনে নিলে যে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা স্বীকার করতে হয় সেটাও তাঁরা মানতে রাজী নয়। তথ্য আর তত্ত্ব মিলছে না, ও তথ্য হতে ও তত্ত্ব চলে না। উপরন্তু এই গোঁজামিলে সমাজ-শরীর আহত হচ্ছে।

সুতরাং যাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরিণামে একই এবং যাঁরা বিশ্বাস করেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাঁদের কেউই ও মতে সায় দিতে পারবেন না। এই বিলটী নিয়ে মতবিরোধ যে এত গভীর ও মৌলিক হয়ে উঠেছে তার দ্বিতীয় কারণ এইটাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম অদ্ভুত সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা প্রচলিত হলে জাতির মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগবে। এই রকম আত্মহননের চেষ্টা যে কতদূর উন্মাদ হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় আমরা ভাষার ক্ষেত্রে পেতে আরম্ভ করেছি। সম্প্রতি 'পাকিস্তান-নামা' একটী দীর্ঘ কবিতার বই হাতে পড়ল। জিন্না আততায়ীর আক্রমণ হতে রক্ষা পেলে যে আনন্দ উৎসব হয়, কবিতাটী সেই উপলক্ষ্যে আক্‌রাম খাঁ সাহেব কবিতাটী রচনা করেছেন। উপলক্ষ্যটী কবিতা রচনায় উপযুক্ত, লেখকও পণ্ডিত—কিন্তু তবু এই কৃত্রিম দাবী বজায় রাখবার জন্য তিনি তাঁর স্বাভাবিকতাকে নিরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। কবিতাটীর আরম্ভ এই রকম :—

"বিছমিল্লা বলিয়া মুখে ধরিনু কলম
পহেলাতে নাম তার করিনু রকম।
রাব্ব্‌ল আলামীন সেই পাক বে-নামাজ
তারিক সকলি তার কর্ত্তা কারছাজ!
...   .
জালালে জামাল হেরি জামালে কামাল
কামেল কামালে মুহা, হইল নেহাল।"

ভাষা যদি লেখক ও পাঠকের মনের সংযোগসেতু হয় তাহলে বলতে হবে এখানে সম্পূর্ণ অপব্যবহার ঘটেছে। বাঙালী পাঠক, এমন কি মুসলমান পাঠকও, অভিধান ছাড়া এই কবিতার অর্থবোধ করতে পারবেন না। ইংরেজী সংস্কৃতি আমাদের কাছে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা ইংরেজী কথা বাংলা সাহিত্যে আপন হয়ে গেছে, টেবিল চেয়ারকে যেমন আজ কেদারা মেজ বলা হাস্যকর, তেমনি মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে আরও বহু দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার ফলে বাংলা সাহিত্যে বহু উর্দ্দু বা আরবী-পারসী শব্দ স্থায়ী আসন পাবে এ কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বরং সেইটাই জীবন্ত ভাষার প্রাণধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৯) "বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আপন তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েচে।...বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো অনেক সহজ। সমনজারি শব্দের অর্দ্ধেক অংশ ইংরেজী, অর্দ্ধেক পার্সি, এর জায়গায় "আহ্বান প্রচার" শব্দ সাধু সাহিত্যেও ব্যবহার করবার মত সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না।...নেশাখোরকে যদি মাদকসেবী বলে বসি তা হ'লে খামখা তার নেশা ছুটে যেতে পারে, এমন কি সে মনে করতে পারে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হল। বদমায়েসকে দুর্ব্বৃত্ত বল্‌লে তার চোট তেমন বেশী লাগবে না। এই শব্দগুলো যে এত জোর পেয়েচে তার কারণ বাংলা ভাষায় প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে যোগ হয়েচে।" কিন্তু যদি এই সহজ যোগের বদলে অপ্রয়োজন বিকৃতি ঘটবার চেষ্টা হয় তাহলে সেই ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না, অপমৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। আজ ভাষার ক্ষেত্রে যার পরিচয় মিলছে, আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং সমস্ত সমাজ মনে তাকে বিসর্পিত হতে দিলে তা জাতীয় প্রাণধর্ম্মের সহায়ক হবে না, তাতে জাতির শ্বাসরোধই ঘটবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের উপলক্ষ্য মাত্র। আরও নানা বিল ও প্রস্তাব উপলক্ষ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু এই বিলটিতে সেই দ্বন্দ্ব এত তীব্র হয়ে ওঠার কারণ শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যতের নিয়ামক, জাতির ভবিষ্যৎ বিবর্ত্তনে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর ফল অনাগত কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হবে, সে কারণেই এত বিরোধ। তাতে লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই, বরং সকলে যে এই বিলের প্রকৃত পটভূমিকা বুঝতে পেরে তীব্র বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছেন এটা আনন্দেরই কথা। এটি যে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন নয়, এর সঙ্গে আমাদের সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ বিবর্ত্তনের ধারা এবং সমগ্র জাতির স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ কথা যাঁরা বোঝেন না বা সমস্যাটিকে এই ভাবে দেখেন না, তারা ইতিহাসের অনুধাবন করেন নি অথবা স্বকীয় স্বার্থবুদ্ধিতে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত।

প্রস্তাবিত দায়ভাগ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ

আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে দিল্লীর আইন সভায় প্রস্তাবিত দায়ভাগ আইনের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। সম্প্রতি অবগত হইয়াছি বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ হইয়াছে। কলিকাতার সাংবাদিক ব্যবসাদারেরা মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু দায়ভাগ আইনের প্রতিবাদ ছাপায় নাই। অর্থাৎ ইহাদের বিবেচনায় মাধ্যমিক শিক্ষা আইনে যে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, নব প্রস্তাবিত দায়ভাগ আইনে তত কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। জানিনা, এই যুক্তির পশ্চাতে কাহারও প্ররোচনা ও কলকাঠি আছে কিনা, তবে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রস্তাবকরা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান, আর দায়ভাগ আইনের প্রস্তাবকরা হিন্দুনামধারী, এবং এই দুই আইনের প্রবর্ত্তনে হিন্দুর সাধনধারা একইভাবে পর্য্যুদস্ত হইবে এই তত্ত্বটা যাহারা অস্বীকার করিবে তাহাদের মুখ্য বা গৌণভাবে কোনও শিক্ষাই হয় নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। শিক্ষা বিলের মৌলিক ফল দাঁড়াইবে—ইং ১৮৮০ সাল হইতে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য যে সারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করিতে পারগ হিন্দু বাঙ্গালী—সেই বাঙ্গালীকে তাহার স্বকৃত সংস্কৃতি ও পারগতা হইতে অপসারিত করা। দায়ভাগ আইনের কার্য্যতঃ ফল ফলিবে, বাঙ্গালী, আসামী ও বাঙ্গালীর অনুকরণে ইংরাজ আমলের স্বোপার্জ্জিত বৃত্তিভোগীরা যখন হিন্দু, তখন তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হউক, তাহারা যেন ভারতের ঐতিহ্যধারা আর বজায় রাখিতে না পারে। পাশ হইবে কিনা জানিনা—সম্ভবতঃ হইবেই—তবে এই দুই বিলের প্ররোচনা যে একই রাজনৈতিক কারণে উদ্ভব হইয়াছে—সেটা বুঝিতে কি অতিশয় সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক হয়? শিক্ষাবিলের আপত্তি পুংখ্যানুপুংখ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দায়ভাগ আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিরাট।

দায়ভাগ আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে--

১ম শ্রেণী—

১। মৃতের প্রতি নির্ভরশীল পিতামাতা, বিধবা (স্ত্রী), পুত্র, কন্যা (অবিবাহিতা, বিবাহিতা, সধবা, বিধবা, পুত্রবতী, সম্ভাবিতপুত্রা), পূর্ব্বমৃত পুত্রের পুত্র (পৌত্র) ও পত্নী, পূর্ব্বমৃত পুত্রের মৃতপিতৃক পৌত্র (প্রপৌত্র) ও তৎপত্নী—সকলে যুগপৎ। ২। দৌহিত্র ৩। পৌত্রী ৪। দৌহিত্রী।

২য় শ্রেণী—

১। মাতা (১ম শ্রেণীতে না পড়িলে) ২। পিতা (ঐ) ৩। ভ্রাতা ৪। ভ্রাতুষ্পুত্র ৫। ভ্রাতুষ্পৌত্র ৬। ভগিনী ৭। ভাগিনেয় ৮। ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাগিনেয়ী।

আরও তিন শ্রেণীর ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১ম শ্রেণীর ১ সংখ্যকরা যুগপৎ পাইবে, তাহাদের অভাবে ২, ৩, ৪; ১ম শ্রেণীর অভাবে ২য় শ্রেণীর ১এর অভাবে ২ এই প্রকার।

কন্যা পুত্রের অর্দ্ধাংশ পাইবে, মৃতের প্রতি নির্ভরশীল পিতা ও মাতা প্রত্যেকে পুত্রের অষ্টমাংশ পাইবে। স্ত্রী একা বা একাধিকা থাকিলে সকলে মিলিয়া পুত্রের সমান অংশ পাইবে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের মাত্র উপভোগ স্বত্বের বিধান আছে এবং সমাজে তাহাই প্রচলিত ছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে স্ত্রীলোকগণ যে স্বত্ব পাইবে, তাহা নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইবে অর্থাৎ ঐ সম্পত্তিতে তাহার যথেচ্ছ দান-বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। তাহার সম্বন্ধে স্ত্রী কোনও উইল না করিলে মাত্র স্বামী এবং তৎপিতা, তৎপিতামহ ও তৎপ্রপিতামহ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত সম্পত্তি (যৌতুক, অ-যৌতুক ও অন্যবিধ) কন্যা, দৌহিত্রী, দৌহিত্র ইত্যাদি ক্রমে পাইবার বিধান হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মাতামহ-ধনে দৌহিত্রের যে বিশেষাধিকার আছে, তাহাও এই আইনের দ্বারা বিলুপ্ত হইবে। শাস্ত্রানুসারে দৌহিত্র মাতামহের পিণ্ডের জন্য দায়ী হইবে, কিন্তু এই আইনের ফলে মাতামহের ধনে অধিকারী হইবে না।

ফলতঃ এই বিল পাশ হইলে কি হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়।

(১) হিন্দুর সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত বিধবা স্ত্রীর এবং অবিবাহিতা, বিবাহিতা, সধবা, বিধবা, সপুত্রা, অপুত্রা প্রভৃতি সকল কন্যারই নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দায়াধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিধবার ভরণ-পোষণের বিধান শাস্ত্রে পরিষ্কার আছে, বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মপ্রবণতার অভাববশতঃ কেহ হয়ত শাস্ত্রের বিধান উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন, সেজন্য কিছু সম্পত্তি charge করিলেই চলিতে পারে। বিধবার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।

(২) মৃতের পারলৌকিক উপকার বা পিণ্ডদানের সহিত উত্তরাধিকারের যে সম্বন্ধ সেই মূলভিত্তির উচ্ছেদ করা হইয়াছে। প্রথম জজ দ্বারকানাথ মিত্র পিণ্ডদানের সহিত দায়ভাগের সম্পর্ক তাহার বিখ্যাত রায়ে স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) স্থলবিশেষে দৌহিত্রীকে উত্তরাধিকারিণী করা হইয়াছে—যাহা কোনও শাস্ত্রে বা আচারে দেখা যায় না।

(৪) মুসলমান আইনের অনুকরণে কন্যার উত্তরাধিকার পুত্রের সহিত আপাততঃ অর্দ্ধাংশে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিলে উপস্থাপিত যুক্তি অনুসারে অর্দ্ধাংশ অচিরাৎ পূর্ণাংশে পরিণত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ পিতার বিষয় পাইবে, স্বামীর বিষয় পাইবে, পুত্রের বিষয়ও পাইবে এবং ঐ সকল সম্পত্তির কতকাংশ কন্যাগত হইবে। ফলে, ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে পারস্পরিক স্নেহের পরিবর্ত্তে একটা মহাবিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে ও হিন্দু পরিবারের প্রায় সমগ্র সম্পত্তি ২।৩ পুরুষের মধ্যে কন্যাগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে চলিয়া যাইবে।

(৫) নারীগণ সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে, অর্থাৎ সম্পত্তির দান-বিক্রয়ে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। শাস্ত্রজ্ঞ আইনজ্ঞ অধ্যাপক দেশপাণ্ডে প্রমাণ করিয়াছেন যে এই ব্যবস্থায় তিনপুরুষের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তির পুং উত্তরাধিকারীর আর কিছুই থাকিবে না।

(৬) স্ত্রী ও কন্যা এই নূতন বিধান মতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে সম্পত্তি পাইলে অপুত্রক ধনীর শাস্ত্রানুমোদিত দত্তক গ্রহণের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। ফলে, এক একটি বংশের ভাবধারা—দেবসেবা, পিতৃপুরুষগণের নাম ও কীর্ত্তিকথা—সমস্তই বিলুপ্ত হইবে।

(৭) বিবাহের পর কন্যা পিতৃগোত্রেই থাকিয়া যাইবে। ইহাতে শাস্ত্রমতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে এবং সর্ব্ববিধ দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে তাহার স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা থাকিবে না।

(৮) অর্জ্জিত সম্পত্তি ও পৈতৃক সম্পত্তির পৃথকত্ব বশতঃ প্রত্যেক যৌথ পরিবারে গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। স্বামীর ও স্ত্রীর স্বার্থের পৃথকত্ব বশতঃ তাহাদের মধ্যেও গুরুতর বিবাদের সৃষ্টি হইবে।

(৯) কন্যা উত্তরাধিকার পাইলে, তাহার বিবাহের জন্য ঋণ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাকে ঋণে আবদ্ধ না করিলে ঋণসংগ্রহ দুষ্কর হইবে।

কন্যার ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে তাহাকে ঋণে আবদ্ধ করা যাইবে না বলিয়া তাহার বিবাহে বিলম্ব অনিবার্য্য হইবে। মনে রাখিবেন, ভগিনীর বিবাহের জন্য উপযুক্ত ব্যয় করিতে ভ্রাতা শাস্ত্রানুসারে বাধ্য, সে জন্য শাস্ত্রে প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে এবং সেজন্য কিছু সম্পত্তি 'চার্জ্জ' করিতেও আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু ইহা দ্বারা ভগিনীকে নিজের অংশের উত্তরাধিকারিণী স্বীকার হয় না।

(১০) উপার্জ্জক পুত্র পিতার হস্তে তাহার উপার্জ্জিত অর্থ দিবে না। কারণ, এই আইনে ঐ অর্থের অধিকাংশই ভগিনীগণের হস্তগত হইবে।

প্রতিবাদকারীরা দায়ভাগের বৈপ্লবিক বিপর্য্যয় লইয়াই মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সকল বিপ্লবের মূল শিকড় প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির ১৭ ও ১৮ দফায় পাওয়া যায়।

১৭ দফায় প্রস্তাব হইয়াছে সগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের সন্তানগণকে বৈধ হিন্দু বিবাহের সন্তানগণের তুল্য মর্য্যাদা ও তুল্য অধিকার দিতে হইবে। অর্থাৎ দায়ভাগ আইনের সাহায্যে জাত মারা চাই।

১৮ দফায় প্রস্তাব হইয়াছে স্বামীকে জীবদ্দশায় ভ্রষ্টা স্ত্রীকে আদালতে ভ্রষ্টা প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা কোনও নারী পতিতা হইবে না। কোন্ দেশে না জানা, যে স্ত্রীর ব্যভিচার স্বামী বেচারাই সর্ব্বশেষে জানিতে পারে।

এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজে কি কারণে আবশ্যক হইয়াছে তাহার কোনও উল্লেখ প্রস্তাবক চারিজন "হিন্দু" কমিটির সদস্য কেহই ঘটনাবলী দেখাইয়া করেন নাই। তাঁহারা যে যে হেতুবাদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় কিছু কিছু দিতেছি। চারিজন সদস্য উদ্ধৃত করিয়াছেন শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মত।

বর্ত্তমান যুগে নরনারীর সাম্য স্বীকার করিতে হইবে "In these days equaliti of women must be recognise1" শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারকে আমরা প্রথম চিনি গৌহাটীর কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে। তখন প্রচারিত হয় তিনি নাকি দক্ষিণের ভারতের একজন বিরাট মেধাবী। গৌহাটির অভিভাষণের ঐ বিরাট মেধার পরিচয় পাই—তিনি বলেন—ভারত শাসনটা চালাইতেছে সবই ভারতবাসী। উচ্চ আসনে ভারতবাসী বসিলেই স্বরাজ লাভ হইল।

সুতরাং এই মেধাবী পুরুষের উক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কথা কওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমিও অতবড় অহমিকা ধরি না। তবে এইটুকু জানি নর ও নারীর সাম্যবাদ জন্মস্থান ইউরোপেও এখনও ষাট বৎসরের অধিক হয় নাই। গত পনেরো বৎসরের মধ্যে মতবাদ বৈষম্যের দিকেই চলিতেছে—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রথম হইতেই এ বিষয়ে একবাক্যতা ইউরোপে বা মার্কিণ দেশে হয় নাই বা ছিল না। একটা বিরাট সাহিত্য আছে। আমাদের পুরুষানুক্রম ধারণা—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি। ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক আগস্ত কোম্‌ৎ বলিয়াছেন—নারী মানবতার অভিভাবিকা—মাতা পত্নী ও কন্যারূপে—আনুগত্য সহচরিত্ব ও রক্ষণীয়ত্ব—পূজা অনুরাগ ও আত্মদান—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। আধুনিক সাম্যবাদের যুগের দুইটি মতবাদ উল্লেখ করিব।

নীট্‌সে বলেন—"নারী স্বাতন্ত্র্যে নারীর প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা ও ম্রিয়মানতা আনে। (weakening and deadening)। এই আন্দোলনের ভিতর বোকামি (stupidity) আছে যে বোকামিতে সুশীলা নারী লজ্জিতা হয়। পুং জাতির শিক্ষিত গর্দ্দভদের মধ্যে অনেক মাথা পাগলা ও নারী খরাইবার লোক আছে। (certainly there are enough idiotic friends and corruptors of woman among the learned asses of the masculine sex)। ইহা গেল ১৮৮৬ সালের কথা। বর্ত্তমান দশ বৎসরের মধ্যে এলেক্সিস্ ক্যারেল ১৯৩৫ সালে "মানুষ অজানা" পুস্তক বাহির করেন। তিনি একজন নোবেল প্রাইজলব্ধ মার্কিনী বৈজ্ঞানিক। তাহার ঐ পুস্তক বৎসরে দুইবার করিয়া পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। তিনি বলেন—নর ও নারীর বাস্তবিক ভেদ সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। সভ্যতার উন্নতির জন্য নারীর কর্ত্তব্য নরের অপেক্ষা গুরুতর। জননীত্বেই তাহার চরম সার্থকতা। নর-নারীর বিভিন্নতাকে বিলোপ করা অসম্ভব। (Betwen the two sexes there are irrevoosle differences) (P 95, Man the Unknown)

চারিজন সদস্য আর একটি অতথ্য লইয়া মূল বক্তব্যের মুখপাত করিয়াছেন। তাঁহারা মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বেঙ্কট সুব্বারাওএর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে "নারীর সম্পত্তির স্বত্ব সীমাবদ্ধ limited হওয়াতে অর্থাৎ যথেচ্ছ দান-বিক্রয়ের অধিকার নারীর না থাকাতে সমাজে অনেক অত্যাচার ঘটিতেছে। কত না স্বত্বকে অকারণে উৎখাত করা হইতেছে। ঐ প্রকার সীমাবদ্ধ স্বত্ব থাকাতে কত না অনন্ত মামলা ফেরেবী ও ধাপ্পাবাজি চলিতেছে।" (unending liligation chicanery and subter fuge)

প্রথম কথা এই যে এত বড় গভীর দোষারোপ করিলে প্রমাণ দিতে হয়। সে প্রমাণের অভাব।

দ্বিতীয় কথা এই নারীর জীবনব্যাপী ভোগাধিকার স্বত্ব থাকাতেও যদি ফেরেবী, অনন্ত মামলা ধাপ্পাবাজি চলিতে থাকে তাহার পরিবর্ত্তে যদি নিব্যূঢ় স্বত্ব হয় তবে সরাসরি নারীর হস্তান্তরের সুবিধা করিবার জন্যই কি আইন হইতেছে?

তৃতীয় কথা এই যে ভূতপূর্ব্ব বিচার পতি যেকথা বলিতেছেন তাহাতে প্রমাণ হয় যে ফেরেবী, মামলা ও ধাপ্পা বন্ধ করিতে আইন-জীবীকে দমন করিবার আইন প্রণয়ণ করার আবশ্যকতা আছে।

চতুর্থ কথা এই যে নারীকে যে অধিকার ও স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দুর্ম্মতি উকীলদের "বান্ধবী" জোটান অধিকতর সুগম হইবে।

চারিজন সদস্যের মূল বক্তব্য তিনটী—

১। ইংরাজাধিকৃত ভারতের হিন্দুর একটা আইন করা হইতেছে।

২। নারীর নারীত্বের ওজুহাতে যে বিভিন্ন অধিকার হিন্দু আইনে হয় তাহার বিলোপ সাধন।

৩। নারীর সীমাবদ্ধ limited স্বত্বের লোপ।

১। ইংরাজাধিকৃত ভারতে ও সামন্ত রাজাদের ভারতে বিভিন্ন আইন হইলে এক আইন মনুষ্যজবক্যের সাহায্যে যাহা আছে তাহা একেবারে গণ্ডগোল হইবে। কত লোকের জন্য হিন্দুকোডের ১ম অংশ অর্থাৎ দায়ভাগ বাহাল হইবে? বাঙ্গালী আসামী হিন্দুর সংখ্যা কত? চারি কোটি হইবে কি? স্বোপার্জ্জিত হিন্দুর বৃত্তি ভোগীর সংখ্যা কত? দুই কোটি হইতে পারে কি? তন্মধ্যে কত লোকের সম্পত্তি দায়ভাগ বণ্টন যোগ্য হইতে পারে? কত লোক আয়কর দেয়? মোট সংখ্যা ছয় লক্ষ হইতে পারে কি?

সমগ্র হিন্দুর জন্য এক আইন করিবার স্বপ্ন যাহারা দেখিতেছে, তাহারা যদি একটু মাত্র বস্তুজ্ঞানের পরিচয় দেয় তবে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিবেন।

২। সাম্যবাদের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কমিটি জানেনই না যে, যে হিন্দুনারী নরের সম্পত্তি অধিকারের সাম্য চাহে তাহারা হিন্দুনারী নহে। হিন্দুনারী চায় শ্বশুর শাশুড়ী ননদিনী ও দেবরের উপর সম্রাজ্ঞী হইতে, সকলের উপর আজ্ঞা জাহির করিতে, কেবনা সে জানে সংসারের শ্রী, শোভা, সৌষ্ঠব ও বিভূতি তাহার পলকহীন কল্যাণ দৃষ্টিতে লাভ হয়। স্বামী, দেবর, শ্বশুর প্রত্যেকেই তাহার আজ্ঞাবহ। হিন্দুনারী জানে তাহার স্বামীকে বিবাহের মন্ত্রে তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় তুমি আমার দশটী পুত্র দিও—দশদিক্‌পাল—তখন অর্থাৎ দশটী সন্তানের জননী হইলে সে তখন বিশ্বজননী, কাজেই এই বিশ্বের কল্যাণদাত্রী হইলেই তাহার দিনান্তের অবসরও ভিন্ন তুষ্টি হয়। তাহার স্বামীকে

বিবাহের সময়ই কন্যাদেবতার কাছে যাচ্ঞা করিতে হয়, তুমি আমাকে একাদশ স্থান দিও। দেবীর—শক্তিময়ী দেবীর—হৃদয়ে কথঞ্চিৎ স্থানের ভিক্ষা। হিন্দু নারীর কত গৌরবের অধিকার ঐ একাদশ স্থান দান! আর হিন্দুনারী জানে সে মহামায়ার প্রকৃতির প্রতীক—নরদেহে প্রকৃতির চঞ্চল খেলার জন্যই তাহার জন্ম। সে যখন জন্মায় তাহার লীলাখেলা প্রস্রবণের ঝরণার মতন উছলিয়া চলে। তাহার মানবজীবনের সার্থকতার পরিণতি হইল, সেই চপলতাকে একটী খাতে প্রবাহিত করা। যেন শিবালিক পর্ব্বত মালার অসংখ্য ধারা হরিদ্বারে আসিয়া "হরকি পাড়ি"র খাতে প্রবাহিত করা। সেই একটী খাত হইল নারীর বিবাহ। বিবাহ হইলে দম্পতিকুলে নারী হন ধ্রুবা। সেই বিবাহের আশীর্ব্বচন হইল সপ্তপদী গমনের মন্ত্র; এক একটী পদ গমন করিয়া শ্রী, সম্পদ, সমৃদ্ধির এক একটী আহ্বান করা হয় এবং মন্ত্রশক্তি নারী শক্তিকে সেই একএকটী আশীর্ব্বাদে কার্য্যকারিনী করিয়া তোলে! একা পুরুষে তাহা করিতে পারে না বলিয়াই শক্তিহীন শিব শবমাত্র। একই তত্ত্ব ভাষান্তরে বলা হয় জায়া নিজেও সন্তান এইসব লইয়াই পুরুষ পুরুষ। হিন্দুর সামান্যা নারী মাত্রই তাহার নিজের এই মহিমা জানে—পিতৃ-সংসারে মাতার আদর্শে জানে—শ্বশুর কুলের আশীর্ব্বাদে জানে—বিবাহের অনুষ্ঠান গৌরবে জানে—ভবিষ্যতে জননী হইবার সম্ভাব্যতায় জানে—গৃহিণীর মহীয়সী আশায় জানে। ইহাই তাহার সর্ব্বস্ব ও ঐশ্বর্য্য। ইহার কাছে অন্য কোনও সম্পত্তি লাভ তাহার কাছে অতি তুচ্ছ।

৩। নারীর সীমাবদ্ধ স্বত্ব—ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা ও প্রমাদপূর্ণ প্রচারণা কল্পনায় আনা যায় না। পাশ্চাত্যের ধারণা সম্পত্তি—ভোগের উপাদান। হিন্দুর কৃষ্টিতে সম্পত্তি পুরুষের ঋণশোধের অবলম্বন। সে ঋণ তিনটী দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। দেবঋণ শোধ হয় যজ্ঞাদির দ্বারা অর্থাৎ সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা। ঋষিঋণ শোধ হয়, বিদ্যার্জ্জনের দ্বারা বিদ্বজ্জন প্রতিপালনে। মেকলে যখন শিক্ষানীতি প্রচলন করেন, তখনও হিন্দুর দানে এই বঙ্গদেশে একলক্ষ সাড়ে বারো হাজার পাঠশালা চলিত, শত শত টোল চতুষ্পাঠী প্রতিপালিত হইত। আর এই দুই ঋণ-শোধের জন্যই বিবাহ প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী সন্তান ধারা কখনও ছিন্ন করিবে না কেননা তাহাই পিতৃঋণ শোধের উপায়। ইহাই পুরুষের কর্ত্তব্যপালনের জন্য সম্পত্তির সার্থকতা। নারীর সার্থকতা এই সমস্ত কর্ত্তব্যপালনের সহকারিতা। ধর্ম্ম, পৈত্রা, প্রজা ও কামের চরিতার্থতার জন্য নারীকে বিবাহ চাই।

শাস্ত্রকার সেই নারীর প্রকৃতি অনুযায়ী স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন। সেই কারণেই মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক নারী তাহার কর্ত্তব্য ক্ষেত্রের অবদানে যাহার সম্পর্কেই আসিবে—তৎকর্ত্তৃক পূজ্যা—কিসের উপচারে? ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। যখন নারীরা এয়োবরণের জন্য আহুত হন, তখন হইতে আজও হিন্দুর ঘরে ঘরে 'নমস্কারি' দেওয়া প্রচলিত আছে। যৌতুকের ভূষণাচ্ছাদনাশনে ও নারীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। নারীর শিল্পার্জ্জিত বিত্তে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। সংসারে সংবিভাগিতা ধর্ম্ম পালন কার্যে অর্থাৎ কাহাকেও অন্ন ও অন্নদানে জলদানেও নারীর স্বত্বের উপর কথা কহিবার অধিকার কাহারও নাই। স্ত্রীধনে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পতি, সুত, পিতা, ভ্রাতা কাহারও নাই। করিলে প্রত্যার্পন করিতে হয় ও রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত নারীকে দান করিবার কোনও সীমা হিন্দুর শাস্ত্রে কোথাও নাই।

ফলতঃ, হিন্দুর শাস্ত্র বাক্যের মূলতত্ত্ব অন্যত্রও যাহা এক্ষেত্রেও তাহাই। অধিকার ভেদ মানা। পুরুষের অধিকার পুরুষের কর্ত্তব্য পালনের জন্য, আর নারীর অধিকার তাহার স্বামীকুলের শোভা সৌষ্ঠব রক্ষা ও বর্দ্ধনের জন্য। পারিবারিক উন্নতির জন্য এই ভেদরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনু যাজ্ঞবল্ক্যে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। আমাদের আইন কর্ত্তারা সে ভেদ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ: অথচ এই ১৯৩৩ সালে একজন বিলাতের হিন্দু আইনের অধ্যাপক নাম সেমুর ভিসি ফিজগেরাল্ড এই মনুর স্মৃতির তত্ত্বকে হিন্দুর আইন বুঝিবার ও বুঝাইবার ভিত্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার যৌথ পরিবারের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যৌথ পরিবারের কেন্দ্র হইল একই পূজা ও একই অন্ন বা রন্ধন শালা। নারীর সম্পত্তির সার হইল পূজার আয়োজন ও রন্ধন শালার অন্নপূর্ণা হওয়া। ইহাতে তাহার কোনও অধিকার কোনও বচনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সে অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার অর্থ সংসার ধর্ম্ম পালনে প্রত্যবায়। পুরুষের তাহা পাপ ও অকর্ম্ম।

আধুনিক পণ্ডিতম্মান্যরা এই সকল মৌলিক তত্ত্ব কিছুই জানে না বলিয়া আমাদের নানা বিদ্রূপ করিবে তাহা আমরা জানি। অজ্ঞতার একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় পণ্ডিতমান্য হওয়া। আর দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পণ্ডিতম্মান্যদের ধৃষ্টতাও অজ্ঞতার নিদর্শন দেখাইব।

বৎসর ৮ পূর্ব্বে একজন জঙ্গীনায়ক বিলাতের ইংলিশ রিভিউ পত্রে নারীকে গৃহে ফিরিতে আহ্বান করেন। লেখকের নাম লিডেল হার্ট। তিনি প্রবন্ধের নামকরণ করেন Woman Wanders The world wavers—নারীরা ঘুরিয়া মরিতেছে, বিশ্ব টলমল করিতেছে। নারী ঘুরিয়া মরিলে গৃহে শান্তি ও শ্রী থাকেনা, কাজেই বিশ্ব টলমল করে। তাহারই ফলে জগৎজোড়া যুদ্ধ। ভাবিবার কথা আইন কর্ত্তারা ভাবিবে কি?

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই ১৯০৪ সালে ভগ্নী নিবেদিতা হিন্দুর নারীর কি পরিচয় দেয়? ১৯০৬ সালে ধর্ম্মনীতির বিশ্বকোষে হিন্দুর দাম্পত্য জীবনের কি আদর্শ ঘোষিত হয়? ১৯০৯ সালে Royal Society হিন্দুর স্বামী স্ত্রীর কি পরিচয় পায়? ১৯১৩ সালে সার জর্জ বার্ডউড—চিৎপাবনীদের ঘরে Perfect daughter, perfect wife and prefect mother নিখুঁত কন্যা, নিখুঁত পত্নী ও নিখুঁত মাতা দেখিয়া কি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন? তাহার পর দশ বৎসর পরে হিন্দু নারীর যে চিত্র মেয়ো মিসির করমাসি মসীরঞ্জনে চিত্রিত হইল, তাহারই সমর্থনের জন্য আইনের পর আইন আসিতেছে কিনা?



বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

বহু প্রত্যাশিত ও বহু বিঘোষিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইয়াছে, গত ৬ই জুন ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে সম্মিলিত পক্ষের সেনা অবতরণ করিয়াছে। প্রবল অবতরণের ক্ষেত্র ব্যাপক নয়; জার্ম্মানীর বিশাল বাহিনী এখনও এখানে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয় নাই। তবুও, ইহা দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রারম্ভিক অধ্যায়; ক্রমে ইহা বিস্তৃত হইবে, প্রচণ্ডতাও বর্দ্ধিত হইবে। মিঃ চার্চ্চিল উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে এই সৈন্ত অবতরণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "the first of a series of landings." সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়, এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্ত স্থানেও অবতরণ করিবে।

ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডী প্রদেশে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের এই প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। এখানে সেরবুর্গ বৃহত্তম পোতাশ্রয়। মার্কিণ সেনা সমগ্র সেরবুর্গ উপদ্বীপকে দক্ষিণ দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে ঐ সহর ও পোতাশ্রয়কে চাপিয়া ধরিতেছিল। গত ২৬শে জুন তাহারা সেরবুর্গ অধিকার করিয়াছে। সেরবুর্গ অধিকৃত হওয়ায় দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। ঐ পোতাশ্রয় সংস্কার করিয়া উহাকে কার্য্যোপযোগী করিতে বিলম্ব না হইবারই কথা।

জার্ম্মানীর সামরিক তৎপরতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বিস্মার্কের আমলে সর্ব্বদা একটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইয়াই জার্ম্মানী ইউরোপে সামরিক প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর, কাইজার দুই দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই তখন জার্ম্মানীর সামরিক বিপর্য্যয়ে বিলম্ব হয় নাই। এবার হিটলার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিলেন। রুশিয়ার সহিত অনাক্রমণচুক্তি হইবার পূর্ব্বে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন নাই; আবার পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল—তিন মাসের মধ্যে রুশিয়া চূর্ণ হইবে; এই অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকার সাহায্যে পুষ্ট হইয়া বৃটেনের পক্ষে ইউরোপ বিপন্ন করা সম্ভব হইবে না। ভবিষ্যতে বৃটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে তখন পূর্ব্বাঞ্চল সম্পর্কে আর দুশ্চিন্তার কারণ থাকিবে না। সোভিয়েট বাহিনী হিটলারের এই হিসাব ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছে। এই এক ভুলেই এখন তাঁহার সব ভুল হইতে বসিয়াছে; আজ কেবল দুইটি নয়, তিনটি রণাঙ্গনে তিনি যুদ্ধ লিপ্ত। ক্রমে এই রণাঙ্গনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বস্তুত, ১৯৪২ সালে শরৎকালে জার্ম্মান বাহিনী যখন ষ্ট্যালিনগ্রাডে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিতে পারে না, সেই সময়েই হিটলারের সমগ্র পরিকল্পনার ব্যর্থতা সূচিত হয়। তাহার পর হইতেই রণক্ষেত্রের অবস্থা অতি দ্রুত জার্ম্মানীর প্রতিকূল হইতে থাকে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের ব্যর্থতার সহিত উত্তর আফ্রিকা ও ইটালীর ঘটনাবলীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। ষ্ট্যালিনগ্রাডেই ১৯৪৩ সালে সোভিয়েট বাহিনীর বিপুল বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হইয়াছিল। এই ষ্ট্যালিনগ্রাড-রক্ষী বীরদলই আজ পশ্চিম ইউরোপে অভিযান সম্ভব করিয়াছে।

এই অভিযানের ব্যাপকতা এখনও আশানুরূপ না হইলেও মিঃ ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃক এই প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হইয়াছে। কাজেই, মনে করা যায়, তেহরাণে সমর-প্রচেষ্টার সমন্বয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, নরম্যাণ্ডীর এই তৎপরতা তাহার সহিত অসামঞ্জস্যকর নয়। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অসাধারণ সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দুই বা ততোধিক রণক্ষেত্রে যদি প্রবলভাবে আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহার ফল অতি শীঘ্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মিঃ চার্চ্চিলের ন্যায় অতি সাবধানী ব্যক্তিও সেদিন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বৎসর গ্রীষ্মকালেই যুদ্ধ শেষ হইতে পারে।



ব্রিটিশ উইমেনস অক্সিলারীর নবনিযুক্তা ডিরেক্টর
এল্. ভি. এল্-ই হোয়াইট্ লে

ফ্রান্স সম্পর্কে রাজনৈতিক জটিলতা

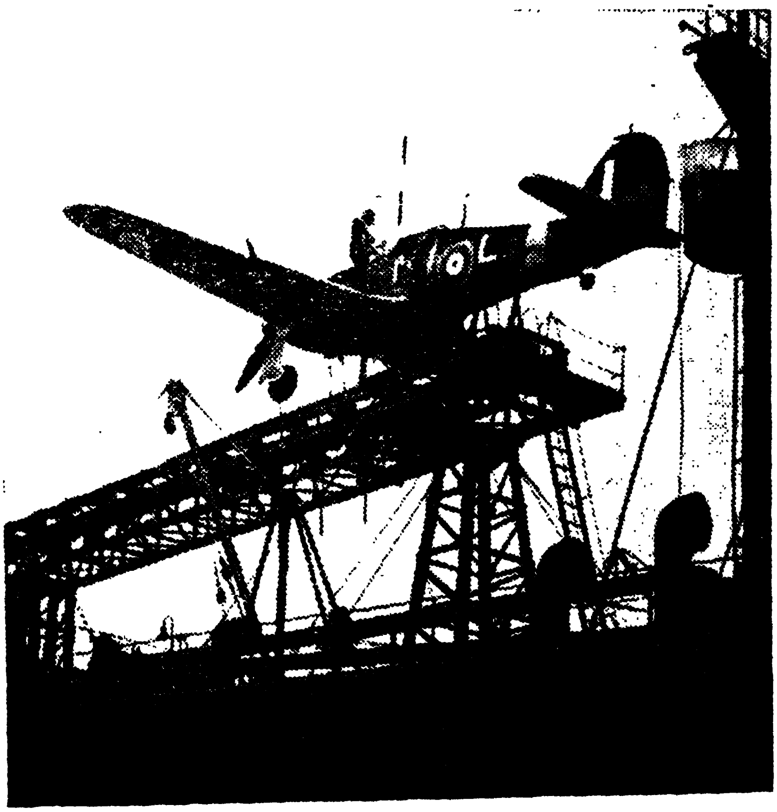
ফ্রান্স সম্পর্কে রাজনৈতিক সমস্তা পূর্ব্ব হইতে জটিল হইয়া

রহিয়াছে। আশা ছিল, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই সমস্তার সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হয় নাই।

১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর জেনারল ন্ত গলের নেতৃত্বে একদল ফরাসী বৃটেনের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়া আসিতে-ছিলেন। ফরাসী ভূমিতে যে জার্ম্মান-বিরোধী গুপ্ত আন্দোলন এখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, উহা নেতারা বহু পূর্ব্বে দ্য গলের নেতৃত্বে গঠিত ফ্রি ফ্রেঞ্চ কমিটী মানিয়া লন। ১৯৪২ সালে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত একমাত্র এই ফ্রি ফ্রেঞ্চ কমিটীই জার্ম্মান-বিরোধী ফরাসীদের পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকারী ছিল। ১৯৪২ সালে নভেম্বর মাসে সম্মিলিত পক্ষের সেনা যখন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ করে, তখন জেনারেল আইসেনহাওয়ার ভিসির সহযোগী এড্মিরাল্ দার্লাঁর সহিত এক চুক্তি করেন। দার্লাঁ প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মার্শাল পেতাঁর অনুমোদনে সম্মিলিত পক্ষের সহিত চুক্তি করিয়াছেন। পরে, পেতাঁ তাঁহাকে সমর্থন না করিলেও সম্মিলিত পক্ষ তাঁহাকে তৎকালীন ফরাসী গভর্ণমেণ্টের (ভিসি গভর্ণমেণ্ট) প্রতিনিধিরূপেই গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেও ভিসির সহিত তাহার কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই। ১৯৪২ সালে নভেম্বর মাসে দার্লাঁর সহিত চুক্তি করিবার সময় আমেরিকা (সরকারীভাবে না হইলেও) এইরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে যে, তাহার পূর্ব্বের মিত্র ভিসি গভর্ণমেণ্টের সহিতই এই চুক্তি হইল; তবে, সেই গভর্ণমেণ্টের লাভাল-পেতাঁ তাহাকে ত্যাগ করিয়া জার্ম্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠতর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছে।

সম্মিলিত পক্ষের এই আচরণে তখন চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়; ফ্রান্সের পতনের পর হইতে যাহারা জার্ম্মানীর সহিত প্রাণপণ শক্তিতে যুঝিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মানীর তাঁবেদার ভিসির সহযোগীদের সহিত এই মিলন সত্যই অত্যন্ত অশোভন দেখায়। সম্মিলিত পক্ষ তখন কৈফিয়ৎ দেন—সাময়িক প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে; দার্লাঁর সহিত চুক্তিতে বহু সৈন্ত এবং মূল্যবান সময় বাঁচিয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পরে দার্লাঁ আততায়ীর গুলীতে নিহত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ জিরোকে তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পর লণ্ডনের ফ্রি ফ্রেঞ্চ কমিটীকে বাদ দিয়া উত্তর আফ্রিকার এই প্রতিষ্ঠানটি মানিয়া চলিবার কোন কৈফিয়ৎ নাই। কাজেই, জিরো ও দ্য গলের মধ্যে মীমাংসার জন্ত যখন চারিদিক হইতে দাবী উত্থিত হইতে লাগিল, তখন সম্মিলিত পক্ষ এই বিষয়ে নিরপেক্ষতার ভান করিলেন। জেনারেল কাত্রু প্রভৃতির চেষ্টায় ১৯৪৩ সালে জুন মাসে জিরো ও দ্য গলের মধ্যে আপোষ হয়; তাঁহারা দুইজন আলজিয়ার্সে গঠিত ফরাসী মুক্তি সমিতির (French Liberation Committee) যুগ্ম সভাপতি হন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে পরামর্শ পরিষদ (Consultative Assembly) গঠিত হইবার পূর্ব্বে মুক্তি সমিতির কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতেছিল। এই পরামর্শ পরিষদে ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের বহু প্রতিনিধি স্থান লাভ করে;



ফাইটার প্লেন ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজ রক্ষা করিতেছে

কম্যুনিষ্টরাও কতকগুলি আসন পায়। ইহার পর হইতে ভিসির সমর্থকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। গত এপ্রিল মাসে ভিসির শেষ চিহ্ন জিরো রাজনৈতিক ক্ষমতায় বঞ্চিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে আফ্রিকায় ভিসির সমর্থক প্রায় ৬শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। লাভাল গভর্ণমেণ্টের পুলিস বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তা পুশো এবং আরও ৩জন ভিসির বিশিষ্ট সমর্থকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। বাইশোঁ, পীরুতোঁ, ফ্লঁদী প্রভৃতি এখন কারাগারে; ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির অনুরোধ তাঁহাদের বিচার আপাততঃ স্থগিত আছে।

ফরাসী মুক্তি সমিতি ফ্রান্সের উপনিবেশ নীতি আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আলজিরিয়ার মুসলমানেরা এখন ভোট দানের অধিকার লাভ করিয়াছে; ফরাসী সৈন্য ও আলজেরিয়ান্ সৈন্যকে সমান বেতন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার শিক্ষা-নীতির আদর্শে উপনিবেশগুলি হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মুক্তি সমিতির তৎপরতার জন্যই লেবানন ও সীরিয়া ক্রত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। খাস ফ্রান্স সম্বন্ধেও এই সমিতির পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রগতিমূলক। ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম নারীদিগকে ভোটাধিকার প্রদানের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে—মুক্তি লাভের পর শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে পরিষদ গঠিত হইবে, তাহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিবে; প্রতি ২ লক্ষ অধিবাসী এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। স্বপ্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সে ব্যবসায়ীরা আর সংবাদপত্রের মালিকানা পাইবে না—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড্ ইউনিয়ন ও গণ-সমিতি সংবাদপত্র পরিচালনা করিবে। সমস্ত মূল শিল্প (Key Industry) জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

সমগ্র জার্ম্মান-বিরোধী ফরাসীদের সমর্থনপুষ্ট এই মুক্তি সমিতিকে সোভিয়েট রুশিয়া বহু পূর্ব্বেই ফ্রান্সের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু মানে নাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন। তাহাদের বক্তব্য—এই সমিতি যে সত্যই ফরাসী জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় তাহার প্রমাণ নাই। আমেরিকার পক্ষ হইতে নাকি এইরূপ নির্লজ্জ উক্তিও করা হইয়াছে যে, ফরাসী মুক্তি পরিষদকে স্বীকৃতি দান'ার সহিত আমেরিকার চুক্তির সর্ত্তের বিরোধী। ফরাসী মুক্তি সমিতির প্রতি ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির এই অবজ্ঞার জন্য এখন স্বভাবতঃ শত্রুর কবলমুক্ত ফরাসী অঞ্চলে সামরিক শাসন-ব্যবস্থা (Amgot) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে; সেখানে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনবিহীন আমেরিকার মুদ্রিত ব্যাঙ্ক-নোট চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষ হইতে মুক্তি সমিতি সম্পর্কে যাহাই বলা হউক না কেন, এই সমিতি ফ্রান্সের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট (Povisional Government) বলিয়া গণ্য হইবার দাবী যে অত্যন্ত সঙ্গত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যত জার্ম্মান-বিরোধী ফরাসীর অভিমত জানা সম্ভব, তাহারা সকলেই এই সমিতিকে সমর্থন করিয়াছে। সর্ব্বোপরি, জার্ম্মানীর শৃঙ্খলিত ফরাসী ভূমিতে যে সব ফরাসী নর-নারী অশেষ দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহারা এই সমিতির সমর্থক। ফরাসী জাতির যথারীতি নির্ব্বাচনে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই বলিয়া ইহার দাবী উপেক্ষা করা অত্যন্ত অন্যায়। ফরাসী জাতির স্বাধীন নির্ব্বাচনে গঠিত প্রতিষ্ঠান ত ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারী। ১৮৭১ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হইলে সে প্রতিষ্ঠান নিজেকে ফ্রান্সের স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বলিয়া দাবী করিতে পারে। ফরাসী মুক্তি সমিতি যদি সেইভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানই হইবে, তাহা হইলে উহা কেবল অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইতে চাহিবে কেন? কৌতুহলের বিষয় এই, চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সব গভর্ণমেণ্ট বৃটেনের পিঞ্জরাপোলে জিয়ানো আছে, তাহারা হইল প্রতিনিধিস্থানীয়, আর প্রতিনিধিস্থানীয় হইল না ফরাসী মুক্তি পরিষদ!

প্রকৃত কথা এই—বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীরা স্বার্থ-প্রণোদিত কারণে প্রগতিমূলক ফরাসী মুক্তি পরিষদকে মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক এই অনিচ্ছার সমর্থনে যুক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—সঙ্গত যুক্তি হইতে অনিচ্ছার উদ্ভব নহে। এই প্রতিক্রিয়াপন্থীর দল যুদ্ধের পর ফ্রান্সে প্রাগ-যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন চাহে। কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতিকদের সমর্থনপুষ্ট প্রগতিমূলক মুক্তি সমিতিকে সমর্থন করিলে তাহাদের এই স্বপ্ন বিফল হইবে। এই জন্যই মুক্তি পরিষদকে এড়াইয়া চলিবার জন্য এখনও এই হীন প্রচেষ্টা।

এই প্রচেষ্টা যে সম্ভব হইবে না এবং এই অন্যায় চেষ্টার ফলে যে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহার আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম ইউরোপে অভিযান আরম্ভ হইবামাত্র ফ্রান্সে প্রতিরোধ-আন্দোলন বৃদ্ধি পাইয়াছে, বহু স্থানে এই আন্দোলনকারীরা সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, ফ্রান্সের বিভিন্ন কারখানায় ধ্বংসমূলক কাজ চলিতেছে, কোথাও কোথাও শত্রুর সহিত তাহাদের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষও বাধিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের বেগ যত প্রবল হইবে, প্রতিরোধ-বাহিনীর এই তৎপরতাও তত প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইবে। এই তৎপরতার ফলে স্থানে স্থানে তাহারা শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী মুক্তি সমিতিকে ফ্রান্সের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টরূপে মানিয়া না লন, তাহা হইলে প্রতিরোধ-বাহিনী কর্ত্তৃক মুক্ত অঞ্চলে স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহা ফরাসী সমিতির এজেণ্টরূপে কাজ করিবে। এই গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সমর্থন পাইবে; কারণ মুক্তি সমিতিকে সে মানিয়া লইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইবেন; তখন হয় প্রতিরোধ-বাহিনীর গভর্ণমেণ্ট তথা মুক্তি সমিতিকে মানিয়া হইতে হইবে, অথবা অস্ত্রবলে এই গভর্ণমেণ্টকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করাইতে হইবে। দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন যে আর সম্ভব নয়, তাহা নিশ্চিত। প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিকদের মনোভাব যাহাই হউক, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা ও ইঙ্গ-মার্কিণ জনসাধারণ যে এখন আর রাজনৈতিক চেতনাহীন ও জড় নয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রুশিয়ার তৎপরতা

পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির অভিযান আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের তিন মাসব্যাপী নিষ্ক্রিয়তা ভঙ্গ করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে জেনারল গভরভের নেতৃত্বাধীনে সোভিয়েট বাহিনী ফিন্‌ল্যাণ্ডের তিনটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে। এখন তাহারা ভিবর্গ অধিকার করিয়া হেন্‌সিঙ্কি অধিকার করিয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রধান প্রতিরোধ-প্রাচীর চূর্ণ হওয়ায় এই ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধে আর দুশ্চিন্তার কারণ নাই। তবে, সোভিয়েট বাহিনী এই রণাঙ্গনে নিষ্ক্রিয় থাকিবে না। রুশিয়ার

সঙ্গত ও উদার সন্ধির প্রস্তাব ফিন্‌ল্যাণ্ড উপেক্ষা করিয়াছে; এখন এই রাজ্যের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্ত এবং এই রাজ্য হইতে জার্ম্মান সৈন্ত বিতাড়নের জন্ত যত দূর যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া দরকার, ততদূর রুশিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিপরীত ভঙ্গিয়া এখন সোভিয়েট বাহিনী মধ্য রণাঙ্গনে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। গত ২৩শে জুন হইতে মগিলেভ-ভাইটেব্স্ক অঞ্চলে তাহারা প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। গত ২৬শে জুন সোভিয়েট বাহিনী ভাইটেব্স্ক অধিকার করিয়াছে। হোয়াইট রুশিয়ার রাজধানী মিন্‌স্কই সোভিয়েট বাহিনীর আশু লক্ষ্য। তবে, মধ্য রণাঙ্গনেই সোভিয়েট বাহিনীর তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকিবে না—উহা ক্রমে সমগ্র পূর্ব্ব রণাঙ্গনে পরিব্যাপ্ত হইবে। তেহরাণ সম্মিলনে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ইউরোপ অভিযানের সহিত রুশিয়ার গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সমন্বয় সাধনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই রুশিয়ার বর্ত্তমান অভিযান। মঃ ষ্ট্যালিনের সেই কথা এখন আবার স্মরণ করা যাইতে পারে—আহত (নাৎসী) পশুকে তাহার গুহায় যাইয়া বধ না করা পর্য্যন্ত সোভিয়েট বাহিনী ক্ষান্ত হইবে না।

রোম অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর রাজনৈতিক অবস্থার এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। "আমুগটের" পরিবর্ত্তে প্রকৃত গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইটালীর গণ-শক্তি এখন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছে। মিলান, টিউরীন প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ-আন্দোলন এখন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।



ইংলণ্ডে নাবিকগণ রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে

ইটালীয় রণাঙ্গন

ইটালীতে গত ৫ই জুন সম্মিলিত পক্ষের সেনা রোম অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মানী রোম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে নাই, উহা ত্যাগের সময় ধ্বংসকার্য্যও চালায় নাই। রোম অধিকারের পর ইটালীর পশ্চিম উপকূলে সম্মিলিত পক্ষের ৫ম বাহিনী ফেলোনিকা সহরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; আড্রিয়াতিকের উপকূলে ৮ম বাহিনী এখন আন্‌কোনার নিকটবর্ত্তী। ইতিমধ্যে সম্মিলিত পক্ষের সেনা এল্‌বা দ্বীপ অধিকার করিয়াছে।

ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল্ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, রোমের পতন হইলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন। মার্শাল বাদোগ্‌লিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কারণ গণ-প্রতিনিধিরা তাঁহার নেতৃত্বে কাজ করিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর, আইভ্যানো বোমিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সমস্ত প্রগতিপন্থী দল এই গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছে।

প্রাচীন রণক্ষেত্র

মণিপুর রণাঙ্গনে কোহিমা-ইম্ফলের সংযোগ সাধিত হইয়াছে; মণিপুর রোডে শত্রু সৈন্ত আর নাই। তবে, ইম্ফলের সমতলভূমিতে এখনও শত্রুসৈন্ত মধ্যে মধ্যে হানা দিতেছে। মণিপুর অঞ্চলে এখন প্রবল বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ষার সময় এই অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা তেমন বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না; তবে উভয়পক্ষের আকস্মিক আক্রমণ চলিতে পারে। উত্তর ব্রহ্মে মিচিনায় শত্রুসৈন্য এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে, সম্প্রতি মিচিনার নিকটবর্ত্তী শক্তিশালী ঘাঁটি মগঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের সেনা প্রবেশ করিয়াছে। মোটের উপর, বর্ষার পূর্ব্বে কোন পক্ষের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই—জাপানীরা ইম্ফল অধিকারে অসমর্থ হইয়াছে; সম্মিলিত পক্ষও মিচিনা অধিকার করিয়া সালুইন্ অঞ্চল হইতে অগ্রগামী চীনা বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।

২৭।৬।৪৪

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি সুজার হাবভাব দেখিয়া গাজী সাহেব সংকিত হইয়াছিলেন। যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে বিকৃত মস্তিষ্ক ডি-সুজা হয়তো পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া দিবে,—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িবে অবশেষে। আফিঙের ব্যবসার খবরটা একবার বাহির হইয়া গেলে কিছু আর করিবার থাকিবে না, দীর্ঘকাল শ্রীঘর বাস অনিবার্য। এ তো আর পুলিশের সাধারণ ব্যাপার নয় যে দারোগা ইন্‌সপেক্টারের পকেট ভারী করিয়া দিলেই চলিবে।

কিন্তু ডি-সুজা বাহিরে জিনিসটাকে একেবারেই যে প্রকাশ পাইতে দিলনা, ইহাতে গাজীসাহেব অতিশয় আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন। এমন কি, এ কথাও তাঁহার মনে হইল যে লোকটার জন্যে কিছু করিতে পারিলে মন্দ হইত না। বুড়া সাহেবের কাছে নানা দিক হইতেই তিনি ঋণী।

এখানে গাজীসাহেবের কিছু বিস্তৃত পূর্ব পরিচয় দেওয়া চলিতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে মুসলমান ক্ষাত্র-শক্তির প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িল। দাক্ষিণাত্য সমাগত দেব-বংশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে তখন ঘুণ ধরিয়াছে; হিন্দু-ধর্মের পর অভ্যুত্থানের দোহাই দিয়া বৌদ্ধ সংপ্রদায়ের উপরে চরম অত্যাচার চলিতেছে, লৌকিক সংস্কারের কঠিন নাগপাশে জাতির শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় এবং কামতন্ত্রতার প্রশ্রয়ে রাজসভায় রসের স্রোত বহিতেছে। ক্ষত্রিয়ের চারণ-গাথা লোপ পাইয়াছে গীত-গোবিন্দের 'ললিত-মধুর কোমল কান্ত পদাবলীতে' এবং পরকীয়া প্রেমে সুদক্ষ রাজার গৌরব-গাথা তাম্রশাসনে অবিনশ্বর করে কীর্তিত হইতেছে।

এমনি সময় মুসলমান শক্তির সংঘাতে গৌড়ের রাজ-সিংহাসন ধূলায় মিলাইয়া গেল। রাজা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে একদল হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে হইল, একদল বৌদ্ধ হিন্দুদের মতে দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গেল। উত্তর ও মধ্য বঙ্গের বিচূর্ণ দেবালয়গুলির পাথর লইয়া মস্‌জিদ তৈয়ারী হইল, দীঘির শীতল কাদার মধ্যে পলাতক পাষাণ-দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অজ্ঞান-তন্দ্রায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পূর্ববঙ্গ,—আরো বিশেষ করিয়া সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁষিয়া এই যে অঞ্চলগুলি, ইহারা তখন সদ্যোজাত ক্লেদাক্ত শিশুর মতো জল-কাদা আর জঙ্গল লইয়া মাথা তুলিতেছিল। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা চলিতে পারে। বনে হিংস্র জন্তু, জলে কুমীরের বিচরণ, ঝোপে জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের সমুদ্ধত ফণা।……উত্তর ও মধ্যবঙ্গ হইতে পলাতক হিন্দু একদল জমিদার পূর্ব বাংলার এই সমস্ত দুর্গম স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন—প্রকৃতি পরম যত্নে দুর্গের মতো তাহার নানা প্রতিকূলতার প্রাকার তুলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন এইভাবেই কাটিল। তার পর দেখিতে দেখিতে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য রাজ্য বর্তমানের গতিতে আসিয়া পা দিল, জল কাদা শুকাইল, বন জঙ্গল সমুদ্রের দিকে সরিতে লাগিল, হিংস্র জন্তুরা পথ করিয়া দিল মানুষকে। উত্তর বঙ্গ বিজয়ী মুসলমানের তরবারি পূর্ববঙ্গের আকাশেও বিদ্যুৎশিখায় ঝল্‌সিয়া উঠিল।

মুসলমান রাজারাই যে কেবলমাত্র তখন দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন তাহা নয়। একদল ধর্মোন্মত্ত ফকির এই ভারটি গ্রহণ করিলেন। বিধর্মীদের ইস্‌লামের ছত্র ছায়ায় আনিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ছিল ফকিরদের ব্রত। কিন্তু ফকিরেরা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবের মতো অহিংস ছিলেন না—তাঁহাদের কোরাণ আর তরবারি পাশাপাশি চলিত। বাহুবলে তাঁহারা অবিশ্বাসী কাফের জমিদারদের পরাভূত করিয়া ইস্‌লামের দীক্ষা দিতেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের কীর্তি-কলাপের সীমা সংখ্যা নাই। নিম্ন বাংলার দুর্গমতম স্থলেও অভিযান করিয়া এই ফকিরেরা যেভাবে তাঁহাদের ব্রত পালন করিয়াছেন—একমাত্র আফ্রিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম প্রচারকারী মিশনারীদের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বাংলা দেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বিরাট কৃতিত্ব বহু পরিমাণে এই ফকিরেরাই দাবী করিতে পারেন।

এই অসিধারী ফকিরেরাই সে-যুগে গাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা কেহ কেহ নিজেদের অসীম শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতার বলে পীরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। নিম্ন বঙ্গে হিন্দু দেবতা ব্যাঘ্রাচার্য দক্ষিণ রায়ের সহিত সমানভাবে মুসলমানের পীর কোনো এক বড় খাঁ গাজীকে পূজা করা হয়। প্রচলিত মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক সাহিত্যে দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড় খাঁ গাজী এবং মহিলা বনবিবির নীতিকথা বর্ণিত হইয়াছে। সে-সব কাহিনীতে রূপকথার খাদ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বিস্মৃত যুগের এক অপূর্ণ অথচ অপূর্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাস।……

নরুল্ গাজী ইহাদেরই কাহারও বংশধর।

নুরুল্ গাজীর ঊর্ধতন পিতৃপুরুষ যখন ধর্ম-প্রচারার্থ এদেশে আসিলেন, তখন স্বরূপ রায় নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার এদেশে কোথাও রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রচুর সৈন্যসামন্ত ছিল, বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন, অস্ত্র-শস্ত্র হাতীঘোড়া ছিল এবং সর্বোপরি স্বরূপরায় দুর্দান্ত বীর ছিলেন। তাঁহার নামে নিম্নবঙ্গ তখন তটস্থ থাকিত।

নুরুল্ গাজীর পিতৃপুরুষ সিকন্দর গাজী প্রচুর সেনা লইয়া স্বরূপরায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন; কিন্তু স্বরূপরায়ের দুর্ধর্ষ বাহিনীর কাছে সিকন্দর গাজীর সৈন্য দাঁড়াইতে পারিলনা, স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভাসিয়া গেল তাহারা। বার বার তিনবার। রক্তে নদী বহিল, শবদেহে পাহাড় জমিল, স্বরূপরায় নিজে যুদ্ধে আহত হইলেন, তবুও তাঁহার শক্তিক্ষয় হইলনা।

উপায়ান্তর না দেখিয়া গাজী তাঁহার অলৌকিক শক্তির আশ্রয়

লইলেন। তিনি কী মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন কে জানে, আশে পাশের জঙ্গলে যেখানে যত বাঘ ছিল, তাঁহার মন্ত্রের আঘ্রাণে পিল্ পিল্ করিয়া সুবোধ বালকের মতো গাজীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের লইয়া তিনি এক অভিনব সৈন্যদল রচনা করিলেন এবং পুনরায় বীরদর্পে স্বরূপরায়ের রাজ্য আক্রমণ করা হইল।

স্বরূপরায়ের সৈন্যেরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই অভ্যস্ত, রণক্ষেত্রে বাঘের আবির্ভাব দেখিয়া তাহাদের আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইয়া গেল। সুন্দরবনের ডোরা-কাটা হলুদবর্ণের সমস্ত কেঁদো বাঘ—ভাঁটার মতো চোখগুলি পাকাইয়া হুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার মতো মনের জোর অবশিষ্ট রহিলনা। অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। স্বরূপরায়ের সেনাপতি বিক্রমপাল নাকি বর্মচর্ম লইয়া বাঘ মারিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন চারটি কেঁদো বাঘ একসঙ্গে পড়িয়া মুহূর্তে ঢাল-তরোয়ালসমেত তাঁহাকে রসগোল্লার মতো ফলার করিয়া ফেলিল।

অতএব একরকম বিনাযুদ্ধেই সমাপ্ত হইল বিজয়-পর্বটা। স্বরূপরায় সপরিবারের ইস্লাম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সিকন্দর গাজী স্বরূপরায়ের অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুলনা জেলার নিম্নাঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মান্তরিত বৌদ্ধের দল এবং গাজীদের তরবারি বাংলার শেষ হিন্দুশক্তিকেও লুপ্ত করিয়া দিল।

তাঁহারই উত্তর পুরুষ মুকুল্ গাজী কেমন করিয়া এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন, সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। নূতন জাগা চরের ইজারা লইয়া তাঁহার পিতামহ প্রথম এদেশে আসেন। সেই হইতেই গাজী সাহেবের স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস এবং ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন।

দিগ্বিজয়ীর বংশধর বলিয়াই বোধ করি, গাজী সাহেবের সঙ্গে ডি-সুজার হৃদ্যতাটা এত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সে বন্ধুত্বটা আরো প্রগাঢ় হইল, যখন দুইজনেই একটি ব্যবসায় ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের চরম অধ্যায়।

গাজী সাহেবের কাজ অবশ্য একটা নয়। চরে জমিদারীটা তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র। সুযোগ পাইলে লোক নামাইয়া তিনি এখনো নদীতে ডাকাতি করান। তা ছাড়া পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যটাও একেবারে বিসর্জন দেন নাই তিনি। উপরের দিক হইতে কেহ নারীঘটিত ব্যাপার করিয়া পলাইয়া আসিলে গাজীসাহেব তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তারপর রাতারাতি মেয়েটিকে ইস্লামে দীক্ষিত করেন—পুলিশ সন্ধান না পাইলে ভালোই, পাইলেও সেটাকে ফাঁসাইয়া দিতে তিনি জানেন।

দিন কয়েক বাদে গাজীসাহেব আবার চরইস্মাইলে আসিলেন। ডি-সুজার এখনও কোনো পরিবর্তন নাই, তাহার মাথা তেমনি অসংলগ্ন হইয়া আছে। দূর হইতেই একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আজও তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা তাঁহার করিতেই হইবে। সে ওষুধটা না লইলে কোনোমতেই চলিতেছে না। বয়স বাট হইয়া গেছে, তবু গাজীসাহেব আরো অনেক বেশি বাঁচিতে চান, সতেজ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জীবনকে উপভোগ করিতে চান, একান্ত ভাবে।

কবিরাজকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। রাধানাথ বাহিরের রোয়াকে একটা মাদুর পাতিয়া নির্জন দুপুরে নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। তাহার হাঁ-করা মুখের একপাশ দিয়া লালা গড়াইয়া ওয়াড়হীন তেলচিট্ চিটে কালো বালিশটার উপর পড়িতেছিল; আর তাহারি গন্ধে নিমন্ত্রিত একপাল মাছি ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহার উন্মুক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে—যেন অভি-যাত্রীর কৌতূহল লইয়া রহস্যপুরীর তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছিল।

গাজী সাহেবের জুতা আর কড়ির মালার খট্ খট্ শব্দে রাধানাথের তন্দ্রা ভাঙিল। কপাৎ করিয়া হাঁ-করা মুখটা সে বুঁজিয়া ফেলিল, আর সেই সঙ্গে আট দশটা অনুসন্ধিৎসু মাছিকেও উদরসাৎ করিল সম্ভবত। একহাত দিয়া মুখের দুর্গন্ধ লালাটা মুছিয়া লইয়া সে তন্দ্রাজড়িত রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর সসম্ভ্রমে চাহিল, গাজী সাহেব যে! আদাব-আদাব।

গাজীসাহেব দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে নীরবে একটু হাসিলেন। রাধানাথ জিজ্ঞাসার আগেই সংবাদটা জানাইয়া দিল, বাবু নেই তো বাড়িতে।

—কোথায় গেছেন?

—ওপারে, রুগী দেখতে। সন্ধ্যার পরে ফিরবেন।

—আমি তা হলে চললুম—গাজীসাহেব যাইবার জন্ম পা বাড়াইলেন।

বলরামের ভৃত্য,—অতএব সঙ্গগুণে মনিবের মতো কতকগুলি গুণও আয়ত্ত করিয়াছে রাধানাথ। আপ্যায়নের ত্রুটি সে-ও করিল না। বলিল, বসুন না, তামাক সেজে দিই—

—না বসব না। কবিরাজ এলে খবর দিয়ো আমি এসেছিলুম—গাজীসাহেব চলিয়া গেলেন।

রাধানাথ বড় করিয়া একটা হাই তুলিল, তারপর একটা বিড়ি ধরাইয়া আবার যথাস্থানে চিত্ হইয়া শুইয়া পড়িল। দিব্যি মিঠা বাতাস আসিতেছে—দিবা-নিদ্রাটি ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝ-খান হইতে গাজীসাহেব আসিয়া কাঁচা ঘুমটুকু মাটি করিয়া দিয়া গেল।

মধ্যরাত্রির মতো নিস্তব্ধ প্রশান্ত দুপুর। উক্তমণ্ডলের সূর্য মাথার উপরে জ্বলিতেছে প্রবলভাবে—আকাশটা পুড়িয়া যেন খাক্ হইয়া যাইবে। নীল আকাশটা অদ্ভুতভাবে নির্মল—এই অতিরিক্ত নির্মলতাটাকেই অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয় এখানে। এমনি এক একটি দিনেই কাল-বৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে।

তেঁতুলিয়ার জলকণা লইয়া স্নিগ্ধ হাওয়া আসিতেছিল। মাথার উপরে সুপারীর পাতাগুলি খস্ খস্ শব্দে কাঁপিতেছে, পাখীর ঠোকর লাগিয়া একটা পাকা সুপারী পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আর সেই সময়ে হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতেই গাজীসাহেব আর একবার মুক্তোকে দেখিলেন। আপনা হইতেই তাঁহার পা দুটি থামিয়া আসিল, দৃষ্টি আটকাইয়া রহিল দুর্লভ-দর্শন একটি অপূর্ব নারীমূর্তির দিকে।

সুপারীবনের একপাশে একটা ডোবা। সম্মান করিয়া পুকুর বলা চলিতে পারে। অনেকটা জায়গা লইয়া বলরামের বাড়ী আর বাগান, কাজেই ডোবাটাকে মোটামুটি নিরিবিলি ও নিভৃত বলিয়া মনে করিলে দোষ হয়না। তাই মুক্তো ঘাটে বসিয়া কী যেন করিতেছিল।

দূর হইতে অতৃপ্ত চোখে গাজীসাহেব তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। আঁচল খসিয়া পড়া অনাবৃত পিঠের উপর কালো

চুলের রাশি ছড়াইয়া আছে, অসতর্ক বেশ-বাসে সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত। চকিতের মতো সেদিন তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, আজ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

কে এ? বলরামের স্ত্রী নয় নিশ্চয়ই—অন্ত কোনো আত্মীয়া হইলে এই দূর দেশে আসিয়া তাহার সঙ্গে বসবাস করিতে কেন রাজী হইবে? তবে কি—

মুহূর্তে ব্যাপারটার সমাধান হইয়া গেল। বলরাম সাধু সাজিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এতটা শুদ্ধ সংযত কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রত্যাশাতে যেন গাজীসাহেবের মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলরাম যখন পাইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষেও খুব দুষ্প্রাপ্য হইবে না হয়তো। তা ছাড়া বলরাম অপেক্ষা তিনি সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তিও বটেন।

চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় চুম্বকের মতো কী একটা ব্যাপার আছে। মুক্তো এক সময় পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জলন্ত দুটি ক্ষুধার্ত চক্ষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া গেল।

মুক্তো চমকিয়া উঠিল। চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া লইল, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টানিয়া দিল মাথার উপর। গাজী-সাহেব একবার চারিদিকে তাকাইলেন—কোনোখানে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ কিছুই নাই। বাতাসে কেবল সুপারীর পাতা কাঁপিতেছে।

গাজীসাহেব হাসিলেন, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দুএকবার কাশিলেনও। মুক্তো কী ভাবিল কে জানে, ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার দিকে চকিত দৃষ্টি ক্ষেপন করিয়াই তড়িৎবেগে তিরোহিত হইল। গাজী-সাহেব দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

বলরামের ফিরিতে রাত হইয়া গেল। গীর্জার ঘাটে আসিয়া যখন তিনি নৌকা ভিড়াইলেন, তখন রাত বারোটার ওপরে গড়াইয়া গেছে। নৌকার মাঝি আলো ধরিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিল। এইখানেই কয়েকদিন আগে জোহান খুন হইয়াছে, কবিরাজের গায়ের মধ্যে ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

বাহিরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল—রাধানাথ খুলিয়া রাখিয়াছে। একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে মিট্ মিট্ করিয়া। দেওয়ালে চীনা মেয়ের ছবি বাতাসে দোল খাইতেছে।

শাদা জিনের কোটটা খুলিয়া এবং পায়ের লাল কেড্‌স জোড়াকে একপাশে রাখিয়া বলরাম নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিছানাটা পরিপাটি করিয়া পাতা,—মাথার কাছে একটা বড় ঘটি এবং এক গ্লাস জল কেরোসিনের কাঠের একটা টেবিলের ওপর বসানো রহিয়াছে। মুক্তোর হাতের স্পর্শ। সাংসারিক ভাবে মুক্তোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল করিবার কোনো কারণ নাই। রান্না-বান্না হইতে সুরু করিয়া তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনটুকুও সে যেন আগে হইতেই বুঝিয়া রাখে, কখনো এতটুকুও অভিযোগ করিতে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ সে কতখানি দূরে সরিয়া গেছে। অত্যন্ত কাছে টানিতে গিয়াই কি বলরাম মুক্তোকে হারাইলেন?

নৌকায় আসিতে আসিতে অনেক কথাই তাঁহার চিন্তার মধ্য দিয়া আনাগোনা করিয়াছে। আজ বলরাম বুঝিয়াছেন মুক্তোকে না হইলে তাঁহার চলিবে না। শুধু শারীরিক ভাবেই নয়—তাহাকে বাদ দিয়া তাঁহার মনও আজ কোনোখানে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়া-ছিলেন—তারপর এতদিন কাটিয়াছে শান্ত আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে। সংযমী ধীরচিত্ত মানুষ বলরাম, তাই বহুকাল পরে সেই স্থির সংযমে আসিয়া যখন তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে, তখন সেটা কোনোমতেই সংযত হইবার নয়।

কিন্তু তাঁহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এই অনাহুত শিশু—এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। দুটি অদৃশ্য অথচ দুর্বার বাহু প্রসারিত করিয়া সে বাধা রচনা করিয়া বসিয়া আছে। মুক্তো তাহাকে চায়—বলরাম তাহাকে চান না। তাই বলরামের প্রতি সন্দেহে মুক্তো ব্যাঘ্রীর মতো সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে বুঝি।

বলরাম বিছানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না। সেদিনকার মতো সর্বাঙ্গে অসহ্য উত্তেজনা। চোখের পাতা দুইটা বুঁজিলেও অন্ধকার আসে না—যেন আগুনের কতকগুলি ফুল সাম্‌নে নাচিতে থাকে। সমস্ত বিছানাটায় যেন বালি কিচ্ কিচ্ করিতেছে। বলরাম উঠিয়া বসিলেন।

মুক্তো আজকাল দরজায় খিল্ দিয়াই ঘুমায়। তা হোক। বল-রাম জানেন একটু চেষ্টা করিলেই ও-ঘরের দুটি কবাটের জোড় অনেকখানি ফাঁক হইয়া যায় আর সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া খিল খুলিয়া ফেলা চলে সহজেই। যা হওয়ার হোক—এই আত্মনিপীড়ন অসহ্য।

বাহিরে অন্ধকারে প্যাঁচা ডাকিতেছে—নিম্-নিম্-নিম্। প্যাঁচার ওই ডাকটার সম্বন্ধে এদিককার লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে—ওরা নাকি মৃত্যুর সংবাদ বহন করিয়া আনে। কাহাকেও লইয়া যাইবার মতলবে আসিয়াছে, নিম্ নিম্ করিয়া সেই কথাটারই জানান দিতেছে। চর্ ইস্‌মাইলের চারদিক ঘিরিয়া তেঁতুলিয়ার অতন্দ্র কল্লোল জাগিয়া আছে,—আর থাকিয়া থাকিয়া কুকুরের অর্থহীন চীৎকার।

একটা টর্চ লইয়া বলরাম বাহিরে আসিলেন। রাধানাথ নাক ডাকাইতেছে—চট্ চটে ব্যাঙের ডাকের মতো বিশ্রী একঘেয়ে আওয়াজ। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, তাহারি আলোয় বলরামের নিজের ছায়াটা যেন প্রেতমূর্তির মতো অতিশয় দীর্ঘ হইয়া বারান্দার উপর ছড়াইয়া পড়িল। নিজের ছায়া দেখিয়া তাঁহার নিজেরই ভয় করিতেছে যেন। প্যাঁচাটা ক্রমাগত সাশাইয়া চলিয়াছে—নিম্-নিম্-নিম্।

বলরাম মুক্তোর ঘরের খিল্ খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্তোর ঘুম আজকাল যেন আগের চাইতে ঢের বেশি বাড়িয়া গেছে। সেদিনের মতো বলরাম আজো আসিয়া আবার তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন।

…মুক্তো উঠিয়া বসিল, এক ধাক্কায় বলরামকে ঠেলিয়া তিন চার হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর পশুর মতো একটা আর্তনাদ করিয়াই টলিতে টলিতে ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। যেন পালাইতে চায়—পালাইয়া রক্ষা করিতে চায় নিজেকে। সজোরে এবং সশব্দে কবাটটাকে খুলিয়া মুক্তো অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল।

আর পরক্ষণেই পতনের শব্দ আর সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চীৎ-কার ভাসিয়া আসিয়া যেন বলরামের কাণের মধ্যে বিঁধিয়া গেল।

নিজের মূঢ়তাটাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলরাম তড়িৎ বেগে বাহিরে আসিলেন। বেশি দূর আসিতে হইল না—পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় দেখা গেল একেবারে দাওয়ার সম্মুখেই কী একটা শুভ্র বস্তু মাটিতে পড়িয়া আছে।

বলরাম টর্চ জ্বালিলেন। মাটিতে পড়িয়া আছে মুক্তো। সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া সামলাইতে পারে নাই—পা ফস্‌কাইয়া আছড়াইয়া পড়িয়াছে। টর্চের আলোয় বলরাম দেখিলেন বড় বড় ক্লান্ত নিশ্বাসে তাহার উবুড় হইয়া থুবড়াইয়া পড়া দেহটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আর গল্ গল্ করিয়া নামিয়া আসা কাঁচা রক্তে যেন স্নান করিতেছে সে।

এত করিয়াও মুক্তো তাহার সন্তানকে রাখিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

১৬ই জুন বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানব দেশহিতে নিবেদিত প্রাণ সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার বর্ত্তমান বৎসরে ঐ দিনেই



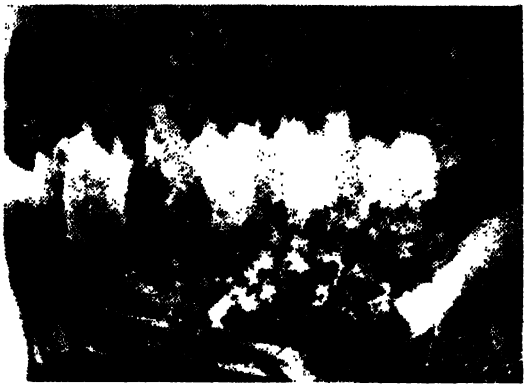
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র —ফটো : পান্না সেন

বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ত্যাগী, কর্ম্মী, ঋষি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটের সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের যে গৃহে গত ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল বাস করিতেছিলেন,



অন্তিম-শয়নে আচার্য্যদেব —ফটো : তারক দাস (পত্রিকা)

সেই গৃহেই তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই আর দেড় মাস মাত্র পরে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর পূর্ণ হইত। প্রায় ৬০ বৎসর ব্যাপী তাঁহার কর্ম্ম জীবনের কথা তাঁহার দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। গত ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আচার্য্যদেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় হইতে



পুষ্পাচ্ছাদিত শব—পার্শ্বে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ
—ফটো : তারক দাস (পত্রিকা)

তিনি প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কার্য্যক্রমের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা হইলে আচার্য্যদেব টাউনশ্রীপুরে তাঁহার ভক্ত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সর্দ্দার মহাশয়ের গৃহে যাইয়া বাস করেন। এই সময়ে বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছিলেন; কাহারও সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে শ্রীপুরে যাইয়া



'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয়ের সম্মুখে শোক-যাত্রা —ফটো : পান্না সেন

৩ মাস কাল তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। অরবিন্দবাবু তাঁহার গৃহ উদয়াচলে ঐ সময়ে আচার্য্যদেবের বাসের জন্য একটি

স্বতন্ত্র ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রত্যহ বহুলোক কলিকাতা হইতে শ্রীপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; আচার্য্যদেব সকলের আহার বাসস্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থায় মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় কিছুকালের জন্ত ছাদে কাটাইতেন।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেট হাউসের সম্মুখে শোক যাত্রার একটী দৃশ্য
—ফটো : তারক দাস (পত্রিকা)

১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্ত অস্থির হন। সে সময়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্ত বসিরহাট লাইনের ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল; সে জন্ত আচার্য্যদেবকে নৌকাযোগে নদীপথে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া এক মাস কাল তিনি আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স ভবনে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ও তাঁহার পত্নীর অতিথি হইয়া বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়েও তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় মোটরে করিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন, কিন্তু মোটর হইতে নীচে নামিতে পারিতেন না। শরীরের নানারূপ গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় তিনি একস্থানে অধিক দিন থাকিতে ভালবাসিতেন না, সে জন্ত তাঁহাকে পুনরায় বিজ্ঞান কলেজে আসিতে হয়। কিন্তু ৫।৭ দিন পরেই তাঁহার দেশের বাড়ীতে যাইবার জন্ত আগ্রহ দেখা যায় ও শ্রীপুর হইয়া নৌকাযোগে তিনি রাড়ুলী গমন করেন। ঐ সময়ে তথায় তাঁহার এক জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল—১৯৪৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তথায় উৎসব হয় ও কলিকাতা হইতে বহুলোক সেই উৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন। ইজিচেয়ারে করিয়া তাঁহাকে জয়ন্তী সভায় আনা হইয়াছিল—ইহার পর তিনি আর কোন সাধারণ সভায় তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। কয়েকদিন দেশের বাটীতে বাস করিয়া তিনি পুনরায় শ্রীপুরে গমন করেন ও তথায় দুই মাস বাস করিবার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি প্রায় এক বৎসর কাল তিনি বিজ্ঞান কলেজের গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল তিনি সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, স্পষ্ট করিয়া কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। এমন কি সকল সময়ে নিজে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেও পারিতেন না।

গত ২১শে মে তিনি সহসা জ্বরে আক্রান্ত হন। কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর আবার কয়দিন একটু ভাল ছিলেন। পুনরায় ৮ই জুন তাঁহার জ্বর হয় এবং চিকিৎসকগণ নিউমোনিয়া বলিয়া প্রচার করেন। শেষের কয়েকদিন প্রত্যহ সংবাদপত্রে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বুলেটিন প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বোম্বাই হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। শুক্রবার সকাল হইতেই তাঁহার অবস্থা খারাপ হয়; বিধানচন্দ্র বিকাল ৪টার সময় তাঁহাকে শেষবারের জন্ত দেখিয়া যান। ৬টার সময় সকলকে সংবাদ দেওয়া হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভা হইতে ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু তাঁহার সম্মুখে প্রার্থনা আরম্ভ করেন। প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হয়। ঐ দিন ঐ সময়ে মৌলবী এ, কে, ফজলল হকের সভাপতিত্বে



আচার্য্যদেবের চিতা-শয্যার পার্শ্বে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রার্থনা জানাইতেছেন —ফটো : তারক দাস (পত্রিকা)

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে দেশবন্ধুর স্মৃতি-সভা হইতেছিল। সভায় এই সংবাদ পৌঁছিলে সকল লোক বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার শেষ দর্শনের জন্ত গমন করেন। পরদিন

শনিবার সকালে তাঁহার শবের শোভাযাত্রা কলিকাতার বহু রাজপথ ঘোরাইয়া নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করে ও তথায় তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়।

খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে রাড়ুলী গ্রামে এক



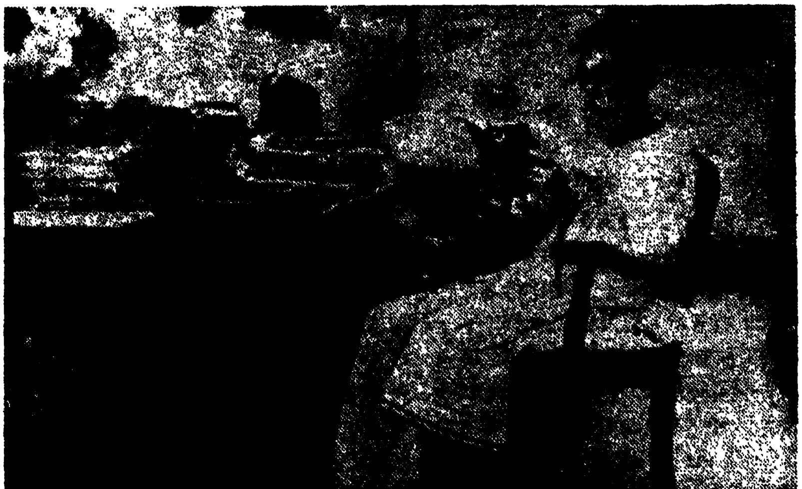
চিতা-শয্যায় আচার্য্যদেব　　—ফটো : পান্না সেন

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্ম হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় ইংরাজী, পার্শী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার সম্বন্ধে আচার্য্য রায় তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ, হিন্দু পত্রিকা, অমৃত-বাজার পত্রিকা, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অমৃত প্রবাহিনী ও সোমপ্রকাশের তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। কেরীকৃত হোলী বাইবেলের অনুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা ও রাজাবলী, এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস তাঁহার লাইব্রেরীতে ছিল। আমার পিতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত ভাল বাসিতেন এবং ওস্তাদের মত বেহালা বাজাইতে পারিতেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার বৈঠকখানায় সঙ্গীতের জলসা বসিত ও পরবর্ত্তী জীবনে তিনি স্বভাবতই মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নব্য বাঙ্গালার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিজের জেলায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। রাড়ুলীতে বলিতে গেলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। * * * বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা নব্য বাঙ্গালার মন অধিকার করিয়াছিল এবং আমার পিতা এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ কার্য্যতঃ প্রমাণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের স্কুলে মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। টোলে পড়া শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি তাঁহার পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সহজেই বিধবা-বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

এই ধর্মবিরুদ্ধ বিবাহের কথা দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল......আমার পিতামহের শ্রাদ্ধে পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুলোক ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করিল; কেন না, আমার পিতা তাঁহাদের মতে "ম্লেচ্ছ" হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কথাও প্রচারিত হইল যে, জনৈক প্রতিবাসীর হারাণো বাছুরটিকে হত্যা করিয়া নাকি চপ, কাটলেট ইত্যাদি সুখাদ্য রন্ধনপূর্ব্বক টেবিলে পরিবেষণ করা হইয়াছে।"

পিতার সঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধ সরল সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। সাধারণতঃ পুত্র যেরূপ পিতাকে ভয় করিয়া চলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার পিতার সঙ্গে সেরূপ ছিল না। এবিষয়ে তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলিয়া আমরা অনেক বেশী শিখিতাম। তাঁহার নিকটে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে ও গল্পাদি করিতে তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিতেন।

১৮৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা সপরিবারে



পাঠ-রত আচার্য্যদেব　　—ফটো : তারক দাস

কলিকাতায় আসিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়।

ইহার চারি বৎসর পরে ১৮৭৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্র কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই পীড়ার দরুণ তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিদ্যালয় ছাড়িয়া বাড়ীতে পড়াশুনা করিতে হয়। স্বাস্থ্য তাঁহার কোনদিনই তেমন ভাল নয়, তবে সেই পীড়ার পর হইতেই তিনি অত্যন্ত সাবধান হন এবং নিয়মিত পানাহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। একান্তভাবে এই নিয়ম পালন করিয়া আসার ফলেই খারাপ স্বাস্থ্য লইয়াও জীবনে তিনি অনেক বড় কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৮৭৫ সাল হইতে তাঁহার অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগ দেখা দেয়। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইবার পর প্রফুল্লচন্দ্র এ্যালবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং সেখানে তিনি ব্রাহ্ম শিক্ষকদের প্রভাবে পড়িলেন। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে যাঁহারা আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের নামই তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই সংস্রবে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৭৯ সালে মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্ত্তি হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেই কলেজের অধ্যাপক। সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রবণের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়াই নাকি প্রফুল্লচন্দ্র উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হন। কেবল সুরেন্দ্রনাথের নয়, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনাও নাকি তাঁহার একটা নেশার মধ্যেই হইয়াছিল।

মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যয়নকালে বিজ্ঞানচর্চার সুবিধার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শ্রেণীতেও যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি বাহিরের ছাত্র হিসাবে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পান। ১৮৮২ সালে তাঁহার কলেজের পড়া শেষ হয়। ঐ বৎসরই তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে কঠোর সাধনার ফলে ১৮৮৭ সালে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করেন।

স্কুলে থাকিতে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও কলেজে অধ্যয়নকালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্লাসে experiment দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি এবং তাঁহার একজন সহপাঠী বাড়ীতে একটি ছোটখাটো লেবরেটরী স্থাপন করিয়া সেখানে কোন কোন experiment করিতে থাকেন। একবার তাঁহারা সাধারণ টিনের পাত দিয়া একটি অক্সি-হাইড্রোজেন ব্লো-পাইপ তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন উহা ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে কেহই আহত হন নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভের ইতিহাস কৌতূহলপূর্ণ। তিনি সকলের অজ্ঞাতে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। আত্মজীবনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন,—"এই পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অনুরূপ ছিল এবং ইহাতে পাশ করিতে হইলে ল্যাটিন, গ্রীক অথবা সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষা জানা অপরিহার্য্য ছিল। আমি গোপনে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং গ্রাম সম্পর্কীয় জ্যেঠতুতো ভাই ভিন্ন আর কেহ এই সংবাদ জানিতেন না। আমি বিশেষভাবে এই সংবাদ গোপন রাখিয়াছিলাম। কেননা পরীক্ষায় ব্যর্থ হইলে সহধ্যায়ীদের শ্লেষ ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং আমার একজন সহপাঠী (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন) বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, আমার নাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের বিশেষ সংস্করণে বাহির হইবে। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের বিশেষ আশা আমি করি নাই এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইতে কয়েকমাস অতীত হইল দেখিয়া আমি সকল আশা ত্যাগ করিলাম। একদিন কলেজে পড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ষ্টেটস্ম্যানের একটি প্যারাগ্রাফের প্রতি একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উহাতে সংবাদ ছিল "গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষায় দুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছে।" বাহাদুরজী নামক জনৈক পার্শী এবং আমি। প্রিন্সিপ্যাল একটু পরেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া আমাকে অভিনন্দিত করিলেন।

বিলাতে অবস্থানকালে প্রফুল্লচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়াই সকল সময় অতিবাহিত করিতেন এমন নয়, জগদ্বাসীর নিকট ভারতের মর্য্যাদা কিসে বাড়ে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। ইতিহাসে তাঁহার চিরদিনই অনুরাগ। সেই সময় তিনি "সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের অবস্থা" নামে একখানি পুস্তক লিখেন। বিলাতের বহু রাজনীতিবিদ্ তাঁহার সেই পুস্তক পড়িয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস্-সি পড়ার সময় তিনি "ভারত ও বৃটিশ শাসন" নামে একখানি পুস্তিকাও লিখেন। এই পুস্তিকা লিখিয়া তিনি বিশেষ যশ অর্জন করেন।

এডিনবরায় জেমস্ ওয়াকার, আলেকজাণ্ডার স্মিথ প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন।

বিলাতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ১৮৮৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৮৮৯ সালের জুন মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগে মাসিক দুই শত পঞ্চাশ টাকা বেতনে অস্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। স্বীয় কৃতিত্বে তিনি উক্ত কলেজে রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকপদ লাভ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র নানাভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। মারকিউরাস্ নাইট্রাইট (Mercurous Nitrite) সম্বন্ধে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে বিস্ময়োৎপাদন করেন। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

প্রফুল্লচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এক বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠি সৃষ্টির জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠি সৃষ্টি করিলেন। এই গোষ্ঠির অনেকেই আজ দেশ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

কি সমাজ-সেবায়, কি দেশ-সেবায় প্রফুল্লচন্দ্র সর্ব্বত্রই নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আত্মভোলা

মানুষটীর মধ্যে উচ্চ ও নীচের যেমন ভেদাভেদ ছিল না তেমনি তাঁহার কোন বিষয়েই অভিমানও ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্রের স্থায় সহজ সরল মানুষ, বর্ত্তমানকালে শুধু বিরল নয়—দুর্ল্লভ।

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবেই দেশ, জাতি ও সমাজের কাছে পূজ্য হয়ে থাকবেন তা নয়, তাঁহার দান দেশের মাটীর সহিত নিবিড়তমভাবে জড়াইয়া রহিবে। দেশের বহু নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁহার প্রেরণায় যেমন জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি পুষ্টি, শুদ্ধি ও বৃদ্ধির পথে তিনিই তাহাকে চালিত করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল শুধু বাঙ্‌লা ও বাঙালীর কাছেই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান নয়—ইহা সমগ্র ভারতেরই গৌরব ঘোষণা করিতেছে। প্রফুল্লচন্দ্র পরিণত বয়সে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু স্বার্থপর আমরা একথা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না যে আচার্য্যদেবের তিরোধান, আমাদের পক্ষে নিদারুণ অভিশাপ!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যে শোকের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি তাঁহার বিজ্ঞানসেবা, জনসেবা ও দেশভক্তির গুণে বাঙালীর হৃদয়ে এমন একখানি গৌরবের আসন পাতিয়াছিলেন যাহার তুলনা বিরল। বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আকস্মিক নহে। আমরা ছাত্রজীবন হইতে তাঁহার পৃথিবীব্যাপী যশোভাতির কথা শুনিয়া আসিতেছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রো (F. J. Rowe) সাহেবের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি আমাদের ক্লাসে আসিয়া প্রায়ই বলিতেন যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জগদীশচন্দ্র এবং তাঁহার পরেই প্রফুল্লচন্দ্র। তৃতীয় স্থান বিদ্রূপের সহিত তিনি বাগ্মিবর সুরেন্দ্রনাথকে প্রদান করিতেন। জগদীশচন্দ্র জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন বিজ্ঞানের সাধনায়। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিক জনসেবা বা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের স্থায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ছাত্রজীবনে রসায়ন শাস্ত্রের উপদেশের সঙ্গে তিনি ছাত্রদের মনে যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও দেশভক্তি জাগাইয়া তুলিতেন, তাহা তাঁহার অনেক ছাত্রই বলিতে পারিবেন। বিজ্ঞানের যন্ত্রগৃহ তাঁহার আত্মাকে একান্তভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই—এখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রেরই মত বিজ্ঞানকক্ষে নিরালা হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। কখনও কোনও সভা সমিতিতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তিনি পারতপক্ষে তাহা এড়াইয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে দেশসেবার যে দুর্দমনীয় স্পৃহা ছিল বিজ্ঞানের যাদুযন্ত্র তাহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার বিজ্ঞানসেবার সঙ্গে যে স্বাদেশিকতার সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে' পাওয়া যায়। তিনি রসায়নতত্ত্ব ভাল বাসিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় এই ভালবাসা অপেক্ষা তাঁহার আত্মমর্যাদা জ্ঞান ছিল অতি প্রখর। তিনি কোনও ক্ষেত্রেই আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মধ্যে যে তেজ দেখিয়াছি, যে সুতীব্র অনুভূতির পরিচয় পাইয়াছি তাহা বাঙালীজাতির একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের নানা প্রতিষ্ঠানের নেতারূপে তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি যে অমায়িকতা ও সৌজন্যের অবতার, কোমলস্বভাব প্রফুল্লচন্দ্র সত্যনিষ্ঠায় অমিততেজা ছিলেন। তিনি যখন রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার একজন সঙ্গী ছিলাম। এই সম্মেলনে দলাদলি প্রসঙ্গে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।



সিটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনা সভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র — রবীন্দ্র মুখার্জ্জির সৌজন্যে

আজীবন ব্রহ্মচারী, সংসারে অনাসক্ত এই মহাপুরুষ কর্মজীবনে

যে নিরলস সেবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। নিজের জন্ম ভাবনাশূন্ত এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কিরূপে পরের ভাবনার বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আমরা আশ্চর্য হইয়া যাইতাম। বন্যাপীড়িতের জন্ত, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টের জন্ত, আর্ত্তের জন্ত তাঁহার আর্তির অন্ত ছিল না। লোকের দুঃখকষ্ট-মোচনের জন্ত তাঁহার যে ব্যাকুলতা, তাহা তাঁহার বিপুল দানে এবং বিপুলতর সহানুভূতিতেই পরিসমাপ্ত ছিল না। বাঙালীজাতির দুঃখকষ্ট অন্নাভাব কিসে দূর হয়, এই চিন্তা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া ছিল। বাঙালী যুবকদিগকে সচেতন করিতে, সতর্ক করিতে, প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। নিজেদের দেশের ধন যদি অপরে লুটিয়া লইয়া যায়, আমাদের স্বল্পবিত্ত যদি আমরা স্বেচ্ছায় বিদেশে ছড়াইয়া দি, তবে আমাদের লোকেরা দুমুঠো খাইতে পারিবে কি করিয়া? আমরা শুধু আইনজ্ঞ হইয়া নিরন্নের সংখ্যা বাড়াইতেছি, কেরাণীগিরি বা শিক্ষকতা করিয়া দিন চালাইতে অক্ষম হইতেছি আর অন্ত প্রদেশ হইতে চতুর ব্যবসায়ীরা আসিয়া লক্ষপতি হইয়া দেশে ফিরিতেছে—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য কি হইতে পারে? আচার্যদেব মর্মে মর্মে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী যাহাতে ইহার প্রতিরোধের জন্ত বদ্ধপরিকর হয় সেজন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেশের অর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্ত এরূপ উৎকণ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে বেশি ছিলেন না; 'বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' পুস্তক লিখিয়া এবং বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে তিনি এই কথাই তাঁহার দেশবাসীর নিকট অমোঘবাণীতে শুনাইয়া গিয়াছেন। আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের বাণী যেমন কালের অস্পষ্ট সোপানরাজি বাহিয়া চলিয়া আসিয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্রের বাণীও তেমনি বহুকাল ধরিয়া বাঙালীর মানসকে প্রভাবিত করিবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। তিনি আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন,—যে শিক্ষা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হই—যে শিক্ষাদানে তাঁহার নিজেরও একটি প্রকাণ্ড অংশ ছিল—সে শিক্ষাকে তিনি অসন্দিগ্ধ ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে শিক্ষা স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয় না, যে শিক্ষায় জনসাধারণের অন্নকষ্ট ঘুচে না, যে শিক্ষায় পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙালী টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্রের বিচারে সে শিক্ষার কোনই মূল্য ছিল না।

তিনি শুধু আমাদের কেরাণীগিরির তথমাধারী যুবকদের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্ত প্রকাণ্ড ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে বাঙালীর মস্তিষ্ক শ্রমিক শিল্পের সাধনায়ও অপটু নহে। প্রফুল্লচন্দ্রের জনসেবার মূলে যে ব্যাপক দৃষ্টি ছিল, তাহার সঙ্গে এক তীব্র ব্যাকুলতার মিশ্রণ হইয়া অপূর্ব সার্থকতায় পরিণত হইয়াছিল। দেশের যুবকদের সম্বন্ধে এরূপ নিবিষ্টভাবে অপর কেহ চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। তিনি আজীবন দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যে সকল ছাত্র তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করেন নাই, তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহচ্ছায়ালাভ ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাকে এরূপ দুঃখ করিতে শুনিয়াছি। তিনি যে দেশের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল এই আদর্শবাদ। তিনি একজন সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী হইলেও তিনি রাষ্ট্রনেতার গৌরবময় আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এই জন্ত যে, তিনি দেশের জন্ত চিন্তা করিতেন, দেশের দুঃখ-মোচনের জন্ত সর্বস্বপণ করিতেন এবং তিনি যে অমূল্য উপদেশ দিতেন হাতে কলমে তাহার সার্থকতা দেখাইয়া দেশবাসীর প্রকৃত শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর-নীতি তিনি বিশেষ বিচার করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একবার যখন তিনি ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন হইতে অসামান্ত অধ্যবসায়ের সহিত ইহার প্রচারকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে এক বৎসরের কিঞ্চিদূর্দ্ধ কালের মধ্যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে ত্রিশ হাজার মাইল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এই প্রচারকার্যের জন্ত! রাষ্ট্রনেতা হইতে হইলে এইরূপ নীরবকর্মীর প্রয়োজনই এখন বেশি। বক্তৃতার দিন চলিয়া গিয়াছে; কাজ করিবার এই একান্ত প্রয়োজনের সময় প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় এক মহান আদর্শ লাভ করিয়া বঙ্গদেশ ধন্ত হইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের অবসর বিনোদন ছিল সাহিত্য-চর্চ্চায়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইলেও সাহিত্য চর্চায় তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। শেকসপীয়র সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ পত্রে তাঁহার ধারাবাহিক চিন্তাশীল প্রবন্ধ দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের সহিত উপাধি সংশ্লিষ্ট না থাকিলে কেহ কেহ হয়ত তাঁহাকে অন্ত লোক বলিয়া সন্দেহ করিত। এমনই নিপুণভাবে তিনি সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ মানব হইতে হইলে যে সকল গুণের সমবায় থাকা আবশ্যক এবং যাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সিনেট সভায় এবং অন্তত্র তিনি যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার মধ্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিত এবং শ্রোতা অনেক সময় ভুলিয়া যাইত যে প্রফুল্লচন্দ্র একনিষ্ঠ রসায়নবিৎ অথবা প্রবীণ সাহিত্যিক। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁহার বক্তৃতা ও রচনা অপূর্ব রসশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিত। স্মরণ রাখিতে হইবে তিনি প্রথমে যখন গিলক্রিষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাতে গমন করেন, তখন তাঁহার পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যই ছিল প্রধান। জীবনের প্রথমে কবিতা নাটক প্রভৃতি তাঁহার মনে যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল প্রফুল্লচন্দ্র কখনও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর তীরে তাঁহার জন্মগ্রহণ করা যে ব্যর্থ হয় নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে।

বাঙালী আজ তাঁহার দিব্যমূর্ত্তির পাদপীঠতলে সমবেত হইয়া যদি তাঁহার বাণী মূলমন্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলেই এ জাতির উপকার হইবে। তিনি জীবনে নিন্দা বা প্রশংসার জন্ত কখনও লোভ করেন নাই। মর্মর মূর্ত্তি রচনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলে তাঁহার পূজা সার্থক হইবে না। তাঁহার পূজা সার্থক হইবে অন্নহীনকে অন্ন দিলে, দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ দিলে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি পুষ্পচন্দন অর্পিত হইবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ

যুগে যুগে এক একজন মানব জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা পথপ্রদর্শক, যাঁহারা যুগপ্রবর্তক, যাঁহারা স্রষ্টা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মে এদেশে এইরূপ একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষেই প্রথম বিজ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত হয়। বহুদিন এ আলোক উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু প্রায় ষোড়শ শতাব্দীতে এ দীপ ম্লান হইতে হইতে একেবারে নিভিয়া যায়। দীর্ঘকাল ঘনান্ধকারের পর গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আবার উষার রঙিন আলোক দেখা দিল। রসায়ন-বিদ্যায় আলো জ্বালিলেন—প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যাপনা করিয়া তিনি তাঁহার কর্তব্য শেষ করিলেন না, মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রহিলেন। মৌলিক গবেষণা করিতে হইলে যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে তখন তাহা ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু বাধা যত বেশি পাইতে লাগিলেন তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি ততই জাগরূক হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই এক নূতন রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হইল। এই পদার্থ হইল 'মার্কিউরস্ নাইট্রাইট'। অবিলম্বে পাশ্চাত্যদেশের বিজ্ঞানিগণ তাঁহার এই নব আবিষ্কারকে বরণ করিয়া লইলেন। এই নূতন দ্রব্য হইতে উদ্ভূত আরও বহু পদার্থ একে একে সৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং সাধারণ ভাবে 'নাইট্রাইট' সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার শতাধিক মৌলিক রচনা বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকাকে অলংকৃত করিল। তদানীন্তন সময়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক তিনি 'মাষ্টার অফ্ নাইট্রাইটস্' নামে অভিহিত হইলেন।

প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের জন্মভূমি এবং বহুদিন ধরিয়া যখন বিজ্ঞানের আলোক পৃথিবীর আর কোন স্থানে পৌঁছায় নাই তখন এই ভারতবর্ষ বিজ্ঞান অনুশীলনে সম্যক উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, এই কথা জনসাধারণের সহিত আচার্যদেবও শুনিয়া আসিয়াছিলেন। রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে এ উক্তি কতটা বিচারসহ এই সময় তাহা তিনি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিলেন। অথর্ববেদ, আয়ুর্বেদ এবং তন্ত্র তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লাইব্রেরি, ভাণ্ডারকরের লাইব্রেরি, কাশীর লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরিতে এ সম্বন্ধীয় বিবিধ পুস্তকে যত কথা ছিল তিনি আলোচনা করিলেন, বিচার করিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রণীত 'হিন্দু রসায়নবিদ্যার ইতিহাস' প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক প্রকাশের পর দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীর নিকট ইহা একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়।

বিজ্ঞানচর্চায় একজনের দানে জ্ঞানের ভাণ্ডার সম্যক পুষ্টিলাভ করে না, দেশ বড় হয় না একথা প্রফুল্লচন্দ্র উপলব্ধি করিতেন, তাই তিনি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীকে মৌলিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ একসময় বলিয়াছিলেন—

"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে।

"উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি



শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—ছাত্রগণের বার্ষিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রদর্শনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র —রবীন্দ্র মুখার্জির সৌজন্যে

বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এইযে আত্মদানমূলক শক্তি—এ দৈবীশক্তি।

"আচার্য নিজের জয় কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।"

একজন মনীষী বলিয়া গিয়াছেন যে কোনো দেশে রাজনীতিজ্ঞরা মিলিত হইয়া দেশের যতনা কল্যাণ সাধিত করিতে পারেন তদপেক্ষা অনেক বেশি উপকার করেন সেই বিজ্ঞানী যিনি যে-স্থানে একটি শস্যকণা জন্মাইত তথায় দুইটি শস্যকণা উদ্ভবের

উপায় বলিয়া দেন। রসায়নবিভার শুধু তথ্যের দিকটা আলোচনা করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র থামিলেন না, বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া নিরন্ন দেশবাসীর অন্নসংস্থানে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। সেদিন যে বীজ উপ্ত হইল, তাহা তাঁহার পরিকল্পনায়, তাঁহার উদ্যমে, তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে যে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে তাহা আজকের দিনে যাঁহারা একবার বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার সাক্ষ্য দিবেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নিদ্রিত দেশকে এইযে তিনি ধাক্কা দিলেন তাহাতে দেশের নবজাগরণ হইল। এবিষয়েও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নবীন ভারতের একজন পথপ্রদর্শক।

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাংলা ভাষায় তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে বাংলায় একখানি পুস্তক লিখেন। এইসব রচনায় বাংলা পরিভাষার জন্য প্রতিপদে যখন বাধা পাইতে লাগিলেন, তখন পরিভাষা প্রণয়ন আরম্ভ করিলেন। এবিষয়েও তাঁহার দান অতুলনীয়।

কিন্তু বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র, শিক্ষাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র, সাহিত্যিক প্রফুল্লচন্দ্র, শিল্পপ্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁহার সংস্পর্শে আসা, তাঁহার পদদেশে বসিয়া শিক্ষালাভ করাকে তাঁহার প্রতিছাত্র তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তাঁহার ক্লাসে প্রথমদিন প্রবেশ করিলাম। বেয়ারা ছাত্রদের হাজিরা-খাতা দিয়া গেল। বেয়ারার গায়ে সাদাকাল খোপ কাটা একটি সুতির কোট। ৪৩ বৎসর পূর্বের কথা, কিন্তু সেদিন ঐ বেয়ারার গায়ে কি রকমের কোট ছিল বেশ মনে আছে, মনে থাকিবার কারণ এই, বেয়ারা হাজিরা-খাতা আনিবার পরই আচার্যদেব প্রবেশ করিলেন এবং বেয়ারার গায়ে যেরূপ কোট তাঁহার গায়ে হুবহু সেইরকমের কোট দেখা গেল; বেয়ারার গায়ের কোটটি একটু ঝকঝকে তকতকে, আচার্যদেবের গায়ের কোটটি অপেক্ষাকৃত মলিন। কৌতূহল হইল; পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে তিনি দুইটা নূতন কোট তৈয়ারি করান, একটি নিজে পরেন অপরটি বেয়ারাকে দেন; বেয়ারা সেটি সযত্নে রাখায় তারটা একটু বেশি উজ্জ্বল। মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র সেদিন আমার চক্ষে প্রথম উদ্ভাসিত হইলেন। এবং সেটা কোন সময়, যখন পাশ্চাত্য দেশের 'ডক্টর' উপাধি কয়েকজন মাত্র ভারতবাসী পাইয়াছেন এবং বিলাত ফেরতরা নিজদিগকে সাধারণের অনেক উর্দ্ধে এক বিশিষ্ট জীব বলিয়া মনে করেন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল্ গড়িয়া তুলিতে আচার্যদেব দিলেন তাঁহার পরিকল্পনা, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার অধ্যবসায় এবং তাঁহার অর্থ; সমস্ত এশিয়ার মধ্যে ইহা এক বিরাট প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু ডিভিডেণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন তিনি নন, অপরে।

তিনি মোট মাহিনা পাইতেন, কিন্তু অল্প কয়েকটি টাকা নিজের জন্য রাখিয়া বাকি সমস্ত দান করিতেন। বিশেষভাবে তাঁহার এই দানের পাত্র ছিল ছাত্রমণ্ডলী।

ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার কোনো লক্ষ্যই ছিল না। একদিন আমার এক বন্ধু এবং আমি কি একটা কাজে বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তখন দারুণ গ্রীষ্ম। বাহিরে আসিয়া বন্ধুবর আমাকে বলেন—উঁহার ঘরে পাখা নাই, আমি কি একখানা পাখা আনাইয়া দিব। আমি ফিরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; উত্তর দিলেন—না, না, দরকার নেই, দক্ষিণ দিক থেকে তো বেশ হাওয়া আসে।

উত্তর বঙ্গে জলপ্লাবন হইল। বিজ্ঞানী কিছু দিনের জন্য তাঁহার টেষ্টটিউব সরাইয়া রাখিলেন। আর্তের দুঃখহরণে তিনি দেশবাসীকে ডাক দিলেন; তাঁহার পদতলে সকলে সমবেত হইল। দেশকে এমন ভাবে সাড়া দিতে আর কখন দেখা যায় নই। কুলিরা মোট তুলিয়া পয়সা লইল না, বলিল আমরা নগদ তো কিছু দিতে পারিলাম না। এইরূপই হইবার কথা। এই ডাক ছিল নিরাসক্ত ত্যাগী, আর্তবন্ধুর আহ্বান।

নিঃস্ব বলিয়া তাঁহার কোন গৃহ ছিল না, একখানি ঘরও ছিল না; তিনি ছিলেন সকলের, সকলের ঘরই তাঁহার ঘর, সকল মানবই তাঁহার আত্মীয়।

তিনি বলিয়া গিয়াছেন তিনি আবার আসিবেন, বারে বারে আসিবেন, যতদিন না দেশের সর্ববিধ অকল্যাণ বিদূরিত হয়।

তিনি মৃত্যুঞ্জয়, তিনি অমর!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কীর্ত্তির শিখরোপরি আলো করে চন্দ্রচূড় ছিলে দশ দিশি
প্রাণের পরশ দিয়া টেনেছিলে বক্ষে তব যারা ছিল হেয়;
তোমার অমৃতবাণী ভাগ্যবিড়ম্বিত এই জাতির পাথেয়
বিশ্বের বন্দিত তুমি সিদ্ধজ্ঞানী নাগার্জ্জুন! রাষ্ট্র গুরু ঋষি!
হলাহল পান করি প্রতিদানে দিলে নিত্য সুধারসায়ন,
মৃত্যুর অতীত হয়ে মৃত্তিকারে দিয়ে গেলে জীবনের গান।

জ্যোতির অক্ষরে লেখা মানবের ইতিহাসে তব আত্মদান,
দধিচীর সম তুমি অস্থি দিয়া করে গেছ বজ্রের সৃজন।
প্রতিভার যজ্ঞশালা রুদ্ধ হোলো এদুর্দ্দিনে তব তিরোভাব,
মহত্বের বেদী হতে অন্তর্হিত হৃদয়ের আত্মাহুতী আজ।
গাঢ় ঘন অন্ধকারে চন্দ্রহারা রজনীর বক্ষে পড়ে বাজ,
মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের বিহঙ্গবলাকা শ্রেণী মৌনী মনস্তাপে।

মোরা কাঁদি এই পারে অন্ধ আঁখি মায়ার বিভ্রমে,
শাশ্বতকালের যাত্রী চলেছ কি আনন্দ সঙ্গমে!

স্মৃতিপূজা

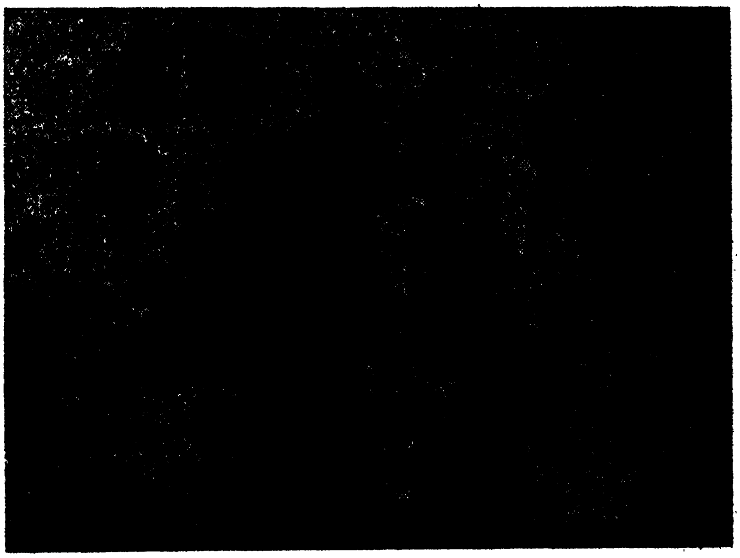
অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি বা শান্তি কামনায় আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করাকেই বলা হয় শ্রাদ্ধ। মৃত্যুর পর মানবাত্মার গতি কি হয় সে সম্বন্ধে কোন অকাট্য সাক্ষী প্রমাণ জীবনের ওপার হ'তে পাওয়া যায় নি; এবং জীবিতেরা শ্রাদ্ধ তর্পণ করলে মৃতের কোন মঙ্গল হয় কিনা তাও জানি না। পণ্ডিত ও শাস্ত্রকারেরা এ নিয়ে তুমুল তর্ক ও কোলাহল করে থাকেন। তবে প্রফুল্লচন্দ্রের মত মহান্ আত্মার কোন উন্নতি বা তৃপ্তি হ'তে পারে আমাদের মত ক্ষীণাত্মার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে, এরূপ মনে করে ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে চাই নে। কেননা, তাঁর প্রাণ ছিল উদার এবং মন ছিল সহজ ও সরল; আর আমাদের প্রাণ হচ্ছে কত ক্ষুদ্র এবং মন কত কঠিন ও কুটিল। তাই আশঙ্কা হয় তাঁর স্মৃতিপূজার উপলক্ষ্য করে আমরা হয়ত শুধু আমাদের আত্মগৌরবের বিজ্ঞাপন জাহির করে বাঙ্গালী জাতির পাপের বোঝা আরো বাড়িয়ে তুলব। তথাপি এতে যে আমাদের আত্মোন্নতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের গুণগ্রাম এবং কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা ও স্মরণ করে, তাঁর বরেণ্য স্মৃতির উপাসনা করে আমরা আমাদের মলিন চিত্তকে কথঞ্চিৎ নির্ম্মল এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিবিধ কলঙ্ককে ক্রমশঃ অপনোদন করতে যে সমর্থ হব, এরূপ ভরসা করা অসঙ্গত নয়। আপন ক্ষুদ্রতার দরুণ তাঁর গুণকীর্ত্তনের যোগ্য অধিকারী না হ'লেও এ কারণেই আমাদের পক্ষে তাঁর স্মৃতি তর্পণের সার্থকতা রয়েছে; এই উদ্দেশ্যেই এ ক্ষুদ্র রচনার অবতারণা।

গত যুগের যে সব মনীষী তাঁদের প্রতিভা ও কর্ম্ম বলে বাঙ্গালা দেশকে বর্ত্তমান উন্নতির পথে অগ্রসর করে দিয়েছেন, প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদের সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি। সর্ব্বশেষ হ'লেও কিন্তু তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুজ্জ্বল সে পুরাযুগের সহিত সকল সজীব সংযোগ গেল ছিন্ন হয়ে। তিনি যদিও বাঙ্গালী আমাদের হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, তথাপি তাঁর বিরাট মনুষ্যত্বকে বাঙ্গালীত্বের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে রাখলে আমাদের আত্মপ্রকাশের সুবিধা হ'তে পারে বটে, কিন্তু তাতে তাঁর মহান্ আত্মার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় না। তাঁর জ্ঞানের ও কর্ম্মের প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে করুণা ও কল্যাণের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে; কোথায় কখন কি ভাবে এরা অঙ্কুরিত হয়ে ক্ষুধা-ব্যাধি দুঃখ-দৈন্য নিপীড়িত নরনারীকে ফল ও ছায়া দানে পরিতৃপ্ত করবে তা কেউ বলতে পারে না। কারণ, মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী দেশ এবং কালের সকল সীমা যায় অতিক্রম করে!

প্রফুল্লচন্দ্রের মহত্ত্ব ছিল মুক্ত ও সর্ব্বপ্রকারে আভিজাত্য বা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জিত। এ মহত্ত্বের কোন আড়াল ছিল না, বা এর সামনে কোন পাহারা থাকত না। এ ছিল সর্ব্বসাধারণের অভিগম্য। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই অনেকের মহত্ত্ব থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, বহু ঊর্দ্ধে তুষারধবল হিমগিরির শৃঙ্গের মত দাঁড়িয়ে; সেখান হ'তে তাঁদের দীপ্তি ও প্রভা আমাদের চিত্তকে চমকিত ও মুগ্ধ করে এবং দূর হ'তে তাঁদের নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা ধন্য হই। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের মহত্ত্ব অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হ'তে প্রবাহমানা মন্দাকিনীর পুণ্যধারার মত নেমে আসত জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে—তাকে ধুয়ে নির্ম্মল এবং উর্ব্বর করতে। তাঁর মহত্ত্বকে তিনি সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে চাইতেন সবাইকে মহান্ করে তুলতে, যেমন 'ধূপ আপনাকে মিলাইতে চাহে গন্ধে।'

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ গুরু এবং গবেষক। গুরু এবং গবেষকের কাজ হচ্ছে সৃষ্টি। এ উভয় ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টি হচ্ছে অসাধারণ; কারণ, তাঁর সকল কর্ম্মের উৎস ছিল সৃষ্টির আনন্দ। তিনি যে সব গবেষণা করেছেন এবং সর্ব্বোপরি তিনি যে শিষ্য সম্প্রদায়ের গঠন করে ও নিখিল ভারত রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাতে বিজ্ঞান-জগতে ভারতের



অধ্যাপক বিনয় সরকার, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিবেষ্টিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র —ফটো: তারক দাস (পত্রিকা)

সম্মান ও আভিজাত্য গেছে অনেক বেড়ে। পুরাযুগের ঋষি-গুরুদের মত তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরলতার আদর্শ। এ সংসার-বন্ধনহীন, চিরকুমার বিজ্ঞানতপস্বীর অঙ্গভূষণ ছিল বিশুদ্ধ খদ্দর। কিন্তু কাজ কর্ম্মের পদ্ধতিতে ও সময়নিষ্ঠায় ছিলেন তিনি প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার যা কিছু শ্রেয়; গঙ্গাযমুনার পবিত্র ধারার মত তা সব তাঁর মধ্যে ছিল পাশাপাশি মিশে। প্রতীচ্যের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সংযমের সমন্বয় সাধন করেছিলেন তিনি আপন জীবনে ও কর্ম্মে। শিষ্যদের কৃতিত্ব তাঁকে এড়িয়ে যাবে—এ ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাই তাঁকে অনেক সময় বলতে শুনেছি···"সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদ্ (শিষ্যাদ্) ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।"

প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম সৃষ্টি শিল্পের ক্ষেত্রে। এর প্রধান নিদর্শন হচ্ছে বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ প্রকাণ্ড রাসায়নিক কারখানা সারাজীবন বাঙ্গালার মাটিতে থাকবে তাঁর গৌরব ও স্মৃতি-স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে।

এসব কল্যাণকর সৃষ্টির মাহাত্ম্যেই প্রফুল্লচন্দ্রের মহত্ব। কারণ, বিশ্বরহস্যের মূলেই রয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা; তাই সৃষ্টিই হয়েছে মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। যার সৃষ্টি যত বড়, মনুষ্যত্বের দুর্গম পথে তিনি হন ততই অগ্রসর।

প্রফুল্লচন্দ্রের মানবত্ব ছিল মহান্। তাঁর দান ছিল অকাতর। কত দীনদুঃখী নরনারী, কত শিষ্য, কত শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান যে তাঁর সাহায্য লাভ করেছে তার তুলনা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দান করে গেছেন রাজার মত; চরকায় সুতো-কাটা ও খাদির প্রচারকল্পে এবং দুঃস্থ বিধবা ও শিশুদের সাহায্যার্থেও তাঁর দানের পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত। জীবনে যে তিনি বেশী রকম অর্জ্জন করেছেন তা নয়; কোন ডেপুটি বা সবজজের আয়ের চেয়ে তাঁর আয় ছিল না বড় বেশী। তথাপি এত দান যে তিনি করতে পেরেছেন তার কারণ তিনি আপনার অভাবকে করেছিলেন অসাধারণভাবে সঙ্কুচিত এবং নিজকে করেছিলেন সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ ও আমোদ-প্রমোদ হ'তে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। ত্যাগেই ছিল তাঁর ভোগের আনন্দ; এবং পরার্থই ছিল তাঁর পরমার্থ। আপন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অযথা ব্যয়কে তিনি মনে করতেন দরিদ্রকে বঞ্চনা। দুর্ভিক্ষে, বন্যায় বা অন্যবিধ দৈবদুর্ব্বিপাকে যেখানেই নরনারীর আর্ত্তনাদ উঠেছে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাদের সাহায্যে সেখানে অগ্রণী। সেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, এবং সে ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন সকল কৃতিত্ব ও সকল সফলতার সহিত। তাঁর কঠোর কঙ্কালময় জীর্ণ দেহের মধ্যে যে মানুষ লুকিয়ে ছিল সে শুধু দিতে জানত, নিতে জানত না। তাই তিনি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন জনসাধারণ ও আপন শিষ্যদের মধ্যে—সেবা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সৃষ্টির প্রাক্কালে যেমন এক অদ্বিতীয় পুরুষ বহু হ'বার ইচ্ছায় এই বিশ্বজগতের মধ্যে আপনাকে বিচিত্র রূপে প্রকাশ করেছেন, একক প্রফুল্লচন্দ্রও সেরূপ আপন শিষ্যদের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে বহু হয়েছেন; আপন জ্ঞান ও প্রাণ দিয়ে তাদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রাণের সঞ্চার করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রনীতিতে তিনি ছিলেন চরমপন্থী, যদিও প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনো কর্ম্মী বা নেতারূপে যোগদান করেন নি। "বৈজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু স্বরাজপ্রচেষ্টার অপেক্ষা চল্‌বে না"—তাঁর এই বিক্রান্ত উক্তি আজ সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

সাহিত্য এবং ইতিহাসে তাঁর অবারিত দখল ছিল। মাতৃ-ভাষাকে ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী। এ সম্পর্কে তাঁর বিবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ তাঁর "আত্মজীবনে" তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌তে হ'লে, মাতৃভাষাকেই যে শিক্ষার বাহন করা আবশ্যক এ নিয়ে তিনি সারাজীবন আন্দোলন করেছিলেন। দন্তস্ফুট ও চর্ব্বণের ক্ষমতা না থাকলেও বাঙ্গালী ছাত্রকে ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়ে ঐ সব দুষ্পাচ্যের পুনরায় উদ্গীরণ করাবার যে প্রথা আমাদের স্কুল কলেজে প্রচলিত আছে, এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল তীব্র ও তিক্ত। এরূপ নীরস, নির্জীব শিক্ষার ফলে ছাত্রদের যে দেহের এবং মনের স্বাস্থ্য যায় ভেঙ্গে তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতেন। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না, সাগরসঙ্গমে স্রোতস্বতীর মত উহা গিয়েছে বহু ধারায় ছড়িয়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবিত করে।

সমাজসংস্কার ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মপ্রচেষ্টার আর একটি বিশেষ অঙ্গ। অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পর্দ্দা, জাতি-ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজীবন তিনি তাঁর বাণী ও লেখনী পরিচালনা করে গেছেন। জাতীয় কল্যাণ ও জাতিগঠনের পথে এরা যে প্রধান অন্তরায় এর প্রচার তিনি সুরু করেছিলেন কংগ্রেস আন্দোলনের (অস্পৃশ্যতা আন্দোলন) বহু আগে।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন জ্ঞানে মহান্, কর্ম্মে মহান্ এবং মানবতায় মহান্। এ মহান্ আত্মার তিরোভাবে বাঙ্গালা দেশ আজ ঘোর তিমিরে। তাঁর জীবনের ও কর্ম্মের মহান্ আদর্শ, সর্ব্বোপরি তাঁর আদর্শ চরিত্র, এ দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি নিপীড়িত বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ঘন অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকার মত আমাদিগকে সত্যের, জ্ঞানের, কল্যাণের এবং অমৃতের পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে, এ একমাত্র ভরসা। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, বিনয়ের সহিত আজ আমরা তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য প্রদান করি।

প্রফুল্ল প্রয়াণে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্‌-এ

আজি সারা বঙ্গ মাঝে
তোমার বাঁশী বাজে
বাদলে ঢেকেছে হেরি' সারা নভোতল!

বিজ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-স্বামী
আঁধারে হারাল জানি,
তোমারি বিহনে ঝরে মৌন অশ্রুজল!

বান-ব্রেখের

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

(কাল্পনিক চিত্র)

[বিজ্ঞান-কলেজের গবেষণাগারে আচার্য রায়ের যে সকল ছাত্র নিরন্তর নানাবিধ পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকিত, মাঝে মাঝে ইহাদের লইয়া তিনি মহত্তর পরীক্ষার উদ্যোগী হইতেন। তাঁহার ঐ সকল খণ্ড খণ্ড জীবনব্যাপী পরীক্ষা নানা ক্ষেত্রে ছাত্রের ভাবগ্রাহী মনে বিস্ময়কর ও গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। নিম্নে এক অর্ধ-কাল্পনিক ঘটনাপরম্পরায় সেই পরীক্ষার গুপ্তধারা পাঠকের গোচরে আনিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

বাহুল্য হইলেও বলা সমীচীন যে, এই চরিত্র-চিত্রণে কোনও জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করার আদৌ অভিপ্রায় নাই—লেখক।]

(১)

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান শিল্পকেন্দ্রতলীতে সন্ধ্যায় যখন অতিথি-সমাগম ঘটল, তখন সতীশবাবু লক্ষ্য করলেন আচার্য রায় এবার সঙ্গে যে ছাত্রটিকে এনেছেন, এটি এখানে নবাগত। সন্ধ্যার পরে বৃদ্ধের কর্মতালিকা অতি সংক্ষিপ্ত, বিশেষত অতিথিরা পথশ্রান্ত, কাজেই রাত্রে আলাপ আলোচনা সম্ভব ছিল না। কুশলাদি প্রশ্নের পর আশ্রমবাসীরা ফিরে গেলে অল্পকালের মধ্যে অতিথি-কুটির নীরব ও অন্যান্য কুটিরের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন তখনও ভোরের আলো ভাল ফোটে নি। ঐ ভোরেই কিন্তু বৃদ্ধের জলযোগ সারা হয়ে গেছে। বেলা হ'লেই লোকজন আসতে শুরু করবে—কতোজনকে আর ফেরান যায়—তার আগে যেটুকু হোক্ পড়াশুনো করে নিতে হবে। ও-বেলায় আবার কারখানা দেখতে বেরুন আছে, পরিত্রাণ নেই ; বিকেলের পড়ার সময়টুকু আজ মাটি।

পড়ার ঘরে ঢুকে বৃদ্ধ দেখে খুশী হলেন, ছেলেটি টুলে বসে' বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে ; তাহলে সকালটায় আজ হবে কিছু। পাশের কেদারায় আসন নিয়ে বললেন, 'বেশ বেশ, সকাল সকাল ঘুম ভাঙে দেখছি। আমার কাছে থাকতে গেলে ঐটি চাইই। আচ্ছা, তাহলে আরম্ভ করে দাও, কাল যতদূর হয়েছিল তার পর থেকে। খাতা নিয়েছ ? ডেট দাও আজকের, সোদপুর, বাইশ ছয়…উঃ, দেখতে দেখতে মাসটা কেটে গেল…' ছেলেটি একটু হেসে খাতার কোণে তারিখ লিখলে।

হাসিটুকু তাঁর চোখ এড়ায়নি, বললেন 'হাসছ কেন ? সময় কেটে যাচ্ছে, তাই বললুম বলে' ? আমার একলারই সময় কাটছে না, তোমারও কাটছে। বেশী দিন ও-হাসি থাকবে না। তা যাক্, তুমি পড়ো।'

ছেলেটি আরম্ভ করল…

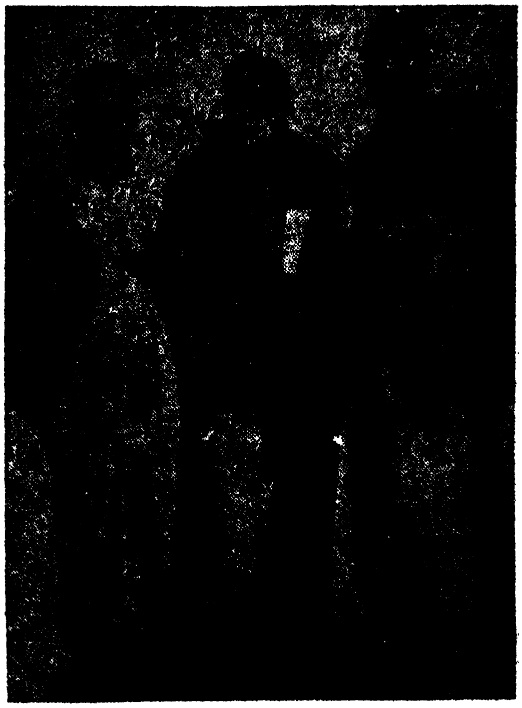
I proceed to another proof that the soul was created to look beyond and above all material interests. What is the great motive that prompts man to the study of nature ? We know what intense labour has been given to this pursuit. Has the great aim of these natural philosophers been to multiply the means of outward good ? No ! The unconquerable thirst for knowledge, for wide views, for a comprehension of the order and beauty of creation as a whole...

[অতঃপর আমি আর একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিব যে মানবাত্মা সকল বাস্তব স্বার্থের ঊর্ধ্ববর্তী ও অতিক্রমে দর্শনের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। যে মহান্ লক্ষ্য মানবকে প্রকৃতির জ্ঞান আহরণে আকর্ষণ করে, তাহার স্বরূপ কি ? এই জ্ঞান সন্ধানে কি কঠোর পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, আমরা তাহা জানি। কেবল বাহ্য সুখসুবিধার উৎকর্ষ সাধনই কি জ্ঞান-বিজ্ঞানীদিগের লক্ষ্য ছিল ? তাহা নহে। তাঁহাদিগের অদম্য জ্ঞানস্পৃহা, বিস্তৃততর দৃষ্টি লাভের এবং নিখিলের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের সমগ্র উপলব্ধির আন্তরিক আগ্রহ…]

বৃদ্ধ একমনে শুনছিলেন, থামিয়ে বললেন 'ঐটে দাগ দাও, unconquerable thirst ; খাতায় লেখ, পেজ কত ?…লেখ 158 : unconquerable thirst ; লিখেছ ? তারপর পড়ে যাও।'

ছেলেটি অল্পদিন হ'ল তাঁর কাছে এসেছে, ততটা সড়গড় হতে পারে নি। একটু থতমত খেয়ে সামলে নিলে। আবার পড়তে লাগল…

…This is that has driven them into solitudes and deserts, and compelled them to bend every energy, at



আলোক চিত্রশিল্পী তারক দাস, আচার্যদেব ও মিঃ এস্ গাঙ্গুলী
ফটো : —তারক দাস

cost of utmost sacrifice, to the work of interpreting the secrets of nature. Truth ! Truth has been the divinity they have worshipped. The great men of science, so far from caring for the body, have cheerfully worn it out in daily and nightly study, have condemned it to exposure, fatigue, suffering, course raiment and scanty fare, and have died in poverty,

that the soul might live in the light of truth' How many such glorious martyrs have left their record...

[...ইহাই তাঁহাদিগকে নির্জনে ও বনপ্রান্তরে নির্বাসিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের সকল শক্তি চরম আত্মত্যাগের সহিত প্রকৃতির গুহাহিত সত্যের উদ্‌ঘাটনে নিত্য নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য করিয়াছে। তাঁহারা সত্যকেই ঈশ্বর জ্ঞানে সাধনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের মহদাচার্যগণ আপন দেহের বস্ত্র লওয়া দূরে থাক্, সানন্দে তাহাকে দিবা ও রাত্রি-কালীন সাধনায় ক্ষয় করিয়াছেন, তাহাকে শীতাতপের অত্যাচারে, শ্রান্তি, ক্লেশ, রুক্ষ পরিধেয় ও স্বল্প আহারে জর্জর হইতে দিয়াছেন, এবং দরিদ্রভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন যেন তাঁহাদের আত্মা সত্যের আলোকে জীবনযাপনের অধিকারী হয়। কত মহিমামণ্ডিত আত্মত্যাগী এইভাবে তাঁহাদের জীবনকাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন...]

'রোসো, ঐ **sentence**টার আগে আর পরে বড় বন্ধনীর চিহ্ন দাও, **the great men** থেকে, কি বললে **light of truth**?...ঐ পর্যন্ত। আর খাতায় শুধু লিখে রাখো সেজটা। নোট করে' পড়বে সব সময়, নোট না করলে পড়ায় কোন কাজ হয় না। **Bahnbrecher** কাকে বলে জানো?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানালে সে জানে না। বৃদ্ধ একটু থেমে গিয়ে ... 'যাক্, পড়ো'। মাথা নীচু করে সে আবার সুরু করল...

Who does not behold a glorious signature of the end of human soul in this hunger and thirst for truth...

[সত্য ও জ্ঞানের এই ক্ষুধা এই পিপাসার মধ্যে কে না দেখিতে পাইবেন মানবাত্মার অন্তিমে এক জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর...]

'**Glorious signature** বাংলা কি হবে বল তো? ছেলেটি ভেবে বললে, জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর, বলে' উৎসুক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলে। বৃদ্ধ সায় দিলেন, 'তা বেশ হবে। লিখে রাখো।' আবার পড়া চলল...

...And the zeal with which our lecture-rooms through cities, towns and villages are weekly thronged by multitudes, not a few of whom have spent the day in manual toil, but who forget fatigue in the reception of new light and in the joy of menal refreshment, is a testimony to the spiritual end for which the whole race was formed, as well as a cheering omen of the brighter social state which must surely come...

[...এবং যে ঔৎসুক্য লইয়া আমাদিগের শিক্ষায়তনের কক্ষে কক্ষে, নগরে পল্লীতে প্রতি সপ্তাহে জনস্রোত সমাগত হয়, যাহার মধ্যে কতজন দিবাভাগের দৈহিক শ্রমের পরে জ্ঞানলাভ ও মনের স্ফূর্তির জন্য শ্রান্তি ভুলিয়া আসে, তন্মধ্যে নিশ্চিত সাক্ষ্য রহিয়াছে যে এই জাতি অন্তিমে আত্মিক লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সমাজের যে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী, ইহা তাহারই শুভ পূর্বলক্ষণ...]

বৃদ্ধ ততক্ষণে একটু এলিয়ে বসেছিলেন, কাসের ধর্মে বেশীক্ষণ খাড়া বসে থাকতে কষ্ট হয়। সহসা সোজা হয়ে বললেন 'বুঝতে পারছ কিছু? না, খালি চিনির বলদ? মাষ্টারি করতে গিয়ে কোনোদিন এসব মনে পড়বে? নইলে কিসের জন্যে এগুলো তোদের দিয়ে পড়াই বল্ তো? বলে' অতর্কিতে ছেলেটির গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

বেচারী লাইন ক'টি পড়তে পড়তে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, হঠাৎ চড়েই পেনসিল পড়ে' গেল মাটিতে। অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলে, শীসটা ভাঙেনি।

এমনি ক্ষণিক টুকরো কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে পড়াশুনো চলতে লাগল খানিকক্ষণ। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ মোটা কাচের চশমাটা চোখে লাগিয়ে, বইখানা খাতাখানা দেখে নিচ্ছিলেন। ছেলেটা নতুন, ভুল করতে পারে।

শেষে চাকর এসে জানাল, কোন্ কাপড়ের কোম্পানি থেকে ডিরেক্টরবাবুরা দেখা করতে এসে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন, তখন বই বন্ধ হ'ল। বৃদ্ধ বললেন, 'তা তুমি বেশ পড় তো, তোমার উচ্চারণ ভাল। আজ ও-বেলা তোমার ছুটি, বুঝলে, আবার কাল সকালে। খাওয়ার পরে একটু জিরিয়ে নিও, আজ কারখানা দেখতে যাব, তৈরী থেকো। তোমার কি দুপুরে ঘুমোন অভ্যাস আছে?'

ছেলেটি জানালে, নেই।

'বেশ, তাহলে দুপুরে আমার চরকাটা একটু সেরে দিও তো, এ চরকাটায় আমার বড় সুতো কেটে যায়।'

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত চিন্তান্বিত। সহসা একটু সোজা হয়ে চশমার খাপটাকে কুড়িয়ে হাতে চেপে ধরে' সিঁড়িতে চলে গেলেন।

(২)

খাওয়া-দাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে চরকা মেরামত শেষ করে ছেলেটি যখন লঘুপদে বৃদ্ধের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে, শুয়ে আছেন চুপ করে'। তাকে দেখে বললেন, 'সে তো দেখি পা'টা টিপে। মানহানি হবে না তো রে!' সে তাড়াতাড়ি পা টিপতে বসল। খানিক পরে সে-ই প্রথম কথা কইল, 'আজ এখনও লোক আসেনি দেখছি, আর একটু ঘুমোলেন না কেন?'

'নাঃ, আর ঘুমোব না, কারখানাটায় যেতে হবে, দূর আছে। হ্যাঁ, আমার চরকা সারিয়ে রেখেছ?' বৃদ্ধ উঠে পড়লেন। তাকে বললেন একটু বাদে তৈরী হয়ে নিতে, বলে' ঘুরে এসে চরকায় বসলেন।

একটু পরে ছেলেটি বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দূরে সতীশবাবু রাশীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে বসে' লেখায় মগ্ন, এখান থেকে বেশ দেখা যায়। অজস্র ঘুরে এদিক ওদিক দেখতে লাগল সে। কতক্ষণ কাটল খেয়াল করেনি, একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমান তাকে এসে সেলাম জানালে। বিনীতভাবে বললে, 'দু' কোশ গাঁ থেকে আসছি বাবু, শুনলাম পি-সি-রায় এয়েছেন। তাঁর কাছে কিছু চাইব না, একবার দেখা করাইবেন বাবু?'

বৃদ্ধ তখন সুতোর পাক দিতে ব্যস্ত, ছেলেটি ঘরে এসে লোকটির কথা জানালে। বৃদ্ধ বলে দিলেন 'লোকটিকে হাত মুখ ধুয়ে কিছু জল খেতে দাও আগে। তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো।'

খানিক পরে লোকটি ঘরে এসে বসল। হাতের কাগজের বাণ্ডিল থেকে যত্নে খুলে বার করল একখণ্ড কাগজ, তাতে বৃদ্ধের একটা পেন্সিলে আঁকা অনতিস্পষ্ট ছবি। তাঁর হাতে দিয়ে নমস্কার করে বললে, 'ইটি অনেকদিন আঁকি রাখছিলাম, আপনার হাতে ধরি দিব। সেই-সনের অজন্মার সময় আপনি আসিছিলেন আমার গাঁয়ে, মনি আছে?'

স্বীকারই করতে হ'ল বৃদ্ধকে, অত মনে নেই, নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। ছেলেটিকে ডেকে তার হাতে ছবিখানি দিয়ে বললেন, 'এইটে নিও তো ফেরবার সময়, আমার বাক্সে রাখো।'

লোকটি বেশীক্ষণ বসল না, উঠে পড়ল। ছেলেটি বাইরে দাঁড়িয়েছিল, যাবার সময় হাত তুলে উদ্দেশ করে' বললে 'আসি বাবু, অনেক পথ যাতি হবে, আবার বেলা পড়ি যাবে।'

একটু পরেই এলেন একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক, আঁটসাঁট স্বাস্থ্য, মধ্যবয়সী। কলকাতা থেকে এসেছেন, ডাক্তার রায়ের সঙ্গে বিশেষ দরকার। ছেলেটি ভেতরে নিয়ে গেল তাঁকে। তিনি বললেন, তাঁর ছেলে ওয়ালটেয়ারে পড়ে, তার জন্যে চারখানা বই দরকার, যদি ডক্টর রায় সায়াল্স কলেজ থেকে বই ক'খানা দু'বছরের জন্যে ধার দেন, গরীবের বড় উপকার হয়। ডক্টর রায় হেসে ফেললেন, "**The College of Science is not my property, no no, nor anybody's**"... লোকটি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

বৃদ্ধ ঘড়ি দেখে হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওহে, এবার তৈরী হয়ে নাও,

দেখব', বলে' চরকাটা ঠেলে রেখে উঠে পড়লেন। ছেলেটি প্রস্তুতই ছিল, একবার ঘরে এসে বারান্দার গিয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ তখন তৈরী হচ্ছিলেন।

হ্যাট-কোট পরা ছড়ি-হাতে এক ছিপছিপে ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সার পি, সি, আছেন?' জুতোর শব্দ শুনে ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, 'কে এল হে, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে নাকি'। গলা পেয়ে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে গেলেন। টেবিলের উপর হেঁট হয়ে বৃদ্ধ কি যেন খুঁজছিলেন, মুখ তুলে চেয়ে একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন, 'ও, কিন্তু আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি' 'বিশেষ কথা ছিল একটু; পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে আমাদের জাহাজ কোম্পানিটা খুলতে পারি…' 'একটা বাঙালী কোম্পানি তো রয়েছে, বলতে গেলে তোমাদেরই, একসঙ্গে কাজ করা যায় না! দলাদলি না করলেই নয়, কেমন?' 'সে সম্বন্ধে মুশকিল আছে আপনি তো জানেন, তাই একটা পরামর্শ করতে চাই,' 'কাল এসো, অন্য দিন এসো' বৃদ্ধ জামাটা মাথায় গলিয়ে লাঠি হাতে বেরিয়েই পড়লেন।

পথে বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে গাড়ী এসে পড়ল। বৃদ্ধ উঠলেন, ছেলেটিকে ডেকে পাশে নিলেন। পশ্চিমা ড্রাইভার একবার শুধু জেনে নিলে গন্তব্যস্থান, তারপর মুখ ঘুরিয়ে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে।

পানিহাটির কারখানার প্রকাণ্ড এলাকার কাছাকাছি এসে বৃদ্ধের কথামত গাড়ী মন্দগতিতে চলল। ছেলেটি বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, কারখানার চালুছাদ ছোট বড় ঘরগুলো। চিম্নি থেকে সারে সারে ধোঁয়া উঠছে, … তারই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে' হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ বললেন 'দেখ', আমার আর একটা এক্সপেরিমেণ্ট। সোদপুরও একটা এক্সপেরিমেণ্ট, এও তাই। দুখানা ঘর নিয়ে একে আরম্ভ করেছিলুম, আজ আড়াইশ' বিঘেয় আমাদের আঁটছে না। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি করি। চাকরি সেরে ব্লো-পাইপ হাপর ঘাড়ে করে গেছি, সালফিউরিক এসিড চেম্বারে অটোজিনাস সলডারিং করতে। তখন কেউ ও-কাজ জানত না, মিস্ত্রীরা সাহস করলে না। ওঃ, সেই যেদিন চেম্বারের তলা ভিজে ভিজে উঠল, এসিড জমছে, সেদিন স্পষ্ট মনে পড়ে। এ অম্নি পড়ে' ওঠেনি তোদের হুজুগের মতো…'

সেদিন ঘণ্টা দুই ধরে' কারখানার খুঁটিনাটি দেখা চলল, আলাপ এবং পরামর্শ হ'ল। ঘরে ঘরে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সবিনয়ে হাসিমুখে বুঝিয়ে দিলেন নির্মাণের যতেক কৌশল। বৃদ্ধ থেকে থেকে বলছেন 'ও তো ছেলেটাকে ভাল করে বুঝিয়ে, দেখুক বই-পড়া আর হাতে-করা, কতো তফাৎ।'

সন্ধ্যার আগে কারখানার গাড়ী দুজনকে সোদপুরে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়ে গেল।

(৩)

সন্ধ্যা হয় হয়।

তখন সামনে দীঘির জল স্বচ্ছ কালো, সায়াহ্নের সন্ধিক্ষণে পশ্চিমের পাড়ে বসে' বৃদ্ধ, তাঁর প্রিয়কর্মী সতীশ, ছেলেটি। নানা কথা হচ্ছিল দুই বৃহৎ কর্মীতে বসে', আর ছেলেটি শুনছিল। কথায় কথায় আবেগ-ভরে সতীশবাবু বললেন, 'আসতে চায় না কেউ। আপনারা বড় বড় বাড়ী তুলে মোটা মাইনে দিয়ে দেশের সমস্ত ভাল মস্তিষ্কগুলোকে কিনে রেখেছেন। আমি যখন বলি, এই যে আমাদের দেশ, যে দেশে লোকের আয় মাসে তিন টাকা—তাও সব গ্রামের মধ্যে নয়—সে দেশে তোমাদের তো টাকার লোভ দেখিয়ে ডাকতে পারিনে, তোমরা এম্নি চলে' এসো, তখন সবাই যায় পালিয়ে।' বৃদ্ধ হাসিমুখে ছেলেটির দিকে চাইলেন, 'জানো ইনি কে, ছেলেধরা'; তার পিঠে হাত রেখে সতীশ-বাবুকে সহাস্যে বললেন 'আবার আমার এ ছেলেটিকে বুঝি ধরার চেষ্টায় আছ' বলে' তাঁর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পায়ের ধুলো নিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিলেন সতীশবাবু, 'ঐ বিদ্যেটা যেন আপনার কাছ থেকে শিখে নিতে পারি।'

অন্ধকারে কারও মুখ আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ কাটল নীরবে। মুক্ত বাতাস দীঘির জলে যে তরঙ্গ তুলছিল, তাও আর দেখা যায় না। বৃদ্ধ বললেন, 'চলো আজ ওঠা যাক্।'

সতীশবাবু ঐখান থেকেই বিদায় নিলেন। পশ্চিমমুখে আবছায়া পথে ছেলেটির কাঁধ ধরে ঝুঁকে ঝুঁকে ফিরে চললেন বৃদ্ধ। সাবধানে নির্বাক হাঁটছিলেন দুজনে, রাস্তা ভাল নয়। পথের শেষাশেষি কুটিরের কাছে এসে ছেলেটির হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, '**Bahubroober** মানে কি জানো, — পথ-প্রদর্শক!'

আচার্য্যের উদ্দেশে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

হে চির তরুণ দেশভক্ত গুরু প্রজাহীন প্রজাপতি,
উজল করেছে জ্ঞানলোক তব শত শত সন্ততি।
কণ্বের মত কুলপতি তুমি
ভাস্বর করি' তব তপোভূমি
তোমারি পালিতা বালিকা হইয়া ছিল যে সরস্বতী।

জনসংহতি তোমারে বাঁধিতে পারে নাই কোনদিন,
তারই বেদনায় ছিল তবু তব নয়ন তন্দ্রাহীন।
ইহসংসার কোন প্রলোভনে
ধরিতে তোমায় পারেনি বাঁধনে।
সারা দেশই যার সংসার, র'বে কেমনে সে উদাসীন?

যোগী ঋষি কভু দেখিনি, শুনেছি পুরাণ কথায় আছে।
কল্পলোকের স্বপ্নযুগের জীব তাঁরা মোর কাছে।
তোমা হ'তে তাঁরা ছিলেন মহান্
একথা কিছুতে মানেনাক প্রাণ।
তাঁহাদের দান তোমার মতন ঋষির মাঝেই বাঁচে।

কার কথা কই? কত গৌরবই তোমারে যে ছিল ঘিরে,
সবার উপরে শিষ্য গরিমা দাঁড়ায় উচ্চ শিরে।
তোমার ধ্যানের শুচি আশ্রমে
পরাবিদ্যার কামধেনু ভ্রমে,
তোমারি জ্ঞানের পরিবেশে দেশ অতীতে পেয়েছে ফিরে।

সত্যলোকের আহিতাগ্নিক, তব তপোবন ছায়,
অনৃতমেধের অমৃত বহ্নি জ্বলে শত রসনায়।
পুড়িল ভ্রান্ত আচার বিচার,
সমাধি সেথায় সকল মিছার।
জাতির মুক্তি তাহারি মাঝারে পূর্ণাহুতিটি চায়।

বাণীর চরণকমলে আজিকে ঝ'রে গেল শেষ দল,
গ্রীবা গুটাইয়া মরাল তাহার ফেলিছে অশ্রু জল।
তুমি চ'লে গেলে, শেষ ডিঙাখানি
প্লাবিল যে কাল দরিয়ায় পানি।
ভাবি আজি তাই বঙ্গযাত্রায় কি রহিল সম্বল।

প্রফুল্লচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

ডক্টর শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী ডি-এস্-সি

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী, ভারতে রাসায়নিক গোষ্ঠীর স্রষ্টিকর্তা, বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। ১৯২৪ সালে এম্-এস্-সি পড়িবার সময়ে আচার্যদেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তদবধি তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার অমায়িকতায়—তাঁহার জ্ঞান মহিমায় এবং সর্বোপরি তাঁহার চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইয়াছি। ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিক্ষাগুরু প্রফুল্লচন্দ্র আদর্শস্থানীয়। প্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতীক প্রফুল্লচন্দ্র পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষালাভ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও আর্য্য ঋষিগণের মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রাচীন গুরুর আশ্রমের পুনঃ প্রবর্তন তিনি করিয়াছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া প্রাণাধিক শিষ্যগণের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়



লিখনরত আচার্য্যদেব

ফটো : তারক দাস

বিশ্বাস ছিল যে বিজ্ঞানচর্চা তপস্যা—অনন্যমনা হইয়া একান্তচিত্তে সাধনা না করিলে উচ্চাঙ্গের গবেষণা হইতে পারে না, তাই প্রিয় শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরীক্ষাগারে জীবনের সায়াহ্নেও জরাজীর্ণদেহ পলিত-কেশ প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিয়া উৎসাহ লাভ করিয়াছি। তাঁহার উপস্থিতি, তাঁহার উৎসাহবাণী ও মৃদু ভর্ৎসনা এবং মাঝে মাঝে উপহাস তরুণ গবেষককে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি কোনও গবেষকের ভাল কাজ হইলে প্রফুল্লচন্দ্র পিতার মত সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন এবং অন্যান্যের নিকট তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজে এই দৃশ্য অনেকেরই চক্ষে পড়িয়াছে। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীগণের জীবনের ঘটনা আলোচনা করিয়া—তাঁহাদের আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তরুণ ছাত্রগণের মধ্যে গবেষণাস্পৃহা জাগাইয়া তুলিতেন এবং বর্তমান সময়ে কোনওরূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিলেই তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিতেন এবং কিরূপ প্রতিকূল আবেশের মধ্যে—নানারূপ আধুনিক সাজসরঞ্জামের অভাবসত্ত্বেও তাঁহাকে গবেষণা করিতে হইয়াছে তাহা বলিতেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা ছিল শতমুখী, বিজ্ঞান-চর্চার মধ্যেও তিনি প্রসঙ্গক্রমে দেশের কথা, ব্যবসায়ের কথা, অর্থনীতির কথা, সমাজসংস্কারের কথা এবং নানাবিষয়ে আলোচনা করিয়া ছাত্রগণকে দেশমাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিতে আমন্ত্রণ করিতেন। মেধাবী গবেষককে অনেক সময়েই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিতেন 'তুই একচোখা, কূপমণ্ডুক, কেবল লেখাপড়া, মাড়োয়ারী ভাটিয়াদের মত তোদের ব্যবসা শেখা উচিৎ।' অনেক সময়েই তিনি বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেন এবং বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীজীবী পরনির্ভর না হইয়া স্বাবলম্বী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে সে বিষয়ে বলিতেন। তিনি বাঙ্গালীর যেমন প্রশংসা করিতেন তাহার বুদ্ধির জন্য—মেধার জন্য—তাহার চরিত্রবলের জন্য, আবার রুগ্নশীর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রকে দেখিলেই তিনি তাহাকে সজোরে আঘাত করিয়া দুর্বল শরীরের জন্য, নিরন্নতার জন্য, অর্থহীনতার জন্য বাঙ্গালী জাতির নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিতেন। কোনও ছাত্রকে বিলাসিতা কিংবা বাবুয়ানী করিতে দেখিলে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে লজ্জা দিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

মহাপুরুষ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাত্রা প্রণালী। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও প্রফুল্লচন্দ্র কমলার আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন। তথাপি তিনি আর্য্যঋষিগণের আদর্শে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থেরই মত তিনি থাকিতেন এবং তাঁহার আচার-ব্যবহারে কখনই তাঁহার অর্থশালিতার পরিচয় পাওয়া যাইত না। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোনওরূপ ব্যয়-বাহুল্য তাঁহার ছিলনা। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিলে আমরা কল্পনাই করিতে পারিতাম না যে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন এত অনাড়ম্বর—এই অশীতিপর মহাপুরুষ মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্বেও নিজের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া নিজেই তাহা রৌদ্রে শুকাইতে দিতেন। নিজের কাজ নিজে করিবেন এইজন্য তিনি মোটেই দ্বিধা বোধ করিতেন না এবং সেজন্য পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাঁহার কক্ষ ছিল একাধারে শয়ন-প্রকোষ্ঠ, বিশ্রামাগার, পড়িবার ঘর এবং আহারের স্থান। কোনও

উজ্জ্বল আসবাবপত্র তাঁহার গৃহে শোভা পাইত না এবং মহাযোগীর মতই তিনি এই কক্ষে বসবাস করিতেন। তাঁহাকে পরিচ্ছদের তারতম্য করিতে দেখা যায় নাই—ক্রোড়পতি মহাজনগণ, উর্দ্ধতন রাজকর্মচারিগণ এবং রাজপ্রতিনিধিগণ তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেও তিনি সাধারণবেশে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতেন। বিজ্ঞানকলেজের বারান্দায় হয়ত আচার্যদেব সাধারণবেশে পায়চারী করিতেছেন এবং তাঁহাকেই আসিয়া দর্শনার্থী কেহ স্যার্ পি, সি, রায় কোথায় আছেন এবং তাঁহার সহিত দেখা হইবে কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এইরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। যাহারা না জানিত তাহারা তাঁহার বেশে তাঁহাকে চিনিতে না পারা বিচিত্র নহে। এমন ঘটনাও শুনা যায় যে জনবহুল সভার তোরণদ্বারে প্রফুল্লচন্দ্রকে চিনিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের এই অনাড়ম্বর জীবন—তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং তাঁহার বালকসুলভ সরলতা তাঁহাকে সাধারণ মানব হইতে অনেক উচ্চে আসন প্রদান করিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব হইতেছে অর্থে বীতস্পৃহতা। তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন নিজের সুখের জন্য নহে—নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য নহে। নিরন্নকে অন্নদান, আর্ত্তের দুঃখমোচন, শিক্ষ-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রভৃতির জন্য তিনি তাঁহার কোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থলালসা কিংবা অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিলনা। তাঁহার সমস্ত অর্থই তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন এবং আমরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি যে অর্থকে তিনি নিতান্তই ভার-স্বরূপ মনে করিতেন। তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহার ব্যাঙ্কের খাতায় কত টাকা জমিয়াছে এবং যখনই শুনিতে পাইতেন ৪০০।৫০০৲ জমিয়াছে সেই টাকা দান না করিলে যেন তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেন এবং সেই শুভমুহূর্ত্তে যদি কোনও প্রার্থী আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিত, তখনই তিনি সঞ্চিত টাকার চেক্ কাটিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেন এবং এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে যে তাঁহার ব্যাঙ্কের হিসাবে মাত্র ১০।১৫৲ রহিয়াছে। শেষ জীবনেও যখন পেন্সনের টাকা মাত্র তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল তখনও তিনি সংসার খরচের অতিরিক্ত টাকা দান করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ সত্যই অতুলনীয়।

নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়নিষ্ঠা প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই উদ্যোগী পুরুষসিংহের প্রাত্যহিক জীবন ছিল ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত, কর্মবহুলতার মধ্যেও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যের ব্যতিক্রম কোন সময়েই হইত না। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন, দর্শনার্থীর সহিত আলাপ আলোচনা করিবার তাঁহার নির্দিষ্ট সময় ছিল এবং জীবন এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আজীবন জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রের ন্যায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে নিয়মমত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন—অধ্যয়ন তাঁহার নিকট ছিল যোগ সাধনা এবং কোনও কারণে এই যোগভঙ্গ হইলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন এবং রুষ্ট হইতেন। শেষজীবনেও দৃষ্টিশক্তির হীনতা হইলে তিনি এই জ্ঞানচর্চা পরিত্যাগ করেন নাই—কোনও ছাত্র আসিয়া নিয়মিতভাবে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিত এবং তিনি একান্তচিত্তে যোগীর মত উহা শুনিতেন। তিনি নিজেকে ছাত্র বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

প্রফুল্ল-স্মরণে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

বিজ্ঞানের বিষবাষ্পে ফুটিল কি.নন্দনের ফুল ?
দিব্যগন্ধে সুষমায় পরিপূর্ণ পূজার দেউল !
কালের পাথার লঙ্ঘি' জিনিয়া দূরত্ব ব্যবধান,
জয়মাল্য পরিয়াছে সসম্মানে বিজয়ী বিজ্ঞান।
যে সামান্য ক'টি প্রাণী উদ্ঘাটিয়া মাহাত্ম্য আত্মার,
ভারতের পুণ্যনাম পৃথিবীতে করিল প্রচার,
সর্ব্বদেশে সগৌরবে, হে জ্ঞানী, হে আচার্য্য মহান্
তুমি তার অন্যতম, সেথা যথাযোগ্য তব স্থান।

কালজয়ী বৈজ্ঞানিক, রসায়ন পারিল না যাহা,
যেথা তার প্রবেশের অধিকার নাই, তুমি তাহা,
করিয়াছ অবহেলে আপনার মাধুর্য্য লীলায়,—
মায়ের কোমল বুকে যে মায়ায় মাধুরী লুকায়,
সে মায়ায় বাঁধিয়াছ বাংলার নরনারী সবে ;
বিজ্ঞানের বরপুত্র, সে কি তব পাণ্ডিত্য গৌরবে ?

আদিযুগ হতে হেথা এ ভারতে অরণ্যছায়ায়,
উদাত্ত মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ত বন্দনায়,
অধ্যাত্মলোকের বাণী, মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র-গীতি,
আমলকী আন্দোলিয়া দুলাইয়া ঘনবন বীথি।
কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হ'ত শিষ্য হ'তে শিষ্য পরম্পরা,
গুরুমুখী গূঢ়বিদ্যা ক্ষুরধার পরা ও অপরা।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর রসতত্ত্ব হ্লাদিনী প্রক্রিয়া
যোগ তপ নিষ্ঠা জপ ধ্যান তন্ত্র, বীণা ঝঙ্কারিয়া,
ছন্দে ছন্দে সমুত্থিত হ'ত হেথা অরণ্যের বুকে—
দুলিয়া উঠিত বিশ্ব সে রাগিনী-গুঞ্জনে উৎসুকে।

সে অরণ্য-সভ্যতায় শেষ চিহ্ন আঁকিলে ধরায়,
আড়ম্বরহীন তব অপরূপ জীবন ধারায়,
সনাতন সে আদর্শ পুনঃ রূপ পেল অভিনব,
দেখালে ঐশ্বর্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠতর আত্মার বৈভব।

তোমার আদর্শে পুনঃ সৃষ্ট হ'ল নূতন জগৎ,
কণ্টক বিস্তৃতারণ্যে তারা কেটে চলে নব পথ।
গুরুর গৌরব হ'তে শিষ্যের সৌরভ গরীয়ান্,
বিজ্ঞানের অভিযানে মিলিয়াছে জ্ঞানের সন্ধান।
শিষ্য ও প্রশিষ্যে বঙ্গ সমৃদ্ধ উন্নত মহত্তর,
সার্থক জনম তব হে প্রফুল্ল আচার্য্য সুন্দর।

দেহ আর কতদিন ধরিয়া রাখিবে নর রূপে ?
বৃহৎ সত্ত্বায় তাই মিশে গেলে স্রষ্টার স্বরূপে।
তুমি মিশে আছ এই বাংলার অণুতে তৃণুতে,
ভাবে রসে গীতে গানে গোপীযন্ত্রে বীণাতে রেণুতে।
তুলসী মালঞ্চ মাঝে মাধবী নিকুঞ্জে অনুরাগে,
নীলিমার নীলে নীলে, নদনদী তটিনী-তড়াগে।
ব্যাঘ্র অধ্যুষিত দেশ—সর্পাদি সঙ্কুল জলাভূমি,
শত ধন্য মানিয়াছে তোমার চরণ ধূলি চুমি।
গীতার নূতন ব্যাখ্যা মূর্ত্ত হ'ল তোমার জীবনে,
হে তরুণ, চিরজীবী, অর্ঘ্য লহ প্রীতির চন্দনে।

"নবযুগ-নাগার্জ্জুন—"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মানুষের জন্ম মৃত্যু অনাদি এ সৃষ্টির বিধান ;
মৃত্যু করে বারে বারে জীবকোষে নব জন্মদান।
অমৃতের পুত্র তারা মর্ত্ত্যলোকে চির-মৃত্যুহীন ;
হলেও নশ্বর দেহ কালধর্ম্মে পঞ্চভূতে লীন
আত্মা চির অবিনাশী—নিত্যমুক্ত-অনন্ত পুরুষ ;
জাতির জীবনে তাই চিরন্তন মাটির মানুষ।

এসেছিল নাগার্জ্জুন বিস্মৃত সে কোন যুগে কবে—
ধন্য করি পুণ্য দেশ মনীষার অতুল গৌরবে,
রসায়ণী রসতত্ত্বে নব নব সৃজিয়া বিস্ময়,
চলে গেছে স্বর্গলোকে ; বিশ্ব তার আজো গাহে জয় !
মৃত্যু-জয়ী নাগার্জ্জুন বেঁচে আছে কীর্ত্তি মাঝে তার
মানুষের অমরত্ব গুণ কর্ম্মে ভুবনে প্রচার।

ডুবেছে শতাব্দী শত একে একে কালস্রোতে ধীরে,
সমাহিত সুধী কত, অতীতের স্মৃতির মন্দিরে
নবীন আচার্য্য এল এ প্রাচীন জগতে আবার
বিকশিল রসার্ণবে জ্ঞান-পদ্ম দিব্য প্রতিভার ;
নব নব বর্ণ বিভা বিজ্ঞানের রসায়ন লোকে
বিকীর্ণ করিল সে যে রসঘন নূতন আলোকে।

পৃথিবী পরালো তারে বহুমানে যশের মুকুট ;
আপনি ইন্দিরা দিল স্বর্ণ মুদ্রা ভরি করপুট ;
ত্যাগী সে, নির্লোভচিত্ত, সদাব্রতী, নহে স্বর্ণে বশ,
রসের সন্ধানে মত্ত আত্ম-ভোলা বিজ্ঞান-তাপস ;
অসহারে বুকে নেয়, নিরাশ্রয়ে স্নেহে ধরে হাতে
জাতি ধর্ম্মে নাহিভেদ, আত্মীয়তা বসুধার সাথে।

উচ্চারি' স্বাতন্ত্র্য মন্ত্র বিজ্ঞানের বহিয়া পতাকা
দারিদ্র্যের পঙ্ক হতে উদ্ধারিয়া অবরুদ্ধ চাকা
ভারতের প্রাণ-রথে চেয়েছিল দিতে অগ্রগতি—
দানবীর—কর্ম্মবীর—নিখিল নমস্য মহামতি !
নির্ব্বাণ লভেছে সেই তপঃসিদ্ধ রসায়ন ঋষি
স্মৃতির অরণি যার তেজদীপ্ত রবে দিবানিশি।

হারাইয়া তারে জানি সর্ব্বহারা হল আজি দেশ,
গৌরবের শেষ চূড়া ভাগীরথী কূলে বিনিঃশেষ।
তবু জানি নহে ইহা সাধকের সমাপ্তি চরম
কঠোর তপস্যা তাঁরে সার্থকতা দিয়েছে পরম।
প্রেম রসায়নে তাঁর সোনা হয়ে গেছে আজ যারা
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের গড়ে যাবে তারা।

দিগন্তে নবীন সূর্য্য সমুদিত যার তূর্য্য রবে
জ্ঞানের অরুণ-বিভা বিচ্ছুরিত অপূর্ব্ব গৌরবে,
তাঁহার আদর্শ বরি' শোক-অশ্রু করিয়া মার্জ্জনা
জননীর মুক্তি লাগি সারা দেশ করুক সাধনা,
নবযুগ নাগার্জ্জুন অনন্তে হবার আগে লয়,
সঞ্জীবনী প্রাণ-মন্ত্রে সবারে যে দিয়েছে অভয়।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বৃটেনের নিকট ভারতের পাওনা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা চরমে উঠিলেও ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ দিন দিন ভারী হইয়া উঠিতেছে। ১৯৩৫ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে স্বর্ণের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয় এবং ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে নোট ছাপাইবার আর কোন আইনগত অন্তরায় থাকে না। ১৯৩৯ সাল হইতে ব্রিটেন মহাযুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে পৃথিবীর নানা দেশে তাহাকে বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী অর্ডার দিতে হইতেছে এবং অন্যান্য দেশের বেলায় স্বর্ণের দ্বারা পণ্যাদির দাম মিটাইতে হইলেও ভারতকে বৃটেন সম্মিলিতপক্ষের মাল যোগাইবার দরুণ নগদ কোন মূল্য না দিয়া ভারতীয় পণ্যের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে ষ্টার্লিং বণ্ড জমা রাখিতেছে। অবশ্য এই ষ্টার্লিংয়ের পর্ব্বত শুধু ব্রিটেনের নিজ দেশের প্রয়োজনের জন্য জমিয়া উঠিতে পারিত না, ভারত বর্ত্তমান যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-রক্ষার ব্যয়ভারের একাংশ বহন করিবার ব্রিটেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সেই হিসাবেও তাহার আর্থিক দায়িত্বগ্রহণের বাধ্য-বাধকতার জন্য ভারতের পক্ষে বহু ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতরক্ষার দায়িত্ব ভারতের একার নয়, সাম্রাজ্য বাঁচাইবার ব্যবস্থা সাম্রাজ্যভোগীদেরই করার কথা, এজন্য এই একাংশ ব্যয় বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্রিটেন এমন কিছু উদারতা অবশ্যই দেখায় নাই ; তবু ভারতের জন্য এই সাধারণ সৌজন্যটুকুর প্রয়োজন রাজশক্তি আগে কখনও অনুভব করে নাই। স্যার জর্জ্জ উইণ্ডেট তাঁহার "our financial

relations with India" গ্রন্থে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত ব্রিটেনের তহবিল হইতে কোনদিন এক শিলিংও ব্যয় করিতে হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আফগান ও ব্রহ্ম যুদ্ধের চার কোটি পাউণ্ড ব্যয় ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইয়াছে; ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজপরিবারের হাতে শাসনদণ্ড চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থার জন্তও ভারতের তহবিল হইতেই টাকা লওয়া হয়। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের খরচ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিনিয়া লইবার ব্যয়, বিভিন্ন বড়লাটের পেন্সন ও এককালীন পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রভৃতি সমস্ত ব্যয়ভারই ভারতবর্ষ বহন করিয়া আসিয়াছে।

এখন ব্রিটেনকে ভারত ছাড়া আমেরিকাও ধারে পণ্য যোগাইতেছে। আমেরিকা যুদ্ধের প্রথম দিকে পণ্যের নগদ মূল্য তো লইতই, অধিকন্তু মাল পাঠাইবার জন্ত জাহাজের দায়িত্বটুকু পর্য্যন্ত তাহারা সেই সময় গ্রহণ করে নাই। তাহার পর যুদ্ধের বিরাট ব্যয় জোগাইতে জোগাইতে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিলে যুদ্ধ জয়ে ইংলণ্ডের সমস্বার্থ অনুভব করিয়া অনেকটা নিজের প্রয়োজনেই আমেরিকা ইংলণ্ডকে ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে পণ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জানে যে, ইংলণ্ড যদি জার্ম্মাণীর কাছে পরাজিত হয় তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিরাট জার্ম্মাণ নৌবহরের পক্ষে আমেরিকা অভিযান একেবারে অসম্ভব নয় এবং হিটলার বিশ্ব-জয়ের যে পরিকল্পনা লইয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন তাহা হইতে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশ আমেরিকার বাদ পড়িবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে যে ধারে পণ্য বেচিতেছে, ইহা তাহার স্বচ্ছলতা বা ইচ্ছাপ্রসূত নয়, আরও নানা বিষয়ে অভিভাবকদের নির্দ্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতার মত এক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ তাহার অসহায়তারই প্রমাণ দিতেছে। বর্ত্তমানের মত গত যুদ্ধে আমাদের প্রচুর সমরব্যয় সত্ত্বেও ব্রিটেনের নিকট হইতে অনেক টাকা পাওনা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধের পরে সেই পাওনা অর্থের প্রায় ১১০ কোটি টাকা ভারতের নামে দানখাতে লিখিয়া লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট চরম স্বার্থপরতার পরিচয় দিলেন। মাতব্বরী চালে শুধু ধন্যবাদের বিনিময়ে ব্রিটেন গত যুদ্ধে ঐভাবে ভারতবর্ষকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। এই যুদ্ধে যদিও এ পর্য্যন্ত সেইরূপ ভয়াবহ অবস্থার পুনরাবির্ভাব হয় নাই, তবু আমাদের পাওনা টাকা ফাঁকী দিবার জন্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও জননায়কদের মধ্যে এখন হইতেই একটি প্রবল আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের আগে ব্রিটেনের নিকট ভারতের বহু দেনা ছিল, এই সকল দেনা হইয়াছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্যাণে, এমন কি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন ইণ্ডিয়া অফিসে যে বিরাট ভোজসভা হয়, সেই অনুষ্ঠানের বিলও ভারতবর্ষকে শোধ দিতে হইয়াছিল। এবারের যুদ্ধে যথেষ্ট পণ্যের অর্ডার পাইয়া এবং ব্রিটেন ভারত-রক্ষার আংশিক ব্যয় ভার বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেই সকল দেনা এখন আমাদের শোধ হইয়া গিয়াছে এবং দেনদার দেশ হইতে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে। ব্রিটেনের নিকট আমাদের আটশত কোটি টাকার বেশী পাওনা হইয়াছে, যুদ্ধের শেষে এই পরিমাণ হাজার কোটিতে পৌঁছাইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন। উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের ভবিষ্যত লইয়া ভারতের বহু মনীষী চিন্তা করিতেছেন, ব্রিটেনের আর্থিক অসচ্ছলতা দেখিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন যে মুদ্রার মূল্যহারে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া অথবা দেনা শোধের ব্যবস্থা স্থগিত রাখিয়া ব্রিটেনের পক্ষে ভারতকে যুদ্ধের পরে নিরাশ করা অস্বাভাবিক হইবে না। এদিকে ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনেস (যিনি ইতিপূর্ব্বে ব্যাঙ্কর নামক মুদ্রামানের পরিকল্পনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন) লর্ড সভায় মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতের স্বার্থে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার ব্যবস্থা না হইলে ভারতের মুদ্রাস্ফীতিজনিত অসুবিধার শেষ হইবে না। ইংলণ্ডের 'ইকনমিষ্ট', 'ফাইনান্সিয়াল নিউজ' প্রভৃতি পত্রিকাও লর্ড কিনেসের সুরে সুর মিলাইয়া ষ্টার্লিং ঋণ হইতে ব্রিটেনকে আংশিক মুক্ত করিবার জন্ত জোর প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। ইকনমিষ্ট পত্রিকার মতে সমর পরিচালনার ব্যয়ভার বহন সম্পর্কে ব্রিটেনের সহিত ভারতের যে চুক্তি হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে, এবং তাহারই ফলে ইংলণ্ডে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং স্তূপীকৃত হইতেছে ও নোটের প্রাচুর্য্য ঘটায় ভারতে শোচনীয় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে। মিঃ বিড়লা ইকমিষ্ট পত্রিকার ও লর্ড কিনেসের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অর্থ বৃদ্ধির জন্ত নয়; চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের জোগান হতাশজনকভাবে কম পড়ায় যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্ত এই মুদ্রা-স্ফীতি সম্ভব হইয়াছে। মোট কথা, বিলাতের উপরোক্ত সংবাদ-পত্রসমূহ ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ চাহিতেছেন যে হয় ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় দান হিসাবে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের কিছু অংশের মায়া পরিত্যাগ করুক, আর না হয় ষ্টার্লিং ও টাকার বিনিময় হারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মুদ্রামূল্য হ্রাসের দ্বারা ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলুন। ভারতের সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাবও খুব পরিষ্কার নয়। মিঃ সোরেনসেন সম্প্রতি হাউস অফ্ কমন্সে ভারতের আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভারত-সচিব মিঃ আমেরিকে ঘোষণা করিতে বলায় মিঃ আমেরি প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার স্যার জন এণ্ডারসনের গত ২২শে জুন তারিখের একটি বিবৃতির উল্লেখ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চ্যান্সেলরের বিবৃতিতেও ভারতের পক্ষে আশাবাদী হওয়ার কোন সুদৃঢ় যুক্তি নাই। স্যার জন এণ্ডারসন কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্ত যে আন্তর্জ্জাতিক ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে না। স্যার জন এণ্ডারসনকেও যখন ভারতের ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত কমাইয়া ঐ দেশের স্বার্থহানির কোন চেষ্টা করা হইবে না এই মর্ম্মে একটি বিবৃতিদানের অনুরোধ করা হয়, তখন তিনিও আসল কথা চাপা দিবার মত করিয়া বলেন যে, এইরূপ প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা সমস্যাটি পরিষ্কারভাবে সমাধান করা বোধ হয় তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষের এই সব নৈরাশ্য-জনক অসংলগ্ন উক্তি শুনিবার পর আমাদের ভয়ের কারণ আরও

বাড়িয়া যাওয়া সত্যই অস্বাভাবিক নহে। ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক অসুবিধার যুক্তিতে ব্রিটিশ স্বার্থবাদীর দল এই যে ষ্টার্লিং ঋণ সঙ্কোচের পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহাতে ভারতব্যাপী তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। মিঃ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, মিঃ জি এল মেটা, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার সমুখম্ চেট্টি প্রভৃতি ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ ও ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি উক্ত ব্রিটিশ প্রচারকার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং ষ্টেটসম্যানের মত প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাও এ বিষয়ে ভারতের স্বার্থরক্ষার দাবী করিয়াছেন। ১৮৭৩ সালে স্যার চার্লস ট্রেভেল্যান বলিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষ আমাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের ইচ্ছামত যে কোন খরচ তাহার ঘাড়ে চাপাইতে পারি।' এই উক্তির পরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তনের সহিত ভারতবর্ষের জাগরণও কিছু কম হয় নাই, কিন্তু ভারতকে যাহারা জমিদারী মনে করেন তাঁহাদের মনের অবস্থা আজও অপরিবর্ত্তিত আছে। আমেরিকার অভ্যুত্থানে ব্রিটেনের মাতব্বরীর অধিকার বর্ত্তমানে খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এখন ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের আর্থিক স্বার্থ লইয়া এভাবে খেলা করার দায়িত্ব ব্রিটেনকেই লইতে হইবে। ইংলণ্ডের নিকট ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের মত আমেরিকার নিকট পণ্যবিক্রয়ের দরুণ আমাদের ডলার উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইতেছে, স্বৈরাচারের মোহে ইংলণ্ড ষ্টার্লিং ঋণ অস্বীকার করিলে ডলার উদ্বৃত্তের কি গতি হইবে? বিশ্বের আর্থিক শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আগ্রহের শেষ নাই, ভারতের টাকা এভাবে ফাঁকী দিবার দুশ্চেষ্টা চলিলে ভারতবাসীর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের পর যুক্তরাষ্ট্রের কি বলিবার কিছুই থাকিবে না?

ফুলের গাছ হইতে রবার উৎপাদন

রবার বর্ত্তমান সভ্যতার আমলে অপরিহার্য্য বস্তু এবং মালয় ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপানের হস্তগত হওয়ায় এই প্রয়োজনীয় পদার্থটির অভাবে মিত্রপক্ষীয় প্রত্যেক রাষ্ট্রই অসুবিধায় পড়িয়াছিল। আমেরিকা রবারের প্রচণ্ড অভাব দূরীকরণার্থে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রবার উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে এবং কিছু পরিমাণে সফলকাম হইয়াছে। ভারতবর্ষের ডেরাডুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বৎসরাধিক কাল বহু গবেষণার পর আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ক্রিপটস্টেজিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা নামক ফুলের গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ রবার পাওয়া যাইতে পারে। এই গাছের ফুল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া আগে বাগানের শোভাবৃদ্ধির জন্ত ইহাদের ব্যবহার ছিল ইহাদের জন্মস্থান আফ্রিকা ও ম্যাডাগাস্কার হইতে ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্যই এই গাছ ভারতে আনা হইয়াছিল। রবার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এক একর জমিতে ক্রিপটস্টেজিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার চাষ করিতে যন্ত্রপাতির খরচ সমেত দুশো টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া গবেষকগণ অনুমান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দুয়ারে শিল্পবিপ্লব অপেক্ষা করিতেছে, যন্ত্র সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপাদান রবার উৎপাদনের এরূপ অভিনব উপায় আবিষ্কারের দ্বারা এই সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য

বৎসরাধিক কাল আলাপ আলোচনা চলিবার পর অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে ভারতকে ১০ কোটি আউন্স রৌপ্য ধার দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই রৌপ্য যুদ্ধের পরে প্রতি আউন্স ফিরাইয়া দিতে হইবে। ভারতে অবস্থিত সম্মিলিতপক্ষের সৈন্যগণ এই রৌপ্য হইতে মুদ্রিত টাকা ব্যবহার করিবে এবং জনসাধারণও এই রৌপ্যের একাংশ কিনিতে পারিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

দেশে নোটের প্রাচুর্য্য থাকিলেও কাগজী নোটের সম্বন্ধে অশিক্ষিত জনসাধারণের বিশ্বাস যে কম ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। বাজারে রৌপ্য মুদ্রা ও খুচরা আনি দোয়ানী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতির কুফল হইতে ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে কিছু পরিমাণ মুক্তি পাইবে। দশ কোটি আউন্স রূপা বাজারে আসিতেছে শুধু এই সংবাদ পাইয়াই দুদিনের মধ্যে একশত ভরি রূপার পাঁচ টাকা দর পড়িয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোনার দরও হ্রাস পায়; সত্যকার আমদানী পুরোদমে চলিলে ভারতের পণ্যাদির বাজার অবশ্যই অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া যাইবে। তবে একথা সত্য যে কেবলমাত্র মুদ্রার রূপার জন্যই ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় নাই, পণ্যাভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে সম্পূর্ণ ফল লাভ আমরা আশা করিতে পারি না।

রৌপ্য আনিবার সময় ভারতসরকারের পক্ষে দুটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিশেষ প্রয়োজন। ইহার পূর্ব্বে লণ্ডনের বাজারে সস্তায় কেনা ভারতীয় রৌপ্য চড়া দরে বিক্রীত হইয়াছিল। স্বর্ণ বিক্রয়ে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড যে ভাবে মুনাফাবৃত্তি চালাইয়াছে তাহার নিদারুণ অভিজ্ঞতা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। আমেরিকা হইতে রৌপ্য আনিবার সময় বর্ত্তমানের বাজার দর ও ভবিষ্যতের প্রত্যার্পণকালীন বাজার দরের কথা ভারতসরকারের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত। তাছাড়া দশ কোটি আউন্স রৌপ্য ভারতের চাহিদার তুলনায় নিতান্ত সামান্য। ইহার কত অংশে টাকারূপে মুদ্রিত হইবে এবং কত অংশ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীত হইবে তাহা জানা যায় নাই। বাজারে নোট ও টাকা পাশাপাশি চালু হইলে যদি টাকা সরবরাহে প্রাচুর্য্য রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার মধ্যে জনসাধারণ অবশ্যই রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয় করিতে সুরু করিয়া দিবে। ইহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় কেবলমাত্র নোটই বাজারে চালু থাকিবে এবং রৌপ্য মুদ্রা বাজার হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। রৌপ্য যদি আনিতেই হয়, তাহা হইলে ভারতসরকারের উচিত চাহিদার উপযুক্ত পরিমাণ রৌপ্য আমদানী করা এবং রৌপ্য মুদ্রা ছাপাইতে হইলে মুদ্রার যথেষ্ট পরিমাণ রৌপ্য রাখিয়া জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা উচিত। প্রায় ৯০০ কোটি টাকার নোটের পরিবর্ত্তে মাত্র ২৮ কোটি টাকার রৌপ্য বাজারে আনিয়া তাহার একাংশ মুদ্রায় রূপান্তরিত করিলেই মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা শেষ হইবে না।

ভারতে হীরকের চাহিদা

বরাবরই আমাদের দেশে হীরকের চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং হীরক চিরকালই সৌখীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীকরূপে এদেশে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় নানা দিক হইতে লোকের অর্থাগম হওয়ায় এবং সঞ্চিত অর্থ সম্বন্ধে লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ায় বহু ভারতবাসী স্বর্ণ ও হীরক কিনিয়া তাঁহাদের বাড়তি অর্থ আটকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় ভারতের পক্ষে বাহির হইতে হীরক আমদানী করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, তবু যত দিন যাইতেছে, ভারতে হীরকের চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ২২ লক্ষ টাকার হীরক আমদানী হয় এবং ১৯৪২-৪৩ সালে আমদানী হয় ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক। ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবে মনে হয় এই আমদানীকৃত হীরকের মূল্য বর্ত্তমান বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছাইবে। হীরক কাটার ও পালিস করিবার ব্যবস্থা ভারতে নাই, বেলজিয়ামের পতনের পর আমষ্টারডাম ও আন্তওয়ার্প হইতে যে সকল হীরকশিল্পী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা বহু রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হীরকের খনিগুলির সহিত এই সকল হীরক শিল্পীকে পাইয়া আশাতীত সুবিধা লাভ করিয়াছে। ভারতের ব্যবসা সম্বন্ধে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি হীরক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের সময় প্রায় ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের হীরক ভারতে পাঠাইয়াছেন এবং ইহা সত্বেও ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যহই নূতন নূতন অর্ডার আসিতেছে। তাঁহাদের যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির চাহিদা মিটাইতে না হইত, তাহা হইলে ভারতের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ তাঁহারা অনায়াসেই দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে পারিতেন। ভারতে ব্যবসা চালাইতে তাঁহারা সবিশেষ উৎসুক কারণ ভারতবর্ষ হীরকের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া থাকে। যে পরিমাণ হীরক ভারতবর্ষের জন্ম বরাদ্দ তাহা এই দেশের বিপুল চাহিদার পক্ষে সত্যই অকিঞ্চিৎকর।

ভারতে মোটর ও রেলইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা

ভারতবর্ষ চিরকাল কৃষিজীবি দেশ থাকিয়া গেলে ইংরাজ রাজশক্তির পক্ষে এখানে ইচ্ছামত রাজত্ব করা যে সহজ হয়, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াই সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় ভারতের শিল্প প্রগতিতে এ পর্য্যন্ত কোন লক্ষণীয় সাহায্য করেন নাই। ইঞ্জিন ও মোটর গাড়ী ছাড়া সভ্যজগতে বাস করা অসম্ভব, অথচ এই সকল অত্যাবশ্যক বস্তুর জন্যও ভারতবর্ষ বরাবর বিদেশের মুখপানে চাহিয়া দিন কাটাইয়াছে। আশার কথা, যুদ্ধকালীন নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ভারতের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের উপেক্ষার ভাবটা বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণ কমিতেছে, তাছাড়া একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের বাস করিতে বাধ্য করার ফল যে কি শোচনীয়, তাহা জাপ আক্রমণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষের বুঝিতে আর বাকী নাই। এই সব নানা কারণে অনেক আবেদন নিবেদনের পর বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও বিড়লার পক্ষ হইতে এদেশে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের দুটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব অবশেষে ভারতসরকার অনুমোদন করিয়াছেন। মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদের মোটর তৈয়ারীর কারখানার মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয়েরও অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। টাটা কোম্পানী ভারতে রেলইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানার জন্য ভারতসরকারের কাছে আবেদন করিয়াছিলেন, ভারত সরকার টাটা কোম্পানীকে কারখানা স্থাপনে অনুমতি দিয়াছেন। জলবিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধার জন্য বাঙ্গালোরে অথবা কয়লার সুবিধার জন্য সিংভূমে অতি শীঘ্রই টাটার ইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহু দুঃখ সহিবার পর ভারতবর্ষ আজ যে যন্ত্রসভ্যতার সাজসরঞ্জাম নিজের ঘরে তৈয়ারী করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে ভারতবাসীমাত্রেই আশান্বিত হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য যাহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে তাহারা আধুনিক যুগের যুদ্ধ বিগ্রহের সময় আত্মরক্ষায় যেমন অশক্ত প্রমাণিত হয়, বাহিরের পণ্যাদির আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও তেমনি দুষ্কর হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগে পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি ভারতবর্ষ যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে।

প্রফুল্ল প্রয়াণে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চির প্রফুল্ল স্বর্ণ কমল
মুদিত হলো রে আজ
যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু মোদের
জ্ঞানের রাজাধিরাজ।
যে রাসায়নিক জানিত রে যাদু
বদ্‌লিয়ে দিলে বাঙালীর ধাতু,
জাতিকে করিল সুপ্রতিষ্ঠ
বিপুল ধরণী মাঝ।

আজি তার মহাপ্রস্থান পথে
জোরে বল্ হরিবল্,
লক্ষ বুকের আলোক মালায়
রোশনাই করে চল্।
ছড়া রে দুহাতে ফুল, খই, কড়ি,
লয়ে চল্ সব গৌরব করি,
বুক ভরা থাক্ আশা উৎসাহ,
চোখ ভরা থাক্ জল।

মৈত্রমী বায়ু এ চিতার ধূম
সবটুকু লহ ভাই,
প্রতিভার বীজ দেশেতে ছড়াও
সোনার ফসল চাই।
বাঙ্‌লা এবং ভারতের মান
বাঙ্‌লা এবং ভারতের দান
বিশ্বে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হউক
তাঁর যে কাম্য ভাই।

পারসীক চিত্রে বোগদাদ শৈলী

(আব্বাসীয় যুগ)

শ্রীগুরুদাস সরকার

পারস্যে চিত্র লিখনের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয় আব্বাস বংশীয় (Abbassids) খলিফাদিগের রাজত্বকালে। পয়গম্বর মহম্মদের আব্বাস নামক এক খুল্লতাত হইতে এ বংশের উদ্ভব। ইঁহাদিগের মোট রাজত্বকাল ৫০৯ বৎসর, খৃঃ অঃ ৭৫০ হইতে খৃঃ অঃ ১২৫৮ পর্য্যন্ত। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন মুসলমান সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রস্থল, বিলাস-বৈভবের আগার বলিয়া পরিচিত সুবিখ্যাত বোগদাদ নগরীতে।

যে শিল্পশৈলী বোগদাদ-পদ্ধতি বলিয়া সুবিদিত বিশেষজ্ঞগণের মতে তাহার উদ্ভব ও প্রসার ঘটে নিকট-প্রাচ্যের (Near East এর) বাইজাণ্টাইন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রভাবে। সে যুগে দামাস্কাস ও সিরীয়ার আলেপো বন্দরে যে সকল চিত্রী ও কারুশিল্পী নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই ছিলেন নাকি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। বোগদাদ-প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মনসুর্ (খৃঃ অঃ ৭৫৭—৭৭৫) বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থনিচয় গ্রীক হইতে আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ দেন। বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ্ তাঁহার পিতামহ মনসুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের অনুবাদ বিভাগ অনেকটা বাড়াইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মামুনের রাজত্বকালে অনুবাদশাখার যে চরম উন্নতি ঘটে তাহার সহিত এ প্রচেষ্টার মোটেই তুলনা হয় না (১)।

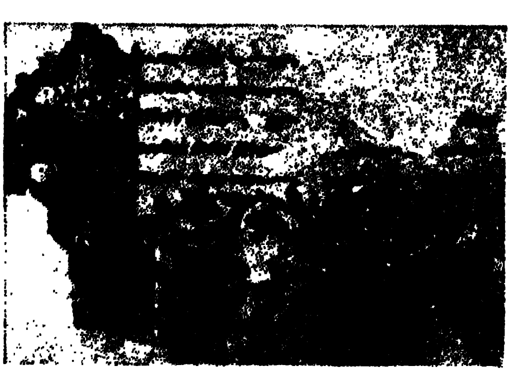
খলিফা মামুন গ্রীক ভাষায় রচিত ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আরব পণ্ডিতদিগের সাহায্যেই ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজ এই সকল গ্রন্থরাজির পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হন। গ্রীক ও রোমকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে সকল গ্রন্থের আরবীয় অনুবাদ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থগুলিই বহুলাংশে চিত্রসম্বলিত। অনুবাদ কার্য্যে যে খৃষ্টীয়ানেরাই নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং চিত্র যোজনা যে তাঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল কোনও কোনও আধুনিক ইউরোপীয় লেখক এইরূপই অনুমান করিয়াছেন।

এ কথা সত্য, যে মামুন নানা দিগ্‌দেশাগত শিল্পী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। প্রাচীন পারস্য ভাষায় (পেহ্লেভিতে) লিখিত গ্রন্থাদি অনুবাদ করার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন য়াহিয়া-বিন্-হারুণ। গ্রীক, সিরিয়াক্ প্রভৃতি ভাষা হইতে অনুবাদের ভার অর্পিত হইয়াছিল লুকের পুত্র কস্তার উপর (২)। আর সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন দুবান নামক এক ব্রাহ্মণ। এই সকল সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডল ব্যক্তিগণের সহিত তদ্দেশীয় চিত্রশিল্পীদিগের আমন্ত্রণও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

আদিতে খৃষ্টীয়ানগণ যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন, দ্বাদশ শতাব্দীতে বোগদাদবাসী বহু শিল্পীই ছিলেন পারসীক বংশসম্ভূত। মামুনের রাজত্বকাল হইতেই বোগদাদের রাজসভায় পারসীক প্রভাব অনুভূত হয়। তাঁহার রাজসভাসদগণ পারস্যদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গৌরব বোধ করিতেন। মামুনের জননী ছিলেন পারস্যদেশসম্ভবা এবং মামুন তাঁহার পারসীক প্রধান অমাত্যের কন্যাকেই সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় পারসীক শিল্পীর উৎসাহলাভ মোটেই কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। আর এক কথা, আরবেরা বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভাবক না হইলেও বিজিত জাতিগণের নিকট জ্ঞান আহরণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। শিল্পকলা বিষয়েও এ কথার সত্যতা অনুভূত হয়। বাইজাণ্টাইনদিগের উপল চিত্র রচনা অর্থাৎ নানা বর্ণের প্রস্তরাদির সন্নিবেশ দ্বারা রচিত মোসেইক্ (Mosaic) নামক কারুশিল্প, এইরূপেই ডামাস্কাস ও আলেপোতে (Aleppoতে) প্রসারলাভ করে।

বোগদাদ শৈলী অন্তর্জাতিক বলিয়া পরিচিত হইলেও এক পারসীক জাতি ব্যতীত অপর কোনও জাতির মধ্যে ইহার প্রসার ও উন্নতি দেখা যায় না। ইহার পূর্ব্বেও যে পারসীক কৃষ্টি শিল্প বিষয়ে একবারে রিক্তশূন্য ছিল না এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কয়েকটি দেওয়াল-চিত্র ব্যতীত সাসানীয় যুগের চিত্র নিদর্শন সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আনুমানিক খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর এই চিত্র কয়েকটিতে বৌদ্ধ প্রভাব ও আদি পারসীক প্রভাব (৩) পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, সাসানীয় শিল্প যে নিজস্ব শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিমান ছিল, প্রস্তরে খোদিত ও রৌপ্য তৈজসাদিতে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি হইতে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। বহিরাগত প্রভাব ইহার মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। শিল্প বৈভবের পুঁজি কিছু না থাকিলে পারসীক শিল্পী বোগদাদ শৈলীর ন্যায় বিভিন্ন একটি শৈলী সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত না। কারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিবিধ রৌপ্য তৈজসে উৎকীর্ণ চিত্রাদি ভিত্তি করিয়া সুধী সার্ টমাস আর্ণল্ড (Sir Thomas Arnold) প্রমাণ করিয়াছেন যে পরবর্ত্তীকালের পারসীক চিত্রে যে সাসানীয় প্রভাব সংক্রামিত হইয়াছিল ইহা ধ্রুব সত্য।

বাইজাণ্টাইন শিল্পধারার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু বোগদাদ শৈলীর উহাই একমাত্র সম্বল নয়। আর এক উপাদান•



১নং মানিচীয় পুঁথির চিত্র

আসিয়াছিল মানিচীয় পুঁথির চিত্র হইতে। পরিমাণে স্বল্প হইলেও উহাতে প্রাচীন পারসীক পদ্ধতির ছাপ স্পষ্টই বিদ্যমান। তুর্কিস্থানে

(১) Syed Ameer Ali's History of the Saracens, p. 258.

(২) এই অনুবাদকটির পরিচয় আরবীয় প্রথায় পিতৃনামসংযোগে ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩) ইহার মধ্যে বীর রুস্তমের মূর্ত্তি ও ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বসদৃশ একটি মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানিচীয় পদ্ধতি ১০৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হারবান্ নগরী মুসলমান প্রভাবমুক্ত ছিল। এখান হইতে প্রাচীন শিল্পের কিছু না কিছু ক্ষীণ ধারায় বহিয়া আসা অসম্ভব নয়। সার্ টমাস্ আর্ণল্ড এইরূপই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তুর্ফান সন্নিহিত খোচো অথবা চোশ্ চো (chotscho) (৪) নামক একটি নগরের পতনের সহিতই তুর্কিস্থানের বিচ্ছিন্ন মানিচীয় শিল্প লয় প্রাপ্ত হয়। সেখানে মানিচীয় পুঁথির যে সকল খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এ শিল্পের মোট পরমায়ু অন্ততঃ চারিশত বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রেও মানিচীয় শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান। পরবর্ত্তীকালে দুঃসাহসিক পারসীক পটুয়া পারগম্বর সন্নিধানে দেবদূত গাব্রিয়েলের আবির্ভাব (৫) এবং আগামিরেক প্রমুখ চিত্রীগণ 'বুরাক' পৃষ্ঠে আরূঢ় হজরৎ সাহেবের স্বর্গদর্শন বিষয়ক যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন (৬) তাহা হয়তো এক শ্রেণীর সচিত্র খৃষ্টীয় পুঁথির (il u;trated missals এর) চিত্র দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু মানিচীয় শিল্পের দেবদূতাদির মূর্ত্তি-সম্বলিত লোকোত্তর Iconographic চিত্রপ্রণালীর সহিত ইরাণবাসিগণ যে অপরিচিত ছিলেন না এ কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না, তাই মানিচীয় পুঁথির দেবদূত প্রভৃতির চিত্র বা এতদ্বিষয়ক লোকপরম্পরাগত প্রবাদ, যে মুসলমান যুগের পারসীক শিল্পীকে এ প্রকার চিত্রাঙ্কণে প্রণোদিত করে নাই, তাহাই বা কে বলিবে ? (৭) শুধু সুরলোকের অধিবাসীদিগের মূর্ত্তি পরিকল্পনার ভঙ্গীতেই নহে, বিশেষজ্ঞেরা এ সকল চিত্রে বর্ণপ্রয়োগ বিষয়েও যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অর্থহীন বা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তাঁহারা বলেন আরবী ও পারসী পুঁথির ক্ষুদ্রক চিত্রে লাজবর্দ্দী নীল নামে অভিহিত যে সুন্দর পাকা নীল (ultra-marine) রঙের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় তাহাও সাসানীয় তথা মানিচীয় চিত্রপদ্ধতি হইতে গৃহীত। অনেকস্থলে যে চৌকোণা প্রসাধক অলঙ্কার ও পুষ্পাকৃতি 'গুল' (ro:ettes) আব্বাসবংশীয়দিগের রাজত্বকালের চিত্রাদিতে ধর্ম্মবাজক প্রভৃতির অঙ্গচ্ছদে চিত্রিত দেখা যায়, তাহাও মানিচীয় যুগের প্রসাধক নক্সার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কবি নিজামী রচিত কোনও গ্রন্থের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে লিখিত একখানি পুঁথিতে "কা'বা" সরীফের যে একটি চিত্র পাওয়া গিয়াছে তৎসন্নিবিষ্ট কোনও ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গে এই প্রকার প্রসাধক চিহ্নযুক্ত অঙ্গচ্ছেদ দৃষ্ট হয়। যে নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা সামান্য হইলেও উপেক্ষনীয় নয় এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া যে চারুশিল্পবিষয়ক অনুমানটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও একবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। এরূপ কোনও একটি প্রসাধক অলঙ্কার যদি চীন হইতে তুর্কিস্থানের পথে পারস্যে পঁহুছিয়া থাকে, তাহাতেও কত কিছু আসে যায় না, যদি তাহা প্রাচীনতর শৈলীতে স্থান পাইয়া পরবর্ত্তীকালে, আব্বাসবংশীয়দিগের যুগে, তৎকালীন পারসীক শিল্পীদিগের তুলিকাসম্ভূত ক্ষুদ্রক চিত্রসমূহে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

আব্বাসবংশীয় খলিফাদিগের উৎসাহে সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুবাদপুষ্ট সদ্গ্রন্থরাজির অভাব ছিল না। তৎকালে রচিত জ্যোতিষ, জলপ্রবাহের গতি—বিজ্ঞান (hydranli:s), বনৌষধির বিবরণ (herbals) এবং যন্ত্রশিল্প এই সকল বিবিধ বিষয়ক আরবীয় পুঁথিতে বোধসৌকর্য্যার্থ নানা বর্ণের চিত্রাদির সন্নিবেশ করা হইত। এই শ্রেণীর সচিত্র বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মধ্যে ১২২২ খৃঃ অব্দে লিখিত ডায়সকোরাইডিস্ (Dioscorides) প্রণীত বনৌষধির বর্ণনা সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ডায়সকোরাইডিস্ কবে বিদ্যমান ছিলেন তাহা স্থিররূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি ছিলেন রোমক বীর অ্যান্টনি (Antony) ও রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার (খৃঃ পূঃ ৩৭-৩০) গৃহ চিকিৎসক ; আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি সম্রাট নীরোর রাজত্বকালেই (খৃঃ অঃ ৩৭-৬৮) চিকিৎসা বিদ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদিতে ছিলেন না কি সাইলিসিয়া অধিবাসী এক সৈনিক পুরুষ, পরে অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এই ভেষজবিষয়ক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন খলিফা মামুন যে সকল গ্রীক গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন ডায়সকোরাইডিসের গ্রন্থখানি তাহারই অন্যতম, এবং মূল পুস্তকের ছবিগুলিরই নকল আরবীয় অনুবাদে স্থান পাইয়াছে। মূল পুঁথিতে কি ছিল না ছিল তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অনুবাদ পুঁথিখানি যে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত এবং সুবর্ণ বর্ণে সমুজ্জ্বল তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। হাল্কা নীল ও যোরাল নীল রঙের মাঝে মাঝে গাঢ় লোহিতের সমাবেশে চিত্রগুলির বর্ণসুষমা অপূর্ব্ব বিকাশলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ এ পুঁথির চিত্রগুলি যে প্রথম শ্রেণীর তাহা স্বীকার না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। এই আরবীয় অনুবাদে যে সকল বৃক্ষলতাদি চিত্রিত রহিয়াছে তাহা আসল গ্রীক গ্রন্থের অনুরূপ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু চিত্রে বিন্যস্ত মানব মূর্ত্তিগুলি বেশে, বর্ণে ও অঙ্কণপদ্ধতিতে মানিচীয় পুঁথির



২নং মানিচীয় পুঁথির চিত্র

চিত্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যদিও বর্ণ ও ছায়াক্রম যে ভাবে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা সমাবেশ কৌশলে রঙীন প্রস্তর ও রত্নাদি খচিত বাইজান্টাইন মোসেইক্ শিল্পের সহিতই বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। অল্ জেজুরি অথবা অল্ জেজাইরি (al Jejure) প্রণীত স্বয়ং চল যন্ত্র (Cautomatic) বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আব্বাসীয় যুগের সচিত্র বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অন্যতম। ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আনুমানিক ১১৮০ খৃঃ অব্দে লিখিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অল্ জেজুরির যে একখানি পুঁথি কুস্তন-তুনিয়ার (Constap'inople এর) সেণ্ট সোফায় (St Sophi:ı)

(৪) ইহার প্রকৃত উচ্চারণ খোশ্ চো হওয়া সম্ভব।

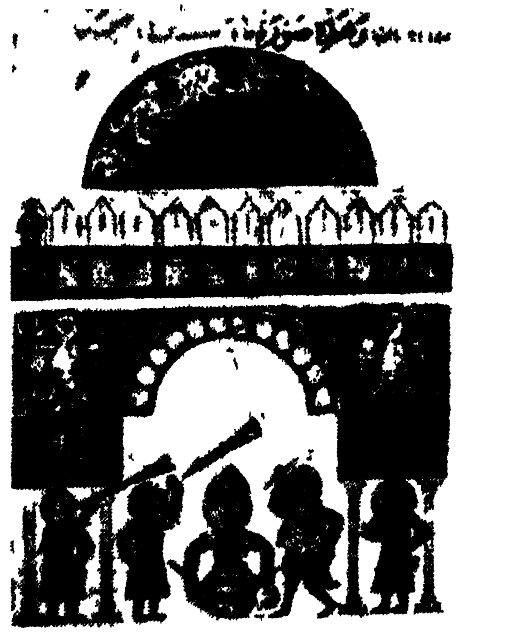
(৫) Plate opp p. 312 Sy'.e's History of Persia reprodu_ed from F, R Martin's Miniature painting of Persia.

(৬) For Prophet's Apocalyp-e and similar other paintings see Arnold's painting in Is'am

(৭) জনৈক আধুনিক শিল্প-সমালোচক এ-অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানিচীয় শিল্পের ঢং ও করণ-কৌশল মুসলমান যুগে, পারস্যে ও মেসোপটেমিয়ায়, ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্রক চিত্রে নিঃসঙ্কোচে গৃহীত হইয়াছিল। ('...the Mahomedan mind appropriated them (The Manichaear teshinqur and decorative mool'if) for miniatures of a theological significance La Massiguon in survay of Perinan Art, Vol III, p. 1935.

পুস্তকাগারে রক্ষিত ছিল, তাহার তারিখ খৃঃ ১৩২৩ অব্দ (৮)। বাগদাদে লিখিত বিজ্ঞানমূলক এই সকল যন্ত্র-তন্ত্রের (hydraulic automatonsএর) বিবরণ খৃঃ ১২০৬ অব্দে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, কিন্তু চিত্রগুলি যে চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরের মেমেলুক সুলতানের রাজত্বকালে (খৃঃ ১৩৪১-১৩৪৫) অঙ্কিত কোনও ব্যাখ্যামালা সম্বলিত (৯) ইহাই অভিমত। এ জাতীয় গ্রন্থ চিত্র ব্যতিরেকে সহজে বোধগম্য হইতে পারে না সুতরাং জেজুরির জীবিতকালেই যে এরূপ গ্রন্থ যথোপযুক্ত চিত্রসহকারে লিখিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

মূলগ্রন্থ বা উহার অনুলিপি এ দেশবাসীর দেখিবার সুযোগ নাই। ইংরাজী ও ফরাসী গ্রন্থে জেজুরি পুঁথি হইতে গৃহীত যে দুই একখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে এই সকল যন্ত্র কিরূপ কৌশলের সহিত শিল্পীদিগের দ্বারা পরিকল্পিত ও চিত্রিত হইত তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার মধ্যে একখানি চিত্র বিশেষ কৌতূহলপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহার উপরিভাগে অর্দ্ধবৃত্তাকারে রাশিচক্র সন্নিবিষ্ট।



অন্‌ মানিচীর পুঁথির চিত্র

দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা, সিংহ, কর্কট, মিথুন, বৃষ ও মেষ রাশি যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিম্নে তোরণ তলে একদল বাদক; দেখিয়া মনে হয় রাজপুরীর নহবতে প্রহরে প্রহরে যে বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে ইহারা যেন তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। দুইজন বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তূর্য্যধ্বনি করিতেছে, আর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অপর দুইজনের মধ্যে একজনের কোমরে বাঁধা তবলা আকারের একটি বাদ্যযন্ত্র, আর অপর ব্যক্তি কাঠি দিয়া ঢোলক বাজাইতেছে—তাহার একটি হাত কাঠি সমেত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত। একজন বাদক, বংশীবাদন ব্যক্তিদিগের ঠিক মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন। উপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে থালার আকারের ন্যায় একটি চর্ম্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র, বাদন দণ্ড দুইটি বাদকের হস্তেই ধৃত হইয়াছে। মনে হয় অদৃশ্য যন্ত্র সাহায্যে এই বাদ্যগুলি বাদিত হইত। তোরণের নিম্নে বারশটি গোলক অর্দ্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত। তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি কৃত্রিম শুকপক্ষী দাঁড়ে ঝুলান রহিয়াছে (১০)।

আরবদিগের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা এতদ্বিষয়ক বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ ফলে ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমে আরব সমাজে ফলিত জ্যোতিষেও যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল তাহার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব নাই। ১২৫০ খৃঃ অব্দে সিরাজবাসী জনৈক পারসীক চিত্রী মিশরের কায়রো নগরে (১১) ফলিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত একখানি পুঁথি নানা চিত্রে বিভূষিত করেন।

জেজুরি পুঁথি হইতে গৃহীত জল ঘড়ির (clepsydra অথবা water clockএর) একটি নক্সায় (১২) বিভিন্ন সূক্ষ্মাংশগুলি অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার অঙ্কণ ভঙ্গী ও অঙ্কন কৌশল চিত্ররচনায় যে পারিপাট্য-সূচিত করে আমাদের বিষয়বস্তুর সহিত তাহার যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। জল ঘড়িটির পরিকল্পনায় যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখা যায়। স্তম্ভ সদৃশ চারিটি আলম্বের উপর একটি গম্বুজ তাহার ভিতর বিচিত্র আকারের কলকব্জা। কোন নলটি ব্যাদিত মুখ সর্পের আকারে কোনটি বা সারসাদি বিহঙ্গমের লম্বমান গলদেশের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত। গম্বুজের চারিপার্শ্বে ঝুলান কার্ণিস তারকাকৃতি প্রসাধক অলঙ্কারে পরিশোভিত। একটি গোলকের বৃত্তাকৃতিমুখে ছুতারের লাটায়ের ন্যায় কি একটা যন্ত্র, তাহার উপর ক্ষুদ্রাকৃতি এক মনুষ্যমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছে। গম্বুজ হইতে একটি শিকল এই মূর্ত্তির স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, সর্পাকৃতি নলের নিম্নার্দ্ধ মূর্ত্তিটির ঠিক মাথার উপরেই চক্রাকারে আবর্ত্তিত। সমগ্র যন্ত্রটি একটি নৌকাকৃতি আধারের উপর বসান। এই আধারের গাত্রে কটোরার ন্যায় একটি পাত্র সংলগ্ন, উপরের আড়কাঠ হইতে লম্বমান একটি শিকল ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। আধারটির একপ্রান্তে খাড়া শুরসার আকারের কোনও যন্ত্রাংশ হইতে, ছোট ঢাকনির মত কি একটা ঝুলিয়া রহিয়াছে। যে জল-বাহিত গতিশীল দ্রব-পদার্থের শক্তিতে এই ঘটিকা যন্ত্র চালিত হইত মনে হয় এই শিকল ও ঢাকনির সাহায্যে তাহা আবশ্যক মত নিয়ন্ত্রিত করা যাইত। পূর্ব্বোক্ত নক্সাটি ১৩৪১ খৃঃ অব্দে লিখিত মূল পুঁথির একখানি নকল হইতে গৃহীত (১৩)। ক্রমশঃ

(৮) E. Blochet in Rupam, January 1930. p. 5.

(৯) A. B. Sakisian in La Miniature Persane du XII au XVII e siecle.

(১০) M. Gaston Migeon প্রণীত Manuel d'art Musulman গ্রন্থে এই চিত্রখানি প্রদত্ত হইয়াছে।

(১১) কায়রো নামটি মঙ্গলগ্রহবাচক 'অল্ কাহিরা' শব্দ হইতে উদ্ভূত।

(১২) এই নক্সাটির একটি প্রতিলিপি Basil Gray প্রণীত Persian Painting গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।

(১৩) অক্সফোর্ড বড্‌লিয়ান (Bodleian) পুস্তকাগারের গ্রীভ্‌স্ (Greaves) সংগ্রহের ২৭ নং পুঁথি হইতে নক্সাখানি লওয়া হইয়াছে। অল্ জেজুরির মূল গ্রন্থের নাম "কিতাব কিমারিফুল অল্ হিয়াল্ অল্ হন্দসিয়া।" বড্‌লিয়ানে রক্ষিত নকলখানি ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে লিখিত।

সাময়িকী

সাময়িক পত্রিকা ও কাগজ নিয়ন্ত্রণ—

গত ১২ই জুন ভারত সরকার Paper control (Economy) order নামক দেশীয় মুদ্রণের কাগজের উপর সম্প্রতি যে হুকুমনামা জারী করিয়াছেন, তাহাতে সাময়িক পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। এই আদেশ জারির ফলে, সাময়িক পত্রিকাগুলির মারফৎ দেশে যে শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব হইত, তাহা হইতে পারিবে না। বহু ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, বহু সংবাদপত্রসেবী বেকার হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক-শিক্ষারও অন্তরায় ঘটিবে। সরকার আকস্মিকভাবে এই আদেশনামা জারী করায় সমগ্র ভারতের পত্রিকা ব্যবসায়ীগণ বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই আদেশজারীর পূর্ব্বে সরকার বিশেষভাবে চিন্তা ও পরামর্শ করিয়াছেন। কাগজ শিল্পীদের তরফ হইতেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই শিল্পটীকে যাহারা বিশেষভাবে বাঁচাইয়া রাখে, সেই পত্রিকা ব্যবসায়ীগণের পরামর্শ বা যুক্তি গ্রহণ করা হয় নাই। উপরন্তু, আকস্মিকভাবেই তাহাদের উপর মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই আদেশ-জারীর পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের পত্রিকা ব্যবসায়ীগণের মতামত ও সুবিধা-অসুবিধার কথা সরকারের চিন্তা করা উচিৎ ছিল।

নয়া দিল্লী হইতে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—দেশী কাগজের মিল সমূহের উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৩০%এ নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কাগজের উৎপাদন ৭০,০০০, হাজার টন। সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন সংখ্যায় বলা হইয়াছে—১,০৯,০০০ টন। আর যুদ্ধের পূর্ব্বে কাগজের উৎপাদন সংখ্যা ছিল—৬০,০০০ টন। কিন্তু উপরোক্ত সংখ্যাগুলি দেখিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান উৎপাদন সংখ্যা শতকরা ৩০%এ নামিয়া আসে নাই। কিন্তু এই সাম্প্রতিক আদেশে মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির শতকরা ৭০% ছাঁটাই করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ একশত পৃষ্ঠার কাগজকে ৩০ পৃষ্ঠার পরিণত করিতে হইবে। একটী প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকায় দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট মনীষীরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে দেশের শিক্ষা বিস্তার ও মননশীলতার পথ সুগম হইয়া থাকে। সুতরাং সাময়িক পত্রিকাগুলির সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ কমাইয়া দেওয়ার একদিকে যেমন শিক্ষা বিস্তারের পথ-রোধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি সরকারের সহানুভূতিহীনতার কথা প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে, শত বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়া সাময়িক পত্রিকাগুলিকে চালাইতে হইতেছে। এমতবস্থায় সরকারের এই আদেশ সাময়িক পত্রিকাগুলির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমানে দৈনিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা কমিয়া গিয়াছে। সে কারণ বিজ্ঞাপনদাতাগণ তাঁহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকাগুলির মারফৎ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ করিয়া প্রচার কার্য্যের সুযোগ ও সুবিধা করিতে পারেন না। সুতরাং অধিকাংশ ব্যবসায়ীকেই বর্ত্তমানে এই সকল মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলি মারফৎ তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রচার কার্য্য চালাইতে হয়। এমতবস্থায় আমরা আশা করি, সরকার বিষয়টী পুনর্বিবেচনা করিয়া সাময়িক পত্রিকাগুলিকে যথারীতি কাগজ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া লোক-শিক্ষার পথে সহায় ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন



পরলোকে অধ্যক্ষ কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
(গত সংখ্যায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের পরিণতি—

২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্পীকার মিঃ নৌসের আলি জানান যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে তিনি আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফলে তখনই বিরোধী দলের নেতা মিঃ এ-কে, ফজলল হকের নেতৃত্বে বিরোধী দলের সকল সদস্য পরিষদ ত্যাগ করেন। তখন বিরোধী দলের সকল সংশোধক প্রস্তাব একে একে উপস্থাপিত ও অগ্রাহ্য হয় এবং সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়—এখনই মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা আরম্ভ করা হউক।

২৫শে মে হইতে এই বিষয় লইয়া পরিষদের সভাপতির (স্পীকার) সহিত বিরোধী দলের বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সভাপতির ইচ্ছামতই কার্য্য হইয়াছে।



পরলোকে ডাঃ বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
(গত সংখ্যায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)



মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সম্বর্দ্ধনা সভায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ
(গত সংখ্যায় এতদ্‌সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)

মন্ত্রীদলে ভাঙ্গন—

গত ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিম্নলিখিত ১১ জন সদস্য মন্ত্রীদল ত্যাগ করিয়া বিরোধী পক্ষে যোগদান করিয়াছেন—(১) ডাঃ মফিজুদ্দীন আহমদ (২) আবদুল লতিফ বিশ্বাস (৩) সাহেদ আলি, মতলব বাজার, ত্রিপুরা (৪) আবদুল হাকিম, খুলনা (৫) খাঁ বাহাদুর আবদুল ওয়াহাব খাঁ (৬) মৌলবী মুস্তাফা আলি দেওয়ান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উত্তর (৭) হাজি মামুদ আলি খাঁ পালি, টাঙ্গাইল দক্ষিণ (৮) খাঁ সাহেব হাতেম আলি জমাদার, পিরোজপুর দক্ষিণ (৯) খাঁ বাহাদুর মহম্মদ অনোয়ারুল আজিম, চট্টগ্রাম দক্ষিণ (১০) রায় সাহেব মনোমোহন দাস, মৈমনসিংহ পূর্ব্ব (১১) শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায়, ঢাকা পূর্ব্ব। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের ব্যবহারই তাঁহাদের দল ত্যাগের প্রধান কারণ—এ কথা তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়া দিয়াছেন।

উড়িষ্যায় মন্ত্রী-সভায় ভাঙ্গন—

গত ২১শে জুন উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী পার্লাকিমেডীর মহারাজা প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে পত্র দিয়াছেন। মাত্র ২ জন সহকর্মীকে লইয়া মহারাজা মন্ত্রিসভা পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণর পুরাতন মন্ত্রীদিগকেই কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন রায়ের পদত্যাগ—

বাঙ্গালার অর্থ-সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বীরেন রায় গত ২০শে জুন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া মতভেদ হেতু পদত্যাগ করিয়াছেন। বীরেনবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা উভয় সভায় সদস্য। তিনি বেঙ্গল মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের সভাপতি। তাঁহার মত তরুণ কর্মীর এই সাহসিকতার জন্য সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব—

গত ২১শে জুন বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পূর্ত্ত ও সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন যে অনাস্থা সূচক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, ৫ ঘণ্টা কাল আলোচনার পর ১০৩-১১৯ ভোটে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ১৯ জন ইউরোপীয় সদস্য সকলেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। মাত্র মিঃ আবদুল জব্বর পালোয়ান নিরপেক্ষ ছিলেন। ইউরোপীয় দল যদি সেদিন নিরপেক্ষ থাকিতেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট পক্ষকে ৩ ভোটে পরাজিত হইতে হইত।

পণ্ডিতের সম্মান—

গত ২৬শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে ১৯৪৩ সালের জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত করিয়াছেন। অতুলচন্দ্র শুধু আইনে পণ্ডিত নহেন, তিনি সুসাহিত্যিক। ঐ দিনই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়কে দুই বৎসরের জন্য 'ভারতীয় চারু শিল্পের বাগীশ্বরী অধ্যাপক' নিযুক্ত করিয়াছেন। ডক্টর নীহাররঞ্জনও পণ্ডিত ব্যক্তি। আমরা উভয়কেই আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম জন্মোৎসব—

গত ২রা এপ্রিল রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় নৈহাটী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-ভিটায় স্যার যদুনাথ সরকার মহোদয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটী-শাখার

উদ্যোগে বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। সভায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র শেঠ, শ্রীযুক্ত শৈলেন লাহা, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাগল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। নৈহাটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণতত্ত্ব সমাগত সুধীবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অনেকে বঙ্কিমপ্রতিভার বিষয় আলোচনা করেন।

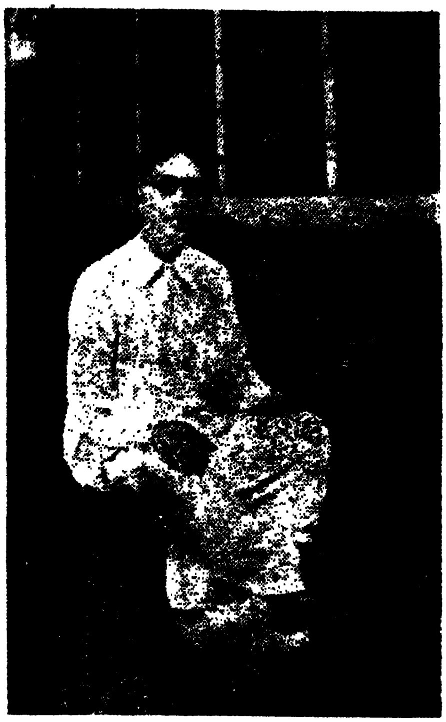
পরলোকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

বিগত ২৮শে মে (১৪ই জ্যৈষ্ঠ) রবিবার প্রাতে বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয় সমাজের নেতা ও বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয় সংসদের সভাপতি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৩ বৎসর বয়সে, তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে, অল্প কয়েকদিন মাত্র রোগ-ভোগের পর অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থনাঙ্কের বহু উর্ধ্বে যে মণীষিগণ বাংলার সমাজকে ও দেশকে পথের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, সতীশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। কর্ম্মারম্ভের প্রথমে তিনি আলিপুরে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। পর পর তিনবার তিনি পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। খ্রীষ্টিয় সমাজের পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও "ইম্মর‍্যাল ট্র্যাফিক বিল্"-এর প্রবর্ত্তন—এই সময়ে তাঁহার দুইটি উল্লেখযোগ্য কাজ। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের এক সভায় খ্রীষ্টিয় সমাজের পক্ষ হইতে, মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল্-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া গিয়াছেন। ৭৩ বৎসর বয়স হইলেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ও অক্লান্তকর্মী ছিলেন।


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরলোকে রায়সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসু—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসু ২১শে জুন বুধবার রাত্রি ১২টার সময়ে সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। হাইকোর্টের চীফ ইণ্টারপ্রীটার হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল এবং লর্ড সিংহ, দেশবন্ধু ব্যারিষ্টার থাকার সময়ে বিচারকালে তাঁহার কৃত অনুবাদ অনমুকরণীয় বলিয়া স্বীকার করিতেন। কলিকাতায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অনেকদিনের, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ডাক্তার ৺নরেন্দ্রনাথ বসুর চিকিৎসা খ্যাতি সুবিদিত। গ্রামের প্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জনবাস


রায়সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসু

তিনি পছন্দ করিতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন বরাকর নদীর তীরে শালনপুর গ্রামে। তাঁহার রচনা সে যুগের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ হইত এবং চৈতন্ত লাইব্রেরীর উদ্বোধনের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। ১৯০০ সালে 'প্রভাতী' নামে একখানি সাপ্তাহিকও তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র কবি প্রভাতকিরণ বসু, স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শিল্পী শ্রীযুক্ত পান্না সেন—

এ মাসের প্রকাশিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্রটী প্রসিদ্ধ আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত পান্না সেনের অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত সেন তাঁহার অঙ্কিত চিত্রটী আমাদের প্রকাশ করিবার সুযোগ দান করায় তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরলোকে গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য—

'পাঠশালা' পত্রিকার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্বর্গত ৺জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান্ গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ 'ম্যালিগন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়া' রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 'তাপসী প্রেস' ও 'পাঠশালা' পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

ই অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত ক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে পুত্রের অধিক স্নেহে সর্ব্বগুণ-র মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার কে সহজেই আকৃষ্ট করিত। তাঁহার অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতি ষ্টার ফলে 'পাঠশালা' পত্রিকা উত্তরোত্তর উন্নতিশীল হইয়া াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৩০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। । অভাগিনী পত্নী, একটী শিশুপুত্র ও দুইটী কন্যাকে শোক-



গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য

র নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রশোকাতুর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দানের মত ভাষা আমাদের ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহাদের এই ণ শোক সহ্য করিবার মত শক্তি দিন।

ট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা—

াগজের ব্যয় সঙ্কোচ সাধনের ফলে গত ৬ই জুলাই হইতে াতা গেজেটের শিক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় সম্বলিত অংশটী া সরকার প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল এবার গেজেটের অতিরিক্ত য় প্রকাশিত হইবে কিনা এ বিষয় অনেকের মনে সংশয় ত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ম্যাট্রিকুলেশন ার ফলাফল সম্বলিত একটী অতিরিক্ত গেজেট মাত্র ৩ শত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঐ গেজেটগুলি সরকার মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ঐগুলির মধ্য বিভিন্ন কলেজে প্রায় দুইশত কপি প্রেরণ করিবেন স্থির ছেন এবং অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি হইতে বিভিন্ন স্কুলে স্ব স্ব ফলাফলের অংশ মাত্র কাটিয়া প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত ছেন। সুতরাং, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরে জনসাধারণের গেজেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিবে না। যাহা হউক, র্থিগণ যে তাহাদের পরীক্ষার ফলাফল জানিবার সুযোগ ইহাই সুখের কথা। কিন্তু প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে? বিশ্ববিদ্যালয় কি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণকে স্ব স্ব ঠিকানায় পত্র দ্বারা জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন?

সাম্প্রদায়িক মীমাংসার প্রস্তাবে মিঃ আমেরী—

গত ১৩ই জুলাই কমন্স সভায় শ্রমিকদলের প্রতিনিধি মিঃ সোরেনসেন ও মিঃ হার্ভের এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন—'আমি শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর সম্প্রতি প্রকাশিত বিবৃতি এবং নিউজ ক্রনিকেল পত্রিকার সংবাদদাতার সহিত গান্ধীজীর আলোচনার বিবরণী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী গান্ধীজীর সহিত যে সকল প্রস্তাব আলোচনা করেন, রাজাজী তৎসম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। ঐ সকল প্রস্তাব সম্প্রতি মিঃ জিন্নাকে জানান হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থা ঘোরালো রহিয়াছে এবং উহা আরও স্পষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিব না। ভারতের এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মীমাংসার জন্য কার্য্যকরী যে কোন প্রয়াস আমি সমর্থন করিব।' মিঃ আমেরীর এই মন্তব্যে মিঃ জিন্না কি কোন বিবৃতি প্রদান করিবেন?

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

ময়মনসিংহের পরলোকগত উকীল শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী (১৬) এ বৎসর (১৯৪৪) আই-এ পরীক্ষায় মহিলা পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং সাধারণ



শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

ভাবে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ভারত গভর্ণমেণ্টের জয়েণ্ট ফাইনান্সিয়াল এডভাইসর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ভগিনী।

আয়ুর্বেদে ধমনী নির্ণয়

ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি (কলিঃ), এম-ডি (বার্লিন), আয়ুর্বেদভূষণ

বর্তমানে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে ধমনী শব্দ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—

১। ধমনী অর্থে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (artery)
২। ধমনী অর্থে জ্ঞান কর্মবাহী পথ (nerve)
৩। ধমনী অর্থে (ক) জ্ঞানকর্মবাহী পথ (nerve) ও (খ) রসবাহী পথ(lymphatic)

শারীর বিজ্ঞান মতে রক্তবাহী পথ (artery), জ্ঞান কর্মবাহী পথ (nerve) ও রসবাহী পথ (lymphatic) এই তিনটি পদার্থ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একমাত্র ধমনী শব্দ দ্বারা এই তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ বুঝাইতে হইলে আয়ুর্বেদ সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের উভয়েরই বিশেষ অসুবিধা। এই জন্ত আয়ুর্বেদ শারীর মতে "ধমনী" প্রকৃতপক্ষে কি নির্দেশ করে এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

১। ধমনী অর্থে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ—artery

রক্তবাহী পথ অর্থে ধমনীর প্রয়োগ প্রায় আয়ুর্বেদের জন্ম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অগ্নিবেশ ও সুশ্রুতের সময় এইরূপ ছিল কিনা জানা নাই কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতায় তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। আয়ুর্বেদে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (artery) ও অশুদ্ধ রক্ত-বাহী পথ (vein) উভয়ের পৃথক বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু শিরা অর্থে সকল সময়ই রক্তবাহী পথ কিংবা রসরক্তবাহী পথ নির্দেশ করে ইহা সর্বজনগ্রাহ্য। অন্ত পক্ষে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন স্থানে বহুবার শিরা ও ধমনী একত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—সপ্ত শিরা শতানি, দ্বে ধমনী শতে (চ-শা-৭।৯) অর্থাৎ শিরা ৭০০, ধমনী ২০০ ; এরূপ চ-সিদ্ধি-১২।৭, সু-সূ-৫।৪, ১১।১৮, সু—শা-৪।৭, ৫।৪৬, সু-চি—৫।৩, ২৪।২০ ইত্যাদি স্থানে শিরা ও ধমনী একত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে ধমনী শিরা হইতে ভিন্ন। এমন কি সুশ্রুত নিজেই বলিয়াছেন—তত্র কেচিদাহুঃ শিরা ধমনী স্রোতসামবিভাগঃ শিরা বিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তত্তু ন সম্যক। অন্যা এবহি ধমন্য স্রোতাংসি চ সিরাভ্যঃ। —সু-শা-৯।২ অর্থাৎ "কেহ কেহ বলেন যে শিরা ধমনী ও স্রোত সকলই একই পদার্থ, ধমনী স্রোত কেবলমাত্র শিরাবিকার। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ধমনী, স্রোত ও শিরা সকলেই বিভিন্ন পদার্থ।" চরকও এই পার্থক্য নির্দেশ জন্ত বলিয়াছেন—"ধ্মানাদ্ ধমন্যঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরনাৎশিরা" চ-সূ ৩০।৩ অর্থাৎ পূরণ হয় বলিয়া তাহাদের নাম ধমনী, স্রবণ হয় বলিয়া স্রোতঃ এবং সরণ হয় বলিয়া তাহাদের নাম সিরা। টীকাকার বলেন— ধ্মাণাৎ অনিল পুরণাৎ, অর্থাৎ ধমনী বাতবাহী অর্থাৎ nerve।

ইহাতেই দেখা যায় ধমনী শিরা এবং স্রোতঃ যে বিভিন্ন পদার্থ এ বিষয়ে প্রাচীন লেখক সকলেই একমত। কিন্তু ব্যবহারের সময় প্রাচীন ও বর্তমান উভয় যুগের লেখকই ধমনী ও শিরা অনেক সময় পর্যায় শব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। সুশ্রুত বলেন, স (রস) হৃদয়াৎ চতুর্বিংশতি ধমনীরনুপ্রবিশ্য... কৃৎস্নং শরীরমহরহ স্তর্পয়তি।—সু-সূ-১৪।৩। অর্থাৎ রস হৃদয় হইতে চতুর্বিংশতি ধমনীতে প্রবেশ করিয়া...সমগ্র শরীর সর্বদা তর্পিত করে।

২। চরক বলেন, রসবহানাং স্রোতসাং হৃদয়ং মূলং দশধমন্যশ্চ।-চ-বি-৫।৪ অর্থাৎ রসবহা স্রোতের মূল হৃদয় ও দশ রসবাহী ধমনী। আরও

২। অর্থে দশ মহামূলা সিরাসক্তা মহাফলাঃ।

তেন মূলেন মহতা মহামূলা মতাদশ।
ওজোবহাঃ শরীরেস্মিন্ বিধম্যন্তে সমন্ততঃ ॥—চ-সূ-৩০।২

অর্থাৎ হৃদয়ে দশটি মহামূলা ও মহাফলা শিরা (ধমনী) সংলগ্ন আছে। হৃদয়স্থ মহামূলা দশ শিরা (ধমনী) ওজোবহন পূর্বক শরীরের সর্বস্থানে বিসর্পিত হয়।

৪। বাগভট্ বলেন, দশমূল শিরা হৃৎস্থাস্তাঃ সর্বংসর্বতোবপুঃ।
রসাত্মকং বহন্ত্যোজস্তন্নিবদ্ধং হি চেষ্টিতম্ ॥—অষ্ট-শা-১৩।১৮

অর্থাৎ হৃদয়ে দশটি প্রধান শিরা আছে, তাহারা সমস্ত শরীরে সর্বদা রসাত্মক ওজঃ বহন করে।

চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের উপরোক্ত উক্তি হইতে দেখা যায় যে ধমনী, শিরা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও পরবর্তী যুগে চক্র-পানি দত্ত (খৃঃ ১০৬০) চরকের উপরোক্ত—"অর্থে দশমহামূলা সিরাসক্তা মহাফলা "—(চ-সূ-৩০।২) এই শ্লোকের টীকা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—অর্থ ইতি হৃদয়ে, মহামূলা ইতি মহৎ হৃদয়ং যাসাং ধমনীনাং তাস্তথা সমাসক্তা ইত্যাশ্রিতা। অর্থাৎ চক্রপানির মতে শিরা ও ধমনী একই পদার্থ কারণ সিরা শব্দের টীকা করিয়াছেন ধমনী।

বর্তমান যুগে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (artery) ও অশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (vein) উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধমনী artery অর্থে ও শিরা vein অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে ইহা লৌকিক ভাষায় বিদ্যমান ছিল। গণনাথ সেন ইহা আয়ুর্বেদ ভাষায় প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রণীত প্রত্যক্ষশারীরম্ (১৯২৪) গ্রন্থে শিরা ও ধমনী এই নূতন অর্থে প্রকাশিত হওয়ার পর এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবাদের উদ্ভব হয়। গঙ্গাধর শাস্ত্রী জোশি (১৯২৪-৩০) প্রভৃতি অনেকে ইহার প্রতিবাদ করেন, অন্তপক্ষে কৃষ্ণ-শাস্ত্রি কাবাডে (১৯২৫-৩৭) প্রভৃতি অনেকে ইহার সমর্থন করেন। গণনাথ সেন (১৯৩১) ইহার যথোচিত মীমাংসা প্রকাশিত করেন। তদবধি আজ পর্যন্ত অনেকে ধমনী, artery অর্থে ব্যবহার করিতেছেন এবং অপর অনেকে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এই মত পোষণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মত ধমনী অর্থে (১) nerve কিংবা (২) কতকগুলি nerve ও কতকগুলি lymphatic।

বর্তমান কালের এই সকল মণীষিদিগের ধমনী সম্বন্ধে বিশেষ মত ভেদ জনিত সমস্যার সমাধান করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হইতে ধমনী সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। আয়ুর্বেদে ধমনী নির্ণয়ই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় সেইজন্ত ধমনী শব্দের (১) লৌকিক অর্থ—যথা—অভিধান বা লৌকিক সাহিত্যে ব্যবহৃত অর্থ এবং (২) বৈদিক অর্থ, অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে যে সকল ধমনী শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহা সায়নাচার্য ইত্যাদি অনায়ুর্বেদীক পণ্ডিতেরা ভাষ্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা হইবেনা। কারণ চরক, বাগভট, চক্রপানি ইত্যাদি আয়ুর্বেদীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেই যখন অনেকস্থলে অসামঞ্জস্য বর্তমান আছে তখন অনায়ুর্বেদীয় পণ্ডিতগণের মত বিবেচনা করিতে হইলে বিষয় জটিলতর হইবে। এমন কি চরক সুশ্রুত গ্রন্থেও যথেষ্ট স্ববিরোধী মত দৃষ্ট হয়। যথা—

সুশ্রুত বলেন—১। সেই রস হৃদয়স্থ চতুর্বিংশতি ধমনীতে প্রবেশ করিয়া...(সু-সূ-১৪।৩)

২। চতুর্বিংশতি ধমনী নাভি হইতে উৎপন্ন...(সু-শা-৯।২)

৩। নাভি সম্ভূত এই চতুর্বিংশতি ধমনীর মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী দশটি ধমনী হৃদয়ে আসিয়া প্রত্যেকে তিন তিন শাখা বিশিষ্ট হইয়া ত্রিংশৎ-সংখ্যক হইয়া থাকে।—(সু-শা-৯।৪)

এস্থলে নাভিস্থ ২৪টি ধমনী ও হৃদয়স্থ ২৪টি ও ১০টি ধমনী এবং নাভিস্থ ২৪টি ধমনীর মধ্যে ১০টির হৃদয়ে গমন ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্বমত বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। আরও সুশ্রুত বলেন—

যাবত্যস্তু শিরাঃ কায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাম্।
নাভ্যাং সর্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ ॥—সু-শা-৭।৩

অর্থাৎ শরীরিগণের যত শিরা সমুদ্ভূত হয় তাহার সকলেই নাভিতে নিবদ্ধ এবং তথা হইতে শরীরের সর্বাবয়বে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এস্থলে নাভিস্থ শিরা ও উপরোক্ত নাভিস্থ ধমনী কি একই পদার্থ? শারীর তত্ত্বমতে নাভি এমন কোন্ স্থান যথা হইতে শরীরের সকল ধমনী ও শিরা উৎপন্ন হইয়াছে? নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে যে সুশ্রুতের মত বিচার করিলে ধমনী অর্থে জ্ঞানকর্মবাহী পথ অর্থাৎ nerve নির্দিষ্ট হয় এবং যেহেতু সুশ্রুতের মতে ধমনী ও শিরা বিভিন্ন পদার্থ তাহা হইলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট শারীরে নাভি এমন কোন্ স্থান যাহা হইতে সুশ্রুতমতে ৭০০ শিরা ও ২৪ ধমনী (সু-শা-৫।৫ সপ্ত শিরা শতানি, চতুর্বিংশতি ধমন্যঃ) এবং চরক মতে ৭০০ শিরা ও ২০০ ধমনী (সপ্তশিরা শতানি, দ্বে ধমনী শতে-চ-শা-৭।৯) উৎপন্ন হয়?

আয়ুর্বেদে ধমনীর কার্য নির্দেশ

সুশ্রুত ধমনীব্যাকরণ অধ্যায়ে (সু-শা-৯ অধ্যায়) ধমনী সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ২৪টি ধমনী নাভি হইতে সমুদ্ভূত। আরও শিরা, ধমনী ও স্রোতঃ তিনটি পৃথক পদার্থ ॥২॥ নাভিসম্ভূত ঐ চতুর্বিংশতি ধমনীর মধ্যে দশটি ঊর্ধ্বগামিনী, দশটি অধোগামিনী ও চারিটি তীর্যগ্‌গামিনী ॥৩॥ ঊর্ধ্বগ দশটি ধমনী নাভি হইতে হৃদয়ে আসিয়া তথায় প্রত্যেকে তিন তিন শাখা বিশিষ্ট হইয়া ত্রিংশৎ সংখ্যক হইয়া থাকে। এই ৩০টির মধ্যে ২টি বায়ু, ২টি পিত্ত, ২টি কফ, ২টি শোণিত, ২টি রস বহন করে (=১০); ২টি শব্দ, ২টি রূপ, ২টি রস, ২টি গন্ধ বহন করে (=৮); ২টি দ্বারা মানব কথা কহে, দুটি দ্বারা শব্দ করে, ২টি দ্বারা নিদ্রা যায় এবং ২টি দ্বারা জাগরিত হয় (=৮); ২টি অশ্রু বহন করে, ২টি স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য কিংবা পুরুষের শুক্র বহন করে (=৪) ॥৪॥ এই বর্ণনা হইতে ঊর্ধ্বগ ধমনীর কর্ম ৩ বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—

(১) বায়ু পিত্ত কফ শোণিত ও রস বহন। ইহা ১০ প্রকার ধমনী দ্বারা বাহিত হয়। শরীর ধারণ ও পোষণের জন্য এই সকল দ্রব্য সঞ্চালন আবশ্যক এবং সেই বহন ও সঞ্চালন ক্রিয়ায় প্রয়োজক এই দশ ধমনী। এই পাঁচ প্রকার পদার্থের প্রত্যেকটির জন্য ২টি করিয়া ধমনী নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য "দ্বে" শব্দের অর্থ দুইটি না বুঝিয়া দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বগত দুই প্রকারের বুঝিতে হইবে।

(২) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের বহন। ইহা ১৬ প্রকার ধমনী দ্বারা বাহিত হয়। ঊর্ধ্বগ ধমনীর কার্য "স্পর্শ" বহন উল্লিখিত হয় নাই তাহার কারণ ইহা তীর্যগ্‌গা ধমনীর কার্য এবং সেই প্রসঙ্গে উহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) অশ্রু, স্তন্য বা শুক্রবহন। এই তিনটিই ক্ষরণ (secretion)।

ইহাতে দেখা যায় যে ঊর্ধ্বগ ৩০ প্রকার ধমনীর কার্য (১) বায়ু-পিত্ত কফ শোণিত রস, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এবং (৩) ক্ষরণ বহন করা। সুশ্রুতও সেই জন্য বলিয়াছেন—ঊর্ধ্বগাঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিত ক্ষুদ্ধসিত কথিতরুদিতাদীন্ বিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি ॥৪॥ অর্থাৎ ঊর্ধ্বগ দশটি ধমনী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভা, ক্ষুৎ, হসন, কথন ও রোদনাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বহন করত শরীর ধারণ করে। এ স্থলে "স্পর্শ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংখ্যা গননার সময় তাহা উল্লিখিত হয় নাই, পক্ষান্তরে তীর্যগ্‌গা ধমনী চতুষ্টয়ের কার্য হিসাবে "স্পর্শ" উল্লিখিত হইয়াছে যথা—"স্পর্শসুখমসুখং বা করোতি॥ ঊর্ধ্বগ এই ৩০টি ধমনীর কার্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কেবল মাত্র দুইটি শোণিত বহন করে বাকী ২৮টি শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি বহন করে। অর্থাৎ এই ২৮টির মধ্যে কোনটিই রক্তবাহী পথ নহে এমন কি কোনটিই সুষিরা অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট পথ নহে। ইহারা সকলেই জ্ঞান কর্মবাহী পথ অর্থাৎ nerve। দুইটি শোণিতবাহী ধমনীও nerve (vasomotor nerve) কারণ ইহারা নিজে রক্তবহন করে না রক্তবাহি পথ (শিরা) দ্বারা রক্ত বহন করায়। দুইটি রসবাহী ধমনীও nerve অর্থাৎ রস বহন করায়। সেই জন্য নির্দেশ করা যাইতে পারে যে ঊর্ধ্বগ সকল ধমনীই nerve। ইহারা কখনও artery হইতে পারে না।

অধোগ ধমনী সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—অধোগ দশটি ধমনী আম পক্বাশয়ে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকটি শাখাত্রয়ে বিভক্ত হয়। এই ৩০টির কার্য—দুইটি বায়ু, দুইটি পিত্ত, দুইটি কফ, দুইটি শোণিত এবং দুইটি রস বহন করে (=১০); দুইটি অন্ন, দুইটি অম্বু (=৪); দুইটি মূত্র, দুইটি শুক্র, দুইটি শুক্রের প্রাদুর্ভাব ও শুক্রক্ষরণ করে এবং স্ত্রীলোকের আর্তব শোণিত, দুইটি পুরীষ নিঃসারণ করে, ৮টি তীর্যগ্‌গামী ধমনী-দিগকে স্বেদ অর্পণ করে (=১৬)।

এই বর্ণনা হইতে অধোগ ধমনীর কার্য প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) বায়ু পিত্ত কফ শোণিত ও রসবহন। ইহা ঊর্ধ্বগ ১০টি ধমনীর কার্য্যের অনুরূপ। প্রভেদ এই যে ঊর্ধ্বগ ধমনী দ্বারা নাভির ঊর্ধ্বদেহে ও অধোগ ধমনী দ্বারা নাভির অধোদেহে এই পাঁচ প্রকার পদার্থ বাহিত হয়। অর্থাৎ এই ২০টি ধমনী (ঊর্ধ্বগ ১০টি ও অধোগ ১০টি) দ্বারা সর্বদেহে বায়ু পিত্ত কফ ইত্যাদি বাহিত হয়।

(২) অন্ন ও অম্বুবহন। অন্ন ও অম্বু অর্থে খাদ্য ও পানীয়। ইহারা প্রাণবায়ু দ্বারা আমাশয়ে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে পিত্তাশয় অর্থাৎ পচ্যমানাশয় বা গ্রহনীতে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া সার অংশ অন্নরস ও অসার অংশ পুরীষে পরিণত হয়। খাদ্যস্থ অন্ন ও অম্বু হইতে উৎপন্ন অন্নরস ৪টি ধমনী দ্বারা বাহিত হইয়া ঊর্দ্ধগত ধমনীতে অর্পিত হয় এবং রসস্থান (=হৃদয়) পূরণ করে।

(৩) মূত্র পুরীষ আর্তবশোনিত ও স্বেদ এই সকল মল পদার্থ এবং শুক্র, ১৬টি অধোগ ধমনী দ্বারা বাহিত হয়।

সুশ্রুত ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন—অধোগমাস্তু বাতমূত্রপুরীষ শুক্রার্তবাদীন্যধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়মভিপ্রতিপন্নাস্তত্রস্থমেবান্নপানরসং বিপক্বমৌষ্ণ্যাদ্ বিবেচয়ন্ত্যোঽভিবহন্ত্যঃ শরীরং তর্পয়ন্তি, অর্পয়ন্তি চোর্ধ্বগতানাং রসস্থানকাভিপূরয়ন্তি, মূত্রপুরীষ স্বেদাংশ্চ বিবেচয়ন্তি, আমপক্বাশয়ান্তরে চ ত্রিধা জায়ন্তে তাস্ত্রিংশৎ। তাসাস্তু বাতপিত্তকফ শোনিত রসান্ দ্বে দ্বে বহতস্তা দশ...॥৬॥

অধোগ এই ৩০টি ধমনীর কার্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ঊর্ধ্বগ ধমনীর মত দুইটি শোণিতবাহি ভিন্ন অন্য কোনওটিই শোণিতবহন করেনা। অতএব এই ৩০টির মধ্যে কোনওটি artery নহে। ঊর্ধ্বগ ৩০টির মত অধোগ ৩০টিও nerveরূপে রস, রক্ত, মূত্র, পুরীষ, আর্তব-শোনিত, স্বেদ ইত্যাদি বহন করায়। শোনিতবাহী দুইটি ধমনীও এ স্থলে vasomotor nerve। রসবাহী ধমনীও nerveরূপে রসধাতু দ্বারা অন্নরস অন্ত্র হইতে রসস্থানে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে বহন করায়।

তীর্যগগামী ধমনী চতুষ্টয় সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—তীর্যগ্‌গানান্তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধাচোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে তাস্ত্বসংখ্যেয়াঃ। তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততঞ্চ। তাসাং-মুখানি রোমকূপ প্রতিবদ্ধানি; যৈ স্বেদমভিবহন্তি রসঞ্চাপি সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ, তৈরেবচাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনবীর্য্যাণ্যন্তঃ শরীরমভিপ্রতিপদ্যন্তে ত্বচি বিপক্কানি, তৈরেবচস্পর্শংসুখমসুখংবাগৃহ্নাতি। তাস্ত্বেতাশ্চতস্রো ধমন্যঃ সর্বাঙ্গগতাঃ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ ॥৮॥

অর্থাৎ তীর্যগ্‌গামী ধমনী চতুষ্টয় প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শতসহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা এই শরীর গবাক্ষিত (জালব্যাপ্তবৎ) বিবদ্ধ ও আতত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল ধমনীর মুখ রোমকূপে প্রতিবদ্ধ এবং সেই মুখ দ্বারা ইহারা (১) স্বেদ বহন করে, (২) রস বহন করিয়া শরীরকে অভ্যন্তরে ও বাহিরে সন্তর্পিত করে, (৩) অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহ ও প্রলেপ ইহারা ত্বকে (ভ্রাজক) পিত্ত দ্বারা বিপক্ক হইলে ইহাদের বীর্য এই ধমনী মুখ দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশিত হয়। (৪) ঐ মুখ দ্বারাই স্পর্শ সুখ বা অসুখ অনুভূত হয়।

এই বর্ণনা হইতে তীর্যগ্‌গামী ধমনীর কার্য প্রধানতঃ ৪ প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহাদের সংখ্যাও ৪টি। এই সংখ্যা উক্ত ৪ প্রকার কার্য নির্দেশ না করিয়া শরীরের ৪ অংশ নির্দেশ করে। তাহার কারণ প্রসঙ্গে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"যতস্রোধমন্যঃ সর্বাঙ্গগতা" অর্থাৎ এই তীর্যগ্‌গা ৪টি ধমনী সর্বাঙ্গগত ॥৮॥ ঊর্দ্ধ্বগা শব্দে ঊর্দ্ধ্বকায়গত অর্থাৎ নাভির ঊর্দ্ধ্বে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবা ও বাহু, শরীরের এই অংশ নির্দেশ করে। যথা—"এতাভিরূর্দ্ধ্বংনাভেরুদরংপার্শ্ব পৃষ্ঠোরঃ স্কন্ধ গ্রীবাবাহবো ধাপ্যন্তেচ ॥৪॥

অধোগ শব্দে অধোকায় গত অর্থাৎ নাভির অধোভাগে পক্কাশয়, কটি, মূত্রাশয়, পুরীষাশয়, গুহ্য (মল দ্বার), বস্তি, মেঢ্র ও সক্থি নির্দেশ করে যথা—এতাভিরধোনাভেঃপক্কাশয়কটীমূত্রপুরীষগুদবস্তি সক্থীণি ধার্যন্তে যাপ্যন্তেচ ॥৬॥ এবং তাহা আমপক্কাশয়ের অন্তর্গত স্থানগুলিতেই কার্য করে কারণ অধোগ ১০টি ধমনী—আমপক্কাশয়ান্তরে চ ত্রিধা জায়ন্তে। এবং এই ৩০টি ধমনী উদর গহ্বরেই তাহাদিগের কার্য নির্বাহ করে। সেইরূপ তীর্যগশব্দে শাখা প্রশাখায় সর্বাঙ্গগত নির্দেশ করে ॥৮॥ শরীরাবয়বের মধ্যে বাহুদ্বয় ধমনী ঊর্দ্ধ্বগ ধমনীর অন্তর্গত কিন্তু নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ সক্থির নিম্ন প্রদেশ অধোগ ধমনীর অন্তর্গত নহে সেই জন্য নিম্নাঙ্গ এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ তীর্যগ্‌গত ধমনীর অন্তর্গত। সর্বশরীরের বহির্ভাগস্থ চর্মের এবং দুই হস্ত দুই পদ এই ৪ অঙ্গের ধমনীও ৪টি তীর্যগ-গত ধমনীর অন্তর্গত ধরিতে পারা যায়।

তীর্যগগত এই ৪টি ধমনীর কার্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কোনওটিই রক্ত বহন করেনা। অর্থাৎ কোনওটিই artery হইতে পারে না।

সুশ্রুত ঊর্দ্ধ্বগ ৩০টি, অধোগ ৩০টি ও তীর্যগ্‌গ ৪টি মোট ৬৪টি প্রধান ধমনী ও তাহার শতসহস্র শাখাপ্রশাখার বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৪টি শোণিতবাহি ধমনীর কথা বলা হইয়াছে বাকী সকলগুলিই বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, নিদ্রা, জাগরণ, অশ্রু, স্তন্য, শুক্র, অন্ন, অম্বু, মূত্র, পুরীষ, স্বেদ ইত্যাদি বহন করে। ধমনী যে এই সকল বহন করে ইহাতে কি ধমনীকে artery কল্পনা করা যাইতে পারে? artery কখনও মূত্র, পুরীষ, অশ্রু, স্বেদ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি বহন করিতে পারে না। অন্যপক্ষে টীকাকার এই প্রসঙ্গে বলেন যে ধমনী নিজে ঐ সকল পদার্থ বহন করে না, ধমনী ঐ সকল পদার্থ বহন করায়। প্রমাণ স্বরূপ ব্যাকরণের নির্দেশ দেন "অন্তর্ধাবি নিচ্" অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত অর্থে নীচ্।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে শারীরতত্ত্ব মতে এমন কি পদার্থ আছে যাহা শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্বশরীরে এমন কি প্রতিরোমকূপে গমন করিয়াছে এবং উপরিউক্ত দেহের সর্ববিধ দ্রব্য বহন করায়? ইহা nerve ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। "তৈরেব চস্পর্শং সুখমসুখং বা গৃহ্নাতি" অর্থাৎ উহাদের দ্বারাই স্পর্শ সুখ বা অসুখ অনুভূত হয়। ইহা বর্তমান বিজ্ঞানমতে একমাত্র nerve এর ক্রিয়া।

আয়ুর্বেদে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তবাহী অর্থাৎ artery ও vein অর্থে সকল সময়ই শিরা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শিরা অর্থে vein ও ধমনী অর্থে artery কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। ধমনী ব্যাকরণ অধ্যায় ভিন্ন আয়ুর্বেদে অনেকস্থলে ধমনীর উল্লেখ আছে। তাহাদের মধ্যে ধমনী রস-রক্ত বহন করে এইরূপ বাক্য যে সকল স্থানে উক্ত হইয়াছে তাহাতে ধমনী nerve রূপে রসরক্ত স্রোত দ্বারা ঐ সকল বহন করায় এই অর্থে ধরিতে হইবে।

স্রোতঃ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—প্রাণবহ, অন্নবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, মেদোবহ, মূত্রবহ, পুরীষবহ, শুক্রবহ ও আর্ত্তববহ এই সকল স্রোতেই শল্যতন্ত্রের অধিকার।-সু-শা-৯।১২। এই স্রোতঃগুলির মধ্যে প্রাণবহ স্রোতগুলি nerve, রসবহ ও রক্তবহ স্রোতগুলি artery, vein ও lymphatics; অন্নবহ, উদকবহ ও পুরীষ বহ স্রোতগুলির অপর নাম মহাস্রোত অর্থাৎ alimentary canal। ধমনীই এই সকল স্রোতগুলির চালক। ধমনী nerve রূপে সকল প্রকার স্রোত দ্বারা নিজ নিজ বিশেষ দ্রব্য বহন করায়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের প্রদীপশিখা নিভে গেল আজ,
সুনিবিড় অন্ধকারে লুকাইল চিরতরে ত্যাগীর সে সাজ;
দীনের কুটীরে তুমি একদিন এসেছিলে জ্ঞানের বর্তিকা লয়ে,
সেই আলো ধীরে, ধীরে, কুটিল আঁধার চিরে, ফুল্লজ্যোতি হয়ে
তোমার জ্ঞানের বাণী, জ্ঞানী, গুণী নিল মানি, দেশে ও বিদেশে,
নির্বিকার ঋষি তুমি, জ্ঞানের সাধক নিষ্ঠ পর্ণপুটে এসে

দেশ সেবা করেছিলে জীবনের ব্রত লয়ে, ভিখারীর সাজ,
দিকে দিকে পীড়িতের, গৃহে গৃহে অভাগার, আঁখি ঝরে আজ,
শিশুর সারল্য মাখা, আরক্ত সে আঁখিমাঝে বহ্নি ছিল ভরা,
দীনবন্ধু ছিলে বটে, অন্যায়ের নাগপাশে দাও নাই ধরা;
প্রস্তর ফলকে আর তৈলচিত্রে হবেনাক স্মৃতিরক্ষা তব,
ভিখারীর ঝুলি ল'য়ে সেবাব্রতী শিখিবে সে পূজা অভিনব!

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

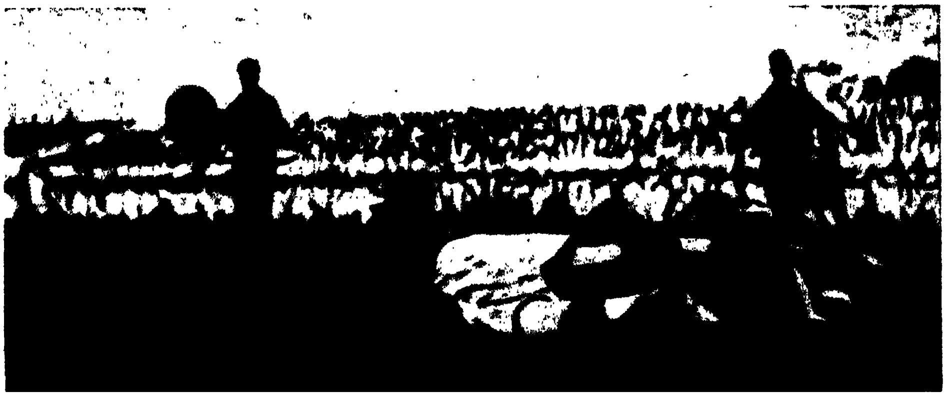


৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বন গোলরক্ষক। তার কাজ বলটি বাধা দেওয়া যেন গোলপোষ্টের মধ্যবর্ত্তী গোল লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম না করে। গোলরক্ষক গোল লাইন থেকে অনুমান এক ফুট সম্মুখে অবস্থান করবে। কারণ হাত থেকে বল দৈবাৎ চলে গেলে গোল-রক্ষক পুনরায় বলটি আয়ত্বে আনতে পারবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং দূরদর্শিতা গোলরক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য্য। খেলার গতিবিধি দেখে ক্ষিপ্রগতিতে Position নিতে হবে এবং অদম্য সাহসে একাগ্রতার সঙ্গে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সম্মুখীন হ'তে হবে।

গোলরক্ষকের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে 'Safety First'. তার পিছনে দলের আত্মরক্ষার আর কোন ব্যবস্থা নেই, কেবল দর্শকরা আছে, যারা তার দোষ ত্রুটীর কঠোর সমালোচনা করতে ছাড়বে না। বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই গোলরক্ষক বলটি প্রথমেই মধ্যে যদি কোন বিচারের ভুল থাকে তাহলে ক্রিকেটের 'রাণ আউটে'র মত শোচনীয় পরিণাম হবে, বিপক্ষের ফরওয়ার্ড এই সুযোগে বলটির কাছে আগে পৌঁছে বলটি একপাশে ট্যাপ ক'রে গোলের মধ্যে সরাসরি ঢুকে যাবে।

বিপক্ষের আউট সাইড খেলোয়াড় উইং থেকে বলটি সেণ্টার না করে গোলের দিকে অগ্রসর হ'লে গোলরক্ষক গোল লাইন থেকে কয়েক গজ এগিয়ে নিশ্চিত গোলের সম্ভাবনা দূর করতে পারে। এক্ষেত্রে গোলরক্ষক বেশী দূর অগ্রসর হবে না কারণ এই সুযোগে বিপক্ষের ইনসাইড খেলোয়াড়দের বলটি পাশ করলে তারা অনায়াসে বিনা বাধায় গোলের মধ্যে বলটি সট করবে। বিপক্ষের সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিম্বা ইনসাইড খেলোয়াড়কে গোলের সামনের রক্ষণভাগ অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে দেখলেই গোল রক্ষক সোজা দ্রুত-গতিতে গোল ছেড়ে অগ্রসর হবে বলের সট প্রতিরোধ করতে।



বডি থ্রো করে গোলরক্ষক গোল রক্ষা করছে

বাধা দিবে এবং বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় না ক'রে বলটি বিপদ গণ্ডীর বাইরে পাঠাবে।

বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গোলের নিকটবর্ত্তী হ'লেই বিপদও ঘনীভূত হয়ে উঠবে। খেলার এই অবস্থায় বিপক্ষের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্যাক দু'জনের মাঝ পথে 'through pass'এর অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকবে। গোলের মুখে সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলটির কাছে পৌঁছে সট করার পূর্ব্বেই গোলরক্ষক দৌড়ে গিয়ে বলটি বিপদ গণ্ডীর বাইরে পাঠাবে। গোলরক্ষকের 'দৌড়ানো'র

বিপক্ষের আউট সাইড খেলোয়াড় গোলের উদ্দেশ্যে ভিতরে অগ্রসর না হলে গোলরক্ষক কখনও গোল ছেড়ে এগিয়ে যাবে না। গোলরক্ষক গোলের মধ্যে অবস্থান করলে বিপক্ষের আউট সাইডের চমৎকার কোনাকুনি সটগুলি সকল সময়েই গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে না। গোলরক্ষক এগিয়ে গেলে বিনা বাধাতেই বলটি গোলের জালে প্রবেশ করবে। গোলরক্ষক কখনই গোল ছাড়বে না যে পর্য্যন্ত বিপক্ষকে tackle করবার কিম্বা তার সট প্রতিরোধ করবার সম্ভাবনা থাকবে।

খেলায় anticipation আত্মরক্ষার পক্ষে গোলরক্ষকের প্রধান অস্ত্র। বলের গতিপথ জানবার এবং অনুমান করবার দক্ষতাই তাকে গোলে position নিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। দূর পাল্লার (Long range) যে কোন কোনাকুনি বল (at any angle) এবং নিকট দূরত্বের সোজা বল সে গোলের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সম্মুখীন হবে। কিন্তু দলের এক পাশের রক্ষণভাগ অতিক্রম করে বিপক্ষকে গোলের মুখে অগ্রসর হতে দেখলে গোলরক্ষক গোলের সেই দিকে position নিয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব বিপক্ষ 'cross shot' করবে। সুতরাং গোলরক্ষক তার নিকটবর্ত্তী গোলপোষ্ট থেকে নিজেকে এমন ব্যবধানে রাখবে যে, বিপক্ষ সেই দিকের কোণে বলটি সট করলে 'body throw' ক'রে বলটি প্রতিরোধ করতে পারবে এবং অন্যদিকে বিপদজনক 'cross shot' পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত থাকবে।

গোলরক্ষক বিপক্ষের ফরওয়ার্ডদের দুর্ব্বলতা এবং সেই সঙ্গে তাদের বল সট করার অভিনবত্ব অনুসন্ধান করবে। প্রথম শ্রেণীর ফরওয়ার্ড দু'পায়েই সমানভাবে বল সট করতে অভ্যস্ত। কিন্তু রক্ষণভাগের চাপে পড়লে তারা তাদের বেশী অভ্যস্ত পায়েই বল সট করে। এই অভ্যস্ত পায়ের সন্ধান পেলে গোলরক্ষক position নিয়ে দাঁড়িয়ে বলটি প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট সুবিধা পাবে। যারা কেবল এক পায়েই বল সট করতে অভ্যস্ত তাদের আয়ত্বে আনা গোলরক্ষকের পক্ষে সুবিধা। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিচু হয়ে বলে হাত পাবার সময় পাওয়া যাবে না বলেই একমাত্র নিকট দূরত্বের শক্ত সট প্রতিরোধ করতেই গোলরক্ষক পা চালাবে। এই একটিমাত্র সময় ছাড়া গোলরক্ষক কখনও পা দিয়ে বল ধরবে না।

গোলের মুখে 'Lob shot'গুলি গোলরক্ষকের পক্ষে বিপদজনক বলেই বিপক্ষের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়রা দ্রুতগতিতে গোলে উপস্থিত হয়। বলটি ধরে আয়ত্বে আনতে গোলরক্ষক খুব কম সময়ই পায়। উঁচু বল ঘুসি দিয়ে পার করতে অসুবিধা হবে না কিন্তু নিচু বল এলে ঘুঁসি চালিয়ে সুবিধা হবে না। নিচু বলগুলি গোলরক্ষক হাত দিয়ে ধরেই আয়ত্বে আনবে। কিন্তু একটা বিপদ যে, বলটি পা দিয়ে পাঠাবার পূর্ব্বেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা গোলরক্ষকে ঘিরে তাকে বলটি 'ড্রপ' ফেলতে বাধ্য করতে পারে। গোলরক্ষ এ ক্ষেত্রে বিপক্ষের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে বলটি মারবে কিম্বা শেষ চেষ্টা করবে বলটি তাদের নাগালের বাইরে ধরে পাশে ঘুরে কাঁধ দিয়ে তাদের বাধা দান করবে। বিপক্ষ বেসামাল হলেই গোলরক্ষক বলটি clear করতে সময় পাবে। গোলের কয়েক গজ দূরে বিপক্ষের আউট লাইনের সেণ্টারগুলি গোলরক্ষক কখনই বিপক্ষকে মাথা পেতে নিতে দিবে না। 'Right' এই শব্দের সঙ্কেতে গোলরক্ষক সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি ধরবে কিম্বা ঘুসি মেরে বিপদ গণ্ডীর সীমানার দূরে পাঠাবে। যে খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে বলটি পাঠান হচ্ছে তার অবস্থানের উপর বলটি ধরা কিম্বা ঘুঁসি মারা নির্ভর করছে। গোলের মুখ থেকে বলটি দূরে পড়লে গোলরক্ষক position নিয়ে দাঁড়াবে সট কিম্বা হেড প্রতিরোধ করতে।

বলটি জলসিক্ত কিম্বা পিচ্ছিল না হ'লে গোলরক্ষকের Glove ব্যবহারের খুব বেশী প্রয়োজন নেই। বৃষ্টির দিনে কিন্তু একজোড়া Woollen Glove একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে, Gloveএর মধ্যে আঙ্গুলগুলি যেন স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করা যায়। বৃষ্টি কিম্বা ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে শরীর গরম রাখতে গোলরক্ষক অতিরিক্ত জামা ব্যবহার করবে এবং বিপক্ষের গোল সীমানায় বলটি থাকাকালীন গোলরক্ষক নিজের গোলে পাচারি ক'রে শরীর সতেজ রাখবে।

হেডিং ঃ

'হেড' দেওয়া কথাটার নিছক অর্থ অনুসরণ ক'রে খেললে কিন্তু ভুল করা হবে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে মাথার উপরিভাগ দিয়ে বলটি খেললে বলটিকে যথাযথ লক্ষ্য করতে পারা যাবে না বরং আহত হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া এর ফলে বলটি সোজা মাথার উপরই উঠে প্রায়ই তার কাছাকাছি স্থানেই পড়বে। হেড দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে বলটি খেলতে হয় কপালের উপরিভাগের অংশ দিয়ে। মাথার সম্মুখভাগের এই অংশ শক্ত এবং পুরু তাছাড়া বল এবং কপালের সংঘর্ষের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলের ওপর চোখ নিবদ্ধ করতে পারা যায়। বলটি মাথার উপর পড়ে বাধা পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। রীতিমত ঘাড় সঞ্চালনে বলের উপর একটা ধাক্কা মারতে হবে। তা না হলে বলটি মাথার উপর বাধা পেয়ে বেশী দূর যেতে পারবে না। বলের উপর মাথা যত জোরে খেলবে কষ্টের তত লাঘব হবে।



বিখ্যাত গোলরক্ষক ডেভিস্‌ বডি থ্রো করেছেন

মাথা দিয়ে বলটি খেলবার পূর্ব্বেই একপাশ ফিরবে ঘাড়টি সহজভাবে ফেরাবার জন্যে; বলটি খেলতে হবে ঠিক ভুরুর কাছাকাছি এলেই। মাথা দিয়ে বল খেলার সময় কখনও চোখ বন্ধ রাখতে নেই। যথার্থ মাথা দিয়ে বল খেলতে হ'লে ঘাড়ের মাংসপেশীর কর্ম্মতৎপরতা প্রয়োজন। এই মাংসপেশীর প্রভাবেই

বলটিকে ইচ্ছানুরূপ যে কোন দিকের দূরত্বে পাঠান যায়। সুতরাং ঘাড়ের মাংসপেশীর রীতিমত ব্যায়াম প্রয়োজন। 'হেড' দিতে গিয়ে সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে। সময়ের জ্ঞান থাকলে নির্দ্দিষ্ট সময়েই বলের সঙ্গে কপালের সংঘর্ষ হবে নতুবা বলটি মাথার চাঁদিতে পড়বে কিম্বা বলটি অতিক্রম ক'রে যাবে। বলটি খেলবার ঠিক পূর্ব্বেই মাটি ছেড়ে লাফাতে হবে। যথাসময়ে ঘাড়টি সামনে সঞ্চালন করলে বলটিকে বেশী দূরত্বে পাঠাতে পারা যায়। খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য হবে মাথা দিয়ে বলটি খেলে দলের লোকের যতদূর সম্ভব পায়ের কাছে বলটি ফেলা। এই উদ্দেশ্যে দেহটি সামনে এগিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টিও সামনে সঞ্চালন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে খেলোয়াড়ের চিবুক নীচু থেকে টেনে আনলে পর বলটির গতি মাটির দিকে আনা যাবে। পাশের দিকে বলটি পাঠাতে হলে কপালের একপাশ দিয়ে বলটি খেলে ঘাড়টি দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে দিতে হবে। যেদিকে খেলোয়াড় বলটি পাঠাতে চায়।

মাথা দিয়ে বলটি খেলতে হ'লে মাটি ছেড়ে লাফানো এবং লাফানোর সময় সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান উল্লেখযোগ্য। একজন খর্ব্বাকৃতি খেলোয়াড় নিভুল সময়ের জ্ঞানে লাফিয়ে বিপক্ষের দীর্ঘাঙ্গী খেলোয়াড়কে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারে।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় মোহন-বাগান দল অগ্রগামী আছে। ২০টা খেলায় ১৫টা জিতে, ৪টাতে 'ড্র' ক'রে এবং ১টায় হেরে ৩৪ পয়েন্ট পেয়েছে। লীগের প্রথমার্দ্ধে ১২টা খেলাতে ২১ পয়েন্ট ছিল। প্রথমার্দ্ধের শেষ খেলায় মোহনবাগান বি এণ্ড রেলদলের কাছে ১—০ গোলে প্রথম হেরে যায়। তাছাড়া ডালহৌসির সঙ্গে 'ড্র' করে ১ পয়েন্ট নষ্ট করে। লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রেলদলকে হারিয়ে পূর্ব্ব পরাজয়ের শোধ নিলেও তারা ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউ নয়ন এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলা 'ড্র' করেছে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের গোল দেবার ব্যর্থতাই এর একমাত্র কারণ। অতি সহজ বল পেয়ে এবং গোল দেবার সহজ সুবিধা পেয়েও অযথা দেরী ক'রে বিপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে নয় লক্ষ্য বস্তু এড়িয়ে বল মেরেছে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র নির্ম্মল চ্যাটার্জির খেলাই উল্লেখযোগ্য। চ্যাটার্জি দলের খেলোয়াড়দের গোল দেবার বহু সহজ সুযোগ দিয়ে এসেছেন; দুঃখের বিষয় তার এক ভাগ কাজে লাগালেও অপেক্ষা কৃত দুর্ব্বল দলের কাছে খেলা 'ড্র' হ'ত না। রক্ষণভাগের হাফলাইন সব দিন সমান খেলে না। একমাত্র অনিল দের খেলাই উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পরে ক্যালকাটা মাঠে আমরা সত্যিকারের একজন একনিষ্ঠ অধিনায়ক দেখলাম। দলের জয়লাভের জন্যে খেলার শেষ পর্য্যন্ত তাঁর চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এ ছাড়া ফরওয়ার্ড লাইনে যথাযত বল সরবরাহ ক'রে তিনি বহু গোল দেবার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন। শরৎ দাস এবং পান্নার খেলা এবং পরস্পর বোঝাপড়া খুবই ভাল। দু'জনের খেলার মধ্যে একনিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোলরক্ষক এই কারণেই অনেকখানি নিরাপদে সুস্থিরে খেলতে পারছে। দ্বিতীয় স্থানে মহমেডান স্পোর্টিং উড়ে এসে যেন জুড়ে বসেছে। মহমেডান দলের ২০টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট। অনেকে ভেবেছিল মহমেডান স্পোর্টিং লীগ তালিকায় এবার বিশেষ কিছু স্থান নিতে পারবে না। মোহনবাগান এবং ইষ্ট-বেঙ্গলের অক্ষমতার জন্যই তারা নিজেদের অবস্থা অনেকখানি ফিরিয়ে নিয়েছে। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিক থেকে মহমেডান দল পূর্ব্বের তুলনায় অনেকখানি দুর্ব্বল। তৃতীয় স্থানের ইষ্ট-বেঙ্গল দল ২১টা খেলে ৩২ পয়েন্ট পেয়েছে। ৩টে খেলায় হেরে এবং ৪টে খেলায় 'ড্র' করে তারা অনেকখানি পিছনে পড়ে গেল। ইষ্টবেঙ্গল দলের ফরওয়ার্ড লাইনও মোহনবাগানের মত গোল কাণা হয়েছে। তাদের অনেক খেলা 'ড্র' হয়েছে ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার জন্য। রক্ষণভাগে ব্যাক এবং হাফ-ব্যাকদের খেলা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। গোলে কে দত্তের খেলা বহুবার দলের সম্মান রেখেছে। লীগ তালিকায় মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। আগে থেকে কিছু বলা কঠিন কারণ খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলতে কিছু নেই। যে দুর্ব্বল দলকে ৭ গোলে হারিয়ে দেবার কথা সেখানে 'ড্র' কিম্বা 'হার' হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। এ অক্ষমতা ক্লাবের সমর্থকদের পক্ষে পীড়াদায়ক বৈকি!

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে "রামের সুমতি" ("রঙমহলে" অভিনীত)—১।০

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মিলনের মন্ত্রমালা"—৪৲

সুবোধ বসু প্রণীত কৌতুক নাটিকা "তৃতীয় পক্ষ"—।৵০

শ্রীবীণাদেবী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পুরুষের মন"—২৲

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাট্য-সাহিত্য "নাট্য-ভারতী"—১।০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত পরলোক-তত্ত্ব "লোকান্তর"—২।০

মৌলভী রেজাউল করীম প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান-সমাজ"—২৲

শ্রীসরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (উপন্যাস) "মিলন রাখী"—২।০

সব্যসাচী প্রণীত শিশু-উপন্যাস "ব্রাহ্মহাউণ্ড"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী - শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী   অতীতের সাক্ষী   ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



ভাদ্র—১৩৫১

প্রথম খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

আধুনিক জগতে ধর্ম্ম ও সমাজ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ইতিহাসের প্রাক্তন কাল হইতে মানব জাতির উপর ধর্ম্ম ও সমাজের যুগ্ম প্রভাব—যেখানে সমাজ ধর্ম্মকেও সেইখানে দেখিয়া সহজে মনে হইতে পারে, উভয়ের ক্রম-বিকাশ দুইটি সমান্তরাল রেখা ধরিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত বোধকরি সঙ্গত হইবে না। বরঞ্চ ইহাই অধিকতর সত্য যে গোষ্ঠী ও জাতির অশ্বত্থকে বেড়িয়া সমাজ ও ধর্ম্ম বাড়িয়া উঠিয়াছিল দুইটি লতার মত, তেমনই অভিন্ন—আচার পদ্ধতি বিধি-নিষেধ সমূহ উহাদের বৃন্তে যুগপৎ ফুটিয়া উঠিত, তখন ওগুলির কোন্‌টি ধর্ম্মের আর কোন্‌টিই বা সমাজের এমন প্রশ্ন কাহারও মনে জাগিত না।

আধুনিক যুগে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের পর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমরা সামাজিক বিধান আইন কানুন প্রথা নিয়ম প্রভৃতিকে ধর্ম্মাচার পূজা-পার্ব্বণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি। মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেও উহার 'পিনাল কোডে'র ব্যবস্থা ধর্ম্মাচার বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। বিষয়টি আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, ধর্ম্মের জগৎ ইহলোকে ও পরলোকে আত্মার চরম সদ্‌গতিকে কেন্দ্র করিয়া সশ্রদ্ধ ভক্তি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে সমাজ ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই, কেন না ধর্ম্ম ব্যক্তির সম্পদ, একান্ত নিজস্ব—সমাজের করগ্রাহী সবল হস্ত উহার কণাটুকুও আত্মসাৎ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমষ্টির মঙ্গল সমাজের লক্ষ্য, ব্যক্তির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র জাতিকে সমাজ লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। ব্যক্তি প্রতি পদে বাধা পায়, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সমগ্রের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দেয়—পরিশেষে এক অবাস্তব ও অপরিস্ফুট অথচ প্রকৃত ও সমৃদ্ধ গণ-চেতনায় মধ্যে নির্ব্বিশেষে মিলাইয়া যায়।

সমাজের সৃষ্টি কিরূপে হইল তাহার প্রকৃত তথ্য জানা নাই বটে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণমূলক কল্পনা বলে ইহা সহজে অনুমান করা চলে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে খাদ্য সংস্থান ছিল মানুষের বড় কঠিন সমস্যা—শিকার বা ফল মূল আহরণ করিয়া তাহাকে বাঁচিতে হইত। তাই, খাদ্য-সংঘ (food group) গড়িয়া তুলিয়া আদি-মানব জীবন-যাত্রাকে সহনীয় করিয়াছিল মাত্র, এবং উহা হইতে পরে সমাজের উদ্ভব হয়। পশু-সুলভ যূথ বৃত্তিও বোধ করি মানুষকে সমাজ গঠনে সাহায্য করিয়াছিল। মানুষের তখন নিঃসহায় অবস্থা, একদিকে ঝঞ্ঝা-বাত্যা মড়ক দাবানল প্রকৃতি অপদেবতাগুলি অন্তহীন দুঃখ-ক্লেশ বহিয়া রুদ্র বেশে দেখা দিয়াছে, অন্যদিকে শত্রুর আক্রমণ—এমন অবস্থায় উক্ত স্বাতন্ত্র্য না থাকিবার কথা, মানুষকে দলবদ্ধ হইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইত। এইরূপে হইল গোষ্ঠির সৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে এমন একটি গণ দেবতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিল যাহাকে গোষ্ঠির আদি-জনক রূপে গ্রহণ করা চলে, যাহার পক্ষপুটচ্ছায়ে আশ্রয় লাভ করিয়া সংঘ জীবন বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কোন একটি জন্তু বা পক্ষী গোষ্ঠিদেবতার আসন অধিকার করিল, অথবা ঐ সম্মান দেওয়া হইল এমন একটি পদার্থকে শিশু-মানবের চক্ষে যাহার শক্তি অপরিমেয়—গোষ্ঠির ঐ কারক ও ধারকের

কল্পনা তাহার স্বভাববৃত্তিকে গৌরবান্বিত ও পরিতৃপ্ত করিত। ইহাকে বলে 'টোটেমিজ্‌ম্' (totemism)। আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম জাতি সমূহের মধ্যে টোটেমিজ্‌ম্ নানা আকারে এখনো প্রচলিত। কোন কোন সুসভ্য জাতিও চন্দ্র সূর্য্যকে বংশের আদি রূপে কল্পনা করিয়াছে, ইহা যে টোটেমিজ্‌ম্-এর প্রভাবকে ইঙ্গিত করেনা, কে তাহা বলিবে?

টোটেমিজ্‌ম্-এর সঙ্গে গোষ্ঠী বহির্ভূত (exogamous) বিবাহের একটা কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়, যদিও তাহা সবক্ষেত্রে পরিষ্কার রূপে বোধগম্য নহে। পাত্র-পাত্রীর ভিন্ন গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত হইবার প্রথা অনেক টোটেমি দলের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রথা মাত্র একটি সামাজিক বিধান, এবং তাহা রক্ষা করিতে হইলে কতকগুলি নিষেধ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন। এই নিষেধ সমূহকে বলা হয় 'তাবু' (taboo)। যে সমাজে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহপ্রথা প্রচলিত সেখানে গোষ্ঠী মধ্যে বিবাহ (Endogamy) একটি তাবু। কেহ ঐ তাবু ভঙ্গ করিলে গোষ্ঠি সমাজ তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়া থাকে—নতুবা গণ-দেবতার ক্রোধ সমগ্র গোষ্ঠীর উপর পড়িবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মমূলক কল্পনা ও সমাজ ব্যবস্থা, আদিম জাতিগুলির মধ্যে উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ এই দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যায়। আবার সামাজিক প্রয়োজনের বা জীবন-রক্ষার কাজগুলিও যে ধর্ম্মের মধ্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। নীলগিরির টোড়া জাতির একটি প্রথা এখানে উল্লেখযোগ্য। ঐ জাতির কোন উপাস্য দেবতা নাই। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি এমন কিছু ইহাদের জাতীয় জীবনের স্বভাবসিদ্ধ নহে। মহিষের দুগ্ধ ইহাদের প্রধান খাদ্য হইলেও অনেক মহিষকে ইহারা পবিত্র মনে করে—তাহাদের দোহন করা হয়না। ইহাদের মন্দির পশুশালা, পূজারি পশুশালার রক্ষক। পুরোহিত চিরকুমার—খাদ্য বিচার ও পরিচ্ছদের বাধা নিষেধ মানিয়া তাহাকে চলিতে হয়। দোহন করিয়াই দুগ্ধ পান করা হয় না, কেন না এইরূপ ইহাদের সংস্কার যে দুগ্ধের পবিত্রতা কোন অজ্ঞাত উপায়ে জাতির অমঙ্গল ঘটাইতে সক্ষম, —তাই পান করিবার পূর্ব্বে দুগ্ধের অকল্যাণকর দোষগুলি নষ্ট করিবার জন্য পূজারীকে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়। এখানে আমরা বেশ দেখিতে পাই যে, মহিষ পালন ও দুগ্ধ দোহন—সহজ জীবন-রক্ষার প্রয়োজনীয় কর্ম্মগুলি কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া একেবারে ধর্ম্ম ব্যাপারে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য আত্মার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সদ্গতি—আদি-মানবের কল্পনায় যদি বা দেখা দিয়া থাকে, নিশ্চয় তাহা স্থূল ও বিকৃত ভাবে দিয়াছে, গভীর উপলব্ধি বা দর্শনের উপর ভিত্তি স্থাপন হয় নাই। আধুনিক আকৃতি বিশিষ্ট মানব (Home sapiens) আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেও বন-মানুষের আকারধারী 'নিয়ানডারথাল' (Neanderthal) মানুষের মধ্যে দেহাতিরিক্ত আত্মা বিষয়ে কোন না কোন রূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। পিরানিস্ পর্ব্বতে গুহা-মানবের দেহ-পার্শ্বস্থিত নিত্য ব্যবহারোপযোগী উপকরণ প্রস্তরাস্ত্র প্রভৃতি ঐ পরলোকে বিশ্বাসকে প্রতিপন্ন করিতেছে। কিন্তু শুধু পরলোকে বিশ্বাস হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইবে না। জন্ম মৃত্যু বিবাহ সাবালকত্ব সাবালিকাত্ব—জীবনের প্রত্যেক মোড় ঘুরিতে কৌতূহল বিস্ময় ও বিভীষিকা। অন্তর্নিহিত ঐ জৈব বৃত্তিগুলিই মানুষকে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছে, বংশ ও গোষ্ঠীকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে বাঁচাইবার জন্ত দেবতার কল্পনা করিতে হইয়াছে। দেবতা প্রসন্ন হইলে বর দেন, রুষ্ট হইলে ধ্বংস করেন। স্তুতি গান পূজা—এই সব অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করিতে হয়। ভীতি বশতঃ দেবতার স্তুতি শুধু যে আদি-মানব করিত তাহা নয়, বহু পরবর্ত্তীকালে ঋকবেদের পুণ্য শ্লোকে উহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—এবং আজিকার দিনেও অনেক ব্যক্তি ঈশ্বর বা দেবতার আরাধনা করেন ঐরূপ ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া।

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো ভামিতো
বধীঃ হবিষ্মন্ত সদামিত্বা হবাম হে॥

হে রুদ্র, আমাদের জীবন গো বা অশ্ব বিনাশ করিও না। ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বলবান ভৃত্যগণকে বধ করিও না। আমরা হোমযোগ্য দ্রব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

সমাজে আচার বিচার প্রথা যাদু মন্ত্র বিধিনিষেধ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল প্রাণ-বৃত্তির প্রয়োজনে, আত্মরক্ষা ও অভীষ্ট সিদ্ধির তাড়নায়—মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, ভাব-প্রবণতা ও কল্পনা হইতে উহাদের সৃষ্টি এবং ঐগুলিই সমাজকে ধর্ম্মের সমাজ আর ধর্ম্মকে সমাজের ধর্ম্ম রূপে ধরিয়া উভয়ের মধ্যে একটি জৈব-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। ধর্ম্মকে প্রাণময় জীবন্ত উচ্ছ্বাসে ভরিয়া দিয়া বাহ্য অনুষ্ঠান সমাজের ও সংহতি রক্ষা করিত, উহার উচ্ছেদ বা পরিবর্ত্তন শুধু যে অমঙ্গল ঘটাইবে তাহা নয়, সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে—এই শঙ্কা মানুষের মনে চিরকাল জাগিয়া উঠিয়াছে। মানবের এই চিরাগত সংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বোধ করি ডাঃ ফ্রেজার উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়াছিলেন,—The history of religion is a long attempt to reconcile old custom with new reason to find a second theory in absurd practices. অর্থাৎ, পুরানো প্রথাকে নূতন প্রজ্ঞা দিয়া সমর্থন করিবার দীর্ঘ প্রচেষ্টাই ধর্ম্মের ইতিহাস,—উহা শুধু অস্বাভাবিক আচারগুলির অন্যতম হেতুবাদ খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই উক্তির সম্পূর্ণ সত্য স্বীকার না করিয়াও বোধ করি বলা চলে, ধর্ম্ম রক্ষণ শক্তি রূপেই মাত্র দেখা দেয় নাই, অনেক সময় জ্ঞান বিস্তার ও পরিবর্ত্তনের পথ এমন অন্ধভাবে রুদ্ধ করিয়াছে যে মানবীয় প্রগতির বিঘ্ন ঘটিয়াছে, সমাজও কোন প্রকারে উপকৃত হয় নাই। অবস্থান্তর ও জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে বিধিনিষেধ প্রথার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সমাজে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের প্রতি চোখ বন্ধ করিয়া চলিত ব্যবস্থাগুলিকে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা কঠোর রক্ষণশীল মনের পরিচয়—আর রক্ষণশীলতা কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যবস্থিত চিত্তের অকারণ পরিবর্ত্তন লিপ্সাকে সংযত করিলেও ঐ মনোবৃত্তির ফলে জাতি ও সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহা নয়, প্রকৃত তথ্য না বুঝিয়া, ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্র—এই ত্রয়ীকে মানুষ অতীত যুগে ক্রম-বর্দ্ধমান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া তাহার অগ্রগতিকে বাধা দিয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্বীকার ও ব্রুনো গ্যালিলিও প্রভৃতি মনীষিগণের উপর ক্রুর নির্য্যাতন আজ একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে পারে, সে অনেক দিনের কথা,—কিন্তু একটি অধুনাতন রাষ্ট্রে বিবর্ত্তন-বাদকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় ঐ তত্ত্বের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ইহা দেখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম্মের প্রভাব হইতে যে এখনো মুক্ত হইতে পারিয়াছে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এদিকে ধর্ম্মের উপর একটা পাল্টা আক্রমণ ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া রাজা কেনিউট একদিন সমুদ্রকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, তেমনই একদল বাস্তব-বাদীকে তর্জ্জনি তুলিয়া শাসাইতে দেখা যায়—ধর্ম্ম, তুমি দূর হও। ইতিহাস পুরাণে হিরণ্যকশিপু শিশুপাল প্রভৃতি অনেক অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহাদের ধর্ম্ম-দ্বেষী বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিলেন ধর্ম্মান্ধ—স্বধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, উপাস্য রুদ্র দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কৃষ্ণ নিন্দা, হরিভক্তের নির্য্যাতন করিয়াছেন। কিন্তু আজিকার হিরণ্যকশিপু দলের মধ্যে সত্যকার ধর্ম্ম-বিদ্বেষ, ধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ—যে সব

নিষ্ঠুর প্রথা অতীত যুগে ধর্ম্মের অঙ্গ-স্বরূপ ছিল অথবা পরবর্ত্তীকালে যে সকল অপকর্ম্ম, দুর্ব্বলের পীড়ন ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের ক্রমোন্নতির পথে বাধা দান করিয়াছিল, ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সেগুলি সজারুর কাঁটার মত কণ্টকিত হইয়া আছে, আধুনিক নীতি-জ্ঞানকে বিঁধিয়া বিশ্ব-ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্ম্মের উন্মাদনা কিরূপ বিকৃত নীতিবিগর্হিত আকার ধারণ করিতে পারে তাহার উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কার্থেজে নররক্ত-লোলুপ মোলকের প্রজ্বলিত উদর-গহ্বরে অনেক নর-নারী নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মেক্সিকোর আজটেকগণ প্রতি বৎসর একটি সুদর্শন যুবককে চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া রক্তাম্বর পরাইয়া শোভাযাত্রায় দেব মন্দিরে লইয়া যাইত এবং সেখানে জীবন্ত অবস্থায় তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া হৃদপিণ্ড উপাস্য দেবতার পদে উৎসর্গ করিত। পরবর্ত্তী তথা-কথিত উন্নত ধর্ম্মগুলির মধ্যে যদিও এরূপ অতি-নৃশংস কদাচারের স্থান ছিল না, তথাপি একজন নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠক এ-কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, জগতের অনেক যুদ্ধ হত্যা নিগ্রহ ঘটিয়াছে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া—স্বধর্ম্ম বিস্তারের অন্ধ প্রবৃত্তি মানুষকে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে যেমন, তেমনই পরধর্ম্ম পীড়নও সংস্কারাচ্ছন্ন মানবের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। কোন চারণ ভিসিগথগণের বিরুদ্ধে অভিযান উপলক্ষে ফ্রাঙ্কস্ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ক্লোভিসের মুখে এই উক্তির আরোপ করিয়াছেন,—ঈশ্বরকে সহায় করিয়া, তাহারই সাহায্যে আমরা এ সব আরিয়ান খৃষ্টানগণকে আক্রমণ করিতেছি, শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহার ভূমি আত্মসাৎ করিব। এই কথাগুলি শুধু যে উত্তরকালে ফ্রাঙ্কিস দলের ক্রুশেড অভিযান বা হিউজিনটগণের দেশ হইতে নির্ব্বাসনের পূর্ব্বাভাস তাহা নয়, আধুনিক যুগের অনেক সাম্রাজ্যবাদী ঐ মহাবাক্যটিকে বীজমন্ত্র রূপে জপ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিবেকহীন মানুষ ধর্ম্মকে চিরদিন প্রয়োগ করিয়াছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। স্পেনে ও রুশে পাদ্রীর প্রতিষ্ঠা বহু শতাব্দী জুড়িয়া মানুষের স্বাধীন বৃত্তি ও সমাজ প্রগতিকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সোভিয়েট রাশিয়ায় গলিত নখ দন্ত পাদ্রীকুলের উপর অল্প বিস্তর জুলুমবাজি চালাইতে দেখা গিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ আছে কি?

কিন্তু ধর্ম্ম চিত্রের এই মসীকৃষ্ণ রূপ দেখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সমগ্র-সত্যের পরিচয় ত দূরের কথা, খণ্ড-সত্যকেও বিকৃত করিয়া তোলা হইবে। ধর্ম্মের ভাব প্রেরণা উচ্ছ্বাস জগতে শুধু যে অনর্থ বহিয়া আনিয়াছে এমন নহে,—বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ শঙ্করাচার্য্য কুয়াং-ফু-জি (কনফুসিয়াস) লাও-সি, নানক চৈতন্য রামকৃষ্ণ—ধর্ম্মোজ্জ্বল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ইহারা এক একটি আলোক-স্তম্ভ, মহান কীর্ত্তির জ্যোতিঃ প্রস্রবণ,—নৈতিক আদর্শ চরিত্র মাধুর্য্য ও বিশ্বজনীন পরার্থপরতা লইয়া জীবন রহস্যের যথার্থ মূল্য নিরূপিত করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নানা দেশের নানা জাতির যাত্রীগণ যুগে যুগে অগ্রসর হইয়াছে—বন্ধুর পথের উপর পাহাড় ধসিয়া পড়িয়াছে, হিমবাহের তুষার স্তূপের চাপে জীবন ধারার গতি রুদ্ধ হইয়া গেছে, এই রাশি রাশি ধ্বংস ভগ্ন স্তূপ ক্লেদ কর্দ্দমের মধ্যেও অনেক সাধক ইপ্সিত মানস-সরোবরের তীরে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাহাদের পুণ্য প্রভাবেই জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রম-বিকাশের সোপান দিয়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছিল।

ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের নিকট স্থাপত্য ভাস্কর্য্য কলা-শিল্প সাহিত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যা গণিত দর্শন এমন কি পদার্থ বিজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রভূত পরিমাণে ঋণী, এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম-চেতনা ও প্রেরণাই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিকাশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, এই মহা-সত্যটিকে মানদণ্ডে ওজন করিলে ধর্ম্মের মহত্ব ও গুরুত্ব অনেকটা উপলব্ধি হয়। গ্রীক সভ্যতার গৌরবময় যুগে ফিডিয়স যে পারথেনন নামক বিচিত্র দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা একটি ভগ্ন-স্তূপ মাত্র—কিন্তু তাহারই খণ্ডিত টুকরাগুলি রেখা ও সৌষ্ঠবের মায়াজাল বিছাইয়া এমন ভ্রান্তি-বিলাস সৃজন করিয়া থাকে যে সৌধটির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কল্পনায় আনন্দে বিস্ময়ে হৃদয় আত্মহারা হয়। ব্যাবিলনে 'বেল' নামক দেবতার সাতটি চূড়া-বিশিষ্ট সুউচ্চ দেউল স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—পারসীক বীর বিজয়ী কাই-খসরু (Cyrus)কে উহা বোধ করি আক্রমণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। গ্রীসের এথেনা প্রভৃতি ভাস্কর মূর্ত্তি এবং রিনাসাঁর যুগে মাইকেল এঞ্জেলোর গির্জ্জা-গাত্রের চিত্রাবলী ভাস্কর্য্য ও চিত্র শিল্পের গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর, ধর্ম্ম মন্দিরে স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্র শিল্পের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য দূর দেশে যাইবার প্রয়োজন কি? এই ভারতের নানা স্থানে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে এবং অজন্তা ইলোরা কার্লে চৈত্য প্রভৃতি শৈল-স্থাপত্যের মধ্যে যে বিরাট বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য সমাধিস্থ হইয়া আছে, তাহা ধর্ম্ম-চেতনার প্রস্তরীভূত প্রতিমূর্ত্তি—কত শৈব বৈষ্ণব, কত হীনযান মহাযান পন্থীগণের আজীবন সাধনার রূপায়ন ঐ সব পর্ব্বত-প্রমাণ শিল্প-ভাণ্ডারগুলিকে চির-কীর্ত্তির অমর মহিমায় প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

মিশরে ও ব্যাবিলনে জ্যোতিষের জন্ম, পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাই মনে করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ, উল্কা ও ধূমকেতু, গ্রহ নক্ষত্রের আবির্ভাব ও তিরোধান কোন না কোন উপায়ে মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ এবং ঐ প্রভাব শুভকর করিয়া তুলিবার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন—এইরূপ সংস্কার হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সূত্রপাত। পূজা উপচার প্রভৃতি ধর্ম্মের যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম্ম শুভক্ষণে নির্ব্বাহ না হইলে ফলপ্রদ হয় না, তাই ব্যোমচারী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া গণনার প্রয়োজন হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মমূলক আখ্যায়িকাগুলি (Legend) দেব-মানবের ক্রীড়া ক্ষেত্র। এনড্রোসিডা পারসিউস ওরিয়ন হারকিউলিস প্রভৃতি আখ্যায়িকা-বর্ণিত মনোহর চরিত্রগুলি মৃত্যুর সঙ্গে জগত হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—আকাশের উদার বক্ষে অগণিত তারকা শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়া প্রাণময় অক্ষয় প্রেম-জ্যোতিকে ঊর্দ্ধ চির-সুন্দর লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বেদীর প্রয়োজন হইত, এবং বিভিন্ন যজ্ঞের ফল যেমন ছিল বিভিন্ন, তেমনই বেদীগুলিকেও বিধিমত ভিন্ন আকারে নির্ম্মাণ না করিলে হোতার ইষ্ট সিদ্ধির হানি ঘটিত। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে,—যেরূপ ও যত সংখ্যক ইষ্টক অগ্নি-চয়নার্থ আবশ্যক, যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা,—এবং কি প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয় যম নচিকেতাকে সে বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন। বিভিন্ন আকারের বেদী নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া ঋত্বিক ভূ-পরিমিতির অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতেন। গণিতের সাহায্যে ঐ সব প্রশ্নের সমাধান কিরূপে সম্ভব হইত তাহার বিশেষ পরিচয় শ্রৌত-সূত্র ও শুল্ব সূত্রগুলিতে পাওয়া যায়।

বহু যুগ পর্য্যন্ত সকল জাতির সাহিত্য ও কাব্য ধর্ম্মকে শুধু যে পাথেয় করিয়া চলিয়াছিল তাহা নয়,—উহার অফুরন্ত রসধারায় আত্ম-বিলুপ্তির সঙ্গে যে আত্মোপলব্ধি ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই কাব্যের অম্লান পারিজাত, তাহারই অনিন্দ্যরূপ অপরূপ সৌরভ বিশ্ব-মানবের মর্ম্মে ব্যাপ্ত হইয়া ভাবের উচ্ছ্বাস এখনো জাগাইয়া তুলে। তাই রামায়ণ মহাভারত ইলিয়ড, প্যারাডাইজ লষ্ট এক একটি অপরাজেয় মহাকাব্য। ধর্ম্মের চিন্ময় অনুভূতি ঐ মহাকাব্যগুলিতে মানুষের সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে দৈব প্রকৃতির চিরশান্ত চির তৃপ্ত মূর্ত্তিটিকে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়াইয়া লীলায়িত ছন্দে প্রকাশ করিয়াছে—

যে হিরণ্ময় পাত্র ঐ সত্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহার মুখ খুলিয়া দিয়া এমন উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছে,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

যতদিন ভাষা থাকিবে মানুষ যতদিন তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব-প্রবণ মনকে নিছক যন্ত্রে রূপান্তরিত না করিবে ততদিন সে এ আনন্দলোকের অমৃত ফল নিষিদ্ধ হইলেও আস্বাদন করিতে বিরত থাকিবে না।

ফল কথা, ধর্মের প্রভাব সভ্যতা ও সমাজের উপর পড়িয়া উহাদের যেমন উত্তরোত্তর শ্রী সম্পাদন করিয়াছে, ধর্মও তেমনই দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ঊর্দ্ধে এক স্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্মলোকে তত্ত্বজ্ঞান-জনিত উপলব্ধিরূপে ক্রমশ বিকশিত হইতেছিল। প্রাণ ধর্মে যাহার অঙ্কুর নিহিত ছিল ক্রমে তাহা মানবধর্মে পরিণত হইল, মানুষ কিন্তু চিরাগত কুসংস্কার কদাচার অন্ধ প্রবৃত্তির হাত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই—সমাজের জীবন্ত দেহে ওগুলি ধর্মের মৃত অবশেষরূপে থাকিয়া তাহাকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। জ্ঞানের পরিধি যতদিন সঙ্কীর্ণ ছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষকে ততদিন যাদু মন্ত্র আচার বিচার প্রভৃতি অনেক দুর্বোধ্য বা অর্থহীন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। ক্রমে জ্ঞান বিস্তৃত হইতেছিল, পরিশেষে তাহা যখন প্রচলিত আচার পদ্ধতির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইল এবং সেই সঙ্গে অজ্ঞানের কল্পলোকে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া পরিবর্ত্তনের দাবী করিয়া বসিল, মানুষের রক্ষণশীল মন তখনই হইয়া উঠিল জ্ঞানের পরিপন্থী, বিদ্যার বিরোধী, বিজ্ঞানের শত্রু। কোন প্রথা বা আচার শাশ্বত সনাতন নহে, প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভব ও লয় দুই-ই আছে—অবস্থান্তরের সহিত বিধিনিষেধগুলির পরিবর্ত্তন না করিলে সমাজ কখনো টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্মের মূল প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলে পরিবর্ত্তন কঠিন হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয়েরও পথ রোধ করা হয়।

রাজা কেনিউটের ভ্রূভঙ্গি সমুদ্রকে ফিরাইতে পারে নাই, কেন না উহার মূল প্রকৃতি সকল নিগ্রহ অনুগ্রহের অতীত, আপনাতে—আপনি—অটল এক গূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের প্রকৃতিও ঐরূপ কোন আত্মহতার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে—আত্ম নিষ্ঠা আত্মদর্শন আত্মজ্ঞান উহার সত্যকার উপাদান। মৌন শুষ্ক আত্মিক উপাসনাদির সাধনমার্গে ধর্ম, ভীতির পর্য্যায় শেষ করিয়া, সত্যকার সুন্দরের সন্ধান দিয়াছে। সেখানে ধর্মের সহিত সমাজের সম্বন্ধ বাহ্যাড়ম্বর, অনুষ্ঠান পর্ব্বের ভিতর দিয়া নয়,—ধূর্জ্জটির ললাটে চন্দ্রকণা যেমন জটা-তরঙ্গিত জাহ্নবীর জলে প্রতিফলিত তেমনই স্নিগ্ধ সার্ব্বজনীন নীতি-ধর্মের কিরণধারা সমাজের উপর পড়িয়া উভয়কেই মহাশান্তির ক্রোড়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া দিয়াছে। আজিকার জগতে প্রকৃত ধর্মের নাম নাই, দলও নাই—শুধু ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া, অধ্যাত্ম জগতের চিন্ময় আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া, চরিত্র মাধুর্য্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ উদার মহানুভবতার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টির মহাসমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম। দর্শনতত্ত্বে যাহাকে প্রজ্ঞা বলে তাহাই ধর্মের নেত্র, ভক্তি ও প্রেমের সাধনা উপায় এবং শান্তি উহার প্রকৃষ্ট ফল।

ধর্মের প্রতি আজিকার বিদ্বেষ অজ্ঞান প্রসূত বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্মের সার-বস্তু কল্পনা করা ভ্রমাত্মক। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান লইয়া মধ্য যুগীয় বিবাদ আমাদের দেশে একটা জাতীয় সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। ধর্মকে ব্যক্তির ও সমাজকে সমষ্টির দুইটি বিপরীত মেরু-মণ্ডলে অধিষ্ঠিত না করিলে সহনশীলতা দেখা দিবে না, বিদ্বেষেরও অবসান ঘটিবে না। ধর্ম ও সমাজ উভয়ের স্থান নির্ণয় করিবার দিন আজ আসিয়াছে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া মণিমোহন আশেপাশে কলেক্শন মোটামুটি শেষ করিল। পনেরো বিশটা দিন কাটিয়া গেল অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেই। সরকারী লোক এবং তাহার কলেক্শন,—ইহা ছাড়া জীবনে আর কোনোরূপ যে থাকিতে পারে, সে কথা ভাবিবারই যেন অবকাশ ছিল না এ কয়দিন। রাণী নয়, বর্মী মেয়ে নয়, ডায়েরী পর্য্যন্ত নয়।

কিন্তু এবার ফিরিতে হইবে। বহু টাকা সঙ্গে জমিয়া গিয়াছে, এগুলি কাছারীতে জমা করিয়া দেওয়া দরকার। ওখান হইতে টাকা লইয়া লোক সহরে চলিয়া যাইবে। এতগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া নদীতে ঘুরিয়া বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অভাবে অভিযোগে দেশের লোক কুকুরের মতো হন্যে হইয়া আছে—সরকারী বাবুকেও রেয়াত করিতে রাজী হইবে না তাহারা।

এত ধান—প্রকৃতির এমন দাক্ষিণ্য—এমন অপরিমিত ঐশ্বর্য। তবুও দুর্ভিক্ষ চলে। ডাকাতি কেবল লোকে যে স্বভাবের দিক হইতে করে তা নয়, অভাবের প্রশ্নটাও সমান জটিল এবং নির্মম। পটুয়াখালি এলাকায় কয়েকখানা ধানের নৌকা লুট হইয়াছে। তা ছাড়া উপনিবেশের এই দুর্জয় মানুষের দল! একবার যদি কোনোক্রমে জানিতে পারে যে মণিমোহন এই রাশি রাশি কাঁচা টাকা লইয়া নিশীথ রাত্রিতে নির্জন নদীতে চলা ফেরা করে, তাহা হইলে মরীয়া হইয়া একটা চেষ্টা হয়তো করিয়া বসিবে।

মণিমোহন কহিল, এবার তা হলে ফেরা যাক গোপীনাথ।

গোপীনাথের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল, এত তাড়াতাড়িই ফিরবেন বাবু?

—দেরী করে আর কী লাভ? তসীল এর বেশি আর হ'বে বলে মনে কর নাকি?

—আজ্ঞে না, তা নয়—গোপীনাথ কথাটা স্বীকার করিয়াই ফেলিল, এই খাওয়া-দাওয়াটা আর কি। একরকম মন্দ তো চলছিলা, পাঁঠা, মুরগী, ডিম—বেশ পাওয়া যাচ্ছিল। আর কাছারীতে ফিরে গেলে সেই ভাগাভাগির কারবার, খেয়ে পেট ভরে না।

মণিমোহন হাসিয়া বলিল, খাওয়াটা তো আসল ব্যাপার নয়, চাকরী করতেই আসা।

—তা বটে। কিন্তু খাওয়াটা যুৎসই না হলে আর চাকরীর নামে এখানে কী আশায় পড়ে থাকি? আপনিই বলুন না।

মণিমোহন সহানুভূতি বোধ করিয়া কহিল, সে তো সত্যি। কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—রাতে এসে যদি নৌকায় চড়াও হয়, তখন? একটা বন্দুক দিয়ে কি ঠেকানো যাবে?

গোপীনাথ সক্ষোভে কহিল, তা বটে।

কিন্তু কালুপাড়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সকাল বেলা বোটে বসিয়া মণিমোহন চা খাইতেছিল। যে কোন অবস্থাতেই হোক, এই চাটি না হইলে তাহার কোনো-ক্রমেই চলিবার জো নাই। মহিষের দুধ প্রচুর মেলে, যদিও চিনি পাইবার সম্ভাবনা নাই সব সময়ে। অভাবপক্ষে গুড়ের চা খাইবার অভ্যাসটা সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আজও সকালে গোপীনাথের তৈরী খেজুরের গুড়ের উগ্রগন্ধী চা গিলিতে গিলিতে সে দেখিল গ্রামের একটা বিরাট জনতা তাহার বোটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মজাঃফর মিঞার মেহেদী রাঙানো দাড়িটাই তাহাদের সকলের আগে চোখে পড়িল।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার?

সম্মিলিত জনতার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল। মেহেদী রাঙানো দাড়ি লইয়া মজাঃফর মিঞাই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদের বক্তব্য ঘোষণা করিল, আমরা বিচার চাই হুজুর।

—কিসের বিচার?

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া কলরব চলিতে লাগিল। তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হুজুর ভালোয় ভালোয় একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তো ল্যাঠা চুকিয়াই গেল, নতুবা যাহা করিবার তাহারা নিজেরাই করিবে। বহুকাল ধরিয়া তাহারা সহ্য করিয়াছে কিন্তু আর নয়।

—আঃ, ব্যাপারটা কি, তাই শুনিনা!

আবার কলরব। তবে তাহার মধ্য দিয়াও বক্তব্যের মর্ম কি উদ্ধার করা গেল। ওই বর্মী মেয়ে। তাহাদের গ্রামের শান্তিপূর্ণ জীবনে সে ধূমকেতুর মতো আসিয়া দেখা দিয়াছে। গ্রামের জোয়ান ছোকরাগুলির মতিগতি বিগড়াইয়াছে। কাজ নাই, কর্ম নাই, তাহারা ওই মেয়েটার পিছনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু কি তাই। তাহাদের নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি এমন কি লাঠালাঠি পর্যন্ত হইয়া গেছে। সমস্ত গ্রামের বুকের মধ্যে ওই মেয়েটার রূপ প্রখর একটা অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলিতেছে। আর শুধু যে জ্বলিতেছে তা নয়—সকলকে জ্বালাইতেছে সমান ভাবে।

শুনিয়া মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত আসিয়া লাগিয়াছে। বর্মী মেয়েকে অবশ্য খুব চরিত্রবতী বলিয়া মনে করিবার মতো কোনো কারণ কখনও ঘটে নাই। সেই ঝড়ের সন্ধ্যা কোনোদিন তাহার স্মৃতি হইতে মিলাইয়া যাইবে না,—সেই অরণ্য মর্মরিত ভয়াল পরিবেশের মধ্যে, কালো অন্ধকারে বর্মী মেয়ের সর্বাঙ্গ যেন মশালের মতো শিখায়িত হইয়া জ্বলিতেছিল। আগুনের কাজই দাহন—প্রতি-দিন, প্রতি মুহূর্তেই নূতন করিয়া ইন্ধনের দাবী জানাইবে সে। মণিমোহন সেখানে একতম এবং অনন্য হইয়া থাকিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল কেন?

তবুও তাহার মন মৃদু একটা বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বর্মী মেয়ের রক্তে উপনিবেশের বর্বর যৌবন জাগিয়াছে—সে যৌবন সর্বগ্রাসী; কিন্তু তাহার মার্জিত দীপ্তি, তাহার চরিত্রে একটা রুচিসঙ্গত পরিচ্ছন্নতা—সবগুলি ভাবিয়া কথাটাকে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল, আমি এর কি বিচার করব?

মুখপাত্র মজাঃফর মিঞা কহিল, ডেকে এনে সমঝে দিন না হুজুর। নইলে আমরাই ওকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেব। ওই কস্‌বীটার জন্যে ছেলেগুলো সব জাহান্নমে গেল।

—তোমরা ওকে ডেকে নিয়ে এলেনা কেন?

ডেকেছিলুম হুজুর, এলনা। ভারী মেজাজ। বলে কি জানেন? কোনো সরকারী বাবুকে আমি পরোয়া করি না। গরজ থাকে নিজেই যেন আসে।

কী হইল কে জানে, মণিমোহনের সরকারী পদমর্য্যাদাটা অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রখর ও প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে তাহার মন অসহ্য ক্রোধ এবং অপমান বোধে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে সুরু করিয়া দিল। মণিমোহন বর্মী মেয়েকে ঘৃণা করিতে সুরু করিয়াছে।

—বটে! আচ্ছা যাও তোমরা—আমি দেখছি।

—ব্যবস্থা একটা করুন হুজুর, নইলে গাঁয়ে বাস করা কঠিন হবে আমাদের।

জনতা নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে বিদায় লইল।

তাহারা চলিয়া গেলে মণিমোহন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ওই মেয়েটা তাহাকে অপমান করিয়াছে, ঠকাইয়াছে তাহাকে। সেদিনকার সেই সন্ধ্যায় এত সহজেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, সেই গর্বেই অভিভূত হইয়া আছে তাহার মন। কিন্তু এ গর্ব ভাঙিতে হইবে।

ঘণ্টাখানেক পরে দু'জন পেয়াদা সে পাঠাইয়া দিল। মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে।

পেয়াদারা ফিরিল দশ পনেরো মিনিট পরেই। একরকম উর্দ্ধশ্বাসেই ছুটিতেছে তাহারা—তাহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। সমস্বরে কহিল, আসবে না হুজুর।

—আসবে না?

—না। শুধু কি তাই? মেয়েমানুষ নয়তো হুজুর, সাক্ষাৎ বাঘিনী। দা নিয়ে তাড়া করেছিল আমাদের, হাতের কাছে পেলে কেটে ফেলত।

বাঘিনী! তা বটে। একেবারে মিথ্যা নয়। প্রথম দিন যখন মা-ফুনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, সেই দিনটির কথা মনে পড়িল। সেদিনও সে এমনি আসামী হইয়াই আসিয়াছিল। থান ইটের ঘায়ে স্বামীর মাথাটা দিয়াছে ফাটাইয়া—আর যাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। দুটি ক্রুদ্ধ চোখ জ্বলিতেছে দুই খণ্ড নীলার মতো।

বাঘিনী—তা বাঘিনীকে সায়েস্তা করিতেও সে জানে। মণিমোহনের মনে হইল, তাহার সমস্ত পৌরুষ যেন একটা অসহ্য অপমানে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কী মনে করিয়াছে এই মেয়েটা। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে—কিন্তু তাই বলিয়া সে কি এখনো পিছাইয়া নাকি? উপনিবেশ প্রবেশ করিয়াছে তাহার রক্তে—উপনিবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার স্নায়ুতে। একান্ত ভাবে ইচ্ছা হইল, বন্দুকটা লইয়া সে নামিয়া পড়ে, একবার দেখিয়া আসে, বন্দুক অথবা দায়ের জোরটাই বেশি। বাঘের থাবার শক্তি যত প্রচণ্ড হোক, তাহার নখ যতই ধারালো হোক, শিকারীর বন্দুক অথবা রাইফেলের মুখে চিরদিন তাহা গুঁড়াইয়া গেছে।

মণিমোহন গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া রাণীকে চিঠি লিখিল সে। কেমন করিয়া এবং কেন যে কে জানে, আজ রাণীকে চিঠি লিখিতে তাহার অত্যন্ত ভালো লাগিতেছিল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া সে রাতারাতি সুস্থ আর স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের ভাবিয়া হাসি পাইতে লাগিল, সত্যি সত্যিই বর্মী মেয়েটা তাহাকে পাকে পাকে অজগর সাপের মতো গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল যেন। তাহার নীল চোখ—তাহার চুনির মতো রঙীন ঠোঁটের বিভঙ্গ—তাহার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে যৌবনের অসঙ্কোচ আত্ম-প্রকাশ—সবটা মিলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যেকদিন জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। আজ সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে—ফিরিয়া পাইয়াছে নিজেকে। উপনিবেশ তাহার গৃহ নয়—এখানকার শ্রীহীন আদিম নির্লজ্জতার মধ্যে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিবে না। এই রাক্ষসী নদী ঝড়ের মেঘে কালো হইয়া আসা বন্ধহীন আকাশ এগুলি তাহার জীবনে সত্য নয়। প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখায় ছোট ঘরটি আলোকিত—মণিমোহনের ফোটোখানির উপর এক ছড়া মালা দুলিতেছে। জানালার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে রাণী। বাহির হইতে আমের মুকুলের গন্ধ আসিতেছে। হরিসভায় কীর্ত্তন চলিতেছে,—বাতাসে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে গানের শব্দ। সেই জীবন অনেকদিন পরে আবার হাত ছানি দিয়া মণিমোহনকে ডাকিল। নদী—কিন্তু নদী বলিলে কি এই! এখন—এই ফাল্গুন চৈত্রে সে নদী হাঁটিয়া পার হয় লোকে। দুই তীরে তাহার ভাঁট ফুল মদের গন্ধ বিস্তার করে, আর প্রেমদাস বৈরাগী বাবাজীর যে সমাধিটা ঝাউ বনের অন্ধকারে লুকাইয়া আছে, একটা প্রদীপ নদীর বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আলো ছড়াইতে থাকে।

এই বহুদূর বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বসিয়া মণিমোহন আজ যেন নূতন করিয়া দেখিল তাহার গ্রামকে—নূতন করিয়া রাণীর কথা তাহার মনকে নাড়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া সে চিঠি লিখিল। তারপর বাতি নিবাইয়া যখন সে ঘুমাইবার উপক্রম করিল, তখন নদী পর্য্যন্ত যেন রাত্রির তন্দ্রালু স্পর্শে নীরব হইয়া গেছে। দূরে কোথাও গাঙ-শালিকের বাসায় কিছু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্ভবত রাত্রির সুযোগ লইয়া ডাকাতের মতো সাপ আসিয়া হানা দিয়াছে তাহার গর্ত্তে।

—বাবু, বাবু, সরকারী বাবু!

একটু তন্দ্রার আমেজ আসিয়াছিল, মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল সেটা। ঘুমের ঘোরে ভুল শুনিল না তো? অথবা নিশির ডাক নয় তো? এ দেশে ভূত-প্রেত স্কন্ধকাটা কোনো কিছুতেই তো অবিশ্বাস করিবার নয়।

কিন্তু আবার স্পষ্ট ডাক আসিল। সরকারী বাবু!

বোটের মাঝিরা অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছে। অস্বাভাবিক খাটে বলিয়াই অস্বাভাবিক ভাবে ঘুমায়। মড়া মনে করিয়া চিতায় তুলিয়া দিলেও তাহারা বোধ হয় জাগিবে না—ঘুমন্ত অবস্থাতেই স্বর্গলাভ করিবে। সুতরাং এ ডাকে তাহারা জাগিল না। মণিমোহনের অজ্ঞানিতে মাঝিদের সহযোগিতায় খানিকটা তাড়ি যোগাড় করিয়া গিলিয়াছে গোপীনাথ—অবশ্য টের পাইয়াও মণিমোহন কিছু ব'লে নাই। নেশা না টুটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত গোপীনাথ পড়িয়া থাকিবে জগদ্দল পাথরের মতো অচল ও অনড় হইয়া।

সুতরাং মণিমোহন নিজেই বাহির হইয়া আসিল। ভুল হইবার কোনো কারণ নাই। জলের ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। তারার আলোয় সে সাহসিকাকে চিনিতে কষ্ট হইল না, সে বর্মী মেয়ে।

অসীম বিস্ময়ে মণিমোহন কহিল, তুমি এখানে! এই সময়ে?

অন্ধকারে সে হাসিল কিনা বোঝা গেল না। বলিল, হাঁ আমি। একটুখানি আশ্রয় দিতে হবে সরকারী বাবু।

—আশ্রয়! বিস্ময়ে আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না তাহার।

জোয়ারের জলে বোটটা অনেকখানি ভাসিয়া আসিয়াছে। পরণের ঘাঘরাটাকে হাঁটু পর্য্যন্ত তুলিয়া অভিসারিণী ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে জল ভাঙিয়া একেবারে বোটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, তুলে নাও আমাকে।

অবস্থাটা চিন্তা করিয়া মণিমোহন সংকুচিত হইয়া গেল, এই বোটে? এখন?

—ভয় পাচ্ছ?

—না, ভয় নয়—মণিমোহন আর বলিতে পারিল না।

—বড় বিপদে পড়েই এসেছিলুম। তা হলে আমি ফিরে যাই—

—বিপদ!—দ্বিধা কাটিয়া গেল মুহূর্ত্তে। একথা ভুলিলে চলিবে না এই এলাকায় আপাতত সে রাজপ্রতিনিধি—সে অনেক কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে।

—না, না, এসো তুমি।—হাত বাড়াইয়া সে তাহার লঘু দেহটি স্বচ্ছন্দে বোটে তুলিয়া লইল। তারপর কামরার মধ্যে আসিয়া দুজনে মুখোমুখি হইয়া বসিল—বসিল খানিকটা দূরত্ব রাখিয়াই। ঝড়ের রাত্রি আর আশ্রয়ের রাত্রি এক নয়। একটা সিগারেট ধরাইয়া মণিমোহন বলিল, কী বিপদ?

ক্লিষ্ট জবাব আসিল, পরে বলব।

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে মণিমোহন দেখিল নীলার উপর যেন মুক্তার বিন্দু টলমল করিতেছে। এই মেয়ের চোখেও কি জল দেখা দিতে পারে! নীরব বিস্ময় এবং বেদনার অনুভূতিতে তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না, আর অনাহূতা দু হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল একটা ছায়ামূর্ত্তির মতো।

* * *

চর ইসমাইলের কাজ ফুরাইয়াছে। এখানে পড়িয়া থাকিলে আর কী হইবে। ওদিকে ব্যবসায় যাহা দু একজন অংশীদার আছে, তাহারা যে এই সুযোগে দু হাতে লুটিয়া খাইতেছে তাহাও নিঃসন্দেহ।

কিন্তু লিসি। গঞ্জালেস অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল লিসিকে না হইলে তাহার চলিবে না। পৃথিবীতে যাহাকে পাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই, একমাত্র তাহারই জন্ত সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করিতেছে গঞ্জালেসের। শরীরের দাবী মিটাইবার জন্ত নারীর অভাব নাই, যতদিন অর্থ আছে ততদিন সে অভাব হইবেও না। তবু লিসিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। মোহ বেশিক্ষণ থাকিবার কথা নয়, লিসির প্রতি তাহার যেটুকু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আজ বাদে কাল তাহার আন্দোলন অতি সহজেই যাইবে শান্ত এবং প্রশমিত হইয়া। কিন্তু আঘাত লাগিয়াছে তাহার পর্তুগীজ অহমিকায়। তাহার সম্মুখ হইতে তাহারই স্বজাতীয়া বাঞ্ছিতাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে কোথা হইতে একদল বর্বর রেঙ্গুনী আর আরাকানী আসিয়া!

গঞ্জালেসের প্রাক্-পুরুষেরা রচনা করিয়াছিল ইতিহাসকে। আর আজ সেই ইতিহাসই নূতন করিয়া গঞ্জালেসকে রচনা করিতেছে। পাখী নৌকা নয়, যুদ্ধ জাহাজ। বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল সাতটা পালে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়াছে। নীল কেশর-ফোলানো সমুদ্রের ঘোড়ায় তাহারা আসোয়ার। সেদিন কোথায় ইংরাজ—কোথায় তাহার ম্যান্-অফ্-ওয়ার! সপ্তগ্রামের বন্দরে চলিতেছে আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিযজ্ঞ—সরস্বতীর কালো জলে সেই আগুনের ছায়া নাচিতেছে। মৃতদেহে ভাগীরথীর বক্ষ পরিকীর্ণ।...

গঞ্জালেস ডি-সুজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু এবার ডি-সুজা তাহাকে চিনিল। শোকের এবং আকস্মিকতার ধাক্কাটা কিছু পরিমাণে সামলাইয়া লইয়া সে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছে বোধ করি। সমস্ত জীবন ধরিয়া একটা নির্মমতার ইতিহাস তাহাকে নির্মোকের মতো ঘিরিয়া আছে। শুধু নির্মোক নয়—চরিত্র এবং মনের উপর তাহা রচনা করিয়াছে লোহার মতো একটা দুর্ভেদ্য বর্ম। তাই এ আঘাতও সে সামলাইয়া লইল।

মাতালের মতো টলিতে টলিতে ডি-সুজা আগাইয়া আসিল সামনে। সম্বর্ধনা করিয়া বলিল, তুমি স্তামুয়েল!

—হাঁ, আমি স্তামুয়েল।

মমির হাতের মতো দুখানা কালো এবং শুকনা হাত বাড়াইয়া গঞ্জালেসের ডান হাতখানি টানিয়া লইল ডি-সুজা। তারপর যেন ঘুমন্ত দুটি চোখ মেলিয়া স্বগতোক্তি করিল, ডেভিডের ছেলে তুমি। মানুষ খুন করাই ছিল ডেভিডের আনন্দ। তোমাকে এর শোধ নিতে হবে।

—হাঁ, এর শোধ নেব।—লোহার মতো দুটি কঠিন হাতে ডি-সুজার শিরা-বাহির-করা জীর্ণ হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্, এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সুজার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

—খুঁজে বার করতে হবে ওদের।

—হাঁ, খুঁজে বার করবই। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান কদিনের পথ! তারপর বর্মা। তারপরে চীন। তারপরে সমস্ত পৃথিবী।

ডি-সুজা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সমস্ত পৃথিবী?

—সমস্ত পৃথিবী।

কতটুকু এই পৃথিবী! সমুদ্র যাহাদের পায়ের তলায়, মৃত্যুকে যাহারা লইয়াছে মুঠার মধ্যে আয়ত্ত করিয়া—ঝড়ের গতির তালে তালে যাহাদের জাহাজ রাতারাতি মহাসাগর পার হইয়া যায়, তাহাদের কাছে পৃথিবী কয়দিনের পথ! কর্ণফুলির তীরে নারিকেল-বীথির যে নীড়, তাহা তো পথের পাশে ক্ষণিকের ছায়া-শীতল আশ্রয় মাত্র। আকাশের আহ্বান আসিয়া সাড়া দিয়াছে—রক্তে রক্তে পাখা মেলিয়াছে যাযাবর পর্তুগীজের মন। কালো চামড়ার টুপি—বন্দুক—পায়ের তলায় শরণাগত পৃথিবীর ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড দুইটা কাঁপিয়া উঠিতেছে।...

ডি-সুজা কহিল, কিন্তু লিসি?

—তাকেও পাওয়া যাবে।

—পাওয়া যাবে?

আবার অকারণ খানিকটা নির্বোধের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ডি-সুজার মুখ।

পরের দিন সকালে ডি-সিল্‌ভার মনে হইল ডি-সুজার একটা সন্ধান লওয়া তাহার কর্তব্য। হাজার হোক প্রতিবেশী, দুঃসময়ে তাহার খোঁজ খবর না করাটা অত্যন্ত অমানুষিক ব্যাপার হইবে। যদিও লিসিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটা লইয়া ডি-সুজা তাহাকে যা নয় তাই অপমান করিয়াছিল—কিন্তু এখন সেটা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত—। তা ছাড়া জননী মেরী তাহার দর্পের শোধ তুলিয়াছেন—ডি-সুজা উচিত মতো শিক্ষা পাইয়াছে। এখন আর পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

অনেকটা করুণার্দ্র বোধ করিয়া ডি-সিল্‌ভা দেখা করিতে আসিল ডি-সুজার সঙ্গে। পায়ের মচ্‌কানোটা এখনো সারে নাই, খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয় এখনো। ব্যাঙের মতো লাফাইতে লাফাইতে একটা লাঠি ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আসিল। ডি-সুজাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।

কিন্তু কোথায় ডি-সুজা! বাড়িতে যে কখনো মানুষ বাস করিত, তাহারও তো চিহ্ন নাই কোনোখানে। শুধু কতক-গুলি ভাঙা টুকরো টুকরো এলোমেলো জিনিস ছড়াইয়া আছে সমস্ত উঠানটাতে। মুরগীর খোঁয়াড়টা অবধি শূন্য—কতকগুলি পাখা আর আবর্জনাই সেখানে অবশিষ্ট। একটা ভাঙা ডিম খানিক নিৰ্যাস লইয়া পড়িয়া আছে শুধু—দু তিনটা কাক তাহা ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া খাইতেছে। আর বাতাসে বেড়ার গায়ে ডি-সুজার একটা ছেঁড়া প্যাণ্টালুন নিশানের মতো দুলিয়া উঠিতেছে।

ধ্বক্ করিয়া ডি-সিলভার বুকটা একটা ধাক্কা খাইল। এ সমস্ত কী ব্যাপার?

লাঠি আর খোঁড়া পা একত্র করিয়া এক সঙ্গে আট দশটা কোলা ব্যাঙের মতো লম্বা লাফ লাগাইল ডি-সিল্‌ভা। আসিয়া দর্শন দিল একেবারে নদীর ধারে।

গঞ্জালেসের নৌকাটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে একটা

নোঙরের গর্ত এবং মোটা কাছির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই। নদীতে যতদূর তাকানো যায় শূন্য একটা শুভ্রতা কেবল ধূ ধূ করিতেছে। গঞ্জালেসের নৌকার এতটুকু আভাস কোনোখানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ডি-সিল্‌ভা হাঁ করিয়া দিগন্তের পানে তাকাইয়া রহিল।

…ইহার পরে চর্‌ইস্‌মাইলে ডি-সুজা আর কখনো ফিরিয়া আসে নাই। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিল—ডি-সিল্‌ভা এবং তাহার মতো আরো দু চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আসিয়া রাতারাতি ডি-সুজার ভিটে খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। অনেক টাকা করিয়াছিল তো লোকটা,—ভুলেও কি তাহার দু একটা ঘড়া মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিয়া যায় নাই!

কিন্তু যাহা কিছু, পণ্ডশ্রম হইল মাত্র। মাঝে হইতে ডি-সুজার ভিটাগুলিতে কয়েকটা বড় বড় কুয়ার সৃষ্টি হইল, তাহার বেশি কিছুই নয়। তারপর নিরাশ হইয়া অর্থলোভীর দল ডি-সুজার ঘরের টিন, বাঁশ, দরজা, কবাট যাহা পাইল তাহা লইয়াই করিল প্রস্থান।

পাশাপাশি দুইটি ভিটা—জোহান আর ডি-সুজার। তাহাদের সমস্ত অপ্রীতি আর সন্দেহের মাঝখানে লিসি সেতু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সে সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর কালো মৃত্যুর একটা আবরণ নামিল তাহাদের ঘিরিয়া—চর-ইস্‌মাইলের পর্তুগীজ সংস্কৃতির উপর সময় ও শতাব্দীর নূতন হস্তাবলেপ।…… (ক্রমশঃ)

বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্‌-ডি

৫

এই পত্রাবলীতে নিছক শব্দ নির্ব্বাচন অপেক্ষা বাক্যবিন্যাসরীতি (Construction of Sentences) আরও কৌতূহলোদ্দীপক ও লক্ষণীয়; কেন না ভাষার অগ্রগতির সহিত বাক্যের সুষ্ঠু বিন্যাসই অধিকতর সম্পর্কান্বিত। মোটামুটি ইহার বাক্যগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ ও জটিল নয়। ছেদ চিহ্নের অপ্রয়োগের জন্যই ইহাদের বিস্তার ও বোধগম্যতার অনুধাবন কতকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে; কিন্তু ছেদগুলি বসাইয়া লইলে দেখা যায় যে ইহারা মোটের উপর সুবিন্যস্ত। স্থূল প্রয়োজন আমাদের মনে যে চিন্তা পরম্পরা জাগায়, তাহাদের পরিধি খুব বিস্তীর্ণ নহে। ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধের সুদূর-প্রসারী ভাবাসঙ্গ (association of ideas) নাই বলিয়াই ছোট ছোট বাক্যের unit এ ইহাদিগকে সহজেই ধরিয়া রাখা যায়। বরং ইহার ঠিক পরবর্ত্তী যুগে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আলোচনা-প্রসারের সঙ্গে রচনানৈপুণ্য তাল রাখিতে পারে নাই বলিয়াই বাক্যগঠন আরও দ্বিধাগ্রস্ত ও ভারসাম্যচ্যুত হইয়াছে। একটা সোজাসুজি নালিশ জানান বা অনুগ্রহভিক্ষা অপেক্ষা প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত লেখা, বা কাদম্বরীর অনুবাদ ও ধর্ম্মবিষয়ক সূক্ষ্ম আলোচনায় ব্রতী হওয়া ভাষা-জ্ঞান ও বাক্য-রচনার পক্ষে অনেক কঠোরতর পরীক্ষাক্ষেত্র। কাজেই এই সমস্ত দরখাস্তকারীদের তুলনায় রামরাম বসু, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও রাজা রামমোহন রায়ের বাক্যসমূহ আরও জটিল ভাবের বাহন ও ইহার পেষণে সময় সময় অনেকটা কাবু ও বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভারবহনের সঙ্গে সঙ্গে ভারবহন-ক্ষমতাও যে বাড়িতেছে তাহা সুস্পষ্ট; ভাবের ক্রমবর্দ্ধমান বোঝা বহিয়া ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও বাক্যের দৃঢ়বদ্ধ, সংহত বিন্যাসরীতি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে। পদস্খলনের দ্বারা দৃঢ়তর পদক্ষেপের শক্তি অনুশীলিত হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্যের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট প্রভাব এই শক্তি ও সংহতি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে। সুতরাং পত্রাবলীর সহিত তুলনায় প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সমূহ, বাক্য গঠন বিষয়ে অসম ও ত্রুটিবহুল হইলেও, উচ্চতর সম্ভাবনার বীজ ও সাফল্যের নিদর্শন বহন করে। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের (parts of speech) অন্বয় সম্বন্ধে উভয় যুগের রচনাতেই যদৃচ্ছাপ্রণোদিত শিথিলতা দেখা যায়—কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। বিশেষতঃ বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ জাতীয় পদগুলির সংস্থাপনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত হয়।

এই স্থলে উপসংহারের পূর্ব্বে আর একটী প্রশ্নের উত্থাপন প্রয়োজনীয়! গদ্য যখন প্রয়োজনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক অভিব্যক্তির প্রথম সোপানে পা দেয়, তখন ইহার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন কোন্ বহির্লক্ষণের দ্বারা সূচিত হয়? উচ্চ বর্ণের হিন্দুর ন্যায় গদ্যেরও দ্বিজত্বলাভ আছে—প্রথমতঃ প্রাথমিক ভাব-প্রকাশের তাগিদে জন্মিয়া ইহা সাহিত্যের আবেষ্টনে নূতন সংস্কারে দীক্ষিত হয়। বর্ণ হিন্দুর ক্ষেত্রে উপবীত ধারণই এই দ্বিজত্বের বাহ্য পরিচয়—ইহার অনুরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট চিহ্ন কি গদ্যের ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায়? অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালীদের রচনায় সাহিত্যিক উৎকর্ষ এত পরিস্ফুট যে ইহাকে আর চিনাইয়া দিতে হয় না। কিন্তু মুস্কিল হয় অনিশ্চয়তা-গ্রস্ত পরিবর্ত্তন-যুগের রচনা লইয়া। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক গুণের স্ফুরণ সমতালে অগ্রসর হয় নাই। রামমোহন, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকসমূহ, মিশনারী ও পণ্ডিত-মণ্ডলী এমন কি অক্ষয়কুমার দত্ত পর্যন্ত লেখকদের মধ্যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে ফলপ্রাপ্তির কম বেশী ব্যবধান লক্ষিত হয়। হয়ত কোথায় কোথায় কয়েক পংক্তি ধরিয়া রচনা সত্যসত্যই সাহিত্যোচিত প্রসাদ ও ওজস্বিতাগুণ মণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু এই উৎকর্ষ স্থায়ী হয় নাই, কিছুক্ষণ পরে ভাষা ও বাক্যবিন্যাস হোঁচট খাইয়া অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয় গদ্য সাহিত্যিক গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহার মানদণ্ড—বাক্যবিন্যাসরীতির মধ্যে ভারসাম্য-প্রতিষ্ঠা। যে ভাষা ক্ষণে ক্ষণে হোঁচট খায়, দাইনে বাঁয়ে ঝুঁকিয়া পড়ে, দ্রুত ও স্বচ্ছন্দগতির মধ্যে অকস্মাৎ অতিভারাক্রান্ত হইয়া ওজন ঠিক রাখিতে পারে না, যাহার ছন্দ টলমল ও অস্থির, যাহা নূতন হাঁটিতে শেখা শিশুর মত কখন মুখ থুবড়াইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় পাঠকের মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে, সে ভাষা সাহিত্যিক মর্য্যাদাকে সাময়িকভাবে স্পর্শ করিলেও পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন নহে। যেমন মানব শিশুর, তেমনি গদ্য শিশুরও, দৃঢ়পদবিক্ষেপই স্বাধীন সত্তা-স্ফুরণের পরিচয়। ইহার পূর্ব্বে শিশুর অস্থিগ্রন্থিহীন মাংস-পিণ্ডবৎ অর্দ্ধজড় অবস্থাকে মোটামুটি গর্ভকোষমুক্ত ভ্রূণাবস্থারই মিয়াদবৃদ্ধি বলা যাইতে পারে। সেইরূপ গদ্যেরও দ্বিধাহীন পদবিন্যাসের পূর্ব্বাবস্থাকে প্রয়োজনমূলক জীবনের পরিধি-বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় গদ্য সর্ব্বপ্রথম দৃঢ়বদ্ধ ভার-সাম্য অর্জ্জন করিয়া সাহিত্যিক মর্য্যাদায় স্থির হইয়াছে। ইহার ছন্দ হয়ত অতিমাত্রায় আত্মসচেতন; ইহার বহু-বিস্তৃত বাক্যাংশগুলি ও

গুরুগম্ভীর শব্দনির্ব্বাচন এমন একটা কৃত্রিম অলঙ্কারবহুল মন্থরতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সজীব ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সাবলীল গতিভঙ্গীর বিরোধী। তথাপি এখানেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম নিঃসংশয়িত সাহিত্যিক রূপ লক্ষিত হয়। এখানেই সর্ব্বপ্রথম বোঝা যায় যে বাক্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে লেখকের মনে সমস্ত বাক্যটার গঠনের একটী পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা জাগরূক ছিল এবং প্রত্যেক পদবিন্যাস এই পূর্ব্ব পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের পদবিন্যাসের আকস্মিক শিথিলতা, শব্দগুলির পরস্পরের ঘাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়ার প্রবণতা, কোন নূতন চিন্তার অতর্কিত উন্মেষের ফলে বাক্যের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তির পরেও অবাঞ্ছিত আগন্তুকের ন্যায় বাড়তি শব্দসমষ্টির সুষমাহীন সংযোজনার সহিত তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যের গঠন-সৌষ্ঠব এবং সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ বিন্যাস উন্নততর শিল্পকলা ও রুচি-বোধের নিদর্শন। রামমোহন রায়ের তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি ও বিষয় গৌরব, অক্ষয়কুমার দত্তের বস্তুনিষ্ঠা ও বক্তব্য বিষয়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, সংবাদপত্র সেবকদের বাস্তব জীবনের সরস বর্ণনাভঙ্গী ও কৌতূহলী আগ্রহশীল মনোভাব সময় সময় ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তেজনাহীন, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবানুবাদ প্রচেষ্টায় অতিনিয়মিত ও মসৃণ, প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তাপবর্জ্জিত রচনার অপেক্ষা উচ্চতর সাহিত্যিক উৎকর্ষ-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অখণ্ডিত শিল্প-কুশলতায়। তিনি গদ্যের বিশৃঙ্খল, ছত্রভঙ্গ জনতাকে সুশিক্ষিত, শ্রেণী-বিন্যস্ত, সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অভ্যস্ত সৈন্যদলে পরিণত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকেরা ইহার মধ্যে গভীরতর ভাবাবেগ, সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য্যোপলব্ধি, উষ্ণতর জীবনরক্ত ধারা ও কাব্যজগতের সুকুমার অনুভূতিরাজি সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে উৎকর্ষের চরম স্তরে লইয়া গিয়াছেন ও কবিতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমান গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাদের কৃতিত্ব, ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শ রূপ প্রতিষ্ঠার ধ্যান স্বপ্নেরই সফলতা সম্পাদন, ঈশ্বরচন্দ্রের আরব্ধ কার্য্যেরই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিসমাপ্তি।

গদ্যরীতিবিন্যাসের ক্রমোন্নতির উদাহরণ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত হইল।

প্রথম যুগ

১। রাণী মরিচমতীর পত্র (৬নং)—"এ কারণ সন ১১৭৯ সালে চুটিয়ার সহিত কাজিয়া হইয়া আমার ছাওাল ৺ কোমপানির সরণাগত হইয়া সরকার বেহার কোমপানির দখল দেলাইয়া উভপক্ষের নিস্পী অর্দ্ধেক) কোমপানিতে নালবন্দী (অশ্বারোহী ফৌজের জন্য কর) কবুল করিয়া কাউল নামা (প্রতিশ্রুতি পত্র) আদি লেখাপড়া আপন নামে না করিয়া—ধরেন্দ্রনারায়ণকে আমার ছাওাল রাজা করিয়াছিল তাহা ভোটেরা মঞ্জুর করে না এ কারণ—(Parenthesis) রাজার কাইমাত্রে রাজাকে কায়েম বা সুস্থির করিবার জন্য) রাজার নামে করিয়া শ্রীযুত মস্তর পর লিঙ্গ সাহেব সহিত কোমপানির ফৌজ লইয়া ভোটীয়াকে বিরত্ত করিল।" (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, পৃঃ ৬ ; পত্র পৌঁছানর তারিখ ৯ই মার্চ্চ, ১৭৮৭)

২। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের পত্র (১২নং)—"পরে আমার গুরু শ্রীযুত ৺গোস্বামি জীউ—৺স্বর্গীয় মহারাজ বর্ত্তমান থাকিতে অবধি বৈবাব প্রযুক্ত রাজত্বের মোক্তেয়ারী করিতেছেন—(parenthesis) তিনি জেলার শ্রীযুত মেস্তর (Mr.) মেথডোর সাহেবের নিকট এ সকল কৈফিয়ত (অবস্থা) জাহেরে (প্রকাশ)' করাত তিনী হুজুর ইত্তলা সংবাদ জ্ঞাপন) করিলে পর এবং উকিলেরদিগের দরখাস্ত মতে জেলার সাহেবের নামে হুকুম আসীয়াছিল সেমতে ৺কুম্পানীর ফৌজ পঠাইয়া অনেক তদারক করিয়া মোখালেপের (বিপক্ষের) হাত হইতে খালাশ করিয়াছেন।" (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, পৃঃ ১৪ ; পত্র পৌঁছানার তারিখ, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৮৭)

৩। মহারাণী কমতেশ্বরীর পত্র (১৪নং)—"জে জে লোক আমার পর দৌরাত্ম্য করিআছে সে সকল লোক রঙ্গপুরে কএদ আছে তাহার-দিগকে মাফিক তকশীর (অপরাধ অনুযায়ী) সাজা হয় কুঙর মজকুররা (উক্ত) পিতাপুত্রে পাকড়া আশীয়া বিহিত প্রতিকার হবেক এমত উমেদে (আশায়) ছিলাম তাহাতে হুজুর হইতে কুঙর মজকুরের নামে ইস্তাহার নামা (বিজ্ঞাপন) দিতে জিলার সাহেবের নামে হুকুম আশীআছে সে মতে জেলার সাহেব ইস্তাহার নামা দিয়াছেন যে তুমি জতো তকশীর করিআছ তাহা সকল তোমাকে মাফ হইল তুমি ছয়ে মাসের মেআদে খালিসাতে (রাজস্ব বিভাগে) কিম্বা জিলার সাহেবের নিকট হাজির হও জদি এ মেআদে হাজির না হও তবে তোমার তকশীর মাফ হবেক নাহি এহি শুনিঞা অধীক প্রাণ ভয় হইল সর্ব্বস্ব লুটীয়া লইলেক এবং বাবা মহারাজা ও আমার প্রাণ বধীতেছিল ও ৺কুম্পানির ফৌজের সহিত লড়াই করিল এমত এমত তকশীর মাপ হইল ইহাতে সে বড়ই পয়শ্রয় পাইল অথন কুঙর মজকুর মনে করিবেক জদি এতো তকশীর আমার মাফ হইল তবে মহারাজা ও মহারাণীকে মারিলে সেহ তকশীর আমার মাফ হবেক অথন সে বাবা মহারাজার ও আমার প্রাণ মারিতে কোন সঙ্কামাত্র করিবেক না আমি তাহার দাগা ও ডাকাতির ভয় করিতাম না জদি বাবা মহারাজা শীধ্ না হইতেন তবে তাহার মুরাদ কী ছিল।" (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, পৃঃ ১৯ ; পত্র পৌঁছানর তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৮)

৪। মহারাণী কমতেশ্বরীর পত্র (২৮নং)—"বাবা মহারাজ গজশীকার রাজা (অর্থাৎ নিজ মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকারযুক্ত) কখনো হিন্দোস্থানের পাতসাহাবের মোতাবিয়ত (বশ্যতা) করেন নাই আপন মুলুকের পাতসাহি করেন...রঙ্গপুর জীলা মধ্যে অনেক জমিদারের স্ত্রীলোক ও বালক জমিদার তাহারা আপন একতিয়ারে আপন আপন জমিদারি রাখিয়া মালগুজারি (রাজস্ব আদায় দেওয়া) করিতেছে আমার বর্ত্তমানে এমত হওাতে অল্প অল্প জমিদার হইতেও বাবা মহারাজ অধস্ত হইতেছেন এ বড় সরমের কথা এ রাজ্যের রেওাজ (রীতি) মতে জিবন মৃতার ন্যায় হইতেছি সাহেব ধর্ম্ম অবতার আমি নিতান্ত স্বরণাগত আমার ও বাবা মহারাজার হুরমত (সম্মান) দেওা নেওার মালিক সাহেবেরা সারাগীর (আশ্রিত) প্রতি নেকনজর (অনুগ্রহ) রাখিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক হুরমত রক্ষার্থে আমার ও বাবা মহারাজের আরজ কবুল হুকুম হবেক। (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, পৃঃ ৩৬-৩৭ ; পত্র পৌঁছানর তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৭৮৯)

নিম্ন রেখাচিহ্নিত বাক্যাংশগুলির ভাষা ও গতিচ্ছন্দ অন্যান্য উদ্ধৃতির তুলনায় কিরূপ সরল ও সাবলীল হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

দ্বিতীয় যুগ

রাম রাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ খৃঃ অঃ) হইতে উদ্ধৃতি

১। "দেখ দিল্লীর বাদসাহ একব্বর যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর পৃভৃতি সমস্ত রাজাগণের মাস্ত তাহারা ইহার করতল।"

২। কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ দৈর্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ দেশের বশহর নামে এক স্থান যেওয়ারিশ জমিদারি দক্ষিণ

সমুদ্র সান্নিধ্য চাদর্থা মহম্মদির জমিদারি ছিল সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওয়ারিশ স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই।"

৩। "এই অপকাশ ক্রমে বাদসাহি সৈন্য সমস্তই এক কালিন পার হইয়া মহামারিতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে তাহারা গাফিল (অসতর্ক) ছিল আচানক (হঠাৎ) মারি পড়নতে অনেক অনেক মারা গেল বক্রিয়া আপন আপন সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোন দিগে পলায়ন করিল ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।"

৪। "বেগম বিসন্নবদনা খিন্নমানা অতি কাতরা হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।—চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হা নাথ হা নাথ করিয়া বহুবিধ বিলাপীর ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায় হায় রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল ছল আক্ষিতে রোদন করিলেন।"

(বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে' অনুরূপ রচনার সহিত তুলনীয় —কাব্যাদর্শে প্রভাবিত করুণরস বর্ণনার সহিত বাস্তব জীবনের শোকাবহ ঘটনা-বর্ণনার প্রভেদ লক্ষণীয়।)

৫। "তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই।"

৬। "অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমারদের পরে তুমি তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবা, যে মত আমি করিতেছি তোমার খুড়ারদিগে—"

(বাক্যবিন্যাসরীতি 'মথি লিখিত সুসমাচার' জাতীয় পাদরী-রচিত বাংলা পুস্তকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ছাত্রদের দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় যুগ

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৮১৮-৩০) হইতে উদ্ধৃত—

১। "এই কলিকাতা মহানগরে অনেক অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিরত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো কাহারো যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে রঙ্গক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াস সাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক এক বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপ দ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপ দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ পথবর্ত্তী হন।" (সমাচার দর্পণ, ১৬ই মার্চ্চ, ১৮২২, পৃঃ ১২৮)

২। "আমি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরে নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলি বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ কেহ ছোট ছোট ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলি কোন কোন বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

এক দিবস দেখিলাম যে ঐ বালকেরা বাঙ্গালিটোলার দিকে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকের দিগের জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্যকরত কহিলেক "কাঁহাকা ভেকুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা" "বাবুকা লড়কা" ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানা প্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে তাহাও হইয়া থাকে। ....অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাস করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহার দিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার বোধা মুপ ভোথা করিয়া দিবেন।"

(সমাচার-চন্দ্রিকা, ২২শে জানুয়ারি, ১৮২৭ ; পৃঃ ১২৯-১৩০)

মেধাত্মক মনোবৃত্তির প্রভাবে এই দুইটী রচনায় ভাষা কিরূপ তীক্ষ্ণাগ্র, বাহুল্যবর্জ্জিত, দৃঢ়সংবদ্ধ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাক্যবিন্যাসরীতির দিক দিয়া কয়েকটী মাত্র প্রয়োগ বাদ দিলে ইহা প্রায় আধুনিক ভাষার সমতুল্য হইয়াছে। তবে বাক্যের মধ্যে কোন ধ্বনি-প্রবাহ বা ভার-সাম্য এখনও অনুভূত হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাঙ্গালা ভাষায় এই দুইটী গুণ আরোপিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বাস্তব অনুভূতির অভাব সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ ও শিল্প-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা অনেকটা পরিপূরিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা অত্যন্ত সুপরিচিত বলিয়া তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না। সংবাদপত্র লেখকদের হাতে বাঙ্গালা বাক্য-বিন্যাসরীতি যে পরিমাণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা হইতে আর একপদ অগ্রসর হইলেই আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্যে পৌঁছাইতে পারি। এইখানেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম আত্মসচেতন পরিণতি ঘটিয়াছে। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির হাতে ইহা কেবল শিল্প-সৌষ্ঠবের গণ্ডী ছাড়াইয়া উচ্চতর সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে ; এবং বিচিত্র, উজ্জ্বল প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।*

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নিউ দিল্লী অধিবেশনে পঠিত।

পারসিক চিত্রে বোগ্দাদ শৈলী

শ্রীগুরুদাস সরকার

(২)

আব্বাসীয় যুগের কারু কৌশলের বিশিষ্ট নিদর্শন, খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ কর্ত্তৃক সার্লমেনের (চার্লস্ ম্যাগ্‌নাসের) নিকট উপঢৌকনরূপে প্রেরিত একটি বিখ্যাত ঘটিকা যন্ত্রের উল্লেখ ইতিহাসেও পাওয়া যায়। উহাতে একটি পিত্তল খণ্ডের উপর ধাতব গোলক নিপতিত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দিত। কয়টা বাজিল তাহা স্থির করিতে কোন কষ্টই হইত না। ঘণ্টা বাজিলেই একটি দ্বার খুলিয়া সমান সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত এবং ঘণ্টা থামিলেই ভিতরে চলিয়া যাইত। খলিফা মুক্‌তাদির (খৃঃ অঃ ৯০৮-৯৩২) একটি সরোবরের মধ্যস্থলে অষ্টাদশ শাখা সমন্বিত যে স্বর্ণ ও রৌপ্যময় বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ফলগুলি গঠিত হইয়াছিল বহুমূল্য রত্নাদির সমবায়ে। বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্যরচিত পক্ষীগুলি বায়ু-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া সুমধুর কাকলীতে দর্শকের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। পুষ্করিণীর উভয় পার্শ্বস্থ তটভূমে অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত দুই দল

অশ্বারোহী মূর্ত্তি মুখামুখিভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহাদিগের পরিচ্ছদ মূল্যবান চিনাংশুকে নির্ম্মিত। এগুলি যন্ত্রচালিত হইলেই মনে হইত ইহারা যেন সম্মুখস্থিত শত্রুকে আক্রমণ করিবে (১)। যান্ত্রিক শিল্পের কতদূর উন্নতি সাধিত হইলে এপ্রকার মূর্ত্তিনিচয় নির্ম্মিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ না হইলে যন্ত্রশিল্প বিষয়ক পুস্তকাদি এরূপ সুষ্ঠুভাবে লিখিত ও চিত্রিত হইবে কেন ?

বিজ্ঞানাদির পঠন-পাঠন সম্পর্কে চিত্রশিল্পের যে প্রকার প্রয়োগ ও বিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাই বিশেষ করিয়া আমাদিগের আলোচনার বিষয়ীভূত। খৃঃ ১২৯০ অব্দে পারসীক চিত্র শিল্পী আরবদিগের ইরাকী চিত্রশালাগুলিরই ধরণ-ধারণ অনুকরণ করিতেন। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় আবু মশর অল্ বাল্খী রচিত জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি বিখ্যাত পুঁথির কৌতুহলকর চিত্রাদি হইতে। এ চিত্রগুলির কলা-কৌশল রীতিপদ্ধতি ও পরিকল্পনাভঙ্গী সমস্তই যেন বোগদাদ, কুফা ও সিরিয়ায় প্রচলিত শৈলী হইতে উদ্ভূত, যেন এই তিন স্থানের বিভিন্ন অঙ্কন রীতি একই প্রকার বাঁধা ছাঁচে ফেলিয়া সরল হইয়াছে। পরে দেখা যাইবে যে এই পদ্ধতিই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে হারিরির মোকামাৎ পুঁথির চিত্রগুলিতে। যন্ত্র শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ব্যতীত তৎকালীন এক শ্রেণীর সাহিত্য গ্রন্থও চিত্রসম্পদে সমৃদ্ধ।

বিষ্ণু শর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ভারত হইতে পারস্যে নীত হইলে পর প্রথমে প্রাচীন পারসীক ভাষা পেলেভি (Pehlevi) তে ভাষান্তরিত হয়—পরে উহা আরব দেশে প্রবেশ লাভ করে। আরবীয় অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল "কালিলা ওয়া দিমনা (দমনা) নামে, গল্পের দুইটি পাত্র করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয়ের নামানুসারে। জনপ্রিয় বিদ্‌পে অথবা পিল্‌পের কাহিনীর (Fables of Pilpaya) ইহাই আরবীয় আকার। বিদ্‌পে শব্দটি বিদ্যাপতিরই অপভ্রংশ। ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি এই গল্পগুলির প্রচার কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কালিলা ওয়া দিম্‌নার রচয়িতা, ইবন্-উল্-মুকাফ্‌ফা, খৃঃ ৭৬০ অব্দে দেহত্যাগ করেন। ইহা হইতেই এ গ্রন্থের বয়স কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। আব্বাসীয় খলিফাদিগের যুগের এই বিশিষ্ট শিল্প ধারার প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গিয়াছে (২) আনুমানিক ১১৫০ খৃঃ অব্দে লিখিত বিদপাই পুঁথির একটি পারসীক অনুবাদে। ইহা পূর্ব্ব পারস্যের অন্তঃপাতী গাজনায় লিখিত হইয়াছিল। এ পুঁথির ক্ষুদ্রক চিত্রগুলি স্বল্প পরিসরের মধ্যে মেসোপটেমীয় আদর্শেরই পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর চিত্রই ১৩শ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বোগদাদ পদ্ধতিতে অঙ্কিত হইতে থাকে। মনে হয় পারস্য দেশে লিখিত বিদ্‌পাইয়ের এ পারসীক সংস্করণ পারসীক চিত্রকরের দ্বারাই চিত্রিত হইয়াছিল। মনে হয় এই গ্রন্থেরই খণ্ডিতাংশ ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মঁসিয়ে মার্ত্তো (Mertean) কর্ত্তৃক পারী নগরীর জাতীয় গ্রন্থাগারে (Bibliotheque Nationale এ) প্রদত্ত হয়। মঁসিয়ে সাকিসিয়ান এ পুস্তকখানিকে "কালিলা ওয়া দিম্‌নার" পারসীক সংস্করণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। এ গ্রন্থের অনুবাদক ছিলেন আবুল মিয়ালি নসরুল্লা। ভাষাগত ও শিল্পগত প্রমাণাদি হইতে তাঁহার অনুবাদ সম্বলিত এই পুঁথিখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। মঁসিয়ে ব্লশে আরও একটু বেশী রকম নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৪)। গ্রন্থের মুখবন্ধে নসরুল্লা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গজ্‌নভী বংশীয় বাহ্‌রম্ সাহের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার উদ্দেশে কোহিস্তান ও ইরাকের অধিবাসিগণ অজস্র সাধুবাদ নিবেদন করিয়া থাকে। বাহ্‌রাম্ সাহের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ১১১৮ হইতে ১১৫২। গ্রন্থকারের প্রশংসাবাদ হইতে বুঝা যায় যে ইরাকের (মেসোপটেমিয়ার) অংশ বিশেষে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বোগদাদের খলিফা-দিগের যুগে রচিত এই পুঁথির ক্ষুদ্রক চিত্রগুলিতে যে বোগদাদীয় অথবা মেসোপটেমীয় শৈলীর বিশিষ্ট চিহ্নগুলি বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে—খৃঃ অঃ ১২২০ হইতে ১২৩০এর মধ্যে আব্বাসীয় খলিফার রাজ্যেই যে 'কালিলা ওয়া দিম্‌না'র যে চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় তাহার সহিত এই পারসীক বিদ্‌পাই পুঁথির চিত্রাবলীর অঙ্কনভঙ্গী, বর্ণ-যোজনা, মানব দেহের অবয়ব আকৃতি, এমন কি জীবজন্তু অঙ্কনের ধারাও হুবহু মিলিয়া যায় সুতরাং এগুলিকে ছোট চাঁদের মেসোপটেমীয় ধারার চিত্র বলিলে কোনও অন্যায় করা হইবে না। এ শ্রেণীর চিত্র পরিকল্পনায় পারসীক শিল্পীর দান যে প্রান্তের মধ্যে নহে এ কথাই বা কিরূপে বলা যাইবে। এই উপলক্ষে দুইখানি চিত্রের পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একখানি চিত্রে রাজসভায় সম্রাট দ্বিতীয় খসরু (খসরু আনুসির্‌বান) পঞ্চতন্ত্রের মূল গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতেছেন। অপর একটি চিত্রে ভারতীয় রাজা দুব্‌শালীন্ ব্রাহ্মণ বিদ্‌পাইয়ের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি পারস্যে বহুকাল প্রচলিত থাকায় যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। নস্‌রুল্লাকৃত অনুবাদের পূর্ব্বে, দশম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইহা আর একবার পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল সামানীয় বংশের রাজত্বকালে (১)। প্রবাদ মতে পঞ্চতন্ত্র আনুসিরবানের যুগ হইতে (খৃঃ অঃ ৫৩১—৫৭৮) পারস্যে সমাদৃত। ফিরদৌসি সাহনামায় এ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে ইহা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পন্থা নির্দ্দেশ করে।

যে গ্রন্থের বহুল প্রচার ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা যে চিত্রসম্পদে ম্লান নহে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার হেতু দেখিনা। আব্বাসীয় শিল্প পদ্ধতি এ পুঁথির চিত্রাঙ্কনে যে ভাবে প্রকটিত হইয়াছে সমঝদার মাত্রেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। কি দরদ দিয়াই না এ যুগের পটুয়ারা পঞ্চতন্ত্রোক্ত ইতরজীবগুলির আকৃতি প্রকৃতি চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চিত্রকর অপূর্ব্ব কৌশলে প্রত্যেকটি জন্তুর বিভিন্ন ভাবোন্মেষ অতিসুন্দর ও স্বাভাবিক রূপে মূর্ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বল্পবুদ্ধি নিরীহ প্রাণীকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলিয়া চতুর শৃগালের সেই নৃশংস উল্লাস, তাহার সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সেই বাক্যবিহীন বাঁকা হাসি, শিল্পীর তুলিকায় রেখায় রেখায় সুপরিস্ফুট ! একাদশ শতাব্দে প্রবর্ত্তিত আরবচিত্রের এই ভাবধারা পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল।

চিত্রসম্বলিত সাহিত্যগ্রন্থের মধ্যে এ যুগের আর একখানি সুপরিচিত সাহিত্যগ্রন্থ ছিল হারিরি'র মকামাৎ। মকামাৎ শব্দের অর্থ সম্মেলন-সমাহার। ইহা রচিত হয় বস্‌রা প্রবাসী জনৈক অবসরভোগী পারসীক রাজনীতিজ্ঞের নির্দ্দেশক্রমে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু আবু জায়েদ নামক প্রধান নায়কের চতুরতা ও দুঃসাহসব্যঞ্জক কার্য্যাবলীর বিচিত্র বিবরণ। গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গল্পের মধ্যে কতকগুলি নীতিশিক্ষাপ্রদ ; আর কতকগুলি রুচির দিক দিয়া প্রশংসনীয় না হইলেও জনসাধারণের মনোরঞ্জনক্ষম বলিয়া তাহাদের নিকট আদরণীয়। যে শ্রেণীর পাঠকের স্থান বিদগ্ধ সমাজের বাহিরে তাহাদের মধ্যে মকামাৎএর কাহিনী যথেষ্ট প্রচার ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এ প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে

(১) Tuazwini kosmographio, pp. 210-211, referred to by Sir Thomas Arnold in his Painting in Islam.

(২) E. Bloohet, Mussulman Painting 12th to 17th oentury p. 33.

(৩) Sakisian, Op. oit. p. 21.

(৪) Rupam, January 1930, No. 41, p. 4,

(১) নবম শতাব্দীতে খোরাসানের উত্তর পূর্ব্বাংশে, অর্দ্ধ স্বাধীন তুর্কদিগের মধ্যে সামানীয় (samanid) রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

গ্রন্থখানি শুধু যে জনৈক পারস্যবাসীর নির্দ্দেশে রচিত তাহা নহে কতকগুলি গল্পের ঘটনাস্থানও পারস্যদেশে।

হারিরি'র ও বিদ্‌পাইয়ের গ্রন্থের পঠন পাঠন কেবল অভিজাতবর্গের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলনা তাই চিত্ররীতিতে বিশেষ কোনও কৌলিন্যলক্ষণ এই সকল সাধারণ শ্রেণীর পুঁথিতে দৃষ্ট হয় না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির বর্ণসমুজ্জ্বল চিত্রনিচয় এ সকল গ্রন্থে না থাকিলেও ইহারও চিত্রপদ্ধতিতে যথেষ্ট বাইজণ্টাইন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঁধা ছাঁদে চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির পরিচ্ছদ বাইজাণ্টাইন ভঙ্গীতেই ভাঁজে ভাঁজে ভারি হইয়া ঝুলিয়া আছে। পীঠভূমির কোনও অংশ ফাঁকা ফেলিয়া রাখিতে তৎকালিক চিত্রকরেরা যেন বিষম কুণ্ঠা অনুভব করিতেন(১)। কোনও প্রধান নায়ক অথবা নায়ক-স্থানীয় পাত্রের মর্য্যাদা ও গৌরব জ্ঞাপনের জন্য শিরোদেশে বাইজাণ্টাইন ধারায় গোলাকৃতি প্রভামণ্ডল তো প্রদর্শিত হইতই, আবার পটভূমির (backgroundএর) অংশবিশেষ যাহাতে অনাবৃত না থাকে সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ শ্রেণীর পাত্র পাত্রীদিগের বেলাতেও প্রভা-মণ্ডলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। আবার কোনও কোনও চিত্রে দেখা যায়, ইতর জন্তুদিগের, এমন কি পক্ষী প্রভৃতির ও শিরোবেষ্টন করিয়া প্রভামণ্ডল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাই ইহা যে শুধু খৃষ্টীয় প্রভাব সূচিত করে সকল ক্ষেত্রে তাহা জোর করিয়া বলা চলেনা। কোথাও বা গাছপালা দিয়া, কোথাও বা ইমারত ও তৎসংলগ্ন স্তম্ভাদি আংশিক ভাবে অঙ্কিত করিয়া, চিত্রকরকে পটভূমিপূরণের সমস্যা মিটাইতে হইয়াছে। এ সব চিত্রে দেখিতে পাই গাছগুলি যেন কেমন চেপ্‌টা ধরণের, আর গাছের ছোট ছোট চারাগুলি মাঝে মাঝে যেন দূর্ব্বাদির ন্যায় পায়ের তলায় গজাইয়া উঠিয়াছে। এ অঙ্কন পদ্ধতিতে বৃক্ষগুল্ম প্রভৃতির স্থূলত্ব পরিস্ফুট হইতে পারে না। উদ্ভিদবিদ্যা অনুশীলনে রত বৈজ্ঞানিক যেরূপ চাপ দিয়া চেপ্‌টা করিয়া উদ্ভিদ ও পুষ্পাদির নমুনা ব্লটিংএর পাতার মধ্যে রক্ষা করেন, ক্ষুদ্রক চিত্রে এগুলি ঠিক যেন তাহারই অনুকরণে চিত্রিত। আব্বাসীয় যুগের চিত্রগুলি একটু বড় ছাঁদের। এ সকল চিত্রের উদ্ভাবনা, এগুলির প্রধান প্রয়োজন, বিষয়-বস্তু বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই, প্রসাধনকলার সহিত এ চিত্র পদ্ধতির কোনও সম্পর্ক নাই, তাই এগুলিকে ঠিক খাঁটি ক্ষুদ্রক চিত্রধর্ম্মী বলা যাইতে পারে না। এগুলি বস্তুতঃ গ্রন্থেরই বর্ণনার অঙ্গীভূত। পরবর্ত্তীকালের পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের ন্যায় শুধু সজ্জার জন্য, পুঁথির ফাঁকা রাখা পত্রাংশে, মণ্ডনকৌশল ও বর্ণচ্ছটার বিলাসবিভ্রমে পাঠকের চিত্তহরণের জন্য বিনিবেশিত হয় নাই। আব্বাসীয় চিত্রে সোনালী কাজের ব্যবহার ছিল বটে কিন্তু এ শৈলীতে শিল্পীর রংগুলি শুধু সংখ্যায় নহে, অমার্জ্জিত ও অবিশুদ্ধ। ইহার জন্য যেটুকু ঘাট্‌তি তাহা পূরণ হইয়াছে রেখাঙ্কনের শক্তিমত্তায়। আপাতদৃষ্টে ইতস্ততঃ ধাবমান বিক্ষিপ্তপ্রায় সূক্ষ্মতুলির টান সমূহ অনিয়মিত ও শৃঙ্খলাবিহীন বলিয়া বোধ হইলেও তৎসাহায্যেই শিল্পীর হৃদয়ের কল্পনা অদ্ভুত শক্তিমত্তার সহিত চিত্রপটে রূপগ্রহণ করিয়াছে। অমিত বর্ণাভাব (black for totnal value) ও বাঁধা-ছাঁদের ছায়া চিত্রণ ভঙ্গী (stylised shadows) ইহাও ছিল এ পদ্ধতির আর একটি বিশেষত্ব(২)।

বাস্তবতার দিক দিয়া হারিরি পুঁথির চিত্রাবলী তৎকালীন আরব-দিগের জীবনধারার একটি সত্যকারের প্রতিচ্ছবি আমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। এ সকল চিত্রের বিষয়বস্তু নানাপ্রকারের। কোথাও অশ্ব ও অশ্বতরে আরূঢ় ব্যক্তিগণ মিছিল করিয়া পতাকা উড়াইয়া, ভেরী নিনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে, কোথাও দাস বিপণীতে শ্বেতকৃষ্ণ উভয় বর্ণের নরনারী, মনে হয় ইহারা হাবসী, গ্রীক ও আর্মেনিয়ান হইবে—সমভাবেই ইতরজীবের ন্যায় বিক্রীত হইতেছে। ক্রেতা অঙ্গুলির



৪নং মানিচীয় পুঁথির চিত্র

দ্বারা একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে—বোধ হয় তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সেই মন্দভাগ্যের মুখের ভীত ও অসহায়ভাব বাস্তবিকই হৃদয়তল মথিত করে। অপর একটি চিত্রে মনেহয় কোনও কাফিলার (caravan এর) যাত্রিগণ পথিমধ্যে একটি উষ্ট্রকে সজ্জিত করিতেছে। উষ্ট্রটি বসিয়া আছে, দুইজন মিলিয়া, উহার পৃষ্ঠে আস্তরণ বিছাইয়া, দ্রব্যজাত বিন্যস্ত করিতেছে। একজন পিছন দিকে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতেছে, তাহার ভঙ্গীতে ক্ষোভ ও হতাশার ভাব অভিব্যক্ত। হারিরির দ্বাদশশতাব্দীর একখানি পুঁথিতে সিংহ ও হস্তীর দ্বন্দ্বযুদ্ধের একখানি চিত্র আছে। বেসিল গ্রে'র গ্রন্থে এইরূপ আর একটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে খৃঃ ১৩৫৪ অব্দের একখানি 'কালিলা ওয়া দিম্‌না পুঁথি হইতে(১)। ইহা সমকালীন চিত্রাঙ্কন



৫নং মানিচীয় পুঁথির চিত্র

পদ্ধতির নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। পশুরাজ, করিরাজকুম্ভ বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই, প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থূল হস্তাবলেপে বিপর্য্যস্ত হইয়া যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন। শুণ্ডবেষ্টিত মস্তকটি

(১) ইহাই শিল্পসমালোচকেরা 'horreuv dee vide' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) Sak'sian, Op. cit.

(১) Lion and Elephant fighting, Bodbian, Ms, Poocoke, Kalila wa Dimna, Dated 1354, fol. 586 b.

তাঁহার আর নড়াইবার সাধ্য নাই। একটি থাবা করিবরের অলকা-তিলকা আঁকা ডাহিন কাণটি শুধু স্পর্শ করিয়াই নিস্ফল হইয়া গিয়াছে। চিত্রকর স্বল্প কয়েকটি রেখার টানে হস্তীর দেহের ও লেজের রোমগুলি অতি সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। সিংহটির আকৃতি হুবহু সাসানীয়



৬নং মানিচীয় পুঁথির চিত্র

শৈলী হইতে গৃহীত। তবুও পাশ্চাত্য শিল্পসমালোচকগণ আব্বাসীয় যুগে কেবল খৃষ্টীয় বাইজান্টাইন (Byjantine) প্রভাবই লক্ষ্য করিতে উন্মুখ। সাসানীয় শিল্প হইতে এ যুগের শিল্পধারার অনেকাংশ যে: সোজাসুজিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী যুগের শিল্পীর পক্ষে



৭নং মানিচীয় পুঁথির চিত্র

পূর্ব্বগামী শিল্পভাণ্ডার হইতে এরূপ আত্মসাৎ করা যে মোটেই অসম্ভব নয় তাহা তাঁহারা যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। শুধু বাঁধা ছাঁচের সিংহের আকৃতি নহে, উষ্ট্র ও ব্যাঘ্র মূর্ত্তির আদর্শও যে সাসানীয় যুগের শিল্প হইতে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা পারসীক কুম্ভক চিত্র দৃষ্টিমাত্রেই উপলব্ধি হয়। পশুযুদ্ধের চিত্রটিতে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বিবদমান হস্তী ও সিংহের ঠিক কটিদেশের পার্শ্বভাগেই যেন ছন্দ বজায় রাখিয়া চেপ্টা আকৃতির দুইটি বৃক্ষ দণ্ডায়মান। কেবল অলঙ্করণ প্রচেষ্টাই যে এই বৃক্ষ দুইটি অঙ্কনের হেতু তাহা বিশদ করিয়া না বলিলেও চলে।

আব্বাসীয় শিল্পী অঙ্কন বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিলেও সকল ক্ষেত্রে বাস্তবিকতার দিকে যে সেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন না তাহা বেসিল গ্রে'র গ্রন্থে প্রদত্ত একখানি চিত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। চিত্রকর আঁকিয়াছেন, একটি উপবিষ্ট উষ্ট্রকে সিংহ, তরক্ষু ও বন্যকুকুর একসঙ্গেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একটি বায়স তাহার মস্তকে উপবিষ্ট হইয়া অক্ষিপ্রদেশে চঞ্চু প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। একত্রে আহারে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাক, আহারকালীন অপর কোনও ইতর শ্রেণীর শ্বাপদ যে সিংহব্যাঘ্রাদির নিকটে আসিতে সাহসী হয় না চিত্রী একথা সত্যসত্যই বিস্মৃত হইয়াছেন। মরণোন্মুখ উষ্ট্রের মুখে যে অপরিসীম যন্ত্রণার ব্যঞ্জনা প্রকটিত, শিল্পীর কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় শুধু তাহাতেই পাওয়া যায়।

হারিরি পুঁথির চিত্রগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাহা লইয়া যে মতভেদ নাই তাহা নহে(১)। আব্বাসীয় খলিফাদিগের রাজ্যের অবসান হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, খৃঃ ১২৫৮ অব্দে। হুলাগু খাঁর অধিনস্থ মোঙ্গলেরা বোগদাদ অধিকারের পর আর মিশরদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাই সেখানে কিছু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত আব্বাসীয় শৈলীর (বোগদাদ শৈলীর) পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও লেখক(২) একখানি হারিরি পুঁথিতে (৩) ধর্ম্মযাজকদিগের পরিচ্ছদে ও উড্ডীয়মান পতাকা-সমূহে কৃষ্ণবর্ণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে এ বর্ণ টি আব্বাসীয় খলিফাদিগের লাঞ্ছনের বর্ণ বলিয়াই ইহার প্রভাব সে যুগের বর্ণ যোজনায় অধিকতর ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। এ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে হারিরি গ্রন্থে চিত্রাঙ্কনের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত টানিয়া আনা যায় না। আব্বাসীয় খলিফাদিগের রাজ্যকাল অতীত হইলে পর আর তাঁহাদিগের লাঞ্ছনের বর্ণ পূর্ব্ববৎ আদৃত হইতে থাকিবে কেন?

বোগদাদ পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছিল আনুমানিক খৃঃ ৯৯০ অব্দে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর তটভূমে। বোগদাদ, কুফা ও ওয়াসিতের চিত্রশালিকায় চিত্রশিল্পীরা, ইহার বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষা করিয়া এ পদ্ধতির অনুশীলন করিতেন। সিরিয়া ও আরবীয় ইরাকে, খৃঃ দশমশতাব্দীর শেষপাদে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে, এ শৈলীর আবির্ভাব ঘটিলেও উহা যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত, নিজ আরবে না হউক, আরবদেশের বহির্ভাগে, কোনও কোনও প্রত্যন্ত প্রদেশে বলবৎ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। একাদশ শতাব্দীতে মিশরের ফতিমা বংশীয় (Fatimide) খলিফা, মস্তাসির বিল্লা, বসোরা ও ইরাক হইতে দুইজন চিত্রকর আনাইয়া, ভিত্তিগাত্রে দুইজন নর্ত্তকীর চিত্র অঙ্কন করাইয়াছিলেন।

কথিত আছে এ দুইখানি ঠিক একই প্রকার চিত্র হইলেও, পটভূমির অঙ্কনকৌশলে একজন নর্ত্তকী যেন পিছাইয়া যাইতেছে এবং অন্যজন যেন অগ্রসর হইতেছে, বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

পারসীক শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে বাইজান্টাইন শিল্পজাত এই বিশিষ্ট শৈলী যেন খাঁটি পারসীক পদ্ধতির সীমানা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াই থামিয়া গিয়াছে, নিজ গণ্ডী আর অতিক্রম করিতে অগ্রসর হয় নাই।

আমরা এ নিবন্ধে শুধু আব্বাসীয় খলিফাদিগের উল্লেখ করিয়াছি। পারস্যের রাজনৈতিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব্যতিরেকে সমসাময়িক শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় সম্পূর্ণ হইবেনা। এ যুগের পারসীক শিল্পের ইতিহাসে আর তিনটি রাজবংশের উল্লেখ প্রয়োজন। সামানীয়দিগের

---

(১) মঁসিয়ে ব্লশে (I. Blochet) হারিরি পুঁথির চিত্রণকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। (E. Blochet, Mussalman Painting, 12th to 17th century, (Methuer, 1929), P 37.

(২) A. B. Sakisian, Op. cit.

(৩) এ পুঁথিখানি Sohetns Hariri নামে পরিচিত।

রাজত্বকালে আধুনিক পারসীক ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হয় এবং প্রাচীন পারসীক (পেহ্‌লভি) বর্ণমালা পরিত্যক্ত হইয়া আরবীয় বর্ণমালা গৃহীত হয়। পারস্যের চিত্রশিল্পে প্রসাধক কলার বিচিত্র অলঙ্করণের উপাদানরূপে এ বর্ণমালার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। সামান (Saman) নামক এক অভিজাতবংশীয় পারসীক সামানীদ অথবা সামানীয় বংশের আদিপুরুষ। সমরকন্দ বোখোরা ও খোরাসান সামানীয়দিগের শাসনাধীনে থাকে প্রায় একশত ষোলবৎসর ধরিয়া, খৃঃ অঃ ৮৭৫ হইতে ৯৯০ পর্য্যন্ত। সামানীরাজ ইস্‌মাইল গজ্‌না নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন বটে কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আলপ্তগিন নামক সামানীয় রাজের এক সেনানায়ক গজ্‌নায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। ইনিই গজনবীয় (Ghaznavid) বংশের প্রতিষ্ঠাতা। শাহী-বংশ ধ্বংসকারী সুলতান মামুদ ইঁহারই ঔরসপুত্র। কাহারও কাহারও মতে আব্বাসবংশীয়দিগের রাজত্বকালেই কতকগুলি পুঁথি গজ্‌নায় লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ (খৃঃ অঃ ৯৯৮—১০৩০) ও তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েকজন নরপতির তিরোভাবের সহিত এ বংশের অবলোপ ঘটে খৃঃ ১১৮৬ অব্দে। মামুদ দাসানুদাসের পুত্র হইলেও যোদ্ধা ও বিজেতা হিসাবে বড় কম ছিলেন না কিন্তু তিনি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গুণী ও বিদ্বজ্জনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাতি লাভ করিবার। তিনি বহু সুবিখ্যাত পণ্ডিতকে তাঁহার রাজধানীতে বাস করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। বিখ্যাত কালক্রম নির্ণায়ক (Chronologer) অল্ বেরুণী উপায়ান্তর না দেখিয়া মামুদের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। কথিত আছে বিখ্যাত চিকিৎসক ও রাসায়নিক ইব্‌ন্ সেনা (Avicenna) গজ্‌না (গজনী) আগমনকালে মাঝপথ হইতে পলায়ন করায়, তাঁহাকে ঠিকমত সনাক্ত করিয়া ধরিয়া আনার জন্য মামুদ নানাস্থানে তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কন করাইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। মামুদের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি প্রাচীন পারসীক কৃষ্টি সংরক্ষণকল্পে আদি হইতে বিভিন্ন বংশের পারসীক নৃপতিদিগের আখ্যায়িকা সংগ্রহ করাইয়া কবি ফার্দৌসির দ্বারা সাহনামা নামক রাজকাহিনী রচনা। মনে হয় পারস্যে নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন ইতিকথার বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীগুলি বিদ্বজ্জনের স্মরণপথে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং জাতীয় মহাকাব্য রচনার প্রেরণা ক্রমেই দুর্নিবার শক্তিতে কবিগণের মানসকুঞ্জে আবির্ভূত হইতে থাকে। এইরূপ পারিপার্শ্বিক ব্যতীত শুধু ফরমায়েসমত এরূপ একটি মহাকাব্য গড়িয়া উঠিত কি না সন্দেহ। ইহার সহিত ললিতকলার যোগসন্ধি কোথায় এ প্রশ্নের উত্তরে বিনাসঙ্কোচে বলিতে হইবে যে সুলতান মামুদের রাজত্বকালের এই সাহিত্যিক প্রেরণা যদি মহাকাব্য সাহনামার আকারে বাস্তবরূপ ধারণ না করিত তাহা হইলে পারসীক চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে পুস্তক চিত্রাঙ্কনের এরূপ উৎসাহ ও উদ্যম বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ পাইত কিনা সন্দেহ। সাহনামায় বর্ণিত সাসানীয় যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজকুলের ইতিবৃত্ত যে কেবল কল্পনামাত্রসম্বল অনৈতিহাসিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ সেজন্য শিল্পের দিক্ দিয়া বিশেষ কোনও দোষ বর্ত্তে নাই এবং সে কারণ রচয়িতা বা তাঁহার নিয়োগ কর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করা যায় না। ফার্দৌসিকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল জনপ্রবাদবহুল পূর্ব্বযুগের ইতিকথার উপর। প্রাচ্যখণ্ডে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনাপ্রণালী এখনও অনেকাংশে অপরিজ্ঞাত। রাজাদেশে কবির জন্য বহু ঐতিহ্যমূলক চিত্রে পরিশোভিত একটি জনবিরল কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তিনি সেখানেই নাকি তাঁহার কাব্যরচনা করিতেন। এ কক্ষের ভিত্তিগাত্রে প্রাচীন পারসীক নৃপতি ও বীরযোদ্ধৃগণের হস্তী অশ্বাদি বাহন ও বিবিধ আয়ুধসমন্বিত চিত্রাদি অঙ্কিত ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ পারস্যে চিরকালই বলবৎ রহিয়াছে তাই সাসানীয় যুগের ঐতিহাসিক চিত্রকলার প্রতিবাদ এবং সেই সকল চিত্রের অনুকৃতি সুলতান মামুদের এই কক্ষটির ভিত্তিচিত্রণে সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই (১)।

মামুদ শিল্প বিষয়ে দরদী ছিলেন এ কথা বলিলে হয়তো সত্যের অপলাপ করা হইবে। শিল্পের জন্যই যে শিল্পানুশীলনের সার্থকতা, এই আধুনিক মতবাদ তখনকারকালে লোকের ধারণাতেই আসিত না। চিত্রাদি সম্পর্কে ধর্ম্ম বিষয়ক দ্বিধা সঙ্কোচ কোন দিনই একবারে কাটিয়া যায় নাই। শুনা যায় মামুদের পুত্র তাঁহার নবনির্ম্মিত একটি মণ্ডপের গাত্রে আদিরসাত্মক চিত্রাদি অঙ্কন করাইয়াছিলেন। শুনিবামাত্র সুলতান মামুদ ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য তথায় একজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। রাজকুমারকে তাঁহার কোনও শুভানুধ্যায়ী সময় মত সতর্ক করিয়া দেওয়ায় তিনি এ চিত্রগুলি চূণকাম করিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার পথ পান নাই। কোনও প্রকার উদ্দেশ্যমূলক চিত্রাদি হইতে রাজকুলে সাধারণ শিল্পানুরাগ অথবা তৎকালীন শিল্পোৎকর্ষ সূচিত হইতে পারে না একথা মানিয়া লইলেও ভিত্তিচিত্র ও ভাস্কর্য্যাদির সাহায্যে গৃহ সম্পাদন যে সে যুগে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিলনা তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ লেখক ইবন্ হকেই (Ibn Hawqual) উল্লেখ করিয়াছেন (খৃঃ অঃ ৯৭৭) যে ইস্তাখার জেলার কোন একটি সুবৃহৎ হর্ম্ম্য, মূরত ও চিত্রাদির দ্বারা পরিশোভিত ছিল। ফার্দৌসির (ফার্দৌসির) কক্ষসজ্জা বিষয়ক এ প্রবাদ যদি সত্য হয় এবং উহা একেবারে অলীক বলিয়াই না উড়াইয়া দেওয়া যায় কি করিয়া, তাহা হইলে এ সকল চিত্র যে পারস্যের মহাকবির ঐতিহাসিক কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ আবহাওয়ায় চিত্র-সমন্বিত দুই পাঁচখানি পুঁথিও যে গাজনায় লিখিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার হেতু দেখি না।

সেলজুক নামক এক মেষপালকের দুইটি পৌত্র গজনবীয় বংশের ধ্বংস সাধন করেন। ভাগ্যদেবী, এইরূপে, যাহা কল্পনারও অতীত, এমন অনেক কিছু যে সময় হইলেই ঘটাইয়া থাকেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোগ্দাদের শেষ খলিফা যখন বুভিদ (Buvid) অথবা বুওয়েহিদ বংশীয়দিগের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র তখন সেলজুকের পৌত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন রাজভৃত্যরূপে প্রাসাদে প্রবেশ লাভ করিয়া পরে যে কি প্রকারে এক বিস্তীর্ণ স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এ সাম্রাজ্য যতই বিপুল ও গৌরবজনক হউক না কেন খোরাসানেই ইহার গোড়াপত্তন ঘটে। খৃঃ অঃ ১০৫৫ হইতে প্রায় একশতাব্দী ধরিয়া সেলজুক অধিকার পারসীক শিল্প ও সাহিত্যের যে অসাধারণ উন্নতিপটে তাহার পরিসমাপ্তি হয় খৃঃ ১১৫৭ অব্দে সুলতান সঞ্জরের মৃত্যুর সহিত। সঞ্জরের রাজত্বকালেই কবি আনোয়ারি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সেলজুক্ বংশের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ১০৩৭ হইতে ১১৯৭ পর্য্যন্ত। সঞ্জর ব্যতীত এ বংশে আরও তিনজন নরপতি খ্যাতি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে আল্প্ অর্সলান্ (Alp Arslan) অন্যতম। ইঁহারই অমাত্য নিজাম-উল-মুক্ বিখ্যাত কবি ও জ্যোতিষী ওমর খৈয়ামের মিত্র ও সতীর্থ ছিলেন। এই সুহৃদের সাহায্য ব্যতীত ওমর কবিতা রচনায় এবং গণিত বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, এ যুগে বা তাহার পরবর্ত্তীকালে, পারস্যের কোনও চিত্রশিল্পী যে ওমার খৈয়ামের রুবাইয়াৎ গ্রন্থ পুস্তক চিত্রের দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছেন বিশ্বাসযোগ্য কোনও সূত্র হইতে এ কথা এ যাবৎ অবগত হইতে পারি নাই (২)।

(১) Arnold, Paintigg in Islam, p. 82.

(২) ওমর কবির আচার্য্যশিল্পীর নিকট এই প্রাপ্য ঋণ সমেত শোধ করিয়াছেন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। তাঁহার রুবাইয়াতের চিত্রগুলি প্রথমে portfolit আকারে প্রকাশিত হয় পরে Nuttall কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ওমর খৈয়াম স্বদেশে সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। তাঁহার খ্যাতি ছিল জ্যোতির্ব্বিদ (astronomer) বলিয়া।

১১৮৪ খৃঃ অব্দে সেলজুকবংশীয় সুলতান তুগ্রল-ইব্‌ন্‌-আর্সলান্‌ একখানি কবিতা সংগ্রহের পুঁথি জয়নুদ্দিন নামক বিখ্যাত লিপিকার কর্ত্তৃক লিখাইয়া লন। সুলতান তুগ্রলের (তুঘ্রলের) রাজধানী ছিল তেহরন সন্নিহিত রায়ী (Rayyi) নগরীতে। যে সকল কবির কবিতা এই চয়নিকার অন্তর্গত ছিল তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একখানি প্রতিকৃতি চিত্রকর জমাল নক্কাস কর্ত্তৃক পুঁথি মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় বিভিন্ন শত্রুদলের আক্রমণে এ যুগের এবং বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের শিল্পনিদর্শনগুলি প্রায়ই বিনষ্ট হইয়াছে। সেলজুকদিগের রাজত্বকালে অঙ্কিত কোনও চিত্র খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

শ্রীযুক্ত এ, কুণেল (A Kuhnel) নামক কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য সমালোচক বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে বোগদাদ শৈলী বলিয়া যে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সাধারণ্যে পরিচিত তাহার উদ্ভব হইয়াছিল ইরাণেরই কোন চিত্রশালায়; সম্ভবতঃ রায়ী বা তৎসন্নিহিত কোনও নগরীতে। যে সকল স্থানে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা ছিল সেলজুক্‌ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তাই কুণেল বলিতে চাহেন যে এই চিত্রসমূহ সেলজুক্‌ চিত্র বলিয়া আখ্যাত হইলে বর্ণনার যাথার্থই প্রতিপন্ন হইবে (১)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি যে তিনখানি চিত্রিত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কোনখানিই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে। মেসেদ নগরের পবিত্র একটি তীর্থ ক্ষেত্রে (Shrine এ) অর্‌রাজী রচিত যে সচিত্র মুফিদ্‌-ই-খাস্‌ নামক গ্রন্থ রক্ষিত আছে তাহার চিত্রগুলির কোনটিতেই রঙীন পীঠভূমি (back ground) দৃষ্ট হয় না। ইহাই আপেক্ষিক প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইয়া পুঁথিখানি আন্দাজ ১২০০ খৃঃ অব্দের লেখক এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। ইহার পরই কুণেলের মতে যে পুঁথিখানির স্থান পাওয়া উচিত তাহা এই মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে (Staats Bibliothek এ) রক্ষিত ছিল, এখন আছে কি না কে বলিবে? এখানি বিখ্যাত রোমক চিকিৎসক গ্যালেন (Galen) রচিত এক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ (২)। এ পুঁথির চিত্রনিচয় রক্তবর্ণ পটভূমি (back ground) বিশিষ্ট। কি নৈসর্গিক দৃশ্যে, কি মানব ও ইতর জীবাদির আলেখ্যে, এ চিত্রের সবগুলিতেই নক্সাকারী চিত্র রচনাপ্রণালীর প্রভাব দৃষ্ট হয়। পুঁথির ক্ষুদ্রক চিত্রে দৃশ্যাংশের বিন্যাসধারা, এমন কি উড্ডীয়মান বিহগাদির বিনিবেশ কৌশলও, স্পষ্টতঃ অলঙ্করণ প্রণালীর অনুযায়ী। বিশেষ করিয়া এই গ্যালেন পুঁথিতে দেখা গিয়াছে যে অশ্বারোহীর পরিকল্পনায়, জীব জন্তুর আকৃতিতে শাখী শাখার পত্র সম্ভারে, এক কথায় সর্ব্বস্থলেই, যে বিশিষ্ট প্রসাধক ভঙ্গী পরিদৃশ্যমান তাহা পারস্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নির্ম্মিত এক শ্রেণীর চীনা মাটির পাত্রের অলঙ্করণ ও চিত্রণ পদ্ধতির কথা স্মরণপথে উপস্থিত না করিয়া পারে না। সূক্ষ্ম কাচবৎ স্তরে আবৃত এই মৃৎপাত্রগুলি মিনাই ফাইয়েন্স (Faience) নামে অনেকদিনই সমঝ্‌দারদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রসাধক কলার আঙ্গিকরূপে ইহাতে যে সকল তরু, গুল্ম, বিহগ, বিটপী, জলাশয় প্রভৃতির চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত গ্যালেন পুঁথির চিত্রপরিকল্পনার সাদৃশ্য নিতান্ত সুপরিস্ফুট। আর এক কথা। গ্যালেন পুঁথির উড্ডীয়মান পক্ষীগুলি প্রভামণ্ডলে পরিবেষ্টিত। ইহা যে স্পষ্টতঃ আব্বাসীয় প্রথারই অনুকরণ তাহা বলা বাহুল্য। বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত কিতাব-ই-সমক্‌-ই-আয়বার নামক উপন্যাস গ্রন্থের চিত্রসম্বলিত পুঁথিখানি গ্যালেন পুঁথির কয়েক দশকের পরবর্ত্তীই হইবে। মনে হয় এ পুঁথির ক্ষুদ্রকচিত্রসমূহে আসন্ন শিল্প শৈলী পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে। এ চিত্রগুলিও পীঠভূমি শূন্য—হারিরি পুঁথির লালবর্ণ পীঠভূমি ইহার কোনটিতেই অনুকৃত হয় নাই।

তথাকথিত সেলজুক শৈলীর সম্পর্কে যে তিনটী বিষয় উল্লেখ করিয়া পদ্ধতিগত পার্থক্য প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে তাহার কোনটিই সেরূপ গুরুতর বলিয়া মনে হয় না। প্রথম দফা পরিচ্ছদাদির বহুবর্ণে বিমণ্ডন এবং তদুপরি আরবীয় ভঙ্গীতে আবর্ত্তিত লতালঙ্কার সমূহের সন্নিবেশ, দ্বিতীয় দফা সুদীর্ঘ কেশপাশ ও কিরীটাকৃতি মস্তকাবরণ, তৃতীয় দফা বৃক্ষ, গুল্ম, জলাশয়, ও পক্ষী প্রভৃতির চিত্রণ কৌশলে চীনামাটির মিনাই পাত্রাদির চিত্রানুকৃতি। ইহাকে ঠিক শৈলীর পরিবর্ত্তন না বলিয়া পরিবেশজনিত বিভিন্নতা বলিলেই যথেষ্ট হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে শৈলী মেসোপটেমিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার আব্বাসীয় শৈলী, বোগদাদ শৈলী বা যে কোন অপর নামেই পরিচয় দেওয়া হউক না কেন, উহা পারস্যের জাতীয় উদ্বোধনের তিনটি প্রধান কেন্দ্রের, যথা তেহরণের (প্রাচীন রায়ী নগরীর), বোখারার, ও খিভার সুপরিচিত শিল্পধারা হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ধাতুগত বিভিন্নতা দূরে থাকুক বরং দেখা যায় যে মৃৎশিল্পের (Ceramic art এর) সেই মৃতশিল্পের প্রসাধক সজ্জা ও মেসোপটেমিয়ার পুঁথিগুলির নক্সাদির অলঙ্করণধারা ঠিক একই প্রকারের। আব্বাসীয় খলিফাদিগের পরাক্রম তাঁহাদের অস্তাচলগামী গৌরব রবির ন্যায় যখন ক্রমেই তিরোহিত হইতেছিল, তখন পারস্য প্রভাব নিজ পারস্যের সীমানা পার হইয়া ইরাকেও যে না বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা নহে। কলা বিলাসী পারসীক সমঝ্‌দার পুঁথি চিত্রণের ফরমায়েস্‌ দিতে হইলে যে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত নব নব পদ্ধতির আনুকূল্য করিবেন এ অনুমান কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা বিবুধগণেরই বিবেচ্য। হয়তো দুই চারিজন নূতনত্বের প্রয়াসী, স্থানীয় (regional) অথবা দেশীয় কৃষ্টির গণ্ডী অতিক্রমকারী এইরূপ বহিরাভিমুখী বিদগ্ধ সমাজ এ পন্থা যে সমগ্রভাবে অবলম্বন করিবেন তাহা তো সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য বিভিন্ন আড়ঙ্‌ হইতে কারুশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শনাদি আমদানি করার রেওয়াজ সে সময় প্রচলিত ছিল বটে তবে সাধারণতঃ সে কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল ব্যবসায়ীদিগের উপর কিন্তু শুধু মারফৎ চিত্রশিল্পের চাহিদা পূরণ চলিবে কি করিয়া?

ধর্ম্মের দিক হইতে চিত্রশিল্পের প্রতি যে বিরূপতা তাহা মুসলমান বিজয়ের পর কোন সময়েই লুপ্ত হয় নাই। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া মুস্লিম অনুশাসনের আয়ত্তাধীন প্রাচ্যখণ্ডে নূতন শৈলী আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা যে বিশেষ ছিল না তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আব্বাসবংশীয়দিগের যুগে এই তথা কথিত অন্তর্জাতিক শৈলীর ক্ষুদ্রক চিত্র নিজ পারস্যেই আঁকা হউক, বা এসিয়ার এ অংশের নিকটবর্ত্তী অপর কোন দেশেই আঁকা হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে তুল্য মূল্য এবং বিশেষ কোনও পার্থক্য বিবর্জ্জিত শিল্প-ধারার এই অনুরূপতার মূলে ছিল পারসীক শিল্পীদিগের দেশান্তর গমন, তাঁহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুরুষানুক্রমিক শিল্প নৈপুণ্য এবং পারস্যের বাহিরে মেসোপটেমিয়ায় এবং পারস্যের নানা স্থানে তাঁহাদের পুঁথি চিত্রণ সম্পর্কে চিত্রকর্ম্মে নিয়োগ। আব্বাসীয়

Fitzgerald কৃত অনুবাদের একটি বিলাতী সংস্করণে এই সুন্দর চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১) History of miniature painting and drawing by A. Kuhnel incorporated in a Survey of Persian Art, Vol III, pp. 1829, 1830.

(২) গ্যালেন বিদ্যমান ছিলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ ১৩০—২০০)।

শিল্প পরবর্তীকালে বর্ণে ও রেখা সন্নিবেশে যে রূপ মূর্ত্ত ও রূপায়িত হইয়াছিল, সে রূপের শক্তিমান ব্যাখ্যাতা হিসাবে পারসীকেরাই যে ইহা আপন বলিয়া দাবী করিবার অধিকারী এ কথা মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবার কারণ দেখি না। বিশেষজ্ঞ ব্লশে (Blochet) এই কারণেই শুধু তাবারির ইতিহাসের চিত্রিত পুঁথি নহে খৃঃ ১২০৩ অব্দে নকলকরা কবি কার্দৌসির একখানি সাহনামার চিত্রাবলীও আব্বাসীয় শিল্পের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে (১) এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে কাহারও কাহারও মতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যে লিখিত সেই বিদ্‌পাই পুঁথির চিত্রগুলিই বোগ্দাদের খলিফা দিগের যুগের চিত্রশিল্পের প্রকৃষ্ট ও প্রাচীনতম নিদর্শন।

(১) Blocket, loc. Cit. p. 33

'প্রান্তিক'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

'প্রান্তিক'-কাব্যের প্রারম্ভেই কবি গাহিয়াছেন :—

"অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্ত পানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী।"

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবি-জীবনের অন্তিম সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে Swan song বলিলে যাহা বুঝায় ইহাকেও সেই আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। কবি এখানে অস্তায়মান সূর্য্যের সহিত আপনার তুলনা করিয়াছেন। তুলনাটি যেমন সার্থক তেমনই সুষ্ঠু। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সহিত একমাত্র আকাশের স্বলজ্জ্যোতি রবির তুলনাই সম্ভব—আর কিছুরই নয়। "Others abide our question, but thou art free"—ম্যাথু আর্নল্ডের এই উক্তিটি শুধু সেক্সপীয়র নয়—রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও খাটে। তাই আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"বল গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা,
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে—
করিতে পারিনে সেবা !"

বিদায়প্রার্থী কবির ভারাক্রান্ত হৃদয়ের একটি চিহ্ন যেন 'অন্তিম পূরবী' এই দুইটি শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 'পূরবী' কথাটি কবি এখানে শুধু মিলের খাতিরে গতানুগতিকভাবে প্রয়োগ করেন নাই,—ইহারও একটি সুন্দর সার্থকতা আছে। দিবাবসানকালেই পূরবী রাগিনীর সকরুণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় ; অস্তাচলশায়ী সূর্য্যের সঘন বিরহবেদনার সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি নিবিড়। এই রাগিনীর সহিত একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ব্যথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। সংসার যে অশ্রুহত এবং অশ্রুর পাথার—শেলীর ভাষায় "A dim vast vale of tears"—ইহা যেন মনকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয় !

'প্রান্তিক'-কাব্যখানির আয়তন ক্ষুদ্র ; কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও রবীন্দ্র কাব্যসমূহের মধ্যে যে ইহার একটি বিশিষ্টস্থান আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম "কবির্মনীষী চ দ্রষ্টা" রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছন্দোময় অভিব্যক্তি হিসাবেও ইহার মূল্য কম নয়। রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতির ধারানুসরণ করিতে হইলে ইহাকে বাদ দিলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে সমগ্রভাবে কোনো কবির কাব্য-বিচার করিতে হইলে তাঁহার কোনো রচনাই উপেক্ষণীয় নয়। নদী-প্রবাহের মধ্যে যেমন একপ্রকার নিরবচ্ছিন্নতা আছে, কবির কাব্য-সমূহের মধ্যেও সেইরূপ একটি নিবিড় নিরবচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য কাব্যের সহিত সমগ্রভাবে পরিচয় না হইলে অর্থাৎ কাব্যকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখিলে কবি-চিত্তের একটি যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়।

সমগ্র 'প্রান্তিক' কাব্যখানি একটি সকরুণ বিদায়-গীতিকার লক্ষণাক্রান্ত। আসন্নমৃত্যুপথযাত্রী কবি এখানে সংসারের নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। টমাস্ গ্রে যাহাকে "Longing lingering look" বলিয়াছেন তাহারই একটি অশ্রু-সজল উদাস মায়া এই বিদায়-সঙ্গীতের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। সুদীর্ঘ জীবনের শেষে সংসারের নিকট কবি আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না এবং তাই তিনি বলিতেছেন,—

"কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গনে যে আসন
পাতা হ'য়েছিল কবে, সেথা হ'তে উঠে এসো কবি,
পূজা সাঙ্গ করি' দাও চাটুলুব্ধ জনতা দেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া।"

জীবনে যাঁহার শিরে খ্যাতি ও সম্মানের অজস্র লাজাঞ্জলি বর্ষিত হইয়াছে, বিদায়-বেলায় সুলভ খ্যাতির মূল্য তাঁহার নিকট থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জীবিতকালে এত যশোলাভ পৃথিবীর কোনো কবির ভাগ্যেই হয় নাই। আত্ম-সমাহিত কবি হৃদয় এখন শান্তির জন্য উন্মুখ ; কারণ—

"দিনের সহস্র কণ্ঠ
ক্ষীণ হ'য়ে এল ; যে প্রহরগুলি ধ্বনিপণ্যবাহী
নোঙর ফেলেছে তারা সন্ধ্যার নির্জ্জন ঘাটে এসে।"

মনে পড়ে একটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার কথা—

Sunset and evening star
And one clear call for me !

বিদায়োন্মুখ কবি আপনাকে পাখীর সহিত তুলনা করিয়াছেন :—

"যাবার সময় হ'ল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে।"

কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত গীতিপ্রবাহে এবং পাখীর কাকলির মধ্যে একটি চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাই ; এই দুইটিই "অকারণ পুলকে" উৎসারিত হইয়া উঠে। "এখনি কুলায় রিক্ত হবে"—ইহা কি শুধু একটি ঘটনার বিবৃতি মাত্র ? ইহার পশ্চাতে কি একটি অব্যক্ত বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া নাই ? মায়া-মমতার সহস্র নাগপাশে পার্থিব জীবন আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করা সহজ নয়। তাই কবির মিনতি—

"হে সংসার আমারে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জ্জন ক'রো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।"

কী করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ! কিন্তু ইহা শুধু বিদায়োন্মুখ কবির উক্তি নয়,—মৃত্যুভয়ার্ত্ত নিখিল মানব-চিত্তের ইহাই চিরন্তন প্রার্থনা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়াও মানুষ আপনাকে উৎসব-রজনীশেষের দলিত মথিত

বিগত-সৌরভ পুষ্পের মত প্রয়োজনহীন মনে করিতে ব্যথা পায় ; সংসারে তাহার অস্তিত্বের আর এতটুকু মূল্য নাই—এ চিন্তা কী দুর্ব্বিসহ ! অনাদিকাল হইতে ধরিত্রীর মর্ম্ম ভেদ করিয়া কেবলমাত্র এই সকরুণ মিনতি উত্থিত হইতেছে—

আমারে বারেক ফিরে চাও।

"দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্" বলিয়া সংসারকে যতই নস্যাৎ করা যাক্ এবং তত্বজ্ঞগণ যতই চীৎকার করিয়া মরুক্ "অয়মবিচারিতচারুতয়া সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ", তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত্তে সংসারের প্রতি এই লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিবার আকুল স্পৃহার মধ্যেই নশ্বর জগতের চারুতা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল জীবনের পূজারী ; কিন্তু জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবনকে ভালবাসিবার উপায় নাই। তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, ষড়ঋতুর লীলা ও অশ্রুহাস্যধৌত সংসারের বৈচিত্র্য—সকলই তাঁহাকে আবাল্য মুগ্ধ করিয়াছে।

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।—"

জীবনের প্রতি কী গভীর অনুরাগ ইহাতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে ! কিন্তু ইহা রচনাকালে মৃত্যু-দূতের অমোঘ আদেশ কবি হৃদয়কে উদ্বেজিত ও উচ্চকিত করিয়া তোলে নাই। মৃত্যু যখন কবির শিয়রে বসিয়া গর্জ্জন করিতেছে—বৈতরণীর জলপ্রবাহের কলনাদ যখন অন্তঃকর্ণে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে মৃদু ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে, 'প্রান্তিক' সেই জীবন-মৃত্যুর মত পৃথিবীর একটি অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণামের মধ্যে যে কবি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন তিনি যে সাধারণ সাংসারিক জীবনের—humdrum life এর কত উর্দ্ধে বাস করিতেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা যে তাঁহার ঔপনিষদিক শিক্ষার ফল এবং গভীর দার্শনিক মনোভাব-প্রসূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই 'প্রান্তিক' কাব্যে কবি বলিতে পারিয়াছেন,

"পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন কর বন্ধন ;
রেখেছে হরণ করি' মরণের অধিকার হ'তে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন্ ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তার হব অনুগামী।

সত্যই মর্ত্তজীবন যেন 'স্বপ্নের বন্ধনে' মানুষকে জড়াইয়া রাখিয়াছে ; এই স্বপ্ন অন্তকেই বোধ হয় আমরা মৃত্যু আখ্যা দিয়া থাকি ! Shakespear বলিয়াছেন :—

We our such stuff
As dreams our madion and our little life
Is rounded with a sleep !

জীবন সুন্দর, মধুর ও মমতায় ভরা ; কিন্তু "মরণের অধিকার হ'তে" যে ধনগুলি সযত্নে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেগুলিও তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে—অর্থাৎ জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। এই অজানার রাজ্যে ঝাঁপ দিতে জীবন-পূজারী কবির হৃদয়ে একটা বেদনাবোধ জাগিয়া উঠে নাই তাহা নয় ; কিন্তু প্রাকৃতজনের চিত্তে মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-প্রসূত যে বিভীষিকা জাগিয়া উঠে, জ্ঞান-বৃদ্ধ কবিকে তাহা কোনোদিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি জানিতেন,—

We must endure
Our going hence even as our Coming hither.
Ripeness is all.

"Ripeness"—জীবনের নিটোল নিখুঁত পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের মত সংসারের কয়জনের ভাগ্যে লাভ করা ঘটিয়া উঠে ?

জীবন-যবনিকার অন্তরালে রহস্যময় মৃত্যুরাজ্যের একটি কাল্পনিক চিত্র 'প্রান্তিকে, কবির তুলিকায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা রচনাকালে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া যে তাঁহার চৈতন্যের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবন হইতে—অথবা নির্ভুল ভাবে বলিতে গেলে—দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন উৎক্রান্ত মানবাত্মার গতিপথ অজ্ঞাত এবং সুদীর্ঘ। কবি বলিতেছেন—

"এজন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্যঘাতে, সে মুহূর্ত্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্ম্মমের পানে।"

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের অবসন্ন চৈতন্য ও অনুভূতিকে 'প্রান্তিক' কাব্যে কবি যেরূপ ছন্দে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা সত্যই অতুলনীয় ; প্রতিভা অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলে।

"দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি'
নিয়ে অনুভূতি পুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্রকরা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।"

বাস্তবিক এই বর্ণনাটিকে কবি-কল্পনার tour-de-force বলিতে ইচ্ছা হয় ! মানুষের চৈতন্য যখন অসাড় ও অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন তাহাতে গোধূলির অন্ধ-আলোক ও অর্দ্ধ-অন্ধকার বিজড়িত একটি অস্পষ্টতাও কুহেলিকার সৃষ্টি হয়। নিপুণ শিল্পী তাহাকে অবলীলাক্রমে ভাষায় রূপ দিয়াছেন ; অবস্থাটি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ! মৃত্যুর পর মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে একথা মানিতে হইবে যে বিদেহ অবস্থায় চৈতন্যের ধ্বংস নাই। মৃত্যুকালেও উক্ত প্রক্রিয়া সংঘটিত হইবার পর আত্মার একপ্রকার স্বপ্নজড়িমার ভাব উপস্থিত হয়। কবি বোধ হয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরের অবস্থাটি কল্পনা-বলে আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া তাহাই প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাহাই "অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়" লিখিবার সার্থকতা। জানি না এ ব্যাখ্যা সঙ্গত কিনা—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাংন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্!" অবশ্য "অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলা" কথাটির দ্বারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরের জড়িমা না বুঝাইয়া দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তিবশতঃ কবির চেতন ও অর্দ্ধ চেতন অবস্থাকেও বুঝাইতে পারে কিন্তু "এহ বাহ্য আগে কহ আর,"—অর্থ লইয়া বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন।

"প্রান্তিকে" রবীন্দ্রনাথ শেষ বিদায়ের সুর বাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহাকে যে এক অজ্ঞাত নবজীবনের মধ্যে জাগ্রত হইতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন :—

"পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূণ্য দিগন্তের ভূমিকায়।"

এখানে গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোক মনে পড়ে :—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী

কবি এখন এই মর্ত্ত্যলোকে নাই ; তিনি কি এখন শূন্য দিগন্তের ভূমিকা রিক্তহস্তে নূতন জীবনচ্ছবি রচনা করিতেছেন ? সেই শূন্য দিগন্ত কি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভাচ্ছটায় পূর্ণ ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই ? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে ?

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

"কয়লা নেই," "কয়লা নেই"—চারিদিকে কয়লার জন্যে হাহাকার! চাল গেল, ডাল গেল, তরী তরকারী গেল, এখন আবার কয়লার সমস্যা। মাধব মুখুজ্জ্যের চোদ্দপুরুষে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। স্নান এবং আহারকার্য্য সমাধা করে মাধববাবু শয্যায় আশ্রয় নিলেন। ক্লান্তিতে শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে, তবুও কিছুতেই চোখে ঘুম আসছে না। সকাল থেকে, শুধু সকাল থেকে কেন, কয়েকটা দিনের অবিরত চেষ্টা আর অবিশ্রাম খাটুনীর পর এখান সেখান থেকে প্রায় মণখানেক কয়লা জোগাড় করেছেন। রাস্তার মোড়ে একটা দোকান আছে, সেখানে কণ্ট্রোল খুলেছে। বাড়ীর চাকর নিবারণচন্দ্র কয়েকদিন ধরে হয় বাল্‌তী, নয় থলে আর পয়সা নিয়ে মহাআড়ম্বর করে কয়লার সন্ধানে যায়, বেলা প্রায় শেষ করে শূন্য হাতে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ফেরে।

কর্ত্তা আজ রেগে বল্লেন, "বেটাছেলে, কোন কাজের নয়—দাও বাল্‌তী, আমিই আন্‌ছি।"

মেজ ছেলের বড় ছেলে সন্তোষ বাল্‌তী নিয়ে গেছে, দূরে কোথায় কয়লা দিচ্ছে তারই সন্ধানে। তার সঙ্গে ছোট বড় সকলে অর্থাৎ মাধববাবুর আরও গণ্ডাকতক্ নাতিনাত্‌নী, গামছা, ঝাড়ন, বাল্‌তী, থলে যে যা পেয়েছে নিয়ে তার সঙ্গী হয়েছে। অগত্যা তিনি একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি নিয়ে গজ্ গজ্ করতে করতে চল্লেন—পাড়ার কয়লার দোকানে।

বেলা প্রায় নটা, সুতরাং স্থান পেলেন সকলের পিছনে। গলায় গামছা, খালি গা, হাতে প্রকাণ্ড ঝুড়ি—মুখুজ্জ্যে মশাইকে চেনবার জো নেই। সামান্য কয়লা যা কোনরকমে মুটের মাথায় চাপিয়ে দোকান থেকে এনে বাড়ীর এক কোণে ফেলে রাখা হয় একান্ত অবহেলায়, যার জন্যে চিন্তা নেই, মহামূল্য সম্পদ্ বলে চোর-ডাকাতের হাত থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে 'সাহেবের দোকানের' তৈরী করা মজবুত্ মজবুত্ বাক্স-পেটরা সিন্দুকের দরকার নেই, কোনোকালে দরকার হয়ওনি, আজ সেই কয়লা দুষ্প্রাপ্য হয়ে সকলকে দিশেহারা করে তুলেছে। আপিসের কেরাণী থেকে, বড়বাবু থেকে, জজ্ ব্যারিষ্টার উকীল, মোক্তার এমনকি বড়বড় সাহিত্যিক্ পর্য্যন্ত সকলের মাথায় হাত, ছুটোছুটি, গলদঘর্ম্ম এমনি আরও কতরকমে নাস্তানাবুদ্ হ'তে হচ্ছে। সুতরাং মাধববাবুকে যে ঐ অবস্থায় কয়লার দোকানের কণ্ট্রোলে গিয়ে দাঁড়াতে দেখা যাবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?

যাই হোক্, অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে তাও কর্পূরের মত নিঃশেষ হয়ে উঠে গেল। ধাক্কা খেয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চুপ করে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হ'ল না। সামনে এগিয়ে গেলেন কুইক্‌মার্চ্চ করে। যার দোকান তাকে ডেকে বল্লেন, "হ্যা হে সুধাংশু, বলি না হয় কয়লার-ই দোকান করেছ বুদ্ধি করে, তাই বলে এমনি করে কি আমাদেরও দুর্দ্দশা করতে হয়? ঘণ্টাখানেক্ হ'তে চল্‌ল, তোমার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি একটু হাত চালিয়ে দিতে হয় তো···। নাও এখন উদ্ধার কর।"

মাধব মুখুজ্জ্যের হাত থেকে প্রকাণ্ড ঝুড়িটা নিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে সুধাংশু বল্লে—"ছিঃ ছিঃ কি কাণ্ড, এ কী আপনার কাজ? দিন্ আমায় দিন্। বাড়ীতে কি কেউ ছিল না?" বেচারী দোকান করে যেন মহাঅপরাধ করে ফেলেছে আর অপ্রস্তুতেরও একশেষ। শেষে নিজেই লোক মারফৎ কয়লা দিয়ে পাঠায়।

বেলা এগারটার পর মাধববাবু বাড়ী ফিরে গিন্নীর কাছে নিজের বুদ্ধির তারিফ্ করে বল্লেন—"দেখ একেই বলে বুদ্ধি! রোজ ঐ নিবারণটাকে না পাঠিয়ে নিজে যদি একবার করে সুধাংশুর দোকানে যাই রোজ কয়লা পাব। বুঝ্‌লে গিন্নী, রোজ আমি যাব। উঃ এতদিন কী কাণ্ড-ই করেছি, নিজে গেলেই হ'ত!"

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌লেন—"আহা। কথার ছিরি দেখনা। এবার থেকে নিবারণ তোমার হয়ে আপিস যাবে; আর তুমি নিবারণের হয়ে কয়লা আনতে যেও—"

আর দ্বিতীয় কথাটী নয়। মাধববাবু তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলেন। তারপর আহারাদি সমাধা করে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। হাতে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে ভুড়ুক্ করে টানছেন আর চোখ দুটো একবার করে বুঁজে আসছে আবার তক্ষুণি খুলে যাচ্ছে।···

মণখানেক কয়লা কদিন-ই বা হ'বে। দুদিন না যেতে সব ফুরিয়ে গেল। চারিদিকে আবার ছুটোছুটী, সুধাংশুর দোকান লাটে উঠেছে। ওয়াগন্ পাওয়া যাচ্ছে না, কয়লা আসবে কী করে? ওদিকে রাণীগঞ্জ আর আসানসোলে রাশি রাশি কয়লা, আর এখানে লোকের বাড়ীতে কয়লার অভাবে হাঁড়ী চড়ে না।

কেউ পরামর্শ দিলে, কুকার কেনা যাক্, সুবিধে হবে।' মনটা সবেমাত্র একটু আশান্বিত হয়ে উঠেছে, ওপাশ থেকে একজন বলে উঠ্‌ল'—"হাঁ দু'দিনবাদে জলও বন্ধ হবে, পাম্পিং ষ্টেশন চলবেই বা কী দিয়ে? ওদেরও তো দোষ দেওয়া যায় না। দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না। দোষ বাঙ্গালীর, আর তার অদৃষ্টের। যাই হোক মাধব মুখুজ্জের চোখে প্রায় জল এনে দিলে ওপাড়ার পরাশর মল্লিক। "আর দেখছেন কি মশায়? কয়লা কি? এবার তরীতরকারী আনাজ পত্তর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। চাল ডালের কথা তো বাদ্ দিন একেবারে। কিছু নেই এবার সেই একেবারে আদম্ ইভের যুগ, মাধববাবু। শুধু গাছে চড়, ফল পাকড় খাও আর হুপ্ হাপ্ করে লাফিয়ে বেড়াও। সব বন্ধ—আপিস্ নেই, কাজকর্ম্ম নেই, রান্নাবাড়া নেই, তার ওপরে আলো নেই, জল নেই···। উঃ! কী যুদ্ধই বেধেছিল যে বাবা! একেই বলে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে আর উলুখড়ের প্রাণ যায়।"

হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাধব মুখুজ্জ্যে। নিজের বাড়ী···

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, শুনতে পেলেম, বড়ছেলে পরিমল

'নিবারণকে নিয়ে বাজার করতে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে শূন্য হাতে, পূর্ণ পকেটে। বাজারে কিছু নেই, শুধু কয়েকটা টীনের ছাউনী আর বড় বড় সিমেণ্টের গাঁথা রোয়াক্। আর কিছু নেই। সব শূন্য—বাজারই বসেনি। নাঃ তাহ'লে পরাশর তো মিথ্যে বলেনি। কল্‌কাতায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। সকলে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। রাস্তায় পা দেবার উপায় নেই, অলিতে গলিতে নাকি মড়া। দুজনের যা বর্ণনা চল্‌তে লাগল, মাধববাবুর মনে হ'ল তা অবর্ণনীয়। একটা উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে তিনি বল্লেন, "যাক্ এতদিনে তাহ'লে ষোলকলা পূর্ণ হ'ল।" কড়িকাটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবার ঘরের মেঝের ওপরে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে মাথাটা দুই হাঁটুর ভেতরে চেপে ধরলেন'

কতক্ষণ যে বসেছিলেন মনে নেই, হঠাৎ কাণে গেল, বাড়ীর ভেতরে ছেলেমেয়েদের তারস্বরে চীৎকার। তাদের আনুনাসিক সুরটাই কাণে লাগ্‌ছিল বেশী করে। "কিঁ শুঁধু আঁধ সেঁদ্ধ ভাঁত কীঁ কঁরে খাঁব।" সত্যিই তো রোজকার চোষ্য চোষ্য লেহ্য পেয়র ব্যাপারটা একমাত্র আধসেদ্ধ দুমুঠো ভাতের ওপর দিয়ে যাবেই বা কী করে? আর কি করেই বা সাতরকম ঝোল ঝাল অম্বল খাওয়া ছেলেমেয়েদের রুচি হবে ঐ অখাদ্য গিলতে?… মাথাটা প্রায় বুকের কাছে নেমে এলো।

হঠাৎ পা ধরে টানাটনি। যেন হাজার সৈন্যের অভিযান সুরু হয়েছে মুখুজ্জ্যে মশায়ের ওপরে। "আঃ" বলে বিরক্ত হয়ে মাথাটা উঁচু কোরতেই দেখেন,—সন্তু, মিন্তু, কালী, ঘোঁৎনা, পচা, হাবু, গবু, তারু, ঝণ্টু, থাঞ্জা, গজা, যত নাতি নাত্‌নীর দল এসে পা ধরে টানাটানি করছে। "আঃ আবার টানে? টানছিস্ কেন? কি হয়েছে কি?" বলতেই সমস্বরে তারা বলে উঠ্‌ল—"দেখছনা, সকলে না খেতে পেয়ে মরছি! খাওয়াবার কর্ত্তা তুমি আর খাওয়ার সময় লুকিয়ে বসে থাকবে? আর এদিকে আমরা উপোস করে মরব? ওঠো শিগ্‌গীর, তুমি না খাওয়ালে তো আমাদের ভারী বয়েই গেল। আমরা একটা উপায় ঠিক করেছি। বাড়ীতে আনাজ পত্তর নেই, দেখনা চোখ দিয়ে আমরা কি হয়েছি।"

এতক্ষণে মুখুজ্জ্যে মশায়ের হুঁস হ'ল। চোখ দুটো ভাল করে রগ্‌ড়ে দেখলেন—কী দেখলেন? কমলাকান্ত যা দেখেছিলেন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত কিছু। তাই তো…কেউ হয়েছে পটল, কেউ বেগুন, কেউ আলু, কেউ ঝিঙে, পেঁয়াজ, কয়লা, উচ্ছে। আর চিচিঙ্গে হয়েছে পরিমলের রোগা ছেলেটা—ঘোঁৎনা। এত দুঃখের দিনেও তিনি সব ভুলে হো হো করে হেসে উঠলেন। "আরে বাঃ বাঃ বেশ বেশ হয়েছে।" তাঁর হাসি দেখে ঘোঁৎনা রেগে উঠ্‌ল—"ক্ষিধের জালায় মরে যাচ্ছি, আর উনি হাসছেন। হাসছ যে?" অমনি ওপাশ থেকে মিন্তু বল্লে, "ওঠ তুমি—আমরা আনাজ হলুম এখন রান্না করা হবে কি দিয়ে? কয়লা তো নেই। চল তোমাকে পোড়ান হবে। তার পর সেই আঁচে রান্না হলে তার পর খাওয়া দাওয়া।"

সকলে আবার সমস্বরে বলে উঠ্‌ল "কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? শুনতে পাচ্ছ না?" হতভম্ব মাধব মুখুজ্জ্যে শিউরে উঠ্‌লেন—একবার এপাশ থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ছাপ ঐ টুকু টুকু ছেলে মেয়েগুলোকেও কী ভয়ঙ্কর হিংস্র করে তুলেছে। বিস্ফারিত চক্ষু দুটো বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

এমন কি কখনও হয়? আর এরা বলেই বা কী? কলি'র শেষ কি এমনি করেই হবে? কুকারে'র বদলে "মাধব কয়লা'!" হরি হরি, এতও বরাতে ছিল?

বুড়োদাদুর অবস্থা দেখে সন্তুর বোধ হয় একটু দয়া হ'ল। বল্লে, "আমরা দিদিমাকেই আগে বলেছিলুম, তা দিদিমা বল্লে, যে তাহ'লে রেঁধে দেবে কে? বামুন তো পালিয়েছে।"

লোকে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। কিন্তু গিন্নী সেই স্ত্রীবুদ্ধির জোরেই তো রেহাই পেলেন। অতএব গিন্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে এই 'মহাপ্রলয়' থেকে হয়ত উদ্ধার পেতে পারেন। মনে মনে ইষ্টনাম জপ করে বল্লেন—"তোদের তো উনুনে হাওয়া দেবার দরকার হবে সেই কাজের ভারটা আমায় দেনা। তোর দিদিমা যেমন রেঁধে দেবে, আমিও তেমনি হাওয়া দেবো।" সকলের মুখের দিকে তিনি সাগ্রহে চেয়ে রইলেন।…

যুক্তিটা বোধ হয় সকলের মনঃপূত হ'লনা, বলে উঠ্‌ল, "ওমা কী চালাক্ দেখেছ? না না সে হবে না, ওসব আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। পচা ইংরিজি পড়েছে, বল্লে, "Division of labour" বুঝলে দাদু, Division of labour। এক একজন এক একটা কাজের ভার নিয়েছে। ওসব আমরা আগেই ঠিক্ করে নিয়েছি। 'নিবারণ' হাওয়া দেবে। তুমি বেশ মোটা সোটা আছ অনেকক্ষণ আঁচ থাকবে…আঃ কী মজা।"

"আর আশা নেই—'একতার জয় সর্ব্বত্র। ওরা আজ দলবদ্ধ, তার ওপর কার্য্যবিভাগে ওরা পারদর্শী তা নইলে আমি জন্মব আমারই অন্নদাস হাওয়া দেবে আমার পোড়াবার জন্যে?"

ওঠ্‌বার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে নিরুপায় মুখুজ্জ্যে ম'শায় ভাল করে চেয়ারটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলেন।

ঘোঁৎনার রাগ সব থেকে বেশী—বল্লে "ওরে দাদু ভয় পেয়েছে, উঠবেনা। দেখছিস্ না আঁকড়ে ধরে বসে আছে? চল্ সকলে চেয়ার শুদ্ধ রান্নাঘরে নিয়ে যাই।"

হরিবোল হরি—এরা করে কী? হায় হায়। সত্যি কি কল্‌কাতার বুকে বসে আছি, না আফ্রিকার জঙ্গলে অসভ্য কয়েকটা বুনো জংলীর হাতে পড়েছি। এইসব ভাবেন আর ঝরঝর্ করে চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।…ঠাট্টা নয় সত্যি সত্যিই উনুনের কাছে মাধববাবুকে চেয়ার শুদ্ধ বসিয়ে ঘুঁটে আর কেরোসিন তেল দিয়ে তাঁর চিতা সাজান হ'ল তাঁরই সামনে। সকলে মিলে ভদ্রলোকের পা দুটো পুরে দিলে উনুনের মধ্যে। খুন্তী নিয়ে এগিয়ে এলেন মেজবৌমা—রক্ষেকালী তাঁকে রক্ষা করবার কোন চেষ্টা করলে না—উপরন্তু রান্নার বড় কড়াটা এনে দুম্ করে উনুনের ওপর যখন বসিয়ে দিলে তখন মুখুজ্জ্যে মশায়ের সারা শরীর দাউ দাউ করে জলতে সুরু করেছে।

বড়বৌমা আন্নাকলী আঁচটা ভাল হবার জন্যে একটা সরু কঞ্চি দিয়ে মাধববাবুর হাতপা, তারপর মাথাটা উনুনের মধ্যে পুরে দেবার জন্যে খোঁচাতে লাগ্‌ল—তিনি তারস্বরে চীৎকার করে বল্লেন "ওমা, আর নয় মা, আর নয়—মাথাটা বাইরে থাকতে

দাও।" বৌমা তাঁর মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে ভাল করে ঘুরিয়ে দিলেন উনুনের ভেতরে। গিন্নীর হাতে খুন্তি জোর জোর নড়ছে। একে একে সব রান্না হল। খাবার আসন পড়ল। নাতি, নাতনী, ছেলে মেয়ে, বউ গিন্নী সব যেন চার হাত দিয়ে খেতে লাগল। মানুষ দুদিন না খেয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে—এ ধারণা কোনও দিনই তাঁর ছিল না আজও এদের না দেখলে বুঝতে পারতেন না।

চোখের কোণ দিয়ে হু হু করে জল পড়ছে, তবু ওদের দিকে দেখছেন আর ভাবছেন—এরা কি মানুষ না হিংস্র পশু? এখন ওরা সব কিছু করতে পারে। বুদ্ধি নেই…কে বল্লে নেই? না থাকলে রান্নার এইরকম চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করতে পারত কী করে? তারপর…বিবেকও নেই…সেটা সত্যিই হয়ত নেই…যাকে 'কোক্ কয়লা' করে রান্না হ'ল, যার জন্যে খাবার তৈরী করা সম্ভব হ'ল, তাকে বাদ দিয়ে সকলের খাওয়া দাওয়া কেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে।

এতক্ষণ ধরে সারা শরীর জ্বলছিল হু-হু করে—এবার জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল উদর দেবতা। উনুনশালা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন আর কেঁদে কেঁদে চোখ দুটোকে পাঁউরুটী করে তুললেন।

মিন্তুর বোধ হয় দয়া হ'ল—হাতে একটা পটলের দোর্ম্মা, কাছে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের কড়া মোছা একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে দিতে বল্‌তে লাগল—"আর কেঁদনা দাদু, খিদে পেয়েছে? এই নাও…এটা খাও, ওঠো……।"

… … … …

চোখ চেয়ে মাধব মুখুজ্জ্যে দেখেন—ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মিন্তু। চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, "কাঁদছ কেন? কেঁদনা অনেক কয়লা পাওয়া গেছে।"

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিন্নী বল্লেন—"দোকানে কয়লা আসতেই সুধাংশু মণ দুয়েক কয়লা পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ীতে। ভাগ্যিস্ সকালে গিয়েছিলে! যাই, দামটা পাঠিয়ে দিইগে। তুমিও উঠে পড়—সন্ধ্যে হয়ে এলো তার কতক্ষণ শুয়ে থাকবে?" তিনি চলে গেলেন।

প্রকাণ্ড একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি উঠে বস্‌লেন। সারাদিনের ক্লান্তির পর চোখ খুল্‌তে খুল্‌তে আর বুঁজতে বুঁজতে কখন যে সম্পূর্ণভাবে বুঁজে ফেলেছিলেন মনে নেই। তারপর এই প্রাণ কাঁপানো ভয়ঙ্কর শুধু ভয়ঙ্কর নয় রোমাঞ্চকর দুঃস্বপ্ন। মানুষকে একেবারে দিশেহারা করে দিয়েছে।

মাটীতে পড়ে যাওয়া আলবোলার নলটীকে সযত্নে তুলে নিয়ে কোঁচার খুঁটে মুখ গলা ঘাড় মুছতে মুছতে তিনি ভাবতে লাগলেন—যে এতক্ষণ যা কিছু দেখেছেন—যা কিছু শুনেছেন, তার সবটুকুই দুঃস্বপ্ন—তা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সত্যি যদি হ'ত। তা হলে?

দুরাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মজিয়া গিয়াছে নদী, অগভীর জল,
নাহি চঞ্চলতা-স্রোতে নাহি আর বেগ,
স্বচ্ছ জলে ক্রীড়া করে সফরীর দল,
চলিয়াছে আঁকা বাঁকা ক্ষীণ জল রেখ্।

২

বাহি ক্ষুদ্র ডিঙিখানি চলেছে ধীবর,
সারাদিন্ মাছ ধরে, শুকায় সে জাল,
ধরা বাঁধা এই কাজ বছর বছর,
একই পথে যাওয়া আসা সকাল বিকাল।

৩

দেখি তারে ভাবি আমি এতেই কি শেষ?
এতেই নিবৃত্তি তার আশা আকাঙ্ক্ষার?
নাহি তার অসন্তোষ—উদ্বেগের লেশ?
পরিতৃপ্ত থাকে না সে দুরাশার ধার?

৪

কথা কয়ে বুঝিলাম—গভীর বিশ্বাস,
একান্ত নির্ভর, যবে ভক্তি ভগবানে,
কিন্তু দেখি ছোট তার নহে অভিলাষ,
দুরাধিরোহিণী আশা জাগে তার প্রাণে।

৫

বলে "বাবু একদিন এসেছেন যিনি
ছেলে হয়ে গোকুলেতে গোয়ালার ঘরে
ভগবান হলে ও সে দীনবন্ধু তিনি,
সকল দীনের ঘর খোলা তাঁরি তরে।

৬

কাছে এলে ধন জন তিনি সরে যান
বলে লোকে—তাঁহাকেই পেতে শুধু সাধ,
হয় ত পাবে না পৌঁছে এ জন্মে সন্ধান
পাবো জানি—কারো সাথে নাহিক বিবাদ

৭

যারে ভাবিতাম আমি অল্পে তুষ্ট বড়,
সদানন্দ—ন্যায্য অংশ পাক বা না পাক
এ যে দেখি দুরাকাঙ্ক্ষ অতি উচ্চতর,
চায় ভগবানে—আমি শুনিয়া অবাক।

৮

এঁদো নদী সেও জানে গঙ্গা সাথে যোগ
অসীম সমুদ্র সেও পর নয় তার,
ভুলে যায় সব দৈন্য দুঃখ কর্ম্মভোগ
বিশীর্ণ বুকেতে খেলে ভাঁটা ও জোয়ার।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস-এস, এফ-আর-ই-এস

(২) *

শিক্ষা

শৈশবেই উমেশচন্দ্র খিদিরপুর হইতে নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে ২৮ সংখ্যক ভবনে আনীত হন। এই বাটীটি তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুত্রের গৃহশিক্ষক পীতাম্বরকে দান করিয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র বাল্যে হরেরাম পণ্ডিতের স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে প্রবেশ করেন। রক্ষণশীল



উমেশচন্দ্র

হিন্দুরা এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কারণ হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য ভোজন ও মদ্যপানাদি করত যে ভাবে হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণের ভীত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামে পরিচিত গৌরমোহনের বিদ্যালয় কোন অংশে হিন্দু কলেজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক অক্ষয়কুমার দত্ত, হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলীর প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক ও বাগ্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র (যিনি লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের হস্ত হইতে একটি বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন) ও মধ্যমাগ্রজ (কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান) শ্রীনাথ ঘোষ, বিখ্যাত ইংরাজী লেখক ও বেথুন সোসাইটীর সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু, রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ, 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, একাধারে বাঙ্গালার গ্যারিক ও সেক্ষপীয়র গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রসরাজ অমৃতলাল বসু, কুশাগ্রবুদ্ধি ভুপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে নটরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা সহিদ্বান কৈলাসচন্দ্র বসুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ে উমেশচন্দ্র বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। তিনি পাঠে অমনোযোগী ছিলেন এবং সমস্ত বৎসর ফাঁকী দিয়া শেষ পরীক্ষার সময় স্বাভাবিক মেধাবলে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতেন, কখনও কখনও দুই শ্রেণী উচ্চেও উন্নীত হইতেন।

যাত্রা, গান থিয়েটার প্রভৃতির তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তখন দেশীয় সাধারণ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পর্ব্বাদি উপলক্ষে ছাতুবাবুর বাড়ীতে বা কাশীনাথ ঘোষের বাটীতে ভোলা ময়রা প্রভৃতির যাত্রায় বহু শ্রোতা ও দর্শক সমবেত হইতেন। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্ররা মধ্যে মধ্যে যুরোপীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর শিক্ষায় সেক্ষপীয়রের 'ওথেলো', 'মার্চ্যাণ্ট অব ভেনিস' অভিনীত করিত বটে, কিন্তু সে অভিনয় আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিত না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাটীতে নন্দকুমার রায় বিরচিত শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়—কিন্তু অভিনয় নৈপুণ্যের অভাবে সে অনুষ্ঠান ও সাফল্য লাভ করে নাই। উমেশচন্দ্রের বাটীর সন্নিকটে এবং বিদ্যালয়ে তিনি অবশ্যই এই সকল যাত্রা ও থিয়েটার সন্দর্শন করিতে যাইতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই এপ্রিল মাসে প্রাতঃস্মরণীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তদীয় ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে প্রথমে



কালীপ্রসন্ন সিংহ

রামনারায়ণ তর্করত্নের "বেণী সংহার" এবং পরে নভেম্বর মাসে কালীপ্রসন্নর "বিক্রমোর্ব্বশী" অভিনীত হয়। ইহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে

* গত মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল আছে। পীতাম্বরের পুত্র কালীচরণ এটর্ণির অফিসে নহে, বাঙ্গালার একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিসে ও শিবচন্দ্র ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে কাষ করিতেন। ১০১ পৃষ্ঠায় 'সতীশচন্দ্রের পুত্র শৈলেশচন্দ্র'র পরিবর্ত্তে 'সুরেশচন্দ্রের পুত্র শৈলেশচন্দ্র' হইবে। "গঙ্গাদেবীর পুত্র হয় নাই" লিখিত হইয়াছে উহার পরিবর্ত্তে "গঙ্গাদেবীর পুত্র ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেহালায় বাস করেন" লিখিত হওয়া উচিত ছিল। উমেশচন্দ্রের চতুর্থা ভগিনীর নাম রাজলক্ষীর স্থলে পতিতপাবনী হইবে।

কালীপ্রসন্নের "সাবিত্রী সত্যবান" ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে "মালতী মাধব" বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয়। স্তর সিসিল বীডন প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অভিনয় দেখিতে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে অভিনয়ের প্রশংসা করেন। উমেশচন্দ্র দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন এবং কালীপ্রসন্নের প্রীতির দৃষ্টিতে পতিত হন। তিনি উমেশচন্দ্রকে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে পুরুষ এবং কখনও কখনও নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিতেন।

কালীপ্রসন্নের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বাবু (পরে মহারাজা স্তর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও নিজ নিজ বাটীতে উত্তম উত্তম নাটক রচনা করাইয়া অভিনীত করাইতে আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্র যতীন্দ্রমোহনের বাটীতে নাট্যাভিনয়েও যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। উমেশচন্দ্র এই সময়ে পাঠে নিতান্ত অমনোযোগী এবং থিয়েটারে আসক্ত দেখিয়া পিতা গিরিশচন্দ্র নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন।

বিবাহ

বোধ হয় তাঁহার জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝাইবার জন্য গিরিশচন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোক্ষদার সহিত বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল, বলিয়াছি। এই বিশ্বনাথ মতিলাল সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতির ন্যায় অধ্যবসায় ও সাধুতার গুণে সামান্য অবস্থা হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় ৮৲ মাসিক বেতনে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া, অধ্যবসায়, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রতিভার বলে তিনি নিমকের দেওয়ান হন এবং মৃত্যুকালে কলিকাতায় প্রাসাদোপম আবাসভবন ও বহু লক্ষ মুদ্রার বিষয় রাখিয়া যান।



হেমাঙ্গিনী দেবী

বহুবাজার নামক প্রসিদ্ধ বাজারটী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথের মৃত্যু ঘটিলে বাজারটী তাঁহার এক পুত্রবধূর কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং সেই সময় হইতে উহার নাম বহুবাজার হয়। মোক্ষদা দেবী লিখিয়াছেন বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণি মতিলাল নিজ বিদ্যার ও অর্থের বলে অনেক বড় বড় সাহেবদের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে সাহেবী-খানা, মদ্য মাংস আহার করা বেশ চলিত। ইঁহার নয় বৎসর বয়স্কা কন্যা হেমাঙ্গিনীর সহিত পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক উমেশচন্দ্রের বিবাহ হওয়ায় উমেশচন্দ্র কৈশোর হইতে অতিরক্ষণশীল হিন্দু গৃহের অনেক আচার ব্যবহার ও কুসংস্কার পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতাপিতার আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা চিরদিন তাঁহার শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিত। হেমাঙ্গিনী দেবী সম্বন্ধে মোক্ষদা দেবী 'কল্যাণ-প্রদীপে' লিখিয়াছেন :—

"হেমাঙ্গিনীর অর্থাৎ উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর গুণের কথা লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র পুঁথির প্রয়োজন। আমরা দুইজনেই সমবয়সী, ১০।১১ বৎসর বয়সে আমাদের দু'জনার পাল্টি ঘরে বিবাহ হয়। আমার প্রায় ৭০ বৎসরের স্মৃতিতে হেমাঙ্গিনী জড়িত। আমি বিবাহের পর প্রথম বউ হইয়া হেমাঙ্গিনীর পিত্রালয়ে যাই। তাঁহার পিতা বৌবাজারের সুবিখ্যাত ৺নীলমণি মতিলাল। তিনি আমার স্বামীর বড়মামা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হেমাঙ্গিনী বৌ হইয়া আমার পিতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমলার বাটীতে উঠেন। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত নিকট আমাদের দুইজনার ভিতর প্রণয় এত গাঢ় ও মধুর যে, ননদ-ভাজে এমনটী প্রায় দেখা যায় না। * * *

আমার দাদা যে ব্যারিষ্টারীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে কংগ্রেসের একজন প্রধান স্রষ্টা ও উহার প্রথম ও অষ্টম প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিয়াছিলেন, এ সমস্তই আমার বিশ্বাস আমার ভাজের স্বামীভক্তির গুণে, ত্যাগ স্বীকারের বলে। আমার দাদার জীবনী কেহ না কেহ অবশ্যই লিখিবেন। তিনি কেবল বাংলা দেশের নহে, সমগ্র ভারতের। তাঁহার জীবনী লেখা না হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। যে মহাত্মাই সেই কার্য্যে ব্রতী হউন তিনি যেন সেই সঙ্গে তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনীকে না ভুলেন।"

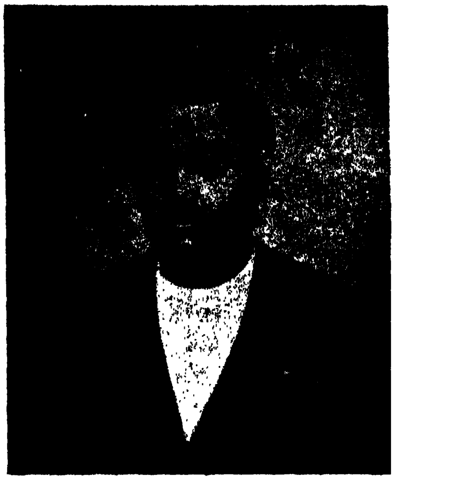
বিদ্যালয় ত্যাগ ও কর্ম্মজীবনে প্রবেশ

গিরিশচন্দ্র কেবল উমেশচন্দ্রের বিবাহ দিয়া একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন না, পারিপার্শ্বিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি উমেশচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এখানেও তাঁহার স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গৃহে কলহ করিয়া রাণীগঞ্জে পলাইয়া যান। প্রবেশিকা পরীক্ষা আর দেওয়া হইল না। গিরিশচন্দ্র কোনও রকমে তাঁহাকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিয়া মিষ্টার ডব্লিউ-পি-ডাউনিং নামক একজন এটর্ণির নিকট শিক্ষানবীশ (articled clerk) করিয়া দিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র ইঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া মিষ্টার ডব্লিউ-এফ্-গিল্যাণ্ডার্সের শিক্ষানবীশ (articled clerk) হন। ইংরাজীভাষায় উত্তমরূপে লিখিতে ও বলিতে না জানায় পদে পদে তাঁহাকে অসুবিধায় পতিত হইতে হইল এবং বিদ্যালয়ে পাঠে অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে অনুতাপ জন্মিল।

'বেঙ্গলী'

পিতা গিরিশচন্দ্র পুত্রের এই অক্ষমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার প্রতিবেশীদিগের মধ্যে দুইটী পরিবার ইংরাজী বিদ্যার জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল,—একটি রামবাগানের দত্ত পরিবার, অপরটী সিমুলিয়ার ঘোষ পরিবার। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পুরাতন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "কেশব, শ্রীনাথ ও গিরিশের বিদ্যাচর্চ্চায় খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পাড়ায়

বসুদের ও ঘোষেদের পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলন খ্যাতি যেমন দাঁড়াইয়া গেল, তেমনটি আর কাহারও হইল না।" 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলীর' প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথকে কৃষ্ণদাস পাল একটি প্রবন্ধে 'সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ' বলিয়া



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

উল্লেখ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যেমন লিখিতে তেমনই বলিতে সুপটু ছিলেন। কর্ণেল ম্যালিসন গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বক্তৃতার সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে তিনি "ভাবের চমৎকারিত্বে ও কল্পনার প্রাচুর্য্যগুণে বাগ্মী বলিয়া সুবিখ্যাত। তাঁহার বক্তৃতার অপ্রতিহত প্রবাহ অনেক ইংরাজ বক্তারও আকাঙ্ক্ষনীয়।" উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার পুত্রকে কোনও প্রকারে "মানুষ" করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। গিরিশচন্দ্র সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব বিভাগে কার্য্য করিতেন, নানা য়ুরোপীয় ও দেশীয় সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন এবং ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে ক্রয় করিয়া লন। হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই এক অফিসে কার্য্য করিতেন এবং উভয়ে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদকত্বকালে সিপাহী বিদ্রোহের ও নীল বিপ্লবের সময় গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় যে সকল রাজনীতিক প্রবন্ধ লিখিতেন, কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন, তাহা হরিশ্চন্দ্রের লেখনীপ্রসূত মনে করিয়া য়ুরোপীয়গণ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র তাঁহার শোকাকুলা জননী ও দুর্ভাগিনী সহধর্ম্মিণীর হিতার্থ পুনরায় হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রখানির স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন। তখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক জমিদার সভার কোন মুখপত্র ছিল না। কৃষ্ণদাস পালের প্ররোচনায় উক্ত এসোসিয়েশনের কতিপয় ক্ষমতাশালী সদস্য কালীপ্রসন্নকে পত্রখানির পরিচালন ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিতে অনুরোধ করেন এবং যদিও কালীপ্রসন্নের ইচ্ছা ছিল প্রজাসাধারণের হিতার্থ পত্রখানি নিয়োজিত হয়, তিনি অবশেষে এসোসিয়েশনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হন এবং মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং নিজের নামে ট্রাষ্টডীড সম্পাদন করিয়া পত্রখানিকে জমিদার সভার মুখপত্রে পরিণত করেন। কৃষ্ণদাস পাল পত্রখানির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

তখন দরিদ্র প্রজাপক্ষ সমর্থনের জন্য গিরিশচন্দ্র (৬ই মে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) 'বেঙ্গলী' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের "সুরধুনী কাব্যে" লিখিত আছে—

"দেখ গো "বেঙ্গলী" পত্রী, ভাষা সুললিত
বিরাজে গিরিশ-করে বিদ্যা-বিমণ্ডিত।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বন্ধুর অনুরোধে উমেশচন্দ্রকে 'বেঙ্গলী' কার্য্যালয়ে নিযুক্ত করিলেন। তখন 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক পত্র ছিল এবং উহার প্রথম অংশে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের সংবাদের সার সঙ্কলন "Precis of News" শিরোনামার নিম্নে প্রকাশিত হইত। গিরিশচন্দ্র উমেশচন্দ্রকে এই সার সঙ্কলনের ভার দিতেন এবং অনুচ্ছেদগুলি সযত্নে সংশোধন করিয়া দিতেন। এই প্রথায় শিক্ষিত হইয়া উমেশচন্দ্র ইংরেজী রচনায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গিরিশচন্দ্রের নিকট তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে ঋণ স্বীকার করিতেন। 'বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এতৎ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"সেই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্বামিত্ব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়া 'বেঙ্গলী' পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই পত্র ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তগত হয় এবং দীর্ঘকাল তাঁহার প্রচার বেদী ছিল। উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র পুত্রকে তাঁহার বন্ধু গিরিশচন্দ্রের নিকটে সাংবাদিকের কার্য্যে শিক্ষানবীশ করিয়া দেন। উমেশচন্দ্র বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে সংবাদ বাছিতেন এবং সম্পাদকের নির্দ্দেশে সময়ে সময়ে দুই একটি নিবন্ধ লিখিতেন। তিনি একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন গিরিশবাবু তখন বিখ্যাত ইংরেজী লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাঁহার নির্দ্দেশে 'বেঙ্গলী'তে কিছু লিখিতে পাইলে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদের অগ্রজ আমাদের পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বন্ধু যোগেন্দ্রপ্রসাদও একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন (আর্য্যাবর্ত্ত, ভাদ্র, ১৩২০)

"কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থে চালিত ও শম্ভুচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ভূম্যধিকারী-সম্প্রদায়ের মুখপত্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে উদ্যোগী হয়েন এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও উত্তর কালে ডবলিউ, সি, বোনার্জি নামে সুপরিচিত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি বৃত্তিলাভ করিয়া বিলাতে গমন করেন। তখন হইতে তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার আমাদের নিকট গিরিশচন্দ্রের নিকট ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার ঋণের কথা বলিয়াছিলেন।"

কিন্তু 'বেঙ্গলী' পত্রের সহিত উমেশচন্দ্রের সম্পর্ক রামগোপাল সান্যাল এবং উমেশচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনী লেখকগণ (১) যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক উমেশচন্দ্রকেই পত্রখানির প্রবর্ত্তক এমন কি সম্পাদক বলিয়া ভুল ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে

---

(১) A General Bi graphy of Bengal celebrities both living & dead. By Ram Gopal Sanyal. Calcutta 1889 Pages 87 and 125.

Eminent Indians on Indian Politics by C. L Parekh. 1892' Bombay' Page 26'

Indian Nation Builders, Ganesh & Co' Madras. Page 47.

গিরিশচন্দ্রের ইংরাজী জীবনচরিতে (২) যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। উহার মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"পরলোকগত ডব্লিউ-সি বোনার্জ্জি, যিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরীতে আহূত ভারতবর্ষের জাতীয় রাষ্ট্রসভায় প্রথম সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইবার অপূর্ব্ব সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার বাগ্মিতা তাঁহার একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম অপেক্ষা অল্প প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই—তিনি 'বেঙ্গলী'র প্রথম দুই কি তিন বৎসর উহার কার্য্যালয়ে সাপ্তাহিক সংবাদ সঙ্কলনকারীর সামান্য পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং যতদূর স্মরণ হয় তজ্জন্য মাসিক অনধিক কুড়ি টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। তখন বোনার্জ্জী অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন। আমাদের মত যাঁহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বাল্যকালে অন্যান্য অনেক মহৎ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষা মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই এবং কিরূপে পরবর্ত্তী জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা তিনি সেই ত্রুটী ক্ষালন করিয়াছিলেন। বোনার্জ্জী অকস্মাৎ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর, গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে নবপ্রবর্ত্তিত কাগজখানির অন্যতম কর্ম্মচারীরূপে উক্ত কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন, কারণ বোনার্জ্জীর পিতা গিরিশচন্দ্রের একজন বহুদিনের পুরাতন বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিলেন এবং তজ্জন্য বালকটির প্রতি তাঁহার বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। আমাদের বেশ স্মরণ আছে যে বোনার্জ্জী (তখন মতিবাবু নামে পরিচিত) প্রতিদিন প্রাতঃকালে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন এবং সেই দিনের সংবাদপত্রগুলি হইতে গিরিশচন্দ্রের নির্দ্দেশে ও তত্ত্বাবধানে সংবাদের সার সঙ্কলন করিতেন। এইরূপ দুই তিন বৎসর চলিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে এক একটি অনুচ্ছেদ লিখিতে ও তাঁহাকে সংশোধনের জন্য দিতে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ সুন্দর শিক্ষায় বোনার্জ্জীর স্বাভাবিক বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে যথোচিত পথে পরিচালিত হইল এবং গিরিশচন্দ্র তাঁহার উন্নতি দেখিয়া এত পরিতুষ্ট হইলেন যে যখন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের জনৈক পার্শী ভদ্রলোক প্রদত্ত বিলাতে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি ছাত্রবৃত্তির একটির জন্য উমেশচন্দ্র প্রার্থী হইলেন তখন গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে যথাযোগ্য স্থানে উচ্চ প্রশংসাপত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করাইলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ খ্যাতির পথে তাঁহাকে অগ্রসর করাইয়া দিলেন। মিঃ বোনার্জ্জী সেই উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন যিনি উপকারককে কখনও ভুলিতেন না, এবং তরুণ বয়সে তিনি গিরিশচন্দ্রের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছিলেন তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন উমেশচন্দ্রই 'বেঙ্গলী' প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার বন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নিকট হইতে মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেন। এতৎ সম্বন্ধে স্মর্ত্তব্য যে কালীপ্রসন্ন বহু পূর্ব্ব হইতেই 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য গিরিশচন্দ্রকে জানিতেন এবং প্রজাবন্ধু ও দেশপ্রেমিক বলিয়া তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদপত্রকেও স্বদেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হিন্দুপেট্রিয়ট'কে একটি সম্প্রদায়ের মুখপত্রে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়া তিনি সাধারণের হিতকর 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রচারে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এরূপ ধারণা করা অসম্ভব নহে। তিনি যে মুদ্রাযন্ত্র দিয়াছিলেন তাহা 'বেঙ্গলী' প্রতিষ্ঠার বহুদিন পরে। বেঙ্গলী প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ই মে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারীর 'বেঙ্গলী'তে Excelsior* নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে "উক্ত দিবস হইতে 'বেঙ্গলী' তাহার নিজের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইবে।"

উমেশচন্দ্র 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক বা পরিচালক ছিলেন না বলিয়া তাঁহার গৌরবমুকুটের জ্যোতিঃ একটুও ম্লান হইবে না। তিনি দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্রের নিকট রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন একথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত-লেখকগণ তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া যদি তাঁহার পূর্ব্বগামিগণকে বিস্মৃত হন তাহা হইলে সে চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান মিরর" এবং তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গলী" প্রবর্ত্তিত হয়। রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন একবার আমাদিগকে বলেন যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে থাকিবার পর "বেঙ্গলী"র শিরোদেশে "১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত" এইরূপ লিখিত হইত যাহাতে লোকের ধারণা হয় উহাই তৎকালীন প্রাচীনতম ইংরাজী সংবাদপত্র। এই ভুল ইচ্ছাকৃত এবং কিছুতেই উহা সংশোধিত হইত না। বহুকাল পরে যখন 'বেঙ্গলী' একজন মান্দ্রাজী দ্বারা পরিচালিত হইত, তখন কাগজের উপর লিখিত হইত "১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত।" ভবিষ্যতে গবেষকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' প্রবর্ত্তিত করেন এবং তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ দশবর্ষ মাত্র বয়সে সুরেন্দ্রনাথ (কারণ সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন) 'বেঙ্গলী' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত করিয়া কি আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পাঠকগণকে চমৎকৃত করিতে পারেন !! আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এই বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। † শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই ভ্রম পরিচালককে জ্ঞাত করাইলেও তিনি ভুল সংশোধন করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "সংবাদপত্রে অনেক ভুল কথাই প্রকাশিত হয়, আর একটা থাকিলে ক্ষতি কি?" মহাত্মগণের জীবনচরিতেও অনেক ভুল প্রকাশিত হয়, সেইজন্য বোধহয় উমেশচন্দ্রের জীবনচরিতগুলিতে এই ভুল কেহ সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। §

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ধনী রুস্তমজী জামসেটজী জিজিভাই ভারতগবর্ণমেণ্টের হস্তে তিন লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে প্রদান করেন যে উহা হইতে ভারতীয় যুবকগণকে ইংলণ্ডে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঁচটী ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইবে, এই পাঁচটীর মধ্যে তিনটী বোম্বাই প্রদেশ-বাসী, একটী বাঙ্গালী এবং একটী মান্দ্রাজীকে দেওয়া হইবে। বাঙ্গালায় উপযুক্ত ছাত্র নির্ব্বাচিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি সমিতি নিযুক্ত

(২) The Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of 'the Hindoo Patriot' and 'the Bengalee' by One who knew him. Edited by his grsandson Manmatha- nath Ghosh M. A. Calcutta R Cambray & Co' 1911.

* Vide Selections from the writings of, Grish Chander Ghose, The founder and first editor of the Hindoo Patruot' and 'the Bengalee.' Edited by his Grandson Manmathanath Ghosh M. A. Calcutta. The Indian Daily News 1912. page 438.

† 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' আষাঢ় ১৩৩৬।

§ আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে উমেশচন্দ্রের পৌত্রী কুমারী সাধনা বনার্জ্জী তাঁহার পিতামহের যে ইংরাজী জীবনচরিত সম্প্রতি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে 'বেঙ্গলী'র সহিত উমেশচন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

করেন, উহার সভাপতি ছিলেন (হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ও পরে বাঙ্গালার লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর) স্তর জর্জ্জ ক্যাম্বেল এবং সদস্য ছিলেন স্তর হেনরি সামনার মেন, মিঃ জন রোজ, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নবাব আমীর আলি খাঁ বাহাদুর, ছোট আদালতের চীফ জজ মিঃ জি, এস, কেগ্যান এবং সম্পাদক ছিলেন মিঃ ডব্লিউ, এল, হিলি। এই ছাত্রবৃত্তির জন্য ১২জন প্রার্থী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী মৌখিক পরীক্ষান্তে উমেশচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকের মহাঝটিকার কিছুদিন পরে—১৬ই অক্টোবর উমেশচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তখনও সুয়েজ খাল খনন হয় নাই এবং যাত্রাপথ সুগম ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে কালাপানি পার হওয়াও আপত্তিকর বিবেচিত হইত। পিতা গিরিশচন্দ্র রক্ষণশীল ও আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহাকে না বলিয়া গোপনেই উমেশচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ৺বিজয়ার পর উমেশচন্দ্র কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরবাটীতে যান এবং তথা হইতে পিতৃবন্ধু এটর্ণি ককারেল স্মিথের সহায়তায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। অবশেষে সমস্ত প্রকাশ পাইলে গৃহে সকলে মর্ম্মাহত হইলেন। বৃত্তি পাইতে কিছু বিলম্ব হয়, সেজন্য ইংলণ্ডে গিয়া উমেশচন্দ্রকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়। অবশেষে পুত্রবৎসলা মাতা তাঁহাকে অর্থসাহায্য প্রেরণ করেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণের নিকট হইতে যে বাধা পাইয়াছিলেন তাহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট প্যারিস হইতে তাঁহার মধ্যম খুল্লতাত শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত একটি পত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। পত্রখানি শম্ভুচন্দ্রের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদ্বিরচিত উমেশচন্দ্রের জীবনচরিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার কিয়দংশ এতৎস্থলে পুনঃপ্রদত্ত হইবার যোগ্য :—

"আশা করি, আপনি শুনিয়াছেন, আমার সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধুগণ যেরূপ চাহেন, আমি সেইরূপ সুখ ও সাচ্ছন্দ্যে আছি। আমার লণ্ডনে উপস্থিতি ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থা খুবই অসুবিধা জনক হইয়াছিল। প্রথমতঃ লণ্ডনে আসিতে আমার সম্পর্কীয় সকলেই নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে এবং অনভিজ্ঞতাজাত নির্ব্বন্ধসহকারে আমার বিলাত যাত্রায় বাধা দিয়াছিলেন এবং পরে বিলাতে একেবারে অপরিচিত বলিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আমি শীঘ্রই এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছিলাম এবং আমার বিলাতের জীবন আশাতীত সুখময় ও কৃতার্থ হইয়াছে তজ্জন্য আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমি জাতিভেদের কুসংস্কার এবং আমাদের দেশবাসীর নীতিবিরুদ্ধ আচারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন মানুষ হইয়াছি, আমার আকৃতিতে, বেশে, ভাষায়, আচারে, চিন্তাধারায়, সংক্ষেপে এক কথায় সব বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং যে সকল দোষের জন্য আমাদের জাতি জগতের মধ্যে ঘৃণিত বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা পরিহার করিয়াছি। * * *

আমি গত কল্য লণ্ডন হইতে দীর্ঘ অবকাশকাল কাটাইবার জন্য দুই মাসের জন্য য়ুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। আমি সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি ও ফ্রান্সে বেড়াইব, ইটালীতে যাইব কি না স্থির নাই।"

উমেশচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন তখন সেখানে যে সকল ভারতীয় ছিলেন এবং যাঁহাদের সহিত তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন, তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য :—

(১) জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইনি বাঙ্গালার লিওসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর উক্ত বৎসর ১০ই জুলাই ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং 'পোলিটিক্যাল পাদ্রী' রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলাকে ৫২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল বিবাহ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে নেন্দ্রমোহনই প্রথম (Lincoln's Inn সম্প্রদায়ের) ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুন ব্যারিষ্টার হন এবং এই সময়ে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটীতে হিন্দু আইন ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন।



কমলা ঠাকুর সখীসহ

(২) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে যান এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী ও কন্যাদ্বয়ের দ্বারা তথায় অভ্যর্থিত হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইনি পর বৎসর (উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই) ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং বোম্বাই প্রদেশে বহুদিন কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম সিভিলিয়ান।

(৩) মনোমোহন ঘোষ—ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাতে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে যান কিন্তু দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Lincoln's Inn হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর

বৎসর ১৮ই জানুয়ারী ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন এবং প্রায় উমেশচন্দ্রের সঙ্গে ভারতে প্রত্যাগমন করেন।



মনোমোহন ঘোষ

(৪) মাইকেল মধুসূদন দত্ত—স্বনামধন্য কবি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়া Grey's Inn নামক ব্যারিষ্টার সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। পর বৎসর অর্থাভাবে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা, কন্যা শর্মিষ্ঠা ও পুত্র নেপোলিয়নকে লইয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার, মনোমোহন তৃতীয়।

(৫) দাদাভাই নৌরোজী—ইনি উমেশচন্দ্র অপেক্ষা ১৯।২০ বৎসরের বড় ছিলেন। বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজে কিছুকাল গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপনা এবং 'রাস্ত গোফতার' (সত্যবক্তা) নামক গুজরাটী সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বণিক মেসার্স কামা এণ্ড কোং ইংলণ্ডে তাঁহাদের একটি শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করত দাদাভাই নৌরোজীকে অন্যতম অংশী ও প্রতিনিধি করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি কামা এণ্ড কোংর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতেছিলেন ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

(৬) ফিরোজশাহ মেটা—ইনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজ হইতে সম্মানের সহিত এম-এ উপাধি লাভ করেন ও উক্ত কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। কলেজের অধ্যক্ষ আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্টের সুপারিশে ইনিও উমেশচন্দ্রের ন্যায় রস্তমজী জামসেটজী জিজিভাই প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন এবং Lin oln's Innএ ব্যারিষ্টার হইতে যান।

(৭) বদরুদ্দীন তায়েবজী—ইনি আরব্যদেশের প্রাচীন মুসলমান-বংশসম্ভূত। ইনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় ইনি কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিড্‌ল টেম্পলের ব্যারিষ্টার



বদরুদ্দীন তায়েবজী

শ্রেণীভুক্ত হন। ইনি শেষোক্ত বৎসরের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টাররূপে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

(৮) ক্ষেত্রমোহন দত্ত—ইনি ইংলণ্ডে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন ইনি তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বাস করেন। পরে ইনি ইংলণ্ডে একটি মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেবেল-এর সঙ্গে স্তর তারকনাথ পালিতের পুত্র সিভিলিয়ান লোকেন পালিতের পরে বিবাহ হয়। ক্ষেত্রমোহন ভারতপ্রেমিক ছিলেন এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য উমেশচন্দ্রের সহিত ইংলণ্ডে আন্দোলন করিতেন। (ক্রমশঃ)

আমারই আনন্দ নিয়ে কাঁপে নিশিদিন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আজ কোন দাহ নাই, নাই কোন জ্বালা !
পথের কণ্টক যত তোলো ফুলমালা।
ঘর-ছাড়া মূঢ় ছেলে ফিরে এনু ঘরে—
জননীর বক্ষে মোর। ছায়ার ভিতরে
স্বর্গেরে খুঁজেছি আর হয়েছি নিরাশ।
কামনার জতুগৃহে ফেলেছি নিঃশ্বাস।

বাসনা-মরুর প্রান্তে পেলেম মুক্তিরে।
প্রভাত-আলোকে স্নিগ্ধ বনস্পতি শিরে।
ব্যাপ্ত হোয়ে গেল মোর আনন্দ অধীর !
আমার আনন্দ আজি নিম-মঞ্জরীর
সৌগন্ধ্যে মিশিয়া যায় ! আমের বাগানে
উচ্ছ্বল আনন্দ মম কোকিলের গানে।

দক্ষিণা বাতাসে আজি পল্লব নবীন
আমারই আনন্দ নিয়ে কাঁপে নিশিদিন।

হানাবাড়ী

(নাটিকা)

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

প্রথম দৃশ্য

রবিবার, বেলা প্রায় ৪টে। খাওয়া দাওয়া সেরে গুপীনাথ সেই যে শয্যা নিয়েছে, এখনও জাগবার নামটি নেই। তার স্ত্রী কাত্যায়নী ডাকাডাকি সুরু করেছে

কাত্যায়নী। ওগো শুনছো! বেলা অনেক হয়েছে; আর ঘুমোয় না—উঠে পড়! না বাবা, এমন ঘুম কখন দেখিনি; কুম্ভকর্ণকেও হার মানিয়েছে।

গুপীনাথ। (নিদ্রাজড়িত বিকৃতকণ্ঠে) কুম্ভকর্ণের অকাল-নিদ্রাভঙ্গের ফল হয়েছিল অকাল-মৃত্যু—সে কথা ভুলে যেও না গিন্নী। দোহাই তোমার, এমন আরামের দিবানিদ্রাটা মাটি কোরো না। সপ্তাহে একটা বই ছুটো রবিবার আসেনা।

কাত্যায়নী। তোমার আবার রবিবার সোমবার কি শুনি? তুমি ত শুনেছি রোজই আপিসে ঘুমোও।

গুপীনাথ। সে ঘুম হচ্ছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অথবা বসে-বসে ঘুম, অর্থাৎ কিনা গাধা-ঘোড়া-মার্কা ঘুম। মানুষ-মার্কা দিবানিদ্রা সপ্তাহে একটা দিন বই ছুটো দিন কপালে জোটে না গিন্নী, সুতরাং……

কাত্যায়নী। না, না উঠে পড়, উঠে পড়! মাণিকঠাকুরপো অনেকক্ষণ থেকে বসে রয়েছে। বলবে কি বল ত?

গুপীনাথ। অনেকক্ষণ যখন বসে রয়েছে, তখন আরও অনেকক্ষণ যে বসে থাকতে পারবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং

কাত্যায়নী। সহজে উঠবে না—নয়, বোসো!

গুপীনাথ। দোহাই তোমার, জানলা খুলো না—রোদ্দুরে পুড়ে মরবো। সহমরণ-প্রথা উঠে যাওয়ার পর থেকে তোমরা স্বামীহত্যা করতে একটুও ভয় খাওনা দেখছি।

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। কে কার সহমরণে যাচ্ছে গো বৌদি?

কাত্যায়নী। এই দেখ না ঠাকুরপো, তখন থেকে ডাকা-ডাকি করছি, কিছুতেই উঠবে না।

গুপীনাথ। অতএব তুমিও তোমার বৌদির সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে লেগে যাও! নাও পরাজয় স্বীকার করছি। এখন কি করতে হবে হুকুম কর! (কাত্যায়নীর দিকে চেয়ে) তুমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন? ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছিলে, ঘুম ত ভাঙ্গিয়ে গেলে; এখন ছু-কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যাও দেখি—একটু চাঙ্গা হয়ে নিই।

কাত্যায়নী। তা দিয়ে যাচ্ছি; তুমি কিন্তু দেখো ঠাকুরপো, আবার না শুয়ে পড়ে।

প্রস্থান

গুপীনাথ। তার পর মাণিকলাল, খবর কি বল ত!

মাণিক। খুব সুবিধেয় একটা বাড়ী পাওয়া গেছে। আট-খানা বেড-রুম, তাছাড়া রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বাথরুম এসব আলাদা। তেতালা বাড়ী……

গুপীনাথ। লাটসায়েবের বাড়ীও ত' আছে; তাতে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি শুনি? বাড়ী ত প্রকাণ্ড, কিন্তু অতবড় বাড়ীর ভাড়া যোগাবে কে বলত? তোমার বৌদি যাই বলুক না কেন, এবাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও নড়ছি না। আমাদের মতন গরীব-গেরস্তর পক্ষে এই এঁদো বাড়ীই যথেষ্ট। স্ত্রীলোকের কথা শুনো না ভায়া। শাস্ত্রেই বলে—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। ঋষিবাক্য কি আর ভুল হবার যো আছে!

মাণিক। আগে থাকতেই ঘাবড়াচ্ছ কেন গুপী-দা! ভাড়াই শোন ছাই!

গুপী। কত ভাড়া শুনি?

মাণিক। ৩০৲ টাকা।

গুপী। আমি ভেবেছিলুম ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছি—এখন দেখছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। ৩০৲ টাকায় ৮ খানা ঘর-ওয়ালা রাজপ্রাসাদ! বলি রাজকন্যাশুদ্ধ নয়ত হে!

মাণিক। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, হাতেপাঁজি মঙ্গলবার আমার সঙ্গে চলুন, চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করে দিচ্ছি। বেশী দূর নয়—গড়পার।

গুপী। তুমি নিজে সে বাড়ী দেখেছ? না পরের মুখে ঝাল খেয়ে তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছ?

মাণিক। ভেতরে ঢুকে দেখিনি বটে, কিন্তু বাইরে থেকে যা দেখিছি, তাতেই বুঝেছি যে হ্যাঁ বাড়ীর মতন বাড়ী বটে।

গুপী। তুমি যে আমাকে বোকা করে তুল্লে হে মাণিকলাল। এটা এপ্রিল মাস বটে, কিন্তু পয়লা এপ্রিল ত অনেকদিন কেটে গেছে ভায়া।

মাণিক। আমি ঠাট্টা করছি না গুপীদা, তোমার দিব্যি বলছি!

গুপী। তবে ত উঠতে হোলো দেখছি।

মাণিক। তুমি কিন্তু আর দেরী কোরো না। শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও! দেরী করা ঠিক নয়, কোন্ ব্যাটা আবার মুখের গ্রাস না কেড়ে নেয়।

গুপী। চা না খেয়েই যাবে না কি?

মাণিক। চায়ের জন্যে আর অপেক্ষা করে কাজ নেই। যাবার পথে রান্নাঘর থেকে চুমুক মেরে গেলেই হবেখ'ন।

গুপী। নাঃ, উঠিয়ে ছাড়লে দেখছি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গড়পারের একটি গলি। এই গলির একটি তেতালা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গুপীনাথ ও মাণিকলাল

গুপী। এ পেল্লায় বাড়ী হে মাণিকলাল। কিন্তু এবাড়ীর ভাড়া যে ৩০৲ টাকা, সে কথা তোমায় কে বল্লে?

মাণিক। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না গুপীদা; দোতালার বারান্দায় ওটা কি ঝুলছে দেখতে পাচ্ছ না!

গুপী। তাই ত—ওটার দিকে ত এতক্ষণ নজর পড়েনি। (অতঃপর বিড় বিড় করিয়া আপন মনে পড়িতে লাগিল) 'সমগ্র বাড়ী ৩০৲ টাকায় ভাড়া দেওয়া হইবে। এই গলিরই ১১নং বাড়ীতে বাড়ীওয়ালার নিকট অনুসন্ধান করুন।'

মাণিক। এতক্ষণে বিশ্বাস হোলো?

গুপী। তাত হোলো, কিন্তু……

মাণিক। আবার কিন্তু কি?

গুপী। না, বলছিলুম কি এর মধ্যে কোন গণ্ডগোল নেই ত?

মাণিক। সে কথা আমি কেমন করে জানবো!

গুপী। তাই বলছিলুম, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করবার আগে আশেপাশের ভদ্রলোকদের কাছ থেকে একটু খোঁজখবর নিলে হয় না? শেষকালে যদি হানাবাড়ী হয়।

মাণিক। কোথায় আবার খবর নিতে যাবে?

গুপী। ঐ তো সুমুকের বাড়ীর বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসেছে। চল না, বাড়ীটার সম্বন্ধে একটু এনকোয়েরি করে আসি।

উক্ত বৈঠকখানা থেকে সহসা তিন-চার প্রকার বাদ্যযন্ত্রের মিশ্র বেখাপ্পা আওয়াজ বাতাসে ভেসে এলো।

গুপী। আরে, ওটা একটা কনসার্টপার্টির আড্ডা দেখছি। চল না, ওদের কাছেই সব খবর পাওয়া যাবে।

মাণিক। তা চল, কিন্তু ওখানে জমে যেও না যেন, তোমার ত কাণ্ড!

গুপী। আরে রামচন্দ্র!

(আড্ডাঘরের দরজার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে)

বলি, শুনছেন মশাই!

উত্তর নেই

গুপী। (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) বলি ও মশাই, এদিকে দয়া করে একটু কান দেবেন কি?

(কোন উত্তর এল না;—কেবল বেহালা-বাঁধার পিড়িং পিড়িং আওয়াজ শোনা গেল।)

গুপী। (গলার স্বর আরও চড়িয়ে) বলি ও মশাই, বেহালাটা না হয় দু-মিনিট পরেই বাঁধলেন।

বেহালা-বাদক। কালা নই মশাই, শুনতে পাচ্ছি; কাকে চান বলুন না!

গুপী।—বিশেষ কাউকে নয়, অর্থাৎ যাকে হোক একজনকে পেলেই হোলো—বুঝেছেন কি না—any port in the storm. —তবে এই পাড়ার লোক হলেই ভাল হয়।

বেহালা-বাদক। (মৃদুভাবে বেহালার ছড়ি টানতে টানতে) —কেন বলুন ত?

গুপী। আজ্ঞে; আপনাদের সামনের ঐ তেতালা বাড়ীটা সম্বন্ধে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। অবশ্য আপনাদের মহামূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ অপব্যয় হবে—তার আর উপায় কি বলুন? বেশী সময় নোবো না—যথাসম্ভব সংক্ষেপে,—বুঝেছেন কি না……

বেহালা-বাদক। (বাজখাঁই কণ্ঠে) ওহে তিনকড়ি মাষ্টার, এগিয়ে এস না হে! তুমি ত ও-বাড়ীর সম্বন্ধে সবই জান,—ভদ্রলোক কি জানতে চান দেখ না!

তিনকড়ি মাষ্টার। (তবলায় চাটি দিতে দিতে)—বলুন, কি জানতে চান।

গুপী। আপনার হাত ত বেশ তৈরী মশাই;—তিরিকিটি-তাক্ ত দিব্যি সেধেছেন!—আদাছোলা খেয়ে হাতটি ত বেশ পাকিয়েছেন!

মাণিক। আবার বাজে বকে! ঝটপট কাজ সেরে নাও গুপী-দা!

গুপী। এই বলছিলুম কি!

তবলা-বাদক। (তবলায় দ্বিগুণ উৎসাহে চাটি দিতে দিতে) —বেশ ত, কি জানতে চান বলুন!

গুপী। এই বলছিলুম কি, আপনি ত এই পাড়ারই লোক, অর্থাৎ কি না এই পল্লীতেই মহাশয়ের পুরুষানুক্রমে বসবাস; সুতরাং এ পাড়ার খবরাখবর সবই—অর্থাৎ কিনা খুটিনাটি সবই, অর্থাৎ কি না…

মাণিক। short cut কর গুপী-দা, অত বাজে বকছো কেন?

গুপী। যা বলেছ ভায়া, স্পষ্ট কথা বলাই ভাল! হ্যাঁ দেখুন মশাই, সুমুখের ও বাড়ীটা অত সস্তায় ভাড়া দেওয়া হচ্ছে কেন বলতে পারেন?

এই সময় সহসা ক্লারিওনেট-টা তীব্র স্বরে একবার বেজে উঠেই কঁক্ করে থেমে গেল

তবলা-বাদক। দেখুন মশাই; ও বাড়ী সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না।

গুপী। হঠাৎ অমন অভিমান করলে চলবে কেন দাদা! কি এমন রাগের কথাটা বল্লুম?—হ্যাঁ আপনার নামটি কি যে ভাল…

তবলা-বাদক। তিনকড়ি মোদক।

গুপী। হ্যাঁ দেখুন তিনকড়ি বাবু, বাড়ীটা আমরা ভাড় নিতে চাই। বুঝতেই ত পারছেন, ছাপোষা মানুষ,—দিন আনি দিন খাই; অর্থাৎ কি না যাকে বলে অন্তভক্ষ ধনুর্গুণ, অথ গিন্নীর সখ একটু বেশ আলো-বাতাস-ওয়ালা হালফ্যাসানে বাড়ীতে হাত-পা খেলিয়ে একটু যাকে বলে বনেদী ষ্টাইলে বা করেন,—বুঝেছেন কি না—

মাণিক। আবার বাজে বকছো গুপী-দা!

গুপী। না, না, কাজের কথা সংক্ষেপে সারাই ভালো, হ্যাঁ বলছিলুম কি—ও বাড়ীটাতে ভূতটুত নেই ত মশাই?

এই সময় কে একজন বলে উঠলো—খবরদার ওসব কথায় থেকো না তিনকড়ি।

তিনকড়ি। আরে রামচন্দ্র!—তেমনি বোকা আমায় পেয়ে হারু-দা!—(তারপর গুপীনাথের দিকে চেয়ে)—হ্যাঁ, দেখু মশাই, মাপ করবেন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

গুপী। কেন বলুন ত? বেশী কিছু ত বলতে হবে না, কেবল হ্যাঁ কি না—ব্যাস্। অর্থাৎ ভূত আছে কি নেই! অর্থাৎ কিনা বাড়ীটা হানা কি হানা নয়। কথায় বলতে যদি নেহাত আপত্তি থাকে—বহুৎ আচ্ছা, ঘাড় নেড়ে, অর্থাৎ কিনা মূক ও বধির স্কুলের ছাত্রদের মত হাত মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিন।

তিনকড়ি। না না, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না মশাই!

মাণিক। বুঝতেই ত পারছ গুপীদা, ওঁরা ওবাড়ী সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন, কিন্তু কোনও কারণে···

তিনকড়ি। ঠিক ধরেছেন আপনি! ওহে বিষ্টু, হারমোনিয়মটায় ডি-সার্প দাও ত একবার! (সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁ করে হারমোনিয়ামের আওয়াজ হোলো)

গুপী। আমি কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না স্যার! আপনি কি বলতে চান বাড়ীটাতে ভূতের উপদ্রব আছে।

তিনকড়ি। (শশব্যস্তে) না না, সে কথা আমি আদৌ বলতে চাই না।

গুপী। তাহলে কি বলতে চান বাড়ীটা একেবারেই নিরাপদ!

তিনকড়ি। না না, তাও আমি বলতে চাই না মশাই!—ছেলেপুলে নিয়ে আপনি বাস করবেন,—শেষকালে···, যাক্‌গে, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।···ওহে তোমার তবলাটা ত ঠিক সুরে বলছে না, ভাল করে বেঁধে নাও।

গুপী। আচ্ছা নমস্কার মশাই!—চল হে মাণিকলাল, ওঁদের মহামূল্য সময় আর নষ্ট করে কাজ নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

গড়পারের একটি গলিপথ

গুপী। দেখলে মাণিকলাল, পেটের কথা কেমন বোমা মেরে বের করে নিলুম। তুমি ত কেবল সংক্ষেপে কথা সারতে চাও; আরে সংক্ষেপের কাজ নয় ভায়া, সংক্ষেপের কাজ নয়,—বৃষোৎসর্গের আয়োজন না করলে ওদের পেটের কথা আদায় করবার জো নেই—বুঝেছ কিনা! এখন চল একবার বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা যাক্! সে মহাপ্রভু আবার কি বলেন দেখ!

মাণিক। চল, কিন্তু এরপর আর ওবাড়ী ভাড়া নেওয়া···

গুপী। আরে ভায়া, ভাড়া নেওয়া না-নেওয়া সে ত আমাদের হাতে। কেউ ত আর জোর করে গচিয়ে দেবে না। তবু একবার শেষ পর্য্যন্ত বেয়ে-চেয়ে দেখাই যাক্ না।

মাণিক। চল!

গুপী। ১১ নম্বর বাড়ী না?—ঐ ত একটা ক্যাডাভ্যারাস-মার্কা লোক আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলেই ত হবে।—বলি হ্যাঁ মশাই, ১১নং বাড়ীটা কোন জায়গায় হবে বলতে পারেন?

ভদ্রলোক। ১১ নম্বর বাড়ী খুঁজছেন?—কেন বলুন ত?

গুপী। অত খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি মশাই?

ভদ্রলোক। একটু প্রয়োজন আছে বৈকি দাদা, কারণ ১১ নম্বর বাড়ীর আমিই হচ্ছি মালিক।

গুপী। তাই নাকি। তাহলে ঐ ৭ নম্বর বাড়ীটার মালিকও আপনি!

ভদ্রলোক। আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনারা বুঝি ও বাড়ী ভাড়া নিতে চান?

গুপী। সেইরকম মতলবই ত ছিল,—কিন্তু···

ভদ্রলোক। কিন্তু সুমুকের ঐ কনসার্ট-পার্টির আড্ডা থেকে বেরুবার পর আর সে মতলব নেই—কেমন ত?

গুপী। আজ্ঞে যা বলেছেন;—কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?—মহাশয়ের দেখছি জ্যোতিষ-বিদ্যায় রীতিমত দখল আছে।

মাণিক। আঃ, কি বাজে বকছ গুপী-দা···

গুপী। হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলি তবে! মহাশয়ের ঐ ৭ নম্বর বাড়ীটাতে ভূত-টুতের উপদ্রব নেই ত?

ভদ্রলোক। (সক্রোধে) দশচক্রে ভগবান ভূত হয় জানেন ত! কনসার্ট-চক্রে ভগবান শুধু নয় ভগবানের গুষ্টিশুদ্ধ দানো পেয়ে যায় মশাই।—শালার ঘরের শালারা ওলাওঠা হয়ে মরে না।—দেখুন মশাই, বাড়ীভাড়া করতে চান্ ত বলুন, ওসব বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই;—বুঝেছেন!—আর বাজে কথা যদি বক্‌তে চান্ ত ঐ শুয়োর-ব্যাটাদের আড্ডায় গিয়ে আবার ঢুকুন!

গুপী। আহা, চটেন কেন মশাই। আমরা কি আর ওদের কথা বিশ্বাস করেছি—না ওদের কথামত কাজ করছি। তা যদি করতুম তাহলে ত ঐখান থেকেই পত্রপাঠ বাড়ী ফিরতুম।—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাহলে আর গোরুখোঁজা করে মরতুম না।

মাণিক। তুমি থামো গুপী-দা! হ্যাঁ দেখুন মশাই, আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই বাড়ীটা নিরাপদ কিনা!

গুপী। বুঝতেই ত পেরেছেন—দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—

ভদ্রলোক। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন—তাহলে··· আর যদি বিশ্বাস না হয় ত আপনার পৈতে বার করুন;—আমি পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি গালতে রাজী আছি। তাতেও না হয়, চলুন কালীঘাট, না হয় দক্ষিণেশ্বর, না হয় আপনিই বলুন কোথায় গিয়ে দিব্যি গালতে হবে।—আরে মশাই; ঐ শালার ঘরের শালারা আমার সর্ব্বনাশ করেছে। বাড়ী বাঁধা রেখে যখন দেনা করেছিলি তখন মনে ছিল না?—তারপর দেনা শুধতে পারলি নি, ফলে বাড়ীটা হয়ে গেল আমার;—হবেই ত!—আরও কাপ্তেনী কর শালারা!—হ্যাঁ কি না বলুন না মশাই? এখন সেই রাগে শত্রুতা করছে—বুঝেছেন কিনা? ওবাড়ী যাতে আমার ভোগে না লাগে তারি চেষ্টা! ভাড়াটে এলেই ভাংচি দেয়,—বলে···

গুপী। ওরা কিন্তু স্পষ্ট করে ত কিছুই বলে না!

ভদ্রলোক। ঐতেই ত লোকে আরো ঘেবড়ে যায় মশাই। শেষকালে মশাই ৩০৲ টাকা ভাড়ায় অতবড় বাড়ী ছাড়তে রাজী হলুম—তাতেও যদি কেউ আসে। আর কিছু না, একবার যদি কেউ সাহস করে দু-টো রাত কাটাতে পারে তাহলেই ব্যাটাদের কারসাজী ফেঁসে যায়! কিন্তু কেউ সাহস করে না। আপনাদের

আর কি বলবো মশাই, গো-ব্রাহ্মণ মানুষ আপনারা—আপনাদের দিব্যি বলছি, ওবাড়ীতে ভূতের উপদ্রব ত দূরের কথা, মশা-মাছির উপদ্রব পর্য্যন্ত নেই।—শালার ঘরের শালাদের মাথায় জাপানী বোমাও পড়ে না!

মাণিক। সব শুনলে ত গুপী-দা! এখন কি করবে ঠিক করে ফেল।

গুপী। উনি যখন অত করে বলছেন তখন না হয়, পরীক্ষা করেই দেখা যাক্।

ভদ্রলোক। সেই ভাল কথা। আপনারা না হয় এক কাজ করুন;—যে কদিন ইচ্ছে বাস করে দেখুন। ও কদিনের ভাড়া অবিশ্যি আপনাদের দিতে হবে না। মনে করুন কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে দু-চারদিনের জন্যে উঠেছেন।—কেমন, এতে রাজী আছেন ত!

গুপী। কি হে মাণিকলাল, তুমি কি বল?

মাণিক। এ মন্দ কথা নয়।

ভদ্রলোক। তাহলে কালই চলে আসুন না কেন!—বলেন ত ওবাড়ীর চাবিটা আপনাদের দিয়ে দিই।

গুপী। না না, কালই নোবোখন।

ভদ্রলোক। বেশ তাই হবে। আপনারা তাহলে কাল কখন আসছেন?

গুপী। এই ধরুন না কেন সন্ধ্যে নাগাদ। আফিসের ফেরত আর কি। কি বল মাণিকলাল, তুমিও আসছ ত? দুজনে না হয় মরিবাঁচি করে একটা রাত কোন রকমে কাটিয়ে দোবো। তার পর বাঁচি ত তখন বাড়ীভাড়া নেওয়া যাবে। ভদ্দরলোক অত করে যখন বলছেন!

ভদ্রলোক। আমার কথা বিশ্বাস করুন দাদা,—কোন ভয় নেই!—ও শালার-ঘরের-শালাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।—এখন তাহলে যদি অনুমতি করেন ত আসতে পারি।—একটু বিশেষ কাজ আছে, নইলে মহাশয়দের সঙ্গে আরও দু-দণ্ড আলাপ করতে পারতুম।

গুপী। না না, আর আপনাকে detain করব না।—তাহলে ঐ কথাই রইলো।

ভদ্রলোক। যে আজ্ঞে! নমস্কার!

গুপী। নমস্কার!—নমস্কার!

ভদ্রলোকের প্রস্থান

গুপী। কি রকম বুঝলে হে মাণিকলাল?

মাণিক। আমার ত মনে হয়, লোকটা সত্য কথাই বলে গেল।

গুপী। তা ত বুঝলুম।—কিন্তু·····

মাণিক। কিন্তু কি আবার?

গুপী। আহা একটু ভাবতেই দাও না ছাই।—আচ্ছা, আমাদের বড়বাবুর কাল মেয়ের বিয়ে হতে পারে না?—অন্ততঃ গায়ে হলুদ, না হয় ছেলের পৈতে?

মাণিক। সে আবার কি? ভূতের বাড়ীতে বাস করবার আগেই যে দেখছি তোমার ঘাড়ে ভূত চেপে বসল।—কি সব আবল-তাবল বকছ বল ত?

গুপী। আহা শোনই না আগে। বলি, কাল যে দুজনে এখানে রাত্রিবাস করব তার, কৈফিয়ত তোমার বৌদির কাছে দিতে হবে ত!

মাণিক। নাঃ তুমি হাসালে গুপী-দা! (ক্রমশঃ)

অপচয়

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এক হাতে লোক থাক্‌না খাবার
দশ হাতে তা ছড়াও কেন?
খালি পেটে কাঁদছে হাজার
ভরতি জঠর ভরাও কেন?

মেনে মিছে সমাজ শাসন
শ্রাদ্ধ বিয়ে অন্নপ্রাশন
ছুতো ধরে তেলা মাথায়
তেলের ভাণ্ড চড়াও কেন?

ভোজ লাগিয়ে করছ ঘটা
টাকার বড়াই জাহির করে,
খোঁজ রাখ কি রোজ কত লোক
মরছে তোমার বাহির দোরে।

জিভে যাহার নেইক রুচি
তার পাতে দাও পোলাও লুচি
পয়সা কি হায় পোলাম্ কুচি
লোকের ভয়ে ডরাও কেন?

না পেয়ে লোক যাচ্ছে মরে
বেশী পেয়েও কম মরে না
চোর ডাকাতে হরণ করে
জাতকুটুমে কম হরে না।

লোকের স্বাস্থ্য হরণ করি
যমকে আনো চরণ ধরি।
অলক্ষ্মীরে বরণ করি
মা লক্ষ্মীরে তাড়াও কেন?



কথা—গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

দিকে দিকে জাগে আজ সাম্যের জয়গান ।
একতায় আমরাও হব আজ বলীয়ান ॥
যদিও রাত্রি এসে—
হানা দিল দ্বারদেশে—
জানি তবু নহে দূর রাত্রির অবসান ॥

জাগো আজ ভাই-বোন— দূরে ফেল অবসাদ,
মুছে ফেল বুক থেকে ভীরুতার অপবাদ ।
শান দাও হাতিয়ারে—
সংগ্রাম ডাকে দ্বারে—
ওই দেখ দূরে কাঁপে আলোকের নব প্রাণ ॥

II সা জ্ঞা সা ন্‌া | সা রা জ্ঞা -া I জ্ঞপা -া জ্ঞা সা | সদা -া দা -া I
দি কে দি কে জা গে আ জ্‌ সা ০ ম্যে র জ য়্‌ গা ন্‌

I পা পা পা -া | পণা পা মজ্ঞা -া I সা রা জ্ঞা -া | মা পা পা জ্ঞা II
এ ক তা য়্‌ আ ম রা ও হ ব আ জ্‌ ব লী য়া ন্‌

II পা ধা ণা পধা | -ণা ণা ণা ণা I ণর্সা র্সা পা পা | পা -া পা পা I
য দি ও রা০ ০ ত্রি এ সে হা না দি ল দ্বা র্‌ দে শে

I দা দা দা দা | দণা ণা পা -া I সা -রা জ্ঞা -া | মা পা পা -া II
জা নি ত বু ন হে দূ র্‌ রা ০ ত্রি র্‌ অ ব সা ন্‌

II প্‌া ধ্‌া সা -া | ধ্‌সা -রা রা -া I রা জ্ঞা রা সা | রপা মপা মজ্ঞা -া I
জা গো আ জ্‌ ভা০ ই বো ন্‌ দূ রে ফে ল অ০ ব০ সা০ দ্‌

I জ্ঞা মা পা ণা | পণা -র্সর্রা র্রা র্সা I পা দপা মজ্ঞা -মা | পা পণা ণপা -া I
মু ছে ফে ল বু০ ০ক্‌ থে কে ভী রু তা০ র্‌ অ প০ বা০ দ্‌

I পা র্রা র্রা -া | র্রা র্জ্ঞর্রা র্রা র্সা I ণর্সা -া পা -া | পা ণর্রা র্রা র্সা I
শা ন্ দা ও ঘা তি০ ঘা য়ে সং ০ গ্রা ম্ ডা কে যা য়ে

I ণর্সা -াণ ণা ণা | পদপা মজ্ঞা মা পা I সা রা জ্ঞা -া | মা মপা পা -া II II
ও ই দে খ দূ০ রে০ কাঁ পে আ লো কে য় ন ব প্রা ণ্

আমাদের আচার্যদেব

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্-সি

আচার্যদেব জন্মিয়াছিলেন ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে। সুতরাং প্রায় ৮৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল গত ১৬ই জুন তারিখে। বাঙ্গালীর পক্ষে, বিশেষত তাঁহার ন্যায় ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা দীর্ঘজীবন।

কিন্তু তাঁহার শরীরের যে ক্ষীণতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তাহারই মধ্যে ছিল অপরিমিত চিন্তাশক্তি, অসাধারণ কর্ম প্রেরণা, লোকাতীত জ্ঞানপিপাসা। সর্বোপরি দেশের প্রতি তাঁহার দধীচির ন্যায় অনুরাগ। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালের কথাই বেশী করিয়া বলিব।

২১ বৎসর বয়সে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া তিনি বিজ্ঞান পড়ার জন্য বিলাত চলিয়া যান এবং সেখান হইতে ডি-এস্-সি উপাধী লইয়া তিনি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রায় এক বৎসর পর প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন সহকারী বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হইলে আচার্যদেব তাহাতে ২৫০৲ বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু অচিরে তিনি ছাত্র সমাজের পরম প্রিয়জন হইলেন, এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন। পরীক্ষাগারে রসায়নের চর্চা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে অন্য দেশে এই বিদ্যা অর্থার্জনের জন্য নিয়োজিত হইতেছে—কিন্তু বাঙ্গালীর সে চেষ্টা নাই—বাঙ্গালী কেবল চাকুরীর জন্য লালায়িত।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে, তিন বৎসর চাকুরীর পর তাহার উপার্জন হইতে ৭০০৲ টাকা জমিয়াছিল। একজন সহকর্মী রাসায়নিক ও ডাক্তার বন্ধু সঙ্গে লইয়া তিনি রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীতে লাগিয়া গেলেন। ৯১ নম্বর অপার সার্কুলার রোডে তিনি বাস করিতেন। সেখানেই কাজ আরম্ভ হইল। এই সময়েই তিনি টালিগঞ্জে একটি এসিডের কারখানা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করেন। সার্কুলার রোডের বাড়ীতেই তিনি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধ যোয়ান-কুচি প্রভৃতির আরক তৈরী আরম্ভ করেন। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ডাক্তারগণ তাঁহার ঔষধ ব্যবহার সুরু করেন। ক্রমে তাহার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার নিকট সমস্ত বাধা ভাসিয়া যায় এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত যে কোন বস্তুই অচিরে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রদ্ধা অর্জন করে।

১৮৯২-১৯০২—এই দশ বৎসর চলিবার পর বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ রেজেষ্ট্রী করা লিমিটেড কোম্পানী হয়। মূলধন হয় ৫০০০০৲ টাকা। তারপর তিনবারে মূলধন বৃদ্ধি করিয়া এখন মূলধন হইয়াছে ২২ লক্ষ।

মানিকতলায় যে পুরাতন সালফিউরিক এসিড তৈরীর যন্ত্র আছে তাহা তৈরী হইয়াছিল ১৯০৪-৭ খৃঃ অব্দ মধ্যে এবং ইহা তৈরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন এখনকার রাসায়নিকগণই—বিদেশী কোন ইঞ্জিনিয়ার এজন্য আসেন নাই।

১৯০৮ সালে এই কারখানায় ৭০ জন লোক কাজ করিত। তখন মিস্ত্রিখানা হইয়াছে, ল্যাবরেটরী তৈরী করার কাজ তখনই আমরা করিতাম। ইহার অল্প আগে সুগন্ধি বিভাগ খোলা হইয়াছিল।

১৯২৪ সালে আমরা আসিয়া দেখিয়াছি, তুলা শুকাইবার ঘর এখনকার প্রফুল্ল ভবনের স্থানে মেশিনসপের মধ্যে। এখনকার ল্যাবরেটরীর মধ্যেই সুগন্ধি বিভাগের সব কাজ চলিতেছে। বড়ো ল্যাবরেটরী এখনকার অষ্টমাংশ। সিরাপঘর এখনকার অষ্টমাংশ। বায়লজিক্যাল বিভাগ তখন ছিল না। ছাপাখানা ছিল। এখনকার বাজার-ষ্টোরে ছিল গাছড়া গুদাম। এখনকার তৈল ঘরের একদিকে ছিল বাল্ক ষ্টোর, অন্যদিকে থিয়েটার ষ্টেজ। টিফিনের সময় weighbridge এর কাছে টিফিন ক্যারিয়ারে করিয়া আনিয়া রতিকান্ত খাবার যোগাইত।

সহসা এই প্রতিষ্ঠান এত বড় হয় নাই। দেশের প্রতি আচার্যদেবের যে মমতা ছাত্র বয়সে বিলাতে "India before and after the mutiny" প্রবন্ধে দেখা গিয়াছিল তাহা দেশে আসিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার এই কর্মক্ষেত্রে কর্মীরা আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রতিভার ছায়ায়, তাহার নেতৃত্বে তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বদেশবাসীর দ্বিধা, বিদেশী শাসনের অকৃপা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অসুবিধা—সম্মুখে কত বিঘ্ন, কত অনিশ্চয়তা। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইল। ধীরে ধীরে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইল। এখন এক কোটি টাকার উপর আমাদের বিক্রয়। যুদ্ধের আগে ভারতের বাহিরেও আমাদের মাল যাইতেছিল। যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের কোন কোন ঔষধ ভারতের বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট পাঠাইয়াছেন।

নানা কাযে আচার্যদেব ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। যখন কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতেন তখন প্রতি বুধবার তিনি এই কারখানায় আসিতেন এবং বিভাগে বিভাগে যাইয়া সকলের সঙ্গে প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সে স্নেহ পাইয়া আমরা গৌরবান্বিত বোধ করিতাম।

এই প্রতিষ্ঠানের আজ কলিকাতা, পাণিহাটি, বোম্বাই ও লাহোরে ৪টি কারখানা। প্রায় ৩।৪ হাজার লোক ইহাতে বেতন ভোগী কর্মী। আরও ৭।৮ হাজার লোক ইহার কাচামাল ও তৈরী মালের কেনা বেচায় জীবিকা অর্জন করে। অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার লোক ইহা হইতে যাহা উপার্জন করিতেছে তাহাতে বুঝিবা লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

আমাদের বিস্ময় বোধ হইতেছে। প্রফুল্লচন্দ্র বিত্ত-বিরাগী ছিলেন।

অতিশয় অল্প আহার করিতেন, বিবাহ করেন নাই, অতি অল্প বস্ত্রাদি পরিতেন—সাংসারিক প্রয়োজন তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তবু ইনিই এতগুলি মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের দুঃখ মিটাইয়া তাহাদের প্রাণের ঠাকুর হইয়া রহিলেন।

প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরী, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য, কোম্পানীর সেয়ারের লভ্য—আচার্যদেবের আয় সামান্য ছিল না। নিজের জন্য সামান্য ব্যয় হইত, সর্বদা ৩৪ জন করিয়া ছাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিত—আর সব তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানের গবেষণা, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে দান, ব্যক্তিগত সাহায্য—আরও কত অজানা দান—সব হিসাবে লেখা সম্ভব নয়। সম্ভবত সমস্ত একত্র করিলে ১০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। কিন্তু টাকার সাহায্যই তো কেবল সাহায্য নহে।

তাঁহার সঙ্গে স্বর্গীয় ৺কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়ের বন্ধুত্ব দেখিয়াছি। বিধবা দুঃস্থরা তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিত। তিনি বসাক মহাশয়ের সাহায্যে তাহাদিগকে বিদ্যাসাগর বাণীভবনে আনিতেন, অথবা অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ব্যবসায় ও দ্রব্য তৈরীর বিষয় পরামর্শ চাহিয়া তাঁহার নিকট পত্র আসিত। লোক উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহারই ছাত্রগণ সমস্ত ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া Indian school of chemists সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যবসায়—বিশেষত রাসায়নিকের ব্যবসায় বিষয়ে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী তাঁহারই প্রভাবে প্রশংসাভাজন হইয়াছে।

বস্তুত তাঁহার প্রথম জীবনে "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া যে আন্দোলনের তিনি সৃষ্টি করেন এবং সারাজীবন বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে উন্মুখ করার জন্য যে উত্তেজনার সঞ্চার করেন তাহা শেষজীবনে তিনি অনেকখানি সার্থক দেখিতে পান। কাচ, চিনামাটি, জাহাজ, লবণ, বস্ত্র, কাগজ, এনামেল প্রভৃতির কারখানাও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সর্বোপরি বলা যায় যে তাঁহাকে দেখিয়াই বিজ্ঞানের দিকে বাঙ্গালী সন্তান আকৃষ্ট হইয়াছিল।

আর আকৃষ্ট হইয়াছিল তাঁহার বিষয়লিপ্সাহীন অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিয়া। মানুষের দুঃখ মোচনে তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা ছিল। সংকটত্রাণ তাঁহার সেই বক্তৃতার জন্য। কিন্তু ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্য প্রকাশের সময় তিনি অন্তরালে থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ দক্ষতা, সাধুতা ও দয়ায় সমস্ত দেশ অজস্রধারে সাহায্য প্রেরণ করিয়া উত্তরবঙ্গ বন্যার কাজে সফলতা আনয়ন করে।

নব নব জ্ঞান অর্জনে তাঁহার অসাধারণ স্পৃহা। পৃথিবীর যেখানে যখন যে আন্দোলন হয় আচার্যদেব তাহা আয়ত্ত করেন এবং আবশ্যক হইলে স্বদেশের উন্নতিকল্পে তাহা নিয়োগ করেন। তাই গান্ধীজির খদ্দর আন্দোলনের তিনি পোষক এবং চীনের ছাত্র জাগরণে তাঁহার চিত্ত অতখানি আলোড়িত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র দেশে ধর্ম ও জাতীয়তার ঢেউ আনিয়াছিলেন, আর সুরেন্দ্রনাথ আনিয়াছিলেন রাজনীতিক আন্দোলন। সেই আবেষ্টনে আচার্যদেব আসিয়া প্রভাবান্বিত হইলেন। যে গঠনমূলক কাজের কল্পনা তখন দেশে এখানে ওখানে অল্প স্বল্প দেখা যাইতেছিল তাহাতে তিনি নবপ্রেরণা দান করিয়া স্বদেশে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের জন্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেন।

আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, শিল্পদ্রব্যের অভাবে দেশ কত অসহায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ভূমি ও তাপ। এদেশের ভূমি এজন্য সবই জন্মাইতে পারে। দেশের খনিজসম্পদ ও মূল্যবান। কাজ করারও লোকের অভাব নাই। শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার জ্ঞানসম্পন্ন লোকও পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যে জাতীয় শিল্পপরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু এই পরিকল্পনায় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কাজ যে প্রথম গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়। এই সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে যে সকল রকম শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতেই রাসায়নিক দ্রব্য আবশ্যক। সুতরাং উহাই প্রথম প্রস্তুত করিতে হইবে।"

দেশের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান এই বেঙ্গল কেমিক্যাল। সুতরাং এই পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব আমাদের উপরই ন্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। আচার্যদেব আমাদের সে দায়িত্বের সম্মুখীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন সে কর্তব্যপালন করিতে পারি; তবেই তাঁহার আত্মা শান্তি পাইবে, আমরা তাঁহার আশীর্বাদের যোগ্য হইব।

বিলাত ফেরত সম্বন্ধী

মোহাম্মদ এস্‌হাক বি-এ

(১)

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ সকাল ন'টা। নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে যেন মৌচাকে ঢিল পড়িয়াছে। বাৎসরিক পরীক্ষা আসন্ন—ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা একমনে পাঠে রত। কেহ ঢুলিয়া ঢুলিয়া, কেহ বালিশ ঠেস্ দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায়, কেহ বা সম্মুখে টেবিলের উপর রক্ষিত দর্পণে প্রতিফলিত আপন মুখমণ্ডলের দিকে চাহিতে চাহিতে বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র ভঙ্গীতে অধ্যয়নে রত। কেবল একটি মাত্র কিশোরবয়স্ক বালকের পাঠে মন বসিতেছে না। বেচারী অনেকদিন বাড়ীছাড়া—মায়ের জন্য তার প্রাণ কেমন করে। মা-আদুরে ছেলে সে—অনবরত মায়ের চিন্তা করিতে করিতে মুখের উপর এমনি একটা কারুণ্যের ছাপ পড়িয়াছে যে দেখিলেই মমতা হয়। বাড়ীর চিঠিপত্রও অনেক দিন পায় নাই—গত রাত্রে মায়ের স্বপ্ন দেখিয়াছে—তাতে প্রাণটা আরও উতলা। বোর্ডিংয়ে পিয়ন আসিবার সময় হইয়াছে সে বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া আনমনা রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় দেখিল কোট-প্যান্টপরা, সুটকেশ-হাতে একজন ভদ্রলোক সদর রাস্তা হইতে বোর্ডিংয়ের গেটে ঢুকিলেন। প্রথমে ইঁহাকে দেখিয়া তাহার সাহেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু নিকটবর্তী হইয়া তিনি যখন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "কি খোকা, ভাব্‌ছ কি? মায়ের কথা? এই ত বড়দিনের ছুটী এল বলে," তখন তাহার ভ্রম দূরীভূত হইল এবং যুবকটীর আচরণে কিঞ্চিৎ বিস্মিত না হইয়াও পারিল না—তিনি তার মনের কথা জানিলেন কি করিয়া? ততক্ষণে যুবকটী নিকটবর্ত্তী হইয়া

একখানা হাত বালকটীর কাঁধের উপর রাখিলেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামু থাকে কোন্ ঘরে?" বালকটী প্রথমে বুঝিতে পারিল না—"রামু? রামু কে?" তিনি কৃত্রিম রোষের সহিত বলিলেন, "ওহে তোমাদের মাষ্টার, রামরঞ্জন দত্ত। বুঝলে? বোকা ছেলে কোথাকার।" বালকটী একটুখানি সলজ্জ হাসি হাসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আসুন স্যার, আমার সঙ্গে।"

বালকটীকে অনুসরণ করিয়া আগন্তুক ছাত্রাবাসের সর্ব্বদক্ষিণ একটী কোণের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরটী ছোট এবং নির্জন। একপ্রান্তে তক্তাপোষের উপর একটী শুভ্র শয্যায় একখানা পুরু কম্বলে দেহ আবৃত করিয়া একজন শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন যুবক শায়িত। মুখ দেখিয়াই বেশ বুঝা যাইতেছে যে তিনি পীড়িত। আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করিতেই তাঁহার মুখের মৃদু হাসি মিলাইয়া গেল—ব্যগ্রভাবে পীড়িত যুবকের মাথার নিকট বসিয়া ডান হাতখানি কপালের উপর রাখিলেন, ও ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামু, এখন কেমন আছিস্?"

(২)

নাটোর নিবাসী অনুকূলচন্দ্র সোম একজন নামজাদা বড়লোক। জমিদারী, কোঠাবাড়ী, দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী, সব কিছুরই তিনি অধিকারী। অনুকূলবাবু বড়লোক, কিন্তু বিলাসী নন্। যে যে গুণে মানুষ পশু হইতে পৃথক, তা তাঁর যথেষ্টই আছে। তাঁর পরহিতৈষণা ও দানধ্যানের কথা লোক-প্রসিদ্ধ। তিনি এক কথায় গরীবের বাপ মা। তাঁহার জমিদারী—সদিরাজপুর, বেরামপুর, সোনাবাজু প্রভৃতি অঞ্চলের প্রজারা কতবার যে অজন্মার অজুহাতে বাকী খাজনা মাফ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; জমিদার-গৃহিণী সুহাসিনী দেবীও যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কত অতিথি অভ্যাগতকে যে তিনি নিজ হাতে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়াছেন, কত অভাবগ্রস্ত অনাথা বিধবার যে তিনি মাতৃস্বরূপা, কে তাহা নির্ণয় করিবে? স্বামী-স্ত্রীর এরূপ মধুর মিলন খুব অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। এই দেবতুল্য পরিবারের দুইটী মাত্র সন্তান—একটী ছেলে ও একটী মেয়ে।

ছেলেটী ২১ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; মেয়েটী তখন অধুনালুপ্ত উমাশশী গার্লস্ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ছেলেমেয়ে দুটী বিশেষতঃ ছেলেটী বাপ-মায়ের অধিকাংশ গুণের অধিকারী হইয়াছে। এমন নিরভিমান, খোলাপ্রাণ ধনীর দুলাল বড় একটা দেখা যায় না। পিতার মতই দীর্ঘ, গৌরবর্ণ চেহারা—প্রথম দৃষ্টিতে বিদেশীয় বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মার প্রসন্ন জ্যোতি মুখে প্রতিফলিত হইয়া মুখখানাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। সেই সুন্দর মুখে একটা মৃদু অথচ চটুল হাসি সর্ব্বদাই বিরাজমান। একুশ বৎসরের উচ্চশিক্ষিত যুবক, অত বড়লোকের ছেলে—কিন্তু এতটুকু আত্মাভিমান নাই—নিতান্ত ছেলেমানুষের মত সরল—মুটে, মজুর, উড়িয়া, কাবুলী সকলেই তার বন্ধু, সকলেরই সে আপন।

কাবুলীদের সঙ্গে মিশিয়া তাদের কথাবার্ত্তা বলিবার মত ভাষা সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। দরিদ্র উড়িয়া চাকরদের সঙ্গে সে গান ধরে—তাদের ব্যারাম পীড়ায় নিজ হাতে ঔষধ আনিয়া দেয়। পূজা পার্ব্বণের সময় সে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মিশিয়া নৌকাপ্রতিযোগিতায় সমান উৎসাহে বৈঠা চালায়। তার নিরভিমান ছেলেমানুষী দেখিয়া লোকে বলে 'পাগলা বাবু'। এটা তাদের দেওয়া, বড় আদরের নাম। মানুষ ত দূরের কথা, সেই হাসি-উজ্জ্বল মুখখানা যেন পারিপার্শ্বিক ইতর প্রাণীগুলিকে পর্য্যন্ত ডাকিয়া বলে, "স্বাগতম্।"

পিতামাতাও একমাত্র পুত্রের এই অবাধ আচরণ সানন্দ মৌনের সহিত সহ্য করিয়া যান, বিশেষতঃ আত্মাভিমান জিনিসটী তাঁদের বিশেষ প্রবল নয় বলিয়া তাতে বড় একটা আঘাত বোধও ছিল না। পিতার একান্ত ইচ্ছা ছেলেকে বি-এ পাশের পর ব্যারিষ্টারী পড়াইবার জন্য বিলাত পাঠান, কিন্তু মাতা রাজী না হওয়ায় তা এতদিনও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ঠিক এমনি সময় এরূপ একটী ঘটনা ঘটিল যার ফলে তার বিলাত যাত্রার পথে কোন অন্তরায়ই রহিল না, অধিকন্তু সেটা কতকটা বাধ্যতামূলকই হইয়া পড়িল।

অতর্কিতে, মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে এই সুখী দম্পতি (অনুকূল বাবু ও তাঁহার স্ত্রী) দুরন্ত বিসূচিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, খ্যাতনামা বহুদর্শী চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পুত্রকন্যা হতভম্ব হইয়া পড়িল—চিরসুখে অভ্যস্ত, স্নেহপুষ্ট হৃদয় যেন শোকে মূহ্যমান হইয়া উঠিল। পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কন্যাকে পুত্রের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, "উহাকে পাত্রস্থ করিও, ভালবাসিও" এই শেষ কথা বলিয়া।

(৩)

উল্লিখিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পিতার শেষ আদেশ মোহিতকুমার যথারীতি পালন করিয়াছেন। ভগ্নী শেফালিকাকে তিনি সৎপাত্রেই অর্পণ করিয়াছেন। রামরঞ্জন দত্ত তাঁহার সহপাঠী বন্ধু—প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে, একসঙ্গেই বি-এ পাশ করেন। রামরঞ্জনের সংসারে বিশেষ কেহ ছিল না। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় তিনি অধিকাংশ পরীক্ষাতেই সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ইহাতেই তাঁহার কলিকাতা বাসের খরচ অনেকটা কুলাইয়া যাইত। যা কিছু কম পড়িত, মোহিতের পিতা তাহা সানন্দে পূরণ করিতেন। পুত্রবন্ধু, এই বিনয়ী ছেলেটীর উপর অনুকূলবাবুর পূর্ব্ব হইতেই দৃষ্টি ছিল এবং পিতার মনোগত বাসনাও মোহিত বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।

ভগ্নীর বিবাহের পর ভগ্নীপতির হাতে সংসারের ভার দিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন—কোন কিছু উদ্দেশ্য লইয়া নয়—বাপ মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর হৃদয়খানি দমিয়া গিয়াছিল। বিদেশ ভ্রমণে হৃদয়ভার দূরীভূত হইতে পারে এবং কতকটা তাঁর পূর্ব্বের সংকল্প অনুসারেও তিনি সাগর পাড়ি দেন। বিলাত প্রবাসকালে এক আমেনিয়া দেশীয় সুন্দরী যুবতীকে ভালবাসিয়া তাঁর পাণিগ্রহণ করেন। অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গে করিয়া ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণের পর মাত্র মাস ছয়েক পূর্ব্বে তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এই প্রবাসজীবনে মোহিতের চরিত্রে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—সেই হাস্যচটুল প্রাণবন্ত উদার ব্যবহার—হৃদয়ের প্রসার যেন আরও একটু বাড়িয়াছে। ইউরোপ ভ্রমণ তাঁকে একটুও আত্মাভিমানী করে নাই। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভগ্নীপতি

বন্ধু গৃহের অলস জীবন যাপনে অসহিষ্ণু হইয়া নবাবগঞ্জ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে একটী শিক্ষকের পদ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। মোহিতকুমার বাড়ী আসিলে পর তিনি কয়বার নাটোর আসিয়াছেন। এই চাকরী গ্রহণ করায় মোহিতকুমার তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নন্। তাঁর ইচ্ছা তাঁরা চারটি প্রাণী গৃহের নিরিবিলি জীবনের মধ্যেই কাল কাটাইয়া দেন, বিশেষ কোন অভাব অভিযোগ যখন নাই। কিন্তু তিনি রামরঞ্জনকে এ বিষয়ে রাজী করিতে পারেন নাই—স্বোপার্জ্জিত অর্থে পরিবারের ভরণ পোষণ করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা। মোহিতকুমারও তাঁর স্বাধীন ইচ্ছায় বিঘ্ন উৎপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াস পান নাই।

রামরঞ্জনের চাকুরী প্রায় চারি বৎসর হইয়া গেল, কিন্তু তিনি তিনি এখনও কর্ম্মস্থলে একাই থাকেন—স্ত্রী, মোহিতের ওখানে।

রামরঞ্জন ছাত্রাবাসের নির্জ্জন একটী কক্ষে বাস করেন। আটদিন যাবৎ তিনি জ্বরে কাতর। সবেমাত্র গতকল্য জ্বর ছাড়িয়াছে, আজ অনেকটা সুস্থ আছেন। 'ক্যাজুয়েল লীভ' বিশেষ পাওনা নাই। 'সীক লীভে'র দরখাস্ত করিতেও সাহস পান না। বাৎসরিক পরীক্ষা অতি নিকটবর্ত্তী। সেক্রেটারী যেরূপ কড়া লোক তাহাতে সম্ভবতঃ আর ছুটী মঞ্জুর করিবেন না—মিছিমিছি অপ্রস্তুত হইতে হইবে—বিশেষতঃ রামরঞ্জনের আত্মসম্মান-বোধটাও একটু বেশী। বোর্ডিংয়ে তাঁহার চিকিৎসার ও সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইতেছে না তবু এই প্রবাসজীবনে পীড়িত অবস্থায়, স্ত্রীর বিদায়কালীন করুণ মুখখানি, তিন বৎসরের মেয়েটীর আধো আধো বুলি মনে পড়িয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলে। তিন দিন পূর্ব্বে আভাসে নিজের পীড়ার সংবাদ জানাইয়া তিনি স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তারই ফলে আজ বিলাত-ফেরত সম্বন্ধীর ব্যস্তসমস্তভাবে নবাবগঞ্জে আগমন।

বলাবাহুল্য আমরা যাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে ছাত্রাবাসের ছেলেটীর সহিত রামরঞ্জনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিতে দেখিয়াছি, তিনিই মোহিত কুমার।

(৪)

ছাত্রাবাসে মোহিতকুমারের সহিত রামরঞ্জনের সাক্ষাতের ঘণ্টাখানেক পরের কথা। স্থানীয় কোন একজন বড়লোকের বৈঠকখানায় মোহিত উপবিষ্ট। সম্মুখে একখানা আরাম কেদারায় স্বয়ং সেই গৃহস্বামী—দোহারা গড়ন—পাকা কাঁচা চুলদাড়ি—মাথার মধ্যভাগে টাক—গায় একটী ফতুয়া—চোখে চশমা—রাশভারী মানুষ—দেখিলেই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। নাম আনোয়ারুল হক চৌধুরী। ইনি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সেক্রেটারী, বালিকাবিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এবং নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। আরও বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট—উদারপ্রাণ পরহিতৈষী মানুষ, তবে একটুখানি বদ্‌রাগী।

বৈঠকখানা-সংলগ্ন, অন্দরের দিকে আর একটী কক্ষ। উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী খোলা দরজার মুখে একটী নানা রঙে রঞ্জিত পর্দা টাঙান। এই পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া জনৈক সুবেশা বর্ষীয়সী রমণী পরম কৌতুকের সহিত ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। ইনি চৌধুরী গৃহিণী। বহুদিন পূর্ব্বে যৌবন অতিক্রম করিলেও, এক সৌম্য স্নেহসিক্ত ভাব ইঁহার মুখমণ্ডলকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

চৌধুরী সাহেবের মধ্যমপুত্র সফিউর রহমান বিলাত ফেরত আনকোরা ব্যারীষ্টার মোহিতের প্রায় সমবয়সী, বিলাত প্রবাস কালে মোহিতের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। সেই জন্য মোহিত রামরঞ্জনের নিষেধ সত্ত্বেও সেক্রেটারীর নিকট আসিয়াছেন—ছুটী তিনি মঞ্জুর করাইবেনই এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে স্বামীর অসুস্থতার সংবাদে বোনটী তাঁহার বিষম চিন্তাক্লিষ্ট। সুতরাং মোহিত অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন—"......আমাকে আপনার কাছে আস্‌তে দিতে চায় না স্যার, বলে কিনা তুই পাগল-ছাগল গিয়ে যা-তা বলে' তাঁর মেজাজ বিগ্‌ড়িয়ে দিবি। আমি বল্লাম, 'তুই থাম্ দিকিন, হাকিম হলেও আমি তাঁর ছেলের 'ফ্রেণ্ড'—পাগল হলেও রাঁচি পাঠাবেন না, ছাগল হ'লেও জবাই করবেন না, এ তুই ঠিক জানিস।' আর কি বোল্‌বো স্যার, দেখ্‌তেন যদি আমার সেই বোনটীর কান্না! হতভাগাকে এত করে বলি বাসা কর, একটা বাসা কর, না হয় আমার কাছ থেকেও দু'দশ টাকা নিস্; কিন্তু কিছুতেই ও তাতে কান দেবে না। বলে কি না 'এতদিন করি নি, এখন যেন কেমন ঝকমারি লাগে। আর স্ত্রীপুত্রকে দূরে রাখার মধ্যেও বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে, তা তুই বুঝবিনে—যতবার যাই তাদের নূতন করে পাই—এই এক জীবনে শতেক জীবনের স্বাদ তুই বুঝ্‌বি কিরে মুখ্যু! তুই ত তোর বিবিকে ছেড়ে মুহূর্ত্তও কোথাও যাস্‌নি'। বলুন ত স্যার এ কথার কি উত্তর দি? দুঃখের বিষয় আপনাদের কাছে এতদিন থেকেও ও মানুষ হ'তে পারল না। আর আপনাদেরই বা দোষ কি বলুন—যার যা স্বভাব, গাধা পিটে কি আর ঘোড়া বানান যায়?"

চৌধুরী সাহেব মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন, তাঁর স্ত্রীও অন্তরাল হইতে সেই হাসিতে যোগ দিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই উচ্চশিক্ষিত নিরভিমান, খোলাপ্রাণ পুত্রবন্ধুকে ইতিমধ্যেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন।

সহাস্য বদনে চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, বোন্‌টী তোমার ছোট না বড়?"

হাত নাড়িয়া মোহিত উত্তর করিলেন, "আমরা ওসব বড় ছোট মানি না স্যার। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর ওরা স্বামী-স্ত্রী, এ সব 'তুই' সম্বোধন—একেবারে আদিম যুগ আর কি। এ কীর্ত্তির অধিকারী একমাত্র আমি-ওরা তিনজনের একজনও নয়। তবে হ্যাঁ, বোনটী আমার ছোট—বড় অবিশ্যি নয়"

চৌধুরী সাহেব প্রশংসমান দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন, "মোহিত, তুমি মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনেছ তা হ'লে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মোহিত উত্তর দিলেন, "এনেছি, কিন্তু আপনার সে 'মালক্ষ্মী' দেশী নয়—বিদেশী—বিলাত-প্রবাসিনী এক আর্ম্মেনীয়া বালিকাকে ভালবেসে বিয়ে করে' বসেছি স্যার। সে আমার চা'র বছরের ছোট। উভয়েই উভয়কে নিয়ে পাগল, শেষে বিয়ে। দোষ বল্‌তে আমার ওই একটাই—অবশ্য যদি এটাকে দোষ বলেন। আর কোন দোষ আমার মধ্যে পাবেন না স্যার। তাই সব্বাই আমার প্রশংসা করে, কেবল ওই রাম..." কথার মধ্যে হঠাৎ আসিয়া মোহিত নিম্নকণ্ঠে অপ্রস্তুতের মত

বলিলেন, ওভা আত্মপ্রশংসা করে' ফেলেছি, তা ছাড়া কার কাছে কি সব কথা। আমার ওই আর একটা দোষ—কথা বল্‌তে বোস্‌লে স্থান কাল পাত্র জ্ঞান থাকে না—মাফ কোর্‌বেন স্যার।"

চৌধুরী সাহেব শেষের কথায় কাণ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মোহিত, বিদেশী মহিলাকে বিয়ে করে' কি তুমি ঠকে গিয়েছ? আজ কাল ত বিলাত-ফেরতেরা এতে মোটেই কোন দোষ দেখেন না।"

আবেগভরে মোহিতকুমার বলিতে লাগিলেন, "ঠকে গিয়েছি? আমি? রামঃ! বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করেছি বলে ত আমার মনেই হয় না। আপনি এরূপ বিয়ে অনুমোদন করেন কিনা ভেবেই আমি ও কথা বল্‌লাম। মনে হয় কি জানেন স্যার, আমরা যেন চিরদিনের জানাশুনা—ওছাড়া অন্য কেউ আমার বউ হ'তে পারে এ চিন্তাই এখন আমার কাছে আজগুবী লাগে। সত্য বল্‌তে কি স্যার, অনেক দেশ ঘুরে ফিরে, অনেক কিছু দেখে শুনে আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে, আপনি পর, স্বজাত, পরজাত, স্বদেশ-বিদেশ, ওগুলি কৃত্রিম বাঁধ। মানুষের মধ্যকার যে সনাতন আসল রূপটী তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন। ভালবাসার চাইতে উচ্চতর ধর্ম ও আর কিছুই দেখি না। দূরকে নিকট, পরকে আপন যা করে, সেই ত ধর্মের ভিত্তি-ভূমি। পরশ পাথরের অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না—কিন্তু ভাল-বাসা যে পরশপাথরধর্মী তা কে অস্বীকার করবে···কিন্তু ওভা ধান ভান্‌তে শিবের গীত! এলাম ভগ্নীপতির দরখাস্ত মঞ্জুর করাতে, আরম্ভ কর্‌লাম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বকুনি। আর তা ছাড়া···" মোহিত হঠাৎ থামিয়া গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাবেন স্যার একদিন এই গরীবের বাড়ীতে? আপনার পায়ের ধূলি পেলে আপনার 'মা লক্ষী' খুব খুসী হবে! তা ছাড়া দেখ্‌বেন বিদেশী মহিলা বলে মনেই হবে না—চালচলন বেশভূষায় একদম খাঁটি বাঙ্গালী।"

এতক্ষণে চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী পর্দার অন্তরাল হইতে আত্ম-বিস্মৃত অবস্থায় ভিতরে আসিয়াছেন এবং স্বামীর পার্শ্বের একটী শূন্য আসন অধিকার করিতেই মোহিত অনুমানে বুঝিলেন—তিনি কে এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্মানে তাঁহার পায়ের ধূলি লইলেন। চৌধুরী গৃহিণীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মাতৃত্বের ছাপ। মাথায় হাত দিয়া তিনি মোহিতকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখী হও বাপ, খোদা তোমার মঙ্গল করুন।" মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্বের নিকট অবনমিত হইল। সকলের প্রভু অন্তর্যামী এই ক্ষুদ্র ঘটনায় বোধ করি রুষ্ট হইলেন না।

• • •

যেদিনকার ঘটনা উপরে বিবৃত হইল, সেইদিনই বৈকালে চা'র ঘটিকার সময় নাটোর জংশন হইতে একখানি জুড়িগাড়ী মোহিত কুমারের বাড়ীর ফটকে আসিয়া থামিল। চালক দরজা খুলিতেই মোহিতকুমার ও রামরঞ্জন গাড়ী হইতে নামিলেন। নবাবগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারী, আনোয়ারুল হক্ চৌধুরী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রামরঞ্জন দত্তকে পূর্ণ বেতনে পুরা দুই সপ্তাহের 'সিক লীভ' ত মঞ্জুর করিয়াছেনই, অধিকন্তু সস্ত্রীক মোহিত কুমারের গৃহে আসিবার প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত দিয়া দিয়াছেন। গাড়ী থামিতেই দারোয়ান সহাস্যে সম্ভ্রম জানাইয়া ভিতরকার জিনিসপত্র নামাইতে লাগিল। বাড়ীর 'গেটে' ঢোকামাত্র মোহিতকে দেখিয়া বাড়ীর পোষা কুকুরটী লাফাইয়া আসিয়া উল্লাসে লেজ নাড়িতে লাগিল। বারান্দায় উঠিতেই খাঁচার টীয়াটী আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। মোহিতকুমার কুকুরটীর গায় হাত বুলাইয়া, টীয়ার খাঁচা উঁচু করিয়া ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পুঁটী, এই তোর বর নে।" শেফালিকা ওরফে পুঁটী গাড়ীর শব্দ শুনিয়া আগেই দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া যাইতেই চারিচক্ষের মিলন।

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

নিছক সত্য ঘটনা। সহরের বাড়ীতে বাড়ীতে এরূপ ঘটনা ঘটে। কুমারী মেয়েদের বইয়ের মধ্যে বা কাপড়ের খুঁটে এইরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অনেকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করে বাসা পাণ্টান, কেউবা সোজা-সুজি চাকরকে সন্দেহ করে থানায় আনেন। এইরূপ ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই চাকর তাড়ান উচিত। মেয়েদের অপর শত্রু ছোকরা গুরু। গুরু অনেক প্রকারের হয়। উদাসী, বিদেশী, গৃহী, সস্ত্রীক গুরু, ছোকরা গুরু ইত্যাদি। অনেক গুরু আছেন যারা সস্ত্রীক গুরুগিরি করেন। খোকা মহারাজ বিলেত যাবেন শিষ্য টাকা দেবে। খুকিমার বিয়ে, টাকা দেবে শিষ্যেরা। ছোকরা গুরুই সবিশেষ ভয়াবহ। একটী ছোকরা গুরুর বিবৃতি দেওয়া গেল।

"গুরুগিরি করতে গেলে দুটো জিনিস জানা দরকার। মনস্তত্বের খুঁটিনাটি, আর কিছুটা ম্যাজিক। এই দুইটী জিনিষের মারপ্যাঁচে, আমি একটী সদ্য বিবাহিত তরুণ শিষ্যকে আয়ত্তে আনি। আমার আদেশে অচিরে সে পিতামাতা ভাই-বোন সকলকেই বিদেয় দেয়। স্ত্রীটি ছিল তাঁর সুন্দরী। কিন্তু কিছুতে সে আমার ভক্ত হয় না। বিরক্ত হয়ে শিষ্টীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে আদেশ দিলাম। সাবধানে তাকে স্ত্রীর উপর অত্যাচারেও প্ররোচিত করলাম। এ বিষয়ে উদ্দেশ্য ছিল আমার দুটী। প্রথম উদ্দেশ্য স্বামীর উপর স্ত্রীর বিরক্তি আনা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল স্বামী সাহচর্য্য হতে তাকে বঞ্চিত করে তার যৌন বোধকে তীক্ষ্ণ করা। স্বামীর অত্যাচার থেকে ইচ্ছে করেই তাকে আমি রক্ষা করি। উদ্দেশ্য তার মনটাকে আমার দিকে টেনে আনা। আড়ালে কিন্তু শিষ্যকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিতই করতাম। এর পর আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। শিষ্যকে আমি সারারাত্র ধর্ম্ম কথা শুনাতাম। দুপুরে তাকে আফিসে পাঠাতাম। সারা দুপুর আমি ঘুমাতাম, কিন্তু তার ঘুমানর সুযোগ নেই। রাত্রে তাকে আরক খাওয়াতাম। পরলোকের ভয় দেখিয়ে তাকে আমি অভিভূত রাখতাম, ঘুমের অভাবে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়ে আসে। শেষে তাকে পাগল বিশেষে পরিণত করি। দেখেও সে দেখতে পায় না, বুঝেও সে বুঝে না।

বাটীতে তখন আমি একমাত্র পুরুষ। স্ত্রীর মন স্বামীর উপর বিষিয়ে উঠেছে। এদিকে সে নিজে অসহায়। একটী পয়সারও দরকার হলে তাকে আমার কাছেই চাইতে হয়। ওদিকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য। স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। ঠিক সেই সময় তার মুখে ধরলাম সুধার পাত্র। হতভাগা শিষ্য বুঝেও বুঝল না, চোখেও দেখলে না এবং সে সহায়তাই করল। তখনও আমাকে সে অবতার বলেই জানে। শেষে শিষ্যর চেয়ে শিষ্যাই আমার বেশী ভক্ত হয়।

এইরূপ গুরুগিরি অবশ্য বেশী দিন চলেনি। বাপ ভাইয়েরা খবর পেয়ে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে যায়, পাড়ার লোক বাড়ী ঢুকে গুরুকে বার করে দেয়, শিষ্য মশাই দোতলা থেকে আস্ফালন করেন কিন্তু গুরু রক্ষায় অপারক হন। ধীরে ধীরে শিষ্য মশাই সেরে উঠেন। পূর্ব্ব কথা স্মরণে লজ্জিত হ'ন। সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে আমি শিষ্যকে জিজ্ঞেস করি। সে এইরূপ বলে, নিচের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য।

"চোখের সামনে দেখলাম, ভগবান নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারলেন না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরে যিশুর কথা ভেবে মনকে সুস্থির করলাম। দুই দিন দুই রাত ঘুমালাম, কাঁদলামও। ঘুম ভাঙার পর বারণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছি মাত্র। হঠাৎ শুনি নীচের ভাড়াটেরা অকথ্য ভাষায় গাল পাড়ছে। আমাকে উদ্দেশ করে সে বলছে—হারামজাদা। নেমে আর দেখি। তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ। তুই ত জোচ্চরটাকে সাধু বলে, আমায় তার শিষ্য করিয়েছিলি। আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাসখানেক আগে সে গুরুদেবের কাছে আসে ও স্বেচ্ছায় শিষ্যত্ব স্বীকার করে পরে সে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠে। তার ভক্তি দেখে আমার হিংসে হত। এ কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, তবে কি···। আমার সন্দেহ জাগে, আমি তাকে বলি —ওপরে আসুন না মশাই। সে ওপরে আসে ও বলে—দেখুন ঘরে দরজা বন্ধ করে পূজা করার সময় আমি গুরুজীর বাক্স খুলি এবং বুঝতে পারি তিনি একজন ঠক্। আমাকে আপনাকে ও এমনি অনেককে ঠকিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠবার পর ভদ্রলোক আমাকে জানান, জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে আমাকে রক্ষা করার জন্যেই তিনি গুরুজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমায় স্বভাবিক করার জন্য ইচ্ছে করেই তিনি পরামর্শমত গালিগালাজ করেন। আমারই মত একজন ভক্তকে গুরুনিন্দা করতে শুনেই নাকি আমি প্রকৃতিস্থ হই।"

এই গুরুটী আরও অনেক শিষ্য-পত্নীর অনুরূপ ভাবে সর্ব্বনাশ করেন। একটী শিষ্য-পত্নীকে আমি জানতাম। সে আমাকে জানায়—দেখুন, স্বামীর উপর আমি প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি দেহ দান করি। আমি তাকে এইরূপ উপদেশ দিই—"বেশ করেছ লক্ষ্মীমেয়ে। কিন্তু যা করেছ করেছ, আর করো না। আর যা বলেছ আমাকে বলেছ, এ কথা আর কাউকে বলো না। কারুর কাছে এ কথা স্বীকার করো না—জানতে পারলেই দোষ, না জানতে পারলে দোষ নেই। ভুলচুক হয়েই থাকে। তোমার স্বামী ছিল তখন রোগী। রোগীর উপর রাগতে নেই। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। এইবার একনিষ্ঠা হয়ে ঘরকন্না করো। পূর্ব্বের ঘটনাগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত উপেক্ষা করে সতী সাবিত্রী হও। এই আমার আশীর্ব্বাদ।" এই সব ছোকরা গুরু হতে সাবধান হওয়া ভাল। এমন অনেক গুরু আছে যারা শিষ্যাদের বিশ্বাস করায়, সে ভগবান এবং শিষ্যদের দেহ ও মনের অধিকারী। সংযম পরীক্ষায় ভাল করেও তারা অগ্রসর হয়। রোগীর আত্মীয়দের এবং পড়শীদের এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং আইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

বাংলা দেশের মেয়েদের উপর এমন অনেক অত্যাচার হয়, যখন কিনা তাদের মুক্তির উপায় থাকে মাত্র তিনটী। এই তিনপ্রকার পন্থার মধ্যে একটী তারা বেছে নেয়। একপ্রকারের মেয়ে আছে, যাদের লোকে সতী সাবিত্রী বলে। মুখ বুজে সকল অত্যাচার তারা সহ্য করে। সকলে তাদের ভাল বলে। কিন্তু এই ভাল হওয়ার জন্যেই তাদের আয়ুক্ষয় হয়। মানুষ সকলকে খুসী করতে পারে না। সকলকে খুসী করা মানে আয়ুক্ষয়। এজন্য তাদের strain হয় খুব বেশী। স্নায়ুর উপর ধাক্কা পড়ে। এই কারণে দজ্জাল ও মুখরা মেয়েরা বেশী দিন বাঁচে। ভাল মেয়েরা গুমরে গুমরে থাকে। শেষে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হয়। তারা সহজ ভাবেই মরে। দ্বিতীয় প্রকার মেয়েদের সহ্যগুণ থাকে কম। তারা আত্মহত্যা করে। তৃতীয় প্রকার মেয়েরা হয় বেপরোয়া, তারা জীবনধর্ম্ম বুঝে। প্রতিশোধ নিতেও জানে। তারাই ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে আসে। শেষোক্ত অবস্থার সুযোগ দুর্ব্বৃত্তরা নিয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য। এই সব মেয়েরা প্রেমে না পড়েই বেরিয়ে যায়।

"আমাকে যখন তখন সকলেই মারত। স্বামী, শাশুড়ী, দেবর যে পারত সেই মারত। এমনও হয়েছে, কলতলায় চান করছি। শাশুড়ীর হুকুমে উড়ে বামুন আমায় চুল ধরে ভিজে কাপড়ে উপরে নিয়ে গেছে। আমি তখন মিষ্টি কথার কাঙাল। যে কেউ আমাকে একটু সহানুভূতি দেখায় তার উপরেই আমি খুসী হই। এরূপ অবস্থায় পাশের বাড়ীর মণ্টু আমাকে সান্ত্বনা দিত। সুবিধে মত লুকিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করত। জীবন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। প্রতিশোধ স্পৃহাও প্রবল হয়ে উঠে। মণ্টু ছাড়া যেন আমার আর কেউ নেই। বাপ মা আমায় স্বামীর ঘরে বনিয়ে থাকতে বলে, সাহায্যে আসে না। মণ্টুই আমার তখন একমাত্র বন্ধু। তারই পরামর্শে আমি চলে আসি। সেও যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমি তা জানতাম না।"

জ্বালা যন্ত্রণাই যে শুধু নারীর সর্ব্বনাশের কারণ হয় তা নয়, লোভ ও কুসঙ্গ একটা কারণ বটে। এই লোভ হতে গরীবেরাই ভোগে বেশী। যে সম্মতি লোভ ও কুসঙ্গজনিত সে সম্মতি সম্মতিই নয়। এই সব দুর্ব্বৃত্তদের নূতন নূতন আইন দ্বারা শায়েস্তা করা উচিৎ। সামাজিক ভুল ত্রুটীও অনেক অঘটনের জন্য দায়ী। এতে ইন্ধন যোগায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা। কলিকাতার বস্তিজীবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্প্রদায়মাত্রেই বহু সৎলোক থাকে। তারা বিভিন্নরূপ গুণের অধিকারী। স্ব স্ব সম্প্রদায় স্ব স্ব গুণ নিয়ে বিভোর। কিন্তু এই সব গুণাগুণের কোনও রূপ আদান প্রদান হয় না। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের কোনও গুণ বা ধর্ম্মাচরণের ভাগী হয় না। হলে ভালই হত। গির্জ্জা মসজিদও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষের জন্য খোলা নেই। কিন্তু বেশ্যালয়, চণ্ডুখানা ও জুয়োর আড্ডায় সকল সম্প্রদায়েরই অবাধগতি। পাপের পথে জাত-কুল বা জাত বিচার নেই, কিন্তু ধর্ম্মের পথে আছে। মোসলেম মেয়েরা ধর্ম্মাচরণ করে পবিত্র হারামে, হিন্দু ললনারা দান ধ্যান করে পর্দ্দার আড়ালে—এক কথায় ধর্ম্মাচরণের কার্য্য হয় লোক-চক্ষুর অন্তরালে। কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু পাপাচরণ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মাচরণের খবর না রাখুক পাপের খবর রাখে। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশ্বমৈত্রে দেখা যায়। কলিকাতার বস্তিজীবনই এর কারণ। বস্তিগুলিতে বিভিন্ন জাতীয় চোর ডাকাত, ঠগ ও জুয়োচ্চোর, এক সঙ্গেই বাস করে। শুধু তাই নয়, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও ঘটায়। এই ভাবে পাপের পথ শক্ত হতে শক্ত হয় ও পুলিশের কাজ বাড়ে। কলিকাতার বস্তিগুলি দুই প্রকারের হয়। খোলা বস্তি ও বস্তিবাড়ী। কোলকাতার এক পঞ্চমাংশ লোক বাস করে এই বস্তিতে। ২০টী হতে ৫০টী পর্য্যন্ত মাটকোঠা নিয়ে তৈরী এক একটী বস্তি। এক একটী মাটকোঠায় ১০ থেকে ২০টী ঘর থাকে। এক একটী পরিবার এক একটী ঘরে বাস করে। বস্তিগুলিতে সর্ব্বজাতীয় নরনারীকেই এক সঙ্গে দেখি। একটী ঘরে হয়ত আছে একজন বেশ্যা-নারী। অথচ

পাশের ঘরেই বাস করে একজন শ্রমিক ও তার ধর্ম্মপত্নী। পাশের ঘরেই হয়ত আছে একজন পুরাণ চোরের রক্ষিতা, সামনের ঘরে হয়ত আছে একজন ঝি। দিনে সে ঝিগিরি করে, রাত্রে করে পেশা। দুই একটা সংগ্রাহিকাও এসে জুটে। এইরূপ আবহাওয়ায় কোনও গৃহস্থ বধূ কিছুদিন বাস করলে অবশ্যম্ভাবি ফলই ফলে। এইরূপ কোনও এক গৃহস্থ বধূর বিবৃতি লিখে দিলাম।

"আমার স্বামী একজন গরীব শ্রমিক। দিন আনে দিন খায়। কোনও রূপে সংসার চলে, আমার পাশের ঘরে থাকে এক কুলটা নারী। তার আয়েসী স্বাধীন জীবন আমায় প্রলুব্ধ করে। তার সাজগোজে আমি মুগ্ধ হই। তার কোনও কষ্টই নেই। তার চেয়ে অনেক সুন্দরী আমি। অথচ ছেঁড়া কাপড়ে দিন কাটাই। দিন-রাত করি শুধু হেঁসেলের দারোগাগিরি। পাশের ঘরে থাকত এক বুড়ী। সে আমাকে প্রলুব্ধ করত, স্বামীর বিরুদ্ধে আমায় উত্তেজিতও করত। পরে জানতে পারি বুড়ী একজন সংগ্রাহিকা, কন্যা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে ডেরা বেঁধেছে। আমায় লাখপতি হবার লোভ দেখায়। পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরে দেখে আমি বিরক্ত ও অমনোযোগী। ক্ষেপে উঠে স্বামী আমায় প্রহার করে। এতে আমার বিরূপ মন আরও বিরূপ হয়। এই সুযোগে বুড়ী আমায় স্বামী ত্যাগের পরামর্শ দেয়, সে আমায় বহু জায়গায় লুকিয়ে রাখে, শেষে এক মাড়োয়ারীর কাছে গছিয়ে দেয়। অনেক হাঙ্গাম হুজুতের পর স্বাধীন হই। পয়সা পেয়েছি, রোগ পেয়েছি কিন্তু সুখ পাইনি, শান্তিও না, মনে মনে আমি মৃত্যুই কামনা করি।"

এই সব সংগ্রাহিকারা শুধু খোলার বস্তিতেই ডেরা বাঁধে তা নয়। তারা বস্তি বাটীতেও আড্ডা গাড়ে। বস্তিবাটীগুলি প্রায়ই দুই বা তিন তলা কোঠা বাড়ী। এখানেও এক একটী গরীব পরিবার এক একটী কামরায় বাস করে। ধীরে ধীরে সংগ্রাহিকার বধূদের লোভী ও স্বামীর উপর বিরূপ করে। পরে কোনও এক ব্যক্তি দ্বারা আদালতে দরখাস্ত করায়, শুভকাঙ্ক্ষিণীটী হাকিমকে জানায়, মেয়েটীর উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। তার উদ্ধারের জন্যও আবেদন জানায়। ম্যাজিষ্ট্রেট আইন-কানুন মত পরোয়ানা জারী করেন। পুলিশ মেয়েটাকে উদ্ধার করে আদালতে আনে। অনেক সময় সংগ্রাহিকার লোকই বধূর জামীন হয়, কোর্টে হাজিরের দিন পর্য্যন্ত কুশিক্ষাই পায় তোতা পাখীর মত বয়ান (State-ment) মুখস্ত করে। সাধারণতঃ মেয়েরা যার হেপাজতে থাকে, তারই প্রয়োজন হয়ে উঠে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ; মনের মত লোক হলে ত কথাই নেই, আদালতে যা হবার তাই হয়, আদালতে বধূটী অনেক কাল্পনিক অত্যাচারের কথা বলে। আদালত শুদ্ধ লোকের চোখে জল আসে। কিছুক্ষণ পরে হাকিম রায় দেন—মেয়ে সাবালিকা। যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে। অচিরে চোখের জল মুছে, হাসতে হাসতে বধূ বেরিয়ে আসে, কিন্তু ঘরে ফিরে না। এই ভাবে নারী-সংগ্রহ অপরাধেরই সামিল, নূতন আইন দ্বারা মেয়েদের ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আটকানর ব্যবস্থা করা উচিৎ। এই বয়সের মেয়েরাও প্রায় ভাবপ্রবণ হয়। তাদের বুদ্ধিমত্তাও কম থাকে। বর্ত্তমান আইনে মাত্র ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত আটকান চলে। বয়সটা বাড়ীয়ে ৩০ করলেও মন্দ হয় না। এই ত গেল মেয়েদের দিক। প্রসঙ্গত কথিত শ্রমিকটী সম্বন্ধেও বলা যাক। এইরূপ একজন পুরুষের বিবৃতিও লিখে দেওয়া হল। এ থেকে বস্তী-জীবনের বিষময় ফল উপলব্ধি হবে।

"একদিন বাটী ফিরে দেখলাম স্ত্রী নেই। পাশের ঘরের পুরাণ চোরটা ঠাট্টা করে জানাল—পাখী পাইলে গেছে, পরিশ্রান্ত আমি, মাটিতে বসে পড়লাম। কাজ-কর্ম্মে স্পৃহা হারালাম, মদ খেতে শিখলাম, কিস্তি-ওয়ালার কাছে টাকা ধার করলাম। শোধ দেওয়া অসম্ভব, শেষে চুরি করলাম। চোখের সামনে দেখি স্ত্রী আমার রাজরাণী। ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়ায়, আমি অনাহারে মরি, তাই চুরি করি, বেশ্যাসক্ত হই। একদিন নেশার মাথায় স্ত্রীর ঘরেই ঢুকে পড়ি। চিনতে পারিনি তাকে, হঠাৎ শুনি মেয়েটা বলছে—এত দূর অধঃপাতে গেছ, কিন্তু এতে যে অকল্যাণ হবে। বরং নাও এই দশটা টাকা, অন্য কারুর ঘরে যাও। চলে যাও এখান থেকে, পাপের উপর পাপ করবনা। চেয়ে দেখি আমারই স্ত্রী, বাড়ী ফিরে আফিঙ খাই, কিন্তু মরিনা। হতভাগ্য স্ত্রীর উক্তরূপ প্রত্যাখ্যান থেকে মেয়েদের একটা বিশেষ দিক উপলব্ধি হয়। নারী সব সময়ই নারী, তাদের যা ভাল তা তারা কোন অবস্থাতেই হারায় না।" (ক্রমশঃ)

ঝরণা ধারার পাশে

শ্রীমতী কমলা দাস

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন সবে সরে গিয়েছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু আলো এসে পড়েছে—পথের পাশের ছোট ঝরণাটীর গায়ে।

একটী তরুণ এসে বসল সেই ঝরণার ধারে। হাতে তার তুলি আর রং ; চোখে কোন স্বপ্নলোকের আভাস। দেখে মনে হয়, তার মন পাখা মেলে উড়তে চায় নীল আকাশের বুকে ; যদিও সে থাকে এই বাস্তবতার মর্ত্ত্যলোকে।

আস্তে আস্তে সে তুলে নিল তার তুলি। কিছুক্ষণ সে মোহ অঞ্জন মাখা চোখ দুটী তুলে তাকিয়ে রইল ঝরণার দিকে।

সত্যি কি অপরূপ! সে ভাবে কত যুগ ধরে এই ঝরণা বয়ে চলেছে—কিন্তু তার সৌন্দর্য্য এতটুকু ম্লান হয়নি। সে কি পারবে তা তার তুলিকায় প্রকাশ করতে? মুগ্ধ হয়ে সে তাকিয়ে রইল। ছোট ছোট শাদা নুড়ির ওপর দিয়ে জল নেচে চলেছে। পাথরের গায়ে লেগে জল উপচে এসে পড়ছে পথে, আনন্দ যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। জলের কলধ্বনি কলকণ্ঠের কাকলীর মত শোনা যাচ্ছে। স্বচ্ছ জলের উপর এসে পড়েছে—এক ঝলক রোদ। সে সেই জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর তার তুলি চলতে লাগল। তরুণের মনে আজ বড় আশা, এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আভাস অন্তত সে ফুটিয়ে তুলতে পারবে তার পটে। হঠাৎ তার ভ্রূ কুঁচকে এলো, নাঃ হোল না। আবার সে নূতন করে রং ফেরাতে বসল। ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠল একটা অধীর উদ্দীপনা, সম্ভাবনার আশায় আনন্দে উচ্ছল একটা ব্যাকুলতা।

শিল্পীর চোখে কত অভিনব রূপ ধরা পড়ে, কিন্তু ওর সময় কোথায়? যে দেশে ওর জন্ম। সেখানে শিল্পীদের চলতে হবে দশের মন রেখে। নিজের দিকে তাকাবার সময় কোথায়? দেশের কাছে ওরা শুধু পটুয়া, ওরা অপ্রয়োজনীয়। ওরা শুধু বড়লোকের ফ্যাশান। কলালক্ষ্মীর আসন আজ ধূলার 'পরে। আজ শিল্পীকে বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। ওর মন বিদ্রোহ করে। না, সে কখনও যাবে না—ভিক্ষার পাত্র নিয়ে অরসিকদের কাছে। টাকার জন্য সে পারবে না শিল্পকে খাটো করতে। কখনই তা সে পারবে না। উৎসাহে সে তুলি চালাতে থাকে। কারণ সে ঠিক করেছে—সে হবে শিল্পের পূজারী, টাকার নয়।

তার হাত ধরে ওঠে, সে বড় ক্লান্ত বোধ করে। অবসন্ন মনে তার ভেসে আসে বিষাদের ছায়া। তার কানে বাজে তার স্ত্রীর কথা। "ওগো

কদিন পরে আর খাবার কিছু থাকবে না ঘরে। লক্ষ্মীটী তুমি ঐ বড় বাড়ীর মিত্তিরদের ফরমাসটা শেষ করে ফেল, নইলে—" স্ত্রীর কথা মনে হতে তার সব প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায়। ভাবে, 'বেচারী কত কষ্টে যে সংসার চালায়, মুখ ফুটে কখনও কোন অনুযোগ সে করেনি'। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে পড়ে। থাক আজ এখানেই। মিত্তিরদের বাড়ীর ছবিটা আজ শেষ করতেই হবে। দুঃখ হয় এরকম একটা শান্ত নিভৃত সৌন্দর্য্যকে ছেড়ে যেতে। ধীর মন্থর গতিতে সে সহরের দিকে চলতে সুরু করে তুলি ও পট নিয়ে।

ঝরণা ঝিকিমিকি করে হেসে ওঠে এই ভেবে যে—তার সৌন্দর্য্য না জানি কতই অপূর্ব্ব, তাই ত শিল্পী এত করে তাকে আঁকতে চায়।

এখন আঁধার আর আলোকের লুকোচুরি খেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে সাড়া পড়েছে। খুব ছোট ছেলেরা মার আঁচল ধরে পিছনে ঘুরছে খাবারের আশায়. আর যারা একটু বড়, তারা মুখ হাত ধুয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত পড়তে আরম্ভ করেছে। আর বড়রা বেরিয়ে পড়েছে কাজের উদ্দেশে।

একটা মেয়ে ও একটা ছেলে এসে দাঁড়ায় ঝরণার কাছে। কাজরী ও মুনিয়া।

"মুনিয়া, তুই আর আজ কাজে যাস না। সাঁঝে ফিরে আসিস, আমি কি করে থাকি তুই বল"।

"আমার কি তোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে? কিন্তু একদিন কাজে না গেলে আমরা খাব কি করে"? সে দিন-মজুর, দিন আনে দিন খায়। "কাজরী তোকে ছেড়ে যেতে আমারও আজ একটুও ইচ্ছা করছে না। আয় আমরা ঝরণার পাশে বসি, তুই গান কর, আমি শুনি"।

"বারে, তুই কাজে যাবিনি? দেরী করে গেলে যে গাল খাবিরে। না না তুই উঠে পড়। দেখ সূর্য্যি কতটা উঠেছে"।

"তা গাল খাই খাব। তাও ত তোর কাছে একটু বসতে পাব, তোকে একটু বেশী দেখতে পাব, তাই আমার যথেষ্ট। বুঝলি! যখন গাল দেবে তখন তোর কথা ভাবব, তাহলে একটুও কষ্ট হবে না। আয়"।

"ওকি তোর চোখে জল, তুই কাঁদছিস্"?

"নারে না, আমি কাঁদব কেন"?

"আমাকে ফাঁকি দিচ্ছিস, তোর চোখে জল দেখছি, কি হয়েছে বল আমার খারাপ লাগছে"।

"আমার মনে হয় তুই আমায় কত ভালবাসিস্, আমি কত সুখী, কিন্তু এত সুখ কি আমার কপালে সইবে"।

মুনিয়া এসে কাছে দাঁড়ায়, কাজরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—আর বলে, "তুই বড় ছেলেমানুষ রে"। আর কিছু সে বলতে পারে না। একটু চুপ করে থেকে বলে, "আমি তবে যাই, কেমন"?

"দেরী করিসনি"।

"নারে না দেরী কি আমি করতে পারি"?

মুনিয়া চলে যায়, কাজরী তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। গাছের আড়ালে মুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়। কাজরী আস্তে আস্তে এসে ঝরণার পাশে বসে। একমনে বাসন মাজতে থাকে। ঝরণা এত সুন্দর। তবু তার দেখতে ইচ্ছা করে না। বাসনগুলো মেজে নিয়ে কলসীতে জল ভরে কাজরী উঠে পড়ে। আজকে গিয়ে সে তার কুঁড়ে ঘর খুব ভাল করে সাজাবে। আর কি রাঁধবে? মুনিয়া কি ভালবাসে, কি খাবার দেখলে মুনিয়া সবচাইতে খুশী হবে তাই ভাবতে ভাবতে সে চলে যায়।

অভিমানে ঝরণার স্রোতে যেন ভাঙন ধরে। সে এত সুন্দর তার দিকে কাজরী একবার ফিরে তাকাল না।

উঃ! কি ধুলো দিয়ে গেল গাড়ীটা। ধুলোয় সব ঢেকে গেল। আর যে কিছু দেখাই যাচ্ছে না।

দুপুর গড়িয়ে এলো।

সূর্য্য একেবারে মাথার ওপর উঠেছে। চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সকালের স্নিগ্ধ কোমল সৌন্দর্য্য আর নেই। এক একটা দমকা হাওয়া এসে রাস্তার ধূলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে কাকের কর্কশ কা কা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এমন সময় এসে বসল ক্লান্ত পথিক। এই প্রখর রোদের মধ্যে সে কত মাইল হেঁটে আসছে। কপাল থেকে তার টপ্ টপ্ করে ঘাম ঝরছে। আর পা ধুলায় ধূসরিত। সে তার আধময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপালটা মুছে ফেলে. ভাঙ্গা ছাতাটাকে একপাশে রেখে বসে পড়ল।

মাত্র কয়েক বৎসর আগেও তারা ছিল বড়লোক। এর পূর্ব্বপুরুষরা ছিল ছোট জমিদার। বেশ বড় অবস্থা—নায়েব, গোমস্তা, খাজাঞ্চি সবই ছিল। টাকা নিয়ে তারা উড়িয়েছে দু'হাতে। সে যেন এক অনেক দূরে চলে যাওয়া স্বপ্নের মত। তারই বাবা ছিল বড় লোক, আর আজ সে পথের ভিখারী! সে সামান্য চাকরীর জন্য দু-ক্রোশ পথ হেঁটে গেছে, হেঁটে ফিরেছে এই ভীষণ রোদের মধ্যে। তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে। তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে,—

"হায় ভগবান, এই কি তোমার বিচার, একের পাপে আর একজনকে তুমি কষ্ট দাও। কেন? কেন কর তুমি এই রকম? আমি ত নিজে কোন পাপ করিনি, প্রভু। আমার কেন এত ভোগ"? হঠাৎ যেন সে ক্ষেপে ওঠে, "না, না, এ চালাকি তোমার চলবে না, তুমি এই রকম ভাবে আমাকে কষ্ট দিতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না, আমি যে নির্দ্দোষ"।

একটা দমকা হাওয়া ধুলো উড়িয়ে তার চোখে মুখে ছড়িয়ে দেয়। চোখ রগড়ে, মাথা ঝাড়া দিয়ে যখন সে ঠিক হয়ে বসে তখন তার যেন অনেকটা হাল্কা বোধ হয়। এই স্নিগ্ধ ঝরণার দিকে তাকিয়ে তার মনটা যেন শান্ত হয়। ঠাণ্ডা জলের মধ্যে পা'দুটোকে ডুবিয়ে সে চুপ করে বসে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সে আঁজলা করে জল পান করে।

ঝরণার দিকে সে তাকিয়ে রইল। "কি সুন্দর, আমারই ভুল, আমারি অন্যায়, যিনি এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন তিনি কখনই নির্দ্দয় হতে পারেন না। এমন স্নিগ্ধ সৃষ্টি যার, তার হৃদয় কোমল না হয়ে যায় না। আমার দুঃখ দৈন্য তিনিই মোচন করবেন। তাঁর দয়া নিশ্চয়ই অপার।" দুহাত কপালে ঠেকিয়ে সে উঠে পড়ে। অনেক দূরে তাকে যেতে হবে।

বেলা তখন চারটা হবে, রোদের তেজ কিছুটা কমেছে, এখন চোখে একটু লাগলেও মাথার চাঁদি ফাটাবে না। ধূলোর ঝড় বইয়ে দিয়ে একটা মোটর এসে ঝরণার একটু দূরে থামল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ছয়টা কলেজের ছেলে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

এদের মধ্যে প্রতীপ গাড়ী চালিয়ে এনেছে। তারই গাড়ী। অবস্থা তার ভাল। তার বাপ আসামের কোন এক চা-বাগানের মালিক। একটা মাত্র ছেলে। কত আদর, কিন্তু এত সুন্দর স্বভাব, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। পরের উপকার করবার জন্য সর্ব্বদাই তার মন ব্যাকুল। এই সব নানাগুণ থাকায় ছেলেদের মধ্যে সকলেই তাকে মানে ও ভালবাসে। প্রতীপের বেশ লম্বা এবং 'মাসকুলার' চেহারা। এসে পাঞ্জাবির হাতটা গুটিয়ে সে চট করে একটা চাটাই তুলে নিল। "সুধীর, তুই নে জলের ফ্লাস্কগুলি আর টিফিন কেরীয়ার, আর এই বাক্সটা তোর জিম্মায় সমর, বুঝলি? আরে, জগদীশ আর পঙ্কজ, তোরা ত বেশ মজা করে দাঁড়িয়ে আছিস্। একজন নে হারমোনিয়াম ও বাঁশি, আর ঢোলটা নিতে ভুলিস্ না। আমাদের নিতু গেল কোথা?

এই যে, প্রতীপদা, আমি গাড়ীর বনেটের জানালাগুলি খুলে দিচ্ছি।

ইঞ্জিনটা বড় গরম হয়ে গেছে কিনা। তোমরা এগোও আমি যাচ্ছি"। "চট করে আয়, আর চিনাবাদামের ঠোঙ্গাটাও গাড়ী থেকে তুলে আনিস্"।

সোরগোল করতে করতে ছোট দলটী এসে ঝরণার পাশে দাঁড়াল। গাছের ছায়াতে ঝরণার ধারে সবাই বসে পড়ল।

"আহা কি সুন্দর ঝরণা, দেখে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল, আমার যে একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা করেছে, হাঁ ঠিক হয়েছে—,

"এই সেরেছে, কবি, কবিতা, পেটের ভেতর যে আগুন জ্বলছে। আগেত তার ব্যবস্থা করা যাক, পরে তোমার কবিতা রচনা হবে"।

"জগদীশ, তুই একেবারেই···যাক, আর বলব না।"

এদিকে প্রতীপ ততক্ষণে ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে, চাটাইয়ের ওপর বসে পড়েছে। নিতু নিয়েছে খাবার পরিবেশনের ভার।

সকলের যখন বেশ কয়েক পেয়ালা চা খাওয়া হয়ে গেছে, টিফিন-কেরীয়ারও যখন প্রায় নিঃশেষ তখন সকলের মুখে কথা ফুটতে আরম্ভ করল।

কালকের ম্যাচে তুই যা খেললি প্রতীপ—Simply marvellous. তুই যদি অমন না খেলতিস তবে আমরা ঠিকই হেরে যেতাম। প্রতীপ আবার খুব ভাল ক্রীকেট খেলোয়াড়। ক্রীকেটে সে কলেজের Blue.

"তুমি যখন, প্রতীপদা, বেপরোয়া ভাবে 'হুক' ও 'গ্লাইড্' করতে সুরু করে দিলে তখন আমার বোলারটার দিকে তাকিয়ে খুব হাসি পেতে লাগল যে সোজা লেগ উইকেটে বল দিয়ে' তোমাকে আর কাবু করতে পারছে না।"

"প্রতীপ, তুই আমাদের কলেজের মান রেখেছিস।"

এই প্রশংসায় প্রতীপ যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলে ফেলল, "শুনেছিস, Budge, Perry এরা যে সব কলকাতায় Christmas টেনিস খেলতে আসছে, এবারে Christmasএ কিন্তু কিছুতেই কলকাতা ছাড়া হবে না কি বলিস।"

"আলবৎ না" এই বলে সমর নিতুর পিঠে মারল এক ঘুসি। "উঃ কি যে কর," "প্রতীপদা, কোন খেলাই কিন্তু miss করা হবে না।"

"ওদের এক একটার Smashing ভাবতেও যেন আমার কেমন লাগছে।" নিতু বলে ওঠে, "সত্যি ওদের একএকটা খেলোয়াড়, অদ্ভুত ওদের health কি, এই যে সেদিন বিলাত থেকে অতি সাধারণ একটা ফুটবল টিম এসে গেল। কি একএকটা চেহারা!

"আমাদের দেশে সকলের আগে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার," মুরুব্বিয়ানা চালে পঙ্কজ বলে।

সুবীরের এসব আলোচনা যেন ভাল লাগছিল না, কারণ নিজে সে রোগী। তাই তাড়াতাড়ি সে বলে, "জানিস্, আমাদের ক্লাসের মণি যে loveএ পড়েছে পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে।

জগদীশ চট করে বলে বসে, "কি রকম type এর মেয়েরে? সে loveএ পড়ি পড়ি করছে কিন্তু পড়তে পারছে না, যে একবার loveএ পড়ে খা খেয়ে গেছে···"

"তুই থামত দেখি, জগদীশ, তোর যেন সবতাতেই বাড়াবাড়ি, তোর ত যা চেহারা, তুই loveএর মর্ম্ম বুঝবি কি?"

"ওরে সর্ব্বনাশ! সুবীর সে বড় বেশী বোঝে, ওর কথাটাত জানতে হচ্ছে এবারে, বলত তোর কি ব্যাপার।"

"প্রতীপ, বল ত এরকম করলে পারা যায়?" সুবীর বিরক্তির চোটে বলে ওঠে।

প্রতীপ সবাইকে থামিয়ে বলে "এবার সুবীরের একটা গান হোক।" সুবীর গায় ভাল। মিষ্টি গলা. মনটার মধ্যে বেশ একটু চঞ্চলতা এনে দিতে পারে এমনি ভাবে সে গায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পশ্চিমাকাশে সূর্য্য অস্তায়মান। আর সেখান থেকে ফুটে উঠেছে একটুখানি লাল আভা। ঠিক যেন এক রূপসীর কপোলে সলজ্জ রক্তিম আভা। বাতাস আস্তে আস্তে বইতে সুরু করেছে, আর তার সঙ্গে তাল রেখে ঝরণাও যেন আস্তে বইছে। চারিদিকে একটা স্নিগ্ধ আবহাওয়া—

"আজি আমারি কথা
ওগো বিমনা সাঁঝে
তব স্মরণ বীণে
যেন বারেক বাজে"।–

মিঠে গানের সঙ্গে তাল দিয়ে বাঁশি ধরল নিতু।

গান থামল কিন্তু তার রেশ প্রত্যেকের কানে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছে। মনের উপরে রচিত হয়েছে একটা সুরের ইন্দ্রজাল। সকলে নির্ব্বাক্, সকলে স্তব্ধ।

এই সময়ে ধরণীর রূপ গেলে বদলিয়ে, অস্তরবির লালিমা মুছে গেছে আকাশের বুক থেকে। চাঁদ ডাক দিয়েছে মেঘের আড়ালে। মিঠে হাওয়ায় দূর থেকে হাসনুহানার গন্ধ ভেসে আসছে, পাখীরা সারাদিনের পর নিজেদের প্রিয়ার পাশে ফিরে এসেছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রতীপ ব'ল্ল, 'চল বাড়ী ফিরে।" এই দলটীর ভেতর প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তনের বেশ ছাপ পড়েছে। এসেছিল সব পাগলা হাওয়ার মত, চারিদিকে চঞ্চলতার সৃষ্টি করে, কিন্তু গেল সব নিস্তব্ধতার মধ্যে ফিরে।

এমনি করে আমাদের সুন্দর ঝরণাধারাটুকুর একটী দিন কেটে গেল। মানুষের কত বিচিত্র প্রেম, গোপন ব্যথা, উদাস ক্লান্তি ও লীলাময় উল্লাসকে কতখানি স্পর্শ করে সে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে তা কি সে নিজেই জানে?

—তমসাবৃত—

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

অতলান্ত গুহা হ'তে শুধু ব্যর্থ কাতর প্রার্থনা—
জীবনের দিনগুলি গোণা।
আলোকের আশা আজো নাই—
চাওয়া-পাওয়া হিসাবের ঠিকানা মিলাই!

ভিক্ষা-বীজ মন্ত্রে শুধু বাঁধিয়াছি বাসা,:
কঙ্কাল মনের কোণে তবু ধরি আশা—
স্বপ্ন তবু আজো এসে করে করাঘাত
জীবনে কি আসিবে প্রভাত?

অন্তর শুকায়ে গেছে—সাহারায় বৃথা পরিক্রমা—
আলোক নিভেছে কবে আঁধার হ'য়েছে শুধু জমা!
কঙ্কাল হাসে না কভু—শুষ্ক মুখে ভাষা নেই কবি;
মরণ নেমেছে জাখো, পথে পথে তারি সব ছবি।

জঙ্গম

বনফুল

৫৬

শঙ্করের পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া উৎপলের মুখে মৃদু হাসি এবং ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া পত্রখানি তৃতীয়বার সে পাঠ করিল।

ভাই উৎপল,

লোকনাথবাবুর স্ত্রী খুব বিপন্ন হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল ভোরেই তাই আমাকে পলাশপুর যেতে হচ্ছে। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না, কারণ বিপদটা যে ঠিক কি জাতীয় তা তিনি লেখেন নি। তুমি ইতিমধ্যে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা করে' ফেল। যা ভাল বোঝ তাই কর। যদিও প্রথমে আমার মনে একটু খুঁতখুঁতানি ছিল (এবং সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আছে) কিন্তু ভেবে দেখলাম তোমার এবং স্বরমার মতটাই ঠিক। এ অপমান হজম করা উচিত নয়। গুলাব সিংয়ের নামে এখন কিছু কোরো না, কারণ কাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি তাঁর স্ত্রী রুক্মিনী দেবী আমার বাড়ীতে বসে' আছেন। তিনি তাঁর স্বামীর হয়ে মাপ চাইলেন এবং বলে' গেলেন যে মণির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবেন তাঁরা, আমরা যেন এই নিয়ে কোর্টে না যাই। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রমথ ডাক্তার, নিপুদা, গদাই, কেনারাম এবং আর সকলের সম্বন্ধে তোমার যা খুসি কোরো, আমি আপত্তি করব না।

ইতি—শঙ্কর

কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া উৎপল কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যদিও সে ইংরেজি-নবীশ লোক তবু দুইটি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবচন পর পর তাহার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমটি—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরোধর্ম ভয়াবহ', দ্বিতীয়টি 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'। সে কেনারাম চক্রবর্তীকে ডাকিতে পাঠাইল। লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার পর কেনারাম একটা আহ্বান প্রত্যাশাই করিতেছিলেন। খুব একটা ক্ষুব্ধ মুখভাব লইয়া তিনি উৎপলের নিকট গেলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

বিনা ভূমিকায় উৎপল বলিল, "শঙ্কর এখানে নেই। আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে"

"কি কাজ"

"লক্ষ্মীবাগে মণির সম্পত্তি লুট করা ব্যাপারে যারা যারা লিপ্ত ছিল তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। কে কে ছিল খবর পেয়েছি আমি—"

কেনারামের মুখের উপর নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীরভাবে বলিল, "সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না। আপনি ফরিদ কারু হরিয়া রহিম কর্পূরা এই কজনের নাম থানায় পাঠিয়ে দিন, লিখে দিন যে ওরা যে ডাকাতের দলে ছিল তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনার দ্বিতীয় কাজ নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে নোটিশ দেওয়া। একমাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে তাঁদের বলে দিন যে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ না করেন অপমানিত হবেন। তৃতীয় কাজ রাজীব দত্ত। তাঁর ছেলে গদাইকেও শঙ্কর ওদের মধ্যে দেখে এসেছে, আপনি রাজীব দত্তকে গিয়ে বলুন যে অবিলম্বে তিনি খেসারৎ স্বরূপ যদি এক হাজার টাকা দিতে রাজি না হন আমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করব—"

কেনারাম মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়। রাজীব-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা কয়টি বলিলেন—রাজীব এখানে নেই, কোলকাতা গেছে—"

"গদাইকে গিয়ে বলুন তাহলে"

"বেশ। কিন্তু গদাই যদি বলে যে সে ওদের সঙ্গে ছিল না"

অবিচলিতকণ্ঠে উৎপল মিথ্যাভাষণ করিল।

"অস্বীকার করবার উপায় নেই। শঙ্করের কাছে ছোট্ট একটা পকেট ক্যামেরা ছিল, সমস্ত দলটার ফোটো সে তুলে এনেছে—"

এই সংবাদে কেনারাম চক্রবর্তী মনে মনে একটু অশান্ত হইয়া উঠিলেন। জীবনও সেখানে ছিল যে! উৎপল চকিতে একবার কেনারামের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "জীবনও সেখানে ছিল। কিন্তু জীবনের কথা আমরা প্রকাশ করব না, আপনি নিজেই তাকে, ধমকে দিন"

"নিশ্চয়। নিশ্চয় ধমকে দেব। একথা তো আমার কানেই যায় নি!" উৎপল এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। কেবল বলিল, "হ্যাঁ ও ছিল। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে এটা মগের মুলুক নয়। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকেও চিঠি লিখছি আজ—"

"নতুন যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন, তিনি বড় বদমেজাজি লোক শুনেছি। কারও সঙ্গে দেখাটেখা করতে চান না বড়। সেদিন—"

"আমার সঙ্গে হয় তো দুর্ব্যবহার না-ও করতে পারে, একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলাম"

"ও"

কেনারাম মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখন আপাতত উৎপলের বিরুদ্ধাচরণ করা চলিবে না। তাঁহার মুখভাব সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অভিভাবকী ভঙ্গীতে বলিলেন, "নিশ্চয়ই, এর একটা বিহিত করা দরকার বই কি। যা যা বললে এখুনি করছি আমি সব। তুমি নিজে এসব ব্যাপারে মন দিয়েছ দেখে ভারী সুখী হলাম। এই তো চাই। শঙ্কর অবশ্য খুবই করে। তবু—" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুহাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তবু তোমার নিজের সব দেখা চাই। কারণ জমিদারি তোমার" —এই কথা বলিবার পরই প্রসঙ্গত আর একটা কথাও যেন তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, "পাঁচ বছর পরে একটা যে হিসেব নিকেশ নেবার কথা ছিল তারও সময় হয়ে এল

প্রায়। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসেবটা আমি আপ-টু-ডেট করে' রেখেছি। অন্য অন্য ব্যাপারগুলোও শঙ্করকে ঠিক করে' রাখতে বলব—রেখেছে আশা করি—বেশ কেপেবল্ ছোক্‌রা ও। তবু তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিও সব। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে থাকে না, মা লক্ষীর আইনই ওই রকম। রাজবল্লভবাবু নিজে কিছু দেখতেন না বলেই তো সব গেল"—কেনারাম আবার একটু হাসিলেন। উৎপল গম্ভীরভাব আনত নয়নে ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গোঁফই পাকাইতে লাগিল কোন উত্তর দিল না। তাহার মনোভাব যে কি তাহা ঠিক টের না পাইলেও কেনারাম প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলিতেও ছাড়িলেন না।

"সেদিন হৃদয়বল্লভ এসেছিল। সে জমিদারিটা আবার কিরে কিনে নিতে চায়। ভাল দামই দিতে চাইছিল। আমি অবশ্য তাকে বলে' দিয়েছি যে জমিদারি বেচবার কোন কথাই ওঠেনি এখনও"

উৎপল ইহারও কোন উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কেনারাম অবশেষে বলিলেন, "এখন উঠি তাহলে। প্রমথ ডাক্তার আর নিপুকে কি আজই নোটিশ দেবে ?"

"আজই"

"বেশ। তাহলে ড্রাফ্‌ট্ করে' টাইপ করে' পাঠিয়ে দিচ্ছি সই করে দিও⋯"

"দিন"

কেনারামবাবু চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র উৎপলের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল। প্রচ্ছন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

৩৭

শঙ্করের সম্বন্ধে ফুলশরিয়ার অনেক দিন হইতেই একটা খট্‌কা ছিল। হরিয়ার মুখে খবর শুনিয়া তাহা আরও বাড়িয়া গেল। কি রকম ধরণের লোকটা যেন! মণিবাবুর 'কামতে' যাহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিল তাহাদের সকলের নামে নাকি থানায় নালিশ হইয়া গিয়াছে। শঙ্করবাবুই নিশ্চয় ইহার মূলে আছেন, কারণ সব জিনিসের মূলে তিনিই থাকেন। এতদিন ধারণা ছিল লোকটা সত্যই বোধ হয় দেবতা। কেন যে এমন অসম্ভব একটা ধারণা তাহার হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া নিজেরই উপর রাগ হইতে লাগিল। তাহার পতিতা-জীবনে অনেক লোকের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে কিন্তু 'দেওতা' তো একজনও চোখে পড়ে নাই, শঙ্করবাবুকেই বা শুধু শুধু দেবতা ভাবিতে গেল কেন সে! লোকটাকে দেখিয়া 'তাজ্জব' লাগে কিন্তু! হাব-ভাব ইঙ্গিতে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে না, মাথা উঁচু করিয়া কেবল পরোপকার করিয়া বেড়ায় এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার। নটটু-বাবু ডাক্তারও কম পরোপকারী নন, কিন্তু 'সরাব' পান করিয়া রাত দুপুরে তাহার দরজা ঠেলাঠেলি করিতে তিনি কোনদিন ইতস্তত করেন না। এ লোকটা কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও যায় না। পাথরের নয় রক্ত মাংসেরই শরীর নিশ্চয়, কিন্তু কোনরূপ বেচাল নাই। এমন নিখুঁত রকম 'বরহম্‌চারি' তো দেখা যায় না বড়। কিন্তু না—ফুলশরিয়া ওসব বিশ্বাস করে না। শঙ্করবাবু এতদিন তাহার উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই—তাহাতে হইয়াছে কি! বাবু ভেইয়াদের পায়ে পড়িলে অনেকেই অমন উপকার করিয়া থাকে। গরীব দুঃখীদের কাকুতি মিনতিতে গলিয়া পড়া অনেকের ঢং অনেকের সখ—'চুহা মুহা' নিপুবাবুও সকলের উপকার করিবার জন্য লালায়িত—উপকার করিয়াছেন বলিয়াই শঙ্করবাবুকে মহাত্‌মাজি' মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহা করিলে মানুষের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার ধারণাই যে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। না—সে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই আর সকলের মতো এ লোকটারও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় সে গলদ। সেদিন লছমীবাগে গুলাব সিংজির দরবারে হঠাৎ গিয়া হাজির। তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্য্যন্ত! অথচ গুলাব সিংয়ের মতো লোক তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে। আর একদিন কোথাও কিছু নাই রাত দুপুরে যমুনিয়ার বাড়ি গিয়া উপস্থিত। চীৎকার চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভাবিল এইবার হুজুর বোধহয় ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোথায় কি! পরে শোনা গেল মুশাইকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছেন—ওই 'ডোক হর'—মার্কা যমুনিয়াকে গায়ের দামী শালটা বকশিস্ করিয়া গেলেন। দরদ দেখাইবার আর লোক পাইলেন না। গরীবদের প্রতি দরদ যে কত তাহার নমুনা তো এইবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিজেদের ল্যাজে যেই পা পড়িয়াছে অমনি ফোঁস্ করিয়া উঠিয়াছেন! মণিবাবুর 'কামৎ' যেই লুট হইয়াছে অমনি যত গরীব দুখীয়াদের নামে থানায় নালিশ হইয়া গেল। আসল ডাকাত গুলাব সিংয়ের নামে নাকি নালিশ হয় নাই, যত দোষ ইহাদের। অথচ ইহাদেরই জন্য শঙ্কর-বাবুর দয়া একদিন উথলাইয়া উঠিয়াছিল। সকলের 'মাইবাপ' সাজিয়া বসিয়াছিলেন। নিজে জামিন হইয়া থানা হইতে ছাড়াইয়া পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন—কেন যে আনিয়াছিলেন কে জানে। কিছু নয় ও সমস্ত লোক-দেখানো ঢং⋯

ঘুঁটের উনুনে হাওয়া করিতে করিতে ফুলশরিয়া মনে মনে গজরাইতেছিল। সেদিন লক্ষীবাগে শঙ্কর যে তাহার দিকে একবারে মাত্র চাহিয়া দেখিয়া দ্বিতীয়বার আর দেখে নাই ইহাতে সে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। শঙ্কর যদি তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বকিয়া দিত, যদি বলিত ফুলশরিয়া তুই এখানে! তোকে এখানে দেখব আশা করিনি তো—তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইত সে। বুঝাইয়া বলিতে পারিত যে তাহারা অসহায় জনমজুর মাত্র, ধনীদের ডাকে সাড়া না দিলে তাহাদের দিন চলা ভার। ভাল-কাজ-মন্দ-কাজের বিচার করিয়া চলিবার উপায় আছে কি তাহাদের? যাহাতে বেশী মজুরি তাহাই তাহাদের কাছে ভাল কাজ যাহাতে কম মজুরি তাহাই মন্দ। তাহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন সহায়-সম্পদহীন দীন দরিদ্র যে। গুলাব সিংয়ের অত মজুরির লোভ তাহারা কি সামলাইতে পারে? এতকথা ঠিক এমনভাবে মনে জাগে নাই কিন্তু এমনি ধরণের কিছু একটা সে শঙ্করকে বুঝাইয়া বলিতে পারিত। কিন্তু শঙ্করবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না পর্য্যন্ত। সে যেন মানুষ নয়, ডাকিয়া কথা বলিবার উপযুক্ত নয়—পোকা মাকড় যেন। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করেন কখনও আবার পায়ে দলিয়া চলিয়া যান। ইস্ ভারী বড়-

লোক আমার—অমন বড়লোক সে ঢের দেখিয়াছে। সজোরে আবার সে উনুনে হাওয়া করিতে লাগিল। হরিয়াটা আবার আসিয়া জুটিয়াছে। এতরাত্রে তাহার জন্ত আবার রাঁধিতে হইবে। ঘরে চাল নাই, কিন্তু হরিয়া সে কথা শুনিবে না, ভাত সে খাইবেই। পয়সা লইয়া দোকানে চাল কিনিতে গিয়াছে। বলিল উপর্যুপরি কয়েকদিন ভাত খাইতে পায় নাই, চুড়া মুড়ি কিম্বা ছাতু খাইয়া কাটাইয়াছে। কে তাহাকে রাঁধিয়া দিবে! বউ তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না—সে নাকি আর একটা 'চুমানা' করিয়াছে। থানার দারোগা ব্যাগার ধরিয়া তাহাকে দিয়া কয়েকদিন 'বরতন্' মলাইয়াছিলেন, বেতন চাওয়াতে দূর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার নামে বি, এল, কেস্ করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। হরিয়ার মুখেই ফুলশরিয়া শুনিল যে লক্ষীবাগ লুট উপলক্ষে সকলের নামে নালিশ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে এই-বার কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হইবে। নালিশটা যে উৎপল করিয়াছে শঙ্করের ইহাতে যে কোন হাত নাই তাহা হরিয়া জানিত না।······ হরিয়া চাল লইয়া প্রবেশ করিল এবং খবর দিল শঙ্কর-বাবু পলাশপুরে চলিয়া গিয়াছেন। নটবরবাবু তাহার জন্ত শঙ্করবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন দেখা হইল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন। 'বদনসীব' বলিয়া হতাশ হরিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

"বদনসীব তো হাম্ কি করবো। যাঁহা কি ছে?"

হরিয়া কিছু বলিল না, ফুলশরিয়া প্রজ্জলিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"দে চাউল দে—"

চাল লইয়া সে ধুইতে বসিল। সহসা নটবর ডাক্তারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

৩৮

পলাশপুর অভিমুখে যাইতে যাইতে শঙ্কর নিজের মনের আধুনিকতম সমস্যার কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহা পল্লীসংস্কার নয়, গুলাব সিং নয়, সুরমা। সুরমাকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। এজন্য সে লজ্জিত হইতেছিল, নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল কিন্তু কিছুতেই মনকে সুরমা-মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এই অশুদ্ধ অশান্ত চিত্ত লইয়া দেশের কাজ করিবার সত্যই কি কোন অধিকার আছে তাহার? কোনও কালে কি ছিল? বাষ্পে স্ফীত রবারের বেলুনের মতো এক একটা ভাবে মাতিয়া কিছুকাল সে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এত দুর্ব্বল কেন সে? নারীর সান্নিধ্যে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না, সমস্ত আদর্শ সমস্ত শিক্ষা নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কেন এমন হয়। সে তো প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখে তবু কেন তাহার অন্তরবীণার সমস্ত তার আচম্বিতে অকস্মাৎ এমনভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। জীবনে এমন বহুবার হইয়াছে। কেন এমন হয়? অমিয়াকে ঘিরিয়া তাহার এ আকুলতা জাগে না তো। চুনচুন, সুরমা, বেলা নীরা তাহার মনে যে ঢেউ তোলে অমিয়া তাহা পারে না কেন। মনকে সহস্রবার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর মেলে না, মন কেবল স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সে ভাবিয়াছিল তাহার মনের এই স্বপ্নসাধ বুঝি মিটিয়া গিয়াছে। পল্লীসংস্কারের প্রেরণায় আদর্শবাদের কঠোরতায় তাহার চঞ্চল যৌবনচিত্ত বুঝি শান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, আজ সে সবিস্ময়ে দেখিতেছে মনের এই প্রিয়া-প্রবণতা প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহা এতদিন পরে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল কেন। এই সুরমাকে তো সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, এতদিন তো কিছু হয় নাই। এতদিন পরে সুরমাকে ঘিরিয়াই আবার স্বপ্ন জাগে কেন! সহসা সে অনুভব করিল তাহার মন যেন ত্রিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক অংশ অপরাধী, এক অংশ বিচারক এবং আর এক অংশ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা অংশ উভয় পক্ষেরই কথা শুনিতেছে, উভয় পক্ষের প্রতিই সে সহানুভূতি সম্পন্ন। মনের এই অংশই যেন নিগূঢ়ভাবে শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দিল। বলিল তোমার কবি-চিত্ত যে প্রিয়া কামনা করে অমিয়ার মধ্যে সে প্রিয়া নাই। অমিয়া তোমার প্রিয়া নয় প্রয়োজন। প্রিয়াকেই তুমি মনে মনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যে নারীর মধ্যে তাহার আভাস পাইতেছ তাহাকে ঘিরিয়াই তোমার মন স্বপ্ন রচনা করিতেছে। স্বপ্ন-রচনা করাই তোমার স্বভাব। এতদিন পল্লীসংস্কারের স্বপ্নে মগ্ন ছিলে, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে স্বপ্ন ক্রমশঃ ভাঙ্গিতেছে প্রাক্তন স্বপ্ন তাই ফিরিয়া আসিতেছে আবার। তাই কি?

লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। যে লোকটি তাহাকে লোকনাথের বাড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল সে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে চাহিল না। আকারে-ইঙ্গিতে সে এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন একটা বাঘের গুহা অথবা সাপের বিবর দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। শঙ্করের প্রতিও লোকটা এমনভাবে দুই একবার চাহিল যাহার ভাবটা—আচ্ছা, অসম সাহসিক ভদ্রলোক তো, ওখানে কি দরকার! তাহারই মুখে শঙ্কর শুনিল যে লোকনাথবাবু স্কুলে আর চাকরি করেন না, স্কুল হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা দাঁড়াইল না। চলিয়া গেল। শঙ্কর একা দাঁড়াইয়া রহিল।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা আসন্ন। লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল। লোকনাথবাবুর সহিত বহুদিন তাহার কোন যোগ নাই। কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে দেখা তো হয়ই নাই বছর দুই হইতে পত্রালাপও বন্ধ আছে। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাতেও আর সে লেখে না। লোকনাথবাবু উপর্যুপরি কয়েকবার তাঁহার লেখা প্রত্যাখ্যান করায় আর লেখাও সে পাঠায় নাই। বস্তুত লোকনাথবাবুর সহিত কার্য্যত কোন যোগ তাহার আর নাই। তবু সে হঠাৎ—মাত্র একখানি পত্র পাইয়াই—আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের এই আচরণে নিজেই সে বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল। আসিয়াছে বলিয়া বিস্ময় নয়। এতদিনের অদর্শন এবং এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও লোকনাথবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এখনও অটুট আছে ইহা আবিষ্কার করিয়াই সে বিস্মিত হইল। লোকনাথ-বাবুর প্রতি এ অহেতুক শ্রদ্ধা কেন! কি আছে লোকটার মধ্যে—

"বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—"

অভিনয়

শ্রীসুধেন্দু রায়

অভিনয় বল্‌তে অনেকের ধারণা নাটক। কিন্তু এরকম একটা ধারণা যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। তা' ছাড়া অভিনয় শব্দটিকে নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে তাকে অনেক ছোট করা হয়। কেন না, অভিনয়কে নাটকের অন্তর্ভুক্ত করলে শাস্ত্রীয় "নৃত্যাভিনয়" কথাটি অবাস্তব ব'লে স্থিরীকৃত হ'বে। কিন্তু যখন নাট্য ও নৃত্যাভিনয় দুই শাস্ত্রে প্রচলিত তখন মোটের উপর সমস্ত প্রকার নটনকেই অভিনয় ব'লে মেনে নিতে হবে। নটন বলতে নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য ত্রিবিধ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে :—

— — — নটনং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি মুনির্ভিভরতাদিভিঃ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট নটন তিনপ্রকার, আর এই নটন যাদের দ্বারা সাধিত হয় তাদের বলা হয়েছে 'নট'। এই নটই হচ্ছে অভিনেতা—অভিনয় করে যে (নট+অন)।

(অভি—নী+অল) হ'তে অভিনয় শব্দের উৎপত্তি। নী ধাতুর অর্থ হচ্ছে পাওয়া, আনয়ন করা ইত্যাদি। অভি অর্থে সম্মুখ অথবা নিকটে। দুয়ের সংযোগে হ'ল নিকটে বা সম্মুখে নিয়ে আসা। এর থেকেই বোঝা যায় যে অভিনেতা ও দর্শক দুজনাই দুজনার মুখাপেক্ষী। তাই ইয়ুরোপীয় সমালোচক সার্সি (Sarcey) বলেছেন—

"A play without an audience and actors to interpret it is inconceivable."

অভিনেতা যখন :—

নানা ভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকং।
লোক বৃত্তানুসরণং — — —।

অর্থাৎ নানা ভাব ও অবস্থার দ্বারা লোকবৃত্তানুকরণ বা তার কার্য্যকলাপের অনুকরণ করতে যাচ্ছে আর সেই স্থলেই যদি উপভোক্তার অভাব হয় তাহলে সে অভিনয়ের সার্থকতা আমরা বুঝি না। আমরা একে অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। অনুকরণ অর্থে প্রতিরূপ বা সদৃশীকরণ—অন্যের সম্পাদিত কাজ দেখে তদ্রূপকরণ, তার মানে কবির ইচ্ছাকে অভিনেতার ইচ্ছা ব'লে মনে করতে হবে।

এখন কথা হ'তে পারে অভিনয়ের সার্থকতা কখন? মহর্ষি ভরত তা' সুস্পষ্টরূপে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর 'তন্ময়' শব্দের দ্বারা। এ তন্ময়ত্ব কি করে লাভ করা যায়? ভরত বলেছেন :—

যথা জন্তুঃ স্বভাবস্থং পরিত্যজ্যান্য দৈহিকম্।
তৎ স্বভাবং হি ভজতে দেহান্তরমুপাশ্রিতঃ।

আত্মা দেহান্তরপ্রাপ্ত হলে তার স্বভাব পরিত্যাগ ক'রে অন্য দেহের স্বভাব গ্রহণ করে। অভিনয় ক্ষেত্রেও তাই, অভিনেতা নায়কের স্বভাব গ্রহণ করতে যাচ্ছে। দর্শকের দিক দিয়েও সেই কথাই, ফলে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। যেমন কালিদাসের শকুন্তলায় অভিনেতা দুষ্মন্তের চরিত্র অভিনয় করছে। সে ভুলে যাবে যে সে রাজা দুষ্মন্ত না আর কেউ। সেইরকম দর্শকও ভাববে যে সেই যেন দুষ্মন্ত। এখানে দুয়ের উভয়ের দেহান্তরিত হচ্ছে, ফলে এক হয়ে গেছে।

এই অভিনয় আবার চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অভিনয়-দর্পণে বলা হয়েছে :—

আঙ্গিকো বাচিকস্তদ্বদাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকোঽপরঃ।

আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক নামে চার প্রকার অভিনয়।

বাচিকাভিনয় :—নন্দিকেশ্বর বলছেন :—

"বাচা বিরচিতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাচিকঃ।"

কাব্যনাটকাদিতে বাক্যের দ্বারা যা অভিনয় হয় তাই বাচিক অভিনয়। বাচিক অভিনয় সম্বন্ধে ভরত মুনি সুবিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের স্বরাধ্যায়ে স্বরের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন স্বরের উৎপত্তি বক্ষ, কণ্ঠ ও শির। কিন্তু বৈয়াকরণেরা বলছেন :—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ"।

অর্থাৎ—বক্ষঃ, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু এই আটটি উচ্চারণ স্থান। এই স্বর আবার ত্রিবিধ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। হ্রস্ব ও দীর্ঘ সম্বন্ধে কাতন্ত্র ব্যাকরণ বলছে যে :—

"হ্রস্বো লঘু দীর্ঘো গুরুরিত্যুচ্চারণবশাদ্ গম্যতে।"

অর্থাৎ—উচ্চারণ বশতোই হ্রস্ব-লঘু ও দীর্ঘ-গুরু ব'লে জানতে হবে। প্লুত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, :—

"দূরাহ্বানে, গানে, রোদনে চ প্লুতাস্তে লোকতঃ সিদ্ধাঃ।"

ঐ স্বরগুলি মাত্রা ভেদে হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘ দু'মাত্রা ও প্লুত স্বর তিনমাত্রা হয়ে থাকে; আর এর মধ্যে ব্যঞ্জন বর্ণগুলো আধ মাত্রা করে ধরা হয়েছে। সূত্র করা হয়েছে :—

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘউচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতোজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধ মাত্রকং।"

উক্ত স্বরগুলি প্রত্যেকে উচ্চারণ ভেদে ত্রিবিধ, যথা :—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। উদাত্ত হচ্ছে উচ্চৈঃ উচ্চারণ; ইংরাজীতে একে বলা যেতে পারে (climax)। অনুদাত্ত হচ্ছে তার বিপরীত নীচৈঃ উচ্চারণ; ইংরাজীতে (anti-climax) বলা যেতে পারে। আর স্বরিত আছে তাদের মাঝে; সে নাতি উচ্চ ও নাত্যধ।

পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে স্বর সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখেন। তিনি ঐ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভাষার মূলমন্ত্র ব'লে বিবেচনা করেছেন।

ভাষা বিশেষভাবে উচ্চারিত হ'লে রসোৎপত্তি হয়, এই কথাই তিনি সব জায়গায় বলেছেন। সঙ্গীতেরও ঐ একই কথা। স্বর ও ছন্দ প্রভেদ থাকতে পারে না; আর ঐ স্বর ও ছন্দ বিশেষভাবে উচ্চারিত হ'লে রসের উৎপত্তি হয়। তানসেনের যুগে এ সমস্ত প্রচলিত ছিল ব'লে কথিত আছে। এই পর্য্যন্তই বাচিক অভিনয় শেষ করতে চাই।

আঙ্গিকাভিনয় :—অভিনয় দর্পণে বলা হয়েছে—তত্র আঙ্গিকোঽঙ্গৈ র্নিদর্শিতঃ।

আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গগুলির দ্বারাই প্রকাশিত হয়। অঙ্গ বলতে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ এদের সকলকেই বুঝিয়েছে; যথা :—

তত্রাঙ্গি কোঽঙ্গ প্রত্যঙ্গোপাঙ্গৈস্ত্রেধা প্রকাশিতঃ।

ওদের সকলের প্রকাশকেই আঙ্গিক অভিনয় বলা হয়েছে।

শির, হস্তদ্বয়, বক্ষোদেশ, পার্শ্বদ্বয়, কটীতট ও পদদ্বয়—এই ছয় প্রকার অঙ্গ :—

অঙ্গান্যত্র শিরো হস্তৌ বক্ষঃ পার্শ্বৌ কটীতটৌ ;
পাদাবিতি ষড়ঙ্গানি গ্রীবামপ্যপরে জগুঃ ॥

প্রত্যঙ্গ বলতে বলা হয়েছে :—

প্রত্যঙ্গান্যথ চ স্কন্ধৌ বাহূ পৃষ্ঠং তথোদরম্ ।
ঊরূ জঙ্ঘেষড়িত্যাহুরপরে মণিবন্ধকৌ।
জানুনী কূর্পরাবেতত্রয়মপ্যধিকং জগুঃ ॥
গ্রীবা স্যাদপ্য—

স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়—এই ছয়টিকে সাধারণত প্রত্যঙ্গ বলা হয়েছে। মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয় আর কনুদ্বয় এগুলোকেও প্রত্যঙ্গের মধ্যে ধরা হয়েছে। গ্রীবাকেও এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এসব ছাড়া যা বাকী থাকে তাকে উপাঙ্গ বলা যেতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে আবার মতের পার্থক্য দেখা যায়। স্কন্ধকে কেউ কেউ উপাঙ্গের মধ্যে ধরেছে। যেমন :—

উপাঙ্গস্তু স্কন্ধ এব জগুর্ববু ধাঃ।
দৃষ্টি ভ্রূপুট তারাশ্চ কপলৌ নাসিকা হনু ॥
অধরো দশনা জিহ্বা চিবুকং বদনং তথা।
উপাঙ্গানি দ্বাদশৈব শিরস্যঙ্গান্তরেষু চ ॥
পার্ষ্ণিগুলফৌ তলাঙ্গল্যঃ করয়োঃ পাদয়োস্তলে।

আলংকারিকেরা উপরোক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বর্ণনা করেছেন। ওগুলো রীতিমত প্রকাশ করার কারণ হচ্ছে ভাব রসকে সম্যকভাবে ফুটিয়ে তোলা। ঐ সমস্ত আঙ্গিকাভিনয়ের মধ্যে চোখ ও মুখভঙ্গী হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভরত বলছেন :—

শাখাঙ্গ উপাঙ্গ সংযুক্ত কতোপি অভিনয় শুভ।
মুখরাগ বিহীনস্তু নৈব শোভান্বিত ভবেৎ ॥

তিনি সমস্ত শরীরকে ভাগ করেছেন অঙ্গ, উপাঙ্গ ও শাখাঙ্গে।

নন্দিকেশ্বর তাঁর অভিনয় দর্পণে যথাক্রমে শির, দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত, পাদ ইত্যাদি ভঙ্গীর উল্লেখ করেছেন।

অভিনয় দর্পণের মতে শিরঃ কর্ম্ম নয় প্রকার—সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত ও পরিবাহিত। এদের পৃথক, পৃথক লক্ষণ আছে কিন্তু এখানে অতো বড় একটা ব্যাপার সংক্ষেপে লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। নাট্য-শাস্ত্রে তেরো (১৩) প্রকার শিরঃকর্ম্মের উল্লেখ আছে—এদের নাম ও লক্ষণের সঙ্গে অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত শিরঃকর্ম্মের নাম ও লক্ষণের অনেক স্থলে সামঞ্জস্য ও প্রভেদ লক্ষিত হয়। নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত শিরঃকর্ম্ম—আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অবধূত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত।

অভিনয় দর্পণে আটপ্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে, যথা :—সম আলোকিত, সাচী, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত।

নাট্যশাস্ত্রে ছত্রিশ (৩৬) প্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে আট (৮) প্রকার স্থায়ীভাব দৃষ্টি; আট (৮) প্রকার রসদৃষ্টি ও কুড়ি (২০) প্রকার সঞ্চারিভাব দৃষ্টি। এ ছাড়া ভ্রূকর্ম্ম, তারা কর্ম্ম ও পুটকর্ম্মাদিরও বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

অভিনয়দর্পণের মতে গ্রীবাভঙ্গী চতুর্ব্বিধ—সুন্দরী, তিরশ্চীনা, পরিবর্ত্তিতা, প্রকম্পিতা। নাট্যশাস্ত্রের মতে গ্রীবাভঙ্গী নয় প্রকার যথা—সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, বলিতা, বৃবিত্তা।

অভিনয় দর্পণে হস্ত-লক্ষণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে—সংযুত ও অসংযুত।

অভিনয়ের মতে অসংযুতহস্ত আটাশ (২৮) প্রকার—পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধপতাক, কর্ত্তরীমুখ, ময়ূর, অর্দ্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, চন্দ্রকলা, পদ্মকোশ, সর্পশিরঃ, মৃগশীর্ষ, সিংহমুখ, কাঙ্গুল, অলপদ্মক, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড়, ত্রিশূল।

নাট্যশাস্ত্রে চব্বিশ প্রকার (২৪) অসংযুত হস্তের লক্ষণ দেখা যায়;—পতাক, ত্রিপতাক, কর্ত্তরীমুখ, অর্দ্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ (কেউ বলে উহা খটকামুখ) সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, কালাঙ্গুল, উৎপলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, উর্ণনাভ, তাম্রচূড়।

অভিনয় দর্পণের মতে সংযুত হস্ত যথাক্রমে—অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, ডোলা, পুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, শিবলিঙ্গ, কটকাবর্দ্ধন, কর্ত্তরীস্বস্তিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, পাশ, কীলক, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, খট্বা ও ভেরুণ্ড।

কিন্তু ভরতের মতে ও সমস্ত হস্ত তেইশ (২৩) রকমের। তাই বলা হয়েছে :—

"ত্রয়োবিংশতিরিত্যুক্তাঃ পূর্ব্বগৈর্ভরতাদিভিঃ।"

এছাড়া দেবদেবীর ভূমিকায় দেব-দেবীর হস্তের অনেক উল্লেখ আছে।

এতদ্ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব, কোহলের মতে অনেক হস্ত রেচক বা চালনার নাম উল্লেখ আছে; ঐগুলো "রেচক" বা "চালক" নামে অভিহিত।

পাদভেদ :—অভিনয়দর্পণে পাদভেদের লক্ষণ দিয়েছেন :—

বক্ষ্যতে পাদভেদানাং লক্ষণং পূর্ব্বসম্মতম্।
মণ্ডলোৎপ্লবনে চৈব ভ্রমরী পাদচারিকা ॥
চতুর্দ্ধা পাদভেদাঃ স্যুস্তেষাং লক্ষণমুচ্যতে।

মণ্ডল, উৎপ্লবন, ভ্রমরী ও পাদচারিকা চার প্রকার। এদের যথাক্রমে লক্ষণও দেখান হয়েছে; কিন্তু "নাট্য শাস্ত্রে" কিংবা "সঙ্গীতরত্নাকরে" ঐ সমস্ত লক্ষণ পাওয়া যায় না; তবে চারী, করণ, খণ্ড ও মণ্ডল "ব্যায়ামে"র মধ্যে ধরা হয়েছে (নাট্যশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে।)

একসঙ্গে উরু, জঙ্ঘা ও পাদ সঞ্চালনকে চারী বলা হয়েছে। এপ্রকার অনেকগুলো চারী আছে। এগুলি সুসজ্জিত ও পর পর সাধিত হয়। ঐ সমস্ত চালনা একপাদ সম্বন্ধীয় হ'লে চারী হয়। দ্বিপাদ সঞ্চালন হ'লে 'করণ'। আবার কতকগুলো যোগে হয় "খণ্ড"। পুনরায় কতকগুলো খণ্ড নিয়ে হয় "মণ্ডল"। আর চারী, কারণ ইত্যাদি একত্রীভূত করলে হয় 'ব্যায়াম'। এই ভাবে মহর্ষি ভরত অতিসুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এইগুলিই বলতে গেলে আঙ্গিক অভিনয়ের মূল কথা। ঐ সমস্ত আঙ্গিক-অভিনয় অত্যন্ত কঠিন ও সাধনসাধ্য।

পরবর্ত্তীকালের নৃত্যবিদেরা উপরোক্ত চারী নৃত্যগুলো আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য অনেক ভাগ-বিভাগ করেছেন। ঐ সমস্ত ভাগ-বিভাগ নিয়ে এখানে আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব বলে এইখানেই আঙ্গিক অভিনয় শেষ করতে হ'ল।

আহার্য্যাভিনয় :—নন্দিকেশ্বর বলছেন, :—

"আহার্য্যো হারকেয়ূর বেষাদিভিরলঙ্কৃতিঃ।"

হার, বেষাদির দ্বারা পরিচ্ছদাদি গ্রহণের নাম আহার্য্য।

নাট্যশাস্ত্রে আহার্য্যাভিনয়ের চারটে ভাগ দেখান হয়েছে, যথা :—পুস্ত, অলঙ্কার, সঞ্জীব ও অঙ্গরচনা।

শৈল যান বিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধ ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তাজ্ঞের্ না পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।

পর্ব্বত, যান-বাহন, বিমান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, পতাকা প্রভৃতি পুস্ত বলা হয়েছে। "যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সঞ্জীব ইতি স্মৃতঃ।" রঙ্গমঞ্চে প্রাণীদের (নানারকম জন্তুর) প্রবেশকে সঞ্জীব বলা হয়েছে।

তারপর যথাক্রমে অলংকার ও অঙ্গরচনা। এগুলোর দ্বারা দেশ, জাতি ও বয়সানুযায়ী সজ্জিত হ'তে হয়।

আহার্য্য অভিনয়ের বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রের ২৩শ অধ্যায়ে করা হয়েছে। সাত্ত্বিকাভিনয় :—

"সত্ত্বং মনঃ গুণো বা নিবৃত্তং সাত্ত্বিকম্।"

অতএব সাত্ত্বিক শব্দে সত্ত্ব অর্থাৎ মন বা চিত্তের দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্মকেই বুঝায়।

অভিনয়দর্পণে বলা হয়েছে :—

"সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্ঞেন বিভাবিতঃ।"

সাত্ত্বিক ভাবগুলোর দ্বারা ভাবজ্ঞের অর্থাৎ (নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর) বিভাবিত (সম্পন্ন) সাত্ত্বিক অভিনয়।

সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে আলোচনা করার পূর্ব্বে রস নিয়ে প্রথমে আলোচনা করাই বিধেয় হ'বে।

এখন রস কাকে বলে ?

ভরত বলছেন :—"রস ইতি কঃ পদার্থঃ।" উচ্যতে—"আস্বাদ্যত্বাৎ"। এর থেকেই বোঝা যায় রস কেবলমাত্র আস্বাদ বা উপলব্ধির দ্বারাই বোঝা যায়।

ইউরোপীয় মনস্তাত্ত্বিকেরা রস সম্বন্ধে ঐ একই মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন :—

"Feeling is something which we can not define. Because it is the most fundamental phase of consciousness so that its nature is to be felt."

ভরত কতকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন রস কাকে বলে। নানা ব্যঞ্জন-ঔষধি-দ্রব্য সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয় সেইরকমভাবও অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব হতে উৎপন্ন যে স্থায়ীভাব তাকে রস বলা হয়েছে।

"যথা হি নানা ব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্রস নিষ্পত্তির্ভবতি। তথা নানা ভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তীতি।"

রস কি কি ? ভরত বলছেন :—

শৃঙ্গার হাস্য করুণা রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে যথোপযুক্তভাবে উপরোক্ত রসগুলো বর্ণনা করেছেন।

এখন ভাব, বিভাব ও অনুভাব কি ও কাকে বলে এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে এ প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে ভাব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্ত্তী আলংকারিকেরা ভরতকে অনুসরণ ক'রে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন ব'লে মনে হয়।

"কিং ভবন্তীতি ভাবাঃ কিংবা ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ।"

এদিয়ে ভাব অর্থে চিত্তবৃত্তিগুলিকেই বোঝায়। ঐ ভাব ৪৯ প্রকারের। তিনি আরও বলেছেন :—

বি ভাবৈরাহৃতো যোঽর্থোঽনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গ সত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ।
বাগঙ্গ মুখ রাগেন সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে।"

বিভাব, অনুভাব, বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্বাভিনয়াদির দ্বারা সাধিত যে অর্থ গম্যমান হয় তাই ভাব বলে পরিচিত। কবির যে অন্তর্গত সংস্কার, বাগঙ্গ মুখরাগ, সাত্ত্বিক অভিনয়াদির দ্বারা যা নিষ্পাদিত হয় তাই ভাব বলে প্রচলিত।

এখন বিভাব ও অনুভাব কি ?

বিভাব :—"বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্য্যায়াঃ।" ভাবের কারণ, নিমিত্ত বা হেতুকেই বিভাব বলা হয়। চিত্তবৃত্তি উদ্ভবের কারণ হচ্ছে বিভাব।

আর, "অনুভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয় ইতি" অনুভাব। কৃত অভিনয়কেই অনুভাব বলা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভাব হল ভাবের কারণ বা হেতু—যা হ'তে ভাবের উদয় হয়। আর ভাবের বাহ্যিক অভিব্যক্তি বা কাজের নাম অনুভাব। বিভাব—হেতু বা কারণ; অনুভাব—কার্য্য।

"এবং তে বিভাবানুভাব সংযুক্তা ভাবা ইতি ব্যাখ্যাতাঃ।" বিভাব ও অনুভাবের সংযোগেই ভাবের সম্পূর্ণতা।

"তত্রাষ্টৌভাবাঃ স্থায়িনস্ত্রয় স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারিণঃ অষ্টৌসাত্ত্বিকা ইতি ত্রিভেদাঃ। এভ্যশ্চ সামান্যগুণ যোগেনরসা নিষ্পদ্যন্তে।"

সমস্ত ভাব তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা :—স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক। স্থায়ী ভাব হচ্ছে আট প্রকার; ব্যভিচারী তেত্রিশ প্রকার; আর সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার। সব সমেত উনপঞ্চাশ রকমের ভাব।

স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাবগুলির মধ্যে স্থায়ী ভাব হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভরত বলছেন :—

যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথাগুরুঃ।
এবং হি সর্ব্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ।

মানুষের মধ্যে রাজা যেমন শ্রেষ্ঠ, শিষ্যের মধ্যে গুরু যে রকম, সেই রকম স্থায়ীভাব ভাবের মধ্যে প্রধান। এই স্থায়ী ভাব অবশেষে রসে পরিণত হয়; অর্থাৎ তখন রসের সঙ্গে স্থায়ীভাবের ভেদ থাকে না। তাই ভরত বলছেন :—"স্থায়ীভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি।"

স্থায়ীভাব আট প্রকার :—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় ভাব।

এইবার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে ভাব, বিভাব ও অনুভাব স্পষ্ট বোঝা যাক, যথা :—

রতিভাব—(আমোদাত্মকো ভাবঃ) আমোদ-আহ্লাদ, নবঋতু সমাগম, মাল্যাদি ধারণ, সুগন্ধি ও চন্দনাদি অনুলেপন, অলঙ্কার পরিধান, ভোজন, প্রিয়জনসঙ্গম ইত্যাদি রতি ভাবের কারণ বা বিভাব।

স্মিত বদন, মধুভাষণ, ভ্রূক্ষেপ, কটাক্ষ প্রভৃতি রতি ভাবের বাহ্যিক প্রকাশ বা অনুভাব।

ব্যভিচারী ভাব :—

"বিবিধমাভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ।"

স্পষ্টত যতক্ষণ রসপুষ্টির প্রয়োজন ততক্ষণই এরা থাকে, কাজ শেষ হলেই এরা অন্তর্দ্ধান হয়। এই ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ ভাগে বিভক্ত, যথা :—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত বিবোধ, অবহিত্থ, উগ্রতা, ব্যাধি, মতি, অমর্ষ, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক—এই ৩৩টি ব্যভিচারী ভাব। আর সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার।

সাত্ত্বিক :—স্তম্ভ খেদোঽথ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ।

স্তম্ভ, খেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং প্রলয়।

এক ! দুই !! তিন !!!

শ্রীগুণেন্দ্রকুমার বসু এম-এ, বি-এল

১৩৫০ সাল। সারা বাংলা দেশ জুড়ে মন্বন্তরের বিকট বিভীষিকা নিষ্ঠুর হাসি হাসছে। দলে দলে ভিখারীরা ক্ষুধার তাড়নায় প্রতি বাড়ির দুয়ারে ঘুরছে পশুর মত—স্বাস্থ্যহীন জীবন্ত কঙ্কালের মত! সেদিন ছিল রবিবার। অফিস ছিল না বলে বাড়িতেই ছিলাম অলস অবসর যাপনে। উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য—এক অঞ্জলি ফ্যানের জন্য ভিখারীর কর্কশ একঘেয়ে আবেদন মনকে উদাস ভারাক্রান্ত করে তোলে। ভাবলাম—"কোথায় এর শেষ?"

বিকাল গড়িয়ে এলো। রক্তরাঙা সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তের অন্ধকার অতলে গেল ডুবে। অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে ক্লাবের দিকেই এগিয়ে চলেছি। বাগবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে ডাক্তারখানার সামনে ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত রমণীর মুমূর্ষু দেহ এ্যাম্বুলেন্স মোটরে নিয়ে যেতে দেখলাম। তার আচ্ছন্ন দৃষ্টির আড়ালে ছিল তার উপবিষ্ট উলঙ্গ শিশু। মাতার অন্তিম আর্ত্তনাদ নিহত দৃষ্টির সামনে সভ্যজগৎ স্তম্ভিত—লজ্জিত! শিশুটি কথা বলতে পারে না···তবু ওর মূক বিস্মিত দৃষ্টি প্রকাশ করছিল ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত অপমৃত্যুর আতঙ্ক—অপস্রিয়মান জননীর পানে চেয়ে বুঝতে পারলাম না। মাথা নীচু করে চলে এলাম। ভাবছিলাম "কোথায় এর শেষ?"

ক্লাবে পৌঁছে দেখি তুমুল তর্ক জমে উঠেছে। সিগারেটে সজোরে টান দিয়ে নৃপেন বলছে—"কী দরকার ম'শায় আমাদের মাথা ঘামাবার? ও সব সাম্যবাদ টাম্যবাদ ঢের জানা আছে হ্যাঃ।"

নৃপেন ছোকরা ক্লাবের প্রধান চাঁইদের একজন। তা ছাড়া ওর পৈত্রিক বেশ কিছু আছে। আর ইদানীং চাকরীও জুটিয়েছে মামার তদ্বিরে। চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলাম নৃপেন টেবিল চাবড়ে বলছে—এখানে মেয়েমানুষের মত নরম মন নিয়ে চলা যায় না, জীবন একটা সংগ্রাম—Survival of the fittest কথার মানে বোঝেন দয়াল দা?"

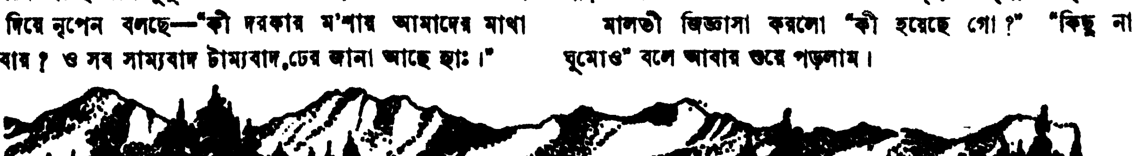
দয়ালের উত্তর শোনা গেল না—

তিক্ত অবসন্ন মন নিয়ে বাড়ি এলাম। রাতে ঘুমের মাঝে কিসের শব্দে চমকে উঠলাম···দেখলাম—হু হু করে ছুটে চলেছে দুরন্ত সময়ের স্রোত···তারই তীরে তীরে ধ্বনিত হচ্ছে—মহাকালের দৃপ্ত পদক্ষেপ কোটি কোটি কঙ্কাল করোটিকা বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ করে।···উদ্যত ত্রিশূলের বজ্রাভ শিখা লেলিহান হয়ে উঠছে—অন্যায়কে অত্যাচারকে ভস্মীভূত করতে···কণ্ঠে তার উচ্চারিত হচ্ছে জর্জরিত বিশ্বের মহামুক্তির মন্ত্র।···

এক! দুই!! তিন!!!···স্থির পদক্ষেপে বিশাল মূর্ত্তি অগ্রসর হয়ে আসছে আমার পানে। পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

ধড়মড় করে ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে জেগে উঠে অন্ধকারে দেওয়াল ঘড়ির দোলকের নিয়মিত শব্দ শুনলাম টিক্! টিক্!! টিক্!!!

মালতী জিজ্ঞাসা করলো "কী হয়েছে গো?" "কিছু না ঘুমোও" বলে আবার শুয়ে পড়লাম।



চাঁদরায়

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ স্বাধীন পাঠান সুলতানদের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর বাঙ্গালার শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালা জয় করেন। ইহার পর মোগল সুবেদারগণ বাঙ্গালায় মোগল শাসন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ন। কিন্তু বাঙ্গালার একদল জমিদার মোগলদের এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই সকল ভৌমিকেরা বারভূঞা নামে পরিচিত ছিল। যে সব বারভূঞা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের মধ্য বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ জেমস্ ওয়াইজ, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত [১] প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থে চাঁদরায়ের জীবনী বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিবার সময় আকবরনামার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ফলে তাঁহাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই ভুল হইয়াছে।

মিঃ ওয়াইজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কেদার রায় চাঁদরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আকবরনামা [২] হইতে জানা যায় যে চাঁদরায় কেদার রায়ের পুত্র ছিলেন। আকবরনামা সমসাময়িক গ্রন্থ এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইবে যে পুত্রের মৃত্যুর পর কেদার রায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রচলিত নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও অসম্ভব নয়। র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ [৩] নামক ইংরেজ পর্য্যটক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে শ্রীপুরের রাজা চাঁদরায় ছিলেন বলিয়া তিনি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। নিকোলাস পিমেণ্টার [৪] গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কেদার রায় শ্রীপুরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই সকল প্রমাণ হইতে চাঁদরায় যে কেদার রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রমপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চাঁদরায় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। র‍্যালফ ফিচের গ্রন্থে আছে যে চাঁদরায়ের মোগল সৈন্যের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। চাঁদরায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সোনার গাঁয়ের রাজা ঈশা খাঁ চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া চাঁদরায় ও কেদাররায় ঈশাখাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন ও কিছুদিন নারায়ণগঞ্জের উত্তর পূর্ব্বে খিজিরপুরে সসৈন্যে অবস্থান করেন। এই সুযোগে ঈশাখাঁ চাঁদরায়ের কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক সোনামণিকে হস্তগত করেন ও তারপর তাহাকে বিবাহ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই "কন্যারত্ন" হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদরায় অন্তিমশয্যায় শায়িত হন। চাঁদরায়ের মৃত্যুর পর কেদাররায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।" [৫]

মিঃ ওয়াইজ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত গল্পটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চাঁদরায়ের মৃত্যুর এই বিবরণ যে নিতান্তই অমূলক তাহা আকবরনামা পাঠে জানা যায়। আকবরনামাতে বিবৃত হইয়াছে যে "রাজা মানসিংহের নিকট খাজা সোলেমান, খাজা ওসমান, সের খাঁ এবং হৈবত খাঁ প্রভৃতি উড়িষ্যার বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ আত্ম-সমর্পণ করায় মানসিংহ তাহাদের জাইগীর প্রদান করেন। কিন্তু অদূরদর্শিতার ফলে ও নানা রকম জনরবে বিশ্বাস করিয়া মানসিংহ তাহাদের সততায় সন্দিহান হন। তিনি তাহাদের হস্ত হইতে জাঁয়গীর কাড়িয়া লন ও তাঁহার নিকট আসিবার জন্য আদেশ করেন। আফগান নেতৃবৃন্দ ভীত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও খরগপুরের নিকট মোগল কর্মচারী বাকিরকে আক্রমণ করিয়া আহত করেন। এই ঘটনা ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। বিদ্রোহী নেতাগণ গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ভূষণার (ফরিদপুর) প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। চাঁদরায় তাহার পিতা কেদাররায়ের পরামর্শানুসারে এই বিদ্রোহীদের কৌশলে বন্দী করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে সোলেমান, ওসমান, ও দিলওয়ার ভূষণা হইতে চারি ক্রোশ দূরে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। চাঁদরায় তাহাদিগকে আহার করিবার জন্য ভূষণার দুর্গে নিমন্ত্রণ করিলেন। আফগানেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সোলেমান ও দিলওয়ারকে পাঠাইল। চাঁদরায় পরম সমাদরে তাহাদিগকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসাইলেন। অত্যল্পকাল পরে দিলওয়ার খাঁ হাত মুখ ধুইবার জন্য প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্ব ষড়যন্ত্রানুসারে চাঁদরায়ের কর্মচারীগণ তাহাকে বন্দী করিল। শীঘ্রই সমস্ত ঘটনা সোলেমানের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অসি নিষ্কাশিত করিয়া বেগে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। চাঁদরায়ের প্রহরীরা তাহাকে বাধা প্রদান করিলে তিনি তাহাদের কয়েকজনকে ধরাশায়ী করিলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গ তোরণে আসিয়া পৌছিলেন। দ্বার রক্ষিদের নিহত করিয়া তিনি বীরত্বের সহিত দুর্গের বাহিরে আসিলেন এবং অনতিবিলম্বে ওসমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইলেন। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ওসমান ভূষণায় দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। চাঁদরায়ের কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ আফগান জাতীয় ছিলেন। তাহারা গোপনে ওসমানকে সাহায্য করিবে বলিয়া সংবাদ পাঠাইল। চাঁদরায় দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আফগানদের আক্রমণ করিলেন। দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে চাঁদরায় হত হইলেন। বিজয়ী আফগানগণ বিনাবাধায় দুর্গ দ্বারে আসিয়া পৌছিল। দ্বাররক্ষীগণ চাঁদরায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন ভাবিয়া দুর্গদ্বার উন্মুক্ত

১। On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal—Dr, James Wise, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874, P. 197. ff. "কেদার রায়"—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ; "বারভূঞা," শ্রীআনন্দনাথ রায়।

২। The Akbarnama of Abu-l—fazl, H. Beveridge, Vl III, p. 968—969.

৩। Ralph fitch, by, I. Horton Ryley (1899) p. 118—119.

৪। Purchas His Pilgrimes, VIX,

৫। বারভূঞা।

করিল। আফগানগণ অতর্কিতে প্রহরীদের আক্রমণ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ও সহজেই চাঁদরায়ের সৈন্যদের পরাস্ত করিল। ইহার পর আফগানগণ ভূষণার দুর্গ ও চাঁদরায়ের রাজ্য তাঁহার পিতা কেদার রায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া ঈশা খাঁর রাজ্যে গমন করিল।"

উপরোক্ত বিবরণী হইতে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে যে আফগানেরা চাঁদরায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদের কৌশলে পরাজিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাহাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হন। কিন্তু অধীনস্থ আফগান কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

আকবরনামার এই বিবৃতি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে চাঁদরায় কন্যার শোকে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন নাই, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। চাঁদরায়ের পিতা কেদাররায়ও মোগলের সাথে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। চাঁদরায় ও কেদাররায়ের আত্মোৎসর্গের কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

দেশ হিসাবে কয়লার ভাণ্ডার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

উৎখাত পরিমাণ হইতে তত্তৎ দেশে কয়লার ভাণ্ডারের অনুমান করা যাইতে পারে; সেই হিসাবে আমেরিকা প্রধান। এখানে মুখ্য বা গৌণ সম্মিলিত ভাণ্ডারের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৬৫ কোটী ৭০ লক্ষ টন। অনুমান, তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল কয়লা ২ লক্ষ কোটী টন। সমস্ত কয়লার খনির আয়তন ২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গমাইল। ইহার মধ্যে পেন্‌সিলভানিয়াতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান কয়লার খনি অবস্থিত। পরিমাপ, অন্ততঃ পাঁচ শত বর্গমাইল। এই স্থানের কয়লার স্তর "অতিকায়" (Mammoth seam) বলিয়া পরিচিত, প্রায় ৬০ ফুট ঘন বা পুরু। তাহার পর আপ্পালাসিয়ান (Appalachian) বা এ্যালিঘেনী (The Alleghany) অঞ্চল পেন্‌সিলভানিয়া হইতে আলাবামা পর্য্যন্ত (পেন্‌সিলভানিয়া, ওহিয়ো, ওয়েষ্টভার্জ্জিনিয়া, মেরীলাণ্ড, ভার্জ্জিনিয়া, কেণ্টকী, টেনেসি ও আলাবামা) প্রায় ৬৫ হাজার বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহাতে পেন্‌সিলভানিয়ার খনিও অন্তর্ভুক্ত। মধ্য বা (Central বা Eastern Interior Field) পূর্ব্ব-আভ্যন্তর ক্ষেত্র প্রায় ৪৮,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং প্রধানতঃ ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয় ও কেণ্টকীর কতকাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। উত্তরভাগের বা উত্তর-আভ্যন্তর অববাহিকা (Northern Field বা Northern Interior Basin দক্ষিণ মিসিগানের ৭,৫০০ বর্গমাইল অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম বা পশ্চিম-আভ্যন্তরিক ক্ষেত্র (Western or Western Interior Field) প্রায় ৯৮,০০০ বর্গমাইল এবং আইওয়া হইতে টেক্‌সাসের মধ্যভাগ (বা প্রায় মেক্সিকো সীমা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা মিসৌরী, কানসাস্, আরাকান্‌সাস্ ও ইণ্ডিয়ান টেরিটরীর এবং সামান্য বিচ্ছিন্ন হইয়া টেকসাসের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া পার্ব্বত্য অঞ্চল (Rocky Mountain) ও অববাহিকা ক্ষেত্র (Basin Field) নামে কালিফোর্ণিয়া, আরিজোনা, কলোরেডো, মণ্টানা, ইডাহো, ওয়াইয়োমিং, ওয়াসিংটন প্রভৃতি অংশে ক্ষুদ্র বৃহৎ খনি বা ক্ষেত্র অবস্থিত।

আমেরিকার খনিতে কয়লার স্তর সাধারণতঃ বেশ ঘন বা পুরু এবং তাহাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা কয়লা উদ্ধার করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। এই কয়লা প্রাচুর্য্যের সহিত বিরাট লৌহ ভাণ্ডারের যোগাযোগ আছে বলিয়া আমেরিকা আজ শিল্পজগতে প্রধান স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

যুক্ত-রাজ্য (U. K.)

উৎখাত কয়লার পরিমাণ হিসাবে ইংলণ্ড আমেরিকার পরেই স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু খনির বিস্তৃতি বা ভাণ্ডারের পরিমাণ হিসাবে ইংলণ্ড এই স্থানের অধিকারী নহে। যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A) ন্যায় যুক্তরাজ্যেও কয়লা এবং লৌহ-প্রস্তরের নৈকট্য ইহাকে শিল্পজগতে উচ্চস্থান দিয়াছে।

ইয়র্কসায়ার, নটিংহ্যামসায়ার ও ডার্বিসায়ার জুড়িয়া প্রায় ষাট মাইল দীর্ঘ স্থান অধিকার করিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান খনি অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা লীড্‌স্ হইতে নটিংহ্যামসায়ার পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল স্থানের খনিতে কয়লার অবস্থিতি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। ল্যাঙ্কাসায়ার ও চেসায়ার-এর খনি ৪৮৪ বর্গমাইল বিস্তৃত। কাম্বারল্যাণ্ডে ছোট খনি আছে; নরদাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের মধ্যে ডারহামের খনি অধিকতর কার্য্যকরী। দক্ষিণ ওয়েলস্, ব্রিষ্টল ও সামারসেট (১৫০ বর্গমাইল), গ্লষ্টারসায়ার, ফরেষ্ট অফ্ ডীন, (৩৪ বর্গমাইল), ওয়ারউইক্‌সায়ার, উত্তর (১১০ বর্গমাইল) ও দক্ষিণ ষ্ট্যাফোর্ডসায়ার (১৫০ বর্গমাইল) শ্রপ্‌সায়ার ও উরসষ্টারসায়ার ও উত্তর ওয়েলেস্-এ (ফ্লিন্টসায়ার ও ডেবিংসায়ার) প্রায় ৪৮ বর্গমাইল বিস্তৃত কয়লার খনি রহিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের খনিগুলি প্রধানতঃ মিড্ (মধ্য) লোথিয়ান, পূর্ব্ব (ইষ্ট) লোথিয়ান, ফাইফ, লিন্‌লিথ্‌গো, ক্লাক্‌ম্যানন, ল্যানার্ক ও আয়ার প্রদেশে অবস্থিত।

আয়র্ল্যাণ্ডের (এয়ে) লিন্‌ষ্টার খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা কিল্‌কেনি, কার্লো এবং কুইন্‌স্ কাউণ্টির কতকাংশ অধিকার করিয়া আছে। তাহা ছাড়া এ্যাণ্ট্রিম (ব্যালি কাসল্), টাইরোণ, টিপারারি, ক্লেয়ার, লিমারিক্ ও কেরি অঞ্চলে কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের আনুমানিক ভাণ্ডার ১৮,৯৫৩ কোটী টন।

জার্ম্মানী

জার্ম্মানীর প্রধান খনি রুর্ (Ruhr), রাইনল্যাণ্ড ও ওয়েষ্টফ্যালিয়ায় অবস্থিত; সার (ব্রুকেন্) খনি রাইন্‌ল্যাণ্ডে লোরেণের উত্তরে; সুইক বা জুইক (Zwickau) এবং লুগাউ (Lugau), স্যাক্সনীতে; আপার (Upper) সাইলিসিয়ার খনি সাইলিসিয়া প্রদেশের অন্তিম দক্ষিণে এবং লোয়ার (Lower) সাইলিসিয়তে ব্রেস্‌ল (Breslau)র দক্ষিণ পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত একটী ক্ষুদ্র খনি অবস্থিত।

ইহা ছাড়া কেম্‌নিট্‌স্ (Chemnitz), লাইপ্‌সিগ্ (Leipzig), কলোন, আচেন্ (Aachen), ফ্র্যাঙ্কফর্ট, ক্যাসিল্যাণ্ড (Cassiland) এবং ওডার (Oder) ও ওয়ার্থ (Warthe) উপত্যকায় প্রচুর লিগ্‌নাইট ও 'ব্রাউন' কয়লা আছে। জার্ম্মানী এই সকল কয়লার সদ্ব্যবহার করে এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য গুণশালী কয়লার সংরক্ষণ করে। জার্ম্মানীর আনুমানিক কয়লার ভাণ্ডার ৪২,৩৩৬ কোটী টন।

রুশ (U. S. S. R.)

রুশের মধ্যে ডন বা ডোনেটস্ অববাহিকার কয়লার খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কার্য্যোপযোগী। ইহা কৃষ্ণসাগরের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মস্কোনগরীর দক্ষিণে মস্কো বা টুলা (প্রধানতঃ ওকা উপত্যকা) অববাহিকা অঞ্চল, কয়লার জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। উরলের পশ্চিমে (Perm সহরের পূর্ব্বদিকে) প্রচুর কয়লা এতদঞ্চলের সমস্ত লৌহ নিকাসন কার্য্যে সহায়তা করে। সাইবিরিয়ার পশ্চিম সমতলক্ষেত্র, কুস্নেট্স্ক অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর কয়লার অবস্থান জানা গিয়াছে। মধ্য সাইবিরিয়ায় পশ্চিমে টুঙ্গুস্ক অববাহিকা এবং পূর্ব্বে লেন্স্ক অববাহিকা প্রদেশ, দক্ষিণে মিনুসিন্স্ক, ইরকুটস্ক এবং কান্স্ক অববাহিকা অঞ্চলে বিরাট ভাণ্ডার আছে।

এই সকল ক্ষেত্র ছাড়া রুশের উত্তরভাগে পেচোরা (Petchora) ক্ষেত্রে এখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই। রুশের আনুমানিক ভাণ্ডার ৬,০১১ কোটী টন।

জাপান

নাগাসকি বন্দরের পশ্চাতে কিউসিউ ক্ষেত্রে, ইয়েজো (Yezo)তে ইসিক্যারি এবং ফুকুসিমার সন্নিকটে উত্তর হন্‌সু অঞ্চল হইতে জাপানীরা প্রচুর কয়লা উদ্ধার করিয়া থাকে। জাপানের এ সমৃদ্ধি খুব বেশী দিনের নয় ; হিসাব মত ফ্রান্সই পঞ্চম স্থানের অধিকারী, কিন্তু জাপানীর অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে যেমন প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছে এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। জাপানের আনুমাণিক ভাণ্ডার ৭৯৭ কোটী টন।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে বিচ্ছিন্ন ভাবে অন্ততঃ পঞ্চাশটী ক্ষুদ্র বৃহৎ খনি অবস্থিত ; তন্মধ্যে উত্তরাংশের খনিগুলি (Valenciennes, Pas de Calais এবং Bourbonnais) বৃহৎ। মধ্যক্ষেত্রের খনিগুলিতে কতগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন খনি, যথা,—Loire (St. Etienne), Burgundy, Nivernais (Le Creusot), Gard (Alais), Blanzy, Tarn, Aveyron (Aubin, Carmaux) ও Bourbonnais (Commentry) প্রভৃতি পড়ে। ফ্রান্সের আনুমাণিক ভাণ্ডার ১,৭৫৮ কোটী টন।

পোল্যাণ্ড

পোল্যাণ্ডের মধ্যে পোলোন (Pologne) খনিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাইলিসিয়ার উপরাংশের সমস্ত খনি, অর্থাৎ শতকরা ৯২ ভাগ, পোল্যাণ্ডের অধিকারে অবস্থিত। গত মহাযুদ্ধের ফলে পোল্যাণ্ডের এই সুযোগ হয় ; তৎপূর্ব্বে পোলাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে ডম্বোভোর সন্নিকটস্থ খনিগুলি লইয়া তাহার অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। সালিসিয়ার খনি পোল্যাণ্ডে সংযুক্ত হওয়ার পর পোল্যাণ্ডের কয়লার ভাণ্ডার সম্বন্ধে সঠিক হিসাব হয় নাই।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা পরে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহা নিষ্প্রয়োজন।

বেলজিয়ম

ক্ষুদ্র স্থান বেলজিয়ম কয়লা উৎখাতনে নবম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কয়লার ভাণ্ডার আনুমাণিক ১,১০০ কোটী টন। বেলজিয়মের খনি ফ্রান্সের ভ্যালেন্‌সিয়েন্‌স্ (Valenciennes) খনির এক অংশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বেলজিয়মের মধ্য দিয়া প্রস্থে পাঁচ হইতে সাত মাইল স্থান ব্যাপিয়া সরাসরি আচেন (Aachen) বা এ-ল্যা-স্যাপ্‌ল্ (Aix-la-Chapelle) পর্য্যন্ত এই খনি গিয়াছে। মন্স ও সার্‌লেরয় (Mons and Charleroi in Hainault) নামুর বা নেমিওর (Namur in Namur), লীজ বা লিয়াজি (Liege in Liege) সহর কয়টী এই খনির বিস্তার পথের উপর পড়িয়া বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়াছে। মন্স ও সার্‌লেরয় অঞ্চলেই বেলজিয়মের প্রধান খনি অবস্থিত। দ্বিতীয় খনি, ক্যাম্পিনে, হল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তে ও অবস্থিত লিম্বুর্গ হইতে বেলজিয়মের এ্যাণ্টওয়ার্প পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

চীন

মহাচীন কয়লা সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ; ইহার আনুমাণিক ভাণ্ডার অন্যান্য বহু দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী এবং সাধারণতঃ ৯৯,৫৫৯ কোটী টন বলিয়া ধরা হয়। চীনের প্রায় সর্ব্বত্র কয়লার খনি আছে ; কিন্তু অনেক স্থলেই আধুনিক উপায়ে কয়লা উৎখাতনের উপযুক্ত করিতে পারা যায় নাই। চিহ্‌লি (Chihli) বা বর্ত্তমান হোপে (Hopeh or Hopei)র উত্তরভাগে কাইপিং ও সানটুঙ্ প্রদেশের পোসান খনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কয়লা উৎপাদন করে। ফাঙসেন-সিয়েন (Fangshen-Hsien) খনিতে প্রচুর এ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লা আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সান্‌সি, দক্ষিণ পূর্ব্ব হুনান এবং উত্তর ও মধ্য সেকোয়ান বা জেকোয়ান (Szechwan) প্রদেশে প্রচুর কয়লা অবস্থিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য (Un. of S. Africa)

দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্যের আনুমানিক ভাণ্ডার ৫,৬৭৭ কোটী টন, তন্মধ্যে ট্রান্সভালের অংশ ৩,৬০০, নাটালের ৯৫০, জুলুল্যাণ্ডের (নাটাল) ৬০ এবং অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট, কেপ্ প্রদেশ (Cape Provinces) বাসুটোল্যাণ্ড এবং সোয়াজিল্যাণ্ড (Swaziland) সম্মিলিত ৪৮০ কোটী টন বলিয়া অনুমান করা হয়। ট্রান্সভালের মিড্‌ল্‌বুর্গ (Middle-burg) জেলার উইটব্যাঙ্ক খনিই প্রধান। র‍্যাণ্ড (Rand or Witwaters Rand)এর পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাখান ও স্প্রীংস, ভাল (Vaal) নদীতীরে জোহান্সবার্গের ৩৫ মাইল দক্ষিণে ভেরীনিগিং (Vereening-ing) সহরের নিকটে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব হাইড্‌ল্‌বার্গে (Heidelberg) এবং এরমেলো—ক্যারোলিন্ অঞ্চলে ব্রেটনে-এ কয়লার খনি রহিয়াছে।

নাটালের নিউ ক্যাস্‌ল ও ডাণ্ডী জেলা, ক্লিপ রিভার (নদী) কাউণ্টি হইতে বিস্তৃত হইয়া ব্রাইহিড (Vryheid) হইয়া অম্‌ফলোজি (Umfolozi) পর্য্যন্ত গিয়াছে।

চেকোস্লোভাকিয়া

প্রাগের দক্ষিণ পশ্চিমে ও পশ্চিম চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধান লিগনাইট খনিসমূহ অবস্থিত। সাইজিন বা সাইসিন্ (Cieszyn) বর্ত্তমান টেসেন (Teschen) জেলায় ভাল কয়লা উৎখাত হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়ার আনুমানিক ভাণ্ডার ১৬,৫৫৭ কোটী টন ; তন্মধ্যে কুইন্সল্যাণ্ডই প্রধান। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্-এর সঙ্গে মিলিয়া যে দুইটী প্রদেশে প্রকৃত কয়লা উৎখাত হয়, তন্মধ্যে কুইন্সল্যাণ্ড শতকরা ৮০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। ভিক্টোরিয়ায় ব্রাউন কয়লার বিরাট ভাণ্ডার অবস্থিত।

নেদারল্যাণ্ড

নেদারল্যাণ্ড (হল্যাণ্ড) ক্ষুদ্র, পরিসরের হইলেও তাহার ভাণ্ডার ৪৪০ কোটী টন বলিয়া অনুমান করা হয়। দক্ষিণ ও উত্তর লিম্বুর্গ, দক্ষিণ পীল (Peel) এবং উইণ্টারসউইক (Winterswijk) খনি হইতে প্রায় সমস্ত কয়লা উৎখাত হইয়া থাকে।

কানাডা

কানাডার প্রকাণ্ড ও আনুমানিক ভাণ্ডার অফুরন্ত বলিলেও প্রায় অত্যুক্তি হয় না ; উভয়ের সম্মিলিত পরিমাণ ১,২১,৬৭৭ কোটী টন। বাৎসরিক উৎপাদনের হিসাবে যথাক্রমে নোভাস্কোটিয়া, আলবার্টা ও ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্থান।

নোভাস্কোটিয়ার সিডনি, ইনভারনেস্, রিচমণ্ড (কেপ্ ব্রিটন দ্বীপে), পিক্টু বা পিক্‌টাউ (Pictou) ও কাম্বারল্যাণ্ড প্রায় সমস্ত কয়লা সরবরাহ করে।

নিউব্রান্সউইকে মিণ্টো খনি, সাল্‌কাচেওয়ান প্রদেশে এষ্টেভান জেলার সাউরিস খনি (Souris Coalfield) প্রধান।

আলবার্টায় লেথ্‌ব্রিজ, ব্যাক্ষহেড এবং এড্‌মনটন জেলার খনিতে কাজ চলিতেছে। ভাণ্ডার হিসাবে সমস্ত কানাডার শতকরা ৮৭ ভাগ এক আলবার্টায় অবস্থিত বলিয়া হিসাব করা হয়। এডমনটন, বেলী (Belly) নদী এবং কুটেনে (Kooteney) স্তরই (formation) সমস্ত কয়লার আধার।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দক্ষিণ ক্ষেত্র (Southern field) ক্রিজটাউনে, মধ্য ক্ষেত্র (Central field) এ্যালেক্সাণ্ড্রিয়া, কোর্ট জর্জ ও কোয়েস্‌নেল এবং ভ্যাঙ্কুভার ক্ষেত্র ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপে অবস্থিত। কুইন সার্লট (Queen Charlotte Is.) দ্বীপে প্রচুর কয়লা আছে।

ইউকন প্রদেশে (Yukon Territory) হোয়াইট হর্স (White Horse), ট্যান্টালস্ এবং রকক্রীক্ অঞ্চল (area) এবং উত্তর কানাডার ম্যাকেঞ্জি অববাহিকা প্রদেশ (Mackenzie Basin)এ কয়লার অবস্থান সম্বন্ধে জানা গিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়া

মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর কয়লা রহিয়াছে ; তন্মধ্যে প্রকাণ্ড বা মুখ্য খনির অংশ খুব বেশী নহে। তথায় সর্ব্বপ্রকার কয়লার আনুমানিক ভাণ্ডার ১৭,৫০৯ কোটী টন। মাঞ্চুরিয়ার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়লার খনি আছে। তন্মধ্যে কোরিয়া সীমার নিকট লিওকিয়াও অঞ্চলের খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

স্পেন

ক্ষুদ্র স্পেন বহুকাল হইতেই কয়লার জন্য সুনাম পাইয়া আসিতেছে ; আনুমানিক ভাণ্ডার ৮৭৮ কোটী টন, তন্মধ্যে জাত এ্যানথ্রাসাইটের অংশ খুব বেশী। খনির মধ্যে স্পেনের উত্তর পশ্চিম এ্যাসচুরিয়াস্ (Asturias)এর অন্তর্গত ওভিয়েডোকে কেন্দ্র করিয়া ঐ অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কয়লা সরবরাহ করিয়া থাকে। মধ্য স্পেনের পেনারয়ার (Penarroya) এবং তাহা ছাড়া এব্রো খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তুরস্কের খনি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। তবে ইহার আনাটোলিয়া প্রদেশ খনিজ পদার্থের আকর বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইন্দোচীনের জাত ও গৌণ ভাণ্ডারের পরিমাণ ২,০০০ কোটী টন বলিয়া অনুমান করা হয়। টংকিং অঞ্চলে হোঙে (Hongay) ও কেবাস্ (Kebas) এবং আনামে তুরেন (Tourane) খনিতে কাজ চলিতেছে এবং ইহারাই ইন্দোচীনের প্রায় সমস্ত কয়লা উৎপাদন করে।

ইটালী খনিজ বিষয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ নয় ; উল্লেখযোগ্য কয়লার খনিও নাই বলিলেই হয়। টাস্‌কেনীর পাহাড়ের সানুদেশে বিশেষতঃ আরিজো (Arezzo), পিসা ও গ্রসেটো অঞ্চলে লিগ্‌নাইট উৎখাত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জ (East Indies), তন্মধ্যে ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চল কয়লা সম্পদে নিতান্ত হীন নয়। তথায় ১৩০ কোটী টন কয়লার ভাণ্ডার আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপের অংশ বিশেষে কয়লা উৎখাত হয়।

ক্ষুদ্র চিলি (Chile)তে কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তথায় উৎখাত কয়লা জগতের মোট হিসাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। চিলির কন্‌সেপসিয়ন (Concepcion) ও আরাউকো (Arauco) প্রদেশ প্রায় সমস্ত কয়লা সরবরাহ করিয়া থাকে।

ব্রেজিল-এর বিরাট আয়তনের তুলনায় কয়লার খনির সংখ্যা বা উৎখাত কয়লার পরিমাণ কিছুই নয়। সাও পাউলো (Sao Paulo) হইতে রায়ো গ্র্যাণ্ডি ডো সল (Rio Grande do Sul) পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০ মাইল ব্যাপিয়া অবিচ্ছিন্ন সূত্রে (কোমল) কয়লা স্তর বিস্তৃত আছে। মিনাস জেরাস (Minas Geras)এর নিকট প্রচুর লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়।

হাঙ্গেরী

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এক সঙ্গে হিসাব করিলে আনুমানিক ভাণ্ডার ৫,৫৫৯ কোটী কয়লা বলিয়া ধরা হয়। হাঙ্গেরী বাকোনী বন অঞ্চল (Bakony Forest Area) হইতে লিগনাইট উৎখাত হয়। হাঙ্গেরীর দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলে পেক্‌স্ খনি (Pecs)তেও প্রচুর বিটুমিনস্ কয়লা অবস্থিত। অষ্ট্রিয়ার আল্‌স্ প্রদেশে এবং ষ্টিরিয়া ও ক্যারিন্থিয়াতে যথাক্রমে নরম কয়লা ও লিগনাইট পাওয়া যায়। তাহা হইলেও সাইলিসিয়ার আষ্ট্রান-কারউইন জেলার খনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

নিউজিল্যাণ্ড

নিউজিল্যাণ্ডের ভাণ্ডার ৩৩৯ কোটী টন। উত্তর দ্বীপের ওয়াক্কা-মুই প্রদেশের মোকান খনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। দক্ষিণ দ্বীপের বুলার-মোকিহিনুই এবং গ্রে মাউথ খনি অধিকাংশ কয়লা সরবরাহ করে।

দক্ষিণ রোডেসিয়ায় অত্যুৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন কয়লা পাওয়া যায়। ইহা বুলাওয়েয়ো (Bulawayo)র উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ওয়াংকি খনির রেঞ্জ (range) বা দীর্ঘাকৃতি স্তরে অবস্থিত। রোডেসিয়ার আনুমানিক ভাণ্ডার ২৭ কোটী টন।

ইহা ছাড়াও নানা দেশে কিছু কিছু কয়লা উৎপাদিত হয়। স্পিট্‌স্‌বার্জেন দ্বীপের প্রায় সকল অঞ্চলের উৎকৃষ্ট কয়লার খনি রহিয়াছে। সুইডেনের স্কানিয়া অঞ্চলে খুব সামান্য কয়লা আছে। রুমানিয়ার পূর্ব্ব বানাট ও ট্রান্‌সিলভানিয়া অঞ্চল হইতে সমস্ত কয়লা উৎখাত হয়। যুগোস্লাভিয়ার জুবল্‌জানা (Ljub'ljana) ও জাগ্রেব, পর্টুগালের মণ্ডেগো উপদ্বীপ ও কইম্‌ব্রার সন্নিকটে, নাইজিরিয়া এনুগু ও উডি খনিতে এবং মালয়ের সেলাঙ্গোর খনি হইতে তত্তৎ দেশের কয়লা সরবরাহ হইয়া থাকে।

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প

শ্রীকমল মৈত্র

"But while striving for my country's freedom, I suggest that if we do not bestir ourselves and lay the economic foundation of freedom, we are qualifying for the charge of having let freedom down"—মিঃ সুন্দরমূর্ত্তি কথাটা বড় সুন্দর বলেছেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থা রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তরায়—এ কথাটা নূতন করে বলবার দরকার হবে না। শিল্প না হলে দেশের আর্থিক সম্পদ আসতে পারে না। সভ্য জগতের মাঝে দাঁড়িয়ে ভারত তার মুষ্টিমেয় কুটীর শিল্প নিয়ে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে দেখলে কেমন করে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য ভারতীয় বাজার দখল করে বসল। কিন্তু "inspite of frantic appeals of industrialist for protection against the ravaging effects of competition of the premier manufacturing countries, forced open door to British manufacturers and capital and Government's economic indifference there has been some development —quite remarkable under the circumstances" এই বাধাগুলি থাকা সত্ত্বেও যে কয়টা শিল্প ভারতে আজ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বস্ত্র-শিল্প প্রথম না হইলেও প্রধান।

ভারতের বস্ত্র শিল্প খুব বেশী দিনের নয়। গত ১৮৬১ সালে আমেরিকার 'সিভিল ওয়ার' থেকে বস্ত্র শিল্পের সূত্রপাত। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও ভারতের লোক প্রধানতঃ তুলা উৎপন্ন করেই ক্ষান্ত হত—অতি অল্প পরিমাণ তুলা দেশীয় শিল্পের জন্য লাগত। কারণ তখনও পর্য্যন্ত তাঁত শিল্পের উপর আমাদের নির্ভর করতে হত। গত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারত তার একতৃতীয়াংশ তুলা দেশের শিল্পের জন্য রেখে সমস্ত তুলাই বিদেশে রপ্তানি করত! এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে পড়ল—"The country which exports raw material, exports soil itself." বাস্তবিক কাঁচা মাল রপ্তানি করা—আর দেশের মাটি বিক্রি করা সমান কথা।

বস্ত্র শিল্পের এত শীঘ্র উন্নতির মূলে গত মহাযুদ্ধ ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বেশ সাহায্য করেছে। কারণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমদানি-রপ্তানির পথ প্রধানতঃ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেশের তুলা ব্যবহারের জন্য আপনা থেকেই শিল্প গড়ে উঠে। আজ দেশের সমস্ত তুলা দেশের শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে—এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নেই তবু বস্ত্র দুর্ম্মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ কোথায়? মিঃ মুরারজি সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখিয়েছেন।

(১) বিদেশী বস্ত্রের ও তুলার আমদানি একেবারে বন্ধ হওয়া।
(২) বিরাট যুদ্ধকালীন চাহিদা।
(৩) কম দামী কাপড়ের অপ্রাচুর্য্য।
(৪) মজুর পাওয়া যায়না। পেলেও বাড়তি ভাতায়।
(৫) তুলার দাম বৃদ্ধি।
(৬) সময় মত price control এর অভাব।
(৭) কাপড় গুদামজাত করা—অতি লাভের আশায়।
(৮) বিদেশে রপ্তানি করা!

উপরের কারণগুলিকে বিশদভাবে বিচার করবার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। বস্ত্র শিল্পের এত শোচনীয় অবস্থা হত না—যদি শুধু জনসাধারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন হত। জনসাধারণ ছাড়া বিরাট যুদ্ধকালীন চাহিদা রয়েছে—যার পরিমাণ সামান্য নহে। উপযুক্ত আমদানি বন্ধ হওয়ায় যুদ্ধকালীন চাহিদা ভারতের শিল্প হতেই মেটাতে হচ্ছে।

আমদানি-রপ্তানি শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পের প্রসারের জন্য আমদানিও যেমন প্রয়োজন রপ্তানিও বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ— "In the enlightened days no country can take as its goal the interior of its own boundaries as its exclusive market." কিন্তু শিল্প প্রসারের দিক থেকে রপ্তানির প্রয়োজন থাকলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে দেশকে বঞ্চিত করে দেশীয় শিল্প বিদেশে রপ্তানি করা দেশের কল্যাণের দিক থেকে হানিকর। অবশ্য সামরিক পরিস্থিতির জন্য আমাদের রপ্তানি করতেই হবে—কর্ত্তব্য হিসাবে। নীচের তালিকা থেকে রপ্তানির একটা হিসাব পাওয়া যাবে।

মোট বস্ত্র প্রস্তুত (লক্ষ)			মোট রপ্তানি (লক্ষ)	
১৯৩৮-৩৯ :	৩৯-৪০ :	৪০-৪১	: ৩৯-৪০	: ৪০-৪১
৪,২৬৯·৩	৪,০১২·৫	৪,৪৯৩·৫	২২১·৪	৩৯০·১

যুদ্ধকালীন মোট রপ্তানির পরিমাণ ১,৯২৫,৪২৯,০৪৬ গজ। উপরের তালিকা থেকে রপ্তানি পরিমাণ কি ভাবে বেশী হচ্ছে বোঝা যায়। সৌভাগ্যের কথা সরকারের নূতন দপ্তর Industries and Civil Supplies বস্ত্রের এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য 'Standard' কাপড়ের scheme করে দেশবাসীকে চিন্তামুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। "Standard cloth" সম্বন্ধে মন্তব্য করবার সময় এখন আসেনি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার schemeটী করেছেন ঠিক ভাবে পরিচালিত হলে দেশবাসী উপকৃত হবে। একথা অস্বীকার করা যায় না—ছ মাস আগে বস্ত্রের সমস্যা যেরূপ প্রকট হয়েছিল আজ সরকারের চেষ্টায় অনেক সহজ হয়েছে।

এইত গেল মোটামুটি বর্ত্তমান বস্ত্র শিল্পের কথা। এখন যুদ্ধোত্তর এই শিল্পটীর কি অবস্থা হবে—সেটা ভাববার সময় এসেছে। "After the war, in order to restore economic activity in a sorely shattered world, special steps will have to be taken regarding several key industries." বস্ত্র শিল্পকে আমরা key industry হিসাবে ধরতে পারি। যে শিল্পটী যুদ্ধের সময় সামরিক উন্নতি করতে পেরেছে—যুদ্ধের পরও যাতে তার অস্তিত্ব অটুট থাকে—তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কথাটা বলা সহজ কিন্তু কাজে করা তত সহজ নয়। কারণ যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক 'trade relation' কিরূপ দাঁড়াবে তাহা এখন থেকে বলা শক্ত। অবশ্য International trade relation এর সহিত আমাদের কোন যোগাযোগ থাকবে কিনা সন্দেহ। তাই অন্য দিক দিয়া দেখতে হবে।

সরকার আজ তার প্রয়োজনের খাতিরে যে শিল্পকে সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্ছেন না—প্রয়োজন শেষ হলে, অর্থাৎ যুদ্ধের পরে আমদানি-রপ্তানির পথ সুগম হলেই, সে সাহায্য আর পাওয়া যাবে কিনা—সেটাই বিবেচ্য। শিল্প প্রসারের জন্য সরকারের দায়িত্ব আছে। যুদ্ধের পর যাতে বস্ত্র শিল্পের ক্রমোন্নতি হয় তার জন্য সরকারের দৃষ্টি এখন থেকেই দিতে হবে। কারণ বস্ত্র শিল্প যেমন ভাবে বেড়ে চলেছে যুদ্ধের পর যদি তার হঠাৎ পতন হয়—তাহলে যে সমস্ত লোক এই

বিশেষ শিল্পের সঙ্গে জড়িত—তারা বেকার হয়ে পড়বে। তাহলেই economic disorder আসবে যেটা কোন সরকারের পক্ষে কাম্য নয়। এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে বাঁচাতে গেলে চাই increased production to find employment for all আবার production বাড়লেই চাই new market through international agreement.

শেষোক্তটার জন্য সরকারের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। Trade Market বিশেষ ভাবে অনুধাবন করবার জন্য United Kingdom Commercial Corporationএর মত কোন Corporation ভারত সরকারেরও গঠন করা দরকার। এই Corporationএর কাজ হবে অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট শিল্পের অবস্থা সঠিক ভাবে জানা এবং যুদ্ধোত্তরকালে সেই সব দেশে কি ভাবে রপ্তানি করা যায় তার বিষয়ে আলোচনা করা। কোথায় কোন জিনিষের অভাব সেটা জানতে পারলে রপ্তানি সুবিধা হয়। সেই বিশেষ দেশগুলির সহিত এখন হইতে যোগাযোগ রাখা একান্ত দরকার।

যুদ্ধের পর সমস্ত দেশই আপ্রাণ চেষ্টা করবে—অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনবার জন্য। Industryর ক্ষেত্রে একটা বিপুল প্রতিযোগিতা হবে। সেই প্রতিযোগিতায় আমাদের পক্ষে দাঁড়ান বেশ কষ্টকর হবে। সমস্ত দেশ তাদের 'increased production' নিয়ে 'World Market'এ ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করবে। সেই World Marketএ ভারতের সভ্যজাত শিল্পটা কতখানি স্থান দখল করবে তা বলা শক্ত। তবে Manchester Guardian কিছু আশার কথা শুনিয়েছেন :

"While India will certainly be a smaller market for British textiles after the war than it was before, it will equally certainly be larger competitor in world trade

ভারত সরকারের সময় মত সাহায্য পেয়ে দেশবাসী যদি আপ্রাণ চেষ্টা করেন—তাহলে Manchester Guardianএর উক্তিকে আমরা বাস্তবে পরিণত করতে পারি।

হিন্দু-উত্তরাধিকার-বিধি

শ্রীনারায়ণ রায় এম্‌-এ, বি-এল্‌

(১)

ব্যবহার শাস্ত্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। অতি প্রাচীন কাল হইতে ত্রিকালজ্ঞ হিন্দু ঋষিগণ শাস্ত্রসম্মত বিধান দিয়া সমাজকে সুপরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন। অনেকে বলেন হিন্দুর বিধি ও বিধান অতীব কঠোর—উহা আদৌ নমনীয় নহে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এইরূপ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন—হিন্দুর বিধান অনমনীয় নহে, ঋষিগণ দেশ কাল পাত্রভেদে ব্যবস্থাদি রচনা করিয়াছেন ; স্বয়ং নারদ বলিয়াছেন

ব্যবহারো হি বলবান
ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে···

অর্থাৎ লোকাচার বা দেশাচার লিখিত শাস্ত্র ব্যবহারও উপরে। আধুনিক যুগে যখন য়ুরোপীয় বিচারক হিন্দুর আইন সম্পর্কে বলেন "Clear proof of usage will outweigh the written text of the law." (১) তিনি কি নূতন কথা কিছু বলেন ?

যুগে যুগে হিন্দুর বিধি ও বিধানের পার্থক্য ঘটিয়াছে। আসলে, প্রাণবান কোন সমাজই চিরকাল একই বিধি ও বিধান আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। যুগে যুগে নূতন নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে উহার ফলে এবং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন শাস্ত্রবিদগণ শাস্ত্রের বিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার ফলে বিভিন্ন বিধানের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুর বিধানের সহিত নারদ,যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতি সকলকেই আমরা মান্য করিয়া আসিতেছি, আবার হিন্দুর বিধানে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগকেও সমান আসন দিয়া আসিতেছি।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার ফলে বিভিন্ন বিধানের উদ্ভব হইয়াছে। উত্তরাধিকার ব্যাপারে বাঙ্গালা দেশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত উহা 'দায়ভাগ' নামে প্রচলিত। বাঙ্গালা ও আসাম ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রধানতঃ "মিতাক্ষরা" অনুসৃত হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলে মিতাক্ষরা অনুসৃত হইলেও আলিয়সান্তন বধুরি ও মরুমক্কত্তয়ম বিধি মিতাক্ষরাকে বহুলাংশে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের দায়ভাগ-এর সৃষ্টিকর্ত্তা জীমূতবাহন। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের যাহা পার্থক্য তাহা শাস্ত্রের বিধানের ব্যাখ্যাকারিগণের মতানৈক্যের ফল মাত্র। বাঙ্গালার হিন্দু-বিধি মিতাক্ষরাকে মান্য করে বটে কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে 'মিতাক্ষরা' ও 'দায়ভাগ'-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব সে সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালার হিন্দু-বিধি,'দায়ভাগ'-এরই অনুসরণকারী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হিন্দুর আইন ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। এই হিন্দু আইনের সম্বন্ধে প্রত্যেক হিন্দুরই সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। হিন্দুর উত্তরাধিকার-বিধি তাহার ধর্ম্ম ব্যাপারের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হিন্দুর উত্তরাধিকার বিধির আলোচনা করা ; কিন্তু উত্তরাধিকার বিধি আলোচনা করিতে যাইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী সুতরাং উত্তরাধিকার-বিধি আলোচনা করিবার প্রাক্কালে, যে সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য সেগুলির অর্থ পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রবন্ধের এই অংশে সেইরূপ কয়েকটী শব্দের অর্থ বা সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) সপিণ্ড—হিন্দু উত্তরাধিকার বিধিতে এই শব্দটির সংজ্ঞার গুরুত্ব অত্যধিক। বস্তুতঃ এই শব্দের অর্থকরণে মতানৈক্যই "দায়ভাগ" ও 'মিতাক্ষরা'র অনৈক্যের প্রধান কারণ।

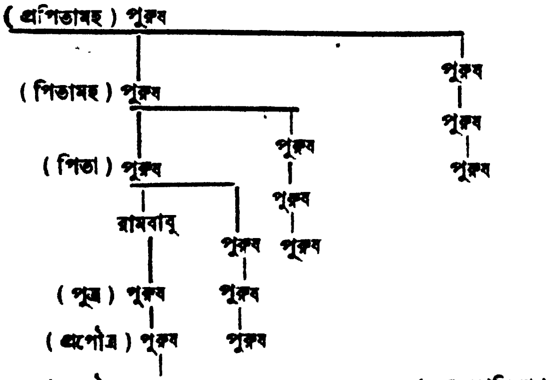
মিতাক্ষরা 'পিণ্ড' শব্দের অর্থ করিয়াছে দেহ ; অর্থাৎ সপিণ্ড শব্দের অর্থ করিয়াছে যাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান ; তবে মিতাক্ষরা এই রক্তের সম্পর্কের একটি সীমারেখাও টানিয়া দিয়াছে। সপিণ্ড হইতে হইলে সাত পুরুষের বেশী ব্যবধান হইলে চলিবে না ও এই সাত পুরুষের মধ্যে সবই যেন পুরুষ সম্পর্কিত হয় (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে agnatic Relationship বলে যেন তাহা হয়) কিন্তু কন্যার পুত্র পুরুষ সম্পর্কিত না হইলেও (কন্যার পুত্র—স্ত্রীলোক সম্পর্কিত। ইংরাজি শব্দ Cognate : ব্যক্তি ও তাহার কন্যার পুত্রের মধ্যে রহিয়াছে কন্যা—স্ত্রীলোক) মিতাক্ষরায় উত্তরাধিকারী অবশ্য মিতাক্ষরায় স্ত্রীলোক সম্পর্কিত ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির উদাহরণ বা পুরুষ সম্পর্কিত নিকটতম

(১) কালেক্টার অফ মাদুরা বনাম মুত্তু রামলিঙ্গ ১২ M. I. A. পৃঃ ৩৯৭

উত্তরাধিকারীই মৃতের সম্পত্তি পাইবে—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ; মাত্র এই স্থলেই হইয়াছে অপর কোথাও হয় নাই।

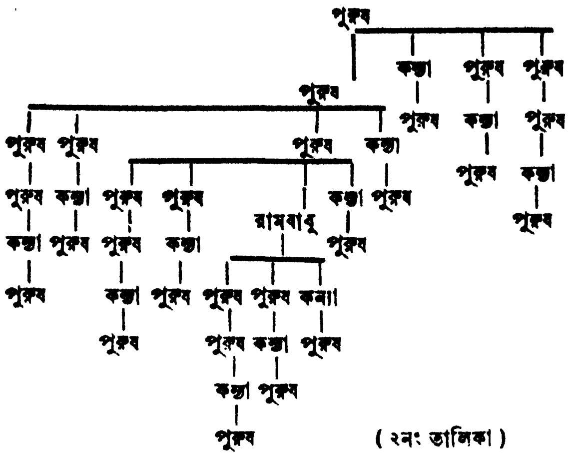
দায়ভাগ বিবাহাদি ব্যাপারে সপিণ্ড শব্দের মিতাক্ষরা অনুসৃত অর্থ গ্রহণ করিলেও উত্তরাধিকার ব্যাপারে ঐ অর্থ গ্রহণ করে নাই। 'দায়ভাগ'-এ পিণ্ড অর্থে শ্রাদ্ধাদির পিণ্ড। দায়ভাগ-এ একে অপরের পিণ্ডাধিকারী হইলে বা উভয়ে একই ব্যক্তিকে পিণ্ড দিবার অধিকারী হইলে তাহাদিগকে সপিণ্ড বলা হয়। প্রত্যেক হিন্দু, পিতার সম্পর্কে উর্দ্ধতন তিন পুরুষ (অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ) ও মাতার সম্পর্কে উর্দ্ধতন তিন পুরুষকে (অর্থাৎ মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধমাতামহ) পিণ্ড দিবার অধিকারী। 'দায়ভাগ' অনুসারে 'সপিণ্ড'কে তিনটী বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা :—

(ক) পুরুষ সম্পর্কিত পুরুষ—এই সম্পর্কের মধ্যে পড়ে পুরুষের সম্পর্কের মধ্য দিয়া—নিম্নতম তিন পুরুষ, উর্দ্ধতন তিন পুরুষ এবং উর্দ্ধতন ঐ তিন পুরুষের প্রত্যেকের নিম্নতন তিন পুরুষ। অর্থাৎ নিম্নের ১নং তালিকার প্রত্যেক পুরুষই রামবাবুর সপিণ্ড।



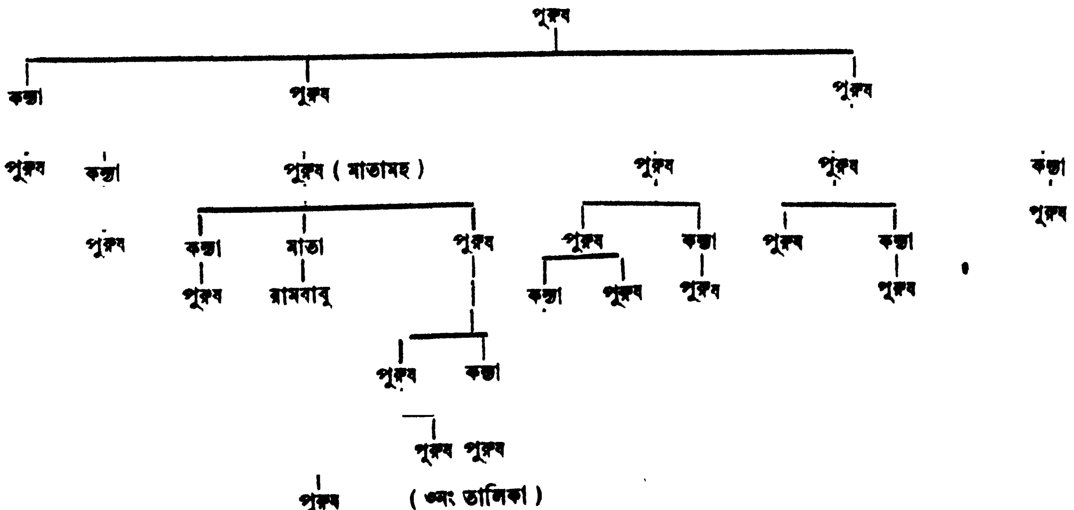
(১নং তালিকা)

(খ) কন্যার সম্পর্কিত পুরুষ অর্থাৎ কন্যার পুত্র—এই শ্রেণীতে থাকিবে নিজ কন্যার পুত্রগণ এবং পিতৃ সম্পর্কে উর্দ্ধতন তিন পুরুষের প্রত্যেকের কন্যার পুত্র ও উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের পুত্রের কন্যার পুত্র ও পৌত্রের কন্যার পুত্র ; নিজ পুত্র ও পৌত্রের কন্যার পুত্র অর্থাৎ নিম্নের ২নং তালিকার প্রত্যেকটী পুরুষ রামবাবুর সপিণ্ড



(২নং তালিকা)

(গ) মাতার সম্পর্কীয়—মাতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া মাতার সম্পর্কে উর্দ্ধতন তিন পুরুষ ও তাহাদের প্রত্যেকের (১) নিম্নতন তিন পুরুষ (২) কন্যার পুত্র ও(৩)নিম্নতন দুই পুরুষের প্রত্যেকের কন্যার পুত্র। এইভাবে নিম্নের ৩নং তালিকার প্রত্যেকটি পুরুষ রামবাবুর সপিণ্ড।—



(৩নং তালিকা)

দায়ভাগের সপিণ্ড তালিকা সকল সময়ে নখাগ্রে রাখা সম্ভবপর নহে ; দায়ভাগে একে অপরের সপিণ্ড কিনা তাহা হিসাব করিবার সোজা উপায় হইতেছে একে অপরকে পিণ্ড দিবার অধিকারী কিনা অথবা উভয়েই একই ব্যক্তিকে পিণ্ড দিবার অধিকারী কিনা দেখা ও সেই সঙ্গে মনে রাখা যে প্রত্যেক হিন্দু, মাতা ও পিতা উভয়ের সম্পর্কে উর্দ্ধতন তিন পুরুষকে পিণ্ড দিবার অধিকারী।

মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ—এতদুভয়ের মধ্যে পিণ্ড শব্দের ব্যাখার অনৈক্যের ফলে উত্তরাধিকারী নির্ণয়েও উভয়ের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়াছে। মিতাক্ষরার মতে যাহারা সপিণ্ড, দায়ভাগের মতে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সপিণ্ড নহে আবার দায়ভাগের মতে যাহারা সপিণ্ড তাহাদের অনেকেই মিতাক্ষরা মতে সপিণ্ড নহে যেমন স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়া যাহারা

সম্পর্কিত তাহারা মিতাক্ষরা মতে সপিণ্ড নহে (কন্যার পুত্রের উত্তরাধিকারী হওয়া সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র), আবার তিন পুরুষের পরবর্ত্তী যাহারা তাহারা মিতাক্ষরা মতে সপিণ্ড হইলেও দায়ভাগ মতে নহে। প্র-প্র-পৌত্র মিতাক্ষরা মতে সপিণ্ড কিন্তু দায়ভাগ মতে প্র-প্র-পৌত্র সপিণ্ড নহে—দায়ভাগের সপিণ্ড সীমা নিম্নতন পুরুষে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত মাত্র।

মনু বলিয়া ছিলেন—"নিকটতম সপিণ্ডই উত্তরাধিকারী (অনন্তরঃ সপিণ্ডাৎ যঃ তস্য তস্য ধনং ভবেৎ) কি সপিণ্ড কে? মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ উভয়েই মনুর বচন শিরোধার্য্য করিয়াছে বটে কিন্তু 'সপিণ্ড'-র 'পিণ্ড' শব্দের অর্থভেদে—উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারী নির্ণয়েও মতানৈক্য ঘটিয়াছে।

আসলে পিণ্ড শব্দের অর্থকরণে মতভেদ থাকিলেও পিণ্ড সিদ্ধান্তের সাহায্যেই হিন্দুর উত্তরাধিকারীত্ব নির্ণীত হয়। পিণ্ড সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিব।

(২) সাকুল্য—নিম্নতন ছয় পুরুষ, উর্দ্ধতন ছয় পুরুষ ও এই উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের প্রত্যেকের নিম্নতন ছয় পুরুষ—ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সপিণ্ড নহে তাহারা প্রত্যেকে। তবে স্ত্রীলোক সম্পর্কিত কেহ সাকুল্য নহে।

(৩) সমানোদক—সাকুল্য যেরূপ সপিণ্ড ব্যতীত উর্দ্ধ ও নিম্নতন ছয় পুরুষ সেইরূপ সমানোদক সপিণ্ড ও সাকুল্য ব্যতীত নিম্ন ও উর্দ্ধতন ত্রয়োদশ পুরুষ ও ঐরূপ উচ্চতন ত্রয়োদশের প্রত্যেকের নিম্নতন ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে।

সমানোদক মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ উভয়ের মধ্যেই আছে কিন্তু সাকুল্য মিতাক্ষরায় নাই কেননা দায়ভাগের প্রত্যেকটী সাকুল্যই মিতাক্ষরায় সপিণ্ড।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন ও ভারতবর্ষ

মহাযুদ্ধের ফলে আমদানী-রপ্তানী ব্যাহত হওয়ায় পৃথিবীর অনেক দেশই পুরাতন শিল্পের প্রসার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। সেই সকল দেশের গভর্ণমেণ্টও জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পপ্রসারে সাধ্যমত সুযোগ-সুবিধা দিতে কার্পণ্য করেন নাই। ভারতবর্ষ শিল্পবিমুখ দেশ, প্রয়োজন ইহার অসামান্য হইলেও পরাধীনতা অগ্রগতির পথে এতবড় বাধার সৃষ্টি করিয়াছে যে, নিজের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার সুযোগ গ্রহণ করিবার অধিকারও তাহার নাই। এইজন্যই নাবালকত্বের গ্লানি বহিয়া এই যুদ্ধের প্রভূত সুবিধা ভারতবর্ষ বৃথা যাইতে দিয়াছে। যে সকল শিল্প এদেশে সামান্যভাবে প্রসারিত হইয়াছে তাহা না হইলে উপায় ছিল না, যে সকল বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে, নানা বাধ্যবাধকতার ফলে তাহার উদ্যোক্তাদের প্রভাব ভারতসরকারের পক্ষে আর অস্বীকার করা সম্ভব নহে। শিল্পপ্রতিষ্ঠা যে আকারেরই হউক, সুবিধা সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইলে ভারতবর্ষ যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কল্যাণে জগতের কাছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়াও মাথা তুলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রিটেনের নিকট ভারতের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওনা হইয়াছে তাহা ফেরৎ পাইলে অথবা সেই অর্থের পরিবর্ত্তে ব্রিটেন হইতে শিল্পপ্রসারের উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব হইলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ছিল। সম্প্রতি আমেরিকায় ব্রিটেনউডস্ সহরের আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতবর্ষ এই প্রাপ্য টাকার উপর অনেক কল্পনা সৌধ গড়িয়াছে। সকলেরই আশা ছিল, দশজন বিদেশী প্রতিনিধির সামনে ভারতের পক্ষ হইতে ন্যায্য পাওনার দাবী উপস্থিত করা হইলে ব্রিটেন কোন অজুহাতেই সে দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। বিগত ১০ই জুলাই ঐ সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রস্তাবটিতে অন্যায় কোন উদ্দেশ্য বা সুবিধাগ্রহণের চেষ্টা না থাকিলেও ফরাসী, ব্রিটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন এবং শক্তিমানের স্বৈরাচারের প্রকোপে দুর্ব্বল ভারতবর্ষকে পাওনাদার হইয়াও অধমর্ণের কৃপার ভিখারী থাকিয়া যাইতে হইয়াছে। ফরাসী প্রতিনিধিরা ভারতের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবার যুক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন যে, ভারত ব্রিটেনের কাছে পাওনা অর্থ আদায় করিতে চাহিলে ফ্রান্সও জার্ম্মানীর কাছে পাওনা আদায় করিতে চাহিবে, কিন্তু এ আদায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ফ্রান্সের প্রতিনিধির এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা মনে মনে হাসিলেও বড়দের দলে ভিড়িয়া নিজের কাজ গুছাইবার লোভ তাঁহারা শেষ অবধি সংবরণ করিতে পারেন নাই। এমনি মিথ্যাচারের ফলে ভারতের দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় মিঃ শ্রফ প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিনিধিরাই শুধু দুঃখিত হন নাই, সমগ্র ভারতে বিপুল ক্ষুব্ধভাব সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই জানেন যে ফ্রান্স ধনী দেশ এবং ১৯৩১ সালে ব্রিটেন যখন স্বর্ণমান ত্যাগ করে তখন ফ্রান্সের তহবিলে যে ২৩০০ মিলিয়ান ডলার মূল্যের স্বর্ণসম্পদ ছিল, সেই পরিমাণ স্বর্ণের মালিক হইবার গৌরব সেদিন একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর কাহারও পক্ষে অনুভব করা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এই হাজার কোটি ষ্টার্লিংয়ের যে মূল্য তাহার পক্ষে পাওয়া সম্ভব, ফ্রান্সের সঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ সম্পদের উদ্বৃত্ত একাংশ বিনিময়ে ফ্রান্স অবশ্যই সে মূল্য আশা করিতে পারে না। তাছাড়া জার্ম্মানীর নিকট ফ্রান্সের যে পাওনার কথা তুলিয়া ফরাসী প্রতিনিধি এখনও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে চান তাহার অধিকাংশই গতযুদ্ধে পরাজিত জার্ম্মানীর নিঃস্বতার সুবিধা গ্রহণে জমিয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র ভারতবর্ষ তাহার পাওনা হাজার কোটি ষ্টার্লিংয়ের সহিত নিজের ভবিষ্যত সম্ভাবনাটুকু বিশ্বাস করিয়া ব্রিটেনের হাতে তুলিয়া দিয়াছে এবং ব্রিটেনের আজিকার বিজয় যাত্রার পথে ভারতের দান অবশ্যই উপেক্ষার বস্তু নয়। ভারতের বিশ্বাসের এভাবে অমর্য্যাদা করার চেষ্টা ব্রিটেন বা তাহার প্রতি

সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে সত্যই অত্যন্ত অসমীচীন হইয়াছে। আমেরিকা ব্রিটেনকে বাঁচাইয়া নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের আশায় ঋণ ও ইজারা নীতি গ্রহণ করিয়াছে, ইংরাজের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্ম আমেরিকার স্বার্থত্যাগে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তবে এই স্বার্থত্যাগ আমেরিকা যে নিছক পরার্থপরতার জন্মই দেখাইয়াছে, একথা বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতার গতি সমর্থন করে না। যুদ্ধের পরে দানের প্রতিদান হিসাবে আমেরিকা অবশ্যই কিছু সুবিধা আশা করে এবং সেই সুবিধার স্বরূপ যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে প্রকাশ পাইবার দিনও আসিয়াছে। বাজারে জোর গুজব যে, যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যক্ষেত্র লইয়া ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে ইতিমধ্যেই একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে চীনের বাজারে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বাজারে ইংরাজ অবাধ বাণিজ্য চালাইবে এবং পরস্পর পরস্পরের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিবে না। কথাটা আপাততঃ নিতান্ত গুজব মনে হইলেও ব্রেটনউড্‌স্ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের দাবী আমেরিকা সমর্থন না করায় এদেশের জন-সাধারণের মনে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সাম্য, স্তায় ও নীতির অসংখ্য বাগাড়ম্বরের পসরা লইয়া আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়াছিল, সততার প্রথম পরীক্ষাক্ষেত্রে আমেরিকার সেই বহুপ্রচারিত ঔদার্য্য এভাবে উপিয়া যাইবে, ইহা সত্যই কেহ আশা করে নাই। ব্রিটেনের প্রতি স্বার্থগত বন্ধুত্বের অজুহাতেই আমেরিকা এতশীঘ্র তাহার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

৮৮০ কোটি ডলার লইয়া আন্তর্জাতিক অর্থসম্মেলনের যে তহবিল গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে, ভারতবর্ষের জন্ম নির্দ্ধারিত চাঁদার পরিমাণ তাহার শতকরা ৪.৫ ভাগ মাত্র। ৪০ কোটি নরনারী যে দেশে বাস করে এবং আয়তনে যাহা রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউ-রোপের সমান, তাহাদের চাঁদার পরিমাণ যে কেন এত কম হইল তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। এই অর্থভাণ্ডারে আমেরিকা ২৭৫ কোটি ডলার, ব্রিটেন ১৩০ কোটি ডলার, রাশিয়া ১২০ কোটি ডলার, চীন ৫৫ কোটি ডলার, ফ্রান্স ৪৫ কোটি ডলার ও ভারতবর্ষ ৪০ কোটি ডলার চাঁদা দিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের এবং দুঃখের কথা এই যে, তহবিল পরি-চালনার জন্ম যে পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইবে তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত উপরোক্ত পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের স্থায়ী আসন থাকিবে—অথচ ফ্রান্সের চেয়ে মাত্র ৫ কোটি ডলার কম চাঁদা দিতে বাধ্য করিয়া ভারতের প্রতিনিধিকে স্থায়ী সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত করা হইল। মাত্র ৪০ কোটি ডলার কেন, প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে আরও অনেক বেশী টাকা চাঁদা দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু ভারতের চাঁদার পরিমাণ যাঁহারা স্থির করিয়াছেন, ভারতের মর্য্যাদাবৃদ্ধি তাঁহারা সুনজরে দেখেন না বলিয়াই এই বৈষম্য ঘটিতে পারিয়াছে। চীনের অর্থস্বাচ্ছল্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, শুধু তাহাকে জোর করিয়া ১৫ কোটি ডলার বেশী চাঁদা দিবার সুবিধা দিয়া ভারতের অপেক্ষা উচ্চতর আসন দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা ভারতের বর্দ্ধিষ্ণু চেতনাবোধ ব্রিটেন ও তাহার বন্ধুবর্গের নিকট প্রীতিকর হইতেছে না এবং পারতপক্ষে ভারতকে মাথা তুলিতে না দিয়া এখানকার বিরাট বাজারে তাহারা অপ্রতিহত শোষণবৃত্তি চালাইয়া যাইতে চায়। চীন ও ফ্রান্স এখন অসহায়ভাবে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী, তাহাদের দলভুক্ত করা তাই ব্রেটনউড্‌স্ সম্মেলনে ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ এখন একবার ভবিষ্যতের নামে পিছাইয়া দিতে পারিলে যুদ্ধের পরে অনিশ্চিত অবস্থারও যেমন সুযোগ পাওয়া যাইবে, তেমনি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় উভয়বিধ জিনিষ দিয়া সেদিন মোটের উপর ভারতের দেনা শোধ করিলে ভারতবর্ষ কথা কহিতে পারিবে না। এখন ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতি আনিয়া ভারতের শিল্পপ্রসার হইতে দিলে, ব্রিটেন জানে, ভারতের বাণিজ্য বাজারে চড়াদরে পণ্য বিক্রয়ের আশা তাহাকে অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় নূতন ভারতীয় শিল্প (শিল্প যদি তখন প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব হয়) কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না, এমনি একটা বিশ্বাস আছে বলিয়াই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম ভারতের পাওনা শোধ দেওয়া পিছাইতে দিতে ব্রিটেনকে বিচিত্র ছলনা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

মোটের উপর ব্রিটেনউড্‌স্ আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলন ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে বলা চলে। ভারত এই সম্মেলনে ন্যায্য পাওনা ফেরৎ চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক তহবিলে কম চাঁদা দিবার অধিকারী হওয়ায় তাহার ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং মাত্র ৫ কোটি টাকা বেশী চাঁদার দাবীতে ফ্রান্স পরিচালকমণ্ডলীতে স্থায়ী আসন পাইলেও পরিচালনার ভার তাহার হাতে ছাড়িতে পরোক্ষ আপত্তি জানাইয়া ভারতবর্ষকে তাহার অধিকার হইতে ষড়যন্ত্র করিয়া বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এদেশের একটি প্রথম শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক পত্রিকা যথার্থই বলিয়াছেন:—From the view point of India the monetary conference is a dismal failure if not a costly farce.

বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয়করণ

বর্তমান মহাযুদ্ধের সময় অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের প্রভূত অসুবিধা ঘটিলেও বিলাতী দেনার হাত হইতে আমরা যে নিষ্কৃতি পাইয়াছি ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বিলাতী ঋণের পরিবর্ত্তে শতকরা ৫ টাকা হারে আমাদের সুদ দিতে হইত। একদিন এদেশে রেলওয়ে প্রভৃতি স্থাপনের জন্ম ভারত সরকার জামিন দাঁড়াইয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ধার দিয়াছিলেন তাঁহারা সুদের উচ্চহার এবং টাকার নির্বিঘ্নতা লক্ষ্য করিয়া আনন্দের সহিত ঋণপত্র ক্রয় করেন। বর্তমান যুদ্ধের আমলে বাণিজ্যিক গতি আমাদের বিশেষ অনুকূল হওয়ায় বিলাতী দেনা শোধের জন্ম দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং এই আন্দোলন উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ভারত সরকার ভারতে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় ব্রিটেনের দেনা শোধ করিয়া দেন। এইভাবে বিক্রীত ঋণপত্রগুলি পুনরায় কিনিয়া লইতে ভারত সরকারকে বাজার দাম অনুসারে কিছু বেশী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে সুদের হার কম হওয়ায় সেদিক হইতে তাঁহারা প্রচুর লাভবান হইয়াছেন। আগেকার বারশো কোটি টাকা ঋণ এই উপলক্ষে চৌদ্দশত

কোটি টাকায় পৌঁছাইলেও সুদের বেলা ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর আট কোটি টাকা কম দিতে হইবে। অতীতকালে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যে দায়িত্ব তাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে লইয়াছিলেন, আজ ভারত সরকার তাহা হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়া উপস্থিত যেটুকু অসুবিধা ভোগ করিতে চলিয়াছেন, তাহা সত্যই মারাত্মক ব্যাপার নয়। সুদের দরুণ যে টাকাটা বাঁচিয়া গেল সেই টাকায় তাঁহারা এদেশের বহু কল্যাণকর কাজের পরিকল্পনা করিতে পারিবেন। এইভাবে এদেশের টাকা সরকারী সম্পত্তিতে লগ্নী করিবার সুফল এই যে, সামান্য পরিমাণ সুদের টাকা বাদ দিয়া লাভের বাকী অংশ এদেশেই নানাভাবে ব্যয়িত হইতে পারে এবং টাকার অভাবে যে সকল প্রয়োজনীয় কাজে গভর্ণমেণ্ট হাত দিতে ভরসা পান না সেই সকল কাজ সম্পন্ন হইবার সুবিধা ঘটিয়া থাকে। ভারত সরকারের রেল বিভাগের আয় প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে, এই আয় বাজেটের অন্যান্য খরচ মিটাইবার জন্য ব্যবহার হইতে থাকায় সেই সকল খরচ বন্ধ করিবার অথবা তাহাদের জন্য নূতন কর বসাইবার প্রয়োজন ভারত সরকারের হইতেছে না। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ভারত সরকারের রেল বিভাগের হাতে বি এন রেলওয়ে পরিচালনার ভার আসিবে। বি এন রেলওয়ে এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেলপথ, বিলাতে ইহা সম্বদ্ধ এবং ইহার আয়ও যথেষ্ট। পরিচালনার ব্যয়টুকু বাদ দিলে এই রেলওয়ে হইতে যে বিরাট পরিমাণ লাভ হইত, এতকাল কোম্পানীর অংশীদারগণ তাহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন। এইভাবে প্রতি বৎসর বহু টাকা ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যাইত। ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইলে অতঃপর লাভের টাকা এদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার বা জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করা হইবে। এইরূপ বড় বড় আয়ের পথ যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্য গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর প্রতি বৎসরই যে নূতন নূতন করভার চাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা হইতে দরিদ্র ভারতবাসী রেহাই পাইতে পারে। বাস্তবিক ঋণ করিয়া ও নূতন কর বসাইয়া কাজ চালাইবার যে নীতি বর্ত্তমানে ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে একদিন শাসনযন্ত্রের বিকলতা সৃষ্টি হইবেই, কিন্তু ভারত সরকার যদি বি এন রেলপথের মত আয়সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কিনিয়া লন ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলে বাজেটে সমতা রক্ষা করিয়াও তাঁহাদের পক্ষে নূতন পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়। কল্যাণের সহস্র সম্ভাবনা থাকিলেও আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া নূতন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমীচীন নহে। ভারত সরকার বি এন রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবেন স্থির হইয়াছে, এই টাকা হইতে অংশীদারগণ প্রতি ১০০ পাউণ্ডের জন্য ১২০ পাউণ্ড হিসাবে ফিরিয়া পাইবেন। বি এন রেলপথের যে সমৃদ্ধি আজ সম্ভব হইয়াছে, তাহা অংশীদারগণ যে দিন টাকা লগ্নী করিয়াছিলেন তখনু অবশ্যই স্থির ছিল না এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা না জানিয়াও সেদিন তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠান আজ বড় হইতে পারিয়াছে। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে অংশীদারগণকে শতকরা ২০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার জন্য অবশ্যই কাহারও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। চালু কারবার হাতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে লাভের কড়ি ঘরে আসিবার সম্ভাবনা, সুতরাং রেলপথ ক্রয় করিতে কিছু বেশী টাকা ব্যয় হইলেও ভারত সরকারের পক্ষে কুণ্ঠা বোধ না করাই স্বাভাবিক। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশন কিনিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে সম্ভবতঃ কর্পোরেশনের হাতে ট্রামওয়ে পরিচালনার ভার আসিবে। ট্রাম কোম্পানীর লাভের পরিমাণ বিরাট এবং সুদের টাকা দিয়াও এই পরিচালনা বাবদ যে অর্থ-সম্ভার কর্পোরেশন লাভ হিসাবে পাইবেন তাহা দ্বারা ব্যয় সাপেক্ষ বহু পরিকল্পনায় তাহারা হাত দিতে পারিবেন এবং সহরের উন্নতি-মূলক যে কোন কাজ করিতে গেলে গভর্ণমেণ্টের নিকট এখন যেমন তাহাকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইতে হয়, সেই উঞ্ছবৃত্তি হইতে অতঃপর কর্পোরেশন অবশ্যই কিছুটা রেহাই পাইবে।

ব্রিটেন ও ভারতে অর্থের ব্যবহারিক মূল্য

মহাযুদ্ধের আমলে যুদ্ধের নেশা যাহাদের পাইয়া বসে, ব্যক্তি-গত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ কোন মোহ তাহাদের নিকট দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অসামরিক দেশবাসীর কাছে ব্যবহারিক জীবনের অভাব অনটনের নিজস্ব একটা মূল্য আছে এবং সেই জন্যই যুদ্ধবিরতি তাহারা সাগ্রহে কামনা করিয়া থাকে। অদৃষ্টের দোষে ও মানুষের অকর্ম্মণ্যতায় এবারের যুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষকে যে দুর্বিপাকের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে তাহার গ্লানি শেষ হইতে অবশ্যই বহুদিন লাগিবে। যুদ্ধের সহিত আমাদের যত নিকট সম্বন্ধই থাকুক, ব্রিটেন যে এই যুদ্ধে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জড়াইয়া পড়িয়াছে ইহা প্রশ্নাতীত সত্য। ব্রিটেন আজ সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহার বৈদেশিক সম্পত্তির অর্দ্ধেক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, আমেরিকা, ভারত, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের কাছে জমিয়া উঠিয়াছে ঋণের পর্ব্বত, তবু অসামরিক দেশবাসীর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় ইংলণ্ডের ব্যবহারিক জীবন ভারতের মত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি হাউস অফ কমন্সে চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকর স্যার জন এণ্ডারসন বলিয়াছেন যে, ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের সাধারণ বাজারে পণ্যাদি কিনিতে পাউণ্ডের যে বিনিময় মূল্য ছিল তাহা ১০০ ধরা হইলে ১৯৪৩ সালে এক পাউণ্ডের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৭১, অর্থাৎ চার বৎসর সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ চলিবার পরও ব্রিটেনে জীবনযাপনের ব্যয় শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডে এই সূচক সংখ্যা ১১৮ হয়, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩ সালে এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩১, ১৩৮ ও ১৪১ হইয়াছে। ভারতের পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সহিত উপরোক্ত মূল্য বৃদ্ধির তুলনা করিলে সত্যই আমাদের হতাশ হইতে হয়। এখানে মানুষের জীবনযাত্রার মান আগেই লজ্জাজনক ভাবে হীন ছিল, দরিদ্র এই দেশে দিনের পর দিন মূল্যরেখা যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে অধিকাংশ লোকের পক্ষে সাধারণ ভাবে বাঁচিয়া থাকাও বর্ত্তমানে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই অপনীতির মাশুল দিতে ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিরুপায়ভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুদ্ধারম্ভের ঠিক আগেকার মাসের পণ্য মূল্য ১০০ ধরিলে এদেশে মূল্যরেখা সরকারী হিসাবেই নিম্নভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ১১৫, ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ১৫১, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ১৮২, ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে ২৪৪·৮। ১৯৪৪ সালে নানারূপ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা সম্পাদনের ফলে এই সূচক সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা সামান্য হ্রাস পাইয়া মে মাসে ২৩১·৪-এ নামিয়াছে। যুদ্ধের উপলক্ষে দেশে যে টাকা বাড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পকেটে যাইতেছে, যুদ্ধভাতা প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা এমন অকিঞ্চিৎকর যে, সেই বর্দ্ধিত আয়ও ভারতবাসীকে বাঁচিবার সুযোগ দিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে পরের দোষে দুঃখ ভোগ করিতে অভ্যস্ত, এই যুদ্ধের আমলের অসুবিধা দুঃসহ হইলেও ভারতবর্ষ শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যাইবে। এ দেশবাসীর জীবনের মূল্যই যখন কাহারও নিকট নাই, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর গ্রাসে ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়া আমাদের তখন স্থায়ী লাভ হইতে পারে না।

বাহির-বিশ্ব

অতুল দত্ত

গত এক মাসে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা মিত্রপক্ষের অনুকূল। নাৎসী জার্ম্মানীর চরম পরাজয় যে অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখন নানা দিক হইতে তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট। প্রাচ্য অঞ্চলেও ঘটনাস্রোত জাপানের প্রতিকূলে বহিতেছে। সত্বর এই স্রোতের গতি অত্যন্ত প্রবল হইবার সম্ভাবনা।

ফরাসী রণাঙ্গন

গত জুন মাসের প্রথমে মিত্রপক্ষের সেনা নরম্যাণ্ডীর উপকূলে অবতরণ করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে সেরবুর্গ উপদ্বীপ বিচ্ছিন্ন করে। জুন মাসের শেষভাগে সেরবুর্গ নগর ও পোতাশ্রয় তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর প্রায় এক মাস ফ্রান্সের যুদ্ধ বৈচিত্র্যহীন ছিল। মিত্রপক্ষ এই সময়ে কোন দিকেই আক্রমণের বেগ বাড়াইতে পারেন নাই। জার্ম্মানীর প্রতিরোধ যে খুব প্রবল, সেই কথাই পুনঃ পুনঃ শোনা গিয়াছে। আগষ্ট মাসের প্রথমে আমেরিকান্ সৈন্য নরম্যাণ্ডী প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে; ইতিমধ্যে তাহারা ব্রিটেনীর প্রধান নগর রেনীজ অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ব্রিটেনী উপদ্বীপ বিচ্ছিন্ন করাই আমেরিকান্ সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য। ব্রিটেনী উপদ্বীপে ব্রেস্ত ও লোরিয়েঁ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি। নরম্যাণ্ডীর পর সমগ্র ব্রিটেনী শত্রুর কবলমুক্ত হইলে ফ্রান্সে যুদ্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিবে। ব্রেস্ত, লোরিয়েঁ ও সেণ্ট নাজের বন্দর দিয়া মিত্রপক্ষের প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই সময় পশ্চিম দিকে মণ্টগোমারীর সেনাবাহিনীও তৎপর হইয়াছে। তাহারা সেইন্ ও লোয়ার নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রোমেলের সেনাবাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য, এই চেষ্টার আনুষঙ্গিক দিকগুলি এখনও খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

গত শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' ফ্রান্সের রাজনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্ট আলজিয়ার্সের ফরাসী মুক্তি সমিতিকে মানিয়া লইয়াছেন; এই সমিতি এখন প্রায় ফ্রান্সের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরই যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। ফ্রান্সের রাজনৈতিক জটিলতার মীমাংসা হইবার পর ফ্রান্সের গুপ্ত সমিতিকে প্রচুর সাহায্য করিয়া সেখানে গণ-অভ্যুত্থানে উৎসাহ দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছিল। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। গুপ্ত ফরাসী প্রতিরোধ-বাহিনীকে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে লালফৌজের বিস্ময়কর সাফল্যের তুলনায় ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন সেনার তৎপরতা যে নিতান্তই তুচ্ছ, ইহার অন্যতম কারণ ফরাসী গুপ্ত সমিতির পরিপূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণে এই অনিচ্ছা। রুশিয়ার শত্রুর প্রতিরোধ-ব্যূহের পশ্চাতে গেরিলা বাহিনী লালফৌজের



জিব্রাল্টারের নূতন গভর্ণর লেঃ জেঃ স্যার টমাস্ রালফ্ ইষ্ট উড্

অভিযানের সহিত সমন্বয় রাখিয়া আক্রমণ চালাইতেছে। উভয় দিকের এই আক্রমণে শত্রু সৈন্যের নৈতিক মেরুদণ্ড সহজেই

ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে বাধ্য হইতেছে। ফ্রান্সেও এই রণ-কৌশল পরিপূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। পারিতেছে না কেবল ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকদের দ্বিধা ও সংশয়ে, গণ-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তাহাদের প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায়। আজ যদি নাৎসী প্রভুত্ব উচ্ছেদের জন্য ফ্রান্সে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সেই গণ-শক্তির রাস সে আর টানিয়া রাখা যাইবে না, এই কথা ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকরা জানেন। এই জানাই তাহাদের দ্বিধা ও সংশয়ের কারণ। আজ নাৎসী জার্ম্মানীর চরম পরাজয় যখন নিকটবর্ত্তী, তখনও ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীকে প্রতীক্ষা করিতে বলায় নাৎসীদের চরম অত্যাচারে তাহাদিগকে শক্তিহীন করিবার দুরভিসন্ধি প্রকাশ পাইতেছে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

উড়ন্ত বোমা

মিত্রপক্ষ ইউরোপে অভিযান আরম্ভ করিলে জার্ম্মানী বৃটেনে যথেচ্ছ বিমান-আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বৃটেনে আরম্ভ হইয়াছে উড়ন্ত বোমার উৎপাত। আমাদের দেশের নাৎসী জার্ম্মানীর ভক্ত জীবগুলি চতুর্দ্দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে এই উড়ন্ত বোমার আশার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইতেছেন। আর গোয়েবল্‌সও তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝাইবার সুযোগ পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের এই গুপ্ত অস্ত্র ব্যক্ত হওয়ায় সারা বৃটেন চুরমার হইয়া যাইতেছে; সুতরাং রণক্ষেত্রে পরাজয় দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই—চার্চ্চিল নতজানু হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন বলিয়া!

গোয়েবল্‌স্ তাঁহার ঢাক বাজাইবার সময় জানিয়া শুনিয়াই সত্যের সহিত যোগ রাখেন না। কাজেই, তাঁহার ঢাকের বাজনা সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে, আমাদের দেশের যে হিট্‌লার-ভক্তরা আশার আলোক মনে করিয়া আলেয়া দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে যে, উড়ন্ত বোমা বস্তুটির কোন সামরিক গুরুত্ব নাই। উহা শত্রুদেশে লক্ষ্যহীনভাবে ছোড়া হয় এবং ক্ষতি করে নির্ব্বিচারে। সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানে উহা পড়িতে পারে, না-ও পড়িতে পারে। বস্তুতঃ জার্ম্মানী সামরিক দিক হইতে বড় লাভের আশায় এই অদ্ভুত অস্ত্র ব্যবহার করিতেছে না। বৃটিশ জনসাধারণকে সন্ধির জন্য আগ্রহী করিবার উদ্দেশ্যে হিট্‌লার এণ্ড কোম্পানী বহু দিক হইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন; উড়ন্ত বোমা ব্যবহার সেই চেষ্টারই অঙ্গ। কেবল বলশেভিক আতঙ্ক প্রচারে কাজ হাসিল হইবার সম্ভাবনা তাঁহারা আর দেখিতেছেন না। কাজেই, ইংলণ্ডের অধিবাসীর উদ্দেশ্যে লক্ষ্যহীনভাবে আগুন ছড়াইয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল ও অসহনীয় করিবার এই চেষ্টা সুরু হইয়াছে। নাৎসী ধুরন্ধরদের আশা—ইহাতে জীবন অতিষ্ঠ হওয়ায় সত্বর সন্ধি করিবার জন্য বৃটিশ জনসাধারণ চার্চ্চিল গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিতে পারে। কেবল বোমা ফেলিয়া যুদ্ধে জয় হয় না; তা সে বোমা ডানাওয়ালাই হউক, আর ডানাকাটাই হউক। নাৎসী মোড়লের দল এই কথা ভাল করিয়াই জানে। ১৯৪০ সালে ডানাকাটা বোমায় যাহা করিতে পারে নাই, ১৯৪৪ সালে ডানাওয়ালা বোমাও যে তাহা করিতে পারিবে না, ইহা তাহারা বোঝে।

উড়ন্ত বোমার উৎপাতে বৃটিশ জনসাধারণ জার্ম্মানীর সহিত সন্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে নাই। এই উৎপাত আরও বাড়িলে তাহারা ব্যস্ত হইবে বলিয়াও মনে করিবার কারণ ঘটে নাই।



ব্রিটেনের কতকগুলি ফাইটার প্লেন

তবে ইহাতে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য তাহারা অধীর হইয়া উঠিতে পারে। ফ্রান্সের সম্পর্কে যে রাজনৈতিক দ্বিধা যুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ত্যাগ করিবার জন্য এখন বৃটিশ রাজনীতিকদের প্রতি জনসাধারণের চাপ বাড়িয়া ওঠা সম্ভব। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে হিটলার বিমান আক্রমণ চালাইয়া যেমন চালে ভুল করিয়াছিলেন, এই বারও তেমনি তাঁহার চালে ভুল প্রতিপন্ন হইতে পারে। ১৯৪০ সালের বিমান আক্রমণ বৃটিশ জনসাধারণের মনে যে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হেস্ মিশন ব্যর্থ হইবার অন্যতম কারণ। ১৯৪৪ সালে এই নির্ব্বিচারে বোমা নিক্ষেপে হয়ত নাৎসীদের অনুকূল সাম্রাজ্যবাদী দ্বিধা ও সঙ্কোচ দূর হইবে এবং নাৎসীদের চরম পরিচয় আরও নিকটবর্ত্তী হইবে।

হিট্‌লার-বিরোধী ষড়যন্ত্র

গত ২১শে জুলাই এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, পূর্ব্ব দিন হিটলারকে বোমার আঘাতে হত্যার চেষ্টা হইয়াছিল; তিনি অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ অনেকে বিশ্বাস

করেন নাই। তাঁহারা বলেন—হিটলারের বিরাগভাজন ব্যক্তিদের প্রাণ লইবার জন্য এই অলীক কাহিনী রচনা করা হইয়াছে, অথবা বোমা নিক্ষেপ সংক্রান্ত ব্যাপারটি সাজানো হইয়াছে। যাহা হউক, এই হিটলার-হত্যার চেষ্টা সম্পর্কিত কাহিনী প্রচারিত হইবার পর হইতে নাৎসী ধুরন্ধররা যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন এবং জার্মান সরকারের যে সব ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নাৎসী জার্মানীর এই চরম দুর্দিনে সেখানে গৃহ-বিবাদ সত্যই দেখা দিয়াছে, হিটলারের প্রতি জার্মান সেনা-বিভাগের আনুগত্য আর অখণ্ড নয়; হিটলারকে হত্যার চেষ্টা হউক, আর না-ই হউক, জার্মান সেনাপতিমহলে হিটলারের মৃত্যুকামী লোকের এখন আর অভাব নাই। আজ গৃহের বাহিরে সামরিক অবস্থা যখন জার্মানীর পক্ষে চরম নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার গৃহে এই বিরোধ নিশ্চয়ই মিত্রপক্ষের আনন্দের কথা।

তবে, এই শুভ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে অশুভ ঘটনার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়াছিল। মিত্রপক্ষের শিবিরে যে সব প্রতিক্রিয়াপন্থী এখন লালফৌজের ক্রমবর্দ্ধমান বিজয়ে শঙ্কিত হইতেছে এবং নাৎসী জার্মানীর সহিত আপোষ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা জার্মানীর গৃহ-বিবাদে তৎপর হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। হিটলার-বিরোধী এই আন্দোলন জার্মান জন-সাধারণের আন্দোলন নয়। জার্মানীর যে সামরিক অভিজাত সম্প্রদায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ, নাৎসীবাদকেও যাহারা লালন ও পুষ্ট করিয়াছে, তাহাদের সহিত নাৎসী নেতাদের মনোমালিন্যই এই গৃহ-দ্বন্দ্বে প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণ-প্রভুত্বকামীদের দৃষ্টিতে নাৎসী দলে এবং এই সামরিক অভিজাত শ্রেণীতে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু যাহারা জার্মানীতে হিটলারের দলকে গদিচ্যুত করিয়া সেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বসাইতে চায়, তাহারা জার্মানীর গৃহ-বিবাদে অভিজাত শ্রেণীর সেনাপতিদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার সুযোগ পাইয়াছিল। এই সুযোগ যাহাতে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য নাৎসী জার্মানীর পক্ষ হইতে কেহ কেহ পোপের নিকট হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন; গণতান্ত্রিক স্পেনের হত্যাকারী ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো এই সময় শান্তির বুলি আওড়াইয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক বিষয়ের লেখক জাস্লাভস্কির একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের বক্তব্য শেষ করিব। ১৯৪৩সালে তিনি জার্মান জেনারল ষ্টাফ্ সম্পর্কে লেখেন—For a century this staff was the holy of holies, the citadel of the Germau titled aristocracy, the main prop of reaction....It became the spearhead of German Imperialism...a repository of political and cultural reaction.

লালফৌজের বিজয় অভিযান

লালফৌজের বিজয় অভিযান সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছে; মার্শাল ষ্ট্যালিন যে কত বড় সমর-নীতিজ্ঞ, তাহা প্রতিদিন পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে নূতনভাবে প্রকট হইতেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার ইউরোপ অভিযান আরম্ভ হইবার পর মার্শাল ষ্টালিন প্রথমে আঘাত করেন ফিনিস্ রণাঙ্গনে। সেখানে তিনটি প্রতিরোধ-প্রাচীর ভেদ করিয়া লালফৌজ ভীপুরী অধিকার করে। তাহার পরেই অক্রিমণের মোড় ঘুরাইয়া মার্শাল্ ষ্টালিন মনোযোগ দেন হোয়াইট রুশিয়ায়। হোয়াইট রুশিয়া হইতে অগ্রগামী একদল লালফৌজ রিগার পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঐ সহরের পশ্চিমে সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়াছে, একটি দল পূর্ব্ব রুশিয়ার সীমান্ত ভেদ করিয়াছে, আর একটি ওয়ার্স'য় পৌঁছিয়াছে। মাসাধিক কালের মধ্যে এই অগ্রগতি বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে বিরল। ষ্ট্যালিনের সামরিক প্রতিভার] পরিচয় কেবল ইহাতেই নয়। সামরিক প্রবাদ আছে—the capture of territory is a result but not the aim



লেঃ জেঃ স্যার আলান, জি, ক্যানিংহাম

of a battle. এই প্রবাদবাক্য স্মরণ রাখিয়া ষ্ট্যালিন তাঁহার সমর-পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন এবং সাফল্যের সহিত সে পরিকল্পনা অনুসৃত হইতেছে। রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যালিন শত্রুর সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার জন্যও মনোযোগী হইয়াছেন। হোয়াইট রুশিয়ার রাজধানী মিন্‌স্কে এমন কৌশলে আক্রমণ চলিয়াছিল যে, সেখানকার তিন চার ডিভিসন শত্রু সৈন্য পলাইতে পারে নাই। ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে হঠাৎ হোয়াইট রুশিয়ায় মনোযোগ দিবারও বিশেষ কারণ ছিল। হোয়াইট্ রুশিয়া হইতে যে লাল-ফৌজ রিগার পশ্চিমে সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়াছে, তাহারা ফিন্‌ল্যাণ্ডে অবস্থিত ১০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে; এই কৌশলে বাল্টেক রাষ্ট্রগুলিতে ২০ হইতে ৩০ ডিভিসন সৈন্য আটক

পড়িয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের জার্ম্মান বাহিনী সম্প্রতি দক্ষিণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে সরিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আত্মসমর্পণ অথবা আত্মহত্যা ছাড়া ইহাদের আর তৃতীয় পন্থা নাই। বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহে আটক জার্ম্মান সেনাবাহিনীকে অপসরণের জন্ম জার্ম্মানী তখন তাহার সমস্ত নৌবহর বাল্টিক সাগরে সমাবেশ করিয়াছে। কিন্তু এখানে আকাশে রুশ বিমানবাহিনীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। কাজেই, এই অঞ্চল হইতে জার্ম্মানীর খুব কম সৈন্যই স্থানান্তরিত হইতে পারিবে।

তারপর, পূর্ব্বপ্রুসিয়া অর্থাৎ খাস জার্ম্মান ভূমিতে লালফৌজের প্রবেশের নৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। ওয়ার্সর পতনও জার্ম্মানদের মধ্যে দারুণ নৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে।

সম্প্রতি লালফৌজ দক্ষিণ অঞ্চলেও তৎপর হইয়াছে; ৪ই আগষ্ট তাহারা কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতমালার নিকটে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেসন ষ্ট্রজ অধিকার করিয়াছে। মার্শাল ষ্ট্যালিনের সমর-পরিকল্পনা ইহার পরে কি ভাবে প্রকাশ পাইবে, তাহা এখন বলা দুষ্কর।

পোলিস্ মুক্তি সমিতি

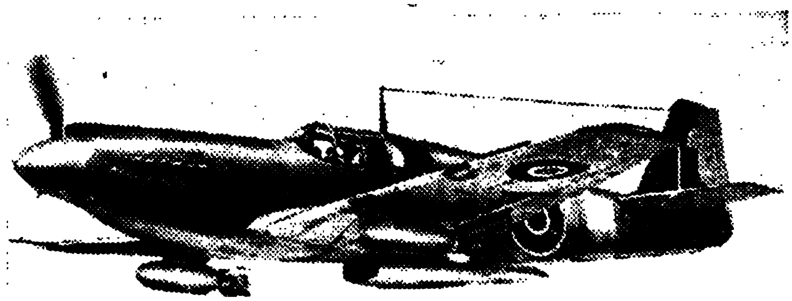
লণ্ডনের পিঞ্জরাপোলের পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট অন্যায় জিদ ত্যাগ না করায় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহাদের মনোমালিন্য দূর হয় নাই। ইহাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হইয়াছে "সাপে ছুঁচো গেলার" অবস্থা। পোলিস্ গভর্ণমেণ্টকে তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন ও আশ্রয় দিয়াছেন। ওদিকে রুশিয়াকেও তাঁহারা চটাইতে পারেননা। আর রুশিয়ার প্রস্তাবও গণতন্ত্রের মুখোস-পরা কোন রাজনীতিকের পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব। মিঃ চার্চ্চিল স্বয়ং "কার্জ্জন লাইন" সম্পর্কিত সোভিয়েট প্রস্তাবটি সঙ্গত বলিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু তিনি আশ্রিত পোলিস্ গভর্ণমেণ্টকে এই সঙ্গত প্রস্তাব মানিয়া লওয়াইতে পারেন নাই।

পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের এই অন্যায় জিদে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ পরোক্ষে উপকৃতই হইয়াছেন। এই প্রতিক্রিয়াপন্থী গভর্ণমেণ্টের সহিত মীমাংসা হইলে ইহাদের সহিত পোলিস গণ-প্রতিনিধিদের আপোষ করাইবার জন্য অনেক বেগ পাইতে হইত। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের গণ-প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত পোলিস মুক্তি সমিতিকে মানিয়া লইয়াছেন এবং শত্রুর কবলমুক্ত পোল্যাণ্ডে সেই সমিতিকে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, স্থির করিয়াছেন। ইহাতে লণ্ডনের পিঞ্জরাপোলে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে; পোলিস্ প্রধান মন্ত্রী মিকোলাজীক্ ছুটিয়াছেন মস্কোয়। ষ্ট্যালিন ও মলোটভ্ তাঁহাকে শিষ্টভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; তবে মস্কোয় আলোচনার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ পোলিস্ মুক্তি সমিতিকে ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবেন না। তবে, মুক্তি সমিতির সদস্যরা যদি আপত্তি না করেন, তাহা হইলে লণ্ডনের গভর্ণমেণ্ট ও এই সমিতিকে একত্রিত করিয়া নূতন শাসন-প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই ধরণের মীমাংসার প্রস্তাবে পোলিস্ গভর্ণমেণ্টও হয় ত আর আপত্তি করিবেন না; কারণ সর্ব্বনাশের সময় অর্দ্ধেক ত্যাগ পণ্ডিতোচিত কাজ। এখনও যদি পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট অন্যায় জিদ ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় তাঁহারা একেবারেই দূরে পড়িয়া থাকিবেন। আর, এই বিষয়ে এখন কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, পোলিস্ ইউক্রেন ও বাংলো রুশিয়া সম্পর্কে রুশিয়ার দাবী অপ্রতিরোধ্য।

তুরস্ক ও ফিন্‌ল্যাণ্ড

ইংরেজিতে প্রবাদ আছে—ইঁদুরও নিমজ্জমান জাহাজ ত্যাগ করে। নিমজ্জমান নাৎসী জাহাজ হইতেও এখন সরিয়া পড়িবার সময় আসিয়াছে। তুরস্ক এতদিন দুই কূল বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থার জন্য তাহার এই কূটনৈতিক কৌশল সফলও হইয়াছে। ১৯৪১ সালে বলকান জয়ের পর জার্ম্মানী যখন রুশিয়া আক্রমণ করিতে যায়, তখন পশ্চিম এশিয়ার মিত্রপক্ষের সমরায়োজনে হাত না দেওয়াই ছিল তাহার নীতি। সে ভাবিয়াছিল, ককেসাস্ ভেদ করিয়া নাৎসী সেনা পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছিবে; উত্তর আফ্রিকায় পথে রোমেল্ সুয়েজ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবেন। এই অবস্থা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে ইরাক-সারিয়া-প্যালেষ্টাইন্ অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সমরায়োজনের বিরুদ্ধে তুরস্ককে "বাফার" রাষ্ট্ররূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে। জার্ম্মানীর সমর-নীতির দিক হইতে তুরস্ককে নিরপেক্ষ রাখিবার এই প্রয়োজন যদি না ঘটিত, তাহা হইলে এই রাষ্ট্রটি বহু পূর্ব্বেই নাৎসী বিষদাঁতের আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইত; তুর্কি রাজনীতিকদের কূটনৈতিক চাতুর্য্য তুরস্ককে ঠেকাইতে পারিত না। পরে ষ্ট্যালিনগ্রাডের ব্যর্থতায় নাৎসী সেনার পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছিবার দুঃস্বপ্ন বিফল হয় এবং ষ্ট্যালিনগ্রাড-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াতেই রোমেলের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এইভাবে পরোক্ষে ষ্ট্যালিনগ্রাড-রক্ষী-বীরদের কৃতিত্বেই তুরস্ক বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও তুর্কি-রাজনীতিকরা জার্ম্মানীর ভয়ে তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জে, গ্রীসে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্য্যন্ত



দি মস্তাং—ফাইটার ডাইভ্ বোম্বার

তাহাদের ভয়ের কারণ ছিল। যুদ্ধের শেষ ফল যাহাই হউক না কেন, তুরস্ককে শত্রুর সহযোগী মনে করিলে প্রথমে জার্ম্মানী ঐ সব অঞ্চল হইতে তাহাকে প্রবল আঘাত করিতে পারিত। কিন্তু এখন তুরস্কের ভয় দূর হইয়াছে। কোন নূতন রণক্ষেত্রে প্রবলভাবে আঘাত করিবার শক্তি যে জার্ম্মানীর আর নাই, ইহা তুর্কি রাজনীতিকরা বুঝিয়াছেন। তাই, সম্প্রতি তুরস্ক জার্ম্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়াছে। সম্ভবতঃ সে তাহার বিমানঘাঁটীগুলি মিত্রপক্ষকে ব্যবহার করিতে দিবে। যুদ্ধের পরে সন্ধির বৈঠকে বসিবার লোভ বড় লোভ। সেই লোভে তুর্কি রাজনৈতিকরা এখন সকলপ্রকারে মিত্রপক্ষকে তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবেন।

ফিনল্যাণ্ডের রাইতি-লিকোমিস্ সোভিয়েট রুশিয়ার উদার সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জার্ম্মানীর সহিত নূতন করিয়া চুক্তি করিয়াছিল। এই চুক্তি নাকি ফিনিস্ পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হয় নাই। আর এই চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানীর যে পরিমাণ সৈন্য পাঠাইবার কথা ছিল, তাহার এক নগণ্য ভগ্নাংশমাত্র নাকি সে পাঠাইয়াছে; যাহা হউক, ফিনল্যাণ্ডের অবস্থা এখন খুবই কাহিল। মুরুব্বি জার্ম্মানী এখন নিজের সমস্যা লইয়াই বিব্রত। তাহার সাহায্যে বাঁচিবার আশা ফিনল্যাণ্ডের আর নাই। এই অবস্থায় রাইতিকে প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে সরাইয়া তাঁহার স্থানে ম্যানারহিম্‌কে বসান হইয়াছে। ম্যানারহিম্ ব্যক্তিটির কুকীর্ত্তি অশেষ। ম্যানারহিম্‌কে ফিনল্যাণ্ডের বালোগ্‌লিও বলিলেও তাঁহাকে বেশী মর্য্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মানীর সহিত তাঁহার প্রণয়ের ডোর ছিঁড়িয়াছে। কাজেই মনে হয়, এখন এই ব্যক্তিটী রুশিয়ার সহিত মিটমাট করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

ইটালীয় রণাঙ্গন

ইটালীয় রণাঙ্গনের গুরুত্ব এখন অপেক্ষাকৃত কম। তবে, ইটালীতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ঐ গভর্ণমেণ্টে প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরা গৃহীত হওয়ায় ইটালীতে যুদ্ধের গতি প্রবলতর হইয়াছে। এখানে ৮ম বাহিনী এখন ফ্লোরেন্সে পৌঁছিয়াছে; আর্ণো নদীর দক্ষিণে তাহারা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। আড্রিয়াতিকের তীরে পোলিস্ সেনা মিশা নদী অতিক্রম করিয়া দুই তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং অ্যাপেজানো সহরে প্রবেশ করিয়াছে।

জার্ম্মানরা ইটালীয় রণাঙ্গনে এখন প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিতেছে। বল্‌কান্ রণাঙ্গনের সহিত ইটালীয় রণক্ষেত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ। কাজেই বল্‌কান্ অঞ্চলে অবস্থা জার্ম্মানদিগের প্রতিকূল হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইটালীতে কেসরলিঙের প্রতিরোধের প্রাবল্য বাড়িতেছে।



একটী বৃহৎ মেশিনে কর্ম্ম-নিরতা জনৈক নারী

ব্রহ্ম রণক্ষেত্র

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ বড় রকমের বিজয় লাভ করিয়াছেন। মণিপুর অঞ্চল এখন শত্রুশূন্য। মিত্রপক্ষের চতুর্দ্দশ আর্মি ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ক্যাবো উপত্যকায় টামু অধিকার

করিয়াছে। ওদিকে উত্তর ব্রহ্মে মিচিনায় মিত্রপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মিচিনার দক্ষিণে চীনা সৈন্য ওয়েঙ্গমো অধিকার করিয়াছে।

মিত্রপক্ষের এই সাফল্যের গুরুত্ব খুব বেশী। এখন সত্বর চীন-ভারত পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। মিচিনায় বিমান ঘাঁটী ব্যবহার করিয়া মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী উত্তর ব্রহ্মে প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইবে।

মনে হয়, এইবার বর্ষার পরেই মিত্রপক্ষ ব্রহ্মদেশে অভিযান আরম্ভ করিবেন। ইউরোপের যুদ্ধ এখন যে অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাতে ঐ অঞ্চল হইতে কিছু নৌবাহিনী প্রাচ্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা অসাধ্য নয়। ব্রহ্ম-অভিযান প্রধানতঃ নৌপথে হইবে। এখন সেই অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি মিত্রপক্ষের হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

জাপানে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

জাপানে তোজো-মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে কইসোর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে। জাপানের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, সমগ্র জাতীয় শক্তি নিয়োগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ পরিচালনের জন্যই এই পরিবর্ত্তন।

জাপানের সামরিক অভিজাত শ্রেণী নৌদল ও সামরিক দলে বিভক্ত। এই দুই দলে সদ্ভাব নাই। সম্প্রতি এই অসদ্ভাব হয়ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাই হয়ত মন্ত্রিসভায় এই পরিবর্ত্তনের কারণ। প্রশান্ত মহাসাগরে নূতন নূতন দ্বীপে অবতরণ করিয়া মার্কিন সেনাবাহিনী ক্রমেই খাস জাপানের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। খাস জাপান তখন দূরগামী বোমাবর্ষী বিমানের পাল্লার মধ্যে। জাপানের নৌদল মার্কিন নৌবিভাগের এই সাফল্য রোধ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে এবং উত্তর ব্রহ্মে জাপানী স্থল-সৈন্য ব্যর্থকাম হইয়াছে। দুই দিকে দুই দলের এই বিফলতা জাপানের সামরিক শ্রেণীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। নূতনভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া এই দুই দলে সদ্ভাব স্থাপনের এবং আসন্ন চূড়ান্ত যুদ্ধে জাপানের সমগ্র জাতীয় শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে করাই সঙ্গত। ৬।৮।৪৪

কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

মহালয়ার দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় আমরা রওয়ানা হলুম কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পথে। এই দেবস্থানটী আমাদের বাসা থেকে প্রায় মাইল ছয় পথ হবে। কাজেই তিনখানি মোটর ঠিক করা হয়েছিল। স্থানীয় কলিয়ারীর ম্যানেজার ও আমরা সপরিবারে এবং উক্ত কলিয়ারীর প্রোপ্রাইটার বাবুর পরিবার-সহ আমরা অজানা পথে পাড়ি দিলুম। গ্রাম থেকে বেরিয়ে গাড়ী বরাকর Stationএর পথ ধরল। মন্দিরটী ষ্টেশান থেকে ৩৷৷০ মাইল দূরে কল্যাণেশ্বরী নামে একটী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সুন্দর শরৎ প্রভাত। লোকালয় ছেড়ে পথ ক্রমশঃ নির্জন হয়ে এল। এখানে একটী ক্ষুদ্র সাঁকো পার হলুম, নাম "ভাঙ্গাপুল"। প্রায়ই সন্ধ্যার পর এখানে ডাকাতের উৎপাত হতে শোনা যায়। অদূরে বরাকর নদী দেখা গেল। নদীর ধারে দেখলুম প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। বরাকর পৌঁছলুম আমরা ৯৷৷০ সময়। এখান থেকে বরাকর নদী, আমাদের সাথে পথের বাঁকে বাঁকে, লুকোচুরী খেলতে খেলতে, চলতে লাগল। এইখান থেকে সমস্ত সহরে জল সরবরাহ করা হয়। অদূরে দেখা গেল সুসুমী পাহাড়। এই পাহাড়টী দূর থেকে কেবলই আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। যত কাছে যাই তত সে দূরে সরে যায়। এমনি করে বাকী পথটী তার মধুর মায়ার মধ্য দিয়ে আমরা কল্যাণেশ্বরী এসে পৌঁছলুম। বেলা ১০৷০টার সময়।

ছোট পাহাড়, ছোট মন্দির, ছোট নদী, ছোট গ্রাম। তার চারিদিক ঘিরে একটী সুনিবিড় প্রশান্তি ঝলমল করছে। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সকলে দক্ষিণাকালী বলে। শোনা যায়, এই দেবী নাকি খুব জাগ্রত। আশ পাশের গ্রাম এবং দূর দূরান্তর হতেও বহুলোক এখানে আসে দেবী দর্শন করতে ও পূজা দিতে। এই দেবীর মুখ পিছন দিকে ফিরানো। এ সম্বন্ধে একটী গল্প কথা আছে। প্রোপ্রাইটার বাবুর বোন্ আমায় বললেন গল্পটী। সে বহু দিনের কথা। এই মন্দিরের এক পূজারী ব্রাহ্মণ তার শিশু কন্যাকে মন্দিরে রেখে স্নান করতে স্নান নদীতে। কিন্তু ফিরে এসে তিনি তাঁর কন্যাকে আর দেখতে পান্‌না। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, দেবীর ঠোঁটের কাছে

কি যেন চকচক করছে—কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, সেটা তাঁর মেয়ের কপালের অলঙ্কার টিক্‌লী! কোনও কারণে দেবী কুপিতা হয়ে ছিলেন এবং সেই কোপানলে মেয়েটী জীবনাহুতি দিয়েছে। এই ঘটনার পরদিন হতে দেখা গেল দেবীর মুখ পিছন দিকে ফেরানো। পূজারী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। কাজেই ভক্তের কাছে লজ্জিত হয়ে তিনি সেই যে মুখ লুকিয়ে ছিলেন, আজও তাহা তেমনি আছে। অনেকে হয়ত এ কাহিনী শুনে খোস্ গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু আমার কি জানি কেন, মন্দিরের সেই আলো অন্ধকারে মেশা বিজনচত্বরে বসে, গেরুয়া রংএর চেলী পরা দেবীমূর্ত্তির পানে চেয়ে সবই সত্য বলে মনে হোল।

তখনও পূজা আরম্ভ হয়নি। সকলে এসে পৌছাননি। কাজেই আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে উপলাস্তীর্ণ ঝরণার ধারে এসে দাঁড়ালুম। ছোট ঝরণা নদী। কি দুরন্ত তার শ্রোতোচ্ছ্বাস। আকুল, আবেগে সে পথের সমস্ত উপল খণ্ডকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে দারুণ ক্রোধে ফেনিয়ে উঠছে আপন সত্তার মধ্যে। এখানে আমার মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথকে 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বারি—ওরে প্রাণের বেদনা, প্রাণের আবেগ, রুধিয়া রাখিতে নারি।' এখান থেকে একটু দূরে নদীর ধারে একটী ছোট্ট মন্দির দেখলুম, এই স্থানটীর নাম "চালনাদয় ঘাট" দেবী কল্যাণেশ্বরী নাকি এখানে বসে শাঁখা হাতে পরেছিলেন এবং এই ঘাটে নিত্য স্নান করতেন। এই মন্দিরটীর মধ্যে থেকে এখনও নাকি আমলাবাটার গন্ধ পাওয়া যায়। এখানে এখন গণেশের মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এমন সময় আমাদের সঙ্গীরা এসে পৌছাতে, আমরা—মেয়েরা সকলে স্নানে নাবলুম। প্রায় তিনঘণ্টা কাল আমরা স্নানে মেতে ছিলুম। অদূরে একটি কাঁঠালী চাঁপা গাছে অজস্র ফুল ফুটেছিল। নানারকম বনকুসুমের গন্ধের সাথে সে গন্ধ মিশে সেই নির্জ্জন বনস্থলীর আবহাওয়াকে মধুর করে তুলেছিল। আমার জা, আমায় একটা গান গাইতে বললেন। প্রকৃতির মনভুলানো শান্ত সুনিবিড় সহচার্য আমায় কেমন যেন মায়া-মুগ্ধ করে ফেলেছিল। ঝরণার বুকে আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ বুঝি স্বপ্ন, প্রকৃতি আর আমি, আমাদের দুজনের এই মধুর মিলন, এ অতি ক্ষণিকের, তবুও আজ আমি যা পেলুম, তা চিরস্মরণীয় চিররমণীয় হয়ে থাকবে, আমার মনের মণিকোঠায়। গাইলুম "স্বপনে দোঁহে, ছিনু কি মোহে, হোলো যাবার বেলা"—!

কখন ছায়াশীতল, কখনও রৌদ্রতপ্ত বনপথ অতিক্রম করে আমরা মন্দিরে এসে পৌছলুম। তখন সবেমাত্র আরতি আরম্ভ হয়েছে। অঞ্জলী দিয়ে সকলে বললেন, বলি দেখে ফেরা হবে। মন্দিরের মধ্যে অতিরিক্ত ভীড় দেখে আমরা বাইরে এলুম। এখানে মন্দিরগাত্রে বহুপ্রকার কারু শিল্পের নিদর্শন দেখলুম। যাঁর পরিকল্পনায় এই মন্দিরটী স্থাপিত হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। এমন পাহাড়ের পাদদেশে ঝরণার ধারে নির্জ্জন বনভূমিতে ললিত কলাসম্পদে পূর্ণ, পূত দেবস্থানটী দেখে, মন আমার কোন্ এক অজানা লোকের বিশ্বশিল্পীর পায়ে আপনা হতে শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে একটী সুবৃহৎ ঘণ্টা আছে। সেটী দেখার মত জিনিষ। বলির দেরী দেখে আমরা মন্দিরের ছাদে একটী নিমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসলুম, ছাদে একটী লোক দেখলুম তাকে আমার পৃথিবীর আদিম মানুষ বলে মনে হোল। দেখতে ঠিক বনমানুষের মত, ভাষাও অদ্ভুত। নামটা কি বলেছিল মনে নেই, তবে স্থানীয় অনেক গল্প বলেছিল মনে আছে। জাতে সে নাপিত, ঘর এই গ্রামে। বহু পুরুষানুক্রমে তারা এই মন্দিরে কাজ করে আসছে। সে বল্লে হাজার বিপদ হইলেও কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে রাত্রে কাকেও থাকতে দেওয়া হয় না। প্রতিদিন গভীর নিশুতি রাতে নাকি স্বয়ং মহাদেব আসেন কল্যাণেশ্বরীর কাছে। জ্যোৎস্না পুলকিত রাতে তাঁদের ঝরণার ধারে ভ্রমণ করতে তার এক পূর্বপুরুষ নাকি দেখেছে। লোকটীর সঙ্গ আমার বেশ মধুর বলে মনে হোল। আধা মানুষ, আধা জন্তু, সভ্যজগতে এরকম সরল বন্ধু পাওয়া কঠিন।

বলি দেখে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলুম। এসেই হাতে পেলুম গরম একক্লাপ চা। তখন পানীয়টী পেয়ে আমার যে কি উপকার হয়েছিল, সে কথা আমি জীবনে কোনও দিন ভুলবোনা। গভীর জঙ্গলের ধারে, অশ্বত্থ, নিম, পলাশ, ইত্যাদি বৃক্ষের ছায়ায় বসে আমরা আহার পর্ব সমাধা করলুম। নদীতে আঁচাতে গিয়ে অনেক ঝিনুক ও জঙ্গলের ধার থেকে অনেক পাথর কুড়োলুম। আমার ভাসুরের এক বন্ধু বন্দুক নিয়ে এসেছিলেন, শীকারের জন্ত। এখানে নাকি খুব ভালো শীকার পাওয়া যায়। নদীর ওপারে অরণ্যাবৃত পাহাড় শ্রেণী, আমায় প্রথম থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। ভাবলুম এইবার আমরা ওদিকটা গিয়ে দেখে আসবো। কিন্তু তখনি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, আমাদের প্রোপ্রাইটার বাবুর হঠাৎ অফিসের কি একটা জরুরী কাজ মনে পড়ে গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে ফেরবার জন্ত তৈরী হতে লাগলেন। মনে মনে একবার কল্যাণেশ্বরীকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠলুম। পিছনে পড়ে রইল নির্জন বনভূমি, শান্ত পাহাড় শ্রেণী, নৃত্যপরা ঝরণা, আর পুণ্য কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। সেদিন অলক্ষ্য হতে তারা আমার মনে যে মায়ামধুর রাখী বেঁধে দিয়েছিল এ জীবনে সে গ্রন্থি আর খুলবে না।



সাময়িকী

বাঙ্গালায় দুরবস্থা—

বাঙ্গালা দেশের কতকগুলিস্থানে রেশানিং প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে চাল, আটা ও চিনি একটা নির্দ্দিষ্ট দরে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অভাবের ফলে বাঙ্গালার জনসাধারণকে দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে চালের মণ ৪ টাকা ছিল, আজ তাহা ১৬৷০ করিয়া দিয়া সরকার চাউল সুলভ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ডাল বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য—ভাল ডাল প্রায়ই পাওয়া যায় না। মাছ তরকারীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বলার প্রয়োজন নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশ হুগলীতে ইলিস মাছ ৪ টাকা সের দরে ও মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে ৫ টাকা সের দরে বিক্রীত হইতেছে। আলুর সের ১০ আনা এবং পটোল, বেগুন প্রভৃতি কোন তরকারীই ৮ আনা সেরের কম পাওয়া যায় না। কয়লা, কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, গুড় প্রভৃতির কথা নাই বলিলাম। এই অবস্থায় সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সংসার চালান প্রায় একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজারে কোন মাছই পাওয়া যায় না—যাহা পাওয়া যায় তাহার দর তিন টাকা সেরের কম নহে। প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণ সম্বন্ধেও এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই—স্থানে স্থানে তাহা এখনও একটাকা সের দরে বিক্রীত হয়। ইহার ফলে লোক অর্দ্ধাহারে ও কদাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে এবং যে কোন রোগে অধিক সংখ্যায় প্রাণ হারাইতেছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া সরকার হইতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য যে আন্দোলন চালান হইতেছে তাহার কোন ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আগামী ভাদ্র আশ্বিন মাসে দেশের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে—কাজেই সকল লোক ভবিষ্যতের ভাবনায় শঙ্কাকুল হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতীকার কতদিনে হইবে তাহা কে জানে?

মহাত্মা গান্ধী ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের বার্ষিক স্মৃতি উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পুনায় গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তিনি সেবা গ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাকিস্তান হইলে বাঙ্গালার কিরূপ দুরবস্থা হইবে তাহা গান্ধীজিকে ও শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীকে বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে উত্তর বঙ্গে দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দিনাজপুর—এই ৪টি স্থানে হিন্দুর জনসংখ্যা অধিক—কাজেই বাঙ্গালাকে পাকিস্তানে পরিণত করিলে ঐ ৪টি জেলাকে আসাম বা বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। স্বাধীন ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকেও ঐ ভাবে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হইবে। পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান বিভাগের ৬টি জিলা এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলায় শুধু হিন্দুস্থান থাকিবে—বাকী সর্ব্বত্র পাকিস্তান হইবে—অর্থাৎ বাঙ্গালাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কয়েকটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে। মহাত্মাজী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সকল কথা ধীরভাবে শুনিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। পাকিস্তান হইলে ভারতের সর্ব্বত্র অন্যান্য যে সকল অসুবিধা ও গণ্ডগোল সৃষ্ট হইবে সে বিষয়েও শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজিকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। গান্ধীজি ইতিপূর্ব্বে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ সেগুলির প্রতি গান্ধীজির মনোযোগ আকৃষ্ট করিলে গান্ধীজি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে ঐ সকল বিষয়ে গান্ধীজির মত পূর্ব্বের মতই আছে—অর্থাৎ রাজাজীর প্রস্তাবের পরও তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শীঘ্রই গান্ধীজির সহিত মিঃ জিন্নার এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। আমাদের বিশ্বাস, তখন গান্ধীজি মিঃ জিন্নাকে শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি বুঝাইয়া দিবেন।

কলিকাতায় ভিক্ষুকদের আগমন—

'ষ্টেটসম্যান' পত্রে প্রকাশ, আবার দল দল ভিখারী মফঃস্বল হইতে রেলে চড়িয়া কলিকাতা সহরে আগমন করিতেছে। ১লা হইতে ২১শে জুলাই এই ২১ দিনে ৪৪৫ জন ভিখারীকে কলিকাতার পথ হইতে সংগ্রহ করিয়া অনাথাশ্রমে রাখা হইয়াছে। মফঃস্বলে চাউলের মণ ২৫৷৩০ টাকা—তরিতরকারী বা মাছ তাহা অপেক্ষাও দুর্ম্মূল্য—কাজেই দরিদ্র লোকগণের পক্ষে সহরে কাজের চেষ্টায় চলিয়া আসা ছাড়া উপায় নাই। ঐ সকল ভিখারী কাজ না পাইয়া মারা যাইতেছে। ইহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে কলিকাতার অবস্থা আরও ভীষণ হইবে বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিতেছে। কিন্তু উপায় কোথায়?

পরিহাস—

রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন, ছবিসহ, দিয়া বলেন, 'রেল চড়া কমাও'। ছবি দেখাইয়া বলেন, "এ ভাবে গাড়ী চড়িও না, বিপদের সম্ভাবনা।" আমাদের অনুরোধ রেল কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্ম্মচারিদের কেহ কেহ যেন নিজ "স্পেশ্যাল কামরা" ছাড়িয়া সাধারণের সঙ্গে রেল চড়েন। যাহার নিজের শরীরের উপর সামান্য মমতা আছে, তাহারা স্বেচ্ছায় সখ করিয়া গাড়ী চাপিবে না, ইহাই রেল ভ্রমণের বর্ত্তমান অবস্থা। বিপজ্জনকভাবে যাঁহারা ট্রেণ চাপেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ ভাবে ট্রেণ না চাপিলে

বাড়ীতে অনাহারে মরিবে, এখানে হয়ত কোনও আকস্মিক না হইতে পারে এই আশা। দেখাদেখি ট্রাম কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়া উপদেশ দিয়াছেন, যখন বড় ভিড় (rush) তখন যথাসম্ভব ট্রাম চাপিবে না। ধন্য! বিদেশী কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অফিস ১০টায় (এখন day-light saving হইয়া ৯—৯।) বসে; স্কুল কলেজ ব্যাঙ্ক সবই প্রায় একই সময় বসে; এ ক্ষেত্রে রস্ (rush) ছাড়িলে ত শুকাইয়া মরিতে হইবে। সুতরাং ইহা নিছক পরিহাস। অফিসগুলি ভাগ করিয়া যদি আরম্ভের সময় পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তাহা হইলে কতক প্রতিকার হইতে পারে। অর্থাৎ এক এক বিভাগের অফিস এক সময় বসিলে চলিতে পারে; আর সকল অফিসই, পরস্পরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। অর্থাৎ কতগুলি সকালে আরম্ভ হইয়া দুটায় ছুটী হইবে; আর কতক বেলা ১২টায় বসিয়া ৭টা বা আরও পরে ছুটী হইবে। আমরা প্রশ্ন করি ট্রাম কোম্পানীর "মেন" (প্রধান) অফিস বসে কখন? তাঁহারা এ বিষয়ে নজীর দেখান না। কতক কেরাণী ১২টা ১টায় বাড়ী ফিরুন, আর কতক ১২টা ১টায় সুরু করুন। ইহাই একমাত্র সুপরামর্শ।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী ও হাইকোর্ট

গত ৯ই জুন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট জাপানী আক্রমণের আশঙ্কার অজুহাতে হাওড়া মিউনিসিপালিটীর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর শাসনভার গ্রহণের আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটীর ৩জন কমিশনার ও ২ জন করদাতা হাইকোর্টে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করায় সরকারী কর্ম্মচারীকে কার্য্যে ভার গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হয়। পরে হাইকোর্টে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার টরিক আমীর আলি ও বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশ ঐ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। রায়ে বলা হইয়াছে যে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও বাঙ্গালা সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বে-আইনি ও অন্যায় আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ বিষয়ে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং সরকারী কর্ম্মচারী যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে না পারেন, সে আদেশ বলবৎ রাখা হইয়াছে। ভারতরক্ষা আইনের ঐভাবে অপব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ না করায় বিচারপতিরা ঐ সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারের উদ্যম—

এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষগণ ভাণ্ডারের নিজস্ব আলয়ে এই অঞ্চলের মধ্যবিত্তদের সুবিধাকল্পে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই অনুষ্ঠানটির জন্য দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দুই হাজার টাকা দান করিয়া কর্ম্মীদের উৎসাহ বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বারাকপুরের এস, ডি, ও মিঃ এস, কে, গুপ্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সুরজমল নাগরমল, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় সাহেব অক্ষয়কুমার ঘোষ, শর্ম্মা-ব্যানার্জ্জী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি এই সদনুষ্ঠানটিতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে মধ্যবিত্তদের সহায়তা-কল্পে এরূপ প্রচেষ্টা যে আদর্শস্থানীয় ইহা বলাই বাহুল্য।

আবর্জ্জনা হইতে সার প্রস্তুত—

সহরের আবর্জ্জনা হইতে সার প্রস্তুত করার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে। ফলে হাওড়া ও হুগলী-চুঁচড়া—এই দুইটি মিউনিসিপ্যালিটী তাহাদের সকল আবর্জ্জনা একত্র করিয়া তাহা হইতে সার প্রস্তুত করিতেছেন। কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য জমীর সার একান্ত প্রয়োজন। সেই সার এখন প্রায় দুর্লভ। যদি বাঙ্গালা দেশের ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাদের আবর্জ্জনা সারে পরিণত করে, তাহা হইলে সেই সার ব্যবহারের ফলে বাঙ্গালা দেশে কৃষির কতকটা উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিরূপ অধিক মূল্যে বিদেশী সার বাঙ্গালার কৃষকদিগকে ক্রয় করিতে হয়, তাহা সকলেই জানেন। সহরের নিকটস্থ কৃষির জমীগুলির জন্য যদি সস্তায় সার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তবে সেই সকল জমীর উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সহজ হইবে।

ভোগ কমিটী—

বহুদিন পরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ পুরোহিত, মন্দিরের ম্যানেজার ও হিন্দুদের প্রতিনিধিদিগকে ভোগ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—বিভাগীয় মন্ত্রী মিঃ এইচ্-এস্, সুরাবর্দ্দী ও বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ এন-এম-আয়ার ঐ কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদক হইবেন। নিম্নলিখিত কয়জনকে কমিটীর সদস্য করা হইয়াছে—পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, শরৎচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ফণিলাল মুখোপাধ্যায়, গুরুপদ হালদার, রায় বাহাদুর এ-এন-দাস, প্রিয়লাল মিত্র, জীবনকৃষ্ণ মিত্র, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, পি-কে-মুখোপাধ্যায়, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত। ইহার পর কি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হইবে?

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটী—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সালের ভারতব্যাপী খাদ্যাভাব ও মহামারী সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন, নিম্নলিখিত কয়জন তাঁহার সদস্য হইয়াছেন—সার জন উড়হেড চেয়ারম্যান, সার মণিলাল বি নানবতী, মিঃ এস-ভি-রামমূর্ত্তি, খাঁ বাহাদুর মিয়া আফজল হোসেন ও ডক্টর ডবলিউ-আর-আকরয়েড সদস্য। বাঙ্গালা দেশে কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহারা সরকারী ও বেসরকারী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাক্ষ্য-গ্রহণ করিবেন। দিল্লীতে কমিশনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কমিশনের সদস্যগণ বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বায়ে গমন করিবেন এবং আবশ্যকমত সকলের সাক্ষ্য পূরণ করিবেন। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার সম্পূর্ণ ও স্বাধীন অধিকার কমিশনকে দান করা হইয়াছে; সেজন্য প্রয়োজন হইলে কমিশন বড়লাট বা প্রধান সেনাপতিরও সাক্ষ্য লইতে পারেন। সবই ভাল কথা—কিন্তু

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা কমিশনের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে শঙ্কিত করিয়া থাকে। তদন্তের রিপোর্টের নির্দ্দেশমত কাজ হইবে ত ?

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা—

বর্ষার পর বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রাপ্ত বয়স্ক-দিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন—এ বিষয়ে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য পাওয়া যাইবে। দেশে যত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ততগুলি প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সেই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৬ মাস শিক্ষা দানে সকলকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হইবে। প্রথমতঃ ২৪ পরগণা জেলায় কার্য্যারম্ভ করা হইবে। এ জন্য ইতিমধ্যে ১০০ জন শিক্ষককে ট্রেণিং দেওয়া হইয়াছে। অশিক্ষিত প্রাপ্ত বয়স্কদিগের গণনা কার্য্য শেষ হইয়াছে। যদি এ প্রস্তাব সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতে মোটর গাড়ী তৈয়ারী—

ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ডালমিয়া সম্প্রতি সিমলায় অবস্থান কালে জানাইয়াছেন যে তিনি ৫০ কোটি টাকা মূলধনের একটি নূতন কোম্পানী খুলিয়া মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবেন। সে জন্য শীঘ্রই উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়া কারখানা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতে প্রস্তুত মোটর গাড়ী বা উড়োজাহাজ যাহাতে সুফল হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। আপাততঃ তিনি নিজে অর্থব্যয় করিয়া সকল প্রাথমিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

আগে পরে—

গান্ধীজির হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রস্তাব লইয়া বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সুফল খুব আশা করা যায় না, কারণ ইংরেজ সরকারের মনোভাব মিঃ আমেরির ভাষায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হতাশ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন বড় করিয়া মনে উঠিতেছে। মিঃ আমেরি বলিয়াছেন, ভারতে রাজনৈতিক মীমাংসা না করিয়াও অর্থ নৈতিক সংগঠন সম্ভব; তাহাতেও লোক ব্যস্ত থাকিবে এবং দেশের উন্নতি হইবে। মূলতঃ ইহা অর্থহীন; কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা না আসিলে দুই পক্ষে প্রতি পদে বিরোধের সম্ভাবনা এবং তাহাতে দুর্ব্বল ভারতের মতামতের কোনও দাম থাকিবে না। বর্ত্তমানের সমস্যায় ভারত চায়, তাহার ষ্টার্লিঙ্ ব্যালান্স অর্থাৎ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হাতে জমা টাকা, ইংরেজ কিছু কিছু ছাড়িতে থাকুক এবং সেই টাকার কতক পরিমাণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে জমা দিউক বা ঋণ পরিশোধের জামিন হউক, ভারত তাহার প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি তাহার সুবিধামত, সেই সকল দেশ হইতে ক্রয় করিবে। ইংরেজ সম্মত হয় নাই। ইংরেজ গত যুদ্ধে ভারতের অর্থবল জনবলের সাহায্য ব্যতীত ১৯০ কোটী টাকা ভারতের দান বলিয়া লইয়াছে; ভারতবাসীর মতামত লওয়া হউক, দেখা যাইবে সেটা দান কি না। ভারতবর্ষ চায় শিল্পকে প্রধান স্থান দিতে, ভারত সরকার একবার stud bull অর্থাৎ প্রজনন বৃষের উন্নতি এবং পরে কৃষি এবং রাজপথ প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বাট্টা বিনিময়ের হার লইয়া বিরোধ রহিয়াছে; রক্ষণ শুল্ক সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে; নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি ভারতবাসী দেশীয় শিল্প সাহায্যে সরবরাহ করিতে চায়, ইংরেজ চায়, তাহার দেশ হইতে আনিয়া সরবরাহ করে। এখানে রেল ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার দাবী পুরাতন, তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। মোটর তৈয়ারী করিতে কারখানা সৃষ্টির অনুমতি পাওয়া গেল, যখন মোটর আমদানী সুরু হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, অর্থ নৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত কোনও প্রকারে সম্ভব নয়।

সার উষানাথ সেন—

ইনি খ্যাতনামা সাংবাদিক। প্রসিদ্ধ সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া'র ইনি ম্যানেজিং



সার উষানাথ সেন

ডিরেক্টার। সম্প্রতি ২ বৎসরের ছুটি লইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের 'চিফ প্রেস এডভাইজারের কার্য্য করিতেছেন। এই বৎসরই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

লবণ সমস্যা—

লবণ উৎপাদনের উপর যে আবগারী কর ধার্য্য আছে, বাঙ্গালা দেশের লবণ উৎপাদন শিল্প হইতে তাহা রহিত করার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। উৎপাদনকারীদের যে গুদাম ভাড়া দিতে হয়, তাহাও উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে বাঙ্গালা দেশ

সমুদ্রের এত কাছে, সে দেশের লোককে এক টাকা সের দরে লবণ ক্রয় করিতে হয়—ইহা অপেক্ষা লজ্জার কারণ আর কি হইতে পারে। যে প্রকারে হউক, এদেশে লবণ সুলভ করা প্রয়োজন।

মাছ ও তরকারীর দর—

কলিকাতার বাজারে মাছ ও তরকারীর দর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া এখন প্রায় ৩ গুণে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ বিষয়ে 'ষ্টেট্‌সম্যান' পর্য্যন্ত শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের দামের সহিত তুলনায় ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের দাম কত বেশী তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মাছের দাম—	শতকরা ১১১ ভাগ
দুধের দাম—	" ৮৩ ভাগ
শাকসব্জীর দাম—	" ১১৮ ভাগ
মাংস ও ডিমের দাম—	" ১০০ ভাগ

মাল আমদানী রপ্তানীর অসুবিধা, কলিকাতার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, কারবারীদের অধিক লাভের চেষ্টা প্রভৃতিই এই অসাধারণ মূল্য বৃদ্ধির কারণ।

রাজা নরসিংহ মল্লদেব—

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে জমীদার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব সম্প্রতি সরকার কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।



ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব

তিনি বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল। তাঁহার চেষ্টায় মেদিনীপুর জেলায় বহু সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

সাহিত্যিককে সরকারী বৃত্তি—

সুপ্রসিদ্ধ কবি কাজি নজরুল ইসলাম গত ৫ বৎসর কাল রোগে শয্যাগত আছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সেজন্য তাঁহার মাসিক ২ শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার যে ৫ খানি পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দানের কথাও বিবেচিত হইতেছে দীনেশচন্দ্র ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রও সামান্য কিছু পাইয়াছিলেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সম্বর্দ্ধনা—

পুনায় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের বার্ষিক স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথায় গিয়াছিলেন। পুণা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইলে তিনি বাধ্যতামূলক প্রাপ্ত বয়স্কদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্রই এই শিক্ষার অভাব—শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ কি এ কথা ভুলিতে পারেন!

বাঙ্গালার সাহায্যে ১০ কোটি টাকা—

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অর্থ কমিটী বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বাঙ্গালাকে ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ দুই বৎসরে ১০ কোটি টাকা সাহায্য দানের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশকে তাঁহার আয় বৃদ্ধি করিতেও সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই ১০ কোটি টাকায় বাঙ্গালার দুর্দ্দশা কতটা কমিবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

বিদেশী গম আমদানী—

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে দুইখানা জাহাজে বাহির হইতে মোট ১৬ হাজার টন বিদেশী গম ভারতে আসিয়াছে। খাদ্য-শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে এই ভাবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আনিয়া আর কতদিন ভারতকে রক্ষা করা যাইবে।

ডক্টর বি-সি গুহ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর বি-সি গুহ দিল্লীতে ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের চীফ টেকনিকাল এডভাইসার নিযুক্ত হইয়া সেই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। আমরা একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের সম্মানজনক পদপ্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বিলাতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদল—

বিলাতের রয়াল সোসাইটীর সেক্রেটারী অধ্যাপক হল গত শীতকালে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন—তিনি আগামী শীত-কালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদলকে বিলাত যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—ঐ দলে তিনজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক আছেন—(১) সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক এস-কে-মিত্র এবং অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

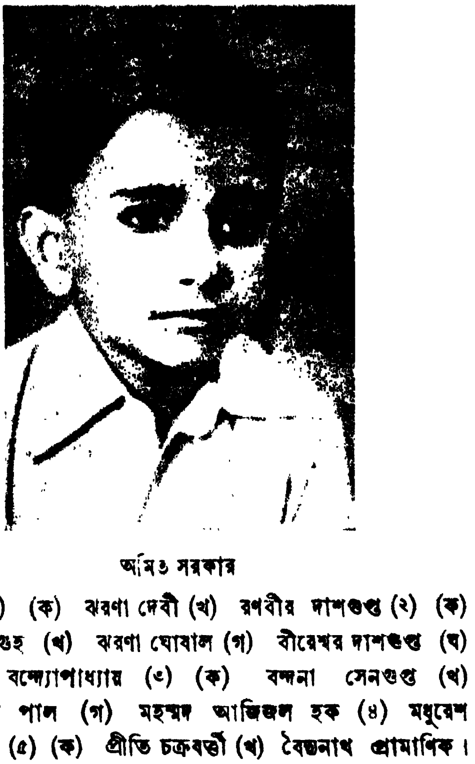
বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব—

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশ ভ্রমণ করিয়া যাইয়া এলাহাবাদ হইতে জানাইয়াছেন—চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও মুন্সীগঞ্জে খাদ্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক। শুধু চালের দাম যে বেশী তাহা নহে—খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক জিনিষের মূল্যই এত বেশী যে সাধারণ লোকদিগের পক্ষে তাহা ক্রয় করা কষ্টকর। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও বাঙ্গালা দেশ হইতে এলাহাবাদে ফিরিয়া গিয়া জানাইয়াছেন—বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষ এখনও চলিতেছে;

খাদ্যদ্রব্যের দাম অত্যন্ত অধিক—চাউল কোন কোন জিলায় এখনও ৪০ টাকা মণ, অনেক স্থানে ২৫ টাকা মণ। লণ্ডন হইতে সার ফেরোজ খাঁ নুন জানাইয়াছেন—ভারতে এখনও খাদ্যাভাব রহিয়াছে এবং গত বৎসরের মত আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। আমরা তিনজনের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিশোর আলেখ্য সম্মিলন—

কিশোর আলেখ্য সম্মিলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার্ষিক চিত্র ও গল্প প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—চিত্র বিভাগ—(১) গোপা চৌধুরী (২) ঝরণা দেবী (৩) অনিলচন্দ্র দত্তগুপ্ত (৪) অমলকুমার সেন (৫) মনোরঞ্জন ঠাকুর (৬) অমিত সরকার—(বয়স ৮ বৎসর)। গল্প ও কবিতা



অমিত সরকার

বিভাগ—(১) (ক) ঝরণা দেবী (খ) রণবীর দাশগুপ্ত (২) (ক) শোভারাণী গুহ (খ) ঝরণা ঘোষাল (গ) বীরেশ্বর দাশগুপ্ত (ঘ) রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) (ক) বন্দনা সেনগুপ্ত (খ) অমরেন্দ্রনাথ পাল (গ) মহম্মদ আজিজল হক (৪) মধুরেশ চট্টোপাধ্যায় (৫) (ক) প্রীতি চক্রবর্ত্তী (খ) বৈদ্যনাথ প্রামাণিক। ৮ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান অমিত সরকারের চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আনয়ন—

ভারত গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা কমিটি ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহার পর কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব সার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন—'গ্রেগরী কমিটী যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ভারতে আমদানী করিতে হইবে। যদি ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা না হয়, তবে ভারতের খাদ্যাভাব-জনিত সমস্যার জন্য আমি দায়ী হইব না।" আপাততঃ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে ৮ লক্ষ টন খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—সম্ভব হইলে পরে আরও খাদ্য প্রেরণের চেষ্টা করিবেন। তবুও ইহা আশার কথা।

কিশোরগঞ্জে ম্যালেরিয়া—

মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার সর্ব্বত্র ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক গৃহের প্রায় প্রত্যেক লোকই জ্বরে শয্যাগত। লোকের অভাবে আউস ধান কাটা যাইতেছে না এবং আমন ধান চাষেরও অসুবিধা হইতেছে। শুধু কিশোরগঞ্জে কেন, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রায় এই অবস্থা। অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে মানুষ বেশীদিন সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারে না। কাজেই যে কোন রোগ সহজেই বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিতেছে।

চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধি—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ জানাইয়াছেন…কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে, চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এতদিন প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক লোককে একপোয়া করিয়া চিনি দেওয়া হইত, এখন সেই স্থানে দেড়পোয়া চিনি দেওয়া হইবে। ঐ অতিরিক্ত চিনি দিয়া ধর্ম্মকার্য্য বা উৎসবের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। যাহা হউক, ইহা মন্দের ভাল।

কাপড়ের বাজার—

কাপড়ের বাজারে বে-আইনি কাজ করার জন্য গত ৩ মাসে কলিকাতা ১০৪ জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা করা হইয়াছিল। ৩১ জন বস্ত্রব্যবসায়ীর গুদাম পরীক্ষার পর ২৫ জনের লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে। চোরা বাজার বন্ধ করিবার জন্য এইরূপ শাস্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

মাদ্রাজে শিক্ষার জন্য দান—

মাদ্রাজে ডাক্তার আলগাপ্পা চেটিয়ার নামক একজন যুবক ব্যারিষ্টার সম্প্রতি শিক্ষা প্রচারের জন্য ১২ লক্ষ টাকা দান করায় সম্প্রতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি-এল্ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর—এত অল্পবয়স্ক লোকের পক্ষে এই দান অসাধারণ। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘজীবন কামনা করি।

দুগ্ধসমস্যা ও সরকারী ব্যবস্থা—

সমগ্র বাঙ্গালা দেশে দারুণ দুগ্ধ-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কি ভাবে যে দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাহার উপর সরকারী আদেশে এক জিলা হইতে অন্য জিলায় দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে কি দুগ্ধসমস্যার সমাধান হইবে?

মাখনলাল রায় চৌধুরী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয় কৃষ্টির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি পাইয়া আগামী অক্টোবরের প্রথমেই মিশরে গমন করিবেন। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃক তথায় তাঁহার অধ্যয়নের অনুমতি দিয়াছেন।

পরলোকে আলতাফ আলি—

ধনবাড়ীর নবাব স্বর্গত নবাব আলি চৌধুরীর পুত্র বগুড়ার নবাব মিঃ আলতাফ আলি এম-এল-সি গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আলি বাঙ্গালা সরকারের চিফ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। আলতাফ আলি সাহেবের রাজনৈতিক জীবন বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত।

পরলোকে বাহাদুর সিং সিংহী—

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনকুবের বাহাদুর সিং সিংহী মহাশয় গত ৭ই জুলাই মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসীদিগকে সুলভে খাদ্যদ্রব্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া



পরলোকে বাহাদুর সিং সিংহী

তিনি বাঙ্গালার সংস্কৃতির সাহায্যে বহু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অর্থে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে জৈন দর্শন অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্প ও সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে তিনি সারা জীবন নানা প্রচেষ্টায় সাহায্য দান করিয়াছেন। 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রভৃতি বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার দান ছিল।

রলোকে ব্রজলাল শাস্ত্রী—

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী মহাশয় গত ৮ই জুলাই ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জের বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হিন্দু আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দেশের শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার চেষ্টা বলবতী ছিল এবং দৌলতপুরে 'হিন্দু একাডেমী' নামক তিনি যে বিরাট কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। দৌলতপুরের কলেজ যে আদর্শে স্থাপিত তাহা সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়ার যোগ্য।

পরলোকে ডক্টর বিধুভূষণ রায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর বিধুভূষণ রায় গত ২৯শে জুলাই মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শুধু অসাধারণ পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছাত্রসমাজের অত্যন্ত 'প্রিয় ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি বরোদায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন।

পরলোকে লর্ড হার্ডিঞ্জ—

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ৮৬ বৎসর বয়সে গত ২রা আগষ্ট বিলাতের কেণ্টে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতে বড়লাট ছিলেন। তাঁহার সময়েই সম্রাট ভারত পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

জ্বালানির অভাব—

কলিকাতা ও সহরতলীতে কয়লার অভাব কিরূপ অধিক হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, সাধারণ গৃহস্থগণকে কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া কয়লা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহার বর্ণনা করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বহুদিন হইতে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এক বেলা রান্না করিয়া দুই বেলা খাইয়া থাকেন। অথচ বি-এন-রেলের কতকগুলি ষ্টেশনে যে পরিমাণ কাঠ চালানের জন্য জমা হইয়া আছে, সেই কাঠগুলি যদি কলিকাতায় আসিত তাহা হইলে লোকের কষ্ট অনেকটা কমিয়া যাইত। মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি রেল ষ্টেশনে কাঠ মজুত হইয়া আছে। যদি সেই কাঠ আনার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে লোক ৪।৫ টাকা মণের কয়লার পরিবর্ত্তে ১।০ মণে সেই কাঠ পাইতে পারে। কিন্তু কে তাহার ব্যবস্থা করিবে?

কর্পোরেশন ও ট্রাম—

কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীকে নোটীশ দিয়াছেন যে আগামী ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে তাঁহারা ট্রাম কোম্পানী কিনিয়া লইবেন। ট্রাম 'রেলওয়ে' সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে—সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের 'রেলওয়ে বোর্ড' হইতে কর্পোরেশনকে ট্রাম পরিচালনার উপযুক্ত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কর্পোরেশন হইতে এ বিষয়ে রেলওয়ে বোর্ডেও পত্র দেওয়া হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় যদি জনসাধারণ উপকৃত হয়—অর্থাৎ সুলভে যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়, তবেই লোক এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ দান করিবে

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীসমূহের ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। লাইব্রেরীয়ান ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় কলা বিভাগের 'রাণী বাগেশ্বরী রীডার' নিযুক্ত হওয়ায় বিশ্বনাথবাবু তাঁহার স্থানে লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজবন্দী পরিবারবর্গকে সাহায্য দান

কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার মেয়র কর্ত্তৃক সংগৃহীত সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ২৫ হাজার টাকা বাঙ্গালা দেশের ৫৬০ জন রাজবন্দীর পরিবারবর্গকে সাহায্য হিসাবে দান করা হইয়াছিল। শীঘ্রই আবার ১৫ হাজার টাকা ১২০ জন রাজবন্দীর পরিবারবর্গকে দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া যে ৮০ জন রাজবন্দীর পরিবারবর্গ উপযুক্ত সাহায্য পান নাই, তাঁহাদিগের জন্যও কিছু অধিক টাকা দেওয়া হইবে; মেয়র সাহায্য ভাণ্ডার হইতে কলিকাতার দরিদ্র অধিবাসীদের মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

গান্ধীজি ও বড়লাট—

মহাত্মা গান্ধী ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; লর্ড ওয়াভেল গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া বিলাতে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ জেমস্ ম্যাকস্টন এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—গান্ধীজি যে সমগ্র ভারতবাসীর অবিসংবাদিত নেতা ও প্রতিনিধি, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না। তাহা জানিয়াও বড়লাট তাঁহার সহিত সাক্ষাতে অসম্মত হইয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পরে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সম্পর্ক কি করিয়া মধুর থাকিবে তাহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। শুধু ভারতবাসীরা বড়লাটের এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বিলাতের লোকগণও মিটমাটের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন।

জব্বলপুরে নৃত্যগীতানুষ্ঠান—

জব্বলপুর বিদ্যার্থীসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২০শে মে বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'তরুণ সঙ্গীতবীথি'র শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক নানাবিধ নৃত্যগীতাদির একটি 'শো' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত জগদীশ বক্সী, কুমারী শুভা ব্যানার্জ্জী ও কুমারী গীতা মণ্ডলের সম্মিলিত 'গ্রেটহাঙ্গার' নৃত্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তৎসহ শ্রীযুক্ত হরদেব মুখার্জ্জীর সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত শঙ্কর ঘোষের 'অর্কেষ্ট্রা' সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত হেমন্ত চাটার্জ্জী, সুবোধ ঘোষ ও বিদ্যার্থী সঙ্ঘের অন্যান্য কর্ম্মীগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়া—

১৯৪৪ সালের প্রথম ৬ মাসে কলিকাতা সহরে শুধু ম্যালেরিয়া রোগে ১৪৬০ জন লোক মারা গিয়াছে। ৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল তাহাতে ১২ জন ও ১লা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ২৯ জন লোক মারা গিয়াছে। যে ম্যালেরিয়া ভয়ে লোক যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলিকে জনশূন্য করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল, সেই ম্যালেরিয়া যদি কলিকাতা সহরেও ক্রমে ব্যাপক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে লোক শেষ পর্য্যন্ত কোথায় যাইবে?

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ—

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় রাজসাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। সম্প্রতি ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক



পণ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ

মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি সর্ব্বজনপ্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

সর্ব্বত্র অনাচার—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কে সি সম্প্রতি বেতারে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বাঙ্গালা দেশে প্রচুর পরিমাণ দুর্নীতি দেখা যাইতেছে। লোক যদি ঘুস গ্রহণ বা ঘুস প্রদানের সংবাদ—প্রমাণাদিতে গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা জানায় তাহা হইলে ইহার প্রতীকার হওয়া সম্ভব। দুর্নীতি এখন শুধু একটি প্রদেশে



জব্বলপুরে নৃত্যগীত শিল্পীবৃন্দ

প্রবল নহে। সিন্ধুদেশের মন্ত্রিমণ্ডল দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মুসলেম লীগ তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। আসামে ও লীগ মন্ত্রীসভা যে দুর্নীতিপরায়ণ তাহা 'সিলেট ক্রনিকেল' পত্রে বিস্তৃত ভাবে

প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা, সিন্ধু ও আসাম—তিনটি প্রদেশেই লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বর্ত্তমান এবং এই তিনটি প্রদেশেই দুর্নীতির পরিমাণ অধিক। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—আসাম ও বাঙ্গালায় ব্যবস্থা পরিষদের ইংরাজ সদস্যগণ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষই সমর্থন করিতেছেন।

'বসুমতী'র দান—

বসুমতীর সত্ত্বাধিকারী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী তাঁহার পরলোকগত পুত্র রামচন্দ্র এবং কন্যা প্রীতির স্মৃতিরক্ষাকল্পে খড়দহ রহড়া গ্রামস্থিত তিনখানি বাগান বাড়ী, তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, নগদ দশ হাজার টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের অন্যান্য দ্রব্যাদি রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন শীঘ্রই ঐ স্থানে "রাম-প্রীতি বয়েজ হোম" নামে অনাথ আশ্রম স্থাপন করিবেন। সতীশচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রকন্যার স্মৃতি বঙ্গবাসীর অন্তরে চিরজাগরূক থাকুক।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবতা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

রবীন্দ্রনাথ অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে সব নরনারী আভিজাত্যের গৌরব করতে পারে না, অর্থাৎ যারা সমাজের অবহেলা কিংবা অবজ্ঞার পাত্রপাত্রী তাদের কথা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। সমাজের অবহেলিত, অবজ্ঞাত সামান্য বা সাধারণ যারা—তারা রবীন্দ্রসাহিত্যে সম্মানিত। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা ও চরিত্রমাহাত্ম্য ভাষা পেয়ে অপরূপ ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। কারণ, এমনি সব সাধারণ নগণ্য জনগণের প্রতি কবির ছিল অসাধারণ সহানুভূতি। এমনি অসাধারণ সহমর্মিতার বশে কবি হতভাগ্যদের প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন—সামান্যের মধ্যেও অসামান্যতার আবিষ্কার করেছেন। তিনি দরিদ্রকে, অতি সামান্য সাধারণ ব্যক্তিকেও মর্যাদা দান করে গিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। তাদের অন্তরের মাধুর্য, চরিত্রের মহনীয়তা ও উদারতা কবির সন্ধানী দৃষ্টিকে এড়ায় নি।

রবীন্দ্রনাথ নিছক ভাববিলাসী কবি ছিলেন না। তিনি কেবল লোটাস-ঈটার নন। যদিও কবি তার প্রথম যৌবনে লিখেছিলেন—

> হেথা এই আকাশের কোণে
> টলমল মেঘের মাঝার,
> এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
> তোর তরে কবিতা আমার!

এবং ব্যঙ্গ করে আর একবারও বলেছিলেন—

> আকাশ মাঝে জাল ফেলে, তারা ধরাই ব্যবসা;
> কাজ কি আমার ভবের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা।

কিন্তু কবি তাঁর কল্পনাকে, মানসসুন্দরী কাব্যপ্রিয়াকে নিয়ে চিরদিন 'টলমল মেঘের মাঝারে' যে বাস করেন নি এ আমরা দেখেছি। তাঁর কাছে কতদিক থেকে কতবার কর্তব্যের আহ্বান এসেছে। কবি সেই আহ্বান উপেক্ষা করেন নি। সেইজন্য তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে মানবতার সুর। তিনি তখন—

> ছোট প্রাণ, ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখকথা
> নিতান্তই সহজ সরল,
> সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি'
> তারি দুচারিটি অশ্রুজল—

এই সবকে ভাষায় অভিব্যক্ত করেছেন। ভাবজগৎ আর কল্পনা-বিলাস থেকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার মাঝখানে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য তিনি যেন ব্রাউনিঙের sordello-র মত অসীম আগ্রহভরে বলে উঠেছেন—

> Here is the crowd
> Whom I with freest heart
> Offer to serve!

এবং তখন ম্লান মূক নতশির জনগণের বেদনায় করুণ কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন, অথবা তাদের মধ্য থেকেও উদারতা মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণের আবিষ্কার করেছেন।

কবির মনের মন্দিরে সকলেরই স্থান ছিল। অসুন্দর বা ছোট বলে কাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন নি। সমাজ যাদের ছোট বলে মনে করেছে, যাদের অবজ্ঞা করেছে, কবি তাঁর কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে তাদের মধ্যেও সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে সুন্দরের উজ্জ্বল মূর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। বাইরের দীনতা যে মানুষের প্রকৃত রূপ নয়, একথা কবি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। কবি হলেও তাঁর মন যে নিছক কল্পনাপ্রবণ ছিল না—সহানুভূতিতে তার অন্তর যে পরিপূর্ণ ছিল, এ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই দেখি তাঁর কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের চরিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হয়েছে। সে তার মনিবের সেবা করেছে অকাতরে। কিন্তু তার ফলে সে পেয়েছে ভর্ৎসনা। তার মনিব তাকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন—'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে!' কিন্তু পরদিনই আবার—'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!' শত ভর্ৎসনাতেও মনিবের সেবায় তার ত্রুটি ঘটে নি। শত লাঞ্ছনা সয়েও তার—

> প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত!

মনিবের সেবা করা তাকে যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে।

এই কৃষ্ণকান্তের মনিব যখন শ্রীধামে গিয়ে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন তখন—

> বন্ধু যে-যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
> আমি একা ঘরে ব্যাধি খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।

কিন্তু সেই বিপদের দিনে একমাত্র কৃষ্ণকান্তই তার মনিবের সেবা করেছে অক্লান্তভাবে!

> নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে তখন—

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত।
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাহি ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।

কৃষ্ণকান্তের সেবায় তার মনিব রোগমুক্ত হলেন। কিন্তু সেই বিষম রোগে আক্রান্ত হলো তাঁর চিরসাথী ভৃত্য। মনিবকে সুস্থ করে তুলে সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলে। তার নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি আর অকপট অক্লান্ত সেবার আদর্শ রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্য আরও অনেক স্থানে মর্যাদা-প্রাপ্ত হয়েছে। কবির 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভৃত্য শঙ্কর একাধারে বহুগুণে গুণান্বিত। শৌর্য, বাৎসল্য, আত্মসম্মানবোধ, রাজভক্তি এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছে এই চরিত্রে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের ভৃত্য রাইচরণের চরিত্রও অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তার বাৎসল্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। ত্যাগের মহিমায় ও বাৎসল্যে রাইচরণের চরিত্র অতুলনীয়।

কবির নিজের ভৃত্য মোমিন মিঞা "চৈতালি" কাব্যের 'কর্ম' নামক কবিতায় মর্যাদা লাভ করেছে। ভৃত্যরূপে যার সঙ্গে কবির কেবল প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল, তার মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন চিরন্তন কালের শোকার্ত পিতাকে। ভৃত্য তার কর্তব্যকর্ম সমাপন করে নি বলে কবি তাকে প্রথমে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন যে 'কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই'—সেই মুহূর্তে তিনি আর তাঁর ভৃত্যকে তিরস্কার করতে পারেন নি। তার বেদনার করুণ কাহিনী কবির হৃদয়কে স্পর্শ করলো, কবি বুঝলেন—"ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল। মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল,—সে হলো প্রত্যক্ষ, সে হলো বিশেষ।... সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিললো। প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হলো বাস্তব।" যতদিন প্রয়োজনীয়তার আবরণে কবির ভৃত্য মোমিন মিঞা ঢাকা ছিল ততদিন তার মধ্যে কোনো বিশেষত্বই কবি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু ভৃত্যের মর্মান্তিক শোকের কথা শুনে কবি তার মধ্যে বিশেষত্ব দেখতে পেলেন। সেও যে মানুষ, তারও যে ব্যথা বেদনা আছে একথা তিনি উপলব্ধি করলেন—পিতৃহৃদয়ের মর্মান্তিক শোককে তিনি মর্যাদা দান করলেন।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প 'পোষ্টমাষ্টারে'র কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেখানেও দেখি যে পরিচারিকা গ্রাম্য বালিকা রতনের সঙ্গে কলিকাতার ছেলে পোষ্টমাষ্টারের নিতান্ত প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল। পোষ্টমাষ্টার বুঝতেন যে তিনি যখন গ্রাম থেকে অন্য কোথাও বদলী হয়ে যাবেন তখন রতন অন্য কোনো প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে কাজ করবে। তাই তিনি রতনকে বলেছিলেন—"রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব—তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন। আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।"—কথাগুলি স্নেহগর্ভ এবং সহানুভূতিপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পল্লীবালিকা পোষ্টমাষ্টারের ঐ অনুগ্রহটুকুকে অনায়াসে উপেক্ষা করেছে। সে বলেছে—"না না, তোমায় কাউকে কিছু বলতে হবে না! আমি থাকতে চাই নে!"

রতনের এমনি উপেক্ষায় পোষ্টমাষ্টার অবাক হলেন। কারণ সেই নির্জন পল্লীকুটীরে রতন এবং তাঁর মধ্যে যে একটি অপরূপ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে কথাটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীবালিকা রতনের অন্তর-রহস্য বুঝেছেন—প্রয়োজনের সীমার বাইরে নারীহৃদয়ের যে মহিমাটুকু এবং যে ব্যথা-বেদনাটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে ভাষা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি', 'সামান্য ক্ষতি', 'কাঙালিনী' প্রভৃতি কবিতা সমাজের দুর্গত অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ। 'দুই বিঘা জমি'র উচ্ছিন্ন মালিক উপেনের চরিত্র কবির মনকে স্পর্শ করেছে। অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারে প্রপীড়িত কাঙালের অন্তর-বেদনা, এই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমনি অবিচার অত্যাচার আমাদের দেশে কত হচ্ছে। কবি বলেছেন—

এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

'সামান্য ক্ষতি'শীর্ষক কবিতাতেও দুর্গত ও অত্যাচারিত গৃহহীন পল্লীবাসীদের প্রতি কবির সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয়েছে। কাশীর মহিষী করুণার হঠকারিতায় একখানি গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। রাণী স্নান সমাপন করে ফিরে এলে পর—

গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে

এবং তারা নৃপতির কাছে—

দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সমস্ত অনুসন্ধান করে কাশীরাজ যখন জানতে পারলেন যে রাণীর হঠকারিতায় দরিদ্র প্রজাদের এমনি দুর্দশা হয়েছে আর সেজন্য রাণীর কিছুমাত্র অনুতাপ বা অনুশোচনা হয় নি এবং রাণীর অন্তরে সমবেদনারও লেশটুকুও নেই বরং বিদ্রূপভরে রাজমহিষী বললেন যে—

গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটীর।
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর।
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।

তখন রাজমহিষীর এমনি আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা তাঁর মহিষীকে বৎসরকালের জন্যে নির্বাসন দিলেন এবং বললেন—

যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটীরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।

রাণীকে তখন ভিখারী নারীর চীরবাস পরিধান করতে হলো—তাঁকে রাজপ্রাসাদ হতে বহিষ্কৃত করে দিয়ে রাজা বললেন—

এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে কটি কুটীর হলো ছারখার
যতদিনে পার সে কটি আবার
গড়ি' দিতে হবে তোমারে।

বৎসরকাল দিলেম সময়
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতি
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটীর নাশিয়া!

কাশীরাজের এমনি পক্ষপাতশূন্য বিচার, আর দীন গৃহহারাদের প্রতি রাজার সমবেদনা কবি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল।

'কাঙালিনী' আর 'শিশু' কাব্যের "সুখ-দুঃখ" কবিতায় অনাথিনী কাঙালিনী বালিকার অন্তরবেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' নামক কবিতায় একবস্ত্রা অতিদীনা ভিখারিণী নারীর দানই শ্রেষ্ঠ দানের মর্যাদা লাভ করেছে। কারণ এ দান তার ভোগোদ্বৃত্ত যৎসামান্য দান নয়—এ তার সর্বস্ব দান। সে তার একমাত্র বস্ত্র দান করেছে মহৎ ত্যাগের আবেগে। 'পূজারিণী' কবিতায় পরিচারিকা শ্রীমতী সকল বিপদকে তুচ্ছ করে বুদ্ধের স্তূপপদমূলে অর্ঘ্য রচনা করেছে এবং মৃত্যুকে বরণ করে মহৎ আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের মহিমা অর্জন করেছে।

'মানসী'র 'বধূ' কবিতাটি কবিহৃদয়ের অসীম সমবেদনা ও দরদ দিয়ে লেখা। গ্রাম্য বালিকা এতদিন পল্লীপ্রকৃতির কোলে আর আত্মীয়স্বজনের কাছে ছিল। সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নগরের পাষাণ কারার মধ্যে বন্দী করার নির্মম এবং কঠোর সমালোচনা এই কবিতাটি। পল্লীপ্রকৃতি এবং চিরপরিচিত আত্মীয়দের মধ্য থেকে নগরের নিরসতার মধ্যে এবং অপরিচিতদের মধ্যে এসে পড়লে বালিকা বধূর মনে যে বেদনা অহরহ পীড়া দিতে থাকে কবি সেই করুণ এবং মর্মস্পর্শী কাহিনী এই কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রাম্য বালিকা-বধূর বেদনাতে কবি নিজে সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং সেই সূত্রে আমাদেরও সহানুভূতি উদ্রেক করিয়েছেন।

কবির 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কাবুলিওয়ালা—সেও তুচ্ছ নয়। সে খুনে বটে। খুনের দায়ে তার কারাবাস পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও কবি চিরন্তন কালের পিতাকে আবিষ্কার করেছেন—সুদূর-প্রবাসী পিতার অন্তরস্থিত কন্যাস্নেহকে মূর্ত করে তুলেছেন।

কবির কাব্যে গল্পে পতিতাও মর্যাদা লাভ করে ধন্যা হয়েছে। পতিতার প্রতিও কবির অসীম সহানুভূতি ছিল। পতিতার মধ্যেও কবি দেখেছেন—

জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব নীরব প্রীতি।

রূপোপজীবিনী বারবনিতার বাইরের ছলনাময়ী মোহিনী মূর্তির অন্তরালেও যে এক অপার্থিব সৌন্দর্য থাকতে পারে কবি তা উপলব্ধি করেছিলেন। পতিতার মধ্যেও কবি নারীত্ব ও দেবীত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। কবির 'পতিতা' কবিতায় কবি বলেছেন যে পতিতা নারী অনুকূল অবস্থা পেলে পবিত্র হয়ে উঠতে পারে। পাপের অন্তরায়ে পতিতার আত্মা কলুষিত হতে পারে। কিন্তু তার আত্মা একেবারে বিনষ্ট হয় না। অনুকূল অবস্থায় তার নারীত্বের বিকাশ হতে পারে। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির কাছে সম্মান ও নারীর মর্যাদা লাভ করে পতিতাও নারীত্ব ও দেবীত্বের মহিমায় মহিমাময়ী হয়ে উঠেছে। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রশংসাগাথা শুনে পতিতা রমণীর অন্তরে তার গতজীবন সম্বন্ধে অনুশোচনা হয়েছে—সে নবজীবন লাভ করে ধন্যা হয়েছে। পতিতার নবজীবনলাভের আনন্দ ঐ কবিতার প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পতিতা তার নিদ্রিত নারীত্বকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখে বলেছে—

প্রথম রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি',
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী।

এতদিন পতিতার মনঃসম্পর্কশূন্য দেহটার উপাসনাই সকলে করেছিল—

মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ-দেহখানি,—

কিন্তু তার অন্তরে যে নারীত্ব দেবীত্বও আত্মগোপন করে এতদিন ছিল তার সন্ধান কেউ পায় নি—

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

ঋষিকুমারই পতিতার নারীত্বের প্রথম পূজারীরূপে তার প্রচ্ছন্ন পবিত্রতাকে প্রকট করে তুলেছেন। পতিতার কলুষ-তামস জীবন ঋষিকুমারের পবিত্র প্রেমের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তখন—

নিমেষে দৌপ্ত নির্মলরূপে
বাহিরিয়া এলো কুমার নারী!

তখন একমুহূর্তে বারবনিতা পবিত্রা নারীতে পরিণত হয়েছে। তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন নারীত্ব ও দেবীত্বের বিকাশ হয়েছে।

'বিচারক' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ পতিতার মধ্যে এমনি অসামান্যতার সন্ধান পেয়েছেন। ঐ গল্পে দেখি যে হেমশশী একবার স্খলিত হয়ে তার পর থেকে ক্রমাগত নিজেকে "বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার" করেছে। কিন্তু সেই হেমশশী যেভাবে তার প্রথম প্রণয়ের নিদর্শন অঙ্গুরীয়কটি সযত্নে রক্ষা করেছে, তা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

এ ছাড়া, পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক যে আখ্যায়িকাতেই কবি পতিতার মধ্যে অসামান্যতার সন্ধান পেয়েছেন তাকেই তিনি ভাষা দিয়ে গিয়েছেন। সাধক কবীরের মহৎ জীবনের মহিমায় পতিতার মধ্যে নারীত্বের উন্মেষ হয়েছিল। 'কথা' কাব্যের 'অপমান বর' শীর্ষক কবিতায় সেকথা আছে। সেখানে দেখি যে পতিতা রমণী পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে এসে নারীত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সামান্য কুলে—পতিতার গর্ভে গোত্রহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকলে সে যে দ্বিজোত্তম বলে সমাদৃত হইবার যোগ্য এ জিনিসটিও কবি বলে গিয়েছেন। 'কথা'র 'ব্রাহ্মণ' নামক কবিতাটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পতিতা যেমন মর্যাদা লাভ করে ধন্যা হয়েছে, অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ও তাঁর সাহিত্যে মর্যাদা লাভ করেছে। কবি অস্পৃশ্য এবং অনুন্নতদের মধ্যেও অপরূপের সন্ধান

পেয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি অসীম সমবেদনা জানিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে সতর্ক চেতন করে দিয়ে অস্পৃশ্যদের মর্যাদা দান করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

অস্পৃশ্য জনসাধারণকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রেখে মন্দিরে বসে বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করলে সে প্রণাম জগৎ-নাথের চরণে পৌঁছয় না। কারণ—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমার প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে।

কবি অন্যত্রও বলেছেন—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

কবি দরিদ্র জন—মজুরদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে লিখেছেন—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করচে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ
খাটচে বারো মাস
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয়রে ধূলার পরে।

কবি তার 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'তে এই জিনিসটি আরও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে গিয়েছেন। সেখানে দেখি যে সকলেই চণ্ডালী প্রকৃতির স্পর্শ এড়িয়ে চলেছে। যাঁরা এমনিভাবে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় না, মানুষকে অস্পৃশ্য ও অবনমিত করে রেখে দেয় তাদের উদ্দেশ্য করে কবি বহু পূর্বেই বলেছিলেন—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে,
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

প্রকৃতি নিজেকে অস্পৃশ্যা বলে যখন বুঝলে, তখন অভিমান-ভরে গেয়ে উঠলো—

যে আমারে পাঠাল এই
অপমানের অন্ধকারে,
পূজিব না পূজিব না, সেই দেবতারে পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল তারে?
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্‌কারে!

এই যে অভিমানভরা কথা, এ ত কেবল প্রকৃতির একার কথা নয়! এর মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতের অবহেলিত অবনমিত অস্পৃশ্যদের অন্তরবেদনা ভাষা পেয়েছে।

কিন্তু এই প্রকৃতিকে মানুষের মর্যাদা দান করেন বুদ্ধশিষ্য আনন্দ। প্রকৃতি একদিন কূপের ধারে জল তুলছিল, এমন সময় বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে প্রকৃতির কাছে জল প্রার্থনা করলেন। কিন্তু প্রকৃতি যে চণ্ডালী—সে যে অস্পৃশ্যা এ কথাটি অনেকেই ইতিপূর্বে তাকে জানিয়ে দিয়েছিল। তাই সে অতি বিনীতভাবে এবং কুণ্ঠার সঙ্গে গাইলে—

ক্ষমা করো মোরে ক্ষমা করো মোরে
আমি চণ্ডালের কন্যা
মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব কূপের জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী।
আমি চণ্ডালের কন্যা।

কিন্তু প্রকৃতির সকল কুণ্ঠা দূর করে আনন্দ গাইলেন—

যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কন্যা,
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।

এ কথার পরে চণ্ডালী প্রকৃতির সকল দ্বিধা আর সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। সে উল্লসিতা হয়ে আনন্দকে জল দিল পান করতে। সেদিন প্রকৃতির অন্তরের সকল গ্লানি দূর হয়ে গেল। তার হৃদয়-বীণার তারে শততন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠলো—সে উৎফুল্ল হয়ে গেয়ে উঠলো—

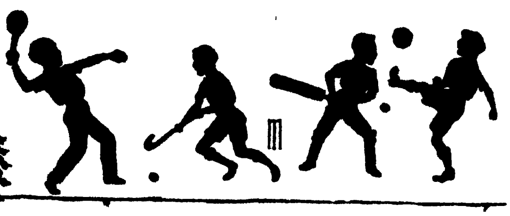
ফুল বলে, ধন্য আমি,
ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা
আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে
নাই ধূলি মোর অন্তরে।

প্রকৃতির এই গানের মধ্য দিয়ে কতবড় কথা কবি আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন! ফুল ধূলায় জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু ফুলের অন্তরে তো ধূলা থাকে না, সে চির-পবিত্র—চিরসুন্দর। সেই ফুল যদি পূজায় লাগ্‌তে পারে তবে প্রকৃতির মত অস্পৃশ্যদের দোষ কি? প্রকৃতি অস্পৃশ্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলে, তার অন্তরেও যে ধূলা থাকবে এমন কোনো কথা নেই। সে শুভ্র পবিত্র ও সুন্দর—এই কথাই কবি জানাতে চেয়েছেন এই নাটিকার মধ্য দিয়ে।

কবির কাছে এইভাবে পতিতা, অস্পৃশ্য—সমাজের অবহেলিত অবনমিত, অত্যাচারিত ও সাধারণ স্তরের নরনারী সহানুভূতি এবং সমবেদনা লাভ করেছে। কবি সকলকেই তাঁর সাহিত্যে মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর 'পলাতকা' কাব্যের সমস্তটাই এমনি তুচ্ছ নগণ্য জনসাধারণের প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ—এই কাব্যে অতি সাধারণ নর-নারীর অন্তরবেদনা অপরূপভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এইরূপে কবি তাঁর কত রচনায় কত জায়গায় যে সমাজের সামান্য সাধারণ নরনারীর মধ্যে কত অসামান্যতা ও অসাধারণত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন তার আর অন্ত নেই। সমাজের সামান্য সাধারণ যারা—রবীন্দ্রসাহিত্যে তারা অসামান্য অসাধারণ।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল ঃ

লীগ খেলা এবারের মত শেষ হ'ল। গতবারের লীগ বিজয়ী জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব এবারও তাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে লীগ বিজয়ী হ'য়েছে। তাদের শেষ খেলায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উত্তেজনার অন্ত ছিল না কে লীগ পাবে, তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে গঠিত মোহনবাগান ক্লাব, না ভারতের মুসলমান খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী মহমেডান।

মোহনবাগান লীগে খেলা সুরু ক'রেছিলো খুব ভাল। ইষ্টবেঙ্গল বিজয়ী মহমেডানকে এবং পরে আবার ইষ্টবেঙ্গলকে হারিয়ে তারা শীর্ষস্থানে উঠে। শেষে কিন্তু বি এণ্ড রেলের কাছে ১ গোলে হেরে যায়। খেলার শেষ পনর মিনিট গোল শোধ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছে। এ হারাতে দুঃখের কিছু নেই। লীগের পরবর্ত্তী খেলায় প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। এত চমৎকার টীম ওয়ার্ক সমস্ত লীগ খেলার মধ্যে মোহনবাগানের আর হ'য়েছিল কিনা সন্দেহ যদিও মোহনবাগান মাত্র এক গোলে বিজয়ী হ'য়েছিলো। রেল দলের গোল রক্ষকের খেলা উচ্চ প্রশংসনীয়। মোহনবাগানের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় প্রাণ দিয়ে খেলেছে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে। মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গেও তাদের খেলা বিজয়ী দলের মতই হয়েছিলো। লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের কয়েকটি খেলায় মোহনবাগান অত্যন্ত হতাশ ক'রেছে যদিও এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাদের একজন খেলোয়াড় জখম হওয়ার জন্য হয় মাঠে নামতেই পারেন নি—নয়ত নামলেও সাধারণ খেলা খেলতে পারেন নি ; তবে আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, লীগের একেবারে নিম্নস্থান অধিকারী টীমগুলির সঙ্গেই খারাপ খেলেছে। আর অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় তো 'ওভার কনফিডেন্স' হওয়ার জন্যে। ওদিকে আবার ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডানের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় তারা অদ্ভুত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। মোহনবাগান-মহমেডান খেলা এবার লীগের সবচেয়ে আকর্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এরিয়ান্সের কাছে সেমসাইড গোলে হেরে গিয়ে মোহনবাগানের এমন অবস্থা হ'লো যে, এ খেলায় যদি মহামেডান ড্র ক'রে তাহ'লেও তারা লীগ পাবে। কাগজ মারফৎ খবর পাওয়া যায় যে, সেদিন ৮টা থেকে মাঠে লোক যেতে সুরু করে। হাজার হাজার লোক টিকিট না পেয়ে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে সমস্ত রোদ মাথায় নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলো। মহমেডান খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে আত্মরক্ষা ক'রে খেলতে গিয়ে ভুল ক'রলো। অন্যদিকে মোহনবাগান ভাবলে যে, ড্র ক'রলেও যখন লীগ হাতছাড়া হবে তখন



অনিল দে হেড দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন

সে ড্র হারারই সামিল তাই তাদের সমস্ত খেলোয়াড় এগিয়ে এসে মহমেডানদের রক্ষণভাগকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুললে। আর এরই ফলে

মহমেডান দলের রক্ষণভাগ পরাজয় স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'লো। সেদিন খেলার মাঠে বাঙ্গালীর সে আনন্দের কথা বলবার নয়। উপসংহারে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, মোহনবাগানের মত অন্যান্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় ভেবেছিলেন যে, বাঙ্গলার বাইরের থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করবার দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাঁরা যদি স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগ ও সুবিধা দেন তাহ'লে তাঁরাও সত্য সত্যই বিজয়ীর সম্মান লাভ ক'রতে পারবেন।

মোহনবাগানের রক্ষণভাগে মান্না ও শরৎদাস চমৎকার খেলা দেখিয়েছেন। ক'লকাতা মাঠে তাঁদের তুল্য ব্যাক একই ক্লাব দুজন নেই এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ছিলো না। শরতের positional play অদ্ভুত; তা ছাড়া তিনি খুব ধীর মস্তিষ্কে খেলেন। অন্যদিকে মান্না ট্যাকলিং ও ট্যাপিংয়ে অদ্বিতীয়। দুজনেই অত্যন্ত দ্রুতগামী ও খুব সাহসী। একাধিক ম্যাচে মান্না চতুর্থ হাফব্যাক হিসাবে খেলেছেন। হাফব্যাক তিনজনেই খুব পরিশ্রমী। আরও প্রথম কয়েকটি ম্যাচে বেশ ভাল খেললেও পরে বল যোগানোর ক্ষমতা হ্রাস পায়। অধিনায়ক অনিল দের ওপনিং খুব ভাল বিশেষত খেলার শেষ দিকে ফরওয়ার্ডদের অজস্র বল জুগিয়ে একাধিক ম্যাচে খেলার মোড় তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অধিনায়কের এই দায়িত্বই সবচেয়ে বড় কথা আর এর জন্য তাঁর প্রশংসা ক'রতেই হবে। শরৎদাস আহত হবার পর নূতন ব্যাকের সঙ্গে খেলে তিনি স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেন নি। ফরওয়ার্ড লাইনে নির্মল চ্যাটার্জ্জির খেলা সবচেয়ে ভাল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও রাইট ইন আর একটু ভাল হ'লে মোহনবাগান চ্যাটার্জ্জির নিখুঁত সেণ্টার থেকে অজস্র গোল ক'রতে পারতো। নিমু বোস প্রথমে এত ভাল খেলতে আরম্ভ করেন যে, আশা হ'য়েছিলো নিঃসন্দেহে এবার তাঁকে সবচেয়ে ভাল লেফট ইন বলা যাবে। লীগের প্রথম ভাগে মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গল ম্যাচে তাঁর খেলা অতুলনীয় হ'য়েছিলো; কিন্তু পরবর্ত্তী ম্যাচগুলিতে হতাশ ক'রেছেন। বি বোসের ইনম্যানদের সঙ্গে আদান প্রদান চমৎকার। দুপায়ে বেশ ভাল সট আছে কিন্তু গোল দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বল আয়ত্তে রাখবার দক্ষতা নেই এবং এই সময়ে পাশ গ্রহণ করবার পদ্ধতিও নির্ভুল নয়। হেডিং অত্যন্ত দুর্ব্বল। কে রায় অদ্ভুত পরিশ্রমী। লেফটে প্রথমে নির্ম্মল ও পরে ভৌমিক উল্লেখযোগ্য খেলেছেন।

প্রথম বিভাগ লীগ তালিকা

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
মহমেডান স্পোর্টিং	২৪	১৮	৩	৩	৪২	৮	৩৯
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	১৪	৬	৪	৪৪	১৮	৩৪
বি এণ্ড এ আর	২৪	১৩	৫	৬	২৭	২৩	৩১
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	২৪	৭	৯	৮	৩০	২০	২৩
এরিয়ান্স	২৪	৮	৬	১০	১৬	২২	২২
ক্যালকাটা	২৪	৮	৫	১১	২৪	৩৯	২১
ভবানীপুর	২৪	৬	৯	৯	২২	১৯	২১
কালীঘাট	২৪	৮	৩	১২	১৮	৩১	১৯
এরিয়াল	২৪	৩	১১	১০	১৫	২৫	১৭
ডালহৌসী	২৪	৭	৬	১৪	২৮	৪৮	১৭
রেঞ্জার্স	২৪	৪	৬	১৪	১৭	৩৫	১৪
পুলিস	২৪	৩	৮	১৩	১০	৩৫	১৪

দ্বিতীয় ডিভিসন

রবার্ট হাডসন	১৫	১৩	২	০	৩১	৪	২৮

তৃতীয় ডিভিসন

উত্তরপাড়া স্পোটিং	১৫	১২	১	২	২৯	১২	১৫

চতুর্থ ডিভিসন

বেঙ্গল এ সি	১৪	১২	৩	০	৪১	৫	২৭

আই এফ এ শীল্ড ঃ

বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ২-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত ক'রে এবারের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। তারা ইতিপূর্ব্বে কখনও ফাইনালে উঠতে পারে নি। ইষ্টবেঙ্গল এইবার নিয়ে পর পর তিনবার ফাইনাল খেলল। কে দত্তের অদ্ভুত গোলকিপিং ও ভাগ্য ভাল থাকায় ইষ্টবেঙ্গল মাত্র দু গোলে হেরেছে। রেল দল যে ভাবে খেলেছে তাতে তাদের অন্ততঃ চার গোলে জয়ী হওয়া উচিত ছিলো। খেলার প্রথম ভাগে ইষ্টবেঙ্গল দু' একবার ভাল আক্রমণ চালিয়েছিলো এবং রক্ষণভাগ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলছিলো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে এস বোস, নন্দী ও আলাউদ্দীনের উপর্য্যুপরি আক্রমণ ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে। বোসকে নিঃসন্দেহে সেদিন মাঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা যেতে পারে। নন্দী ও আলাউদ্দীন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলেছেন। তাঁদের বাধা দেওয়া ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের পক্ষে অসম্ভব হয়। তুলনায় নন্দীই শ্রেষ্ঠ। তাঁর সেণ্টারগুলি অধিকাংশই নিখুঁত ও বেশ কার্য্যকরী। রেল দলের সেণ্টার হাফে মোহিনী ব্যানার্জ্জি ফরওয়ার্ডদের খুব চমৎকারভাবে খেলিয়েছেন। গোলে পি ঘোষ এই রকম খেলা রাখতে পারলে শীঘ্রই ক'লকাতার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলকিপার হ'তে পারবেন। ইষ্টবেঙ্গলের গোলে দত্তও শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে টীমকে রক্ষা ক'রেছেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আলাউদ্দীনের একটি সট তিনি যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে আটকেছিলেন তা স্থানীয় ফুটবল খেলায় বহুদিন দেখা যায় নি। রেল দলের ফরওয়ার্ড লাইনের বিরুদ্ধে ইষ্টবেঙ্গলের বাকী রক্ষণভাগ অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হ'চ্ছিলো। ব্যক্তিগতভাবে কে দত্ত ছাড়া ইষ্টবেঙ্গলের আর কোন খেলোয়াড় ভাল খেলা দেখাতে পারেননি। ফরওয়ার্ডদের মধ্যে বল আদান প্রদান অথবা হাফব্যাকদের সহযোগিতা প্রথমার্দ্ধে যা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে সকলেই হতাশ হ'য়ে পড়েন। অন্যদিকে রেল দলের নিখুঁত আদান প্রদান এবং ক্ষিপ্রতায় তাদের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের তুলনাই চলে না। ইষ্টবেঙ্গল ও বি এ রেলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তুলনায় রেল দলেই বেশী বাঙ্গালী খেলোয়াড়। মোহনবাগান লীগ পেয়েছে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের নিয়েই। ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান সেমিফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল এক গোলে জয়লাভ ক'রে। সেমিফাইনালের খেলা, বিশেষত মোহনবাগান

ইষ্টবেঙ্গলের মত দুই টীমের যে এত নিরুত্তমের হয় তা ধারণারও অতীত ছিলো। মোহনবাগান 'ওভার কনফিডেন্স হ'য়ে খেলা নষ্ট ক'রেছে। শীল্ডের অন্ত ম্যাচের সঙ্গে তুলনা ক'রলে সেদিন তারা মোটেই খেলতে পারেনি। ফরওয়ার্ড লাইনও কতকাংশে হাফ লাইনই এর জন্ত দায়ী। ইষ্টবেঙ্গল তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলেছে ; এর থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না।

২য় রাউণ্ডে মহমেডান অপ্রত্যাশিতভাবে রয়েল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ৩-১ গোলে হেরে যায়। আর ই টীম হিসাবে খুব শক্তিশালী নয় ; গোলকিপার আর লেফট্ ইন-ই প্রধান অবলম্বন। পরবর্ত্তী খেলাগুলিতে আর ই মোটেই আশানুরূপ খেলতে পারেনি এবং সেমিফাইনালে ৩-১ গোলে বি এণ্ড এ আরের কাছে হেরে যায়। ক্যালকাটার কাছে তাদের এবং মাইসোর রোভার্সের কাছে রেল দলের জয়লাভ সুপ্রসন্ন ভাগ্যের জন্ত। তাছাড়া এরা শারীরিক বলপ্রয়োগেরও একটু বাড়াবাড়ি ক'রেছিলো। মাইশোর রোভার্সের মুর্গেশ ভিজা মাঠে অতুলনীয় খেলা দেখিয়েছেন ; সেন্টার হাফে মহীউদ্দীনের খেলাও কম নয়। দুর্ব্বল রক্ষণভাগ তাদের পরাজয়ের অন্ততম কারণ। তাছাড়া তাদের দুজন খেলোয়াড় রেল দলের ফাউল গেমের জন্ত গুরুতররূপে জখম হয়। শীল্ডের অপর দিকে রবার্ট হাডসন একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিলো। এরিয়ান্সের কাছে পায়ের জোরে ২-১ গোলে জয়লাভ ক'রে তাদের বোধ হয় ধারণা হ'য়েছিলো যে, এই ভাবে খেলা চালিয়ে যেতে পারলে তাদের অগ্রগতি অনিবার্য্য। টীম হিসাবে তারা খুব খারাপ নয় এবং দু একজন খেলোয়াড় যে কোন প্রথম ডিভিসন টীমে খেলার যোগ্যতা রাখে। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম দিন ড্র ক'রে পরে ৩-০ গোলে তারা হেরে যায় কিন্তু দেব রায়কে গুরুতর ভাবে আহত ক'রে টীমের অত্যন্ত ক্ষতি করে। অবশ্য মারামারির ফলে তাদের দুজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

ফুটবল ঃ

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় খেলার পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধগুলি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ক'রে এবং আরও নূতন প্রবন্ধ দিয়ে মেসার্স এম সি সরকার এণ্ড সন্স (১৪নং কলেজ স্কোয়ার) ফুটবল খেলার একখানি সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর সচিত্র বই এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত নাটক "হালদার সাহেব"—২৲
ডক্টর বিমলাচরণ লাহা প্রণীত "জৈনগুরু মহাবীর"—১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জীবনের জয়গান"—।•
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত "বাঙ্গলা সাহিত্যের এক দিক"—৩।•
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "চেতনার অবতরণ"—১৲
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ইউরোপে" (ইংলণ্ড জার্ম্মাণি)—২।৶•
এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল প্রণীত "বাদশাহী গল্প"—৸•
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কবিতা পুস্তক "বৈশবীথি"—।•
শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত "মডার্ণ শকুন্তলা"—১।•
আবুল হাসানাৎ প্রণীত "বাংলা ভাষার সংস্কার"—১৸•
শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "জয় যাত্রা"—১৸•

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ৮ই আশ্বিন মহাপূজা আরম্ভ। সে জন্য আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষ ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে ভাদ্রের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। কার্ত্তিকের ভারতবর্ষ আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ,—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—রাধাচরণ বাগচী | হুমায়ুননামা | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



আশ্বিন—১৩৫১

প্রথম খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রাচীন কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি

বিগত ১৩৫০ সালে যে ভীষণ মন্বন্তর সমগ্র বাংলা দেশটিকে শ্মশানে পরিণত করিয়া গিয়াছে, আজিও তাহার জের মেটে নাই। সে সময়ে যাহারা কোনরূপে টিকিয়া গিয়াছিল, জীবনীশক্তি হ্রাসের ফলে আজ তাহারা রোগের সামান্য আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না, দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতেছে। রাজশক্তি দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু বাংলার অনেক অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অনেক চড়াদামে ধান্যাদি বিক্রীত হইতেছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। যাহা হউক, সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যও দ্রব্যগুলির স্বাভাবিক কালের মূল্য অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। আবার অনাবৃষ্টির জন্য বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এবারও ধান্যের অবস্থা শোচনীয়। সেজন্য দেশের ভবিষ্যৎ নিতান্ত আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। এই দুর্দ্দিনে প্রাচীন ভারতের দুর্ভিক্ষাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অনেকে প্রাচীন ভারত বলিতে "সোনার দেশ" এবং "রাম-রাজত্ব" বুঝিয়া থাকেন। এই ধারণা অবশ্যই সত্য নহে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন জনপদ সম্পর্কে দুর্ভিক্ষ, কুশাসন, অরাজকতা প্রভৃতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে কুরুরাজ্য (আধুনিক দিল্লী-মীরাট অঞ্চল) একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্তু ঋগ্বেদেও শান্তনুর শাসনকালে ঐ দেশে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাই। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পাঠে জানা যায়, একবার কুরুদেশ "মটচীহত" (বা "মটতীহত", অর্থাৎ শিলা বৃষ্টি বা পঙ্গপাল দ্বারা বিধ্বস্ত) হইলে ঐ দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে চক্রপুত্র উষস্তি নামক নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অন্নাভাবে আপনার "আটিকী" (অর্থাৎ, অপ্রাপ্তযৌবনা কিংবা বিদেশ ভ্রমণ সমর্থা) পত্নীর সহিত ইভ্যদিগের (সম্ভবতঃ, হস্তিপকদিগের) গ্রামে উপস্থিত হইয়া জনৈক ইভ্যের উচ্ছিষ্ট কুৎসিৎ মাষকলাই ভোজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের তপতী-সংবরণ উপাখ্যানে কুরু দেশের একটি অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের

উল্লেখ দেখা যায়। তপতীকে লাভ করিয়া রাজা সংবরণ দ্বাদশ বৎসর রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন নাই। "সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তাঁহার রাজধানী ও রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বর্ষকাল জলবর্ষণ করিলেন না। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্থাবর, জঙ্গম ও সমুদয় প্রজাবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনাবৃষ্টি হেতু এমন সুদারুণ সময় উপস্থিত হইল যে তখন পৃথিবীতে নীহার-বিন্দুও পতিত হইল না; শস্যোৎপত্তির সম্ভাবনা রহিল না। প্রজাগণ ক্ষুৎপীড়িত ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিগ্বিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজ্য ও রাজধানীস্থিত জনগণ নিরন্তর ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে মর্য্যাদাশূন্য হইয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজন পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দেশ নিরাহার, ক্ষুধার্ত্ত ও মৃতকল্প জনগণে পূর্ণ হওয়ায় প্রেত-পরিবৃতা যমপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল।"

জাতকাদি বৌদ্ধসাহিত্যেও বহু স্থলে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। বেস্সন্তর জাতক হইতে আমরা কলিঙ্গ (আধুনিক পুরীগঞ্জাম অঞ্চল) দেশের একটি অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের বিষয় জানিতে পারি। যাহা হউক, বিশাল ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রদেশের অগণিত দুর্ভিক্ষের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে আমরা কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত দুই চারিটি দুর্ভিক্ষের কথা বলিব। কারণ, ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরই একমাত্র দেশ যাহার প্রাচীন যুগে লিখিত যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত মহাপ্রাজ্ঞ কহ্লণপণ্ডিতকৃত রাজতরঙ্গিণীর কথা বলিতেছি। এই ইতিহাস গ্রন্থের প্রথমাংশ সুব্রত, ক্ষেমেন্দ্র, নীলমুণি, হেলারাজ, পদ্মমিহির এবং ছবিল্লাকর প্রমুখ কাশ্মীরের একাদশজন প্রাচীন ঐতিহাসিকের গ্রন্থের সাহায্যে রচিত হইয়াছিল। উহার শেষাংশ রাজশাসনাদির সাহায্যে কহ্লণ স্বয়ং সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজতরঙ্গিণীর দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাঠকালে অনেক স্থলেই বাংলার ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা স্মৃতি পথে জাগরূক হয়।

আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কাশ্মীর দেশে তুঞ্জীন নামে জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। সাধ্বী বহুষ্টমা তাঁহার মহিষী ছিলেন। এই রাজার শাসনকালে কাশ্মীর দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। "শরৎকালে মাঠে প্রচুর ধান্য পাকিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ ভাদ্রমাসে সেই শস্যের উপর রাশি রাশি বরফ পড়িতে লাগিল। প্রলয়কালীন মহাকালের অট্টহাস্যের ন্যায় সেই হিমরাশি পড়িতে থাকায় প্রজাদের জীবনাশার সহিত সমুদয় ধান্য বরফে ডুবিয়া গেল। ফলে এমন নরকের ন্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে ক্ষুধার্ত্ত জনগণ প্রেতের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। লোকে ক্ষুধার জ্বালায় উদরপূরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ ও পিতৃভক্তি ভুলিয়া গেল; সকলেই অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে পড়িয়া ক্ষুধার পীড়নে লজ্জা অভিমান ও বংশমর্য্যাদা ভুলিয়া ভোজনের আশায় ফিরিতে লাগিল। সম্মুখে পুত্র কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া খাদ্য চাহিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া পিতা নিজে ভোজন করিল; পুত্রও অনুরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পিতাকে ত্যাগ করিয়া নিজের উদরপূরণ করিতে লাগিল। খাদ্যাভাবে সমুদয় প্রাণী অস্থি ও স্নায়ু মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বীভৎস-মূর্ত্তি হইয়া উঠিল। খাদ্যের জন্য সেই আত্মসর্ব্বস্বেরা প্রেতের ন্যায় মারামারি করিতে লাগিল। অন্নাভাবে সকলে কৃশ, ভীষণদর্শন এবং রুক্ষভাষী হইয়া উঠিল; চারিদিকে খাদ্যান্বেষণে দৃষ্টি চালিত করিতে করিতে তাহারা সংসারের সমুদয় জীবকে উদরে পুরিয়াও স্বদেহ পোষণের জন্য ব্যগ্র হইল।"

কথিত আছে, রাজা ও মহিষীর চেষ্টায় অলৌকিক উপায়ে এই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল। ইহাতে অধিক লোকক্ষয় হয় নাই। কাশ্মীর দেশের চারিদিকের পাহাড়-গুলি বরফের জন্য দুরতিক্রম্য হওয়ার ফলেই দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বাড়িয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে লোকে মৃত কপোতের মাংস ভক্ষণ করিয়া কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়াছিল।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আধুনিক বুলর হ্রদের প্রাচীন নাম মহাপদ্ম। বিতস্তা বা ঝেলম্ নদী এবং আরও কতিপয় নদনদীর জলধারা এই হ্রদে আসিয়া আশ্রয় পায়; পরে আবার এই হ্রদ হইতেই পরিপুষ্টা বিতস্তা বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময় হ্রদে এত অধিক জল জমিয়া যাইত যে সহজে উহা বাহির হইবার পথ পাইত না। ফলে বর্ষাকালে কাশ্মীর দেশে জলপ্লাবন লাগিয়াই থাকিত; দুর্ভিক্ষ উহার অবশ্যম্ভাবী সহচর ছিল। ললিতাদিত্য (আঃ ৭২৫-৬১ খ্রীঃ) প্রমুখ কতিপয় নরপতি বিতস্তার খাদে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু উহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। উৎপলবংশের প্রথম নরপতি অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব কালে (৮৫৫-৮৩ খ্রীঃ) জলপ্লাবনের ফলে কাশ্মীরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। কাশ্মীর দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় এক খারী ধান্য দুইশত দীন্নার মূল্যে বিক্রীত হইত। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সময়ে একখারী ধান্যের দাম এক হাজার পঞ্চাশ দীন্নার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, অর্থাৎ খাদ্য মূল্য স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ৫।০ গুণ বা শতকরা ৫২৫৲ হারে বর্দ্ধিত হইয়া-ছিল। অবশ্য বাংলার মন্বন্তরে আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক মাত্রায় খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছি। কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার একজন মহাপ্রাজ্ঞ প্রজার অদ্ভুত বুদ্ধি কৌশলে তদীয় রাজ্যের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা খারীর পরিমাণ এবং দীন্নারের মূল্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন বাংলার এককুল্যবাপ ভূমির মূল্য

সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমি সে যুগের মুদ্রার অত্যধিক ক্রয়শক্তির কথা বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ন্যায় প্রবীণ ঐতিহাসিক পর্য্যন্ত বিষয়টিকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় পুরাবেত্তা ষ্টাইন সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাশ্মীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে দীন্নার (আধুনিক কাশ্মীরী ভাষায় "দ্যার") শব্দ রাজতরঙ্গিণীতে বহু স্থলে কেবলমাত্র "নগদ ধন বা অর্থ" বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার প্রাচীন কাশ্মীরে সাধারণ ক্রয়বিক্রয় কার্য্যে কড়ির ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ষ্টাইন সাহেব স্থির করিয়াছেন যে এস্থলে দীন্নার অর্থ কড়ি ব্যতীত আর কিছু নহে। একশত কড়ি কাশ্মীরে "হত্" (শত) আখ্যায় অভিহিত হইত। মুঘল সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক কাশ্মীর বিজয়ের পর আকবরী দাম অর্থাৎ, ২৩॥০ গ্রেণ ওজনের তাম্রমুদ্রা ঐ দেশে "হত্" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও পয়সাকে কাশ্মীরে "হত্" বলা হইয়া থাকে। সুতরাং সেকালে একশত কড়ি বা দীন্নার একটি তাম্রমুদ্রার সমান ছিল। কিন্তু তখন তাম্রমুদ্রার বিনিময় মূল্য অধিক ছিল। মুঘল যুগেও ৪০ আকবরী দাম বা পয়সা ১ আকবরী রুপিয়া বা রৌপ্যমুদ্রার সমান ছিল। দীন্নার যে কোনরূপ মূল্যবান্ মুদ্রা ছিল না, তাহা ষ্টাইন সাহেব নানা উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা কোন একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। কহ্লণ লিখিয়াছেন, ললিতাদিত্যের পৌত্র রাজা জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের সভায় রাজপ্রসাদপুষ্ট অসংখ্য পণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তন্মধ্যে একমাত্র উদ্ভট ভট্ট নামক সুপণ্ডিত ব্যক্তিই প্রত্যহ একলক্ষ দীন্নার বৃত্তি পাইতেন। রাজা অনন্তের রাজত্বকালে (১০২৮-৬৩ খ্রীঃ) রুদ্রপাল ও দিদ্দাপাল নামক দুইজন পারিষদের যথাক্রমে দেড় লক্ষ ও আশী হাজার দীন্নার দৈনিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। দীন্নারকে আধুনিক পয়সার ন্যায় তাম্রমুদ্রা স্থির করিলে পণ্ডিত উদ্ভটের দৈনিক বেতন দাঁড়ায় ১৫৬২॥০; ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। ষ্টাইন সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে একশত দীন্নার আধুনিক এক পয়সার সমান ধরিয়া হিসাব করিলে, দেখা যায়, উদ্ভট দৈনিক ১৫।৵০ পাইতেন। অবশ্য তিনি যে রোজ একলক্ষ কড়ি গুণিয়া লইতেন, তাহা নহে। সেকালে শস্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। রাজগণ সেই নির্দ্দিষ্ট মূল্য অনুসারে ধান্যাদি দ্বারা নিজপ্রাপ্য গ্রহণ করিতেন এবং রাজ শস্যাগার হইতে অপরের প্রাপ্য শোধ দিতেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাচীন কাশ্মীরে এক খারী ধান্যের মূল্য ২০০ দীন্নার বা কড়ি অর্থাৎ ২ তাম্রমুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল। পরে ধীরে ধীরে এই মূল্য অনেকগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আকবরের যুগে ধান্যে খাজনা দিতে হইলে এক খারীর মূল্য ২৯ দাম বা পয়সা (২৯০০ দীন্নার বা কড়ি) হিসাবে দিতে হইত এবং মুদ্রায় খাজানা দিলে এক খারী ধান্যের মূল্য ১৩$\frac{৯}{১৬}$ দাম (১৩৩২ দীন্নার) নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাহা হউক এইবার খারীর ওজন বলা প্রয়োজন। এই মাপ এখনও কাশ্মীরে প্রচলিত আছে। এক খারী ধান্য বাংলা দেশের হিসাবে প্রায় সওয়া দুই মণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে সওয়া দুই মণ ধান্য প্রাচীন কাশ্মীরে মাত্র দুইটি তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া যাইত। আকবরের সময়ে উহার মূল্য ১৩$\frac{৯}{১৬}$ হইতে ২৯ তাম্রমুদ্রার মধ্যে ছিল। এস্থলে এই মূল্য বৃদ্ধির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধান্তরে প্রাচীন ভারতের দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

যে ব্যক্তির অলৌকিক বুদ্ধিপ্রভাবে অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব-কালীন দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম সুয্য। সুয্যা নাম্নী এক চণ্ডাল রমণী রাস্তায় একটি অনাথ শিশু কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সে এক প্রতিবেশিনী শূদ্রনারীর সাহায্যে শিশুটিকে পালন করে এবং নিজ নামানুসারে উহার নাম রাখে। এই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল এবং শেষে জনৈক গৃহস্থের বাটীতে বালকদিগের শিক্ষকতা কার্য্য পাইল। সুয্য অনেক সময় নিজের বন্ধু-মহলে প্রকাশ করিত যে সে বুদ্ধিবলে দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু অর্থাভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। সকলেই সুয্যের কথা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু ক্রমে এই কাহিনী নরপতি অবন্তিবর্ম্মার কর্ণগোচর হইল। তিনি সুয্যকে ডাকাইয়া তাহার কথা শুনিলেন এবং তাহার বুদ্ধি কৌশল পরীক্ষার জন্য রাজকোষের ধনরাশি তাহার যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়সমূহ হইতে প্রস্তরখণ্ড পড়ায় বিতস্তার জলস্রোত কয়েকস্থানে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাই জলপ্লাবনের কারণ জানিয়া সুয্য দুইটি স্থান হইতে উপলখণ্ড তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি রাজকোষ হইতে রাশিরাশি দীন্নার লইয়া ঐ দুইটি স্থানে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরা মুদ্রানিক্ষেপবৃত্তান্ত শুনিবামাত্র দলে দলে আসিয়া জলমধ্যে মুদ্রা অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং প্রবাহমধ্য হইতে প্রস্তরখণ্ডসমূহ উঠাইয়া বিতস্তাকে পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। এইরূপে দুই তিন দিনে সমস্ত বর্দ্ধিত জল নদীপথে বাহির হইয়া গেল। অতঃপর সুয্য প্রস্তরের বাঁধ দ্বারা সাত দিনের জন্য বিতস্তানদীর প্রবাহ বাঁধিয়া রাখিলেন। নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত জলশূন্য হইলে নদীগর্ভে যাহাতে প্রস্তরাদি গড়াইয়া পড়িতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নদীর পার্শ্বে সুদীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন। তারপর প্রবাহরোধকারী বাঁধ অপসারিত করা হইল। যে যে স্থলে সলিলপ্লাবনে তীর ভাঙ্গিয়া যাইত, সেই সেই স্থানে সুয্য বিতস্তাপ্রবাহকে নূতন পথে চালিত করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র সিন্ধুনদী পূর্ব্বে ত্রিগ্রামী (আধুনিক

(ত্রেগাঁও) নামকস্থানের সন্নিকটে বিতস্তার সহিত মিলিত ছিল। সুয্যের চেষ্টায় ঐ বিতস্তাসিন্ধু-সঙ্গম শাদীপুরের নিকটে উহার আধুনিক অবস্থানে আনীত হয়। ইহাই সুয্যের প্রধান কীর্ত্তি। কহ্লণ পণ্ডিত আবেগভরে বলিয়াছেন, "সাক্ষাৎ অন্নপতি শ্রীমান্ সুয্যরূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" "যে কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ সময়েও দুই শত দীন্নারের বিনিময় ব্যতীত এক খারী ধান্ত মিলিত না, সুয্যের কৃতকর্ম্মের পর হইতে সেই কাশ্মীরমণ্ডলে মাত্র ছত্রিশ দীন্নার বিনিময়ে এক খারী ধান্ত বিক্রীত হইতে লাগিল।" প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সুয্যের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে কাশ্মীরদেশে ভয়াবহ অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সময়ে তন্ত্রীসংজ্ঞক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কাশ্মীরের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রবল স্বেচ্ছাচার চালাইতেছিল; তাহারা অর্থ বিনিময়ে যাহাকে তাহাকে রাজপদ প্রদান করিতেছিল। অক্ষম রাজা প্রজার অর্থশোষণ করিতেছিলেন; রাজকর্ম্মচারীরাও প্রজাপীড়ন দ্বারা ধনসঞ্চয় করিতেছিল। "প্রজাগণের সেই দুঃসময়ে ক্ষতে ক্ষারপাতের ন্যায় সমস্ত শরৎকালীন ধান্ত শস্য জলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়া গেল। সেই ভয়ঙ্কর ৯৩ সালে (৩৯৯৩ লৌকিকাব্দে অর্থাৎ ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) এক খারী ধান্ত এক সহস্র দীন্নার মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্য দুর্লভ হইয়া উঠিল। অনাহারে লোক মরিতে লাগিল। বিতস্তার জলে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকায় লোকের মৃতদেহ-সমূহ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপ মৃতদেহে বিতস্তানদী ভরিয়া গেল। এমন কি, নদীর জল সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না। চারিদিক নিবিড় ভাবে কঙ্কালাকীর্ণ হওয়ায় সর্ব্বজীবভয়াবহ শ্মশানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু এই সময়েও রাজমন্ত্রিগণ এবং তন্ত্রী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা অতিরিক্ত মূল্যে ধান্ত বিক্রয়দ্বারা লাভবান্ হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি ধান্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থে তন্ত্রীদিগের হুণ্ডীর ধারশোধ করিতে রাজী হইতেন, তাঁহাকেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হইত। যেমন কোন ব্যক্তি নিজে উচ্চগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বাহিরের অরণ্যমধ্যস্থ বাত্যাবৃষ্টি প্রপীড়িত লোকদিগকে দেখিয়া আত্মসুখের প্রশংসা করে, সেইরূপ বহুকাল ধরিয়া কাপুরুষ নরপতি পঙ্গু নিজে রাজভবনে থাকিয়া দুস্থপ্রজাবৃন্দকে অবলোকনপূর্ব্বক নিজ সুখে অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন।" দুর্ভিক্ষের বাজারে দুর্লোভী-দিগের নির্লজ্জ ব্যবসায় রীতি আজ আর বাংলা দেশে কাহারও অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, শস্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ফলে কাশ্মীরের ঐ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইল; কিন্তু অরাজকতার তাণ্ডবলীলা শীঘ্র থামে নাই।

কাশ্মীরের ইতিহাসে রাজা হর্ষের রাজত্বকাল (১০৮৯-১১০১ খ্রীষ্টাব্দে) নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রাজত্বের উত্তরকালীন ইতিহাস অত্যন্ত কদর্য্য ও ভয়াবহ। এই নরপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় নাই, যমরাজের দপ্তরে এমন কোন পাপকার্য্যের নাম আছে কিনা সন্দেহ। তিনি প্রজাগণের করভার বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দেবমন্দিরের ধনহরণ করিয়াছিলেন এবং দেবোৎপাটননায়ক সংজ্ঞক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। এমন কি, প্রজাগণের মলমূত্রাদির উপর করধার্য্য করিয়া তিনি উহা আদায়ের জন্য পুরীষনায়ক নামক কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। যাহা হউক, হর্ষের দুর্ভাগ্য প্রজাগণের দুঃখের ভরা পূর্ণ করিবার জন্য ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। "রাজার উৎপীড়নে প্রজাদেহে যে ক্ষত হইয়াছিল, কতকগুলি নূতন দুঃখ সেই ক্ষতে ক্ষার সংযোগ করিল। চোরেরা রাজভবন হইতেও সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিয়াছিল। তাহারা দিবসেই প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মহামারী উপস্থিত হইল; চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া দিবানিশি প্রেতবাদ্যের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। ৭৫ সালে (৪১৭৫ লৌকিকাব্দে অর্থাৎ ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রামসমূহ জলপ্লাবিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; সকলেরই শস্যভাণ্ডার শূন্য হইল। তখন এক খারী ধান্ত পাঁচ শত দীন্নার মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। এক দীন্নারে দুই পল আঙ্গুর পাওয়া যাইত না। এক পল পশম ছয় দীন্নার মূল্যে কিনিতে হইত। লবণ, মরিচ, হিঙ্গ্ প্রভৃতি দ্রব্যের নামই শুনা যাইত না। জলস্ফীত অসংখ্য শবদেহদ্বারা বিতস্তানদী পরিপূর্ণ হইয়াছিল; দেখিয়া বোধ হইত যেন পর্ব্বত ও কানন হইতে শতশত বৃক্ষ নদীজলে ভাসিয়া যাইতেছে।" "প্রজাদের এই বিপদের সময় রাজা তাহাদের উপর গুরুতর অর্থদণ্ডের বিধান করিয়া যেন ভারক্লিষ্ট বলীবর্দ্দের উপর গণ্ডশৈল পাতিত করিলেন। কায়স্থ সংজ্ঞক রাজস্ব সংগ্রাহক কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সর্ব্বস্ব-দণ্ডের বিধান করায় গ্রাম ও নগরের প্রজাগণ বাস্তুহীন হইয়াছিল।" বলা বাহুল্য লবণাদি বস্তু বিশেষের নাম না শুনিতে পাইবার অবস্থা এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, রাজা অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকালীন দুর্ভিক্ষে এই দুর্ভিক্ষের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের দ্বিগুণাধিক মূল্যবৃদ্ধি হইলেও, উহাতে এত অধিক লোকক্ষয় হয় নাই। সম্ভবতঃ রাজপীড়নে প্রজাগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল বলিয়া হর্ষের রাজত্বকালীন দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষকালে দুই পল বা আট তোলা আঙ্গুরের মূল্য এক দীন্নার বা কড়ি হইতেও বেশী হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীর হিসাব হইতে জানা যায়, আকবরের আমলে কাশ্মীরে এক দাম বা পয়সায় আট সের আঙ্গুর মিলিত; সুতরাং তখন দ্রব্যাদির সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও এক দীন্নারে কিঞ্চিদধিক দেড় পল আঙ্গুর পাওয়া যাইত। কহ্লণ পণ্ডিত হর্ষের রাজত্বকালের অপর একটি দুর্ভিক্ষের কথা লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। হর্ষের ন্যায় নিরঙ্কুশ রাজার রাজত্বে বারবার দুর্ভিক্ষ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার পরে উচ্চল ও সুস্সল ক্রমান্বয়ে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে কাশ্মীরের রাজনীতি-গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল; তবুও কিন্তু কহ্লণ লিখিয়াছেন, "দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে উচ্চল সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দমন করিতেন; কিন্তু সুস্সলের রাজত্বে দুর্ভিক্ষ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।" সুস্সলের পুত্র রাজা জয়সিংহের রাজত্বকালে কহ্লণ তাঁহার অমরগ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের পরবর্ত্তী ইতিহাসেও দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। স্বনামধন্য কাশ্মীরেশ্বর জৈনুল আবেদীনের রাজত্বকালে (১৩২০-৭০ খ্রীঃ) ধান্যের স্বাভাবিক মূল্য ছিল প্রতি খারী তিনশত দীন্নার; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ঐ মূল্য দেড় হাজার দীন্নার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মুহম্মদ শাহের শাসনকালে কাশ্মীরে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে খারী পরিমাণ ধান্য দশসহস্র দীন্নার মূল্য বিক্রীত হইয়াছিল। অবশ্য এই সময়ে অর্থ-নীতিক কারণে ধান্যের স্বাভাবিক মূল্য অনেকটা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এপিঠ ওপিঠ

চন্দ্রহাস

তরুণ আই-সি-এস্ সুখেন্দু গুপ্ত প্রেমে পড়িয়াছে; তাহার ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা মজবুত হৃদয় নড়্‌বড়ে হইয়া গিয়াছে।

শুধু প্রেমে পড়িলে দুঃখ ছিল না; কিন্তু এই চিত্তবিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন সে ডুবিয়া ডুবিয়া কয়েক ঢোক জল খাইয়াছিল, সেই অনুতাপের জ্বালা আজ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

সুখেন্দু ছেলে খারাপ নয়। তবে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম; অতিবড় সাধু ব্যক্তিরও মাঝে মাঝে পা পিছলাইয়া যায়। বিশেষত বিলাতের পথঘাট একটু বেশী পিছল; তাই সুখেন্দুর পদস্খলনকে আমাদের উদার-চক্ষে দেখিতে হইবে। আমাদের একটা বদ্‌অভ্যাস আছে, ঐ জাতীয় ত্রুটিকে আমরা একটু বড় করিয়া দেখি এবং ক্রমাগত সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে থাকি। যাঁহারা বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু এ বিষয়ে ঢের বেশী সংস্কার-মুক্ত।

যাহোক, সুখেন্দুর মনস্তাপ যে আন্তরিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে সে গোটা হৃদয় লইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। তারপর তিন বছর কাটিয়াছে; হৃদয় কোনও গোলমাল করে নাই। বাংলা দেশের এক মহকুমায় সগৌরবে রাজত্ব করিতে করিতে অন্য এক মহকুমায় বদলি হওয়া উপলক্ষে কিছুদিনের ছুটি পাইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এখানে আসিয়াই তাহার হৃদয় হঠাৎ জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

যুবতীটির নাম এণা; বাংলা সরকারের একজন মহামান্য অফিসারের কন্যা। বয়স কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে—তন্বী রূপসী কুহকময়ী—এণা সত্যই অনন্যদুর্লভা। সে গভর্ণরের পার্টিতে বল্‌নাচ নাচিতে পারে কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোথাও প্রগল্‌ভতার ইসারা পর্য্যন্ত নাই; কথায় বার্ত্তায় সে পরম নিপুণা, কিন্তু তাহার প্রকৃতিটি বড় মোলায়েম; সে ইংরেজিতে রসিকতা করিতে পারে, আবার বিদ্যাপতির চণ্ডীদাসের পদাবলী গাহিয়া চিত্তহরণ করিতেও জানে। দর্পণে সে যে দেহটি দেখিতে পায় তাহা যৌবনের অকলঙ্ক লাবণ্যে ঝলমল, কিন্তু দর্পণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না সেই অন্তরটি কত নিবিড় রহস্যের জালে ছায়াময় হইয়া আছে তাহা কে অনুমান করিবে?

প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন্দু ঘাড় মুচ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর কোনও আশা ছিল না। ওদিকে অপর পক্ষও একেবারে অনাহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সুখেন্দু অতি সুপুরুষ এবং অত্যন্ত স্মার্ট; কোনও দিক দিয়াই তাহার যোগ্যতায় এতটুকু খুঁত ছিল না। তাই অন্তরের গহন বনে এণাও বিলক্ষণ ঘা খাইয়াছিল।

তারপর আলাপ যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, দু জনের মধ্যে আকর্ষণও তেমনি দুর্নিবার হইয়া উঠিল। মুখের কথা যখন সাধারণ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে, চোখের ভাষা তখন আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত হইয়া উঠে। চোখের ভাষা নীরব হইলে কী হইবে, উহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সুখেন্দু দেখিতে পায়, এণার নরম চোখ দুটি মিনতিভরা উৎকণ্ঠায় তাহার স্বীকারোক্তির প্রতীক্ষা করিয়া আছে; এণা দেখে, সুখেন্দুর ঠোঁটের কাছে কথাগুলি কাঁপিতেছে, কিন্তু তাহারা আবেগের বাঁধনহারা প্লাবনে বাহির হইয়া আসে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। সুখেন্দু বিরসমুখে অন্য কথা পাড়ে।

এইভাবে কয়েকটা অন্তর্গূঢ় অগ্নিগর্ভ দিন কাটিয়া গেল, সুখেন্দুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল।

আর সময় নাই; দুদিন পরেই তাহাকে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অথচ যে কথাটি বলিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় মন্থন করিয়া অনুতাপের হলাহল বাহির হইয়াছে। যতবার সে বলিবার জন্য মুখ খুলিয়াছে ততবার বিবেক আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

গ্রাণ্ড্ হোটেলে নিজের কক্ষে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে করিতে সুখেন্দু ভাবিতেছিল—কী করি! আমি জানি ও আমাকে চায়—কিন্তু—ওকে ঠকাব? না না, অনাঘ্রাত ফুলের মত ওর মন, অনাবিদ্ধ রত্নের মত ওর দেহ। আর আমি! না—কিছুতেই না।

এসে পর্য্যবসিত হ'ল, তখন তাদের অপূর্ব সমন্বয়ে এ কী অনির্বচনীয় শান্তি! সে শান্তি আমরাও কি অনুভব করি না? সে শান্তি কি আমাদেরও ধরে রাখছে না? আমাদের বক্ষে নিয়ে এই পৃথিবী প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিতা! তার আহ্নিক গতি, তার বার্ষিক গতির সাথে বিশ্বলোকের আরো কত গতিই না এসে মিলছে! যে-জড়কে দেখে ভয় করি, তার চেয়েও কত সহস্রগুণ ঘূর্ণিত হ'তে হ'তে চলেছি অসীম আকাশের এক অঙ্ক হ'তে আর এক অঙ্কে—অথচ এই প্রচণ্ড আলোড়নেও কে আমাদের এমন স্থির রেখেছে? মাধ্যাকর্ষণ কার অমোঘ বিধান?

আমাদেরও এম্‌নি ক'রে তাঁরই পদাঙ্ক ধরে চলতে হবে, তাঁর বর্ত্মের অনুবর্ত্তী হ'তে হবে। অভিঘাত লাগুক এসে বুকে, আমরা যেন অস্থির না হই। যে-সব শক্তি আমাদের চঞ্চল করতে চায়—আত্মীয়েরু বিচ্ছেদ, দুঃখের গ্লানি, অপমানের পীড়ন—তাদের চেয়েও আমাদের আপন মনের শক্তি হোক্ প্রবলতর।

তাই এই শান্তি পাবার জন্যে জগতের কোলাহলকে দূরে রাখতে বাহির থেকে কোনো প্রাচীর তুলব না। কোনো নিভৃত কন্দরে, কোনো অদ্রিগুহায় পালাবারও প্রয়োজন নেই। শান্তির রাজপথ কাটতে হবে নিজের বুকের মাঝে। শান্তির অভিষেক বারি আহরণ করতে হবে আপন অন্তর হতে। বাইরের কোনো শান্তির জল, কোনো তুক্‌তাক্, তাবিজ মাদুলীর মর্ম নয়। শান্তি পাবার জন্যে যে-শক্তির দরকার, তাকে অর্জন করতে হবে নিজের সাধনায়, নিজের অধ্যবসায়ে। নিজের মনকে শেখাতে হবে—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

দুঃখসমূহে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ ভয় এবং ক্রোধশূন্য যিনি, তাঁকেই বলে স্থিতধী, তাঁকেই বলে মুনি।

শুভ আসুক, আর অশুভ আসুক, এমন মানসিক সংযম আয়ত্ত করতে হবে, যে আনন্দিত হব না, অসন্তুষ্ট হব না, আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকব। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে হবে, অহঙ্কারকে জয় করতে হবে, কামনা-বাসনা যেন আকর্ষণ আর না করতে পারে। এম্‌নি ক'রে আমাদের মনের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে শান্তির অভেদ্য দুর্গ। বাইরে থাকুক অযুত বিপ্লব, বাইরে থাকুক অযুত সংঘাত,—অন্তরে তার কোনো আঘাত পশবে না, তার কোনো দাগ বসবে না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যিনি সকল কামনা ত্যাগ ক'রে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, যিনি মমত্বশূন্য, অহঙ্কারশূন্য তিনিই শান্তি পান।

গীতার এই মন্ত্র বারংবার আবৃত্তি করবার প্রয়োজন আছে জীবনে, প্রয়োজন আছে প্রত্যেক লোকেরই যিনি শান্তিকামী। কামনাশূন্য, স্পৃহাশূন্য, মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য হও, তবে শান্তি পাবে।

এই দুঃসাধ্য সাধনার বলে যিনি শান্তি পেয়েছেন, গীতা তাঁর সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করেছেন। তুলনাটি কি সুন্দর—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

কামনা বাসনাকে রোধ করবার জন্যে বধির, অন্ধ, পাষাণ হ'য়ে যাওয়া নয়, আবার তৃষ্ণার পিছু পিছু পাগল হ'য়ে ছুটে চলাও নয়। মানুষকে হ'তে হবে সমুদ্রের মতো। কত শত নদীনদ কত শত দেশ প্লাবিত ক'রে ভৈরবগর্জনে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কখনো তার উপরিতলের অসংখ্য তরঙ্গ-ক্রোধে ফেনায়িত হ'য়ে ওঠে ঝড়ের দোলায়,—সমুদ্র তবু থাকে স্থির, তবু অচল রয় তার প্রতিষ্ঠা। এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে ভাবান্তর,—এ শুধু তার বাইরের জিনিষ। তার অন্তরের গভীর তলে যেখানে আছে তার ধৈর্য্য,—সেখানে সমুদ্র বসে আছে ধ্যানে লীন, সেখানে তার তরঙ্গ নেই, বিক্ষোভ নেই, ফেনা নেই, সেখানে শুধু অবিচ্ছিন্ন শান্তি। তেম্‌নি যে-মানুষ অভ্যাসের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সংযমের দ্বারা মনকে শান্ত করতে পেরেছে, সেও সেই সমুদ্রের মতো। কোনো বিপদে সে দমে না, কোনো বাধাকে সে গ্রাহ্য করে না, কোনো অশুভ তাকে বিচলিত করে না, কোনো কামনা বাসনার নদী টলাতে পারে না তার অন্তরের প্রতিষ্ঠাকে। এ জগতে এমন কোনো রাজশক্তি নেই, এমন কোনো প্রাকৃতিক শক্তি নেই যে ভয় দেখিয়ে তাকে তার কর্ত্তব্য হতে ক্ষান্ত করবে, লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করবে, দুঃখ দিয়ে তাকে অবনত করবে, পীড়ন দিয়ে তাকে তার লক্ষ্য হ'তে বিচলিত করবে। বাইরে সে প্রশান্ত, হাস্যময়, কুসুমকোমল। অন্তরে সে পর্বতের মতো দৃঢ়।

এই তো মানুষের মতো মানুষ হওয়া, এই তো বাঁচার মতো বাঁচা। আর সবাই ব্যর্থ জীবন যাপন করে। কেন মিথ্যা ভয়, কেন মিথ্যা শোক, কেন পলায়ন! তাই তো গীতার উপদেশ, হে বীর, তুমি যুদ্ধ করো।

গীতা কেন মানুষকে বলেছেন, তুমি বীর? ভেবে দেখ, যখনি ভূমিষ্ঠ হয়েছ, বিধাতা তোমার ললাটে জয়ের টীকা এঁকে দিয়ে বলেছেন, তুমি বীর। ক্লীবের মতো নয়, জড়ের মতো নয়, পশুর মতো নয়, মানুষের মতো, বীরের মতো তোমায় বাঁচতে হবে। প্রলোভন দেখেই পথ হারাব, এম্‌নি অপদার্থ! শোক দুঃখ ক্ষতি,—ভেবে দেখলে যার কোনো মানে নেই,—তাইতে ভেঙে পড়ব! কখনো নয়। দুঃখের কণ্টক দিয়ে হোক্ না পথ আস্তীর্ণ, থাকুক না একদিকে মরুভূমির তৃষা, আর একদিকে কামনার প্লাবন,—উঠুক কোলাহল, আসুক ঝঞ্ঝা,—হে বীর, ছোটাও তোমার বিজয় রথ। ক্ষুদ্র নও তুমি, পঙ্গু নও তুমি, লোভী নও তুমি, নীচ নও তুমি। তুমি যে মহান্, তুমি যে অপরাজেয়। তুমি যে তোমার সকল পরিস্থিতির চেয়ে বড়, তুমি যে প্রকৃতির চেয়েও বড়। লাভ কর তোমার সেই অন্তরতম শক্তিকে। বিকশিত করো তোমার তেজকে। তুমি কেন শোকের কাছে মাথা নোয়াবে, ক্ষতির কাছে দাসত্ব করবে! তুমি যে মানুষ, তুমি কেন ছোট কাজ করবে! হে দৃঢ়চেতা, হে জিতেন্দ্রিয়, হে আত্মপ্রতিষ্ঠ, হে বীর, জয় হোক্ তোমার, জয় হোক্ তোমার।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ওদিকে মণিমোহনের বোটের উপর রাত্রি শেষ হইয়া আসিল নক্ষত্র-চক্রের গতি বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কালো জলে ধূপছায়ার পাণ্ডুরতা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফেঁপুলিয়া কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে অরণ্য রেখার অর্থহীন জমাট রূপ এক একটা অবয়ব গ্রহণ করিতেছে ক্রমশঃ। নৈশ-পরিক্রমা শেষ করিয়া বাদুড়েরা ফিরিতেছে নিদ্রাতুর দেহ এবং মন লইয়া।

অর্থহীন চিন্তায় মণিমোহন এই দীর্ঘ সময়টা বসিয়া আছে অতন্দ্র চোখে। আর বর্মী মেয়ের মুখখানা তাহার হাতের মধ্যে লুকানো, ঘুমাইতেছে কিংবা জাগিয়া আছে বোঝা কঠিন। এত কাছে—অথচ এতদূরে! সেই ঝড়ের সন্ধ্যায় মনে হইয়াছিল সে বাঘিনী, সে বিষকন্যা। আর এখন মনে হইতেছে মাটির পুতুলের মতো ভঙ্গুর, স্পর্শ মাত্রেই ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িবে মাটিতে। এমন অবসরে—এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে কাছে পাওয়ার লোলুপতাটা করুণার বন্যায় কোথায় তলাইয়া গেছে।

তারপর মেয়েটি মাথা তুলিল। চুলগুলি চূড়া করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, তোমার অনেক ক্ষতি করলুম।

মণিমোহন অস্পষ্ট গলায় বলিল, ক্ষতি?

—ক্ষতি ছাড়া আর কী। লোকে তো সত্যি মিথ্যে জানবেনা, নিন্দে রটাবে তোমার।

—রটাক গে।

—নিন্দে-কলঙ্কে ভয় করোনা তুমি?

—করি বইকি। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি দাম আমি পেয়েছি।

বর্মী মেয়ে ক্ষীণভাবে হাসিল। কথাটা সে বুঝিয়াছে। এই সভ্যতা-বর্জিত দেশের পটভূমিতে আজ আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জীবন ও শিক্ষাদীক্ষা ঠিক এই ধাঁচের নয়। বিশিষ্ট বর্মীর মেয়ে সে, মৌলমিনে তাহার বাবার কাঠের কারবার ছিল। মিশনারী স্কুলে সামান্য কিছু লেখাপড়া করিয়াছিল, সভ্যতার উপরকার স্তরটাকেও যে কিছু কিছু না দেখিয়াছিল তা নয়। কিন্তু আশৈশব অসংযত তাহার মন। ঘোড়ায় চড়িয়াছে, সমানভাবে মারামারি করিয়াছে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে। একদিন বাপমায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ঝোঁকের মাথায় একটা ভ্যাগাবণ্ড যাযাবর লোককে সে বিবাহ করিয়া বসিল। তারপর—

তারপর নানা যোগাযোগে ঘুরিতে ঘুরিতে এই চর। অর্ধসভ্য মানুষগুলির সঙ্গে মেলা-মেশার দৈনন্দিন ফলে সে সকলের সঙ্গে এক হইয়া গেছে, এদের নীচতা আর অসংযমকে লইয়াছে সমানে আয়ত্ত করিয়া। কিন্তু রেঙ্গুন-মান্দালয়—পেগু-মৌলমিন। প্রকৃতি-ধর্মের অতিরিক্ত যে মন, সে মন তাহার জাগিয়া উঠিল মণিমোহনকে কেন্দ্র করিয়া।

মণিমোহন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। আবছায়া আলো পড়িতেছে বাহির হইতে। সে আলোয় তাহাকে চেনা যায়না—একটা আভাস পাওয়া যায় শুধু। করুণ আর শিথিল বসিবার ভঙ্গি। সমস্ত দেহটা ঘিরিয়া একটা স্নিগ্ধ মধুরতা যেন অস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হইয়া আছে। নীলার উগ্র রশ্মিছটা নাই,—যে আগুন প্রথম একটা অসহ্য জ্বালা লইয়া তাহার সামনে আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে আগুনই বা আজ কোথায়? একটা অর্থহীন বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন।

মা ফুন্ কহিল, এবার আমি নেমে যাব।

—নেমে যাবে?

—হাঁ, মাঝিরা জেগে ওঠবার আগেই। হয়তো তা হলে ব্যাপারটা চাপা থাকতে পারে এখনো। আসাটাই অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু না এসে আমার কোনো উপায় ছিলনা যে।

মণিমোহন জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়াই রহিল।

—না এসে উপায় ছিলনা। তোমার কাছে মিথ্যে দরবার করেছে ওরা সব। আমি ওদের ছেলেপুলের মাথা খাবার কোনো মতলব করিনি, ওরাই বরং আমার মাথা খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সুবিধে পায়নি, তাই এই রাগ।

—বটে! মণিমোহন উঠিয়া বসিল, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এর একটা বিচার—

—কী লাভ? ওদের কোনো দোষ নেই। আমি একা—কেন ওরা সুযোগ নিতে চাইবেনা? আজ রাতে ওরা সব দল বেঁধে আমার বাড়ীতে হানা দেবার মতলব করেছিল, তাই তোমার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। কিন্তু এবার আমি চললুম সরকারীবাবু—এর পরে বেলা উঠে যাবে।

—না, না দাঁড়াও। মণিমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বেলা উঠুক, কারো কথাতে আমি ভয় করিনা। কিন্তু আজ বিকালে তো আমি চলে যাব, তারপর কোথায় আশ্রয় পাবে তুমি?

বর্মী মেয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, সে ভাবনা আমার।

মণিমোহন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল মুহূর্তে। মা ফুনের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল সে। বলিল, তোমাকে আমি নিয়ে যাব।

—কোথায়?

—যেখানে হয়। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবনা।

বর্মী মেয়ে শান্তকণ্ঠে বলিল, এসব কথার কোনো মানে নেই সরকারীবাবু। তোমার সমাজ আর জীবন আলাদা। কোনখানে মিলবেনা আমাদের। পথে যেতে যেতে যা পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ। কোথাও থেমে দাঁড়ালেই ঠকতে হয়।

আশ্চর্য পরিবেশ—আশ্চর্য জগৎ। ইহার মাঝখানে মণিমোহন

এমনি একটি মেয়ের দেখা পাইবার কল্পনা কি স্বপ্নেও করিতে পারিত। অরণ্যের অন্ধকারে যেন অরণ্যলক্ষ্মী।

—এবার আমি চলি সরকারীবাবু। তুমি আমার বড় উপকার করেছ। তোমাকে আমি কখনো ভুলবনা—মা ফুন্ উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু মণিমোহন তাহাকে ছাড়িলনা।

বলিল, আজ থেকে তুমি আমার।

শিশুর নির্বোধ সারল্যে মানুষ যেমনভাবে হাসে, ঠিক তেমন করিয়াই সে হাসিল। বলিল, কিন্তু আমার স্বামী?

—সে তো তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—আবার ফিরতেও তো পারে।

—না ফিরবেনা—মণিমোহনের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শুনাইল, তুমি বাজে কথা বলছ আমাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতায়, সিভিল্ ম্যারেজের আইনে বিয়ে করব।

রাণী। পলকের জন্য মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল রাণীর ছায়াছবি। বিদায়ের আগে তাহার অশ্রুম্লান মুখখানি। দূর বিদেশে কতদূরে যে যাইতে হইবে। তাহার কপালের সিন্দুর বিন্দুটি এবং হাতের শাঁখা যেন ঝলমল্ করিয়া উঠিল একবার।

কিন্তু এখানে বন্য-প্রকৃতির আদিম প্রেরণা। পাশে বসিয়া আছে বিদেশিনী বিচিত্র নারী—তাহার জ্বলন্ত তীব্র রূপ লইয়া। পৃথিবী এখানে পরিপূর্ণ কোমলতার নির্যাস বহিয়া অনাবৃত লাবণ্যে দাঁড়াইয়া আছে—বর্বর উচ্ছৃঙ্খলতায় বেলা আপনা হইতেই আচ্ছন্ন করে আসিয়া।

বর্মী মেয়ে মৃদু ভাবে কহিল, তোমার আত্মীয়-স্বজন?

—কেউ বাধা দেবেনা। তোমাকে আমি নিয়ে যাবই।

রাণী। কিন্তু রাণীর মুখখানা এবার আর সম্পূর্ণ করিয়া দেখা দিলনা—ভাবনার পর্দার উপর ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিবার আগেই মিলাইয়া গেল ছায়ার মতো। মণিমোহনের দৃঢ় ও লোভী মুষ্টির মধ্যে বর্মী মেয়ের কঠিনে কোমলে মিশানো হাতখানি ঘামে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। হাতখানি ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া বর্মী মেয়ে আরো দূরে সরিয়া বসিল।

বেলা বেশি হইবার আগেই মণিমোহন বোট ছাড়িয়া দিল।

মাঝিরা ভালোমন্দ কোনো কথা কহিলনা—পরস্পরের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। আর বেলা ছুটিয়া গেলেও গোপীনাথ চোখে মুখে খানিকটা জল দিয়া বসিয়া রহিল গুম্ হইয়া। এসব কী ব্যাপার? চাকুরী করিতে আসিয়াছ—সন্ন্যাসী সাধু হইয়া নাই থাকিলে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে উপসর্গটাকেও কাঁধে করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে কোন্ দেশি বেহায়াপনা এসব? শিক্ষিত লোকগুলা কি একেবারেই নিরঙ্কুশ নাকি?

তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে। শরীরে যে খানিকটা বিশুদ্ধ আর্য-শোণিত বহিতেছে সেটা তো আর অস্বীকার করিবার জো নাই বাপু। একটা নাপ্পি খাওয়া থ্যাবড়া-মুখো মগের মেয়েকে কাঁধে তুলিয়া শোভাযাত্রা করা—এ যে মুসলমানের ভাত খাওয়ার চাইতেও বিপজ্জনক। মুরগী না হয় চলিতে পারে, এক আধটা বাগ্দীর মেয়েকে বোষ্টুমী রাখিলেও চলে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে এতটা—

কি একটা বইতে গোপীনাথ পড়িয়াছিল সত্যযুগ আসিল বলিয়া। আর এই সত্যযুগে আবির্ভূত হইতেছেন স্বয়ং কল্কি অবতার, যত ম্লেচ্ছ এবং ম্লেচ্ছভাবাপন্নদের তলোয়ার দিয়া কচুগাছের মত তিনি কচাকচ্ শব্দে সাবাড় করিবেন। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ঘুম ভাঙিয়া দেখিবে রাতারাতি তাহারা ষাট হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে—সত্যযুগের মানুষ কিনা। আর পৃথিবীতে অসাধু, চোর, পাওনাদার কিংবা চৌকীদারী ট্যাক্স কিছুই নাই—একেবারে রামরাজ্য যাহাকে বলে।

উৎসাহিত হইয়া গোপীনাথ কথাগুলি শুনাইয়াছিল মণিমোহনকে। কিন্তু মণিমোহন বিশ্বাস করে নাই—গাঁজা বলিয়া এবং নানারকমের কটু-কাটব্য করিয়া জিনিসটাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। সেই হইতে গোপীনাথ মণিমোহনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নিরাশ হইয়া উঠিয়াছে। দু' দশটা অন্যায় কাজ কে না করে—পৃথিবীতে সবাই-ই আর এমন কিছু সাধুসন্ত জাতীয় জীব নয়, কিন্তু দু চারটা মাস একটু শুদ্ধ-শান্ত থাকিয়া যদি কল্কি-অবতারকে ফাঁকি দিয়া সত্যযুগের বাসিন্দা হইতে পারা যায় তো মন্দ কী। কিন্তু ও সম্বন্ধে মণিমোহনের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা বা চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

বোট চলিতে লাগিল। দিনের উজ্জ্বল আলো নামিয়া নদীর বুক হইতে অস্পষ্টতার শেষ আবরণ মিলাইয়া গেল। আবার সেই পুরাতন জল আর আকাশের জগৎ। মোহ নাই, আচ্ছন্নতা নাই—মৃত্যুর মতো নিঃসংকোচ ও নিরাবরণ। বোটের গায়ে জল বাজিবার শব্দ—মাঝে মাঝে কচুরি-পানার পচাগন্ধ। বিরাট নদীর তলায় নূতন মাটির সূচনা—মাঝে মাঝে মধ্য নদীতেও লগি বাধিয়া যাইতেছে।

উত্তেজনা খানিকটা শিথিল হইয়া আসিতেছে মণিমোহনের। উপনিবেশের স্বপ্ন-কোমল রহস্য-উপন্যাসের মতো রাত্রি, আর খাসমহল কাছারীর তহশীলদারের হিসাবের কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন দিন এক নয়। তা ছাড়া দিনের আলো বড় বেশি প্রকট, বড় বেশি উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, কিছুই যেন প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার উপায় থাকেনা। রাণীর ছায়ামূর্তি আবার আসিয়া উঁকি মারিতেছে।

বর্মী মেয়ে জড়োসড়ো হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত ঘটনাটাই যেন মন্ত্রবলে ঘটিয়া চলিয়াছে। মণিমোহনকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের এই পটভূমিকা। এই বর্বরতার মাঝখানে সে সভ্য-জগতের আলো লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সভ্য-জগতেই? যেখানে মণিমোহন আর দশজনের মধ্যে একজন, যেখানে বহুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটা বুদ্বুদ হইয়া মিলাইয়া যাইবে সে, সেখানে? নিজের বন্য মনকেই কি সে বিশ্বাস করে? রেঙ্গুন-মৌলমিন পেগু হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়া আনিয়াছিল—আজ আবার উপনিবেশকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায় সে? নূতন জীবনেই কি বাধা পড়িবে সে? নদীর মতো সে বহিয়া আসিতেছে, পুরাণো চর ভাঙিয়া নূতন চরকে সে রচনা করিতেছে প্রত্যহ—মণিমোহন কি অনন্ত হইয়া থাকিবে সেই স্রোতের মুখে? তাহার চাইতে—

সামান্য একটু হাসিয়া মা-ফুন্ বলিল, কেন মিথ্যে পাগলামি

করছ সরকারীবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ঘর আছে, সংসার আছে তোমার। চরের জীবন চরেই শেষ হয়ে যাক, তার বাইরে তাকে টেনে নিতে চেয়োনা।

মণিমোহন বলিল, হুঁ।

অতি প্রত্যক্ষ দিনের আলো। প্রথম সূর্যের আলোয় নদীর মূর্তিটাকে শান্ত আর সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। ভালো করিয়া তাকাইলে গাছ-পালার আভাসও সুদূর পরপার হইতে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। সে আহ্বান এই রাক্ষসী নদীর মৃত্যু-সংকেত নয়—সে আহ্বান আসিতেছে সেখানকার বাণী লইয়া, যেখানে লাল-কাঁকরের প্ল্যাটফর্মের পাশে ছোট্ট একটি ষ্টেশন। কলিকাতার লোক্যাল্ আসিয়া মাত্র এক মিনিট দাঁড়ায়। কাঁচা মাটির পথের ধারে ধারে আমের বন ছায়া ফেলিয়াছে, আর—

বর্মী মেয়ে। রাত্রির একটি বিশেষ মুহূর্তে যে মহীয়সী, যাহার জন্ম সে মুহূর্তে যত রকম অসাধ্য সব সাধন করিয়া ফেলা যাইতে পারে, দিনের বেলায় তাহার প্রয়োজন কতটুকু। লোলুপতার উপর নিশীথের রঙ্ লাগিয়া তাহাকে দেহের অতীত ভাবের জগতে লইয়া যায়, কিন্তু সূর্যের আলো উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহার অনাবরণ রূপ।

বর্মী মেয়ে আবার কহিল, ফিরে যাওয়ার সময় আছে এখনো। আমার জন্ম তুমি ভেবোনা! আমরা মগের মেয়ে—নিজেদের ভার নিজেরাই নিতে জানি। তুমি আমার জন্মে কেন যেচে নিজের বোঝা মাথায় নিতে চাচ্ছ?

মণিমোহন জোর করিয়াই হাসিল অনেকটা। বলিল, পাগল। নিয়ে চলেছি যখন, নিয়ে যাবই। নিজের বোঝা মাথায় বইতে আমি ভয় করিনা।

সত্যিই সে ভয় করেনা। এই নদী, এই পৃথিবী, এই সব মানুষ। নিন্দা-প্রশংসা এখানে সমান অর্থহীন। কিন্তু সব কিছু তো এইখানেই শেষ হবার নয়। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে, পাকুড়-প্যাসেঞ্জার আর ধানক্ষেতের আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, বি-এস্-সি পাশ করিয়াছে; মার্জিত আর পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বপ্ন তাহার সম্মুখে। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে তো আর সে স্থায়ী ঘর বাঁধিতে পারিবেনা। তাই এখান হইতে যখন তাহাকে ফিরিতে হইবে তাহার নিজের পরিচিত গণ্ডীতে—কলিকাতার ট্রামে-বাসে, সিনেমার আলোয় আর প্রসাধনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখগুলির মধ্যে—তখন? তখন? তখনও কি সে ভয় করিবেনা?

মণিমোহন ভাবিতে লাগিল।…

দুদিন পরে মণিমোহনের বোট আসিল চর ইস্‌মাইলে। কিন্তু বর্মী মেয়ে সঙ্গে আসে নাই। পথেই রাত্রে কোথায় কোন অবসরে যে বোট হইতে নামিয়া গেছে মণিমোহন জানিতেও পারে নাই সেটা। রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় নিতে আসিয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারেই ফিরিয়া গেছে আবার। জল, জঙ্গল, অন্ধকার আর অরণ্য-প্রকৃতির আদিম বর্বরতা নিঃশেষে নিজের মধ্যে তাহাকে লুপ্ত করিয়া লইয়াছে। •

কিন্তু সেটাই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। সব চাইতে বিস্ময়কর খবর এই যে মণিমোহন ফিরিয়া আর তাহাকে খুঁজিতে চায় নাই। এ মাসে তাহাকে দশহাজার টাকার কলেক্‌শন দেখাইতে হইবে—বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। তারপরে হয়তো ছুটি মিলিতে পারে। রাণীর সঙ্গে কতদিন যে দেখা হয় নাই। নদীতে অবশ্য রোলিঙের ভয় আছে, কিন্তু সেজন্ম দেশের ছেলে কি দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিবেনা?

প্রকৃতি আর মানুষ। প্রকৃতি মানুষকে জয় করিবার প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া আছে—আশা করিতেছে, আবার সেই সৃষ্টির প্রথম দিনটির মতো তাহার সন্তানকে ফিরিয়া পাইবে নিজের বুকের ভিতর। কিন্তু কালের বেলাভূমিতে পদচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া যে যুগ হইতে যুগান্তরের পারে চলিয়া গেছে—সে আর কোনোদিন তাহার শৈশবে ফিরিয়া আসিবেনা।

বলরাম ভাবিয়াছিলেন, মুক্তো এ যাত্রা তাহাকে খুনের দায়েই ফেলিল বুঝি। কিন্তু পরম আশ্বাসের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দেখিলেন, মুক্তো মরিলনা। কিছুদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

ব্যাপারটা বাহিরে কেউ জানিতে পারিলনা, পারিবেই বা কে? বলরাম দিনকয়েক নিজের যথাসাধ্য কবিরাজী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া মুক্তোকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই সামান্য কয়দিনের মধ্যেই তিনি যেন অর্ধেক আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছেন—এমন জানিলে কি আর—

মুক্তো ভালো হইয়া উঠিল, কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গেল তাহার ব্যবহারে। এতটুকু অভিযোগ সে জানাইলনা বলরামের বিরুদ্ধে, যেন কিছুই হয় নাই, সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। অথবা জোর করিয়াই অতীতের ঘটনাটাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে সে। বলরাম অবশ্য এখনও তাহার কাছে আমল পাইতেছেনা, কিন্তু তাঁহাকে যে আজকাল সে অন্তত বাঘের মতো ভয় করিতেছেনা, এইটুকু দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন তিনি।

সন্ধ্যার দিকে বলরাম ভাবিলেন, একবার খাসমহল কাছারী হইতে ঘুরিয়া আসা যাক। যোগেশবাবু লোকটির দাবা খেলিবার সখ প্রচণ্ড। প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া তিনি বলরামের আস্তানায় তাস খেলিয়াছেন, দাবার সঙ্গী ছিলনা। তবে সংপ্রতি বলরামকেও দাবায় খানিকটা দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন—মাঝে মাঝে খাসমহল কাছারীতে গিয়া তিনি আসর জমাইয়া তোলেন।

বলরাম বাহির হইবার উপক্রম করিতে মুক্তো প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্ছ!

—যোগেশবাবুর ওখানে।

—ফিরবে কখন!

—দেরী হবে।

বলরাম বাহির হইয়া গেলেন।

ফিরিলেন অনেক রাত করিয়া। দাবায় একবার জমিলে চট্ করিয়া উঠিয়া আসা কঠিন। তা ছাড়া খেলাটা এখনো শেষ হয় নাই। মাথার মধ্যে নৌকা, গজ আর মন্ত্রী সমানভাবে পরিক্রমণ করিতেছিল তাঁহার। কাল সকালেই আবার যাইতে হইবে। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই মনে। পথে আসিতে আসিতে হিসাব করিতে লাগিলেন, ঘোড়ার আগে গজের কিস্তিটা লাগাইলে—

বাহিরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। রাধানাথ চুপটি করিয়া বসিয়া। বলরামকে ঢুকিতে দেখিয়া সে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু।

বলরাম সভয়ে কহিলেন, কী সর্বনাশ?

—দিদিমণি চলে গেছে।

—চলে গেছে! চলে গেছে কি রে! বলরামের মাথায় যেন গোটা আকাশটাই ভাঙিয়া পড়িল সশব্দে:

কোথায় চলে গেছে?

গাজী সাহেব এসেছিল। তারই সঙ্গে।

শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় যেন শীতল হইয়া গেল বলরামের: ধরে নিয়ে গেছে! সশব্দে বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন তিনি—তোর চোখের সামনে থেকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেল তাকে? আর বসে বসে দেখলি তুই, বাধা দিতে পারলিনে? লাঠির ঘায়ে দু একটা মাথা নামিয়ে দিতে পারলিনে মাটিতে? একটা খবরও দিলিনে আমাকে?

থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল বলরামের সর্বাঙ্গ।

কিন্তু ঘৃণা আর হতাশা প্রকট হইয়া উঠিল রাধানাথের কণ্ঠস্বরে।

—বাধা দেব কি বাবু? ইচ্ছে করেই তো চলে গেছে দিদিমণি। তোমাকে খবর দিতেও নিষেধ করলে। বললে, বাবুকে বলিস্, আমি চলে গেলুম গাজী সাহেবের সঙ্গে। গলায় দড়ি! সকলের চোখের সামনে মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল—ছি—ছি—ছি—ছি!

বলরাম দারুমূর্তি বলরামের মতোই অনড় হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাধানাথ বলিয়া চলিল, ভয়ে তোমাকে বলিনি বাবু, দিদিমণি খুব খাতির জমিয়ে নিয়েছিল তোমার ওই গাজীর সঙ্গে। তুমি না থাকলেই গাজী যখন তখন যাতায়াত করত, আর—

বলরামের মুখের দিকে তাকাইয়া কথার মাঝখানেই রাধানাথ থামিয়া গেল।

দেওয়ালের গায়ে অসম্বৃতবসনা চীনা নারীমূর্তিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুতভাবে। তাহার চোখে আচ্ছন্ন স্বপ্নাবেশ, তাহার মুখে লালসার মদির হাসি। কাঁচভাঙা ঘড়টার বড় কাঁটাটা কেমন করিয়া যেন বাঁকিয়া সামনের দিকে উদ্যত হইয়া আছে, আর পেণ্ডুলামের নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনের তালে তালে হাতুড়ি ঠোকার মতো অস্বাভাবিক শব্দ হইতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠকাঠক্—

* * * *

পৃথিবী বাড়িতেছে।

নদীর মুখে প্রতিদিন নামিয়া আসিতেছে বাংলার বুক ধোয়া পলিমাটি, দিগন্ত প্রসারিত নদীর নিভৃত গর্ভকোষে মৃত্তিকার ভ্রূণ-শিশু লালিত হইয়া চলিয়াছে। জন্ম লইবে নূতন আলোর, নূতন আকাশের নীল-নির্মম স্নেহছায়ায়।

শিশু পৃথিবী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো বর্বরতা লইয়া—সেদিনকার মতো উচ্ছৃঙ্খল অসংযম লইয়া। নিজের খেলনা সে নিজেই চূর্ণ করিয়া চলিবে কয়েকদিন। সভ্যতা সমাজ, ধর্ম—এগুলি এখনও তো তাহার দূর চক্রবালেই নিহিত।

কিন্তু চর পড়িতেছে নদীতে। গঙ্গার ব-দ্বীপের প্রাণ-প্রবাহিনী শিরা-উপশিরাগুলিতে মৃত্যুর মন্থরতা। সামুদ্রিক বহুভুজের মতো, কালো কালো বাহু বাড়াইয়া দিতেছে নূতন সভ্যতা; কলে কারখানায় বন্দী বিদ্যুতের আর্তনাদ।

শাখায় পাতায় অন্ধকার করিয়া হিংসার গুহা এই যে সুন্দরবন, এ আর কতদিন দাঁড়াইবে কুঠারের মুখে! তেঁতুলিয়া কালাবদর কিংবা রায়মঙ্গলের মুখে আর কি শবের জল তেমন পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া আসে? পর্তুগীজদের শেষ উপনিবেশ মিলাইয়া যায় নদীগর্ভে—সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেসের রক্ত—ডি-সুজা, জোহান আর লিসি পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে পেরিরা আর ডি-সিল্‌ভা, জমিতে লাঙল ঠেলে তাহারা শুঁটকি মাছের ব্যবসা করে।

আরো দশবছর পরে যারা এখানে আসিবে, তারা দেখিবে কত বড় হইয়াছে চর ইস্মাইল। সভ্য, শিক্ষিত মানুষ। নদী—শান্ত এবং অহিংস, এখানে ওখানে চর পড়িয়া গোটা চেহারাই তাহার বদলাইয়া গেছে। আর এস্ কোম্পানির নূতন লাইনে ষ্টিমার যাতায়াত করে, ফার্ষ্ট ক্লাশের ডেকে বসিয়া প্রেমালাপ জমায় আধুনিক তরুণ দম্পতী। সহর আর শিক্ষার প্রভাবে উপনিবেশ সমুজ্জ্বল। যদি সময় আসে তো সেদিনকার কাহিনী বলিব নূতন করিয়া।

কেবল আদিম পৃথিবীর সেই বর্বর দানবটারই মৃত্যু হইয়াছে। আর কালের বালুবেলার পরপারে প্রতিদিন মিলাইয়া আসিতেছে বিদ্রোহী শিশুদের অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলি।

—সমাপ্ত—

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

মেয়েদের বিপদ যে কেবলমাত্র অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হতেই আসে তা নয়। ভাল লোকও অবস্থা ভেদে মন্দ হয়ে উঠে এবং মেয়েদের সহযোগিতাতেই মেয়েদের ক্ষতি করে। স্বভাবজাত যৌন স্পৃহাই এর কারণ। মানুষের দুর্বল মুহূর্তে morality হয়ে উঠে want of opportunity। এই দুর্বল মুহূর্ত যে কোনও অবস্থাতেই আসতে পারে। এই জন্য ব্রহ্মচারী লোকের সঙ্গে মেয়েদের না ছেড়ে, বিবাহিত এমন কি বখা ছেলের সঙ্গেও মেয়ে ছাড়া ভাল। বিবাহিত বা বখা ছেলেদের যৌন স্পৃহা কম থাকে। নিজেদের সংযত করতে তারা সক্ষম। মনও থাকে তাদের আয়ত্বের মধ্যে। তারা অপরাধ করে ইচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তারা করে না। অনেক সময় তারা বিশ্বাস রাখে। কিন্তু ব্রহ্মচারীরা বিশেষ একটি অবস্থায় (Nuretio না হওয়া পর্য্যন্ত) না আসা পর্যান্ত সঠিক ব্রহ্মচারী হতে পারে না। মন তাদের আয়ত্বাধীন থাকে না। বন্যার মতই তারা ভেসে যায়। শিক্ষক, গুরু প্রভৃতি ব্যক্তি হতেও বিপদ ঘটেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সব গুরু বিষয়ে বা শিক্ষক ছাত্রীরা সুরুতেই প্রেমোন্মুখ থাকে না। পরবর্ত্তী সময়ে তারা প্রেমোন্মুখ হয়ে উঠে। ধনীর দুলালীকে প্রেমোন্মুখ করে বিবাহ করা ও সেই বিবাহের দ্বারা ছাত্রীটিকে

দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে আনা, অপরাধেরই সামিল। কেবলমাত্র যৌন কারণে একটী ছেলে একটী মেয়েকে চাইলে, তাকে সরিয়ে এনে অনুরূপ অপর একটী ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে (বা ভিড়িয়ে) দিলেই গণ্ডোগোলের অবসান হয়। কিন্তু যৌন স্পৃহার সঙ্গে প্রেমমিশ্রিত থাকলেই মুস্কিল বাধে। মেয়েটী তখন সেই একমাত্র ছেলেটীর জন্যই পাগল হয়। এই জন্য প্রেমের রূপ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। Sugar coated quinineএর সঙ্গে প্রেমের তুলনা চলে। উপরে থাকে প্রেম বা sugar, ভিতরে থাকে quinine বা যৌন স্পৃহা, কিছুটা স্বার্থ বোধও বটে। যৌন-স্পৃহা ছাড়া প্রেম অসম্ভব। নিম্নের বিবৃতিটুকু এর প্রমাণ। কথিত মেয়েটীর অকৃতজ্ঞতা আমাকে ক্ষুব্ধ করে।

"বহু বৎসর পরে অমুকবাবুর সঙ্গে দেখা হল। বাল্যকালের শিক্ষক তিনি, বহুদিন পরে দেখা। আদর করে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। তাঁর কন্যাটীর বয়স তখন বছর চৌদ্দ। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, হঠাৎ চিনতে পারি নি। তার বিয়ের জন্য অমুকবাবু চিন্তিত, কিন্তু পয়সার অভাব। অভয় দিয়ে বললাম—'ব্যস্ত হবেন না, আমি ওর ভার নিচ্ছি।' অমুকবাবুর স্ত্রী কাছেই ছিলেন। খুশী হয়ে বলে উঠলেন—হাঁ বাবা তাই নাও, বোনটীর ভার তুমিই নাও। বিব্রত বোধ করলাম—বোনটী কেন? বললেই ত পারতেন মেয়েটীর ভার নাও। ক্ষণিকেই আমি মেয়েটীকে ভালবেসে ছিলাম। মনে যেন তাকে পত্নীত্বেও বরণ করে নিলাম। আমার মত জামাতা লাভ তাদের আশাতীত ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁরাও কথা বলেন নি। রাজী হওয়া মাত্রই কন্যাটী যে আমার হবে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। মনের ভাব আমি মেয়েকেও জানালাম না, তার বাপ মা'কেও না। মেয়েটীকে নিজে স্কুলে ভর্ত্তি করে এলাম। সেতারের, গানের ও ছবি আঁকার মাষ্টার নিযুক্ত করলাম। বহু অর্থ ব্যয় করে মেয়েটীকে মনের মত করেছি। এমন সময় একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটল। বোনের জন্মদিনে মেয়েটী নিমন্ত্রণে এসেছে—তার দিদির সঙ্গে। মেয়েটীকে চিবুক ধরে খুশী হয়ে মা বললেন—"বেশ মেয়ে, একেই আমি বৌ করব। বাবাকে বোল মা।" আমি যে তাকে চাই সেইদিনই সে প্রথম জানল। এতদিন সে আমাকে দাদা বলেই ডেকেছে। মনের আসল ভাব তাকে কখনও জানাইনি, পরদিন তাদের বাড়ী গিয়ে দেখি সর্ব্বনাশ ঘটেছে। মেয়েটী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—"বাবা, অমুক দা'কে আমি মা'র পেটের ভাইয়ের মত মনে করি, তার মনে এই ছিল।" দেখলাম আজ চার বৎসরের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। বুকের ব্যথা বুকে চেপে মুখে বললাম—"আরে পাগলী। মার কথায় রাগ করে। ঠাট্টা করেছে তোকে। বুড়ো মানুষ কিনা। তোর কত ভাল বিয়ে হবে। রাজপুত্তুরের মত বর হবে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসবে।" হাজার তিনেক টাকা আগেই খরচ করেছি। আরও হাজার পাঁচেক দণ্ড দিয়ে একটী সরকারী চাকুরে পাত্র জোটালাম, নামও কিনলুম। কি বলছেন? তার সঙ্গে দেখা করি কিনা? একদিন করেছিলাম। সে তখন লুচি ভাজছিল। আমায় দেখে বলল—"উনি এখুনি ফিরবেন। তাই লুচি ভাজছি। বসুন আপনি।" উত্তরে বলিলাম—না, আজ আসি। লুচিটা সে কড়ায় চাপাচ্ছিল। উত্তরে বলল—"আবার আসবেন ত? আসবেন, কিন্তু।" আমার সাধারণ মন তাকে ক্ষমা করে নি, কিন্তু আমার বৈজ্ঞানিক মন করেছিল।

সকল ক্ষেত্রেই প্রেম প্রেমরূপে দেখা দেয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রেম প্রেমরূপেই বর্ত্তায়—তা হিষ্ট্রিয়া রূপেই হউক বা অন্য কোনও রূপেই হোক। আবার এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রেমের আবির্ভাব হয় সর্ব্বশেষে। একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

প্রেম ছাড়া মানুষের আরও কয়েকটী মনোবৃত্তি আছে। উহাদের যথাক্রমে ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, স্নেহ ও অনুকম্পা বলা হয়। এই ছয়টী বৃত্তির মধ্যে যৌন-স্পৃহা থাকে না। থাকলেও সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উহাদের যে কোনটী অবস্থাক্রমে ধীরে ধীরে প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে। নিম্নের তালিকাটীর পর্য্যালোচনে বিষয়টী বুঝা যাবে।

ভক্তি
|
শ্রদ্ধা
|
ভালবাসা
|
কৃতজ্ঞতা—ভালবাসা—প্রেম—ভালবাসা—কর্ত্তব্যাদি
|
ভালবাসা
|
স্নেহ
|
অনুকম্পা

কোনও একটী কুরূপা গরীব মেয়ের প্রতি রূপবান ধনীর দুলালকে আকৃষ্ট হতে দেখে আমরা অবাক হই। কিন্তু এই আকর্ষণ প্রেমজনিত হয় না। উহা অনুকম্পা মাত্র। পরে এই অনুকম্পাই প্রেমে রূপান্তরিত হয়। নিম্নের বিবৃতি থেকে বিষয়টা বুঝা যায়।

"আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সে। রূপ তার ছিল না। কুরূপা বললেই ভাল হয়। পাত্রপক্ষীয়রা মেয়ে দেখে বলে যেতেন—খবর দেব। কিন্তু খবর তাঁরা দিতেন না। অভিভাবকরা গঞ্জনা দিত। মেয়েটী ফেলত চোখের জল। তার কষ্টে আমি অভিভূত হই এবং তাকে বিবাহও করি। কিন্তু ভালবাসতে পারি না। কৃতজ্ঞতা প্রসূতই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক সে আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত, যত্ন ও প্রেম করত। প্রতিদানে সে কিছুই চাইত না। একদিন অলক্ষ্যে মুখ থেকে বের হল—'আহা বেচারা! কিছুদিন পরে বুঝতে পারি তার উপর আমার স্নেহ আসছে। বোনেদের মত তাকেও আমি স্নেহ করি, তাচ্ছিল্য করি না। একদিন দেখলাম তাকে ভালওবেসেছি ঠিক বন্ধুর মত। তার পরামর্শমত সব কাজ করি, তার উপদেশ চাই। কিছুদিন পরেই আমার সেই ভালবাসা প্রেমে রূপান্তরিত হল। তাকে কাছে না পেলে থাকতে পারি না। অচিরে সে হয়ে উঠল প্রেমময়ী স্ত্রী, ভার্য্যা, সহধর্ম্মিণী।"

এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকম্পা থেকে স্নেহ, স্নেহ থেকে ভালবাসা, ভালবাসা থেকে প্রেম জন্মে। এইত গেল অনুকম্পার কথা, এইবার স্নেহের কথা বলি। একটী ফুটফুটে ছোট মেয়ের প্রতি আমার জনৈক বন্ধু আকৃষ্ট হন, তাকে বিয়েও করতে চান। আমি বন্ধুটীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। শেষে তার মনোবিশ্লেষণ করি। বন্ধুটী স্বীকার করেন, প্রথমে মেয়েটীকে তিনি বোনের মতই স্নেহ করতেন। পরে উক্ত স্নেহ উপরিক্ত ভাবেই ভালবাসায় পরিণত হয়। বোন থেকে বন্ধুর পর্য্যায় (উঠে) আসে। এই ভাবে তার সেই স্নেহ ভালবাসায় এবং আরও পরে প্রেমে পরিণত হয়। এইবার ভালবাসার কথা বলি। প্রথমে সহপাঠী সহপাঠিনীকে, বন্ধু বান্ধবীকে ভালবাসে মাত্র। এর মধ্যে যৌন ভাব (কম থাকে বা) থাকে না। পরে এই ভালবাসাই প্রেমে পরিণত হয়। অনুকম্পা, স্নেহ এবং ভালবাসা প্রেমের নিম্নস্তর। উপরিস্তর হচ্ছে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি। (তালিকা দেখুন) ভক্তি থেকে শ্রদ্ধায় ও শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসায়, ভালবাসা থেকে প্রেমে নামা মনোজগতে বিচিত্র নয়। গুরুকে শিষ্যা ভক্তি করে। ঘনিষ্টতার সঙ্গে ভক্তির মাত্রা কমে শ্রদ্ধায় পর্য্যবসিত হওয়া, ও পরে শ্রদ্ধার মাত্রাও কমে ভালবাসায় নামা বিচিত্র নয়। বরং ইহা হামেসা ঘটে থাকে। পরে সেই ভালবাসা প্রেমেও পরিণত হয়। ছাত্রী শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে। সেই শ্রদ্ধার ভিতর যৌন ভাব থাকে না। পরে সেই শ্রদ্ধাই ভালবাসায় এবং

ভালবাসা প্রেমের পর্য্যায়ে নামে। গুরু শিষ্যায়, ছাত্রী শিক্ষকের প্রেম এই ভাবেই এবং এই জন্তেই ঘটে থাকে। এই সব বৃত্তিগুলি ছাড়া কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতা থেকেও প্রেম আসে। এগুলি আসে পাশ থেকে। যৌন কারণে বা সাময়িক দুর্ব্বলতায় কোনও ছেলে কোনও কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে, সব সময় সে মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে না। তার প্রতি একটা অনুকম্পা ও কর্ত্তব্যবোধ আসে। এই অনুকম্পা ও কর্ত্তব্যবোধ পরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ধরে বেঁধে বা জোর করে দু'জনকে মিলিয়ে দিলে কুফল ফলে না। এইবার কৃতজ্ঞতার কথা বলা যাক। অনেকসময়ে কন্যাগণ পারিবারিক উপকারার্থে অন্তকে প্রাণ সমর্পণ করে। বাপ-মার প্রতি বা সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবোধই এর কারণ। ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল নয়। বাপমাকে সাহায্য করার বা ভাইকে চাকুরী দেওয়া প্রভৃতির জন্তও পারিবারিক বন্ধুর প্রতি মেয়েরা আকৃষ্ট হয়। এই স্থলে কৃতজ্ঞতা থেকে ভালবাসা জন্মে ও ভালবাসা থেকে প্রেম আসে। অনেক দুর্ব্বৃত্ত মেয়েদের কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের ক্ষতিও করেছে। এ সম্বন্ধে আমার এক সম্পাদক বন্ধুর বিবৃতি তুলে দিলাম। প্রায় বছর চার পূর্ব্বে ঘটনাটি ঘটে।

"আমি তখন একটি অতি আধুনিক পত্রিকার সম্পাদক। উত্তর কলিকাতায় বাস (ও আফিস) হলেও, আমার flying standard গাড়ী খানাকে দক্ষিণতম কোলকাতায় দেখা যেত বেশী। হঠাৎ জেঠাবাবু হুকুম দিলেন—বা মালঞ্চা লেনের মেয়েটাকে দেখে আয়। হা হতোস্মি। যে ব্যক্তি সিলোন পর্য্যন্ত যেতে রাজী, তাকে যেতে হবে মধ্য কোলকাতার মালাঙ্গা লেনে। হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ প্লেস বা লেক রোড হলেও কথা ছিল। যার কলমের মুখে ভোর হয় নীল, দুপুর হয় হলদে, তাকে রিজেন্ট পার্কে না পাঠিয়ে জেঠামশাই পাঠাতে চান মলাঙ্গা লেনে। শেষে যেতেই হল। অপছন্দ করে চলে আসা, এই ত কথা। কতক্ষণই বা লাগবে। মেয়েটার দিকে না তাকিয়েই বসে রইলাম। হঠাৎ শুনলাম এক ভদ্রলোক (?) বলছেন—'হাঁ মশাই, আপনার নাকি একটা কাগজ আছে। তাতে নাকি শ্লীলতা বিহীন গল্প আছে। কাগজটা শুনেছি যাচ্ছেতাই।' যুগপ্রবর্ত্তক আমরা, নিন্দা আমাদের ভূষণ। সমাজের মতে অত্যাচার করলে সমাজ চেঁচাবেই। কোনও উত্তর দিলাম না। উত্তর দিল সেই মেয়েটা। সে বলে উঠল—'কে বল্লে অশ্লীল কাগজ। আমি নিজে কাগজটার গ্রাহিকা। কোথায় ও কোথায় অশ্লীলতা আছে।' মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। আমি চোখ তুললাম। পৌনে এক মিনিটেই তাকে ভালবেসে ফেল্লাম। দুসেকেণ্ড পরেই ভালবাসা। আর ভালবাসা রইল না। উহা প্রেমে পরিণত হল। আমি জানিয়ে দিলাম—আমি এই মেয়েকেই বিয়ে করব। একটা পয়সাও না নিয়ে। আমাদের প্রেম গভীর হতে গভীরতম হয়। মিলনের পথে বাধা ঘটে অনেক। থানা পুলিশ পর্য্যন্ত ব্যাপার গড়ায়। অনেক হাঙ্গাম হুজুতের পর আমাদের বিবাহ হয়। যে কাগজটা নিয়ে এত হাঙ্গামা, সে কাগজখানা আমি উঠিয়ে দিয়েছি। লোকে আমাদের ভুলে গেছে, কিন্তু কাগজটাকে ভুলে নি। আমাদের স্বামী স্ত্রীর এইটুকুই সান্ত্বনা। হাঙ্গাম হুজুতের ব্যাপারটা বন্ধুর লেখা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ক্রমশঃ

সখের জিনিস

শ্রীকানাই বসু

"ভালো জিনিস কিছু কি তোমাদের জ্বালায় থাকবার জো নেই! এই সেদিন সেই আবলুশ কাঠের রুলারটা উধাও হল, আবার আজ এই পেপারওয়েটটা। একি সব পাখা গজাচ্ছে নাকি? চালাকি? কোনো কথা শুনতে চাই না। যেখান থেকে পারো বার করা চাই।"

বলিলাম বেয়ারাদের লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু বাবুরাও বুঝিলেন যে এই ধমক ধামকের লক্ষ্য কেবলমাত্র বেয়ারারাই নহে।

সর্দার বেয়ারা সদানন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম—যদি বাহির করিতে না পারে তবে প্রত্যেকের এক টাকা জরিমানা হইবে। বাবুরা পর্য্যন্ত নিজের কাজ ফেলিয়া খুঁজিতে লাগিয়া গেলেন। অফিসশুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছি।

কিন্তু এত কাণ্ড করিবার কোনো দরকার হইত না। উহারাই খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া এতটা করিতে বাধ্য করিল। সকাল হইতে যে কেহ আমার টেবিলের ধারে আসিয়াছে, সে-ই ঐ পেপার ওয়েটটার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। প্রথমে আসিলেন জগৎবাবু। বুড়া এদিকে কাছের জিনিস নাকের কাছে না ধরিলে দেখিতে পান না, কিন্তু দূরের জিনিস তাঁহার চোখে এড়ায় না। "টেবিলটি আপনার দেখলে হিংসে হয়, তা যাই বলুন বড়বাবু। এমন নিট্ এণ্ড ক্লিন। যেখানে যেটি থাকবার কথা, ঠিক সেইখানেই, —ছুরি, কলম, ব্লটার, কাগজ—পেপারওয়েট—কই আপনার সেই প্রিয়তম গণেশমার্কাটি কোথায়? সেটি নইলে আপনার টেবিলটি মানায় না, তা যাই বলুন। সেটি আপনার মধ্যমণি। সেটি বুঝি বার করেন নি?"

কথাটায় কান দিই নাই। তারপর আসিল নির্মল। ছোকরা কাল অফিসে ঢুকিয়াছে, কিন্তু মুখে যেন কিছু আটকায় না। তবে গুণের মধ্যে রাণাঘাটে বাড়ী। কলিকাতায় বিবাহ হওয়ায় দেশে যাওয়া তাহার ঘন ঘন হয় না বটে; কিন্তু গেলে শুধু হাতে আসে না। স্বদেশের মিষ্ট নাম বজায় রাখিবার চেষ্টা করে।

নির্মল বলিল, "কী হল সার্, আমাদের পাশ কই?"

"পাশ কি এরই মধ্যে চাওয়া যায় হে। সবে নতুন বই খুলেছে, দাঁড়াও পুরোনো হয়ে আসুক।"

"ওসব আমি শুনব না সার্, নতুনই থাকুক আর পুরোনোই থাকুক, আসছে শনিবার আমরা দুজনে, না, দুজনে নয়, তিনজনই ধরুন, শ্বশুরবাড়ী থেকে আনতে গেলে ও শালীটা বা হয়েছে ঠিক সঙ্গ নেবে। তিনজনে যাব, শুক্রবারে বিকেলে যদি পাশ না পাই, তাহলে, তাহলে আপনার এই গণেশবাবাজীটি আমি চক্ষুদান করব, তা বলে রাখলুম। কোথায় গেলেন বাবাজী?"

বলিলাম, "আছে এইখানেই কোথায়।"

নির্মল বলিল,—"আছেন তো? নাকি উল্টেছেন? কেউ চক্ষুদান করলে না তো? দেখবেন।"

হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। থানাতল্লাস করানোর কথা তখনো

আমার মনে হয় নাই। কিন্তু কথায় বলে, বার বার তিন বার। দীনেশ সমাজায় আসিয়া বলিল, "গুড্ মর্নিং দাদা।"

উত্তর দিলাম, "বেষ্ট মর্নিং ভাই। তারপর কী খবর?"

দীনেশ ডান হাতে পানের ডিবা খুলিয়া সামনে ধরিল। এক জোড়া খিলি উঠাইয়া লইতেই বাম হাতে জর্দার কৌটা টিপিয়া খুলিল। এক টিপ জর্দাও লইলাম। এ সকলই নিত্যকর্ম-পদ্ধতি অনুসারে। নিজের মুখে দুইটি খিলি ফেলিয়া দিয়া দীনেশ কহিল, "খবরের কথা আর বলবেন না।"

"বেশ, যদি বারণ কর, বলব না।"

"না না, ঠাট্টা নয়। একটা স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট নেই? তুই খেলতে এসেছিস, না পাটের দালালি করতে এসেছিস্? বল্?"

বলিয়া দীনেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল; যেন আমিই কোথায় খেলিতে গিয়া পাটের দালালি করিয়া ফেলিয়াছি।

প্রায় আধমিনিটটাক্ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া দীনেশ বলিল—"জীবনে যদি আর খেলতে না পাই সো ভি আচ্ছা, তবু ঐ বেটা অধ্‌রাটার সঙ্গে আর খেলব ন্না, কক্ষণো না।"

বলিলাম, "বেটা কী হে? অধরবাবুকে বেটা? বুড়ো মানুষ!"

"বেটা বলবে না তো কি জ্যাঠামশাই বলে কোলে নিয়ে নাচতে হবে?"

বলিতে পারিতাম, জ্যেঠামহাশয়কে কোলে করিয়া নাচাটা এখনও রেওয়াজ হয় নাই, বাতী-নৃত্য, কলসী-নৃত্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, জ্যাঠা-নৃত্য এরই মধ্যে চলিবে কি? কিন্তু বলিলাম না, বলিলে আস্কারা পাইয়া মাথায় উঠিবে।

কিন্তু দীনেশ আমার বলা না বলার তোয়াক্কা রাখে না। মাথায় সে উঠিয়াই আছে। ব্লটিং প্যাডের উপর খচ্ খচ্ করিয়া গোটাকত ঘর টানিল এবং ফস্ করিয়া পিনকুশনটা টানিয়া লইয়া বলিল—"এই ধরুন, এই আছে আমার দাবা, আর এই আমার নৌকো ইদিকে, আর ইদিকে গজ।"

গোটা দুই কাঁচের কাগজচাপা, একটা ছাইদানি, একটা ভিজা স্পঞ্জাধার, একটুকরা ইরেজার ও তাহার নিজের পানের ডিবা জর্দার কৌটা সব বিভিন্ন ভূমিকায় নামিল।

—"এই নৌকো আপনার, আর এই দুটো বড়ে, আর ওদিকে এই ঘোড়া গজ—আর আর—আচ্ছা দেখি দোয়াতটা দিন তো—"

বলিয়া দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া সে দোয়াতটা উঠাইয়া ঘোড়া না গজ কী দাঁড় করাইল। তারপর বোধহয় আর কাহাকেও না পাইয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, গণেশ-অধিষ্ঠিত কাগজচাপাকে।

সেই একই কথা। গণেশ কোথায় গেলেন? হারিয়ে গেলেন নাকি? চুরিও যেতে পারে, দেখা দরকার, ইত্যাদি।

আর গণেশদেবের অন্তর্ধানকে উপেক্ষা করা যায় না। সর্ব্বজন-পরিচিত ও প্রায় সর্ব্বজনপ্রিয় বস্তুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া বসিয়া থাকা আর ভালো দেখায় না। বিশেষতঃ সবাই জানে ওটি আমার বড় সখের জিনিস। নিষ্ফল জানিয়াও অনুসন্ধান সুরু করাইলাম। কিন্তু ইহাও বুঝিলাম যে, এতগুলি লোকের সাগ্রহ সোৎসুক দৃষ্টির বিষয়বস্তু যাহা, তাহা আজ অন্তর্হিত যদি নাও হইত, হইতে বড় বিলম্বও হইত না। সেই হিসাবে আজ অন্তর্হিত হওয়া মন্দ হয় নাই। বরং আরও আগেই অন্তর্ধান হওয়া উচিত ছিল। তবে অনুসন্ধান একটা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলাফল যেমনই হউক।

সুতরাং অফিস তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছি।

ভবতোষ আসিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল—"সার, কালকের ড্রাফ্‌টটা কি দেখা হয়েছে? যোজার সাহেব হয়তো এখুনি—"

সঙ্কোচে এবং আমার মেজাজের উগ্রতায় সে তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না। বলিলাম—"কখন আর দেখলুম বল? দেখছ তো আপিসের কাণ্ড। কাজ করতে ইচ্ছে করে এখানে? না, কাজ করতে ভালো লাগে? বল?"

ভবতোষ ছেলেটির বড় বিনীত কথাবার্ত্তা। কাজকর্ম্মও ভালো করে। এ বছর তাই তাহার তিন টাকা মাহিনাও বাড়াইয়া দিয়াছি। সে বলিল—"আজ্ঞে কী বলব বলুন। অবাক হয়ে গেছি। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার তো কখনো দেখিনি। চোখের সামনে থেকে জিনিস উড়ে গেল!"

"গেল না? তোমরা হয়তো মনে করছ, তুচ্ছ জিনিষ, কতই বা দাম। এত বড় একটা আপিসের তাতে কীই বা এসে গেল।"

"আজ্ঞে না সার, তুচ্ছ হোক, দামী হোক্, যাবে কেন। কাল যে জিনিস দেখেছি—"

"একজ্যাক্‌টলি সো। যাবে কেন। আর তা ছাড়া ওটা আমার বড্ড সখের জিনিস ছিল হে। বড্ড পছন্দ হয়েছিল জিনিসটা।"

ভবতোষ যেন মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল,—"পছন্দ? পছন্দ হবার মতন জিনিসই-যে ছিল সার। অপূর্ব্ব জিনিস। না সার, আপনি ড্রাফ্‌ট আর কাকেও টাইপ করতে দিন, আমি একবার খুঁজতে লাগি। আমার মনে হচ্ছে কেউ ভালো করে দেখছে না।"

খুব উৎসাহী ছেলে ভবতোষ। কিন্তু অনর্থক উদ্যম ও সময় অপব্যয় করিয়া তো লাভ নাই। বলিলাম—"মিথ্যে খুঁজবে ভবতোষ; ও উদ্ধারের আশা তুমি ছেড়ে দাও। মিছিমিছি কাজের ক্ষতি করে কোনো লাভ নেই।"

অফিসে সারাদিন কাহারও মুখে হাসি দূরে থাক, উচ্চ কণ্ঠে কথা পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আমি কঠিন মুখ করিয়া বসিয়া থাকিলে বেচারীরা আর হাসে কোন সাহসে। ভয় হইয়াছে বোধকরি সকলেরই। ইচ্ছা করিলে দুই একজন লোকের চাকরীর নিকাশ করিয়া দিতে পারি।

অতদূর করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে ভবিষ্যতে আর কোনও জিনিষ কাহারও টেবিল হইতে না উধাও হয়, তাই সাবধান করিয়া দিবার জন্য ছুটির আগে সকলকে ডাকাইয়া বলিলাম,—"তোমরা হয়তো মনে মনে করছ, কোম্পানীর পয়সার অভাব নেই, আর একটা কিনে নিলেই হয়। অত কিসের! বড়বাবুর সব বাড়াবাড়ি।"

মৃদু স্বরে দুই একজন বলিতে চেষ্টা করিল—তাহারা ওরূপ মনে করে নাই। হাত তুলিয়া তাহাদের থামাইয়া দিয়া বলিলাম—"কোম্পানীর পয়সার অভাব নেই বটে, কিন্তু পয়সা যতই থাক, ও জিনিষ আর কলকাতার বাজারে নেই বুঝলে? দুটি কিনেছিলুম, একটি বাড়ীতে ছেলেটার জন্যে রেখেছি, আর একটি এনেছিলুম অফিসে।"

আজ হইতে শুনাইয়া রাখা ভালো। নচেৎ ইহার পর

কোনদিন কে আমার বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া হয়তো সন্দেহ করিয়া বসিতে পারে। তখন যতই যা বলি, বিশ্বাস করানো শক্ত।

—"বোধহয় চোদ্দ টাকা জোড়া নিয়েছিল, না অনুকূলবাবু? দেখুন দিকি আপনার পেটি-ক্যাশের খাতাটা। অক্টোবরের শেষের দিকেই হবে, পেপার-ওয়েট একটা সাত টাকা লেখা আছে না?"

অনুকূলবাবু খাতা দেখিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ছ টাকা দশ আনা।"

অনুকূলবাবুর ঐ স্বভাব। প্রতিবাদ করিতে উঠিলেও "আজ্ঞে হ্যাঁ" দিয়াই কথা শুরু করিবেন। অতিশয় ভালো মানুষ, কিন্তু ঐ আজ্ঞে হাঁর জন্য মনে হয় যেন ঠাট্টা করিতেছেন। কোন্ কথাটা মানিয়া লইলেন আর কোন কথাটা অবিশ্বাস করিলেন তাহা ঠিক বোঝা যায় না।

বলিলাম—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত স' তেরো টাকায় নেমেছিল বটে। আর এখন? পনেরো টাকা দিচ্ছি, একজোড়া নয়, একটা আনো তো দেখি কেউ। বড় সাহেব পর্য্যন্ত বলেছে—বিউটিফুল থিং, ডাট। এটা আমি নিলুম। আমি বলেছি, দাঁড়াও সায়েব, উটি ছাড়ব না। তোমাকে আর একটি এনে দেব। কিন্তু আজ অবধি আর একটি তো আমার চোখে পড়ল না। যাক্। ও গিয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে আর যেন কারও জিনিষ পত্তর টেবিল থেকে না হারায়। এই বলে দিলুম। যার কাছে যা ষ্টেশনারি আছে তার জন্যে সে দায়ী। হারালে গুনোগার দিতে হবে, এইটি মনে থাকে যেন।"

বাড়ী ফিরিয়া আমার নিজস্ব ছোট আলমারিটা খুলিয়া মানিব্যাগ, ফাউন্টেনপেন, পকেটবুক, ট্রামের টিকিট ইত্যাদি রাখিয়া দিলাম। তারপর সবশেষে পেপার ওয়েটটি রুমালে মুছিয়া রাখিতেছি, স্ত্রী পিছন হইতে আসিয়া বলিলেন, "দেখি দেখি, এটা আবার কবে কিনলে গো?"

বলিলাম, "অনেক দিন থেকে শখ ছিল, আনলুম একটা।"

"তাতো আনলে বুঝলুম। আলমারিটি তো বেশ মণিহারি দোকান করে তুলেছ। এত পয়সাও বাজে নষ্ট করতে পারো তুমি।" বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পেপার-ওয়েটটি দেখিতে লাগিলেন!

মুখের ভাষায় যাহাই বলুন, মুখের ভাবে তাঁহার মুগ্ধ প্রশংসা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম, "বাজে পয়সা বই কি, কী বিউটিফুল জিনিষ বলতো।"

"তা বিউটিফুল বটে, গণেশের মুখখানি, শুঁড়টি, হাতগুলি করেছে বড় সুন্দর। কিন্তু কত পড়ল শুনি?" বলিয়া আঁচলে মুছিয়া সেটি আলমারিতে রাখিলেন।

গণপতি তাঁহারও মনোহরণ করিয়াছে। কিন্তু মুখে তো হারিবেন না, হাজার হইলেও স্ত্রীলোকের জাতি যে। বলিলেন, "নিজের সখের বেলা পয়সা লাগেনি না? আর এত করে বললুম একখান লংক্লথ এনে দাও, ছেলেগুলোর ইজের ছিঁড়ে গেছে, বালিশের অন্ত একটা যদি আস্ত থাকে, তাতে পয়সা বেরোবে কেন। যাক্ এটা আমার রইল। এ তুমি পাচ্ছ না।"

ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ পুত্ররত্ন আসিয়া হাজির হইল। মাটিতে মিছরির দানা পড়িলে পিপড়াকে ডাকিতে হয় না, আসিবামাত্র দৃষ্টি যথাস্থানে গিয়া নিবদ্ধ হইল। অমনি নর্ত্তনও সুরু হইল।

"আমি নেব বাবা। হ্যাঁ, ওটা আমার। আমি আগে থাকতে বলে রাখছি। হ্যাঁ।"

বলিলাম—"কী রে, কী তোর?"

"ঐ যে, ঐ গণেশ ঠাকুরটা। ওটা আমি নেবই কিন্তু। আমার টেবিলে রাখব।" বলিতে বলিতে আলমারির পাল্লা ধরিয়া টানিল। কিন্তু গৃহিণী তো তাহারই জননী। ক্ষিপ্রহাতে আলমারি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—"পড়ার সঙ্গে খোঁজ নেই, সখ আছে ষোল আনা। তাতে ঠিক বাপের ধারা। যা যাঃ।"

"হাঁ। পড়ার সঙ্গে খোঁজ নেই, অমনি বল্লেই হল! বেশ সখ তো সখ। দেখ না, আমি ঠিক একদিন বার করে নেব। তখন দেখবে।"

দুমদাম করিয়া পা ফেলিয়া পুত্ররত্ন চলিয়া গেল। তাহার জননী তাহার উদ্দেশে হাঁকিয়া বলিলেন—"খবরদার এতে হাত দিও না খোকা। বারণ করে দিলুম। ভালো জিনিস একটা রাখবার জো নেই তোমাদের জ্বালায়। একবার চোখে পড়লে হয়।"

শুধু তিরস্কার করিয়া ও খবরদার বলিয়া তাঁহার মন শান্ত হইল না। তিনি আবার আলমারি খুলিলেন ও পেপার-ওয়েটটি বাহির করিয়া বলিলেন—"নাঃ, বিশ্বাস নেই ওদের। এই সেদিন অমন আবলুশ কাঠের রুলটা তুমি এনে দিলে, এরই মধ্যে তাকে ভেঙে দুখান করেছে বেরাল মারতে গিয়ে। এটা আমি নিলুম বাপু। দিব্যি গণেশটি করেছে।"

দিব্য গণেশটি করিয়াছে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকেই উহা লইতে হইবে এ যুক্তি আমি বুঝিলাম না। বলিলাম—"তা বেশ তো, তা তুমি নেবে কেন? আমার আলমারিতে থাকুক না।"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন,—"হ্যাঃ, তোমার আলমারিতে থাকবে। কচি খোকার মতন তুমি পুতুল সাজিয়ে কী করবে শুনি?" বলিয়া পিছন ফিরিলেন এবং চট্‌পট্ করিয়া নিজের পুতুলের আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতরে গণেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম। বলিতে পারিতাম যে আমি কচি খোকা নই বটে, কিন্তু তিনি কি চির-কচিখুকী হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বিপদ বাড়ানো সুযুক্ত হইবে না।

যেমন ছেলে তেমনি তাহার মা। সখ করিয়া একটা জিনিষ ঘরে আনিয়া স্বস্তি নাই। চোখে পড়িল তো অমনি ছোঁ মারিয়া লইবে। দূর কর ছাই! কেন মিছে ভূতের ব্যাগার খাটিয়া মরা। ইহাদের রাক্ষসের পেট তো ভরিতে পারিব না, তবে আর কেন। আচ্ছা।

পরদিন অফিসের সকলেই অতিশয় চমৎকৃত হইল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ছিল? কে খুঁজিয়া বাহির করিল? কখন পেলেন? ইত্যাদি।

বলিলাম, "কই, কে আর খুঁজে বার করলে বল। বাড়ীরটাই নিয়ে এলুম। ছেলেটার সখের জিনিষ, সে একটু টঁ্যা করতে লাগল বটে, তা আর কী হবে। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঐ গণেশ দেবকে চোখের সামনে দেখে কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। আর দেখতে পাবনা ভাবতেই কেমন বিশ্রী লাগছিল।"

ফাজিল নির্মল বলিল—"তাই ছেলের জিনিষটা গাপ করলেন? নাঃ, সখ বটে আপনার।"

ভুটানের বুকে শিবধামে

শ্রীমতিলাল দাশ

ভুটান চির-রহস্যময় দেশ। একান্ত নিকটে—অথচ রয়েছে অপরিচয়ের নিবিড় আড়ালে, দেশ দেশান্তর থেকে অনেক যাত্রী আসে—তারা ভারতবর্ষকে দেখে, কিন্তু ভুটানকে দেখবার সুযোগ জোটে



মতিরাজ, ভৃত্য ও নিহত ব্যাঘ

কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট সরকারী লোকের। তাদের বর্ণনা থেকে আমরা ভুটান সম্বন্ধে যা কিছু জানি।

হিমালয় নামে যে নগাধিরাজ পূর্ব্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত চলেছে—ভুটান সেই অভ্রংলিহ পর্ব্বতমালার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত শৈলমালায় গঠিত মনোরম স্বাধীন দেশ। ভুটানের অধিবাসীরা ভুটিয়া—আলখাল্লায় ও অদ্ভুত পোষাকে তাদের কিম্ভুতকিমাকার দেখায়, তাই আমার তৃতীয় পুত্র সর্ব্বজিৎ অপূর্ব্ব ও বিশ্রী মোটা কাউকে দেখলে বলে ওঠে—"ঐ ভুটিয়া যাচ্ছে।"

পাহাড়ে থাকে বলে এরা প্রতিদিন স্নান করে না—এদের পোষাক পরিচ্ছদও জবরজং—শিক্ষার ও জ্ঞানের আলো ভুটানে প্রবেশ করে নি—কাজেই ভুটিয়াদের আমরা অদ্ভুত মনে করি।

ভুটান দেশের উত্তরে তিব্বত—পূর্ব্বে নানা পার্ব্বত্যজাতির পশ্চিমে সিকিম এবং দক্ষিণে আসাম ও জলপাইগুড়ি। পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে—অধিত্যকা ও উপত্যকায় মানুষের বসতি। নিসর্গের মাধুর্য্য এখানে অবারিত।

ভুটানের অভ্যন্তরে আমরা প্রবেশ করিনি—কিন্তু দ্রুতগামী মোটর থেকে তরুগুল্মময় এই শৈলশ্রেণী দেখে দাদা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, বলেন, "কবি! এইবার লেখনী ধরুন।"

সেদিন থানা-ভরতি বা রেবী নদীর উপল বিক্ষিপ্ত বালুবক্ষ বেয়ে যখন আমরা চলেছিলাম, তখন দুধারে ও সম্মুখে পাহাড়ের এই চমৎকার মাধুর্য্য আমরাও অনেকটা দেখে নিয়েছি। মহান্ মহিমাময় এই শৈলদেবতার চরণতলে দাঁড়িয়ে কবি হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলি জানিয়ে এসেছি। এই শৈল ও বনভূমি ভেদ করে নির্ঝরিণী গিরিনদী কলনাদে বেয়ে চলেছে দক্ষিণে—। ইহারা সমতল বাংলার বুক বেয়ে অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের জলধারাকে পুষ্ট করেছে।

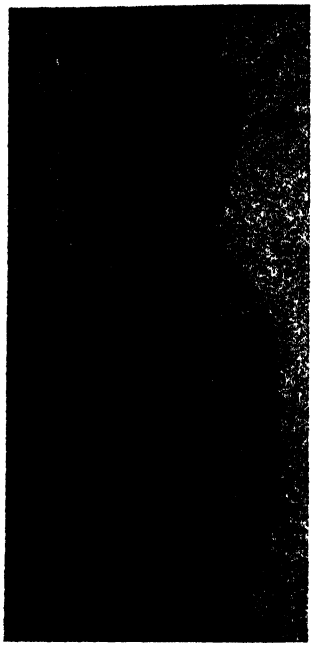
এক শনিবার ২টা ২০ মিনিটে রওনা হওয়া গেল। তিস্তার বক্ষে জলধারা নেমেছে, কিন্তু বর্ষার দুর্দ্দম রূপ নয়। তিস্তা পার



বামে মতিরাজ ও ডাহিনে রত্ন বাহাদুর

হয়ে আলিপুরদুয়ারের চমৎকার রাস্তা—সেখান দিয়ে মোটর বায়ুগতিতে ছুটে চলল।

ভুটান ও কুচবিহার এক সময়ে একই জাতির অধিষ্ঠান ভূমি ছিল, তাদের নাম টেকু। প্রায় আড়াই শ বছর আগে কতকগুলি তিব্বতী এখানে আপন আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে



ভুটান-প্রবাসী নেপালী

কুচবিহার রাজার প্রার্থনায় কোম্পানী ভুটিয়াদের পরাজিত করে। তেসুলামার মধ্যস্থতায় এক সন্ধি স্থাপিত হয়। কাপ্তেন টার্ণার ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভুটানে যান—উদ্দেশ্য বাণিজ্য স্থাপন। ইহা ব্যর্থ হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আসাম অধিকার করে। তখন তারা জানতে পার যে ভুটিয়ারা 'দুয়ার' নামক কতকগুলি গিরিপথ সংলগ্ন সমতলভূমিকে অধিকার করে নিয়েছে। ভুটানরাজ তার জন্য কর নিতে চান, কিন্তু তা না দেওয়ায় ইংরাজ এগুলি কেড়ে নেয়। ভুটিয়ারা দুয়ারের বৃটিশ প্রজার উপর উৎপীড়ন করায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইডেন ভুটানে যান। কিন্তু তার দৌত্য সফল হয়নি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ পশ্চিম দুয়ার দখল করে নেয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়—তার ফলে ভুটানরাজ আসাম ও বাংলার ১৮টি দুয়ার ছেড়ে দেন। ইংরাজ তার বদলে ভুটানকে বার্ষিক কর দেন।

তিস্তার পারে আলিপুরদুয়ার এই অধিকৃত দুয়ারের অন্যতম। গাড়ী চলল—আমার ঘুম পাচ্ছিল—আমি চোখ বুঁজে তন্দ্রা দিলাম। নগেনবাবু ও দাদা গল্প করে চল্লেন।

জলঢাকা সেতুর নিকট ঘুম ভাঙ্গল—এই সেতুটি স্থাপত্য-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। ধূপগুড়ির হাট প্রকাণ্ড হাট—সেখানে নেমে হাটটি দেখে নিলাম।

আধঘণ্টা পরে সোজা উত্তরে চললাম। সাড়ে চারটায় কাঁটালগুড়ির বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। চমৎকার বাংলো—সুপরিসর। পুষ্পশোভিত—বাংলোয় আমাদের জন্য সুন্দর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল।

চা পর্ব্বের একটু দেরী…

সম্মুখে ভুটানের পাহাড়…দূরে একটা পাখী ডাকে…"বৌ কথা কও"

কি তার আর্ত্ত কণ্ঠ…পাখীর কবি-হৃদয়ে এ মিনতি কেন? যে কথা বলবে না, সেই মানিনীর মান ভাঙ্গাবার এই অসাধ্য আয়োজন কেন?

চা পান শেষে চামুরচি দরবারে মন্ত্রিরাজ গুরুং মহাশয়ের বাসায় গেলাম—ইনি কাজি…বিচার করেন, জমিদারের মত কর আদায় করেন…পান এবং অর্দ্ধখণ্ডিত কাঁচা সুপারি এনে আতিথ্য করলেন। দেখালেন তার নেপালী আইনের বই…ভুটান ও তিব্বতের মানচিত্র।

জানালেন…আগে খবর না দেওয়ায় ঘোড়ার আয়োজন অসম্ভব…আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে পাহাড়ের শোভা শিবধাম দেখে আসতে পারি, আমরা তাতেই সম্মত হলাম। মন্ত্রিরাজকে ভুটানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার কথা প্রশ্ন করলাম। মন্ত্রিরাজ বোধ হয় বিশেষ কিছু জানেন না—ভাসা ভাসা উত্তর দিলেন।

ভুটানের শাসন চলে দুইজন শাসনকর্ত্তার তাঁবেদারীতে—একজন ধর্ম্মরাজ, অপরজন দেবরাজ। ধর্ম্মরাজ জাতির আধ্যাত্মিক বিষয়ের সর্ব্বময় প্রভু, আর দেবরাজ পার্থিব বিষয়ে প্রভু। ধর্ম্মরাজ দেবতার অবতার। একজন ধর্ম্মরাজের লোকান্তর হলে ২ তিন বৎসর তার সিংহাসন শূন্য থাকে। তার পর অবতারের সন্ধান হয়—যে শিশু পূর্ব্ব-ধর্ম্মরাজের তৈজসপত্রাদি চেনে তাহাকেই ধর্ম্মরাজ বলে গ্রহণ করা হয়—তার পর বৌদ্ধ মঠে তার শিক্ষা ও পরিপালন হয়। বয়োপ্রাপ্তি হলে তিনি আপন শাসন পরিচালনা করেন। দেবরাজ মন্ত্রিসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হ'ন।

দাদা মন্ত্রিরাজকে ভুটানের অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

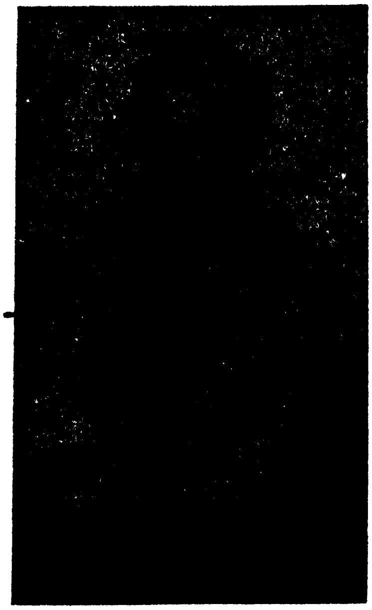


ভুটান-প্রবাসী নেপালী

সে সব উত্তর জ্ঞানগর্ভ নয়। ভুটান সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য নিয়ে সঙ্কলন করে দিলাম। ভুটান পশ্চাৎপদ রাজ্য—নেপালের

মত এখানে বর্ত্তমানতার কিরণ রেখা ফেলতে পারেনি। এদের লোকসংখ্যা কত তা কেউ জানে না। যা বলা যায় সেটা আনুমানিক···বোধ হয় এক লক্ষের উপর লোক হবে না। '

এখানে শাসন ও বিচার নেই বললেই চলে। জোর যার মুল্লুক তার—তাই এরা দাসের মত জীবনযাপন করে। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কোনও মাইনে পায় না, তারা জাইগীরদার—রাজাকে যত অধিক দেয়, ততই তার প্রতিপত্তি। ভুটিয়ারা দেখতে বেশ বলবান, কিন্তু অপরিষ্কার বলে ওদের শারীরিক সৌন্দর্য্য হয়ত মন ভুলায় না। এরা যা তা খায়—মাংস খেতে এদের বাধা নেই—যদিও এরা বৌদ্ধ। মারুয়া ও ধেনো মদ এরা খুব খায়—চীনে চা এদের খুব প্রিয়। এদের বাড়ী সাধারণতঃ দ্বিতল ত্রিতল—একখানি বারান্দায় সূক্ষ্ম কাঠের কারুকার্য্য থাকে। বৌদ্ধ হলেও খুব কম লোকেই বৌদ্ধধর্ম্মের মহৎ অবদানের কথা জানে। এরা প্রেতোপাসক। জঙ্গলের ধারে এরা কুটীর বাঁধে। জঙ্গল পুড়িয়ে তাতে যব, ভুট্টা, গম, সরিষা, লঙ্কা প্রভৃতির চাষ করে। ভুটানের উর্ব্বর জমিতে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় শাক-সব্জী দুই ভাল হয়—কিন্তু এসব বিষয়ে চেষ্টা কম। এখানে আপেলের চাষ চলছে—মতিরাজ সেকথা আমাদের বলেছেন। কমলালেবুর বিস্তৃত চাষ আরম্ভ হয়েছে। মতিরাজের শালা রত্নবাহাদুর নিজেই কমলাবাগান করেছেন। কমলা বাগানের শোভা অতিশয় চমৎকার ; শীতকালে যখন কমলা পাকে, তখন এই সব উদ্যানের মধুর শোভা দেখবার জন্য বহুলোক এখানে আসে। ভুটানের চাষীদের চাষের বুদ্ধি ভাল—ওরা জমি বাড়াতে চায় না—কারণ তাহলে খাজনা বেশী দিতে হবে। যে জমি আছে তা থেকে ওরা



ভুটিয়াদের ছবি

দুনো ফসল ফলাতে চায়। ভুটানে একরকম চমৎকার শালগম হয়—এগুলি আঁশ আঁশ নয়—আলুর চাষও বেশ হয়েছে।

ভুটানের পাহাড় নানা তরুগুল্মে আবৃত ; দুরারোহ পাহাড়ে দেওদার জাতীয় গাছ অনেক আছে—নীচে তৃণ, নাস্পাতি প্রভৃতি গাছ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

কোন কোন পাহাড়ে চন্দন ও দারুচিনির গাছ পাওয়া যায়।

ভুটানের জঙ্গলে হাতী অনেক। বুনো হাতী মাঝে মাঝে খুব অত্যাচার করে। চিতাবাঘ ত আছে—বড় বাঘও দুর্লভ নয়। কস্তুরী মৃগ আছে দুর্গম পাহাড়ে—তবে সাধারণ হরিণ পাহাড়ের যত্রতত্র দেখা যায়।

ভুটানের দেশী নাম টাঙ্গাস্থান—তাই এ দেশের জাত ঘোড়ার এক নাম টাঙ্গান। এই ঘোড়াগুলি দেখতেও সুন্দর অথচ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু। এদের শিল্পবিদ্যা রয়েছে মধ্যযুগের মাঝে। এরা রূপোর এক রকম টাকা নিজেদের টাকশালে তৈরি করে। তা ছাড়া তরবারি প্রভৃতিও তৈরী করে। মতিরাজ তার দরবারী তরোয়াল দেখালেন—এটা বেশ সুন্দর বলেই মনে হল। এরা যেসব ভুটিয়া কম্বল, সোয়েটার প্রভৃতি তৈরী করে, সেগুলি দুচারজন আদর করে কেনেন—কিন্তু সেগুলি সব মোটা বুনন। এদের আদেশগুলি আসে ভূর্জ্জপাতার মত রচিত একরকম দেশী কাগজে—এমন একটা শাসন মতিরাজ আমাদের দেখালেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মতিরাজ ও রত্নবাহাদুরের ওখান থেকে বিদায় নিলাম।

মতিরাজ ধীর গম্ভীর, রত্নবাহাদুর চপল ও চঞ্চল। সে বলল "হয়ত একটু কষ্ট হবে, কিন্তু নূতনত্বের দেখা হবে।"

তার কথা ফলেছিল। শিবধাম মতিরাজের বাড়ী থেকে ৫-৬ মাইল দূরে—ওরা বলেছিল মাত্র আধ মাইল।

পরদিন সকাল সকাল চা পান করে মোটরে মতিরাজের ওখানে আসা গেল। ডাঃ ঘোষ চা বাগানের ডাক্তার—তিনি বললেন—"মাছ ধরার আয়োজন মন্দ নয়—তবে তার জন্য ডিনামাইট চাই।"—যেখানে স্বচ্ছ পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী আবর্ত্ত ও গুহা তৈরি করেছে, সেখানে মাছ লুকিয়ে থাকে—বড় বড় তোড় মাছ ডিনামাইট দিলে জলের উপর ভেসে ওঠে। ডাঃ ঘোষ গামছা সঙ্গে নিয়েছিলেন, কিন্তু মতিরাজ বিশেষ কাজের লোক ন'ন বলে মনে হল। তিনি ডিনামাইটের ব্যবস্থা করতে পারলেন না—অথচ তিনি পূর্ব্বদিন পত্র দিয়েছিলেন মাছ ধরবার আনন্দোৎসব করবেন।

বাসের যোগাড় হয়'ন, তাহলে পাহাড়ের গা পর্য্যন্ত যাওয়া যেত ; আমরা রেতীর বুক বেয়ে চললাম—কুলুকুলুনাদে নদী বইছে—দুধারে বনস্পতিগুল্মমালাময় পাহাড়, পায়ের তলে বালু ও উপল। সেই দিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে এই অভিযান খুব আনন্দময় লাগছিল। মাঝে মাঝে জুতা খুলে স্রোতোধারা পার হতে হল।

পাহাড়ে পথ বেশী খারাপ নয়—দুধারে কমলাবাগান—অবশ্য তখন একটীও 'বাগানে' কমলা ছিল না। লুব্ধ-দৃষ্টি দিয়েও একটীর আবিষ্কার হয়নি।

পথে পড়ল একটা নাস্পাতি গাছ—তার চমৎকার ফুল ও ফল! দেখতে বেশ ভাল লাগে। অর্দ্ধেক পথের শেষে একটা স্থানে একটী পাথরের আসন আছে। নগেনবাবু পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন—বসে সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করলেন। তারপর বললেন—"সোমরস পান করুন—"

এটা কলার সিরাপ—কিন্তু নাম ছিল Beverge—বোধ হয় মদ্যজাতীয় কিছুর সংযোগ ছিল—বিজ্ঞাপনে লেখা, এটা ক্লান্তির ঔষধ। পার্ব্বত্য ঝর্ণার জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করা গেল।

রত্নবাহাদুর ও আমি আগিয়ে গেলাম।

উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠে আবার নীচুতে নামতে হয়—তারপর খাড়াই উঠতে হয়—সেখানে একটা পার্ব্বত্য নদী—আমরা



ভুটিয়াদের ছবি

তার উপর বসে পিছনের বন্ধুদের জন্ত অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় ডাঃ ঘোষ এসে বললেন :—নগেনবাবু বসে পড়েছেন, আর আসতে পারবেন না…দাদাও অতিশয় শ্রান্ত…আমি ও ডাঃ ঘোষ এগিয়ে গেলাম—পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পথ—সে পথ জঙ্গলে ভরে উঠেছে—তাতে অসংখ্য জোঁক। যখন শিবধামের সম্মুখস্থ ছাতিমতলায় পৌঁছান গেল, দেখি জুতায় ও কাপড়ে অনেক জোঁক লেগেছে।

এক বাতে পরিবার ভগবানকে পূজা দিতে এসেছে—চামুরচির এক পশ্চিমা ঠাকুর এসেছে তাদের পৌরহিত্য করতে। জুতা খুলে গুহায় প্রবেশ করলাম…চূর্ণাপাহাড়ের গুহা—অন্তঃশীলা নির্ঝরের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে গুহার মস্তকে শিবের জটার মত সুন্দর জটাকৃতি লম্বিত প্রস্তর তৈরি হয়েছে—মাটিতেও শিবলিঙ্গের মত লিঙ্গ তৈরি হয়েছে…স্বভাবের এই মনোমোহন সৃষ্টি আমাদের ভক্তিহীন মনেও মহান ভাবের উদ্রেক করে। চামুরচির ঠাকুরদাদা এসে আচমন মন্ত্র পড়িয়ে তাহাদের কাছ থেকে টিপবাতি নিয়ে গুহা দেখাতে চলল…সে বলল ভিতরে চলুন…শিবপার্ব্বতী দেখবেন…কাদা ও জল—পাষাণের বক্ষ পিছল—আমরা সাহস করে অগ্রসর হলাম না…তবে বিচ্ছুরিত বাতির আলোকে দেখে নিলাম—নানা ভঙ্গিমাময় সেই অপূর্ব্ব কারু।

সেই নির্জ্জন গিরিশিখর—সেই বনভূমি…সেই চূর্ণ পাহাড়ের গুহা—মনে বিস্ময় ও আনন্দ আনে। হয়ত কালে এখানে মন্দির হবে।

যা সহজ, যা প্রকৃতির আপন হাতের দান—তা মানুষের হাতের গড়া সৌধের মাঝে বেরূপ হবে—অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে এই নীরবতা ও মাধুর্য্য লোপ পাবে, কিন্তু তবুও আমাদের দেশের মনে দেবতা গড়বার যে অমায়িক বাসনাই আছে তাকে তুচ্ছ বলতে পারিনে। দাদার বেশ কষ্ট হয়েছিল—ফিরবার পথে তাকে নেওয়ার জন্ত দুইজন লোক পাঠান গেল—আমি নগেনবাবুর সন্ধানে দ্রুত অগ্রসর হলাম। দুঃখ হল এই তরুণহৃদয় বন্ধু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেও মনে মনে এতখানি তেজ ও শক্তি রক্ষা করেছেন।

ফিরবার পথে নির্ঝরের বুকে উপলখণ্ডের উপর বসে সঙ্গের আনীত জলখাবার ও সোমরসের সৎকার করা গেল। পশ্চিমাঠাকুর ততক্ষণে ফিরেছিল, তাকে কিছু কদলী উপহার দেওয়া গেল।

আমি ও রত্নবাহাদুর আলাপ করতে করতে আগিয়ে গেলাম; এই তরুণ নেপালী যুবার অন্তরে রয়েছে অসীম আগ্রহ।

আবার রেতীর বুক বেয়ে ফিরলাম—মতিরাজের ঘরে ওরা আমাদের জন্ত মাংস, লুচি প্রভৃতি নানা খাবারের আয়োজন করেছিল।

কয়েকটি ভুটিয়া-টাকা আনবার ইচ্ছে ছিল…মতিরাজ বলল, দারুচিনি ও ভুটিয়া মুদ্রা সে পরে পাঠিয়ে দেবে। নগেনবাবু এত শ্রান্ত হয়েছিলেন যে তিনি মোটর থেকে আর নামলেন না।

ক্ষণ পরিচয়ের বন্ধুদের বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে বললাম—'নমস্তে'। মোটর চলল—পিছনে রইল ভুটানের পাহাড়। সেই মায়াবিনীর হাতছানিতে শৈলমালায় কোনও দিন ফিরব কিনা ভবিতব্যই জানে।

বাঙ্গালা নাটকের ধারা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য কবি। কবিপ্রতিভাই তাঁকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাংলা নাট্যসাহিত্য ও তাতে মণীষী রবীন্দ্রনাথের দান—একথাটাই আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

বাংলা সাহিত্যকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উপন্যাস (২) নাটক এবং (৩) কবিতা। নাট্যসাহিত্য যখন আলোচ্য তখন নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুচার কথা বলা নিশ্চয়ই অশোভন হবে না। বাংলা সাহিত্যে নাটকের সৃষ্টি খুব বেশী দিন হয়নি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক বহুপূর্ব্বেই

ছিল—এবং বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটক থেকে জন্ম নেয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" বাংলার প্রথম নাটক বলা হয়। তারপর সত্যিকারের এক নাট্যকারের অভ্যুদয় হয়। দীনবন্ধু মিত্র নাটককে standarised করলেন। কিন্তু standardএ আনলেও তাঁর নাটক নির্দোষ নয়। নাটকের প্রধান অভিযোগ যে তাঁর নাটক অশ্লীলতা ও কুরুচিতে পূর্ণ। ঠিক এমনি অভিযোগও কবি ঈশ্বর গুপ্তের বিরুদ্ধে স্বভাবতই আনা হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন "একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা কোন বর্ত্তমান কবির সমালোচনা করছি না। বর্ত্তমান সভ্যতার ও সমাজের বিচারে তার প্রতিভার সমালোচনা করতে গেলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তৎকালীন যুগে অশ্লীলতা ছিল রসিকতার একটা অঙ্গ।" ঠিক দীনবন্ধুর বিষয়ে একথা বলা চলে। মাইকেল মধুসূদন কবি ছিলেন, কিন্তু নাট্যরচনায়ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে 'প্রহসন' রচনার চেষ্টা তিনি প্রথম করেন। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যসাহিত্য যেন পথ খুঁজে পেল। গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বের নাট্যকারদের মধ্যে কবিতার ভাব বেশী থাকত—কারণ তাঁরা অনেকেই কবি ছিলেন। নাটকের মধ্যে গতির (action) বাহুল্য ছিল না। তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি ছিল বেশী—ঘটনার সমাবেশ খুব সামান্যই থাকত। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ঘটনার সমাবেশ আছে—স্বাভাবিক গতি আছে। সেদিক দিয়ে তাঁকে নাট্যসাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক বলা যেতে পারে। সামাজিক জীবনের ঘটনা নিয়ে প্রধানতঃ নাটকের সৃষ্টি হত। দ্বিজেন্দ্রলাল আর একটা দিক দেখালেন। পুরাতন ইতিহাসের কয়েকটী চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি নাটক সৃষ্টি করলেন। "সাজাহান," "দুর্গাদাস" ও "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতি নাটকগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিতে অনেকটা সাহায্য করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে অনেক সাহিত্যসেবী নাটক রচনা করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ, রসরাজ অমৃতলাল ও অপরেশচন্দ্রের নিকট বাংলা নাট্যসাহিত্য অনেক বিষয়ে ঋণী।

দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে নিয়ে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছিল—তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল রবীন্দ্রনাথের যুগে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক নাটিকার মধ্যে গীতি কবিতার প্রাধান্য বেশী। কারণ তিনি কবি। নাটকের প্রতিছত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ যেন বর্ত্তমান। এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে বড় বড় বক্তৃতা techniqueএর দিক দিয়া অশোভন। নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক নাটিকার মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য—ঘটনার চেয়ে অনুভূতির প্রকাশ হচ্ছে মুখ্য। "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ", "বিদায় অভিশাপ", "প্রকৃতির পরিশোধ", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটিকা। "চিত্রাঙ্গদা" নাটিকা যদিও সম্পূর্ণাবয়ব নাটক নয়—তবু নাটকোচিত লক্ষণ অন্য নাটিকাগুলির চেয়ে বেশী আছে। বাহিরের দৈনন্দিন জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত বেশী না থাকলেও অন্তরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। 'চিত্রাঙ্গদা' মদনের বরে অর্জ্জুনকে পেলেও তার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব থেকে গেল। কেবলি মনে হয় এ সুখ শুধু ক্ষণিকের। যেদিন মদনের বর শেষ হবে সেদিনই অর্জ্জুন আবার তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাই সম্পূর্ণ ভোগের ও ঈপ্সিত মিলনের মাঝে থেকেও অর্জ্জুনকে—তার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে বলতে পারে—

"মুহূর্ত্তেকে সত্যভঙ্গ
করি—অর্জ্জুনেরে করিতেছে অনর্জ্জুন
কার তরে ?"

"রাজা ও রাণী", "তপতী" এবং "বিসর্জ্জন" সম্পূর্ণাবয়ব নাটক। "রাজা ও রাণী" কবির প্রথম জীবনের রচনা। তাই এতে তাঁর প্রতিভার আভাস আছে কিন্তু পরিণতি নেই। "বিসর্জ্জন"কে আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলতে পারি। 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে তিনি "বিসর্জ্জন" নাটক লেখেন। উপন্যাস ও নাটক এক নয়—তাই "রাজর্ষি" ও "বিসর্জ্জন" এক নয়। উপন্যাসের "হাসি" নাটকে স্থান নেই—তার স্থান দখল করেছে ভিখারিণী অপর্ণা।

নাটক ও নাটিকা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনা করেছেন। "বৈকুণ্ঠের খাতা", "গোড়ায় গলদ" ও "চিরকুমার সভা" উল্লেখযোগ্য। ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের মতে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রহসনের দিক দিয়ে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রহসন সম্বন্ধে কিছুদিন আগে 'ভারতবর্ষে' বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে—পুনরাবৃত্তির ভয়ে সেগুলি আবার আলোচনা করলাম না।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক বাদ দিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে নাকি ইউরোপীয় নাট্যকার 'মেটারলিঙ্ক'এর প্রভাব আছে। প্রভাব আছে একথা অস্বীকার করা যায় না—তবে বৈদেশিক রূপক নাটক থেকে তিনি রূপক লিখতে আরম্ভ করেন—এ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত! ভারতবর্ষ রূপকের দেশ। এই দেশেই শত শত রূপক রয়েছে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। কবির চোখে সেগুলি ধরা দিয়েছিল। 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' ও 'রক্তকরবী'র মধ্যে ইউরোপীয় 'টেক্‌নিক্' বর্ত্তমান—কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ স্থান পায়নি। রূপক নাটকের পূর্ব্বে তিনি রূপক কবিতা (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ) লেখেন। রূপকের উপর তাঁর স্বাভাবিক ভক্তি ছিল। প্রবন্ধ ব্যাপক হবার ভয়ে রূপক নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা সম্ভব হল না। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই ধরণের রূপক নাটকের আমদানী করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধিশালী করেছেন।



শিক্ষা-প্রসঙ্গ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী

সাধারণতন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সে শিক্ষার ইতিহাস একতন্ত্র-মূলক। শিক্ষা-ব্যাপারে ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছিল, এখনও আছে। নেপোলিয়নের অধিনায়কত্বের বহুপূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনে ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের পূর্ণ-শক্তির অন্তরালে "ইউনিভারসিটি অব্ ফ্রান্স" গঠিত হয়। তাঁহারই অনুশাসনে "একাদেমী" নামে ২৭টী শিক্ষা-বিভাগ গড়িয়া উঠে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার সুব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রানুগ করার চেষ্টা প্রথমে হয় জার্মানীতে ও তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে হয় ফ্রান্সে। শিক্ষামন্ত্রী গীজো (Guizot) যে জাতীয়তার ভিত্তিতে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দূরতম পল্লীগ্রামেও শিক্ষা-বিস্তার সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ও পুং-স্ত্রী-ভেদে বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষকগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় ও তাহার ফলে অনেকগুলি নর্ম্ম্যাল-স্কুল সংস্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফ্রান্সের শিক্ষায়তনগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীন করা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে স্যাশন্যাল বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী, তদধীন সাতজন ডিরেক্টর ও ৫৮ জন ইন্স্পেক্টর জেনারাল্ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত করিতেছেন। ইহাদের পরামর্শদানের জন্য ৫৬ জন সভ্যদ্বারা গঠিত একটি সমিতি আছে। তাঁহাদের হাতে কারিকুল্যাম্, পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচন, পরীক্ষা-গ্রহণ, শাসনভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সর্ব্বপ্রধান শিক্ষামন্ত্রীর নিয়োগ প্রেসিডেণ্টের ও প্রিমিয়রের নির্দ্দেশ অনুসারে হইয়া থাকে।

১৯৩২ সালের আইনে ইহাও স্থির হইয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত 'একাদেমী'র সংখ্যা-হ্রাস করা হইবে, প্রতি একাদেমীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে ও একজন করিয়া "রেক্টর" ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিবেন। নিম্ন-প্রাথমিক বিভাগ ছাড়া উচ্চতর সকল শিক্ষাবিভাগে এই রেক্টর প্রায় একশত সহকারী ইন্স্পেক্টরের আনুকূল্যে সেই একাদেমীর শিক্ষাদানকার্য্য পরিচালন ও পরিদর্শন করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্য্য পরিদর্শনের জন্য—আমাদের দেশের মত, অনেকগুলি সব-ইন্স্পেক্টরও আছেন। আমাদের নব-পরিচিত স্কুল-বোর্ডগুলি ফ্রান্সে অনেকদিনের পুরাতন প্রতিষ্ঠান। সে-দেশে তাহাদের সংখ্যা ও মূল্য কম নহে।

প্রাথমিক শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছে। দুই হইতে ছয় বৎসর বয়সের শিশুদের জ একপ্রকার বিদ্যালয়, উহার ফরাসী নাম—"একোল্ মেতারন্যাল্। ইহার পর প্রাথমিক স্কুল; উহাতে শিক্ষার্থীর বয়স ছয় হইতে তের-চৌদ্দ। ইহার উপরে উচ্চতর প্রাথমিক স্কুল—ছাত্র-ছাত্রী বয়স তের হইতে ষোল বৎসর। উপস্থিতি সর্ব্বক্ষেত্রেই বাধ্যতা মূলক। সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র নাই। আমাদের দেশে সহ-শিক্ষার উদ্যোগীগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মাতৃ-সদনে শিক্ষার ব্যবস্থা বহুকালের। গীজো ইহার প্রথ প্রবর্ত্তক। এখন হইতে ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে দুগ্ধ-পোষ্যদে "ষ্টেট্" হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা পাকা করা হয়। আধুনিকত প্রথায় নানা চিত্তরঞ্জক উপাদান ব্যবহার করিয়া বিশেষ-শিক্ষি শিক্ষয়িত্রীগণ এই সকল প্রাথমিক স্কুলে নিযুক্ত আছেন।

প্রাথমিক নর্ম্ম্যাল স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী শিক্ষিত হইয়া যোগ্যতালাভ করেন। আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, প্রতি বৎসর প্রারম্ভেই কতজন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী নর্ম্ম্যাল স্কুলে প্রবেশ করিবে তাহা স্থির হয়—কত লোক লইতে হইবে—সেই সংখ্যার উপর। প্রবেশাধিকার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হয় ফরাসীদেশের ভাব-ধারা অনেকটা আমাদেরই দেশের মত অবশ্য এ সব বর্ত্তমান নাৎসী-শাসনের পূর্ব্বেকার ব্যবস্থা। নূতন পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমাদের আলোচ্য নহে।

ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা অনেকাংশে আমাদের কলেজী শিক্ষার নামান্তর। ওখানকার Lycee ও Collegeগুলি হইতে উত্তীর্ণ হইলে 'গ্র্যাজুয়েট' হওয়া যায়।

ফ্রান্সে অনেকদিন হইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান—এই দুই শাখায় শিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা চলিতেছে। ল্যাটিন ও গ্রীক্ ছাড়া বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে আধুনিক ভাষা-শিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। সামরিক ও নৌ-বিদ্যা ঐ গ্র্যাজুয়েট-কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কোন কোন স্থানে জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করা হইতেছিল। 'লাইসী' বা 'কলেজে' এগার হইতে আঠার এই বয়সের বালক বা বালিকাগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। ইহার পর ইউনিভারসিটির উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠান। আমাদের দেশবাসী শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে ফরাসী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনুসারে এই কলেজীয় শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক। আমাদের নিকট যাহা স্বপ্ন, তাহাদের নিকট তাহা সত্য। ও দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বেতন-বিহীন করার প্রথম চেষ্টা হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। আর আমাদের?



জঙ্গম

বনফুল

৩৯

শঙ্কর পলাশপুর হইতে ফিরিতেছিল।

হর-রমার বিচ্ছা উদ্ধার করিয়া সে প্রত্যর্পণ করিয়াছে বটে কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে। লোকনাথবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইবার সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করিবে। ক্ষত্রিয়ের প্রবন্ধাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে লোকনাথবাবু তাহা শঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং শঙ্কর নিজে কলিকাতায় গিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তাহা ছাপাইয়া যথাস্থানে সেগুলি বিতরণ করিবে। আজকাল মূল্য দিয়া কেহ 'ক্ষত্রিয়' কেনে না। লোকনাথবাবুর বিচারে যাঁহারা সাহিত্যিক-বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা বিনামূল্যে ক্ষত্রিয় উপহার পাইয়া থাকেন। ইহা করিতে গিয়াই লোকনাথবাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না, শঙ্কর তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। "যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু শক্তি এবং আমার ঘরে একখণ্ড কপর্দ্দক অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি থামব না। আমার স্ত্রী আমারই অর্থে তার বোনপো-বউকে শাড়ি পাঠাবেন, আর অর্থাভাবে আমার কাগজ উঠে যাবে এ কখনও হতে পারে না। এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য"···লোকনাথবাবুর কথাগুলি শঙ্করের মনে পড়িল। লাঞ্ছিতা হর-রমার কাতর অশ্রুসিক্ত মুখখানিও মনে পড়িল। কাহারও দাবী সে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই।

আজকাল 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইতে কত খরচ পড়িতে পারে মনে মনে তাহাই সে হিসাব করিতেছিল। শুধু তাহাই নয়, যে ক্ষত্রিয়কে একদিন সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল যাহা একদিন তাহার দিবসের চিন্তা এবং রাত্রির স্বপ্ন ছিল সেই ক্ষত্রিয় অদ্ভুতভাবে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছিল। সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া যাহাকে সে একদা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল সে আবার ফিরিয়া আসিল! ক্ষত্রিয় পত্রিকাটাকে একটা জীবন্ত প্রাণবান কিছু বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল—মায়া কাটাইতে না পারিয়া পথ চিনিয়া আবার যেন ফিরিয়াছে। বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলেবেলায় সে একটা কুকুর পুষিয়াছিল। যদিও অতি সাধারণ কুকুর কিন্তু তাহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানো, কসরৎ শেখানো ছাড়া কোন কাজ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু সে কুকুরকে ছাড়িতে হয়। মায়ের শুচিবায়ু প্রবল ছিল। কুকুরটাকে দেখিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শঙ্কর ওটাকে লইয়া মাখামাখি করে এ চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাধ্য হইয়া তাকে ছাড়িতে হইল। না ছাড়িলে মা হয়তো পাগলই হইয়া যাইতেন। সহপাঠী অবিনাশের কুকুরটার প্রতি লোভ ছিল, তাহাকেই সে কুকুরটা দান করিয়া দিল। অবিনাশ কুকুর লইয়া চলিয়া গেল। তাহার বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। মাস দুই পরে একদিন মনে হইল কে যেন কপাট আঁচড়াইতেছে, কুঁই কুঁই শব্দও শোনা গেল। দ্বার খুলিয়া শঙ্কর দেখে টম ফিরিয়া আসিয়াছে। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টি আন্দোলিত পুচ্ছ চোখের উপর ছবিটা আবার যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।···ক্ষত্রিয়ের মলাটটা এবার নূতন ধরণের করিতে হইবে···কতই বা খরচ পড়িবে···।

ষ্টেশনে গাড়ি ছিল না, শঙ্কর হাঁটিয়াই ফিরিতেছিল। হঠাৎ একটা কোলাহল কানে আসিল। চাহিয়া দেখিল একদল লোক হাল্লা করিতে করিতে আসিতেছে। কিসের হাল্লা? কে ইহারা! ছ্যারা রা রা রা—। ও হোলির দল! সকলের মাথায় কাগ, জামা কাপড়ে রং, যুদ্ধের বাজারে ভাল লাল রং জোটে নাই, সবুজ হলুদ বেগুনী যে যাহা পাইয়াছে মাখিয়াছে, অনেকের মুখে তেল-কালী মাখানো—খচখচ করিয়া একটা বাজনা বাজিতেছে, সঙ্গে গোটাকয়েক ঢোলও আছে—দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে 'হোলি'তে মাতিয়াছে সব। ছ্যারা রা রা রা···। শঙ্কর একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহার মনে হইল কে ইহারা! ইহারাই কি তাহার স্বদেশবাসী? ইহাদের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল কি আছে? এই ইহাদের উৎসব! এভাবে উৎসব করিবার কল্পনাও সে কি করিতে পারে! সভ্যতা ভব্যতা, শ্লীলতা শোভনতা, মানসিক যে সব উৎকর্ষকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে এতদিন সাধনা করিয়াছে—এই জনতা কি তাহার মূর্ত্ত প্রতিবাদ নয়? কিছুকাল পূর্ব্বে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার মনে যে গর্ব্ব হইয়াছিল তাহা সহসা যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ? বসন্তোৎসবের সহিত যে মদনিকা-মালবিকা, আবীর-কুঙ্কুম, ঝারি-পিচকারি—যে রঙ ও রসের মধুর ছবি তাহার কল্পলোকে রঙীন হইয়া আছে এই উন্মত্ত অসভ্য দেহসর্ব্বস্ব জনতার মধ্যে তাহার কিছুমাত্র আভাস তো নাই। ইহারা কি সত্যই ভারতীয়? সত্যই তাহার আপন লোক? ইহাদের উদ্ধার করিবার জন্যই কি সে জীবনপণ করিয়াছে? ইহাদের—এই মূঢ় বর্ব্বরদের উদ্ধার করিবার সত্যই কি উপায় আছে কোন? নির্ব্বাক বিস্ময়ে নূতন দৃষ্টিতে সে এই জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে একটা নারীমূর্ত্তি দেখা গেল। একটু কাছে আসিতেই দলের মধ্যে একজন আগাইয়া গিয়া অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী সহকারে মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া অশ্লীল একটা ছড়া মুখে মুখে বানাইয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিল। জনতা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—হো হো হো হো—ছ্যারা রা রা রা—। খচমচ খচমচ বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। মেয়েটা লজ্জায় মরিয়া গেল না, সরিয়াও গেল না। ক্রুদ্ধ রোষভরে সে বরং আগাইয়া আসিল এবং রাস্তা হইতে এক আঁজলা ধূলা তুলিয়া লোকটার মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিল। শঙ্কর হঠাৎ চিনিতে পারিল। মেয়েটা অপর কেহ নয় ফুলশরিয়া। তাহাকে দেখিয়া যে লোকটা গান

ধরিয়াছিল সে চানাচুরওলা রামু। রামুর চোখে বোধ হয় ধূলা পড়িয়াছিল। তবু সে চোখমুখ কুঁচকাইয়া হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গেল এবং ফুলশরিয়াকে ধরিয়া জোর করিয়া তাহার সমস্ত মুখখানাতে 'বাঁদুরে রং' মাখাইয়া দিল। আর একজন ঢালিয়া দিল পাতলা খানিকটা গোলাপী রং। বিস্রস্তকেশা ফুলশরিয়া আবার একমুঠা ধূলা ছুঁড়িয়া মারিল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার রঙে ভিজাইয়া দিল 'ছোঁড়াপুতারা'! খচমচ খচমচ করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। হো হো হো হো—হ্যারা রা রা রা—উন্মত্ত জনতা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। সহসা তাহারা শঙ্করকে দেখিতে পাইল এবং থামিয়া গেল। হঠাৎ ভীড়ের ভিতর হইতে ঈষৎ টলিতে টলিতে নটবর ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন।

"নমস্কার শঙ্করবাবু, আসুন, আজকের দিনে একটু ফাগ নিন। অমন টিপটপ্ হয়ে থাকা মানায় না আজকের দিনে—"

"দিন—"

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও কপালটা না বাড়াইয়া দিয়া সে পারিল না। নটবর তাহার কপালে ফাগ লাগাইয়া দিলেন।

"সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি আমি"

"কেন কিছু দরকার ছিল?"

"ছিল বই কি। হরিয়াটার নামে দারোগা সাহেব বি. এল. কেস চালাতে চান। এ গ্রাম থেকে একটি সাক্ষী যাতে না জোটে তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।"

হরিয়া এবং অন্যান্য অনেকের নামে পুনরায় থানায় নালিশ হইয়াছে একথা তিনি হরিয়ার মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া শঙ্করকে এ বিষয়ে কিছু বলাটা তাঁহার অনুচিত বোধ হইল।

কেবল বলিলেন—"কথা যখন দিয়েছি তখন ও ব্যাটাকে বাঁচাতেই হবে। আপনাকে সাহায্য করতে হবে একটু। ওরে হরিয়া—"

ভীড়ের ভিতর হইতে রং-মাখা হরিয়া কুণ্ঠিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

"কাল যাবি বাবুর বাড়িতে, গিয়ে একবার মনে করিয়ে দিবি। উনি পাঁচ কাজের মানুষ"

"জি হুজুর"

"আচ্ছা, চলি তবে এখন আমরা। হৈ হৈ করা যাক আজকের দিনটা। বছরে একটা দিন বই তো নয়—"

দল আগাইয়া গেল। শঙ্কর দেখিল দলের ভিতর শুধু হরিয়া নয়—কারু, ফকিরা, রূপুয়া, মধুয়া, বেচু সকলেই রহিয়াছে। রঙে নাহিয়া ফুলশরিয়া একটু দূরে আগে আগে চলিতেছিল। শঙ্কর তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

হঠাৎ আর একটা দল আবির্ভূত হইল। ইহাদের ধরণটা অন্যরূপ। একজনকে মড়া সাজাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়াছে এবং শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার আগে একজন এবং পিছনে একজন গাধার পিঠে চড়িয়া আসিতেছে। সকলে এমন কি মড়া এবং গাধা দুইটা পর্য্যন্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত। যে মড়া সাজিয়াছে সে মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে এবং বাকী সকলে জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে। হোলির দিনে মৃত্যুকেও তাহারা রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে! হাসির হররা তুলিয়া মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে—রাম নাম সৎ হ্যায়!

ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর উভয়েই রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। তাহাদের কেহ কিন্তু লক্ষ্যই করিল না, নিজেদের আনন্দেই সকলে মশগুল হইয়া রহিয়াছে।

ইহাদের পিছনে আর একটা তৃতীয় দলও দেখা দিল। ইহারা একটু প্রবীণ গোছের, পক্ককেশ বৃদ্ধও আছে। সকলেই ফাগ মাখা, সকলেরই গায়ে রং। ঢোল এবং খঞ্জনী বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিতেছে—

সীতারাম সীতারাম, জয় জয় সীতারাম কি—
রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম কি—

গাহিতেছে এবং নাচিতেছে। দুইহাত তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য। ইহারাও চলিয়া গেল। ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর তখন পথে উঠিল। ফুলশরিয়া আগাইয়া চলিতে লাগিল। শঙ্কর গতিবেগ একটু মন্থর করিয়া দিল। ভাবিল মেয়েটা আগাইয়া যাক। যে চিন্তাটা কিছুক্ষণ আগে তাহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল তাহাই মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল। আমরা সত্যই কি একজাতের? ফুলশরিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং একমুখ হাসিয়া বলিল—"তু হাম্ লোগিসে ঘিন্ করইছ, নেই বাবু?"

প্রশ্নটা শুনিয়া শঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার মনের কথা মেয়েটা টের পাইল কি করিয়া! উহাদের সম্বন্ধে ঘৃণা বড় জোর অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোন ভাব যে সে পোষণ করে না তাহা নিজেই সে এতদিন স্পষ্ট করিয়া জানিত না। ইহাদের সহিত সত্যই তো তাহার কোন আন্তরিক যোগ নাই। শিক্ষায়-দীক্ষায় আচারে-ব্যবহারে চিন্তায়-কল্পে সত্যই সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের লোক। গায়ের রং এবং মুখের ভাষা ছাড়া বিলাতী মিশনরিদের সহিত তাহার যে বিশেষ কোন তফাত নাই—সহসা এই সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ইহাদের সকলকে বর্ব্বর মনে করিয়াই তো সে ইহাদের উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু ইহারা সত্যই কি বর্ব্বর নয়? হঠাৎ নজরে পড়িল—ফুলশরিয়া তাহার দিকে হাসি মুখে চাহিয়া আছে। মুখময় কালচে সবুজ রং, মাঝে মাঝে আবীর লাগিয়াছে, বিস্রস্ত অলকগুচ্ছ কপালের দুইপাশে দুলিতেছে, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক রকম শাদা, রঙে ভিজিয়া শাড়িটা সর্ব্বাঙ্গে সাঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে। একটা ডাকিনী যেন! এই কি ভারতীয় রমণীর প্রতীক? এই কি শতকরা পঁচানব্বই জনের একজন? চকিতের মধ্যে কয়েকটা মুখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। অমিয়া, সুষমা, কুন্তলা, চুনচুন, বেলা, বৌদিদি, মিষ্টিদিদি, ঝিনি, মুক্তো ইহাদের মধ্যে কে ভারতীয়? সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কস্তুরবাই গান্ধি ইহাদের মধ্যেই কি ভারতীয় রমণীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে? এইমাত্র যে হর-রমার গহনা সমস্যা সে সমাধান করিয়া আসিল সেই কি ভারতীয়? না, এই ফুলশরিয়ারা? যমুনিয়ার শীর্ণ শুষ্ক মুখটাও মনে পড়িয়া গেল। ইহারাই তো সংখ্যায় বেশী। ইহাদেরও একটা জীবনযাপন নীতি আছে, কিন্তু আমাদের মানদণ্ড অনুসারে তাহা অসভ্য। সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহাদের সে সব বালাই নাই। ইহারাও চাষ করে, চাকরি করে,

ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, উপবাস করে, উৎসব করে। কিন্তু বিশেষ একটা কোন সভ্যতার আদর্শে সবাই চলে না। অথচ খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে সবই মিলিবে। অনার্য্য-আর্য্য-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সব রকম সভ্যতার উচ্ছিষ্ট আসিয়া ইহাদের মধ্যে জমা হইয়াছে। যেন একটা ডাষ্টবিন!

ডাষ্টবিনটা সহসা আবার কথা কহিয়া উঠিল—"কহ না বাবু, তু হাম্ সেনি সে নফ্‌রত্‌ করইছ?"

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্ম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ফুলশরিয়ার কথায় আবার আত্মস্থ হইল। অপ্রস্তুত মুখে ভুল হিন্দিতে আমতা আমতা করিয়া বলিতে হইল—"না—না—সে কি কথা, তোমাদের ঘৃণা করি না তো!" আর কিন্তু সে ফুলশরিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। ফুলশরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলে শঙ্কর দেখিতে পাইত ফুলশরিয়া তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে—যেন বাঘিনীর চোখ!

শঙ্কর কিন্তু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার মনের মধ্যে একটা ঘূর্ণা জাগিয়াছিল এবং তাহাতে পল্লী-সংস্কার, লোকনাথ ঘোষাল, ক্ষত্রিয়, হর-রমা, অমিয়া, সুরমা, নিজের জীবনের আদর্শ, ভারতের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য—সমস্তই যেন অসংলগ্নভাবে আবর্ত্তিত হইতেছিল। নতমস্তকে দ্রুতবেগে সে হাঁটিতে লাগিল, যেন একটা বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

৪০

উৎপল নিবিষ্টচিত্তে রেডিও শুনিতেছিল। কি সর্ব্বনাশ, রেঙ্গুন যে যায় যায়। কেনারাম চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন।

"নিপুবাবু আর প্রমথবাবু চলে গেলেন। কিন্তু…"

কেনারাম ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া উৎপল যে আবার কি মূর্ত্তি ধরিবে তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারিতেছিলেন না।

"আবার 'কিন্তু' কি—"

উৎপল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

"গদাই দত্ত জরিমানা দিতে চাইছে না"

"কি বলছে"

"বলছে দেব না—আপনারা যা করতে পারেন করুন"

উৎপল রেডিওর ডায়ালটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি যান এখন—"

কেনারাম কতকগুলি কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেগুলি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, "ব্যাঙ্কের হিসেব এটা। আমি আপ-টু-ডেট করে রেখেছি। হাজার দশেক টাকা লোকসান হয়েছে—"

"ও সব শঙ্করকে দেবেন। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইব—"

কেনারাম চলিয়া গেলেন।

উৎপল ক্ষণকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে তাহার অধরে হাসি ফুটিল। রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ভিতরে যাইবার জন্ত উঠিল। সুরমার সহিতই পরামর্শটা করা যাক। ছোটখাটো একটা প্রলয় করাই যখন উদ্দেশ্য তখন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সাহায্য লইলে নেহাত অশোভন হইবে না!

৪১

গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্কর দেখিল গ্রামে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। পাটের গুদাম এবং ধানের গোলা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। রাজীব দত্তের বাড়ির চতুর্দ্দিকে ভীড় এবং কোলাহল। দূর হইতে আকাশবিসর্পী লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উৎপল কথাকে কাজে পরিণত করিতে পারিয়াছে তাহা হইলে! রাগে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ যে কাহার উপর, ক্ষোভ ও দুঃখ যে কিসের জন্য, তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না বলিয়াই সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বেদনায় আরও টনটন করিতে লাগিল। দুষ্ট শাস্তি পাইতেছে এবং সে শাস্তির আয়োজন তাহার অভিমত অনুসারেই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই, সুরমাও ইহাতে খুশী হইবে—এ সব যুক্তি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—হারিয়া গেলাম, নামিয়া গেলাম, সব নষ্ট হইয়া গেল। যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা হইল না। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে সে বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল—ছাত্রজীবনে কোথাও আগুন লাগিয়াছে শুনিলে সে-ই সর্ব্বাগ্রে ছুটিত আগুন নিবাইতে—এখন চোরের মতো পলাইতেছে। কোন মুখ লইয়া সে এখন উহাদের কাছে যাইবে। ছি ছি কি শোচনীয় অধঃপতন! কিন্তু কেন! কেন সে নিজের আদর্শকে ছোট করিতেছে? সনাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছাড়িয়া কোথায় কিসের লোভে চলিয়াছে সে! নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর্ব্বলতা সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন সহসা এক নিষ্কলুষ স্বপ্নরাজ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওই স্বপ্নরাজ্যই তো তাহার লক্ষ্য। অপথে বিপথে কোথায় সে ঘুরিয়া মরিতেছে।

বাড়ি ফিরিতেই খুকী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাড়ির সামনের ফাঁকা মাঠটায় সে দুইটি সমবয়সীর সঙ্গে ধুলা মাখিয়া খেলা করিতেছিল। তাহার ফ্রকে কে খানিকটা রং দিয়াছে। শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

"বাবা, তুমি কোথা গেছ্‌লে"

"পলাশপুর"

"আমি পলাচপুল যাব"

"আচ্ছা যেও। এরা কে—"

"ছামিয়া বুদিয়া। কাও—"

আধখানা-কামড়ানো একটা কুল সে শঙ্করের মুখে গুঁজিয়া দিল।

"মুছাই এতো দুত্‌তু হয়েতে বাবা, কুল পেলে দিতে বললে দেয় না। তাকে বকে' দিও তো—"

"আচ্ছা"

বারান্দায় উঠিয়া সে খুকীকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খুকী ছুটিল মাকে খবর দিতে। বাইরের ঘরে ঢুকিয়াই শঙ্করের চোখে পড়িল—টেবিলের উপর কয়েকদিনের ডাক জমিয়া রহিয়াছে।

উপরের পোষ্টকার্ডখানা শশুরের। তুলিয়া পড়িতে লাগিল। আসন্নপ্রসবা অমিয়াকে তিনি লইয়া যাইতে চান। অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় নানা রঙে বিচিত্র এবং সিক্ত। "এমন অসময়ে রং দিলে কে!"

"রং সকালে দিয়েছে। আমি এখন আমাদের খোড়ো চালে জল ঢালছিলাম। রাজীববাবুর গোলায় আগুন ধরেছে, দেখলে না?"

"হ্যাঁ দেখলাম আসতে আসতে"

"আহা, বেচারীর সব পুড়ে গেল! কি করে' যে লাগল আগুন!"

শঙ্কর পোষ্টকার্ডেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

"একদিনের নাম করে' গেলে, এই বুঝি তোমার একদিন!"

এ কথারও জবাব না দিয়া শঙ্কর বলিল, "তোমার বাবা চিঠি লিখেছেন, দেখেছ?"

"দেখেছি"

"যাচ্ছ কবে"

"আমার আবার যাওয়া! আরও তিনজন পোষ্য জুটেছে। দাইয়ের ছেলেমেয়েরা তো আছেই"

"আবার কে জুটল"

"ঝমরু তার ছেলেদের নিয়ে হাজির হয়েছে এসে। তার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোয় না, কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে রোজ। কাল দেখি খিড়কি দরজার পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। ছেলে দুটো পাশে বসে' আছে চুপ করে'। দুদিন খেতে পায়নি বললে। ডেকে এনে খেতে দিলাম। আর নড়তে চাইছে না—"

অমিয়া হাসিল। শঙ্করও হাসিল।

দীনদুঃখীদের প্রতি অমিয়ার একটা স্বাভাবিক করুণা অবশ্য আছে; কিন্তু কেবল এই জন্যই সে যে বাপের বাড়ি যাইতে চাহিতেছে না তাহা সত্য নহে। আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে। শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সে ও টের পাইয়াছিল। মুখে সে কিছু বলে নাই, কোনদিন বলিবেও না, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া এ সময় সে কোথাও যাইবে না।

দুই হাতে দুই মুঠা মটরশুঁটি লইয়া খুকী ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া পাশ কাটাইয়া বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল—"দেখেছ মেয়ের কাণ্ড! রেখে আয় মটর শুঁটি—" বলিয়া অমিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। খুকী চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া নীরবে শঙ্করের পানে চাহিল। ভাবটা—মায়ের ব্যবহারটা দেখ একবার!

শঙ্কর বলিল—"দাও, দাও, ছেড়ে দাও"

ছাড়িয়া দিতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

"এমন দস্যি হয়েছে! ওরা এসে থেকে পর্য্যন্ত দিনরাত ওদের সঙ্গে আছে। কাল সন্ধেবেলা ওদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল পর্য্যন্ত—"

"ওরা শুচ্ছে কোথা"

"ভাঁড়ার ঘরের পাশের গলিটায়—"

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া শঙ্কর কিন্তু বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল না। বাহিরের ঘরে লোকের পর লোক আসিতে লাগিল। স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গেলেন। বিরিপুরের একজন শিক্ষক আসিয়া নিবেদন করিলেন যে লছমন গোয়ালার পুত্রকে ক্লাশ প্রমোশন দেওয়া হয় নাই বলিয়া লছমন তাহাকে শাসাইতেছে। মারিবে বলিতেছে। লছমন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বিরিপুরে তাহার প্রতিপত্তিও আছে। শিক্ষক মহাশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার ব্যবস্থা না করিলে কার্য্যে ইস্তফা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কাক ফরিদ রহিম কর্পূরা ফকিরার দল এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়া পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল, দারোগার কবল হইতে বাঁচাইতে হইবে। কেনারামবাবু তাহাদের নামে থানায় নালিশ করিয়া আসিয়াছেন। জমীরগঞ্জে উল্টা মহরমের দিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জমীরগঞ্জ মুসলমান-প্রধান স্থান। একজন মৌলভী আসিয়া সমস্ত মুসলমানদের মন হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিয়াছে। সেখানকার হিন্দু-প্রজাদের মুখপত্র গুলজার সিং আসিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিল। শঙ্করবাবু এবং গুলাব সিং যদি 'মদৎ' করেন তাহা হইলে সে—গুলজার সিং—একাই উহাদের 'বীজ' পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে পারে। বদমায়েসগুলা একটা কচি বাছুরের গলায় মালা পরাইয়া সেটাকে হিন্দুদের বাড়ীর সামনে দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। গুলজার সিং আর একটা উপায়ও বলিল। রাজীব দত্ত ওই মুসলমানগুলার মহাজন। তিনিও ইচ্ছা করিলে প্রতিশোধ লইতে পারেন এবং শঙ্করবাবু অনুরোধ করিলে তিনি যে অস্বীকার করিবেন তাহা মনে হয় না। গুলাব সিং ও শঙ্করবাবুর অনুরোধ সে ঠেলিতে পারিবে না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া নিপুণ এবং প্রমথ ডাক্তারের বিতাড়ন বার্ত্তা জানাইয়া গেলেন। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলিলেন—"পাঁচ বছর পুরে গেছে, উৎপল হিসেব চাইছিল। আমি ব্যাঙ্কের হিসেব ঠিক করে রেখেছি। দশটি হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। তুমি বাকী সব ডিপার্টমেণ্টগুলার হিসেব ঠিক রেখো। উৎপল বাইরে দেখতে ওরকম হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে বেশ ট্রিকট্ আছে। থু—ব—"। চক্রবর্ত্তী মহাশয় চলিয়া যাইবার পর ঝকসু আসিল এবং বলিল যে নিপুবাবুর সহিত তাহার পুত্র রামলালও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার একজন চৌকিদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন—আশপাশের গ্রামে এই অসময়ে (খুব সম্ভবত হোলির জন্য) কলেরা লাগিয়াছে। পাশের গ্রামেই দশজন মারা গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়াছিলেন—তিনি তো কিছুই বলিলেন না, সম্ভবত কোন খবরই রাখেন না। অথচ প্রতিমাসে এইজন্য বেতন পান।

শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় অমিয়াকে বলিয়া গেল—কেহ যদি খুঁজিতে আসে তাহাকে যেন বলিয়া দেওয়া হয় যে সে বাড়ি নাই। রাত্রি দশটার সময় অমিয়া যখন তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেল তখনও সে তেমনই নিস্তব্ধ হইয়াই বসিয়াছিল।

"চল, খাবে চল"

"চল"

"অমন চুপ করে' মন-মরা হয়ে বসে আছ যে! কি হয়েছে"

"কিছু না"

"নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলবে না?"

অমিয়াও পাশে বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, "ব্যাঙ্কে দশহাজার টাকা লোকসান হয়েছে। টাকাটা পুরিয়ে দিতে না পারলে উৎপলের কাছে মান থাকবে না।

"অত টাকা লোকসান হল কি করে?"

"সবাই ধার নিয়েছে আর শোধ দেয় নি, মানে দিতে পারে নি। আমি ভাবছি—"

বলিতে গিয়া শঙ্কর হঠাৎ থামিয়া গেল।

"কি ভাবছ—"

"একটা কথা তুমি জান? বাবা উইল করে তাঁর সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছেন"

"জানি তো"

"কি করে' জানলে?"

"তাঁর উইল তো ওই কাঠের আলমারির দেরাজে রয়েছে, দাদা সেবার এসে বার করেছেন। কেন, তাতে কি হয়েছে—"

অমিয়া জানিত! জানিয়াও তাহাকে এতদিন কিছু বলে নাই! অমিয়া-চরিত্রের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ সহসা যেন তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

"কি ভাবছ বললে না—"

"ভাবছি…না থাক্, তোমার টাকাগুলো নষ্ট করে ফেলা ঠিক হবে না—"

"আমার টাকা তোমার টাকা বলে' আলাদা আলাদা কিছু আছে না কি! কালই তুমি টাকা তুলে ব্যাঙ্কে জমা করে' দাও। তোমার মানের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়"

"বাবা যে কত টাকা রেখে গেছেন তাও তো ঠিক জানি না। ও টাকাতে যদি না কুলোয়—"

"যদি না কুলোয় তাহলে আমার গয়না বিক্রি করে দাও। ওর জন্যে আর ভাবনা কি। চল খাবে চল। রাত হয়েছে।"

শ্রদ্ধায় শঙ্করের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায় অমিয়া তো তাহা নয়, তবু সে এত মহৎ! এত সহজে এত অনাড়ম্বরে এতগুলো টাকার অধিকার এমন অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া দিল! অনিবার্য্যভাবে একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে সুরমা কি ঠিক এই রকম পারিত? ক্রমশঃ

শ্রীরাধাই শ্রীদুর্গা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

শ্রীরাধাই শ্রীদুর্গা। ভগবান্ বিষ্ণুর যোগনিদ্রা—মহাকালী। এই মহাকালীই তাঁহার দেহ হইতে উদ্ভূতা এবং মধু-কৈটভ বধের কারণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শিবশক্তি মহাকালীর কি করিয়া বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল? মহাকালীকে আমরা পরা প্রকৃতি, আদ্যা-মহালক্ষ্মী, দুর্গার অংশরূপা বলিয়াও জানি। কাজেই পরা-প্রকৃতির সহিত পরমপুরুষের সম্বন্ধ থাকিলে তাহা অন্যায় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহারা তিনেই এক এবং একেই তিন, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারয়াও বলিয়া থাকেন। কাজেই এই মহাকালী যে ভগবানের পরা-প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনিই "বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্ত বীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া", তিনি পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী,—যাহাকে সম্মোহন-তন্ত্রে বলা হইয়াছে, "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"

ব্রহ্ম 'সগুণ', 'সাকার' ও 'সচ্চিদানন্দ'। এই সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষই হইতেছে—শ্রীভগবান। সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাই তিনি 'সৎ', জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর তাই তিনি 'চিৎ', আনন্দময় তাই তিনি 'আনন্দ'। 'সৎ', 'চিৎ,' 'আনন্দ'—এই তিনে পরিপূর্ণ কৃষ্ণ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের যাহা স্বরূপ, তাহাই তাঁহার 'চিচ্ছক্তি' এবং এই 'চিচ্ছক্তি' ভিন্ন ভিন্ন তিন-রূপে প্রকাশমানা—আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিদ্':—

> সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ:
> একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।
> আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
> চিদংশে সম্বিদ্, যারে জ্ঞান করি মানি।—চৈঃ চঃ

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, একই 'শক্তি' যখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিতা, তখন তাহারা মূলতঃ এক। শ্রীকৃষ্ণের এই চিচ্ছক্তিই তো মহালক্ষ্মী দুর্গা। বারাহী-তন্ত্রে স্পষ্টই তাঁহাকে বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ং।" আবার রাস-মঞ্চের পূজারীও শ্রীরাধার পূজার সময় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, শুনিতে পাই,—"ত্বং দেবী জগতাং মাতর্বিষ্ণুমায়া সনাতনী।" কাজেই শ্রীরাধা এবং শ্রীদুর্গা যে একই বস্তু তাহা কি করিয়া অস্বীকার করা যাইবে?

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীরাস-লীলা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

> ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎ-ফুল্ল-মল্লিকাঃ।
> বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।

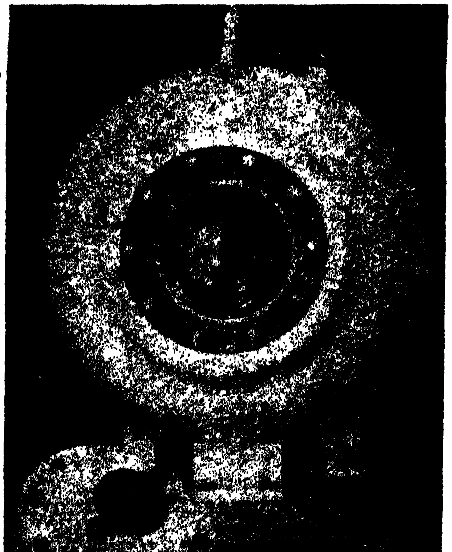
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ 'যোগমায়ামুপাশ্রিত' হইয়া রাস করিয়াছিলেন। এখন কথা উঠিতেছে, এই 'যোগমায়া' কে? দেবী দুর্গাই কি যোগমায়া নন? শ্রীপাদ্ সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধাকে যোগমায়া বলিয়াছেন—রাসেও তিনি 'যোগিনীকোটিপরিবৃতা।' এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরাধা যদি যোগমায়া শ্রীদুর্গাই না হইবেন, তাহা হইলে রাস-লীলায় তিনি যোগিনী-পরিবৃতা হইলেন কি করিয়া? আর রাস-মঞ্চের পূজারীই বা "ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রৈ দুর্গায়ৈঃ নমঃ" বলিয়া পূজারম্ভ করলেন কেন? কাজেই শ্রীরাধাই যে শ্রীদুর্গা—সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? রুদ্রযামল তো জোর গলাতেই একেবারে বলিয়া দিয়াছেন,—"কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপা সা" অর্থাৎ 'পরমাপ্রকৃতি পরমব্রহ্ম কৃষ্ণস্বরূপা।' ব্রহ্মযামল তন্ত্রও বলিয়াছেন,—"বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।" আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেবী দুর্গা নিজেই বলিতেছেন,—"অহঞ্চ হরিপা সার্দ্ধং কল্পে কল্পে স্থিরা সদা।" আমরাও তাঁহাকে "নারায়ণি নমোঽস্তুতে" বলিয়া প্রণাম করিতেছি।

সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীদুর্গা একই—পৃথক বলিবার উপায় নাই।

গভীর জলের মাছ

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এস্-সি

গিরিবনরঞ্জিত পশুপক্ষীমানবের আবাসভূমি পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীর অনেক খবর মানুষের জানা আছে, কিন্তু গোটা পৃথিবীর জ্ঞাতব্যের তুলনায় সে জানার পরিধি কতটুকু! পৃথিবীর সমগ্র আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। সেই সমুদ্রও আবার অতলস্পর্শ, অর্ধাংশ তার দুই মাইলের বেশী গভীর, স্থানে স্থানে গভীরতা পাঁচ ছয় মাইলেরও উপরে, দশমাইল গভীর সমুদ্রতলেরও সন্ধান মিলিয়াছে। এই বারিধির আয়তন পৃথিবীর স্থলভাগের তুলনায় কত বিরাট! সমুদয় ভূখণ্ডের অসমতল অংশ কাটিয়া সমান করিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠের সম-উচ্চতায় লইয়া আসিলে যে মৃত্তিকাপ্রস্তরাদি পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা সমুদ্রগর্ভের চৌদ্দভাগের একভাগ কোনক্রমে ভরাট করা চলিবে। প্রকৃতপক্ষে জলের নীচেই রহিয়াছে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ। স্থল ও অন্তরীক্ষের কিছু কিছু আমরা চিনি বটে, কিন্তু জলের নীচের



বেদিস্ফিয়ার

কতটুকুর খবরই বা আমরা রাখি! বিহঙ্গকলকাকলীমুখরিত কাননের সহিত মানুষের পরিচয় আছে, হিংস্রশ্বাপদসংকুল গহন অরণ্যে দুঃসাহসী মানবেরা অভিযান করিয়াছে, বায়ুভূতনিরাশ্রয় অদৃশ্য ও গোপনসঞ্চারী জীবাণুরা ধরা পড়িয়াছে বিজ্ঞানীর লেবরেটরীর যন্ত্রফাঁদে—কিন্তু বরুণদেবের অন্দরমহলের রহস্য আজও মানুষের অজানাই রহিয়াছে। জলধির অতলতলে লুকান রহিয়াছে এক বিচিত্র জীবজগৎ, কত না অজ্ঞাত জীবন-ধারা, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর তুলনায় সে রাজ্যের ব্যাপ্তি অসীম। সেই পাতালপুরীর রহস্যঘন প্রাণপ্রবাহের খবর বিজ্ঞানী কতটুকুই বা জানে! সাধারণ মানুষ জলের নীচে পনর বিশ হাতের খবর জানে, আধুনিক উন্নতধরণের যন্ত্রাদির সাহায্যে ডুবুরীরা জলতলে চারিশত ফিট পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। সমুদ্রের নীচে সর্বাপেক্ষা বেশী দূরে গিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়াম বিবে। নিজের তৈরী 'বেদিস্ফিয়ার' নামক লৌহ গোলকের ভিতরে বসিয়া তিনি ১৪২৬ ফিট (সিকি মাইলের কিঞ্চিৎ বেশী) নামিয়াছিলেন। সমুদ্রতলে মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঐ পর্যন্তই। প্রকৃতির হারেমের সিংহদ্বার বিজ্ঞানীর কাছে আজও রুদ্ধই রহিয়াছে।

বহুকাল মানুষের ধারণা ছিল যে সাগরের গভীরতম প্রদেশে প্রাণীর অস্তিত্ব নানাকারণে সম্ভব নহে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে জাহাজে চড়িয়া অধ্যাপক টমসন সমুদ্রযাত্রা করেন জলতলের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাঁরই উদ্যোগে ঐ অজ্ঞাতরাজ্য বিষয়ে মানুষ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। গভীর জলে জাল ও ফাঁদ নামাইয়া চির-অন্ধকার তুহিন শীতল, নীরব নিথর পাতালপুরীর অদ্ভুত ও বিচিত্র মৎস্যকুলের সন্ধান পাওয়া গেল।

অবস্থাবৈষম্যহেতু গভীর জলের প্রাণীরা জলের উপরিভাগের প্রাণীদের চেয়ে স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য। সমুদ্রের গহনপ্রদেশে অমানিশার ঘনান্ধকার চিরবিরাজিত। এতদ্দেশীয় প্রাণীদের কিবা রাত্রি, কিবা দিন। মানুষ ত কোন ছার, সেখানে তপনদেবেরও প্রবেশাধিকার নাই, বারুণী রূপসীরা সত্যই অসূর্যম্পশ্যা। বারশত ফিট গভীরতার নীচে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে না, তৎপরবর্তী সমুদ্রতল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সেইজন্য একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের অধিকারী, তাহাদের দেহমধ্যে রহিয়াছে উত্তাপহীন আলোর উৎস। উহাদের শরীর হইতে আলো বিচ্ছুরিত হয়, স্বকীয় প্রদীপ লইয়া উহারা আঁধাররাজ্যে চলাফেরা করে। গভীরজলের মৎস্যকুলে অনেকেরই এই বিশেষত্ব আছে। কাহারও মাথায় জ্বলে সন্ধানী দীপ, মোটরের হেড্‌লাইটের মত—কাহারও বা দেহের দুইধারে সারি সারি আলোকমালা, কখনও জ্বলে কখনও নিভে, বিদ্যুতবাতির মত। কোন কোন মাছের চোয়ালের সঙ্গে দাড়ির ন্যায় লম্বা লম্বা চুল বাহির হয়, এগুলিতে আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা থাকে। এই সকল মৎস্যেরা সবই গভীর কৃষ্ণবর্ণ, আঁধারের সাথী তাই আঁধারবরণী।

সমুদ্রের এই গভীরতলে উত্তাপও খুব কম। জল বরফের মত ঠাণ্ডা। সমুদ্রের উপরিতলের শীতাতপের প্রভাব এতদঞ্চলে বিস্তৃত হয় না। শুধু তাহাই নহে, সমুদ্রপৃষ্ঠের ঝঞ্ঝাবিক্ষোভও তলদেশে পৌঁছায় না। উপরে উত্তাল তরঙ্গমালার কত দুরন্ত মাতামাতি—কিন্তু হেথা 'এসে তার স্রোত নাহি আর', কলকল ভাষা তার নীরব হইয়া গিয়াছে। 'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন' সে জলধিতলে ভয়াবহ শান্তি ও নিরানন্দ নীরবতা বিরাজ করে।

এই স্থানের চাপের কথাটাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

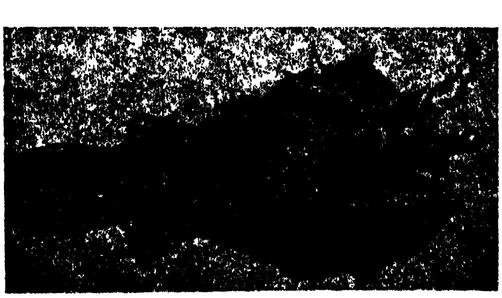
আমাদের উপরে উর্দ্ধস্থিত বায়ুমণ্ডলের যে চাপ পড়ে তাহার পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের। সাগরজলে চার মাইল নীচে জলের যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহাতে ভূপৃষ্ঠের সাধারণ জিনিষকে সেখানে লইয়া গেলে চাপে গুঁড়া হইয়া যাইবে। বিবে



মৎস্য দম্পতি (পুরুষটি পেটের নীচে)

সাহেব যে বেথীস্ফিয়ারে বসিয়া জলের নীচে গিয়াছিলেন তাহা বিশেষ শক্ত কৌটে তৈয়ারী ছিল। ডুবুরীরা যে পোষাক পরিয়া নীচে যায় তাহাও প্রচণ্ড চাপসহনোপযোগী করিয়া তৈয়ারী। আলোচ্য অঞ্চলে প্রতি বর্গইঞ্চিতে এতশত মাট মন চাপ পড়ে। ইস্পাতের পাতের ভিতর দিয়া এই চাপে জল গলান যায়। প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের তলদেশের অবস্থা কোনটাই আমাদের পরিচিত প্রাণী ও মৎস্যাদির বাস করিবার অনুকূল নহে।

এই অদ্ভুত পরিবেশের ভিতরে প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কৌতূহলী মানুষ এখানেও হানা দিতে কসুর করে নাই। এই প্রকার অভিযানের ফলে গভীর জলের কিছু কিছু মাছ ধরিয়া উপরে আনা হইয়াছে। এই সকল প্রায়শ ক্ষুদ্রাকৃতি। আকারে ইহারা উর্দ্ধে চার পাঁচ ফিটের বেশী হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা জোর করিয়া বলা যায় না যে গভীরজলে বৃহদাকৃতির প্রাণী বা মৎস্যাদি নাই। যেভাবে এখানকার মাছ ধরা হইয়াছে তাহাতে বড় বড় প্রাণীরা ধরা না পড়িতেও পারে। আকাশে এরোপ্লেন হইতে দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া একটা থলে টানিয়া লইয়া গেলে উহাতে মাটির উপরকার ক্ষুদ্রাবয়ব প্রাণী ভিন্ন হাতীঘোড়া আটকা পড়িবার কথা নহে। গভীর জলের মাছ ধরিবার ব্যাপারটাও অনেকটা ঐ রকমই।



মৎস্য-দম্পতি (পুরুষটি মাথার উপরে)

এই মাছগুলি জলের উপর আনিবার পূর্বেই মরিয়া যায়। উপরে আনিবার পর উহাদের শরীর বেশ নরম ও স্ফীত মনে হয়। কম চাপে আসিয়া পড়িবার জন্ত ভারী চাপসহনশীল দেহ স্বভাবতই ফুলিয়া উঠে এবং নরম হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে জলের নীচে থাকা কালে উহাদের শরীর খুবই শক্ত থাকে। ইহাদের দেহের পেশীসমূহে জলীয় অংশ বেশী থাকে, যাহাতে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করিবার উপযুক্ত হয়।

গভীর জলের মাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য উহাদের অদ্ভুত চেহারা। ইহাদের অধিকাংশই ভীষণ দর্শন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যহীন। দাঁতগুলি প্রায়শ বড়—মুখগহ্বর প্রশস্ত ও পাকস্থলী বৃহদায়তন। আহার্যপদার্থ এতদ্দেশে অপ্রতুল, কচিৎ কখন পাওয়া যায়, তাই যখন যাহা মেলে তাহাই নির্বিচারে উদরসাৎ করিবার ব্যবস্থা ও ক্ষমতা না থাকিলে চলে না। সূর্যালোক ও তাপের অভাববশত এখানে উদ্ভিদ জন্মে না, তাই মৎস্যকুল সবই মৎস্যভুক ও মাংসাশী, একে অন্যকে খায়। এই ভক্ষণ করিবার রীতিতেও বৈচিত্র্য রহিয়াছে। যে যাহাকে পায় তাহাকে খায়—লঘুগুরু ভেদ জ্ঞান নাই, 'মাৎস্যন্যায়'এর ধারাগুলি এখানে আরও উদার ও সম্প্রসারিত। ক্ষুদ্রাকৃতি একটি মৎস্য হয়ত নিজের চেয়ে বড় আর একটিকে অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিতেছে। এই কারণে কোন কোন মাছের সমস্ত দেহটাই মুখ। মুখব্যাদান করিলে প্রশস্ত এক গহ্বর উন্মুক্ত হয়; গুহামুখে বড় বড় দাঁত, শুধু



ডিপ মৎস্য

চোয়ালে নয়, তালুতেও—গিলিত প্রাণী ছুটিয়া যাইতে না পারে। দাঁতগুলি কখন কখনও আবার বাঁকান। পেটটা রবারের মত সম্প্রসারণশীল এবং অনেক সময়ে স্বচ্ছ একটা থলের মত, বাহির হইতেই পেটের ভিতরকার ভুক্তদ্রব্য দেখা যায়। জলের উপরিভাগ হইতে পতিত মৃত জীবাণু ও প্রাণীর দেহও উহারা আহার করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্যের যেমন বৃহৎ মুখ থাকে তেমনি আবার বৃহদাকৃতি মৎস্যেরও সংকীর্ণ মুখ দেখা যায়। অসামঞ্জস্যই এই বিচিত্র জগতের ধারা। ক্ষীণমুখ মৎস্যেরা প্রায়ই জোঁকের মত রক্তচোষা।

আহার ও পরিপাকযন্ত্রের মত দর্শনেন্দ্রিয়েরও বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কোনটির চক্ষু বেশ বড়, মনে হয় স্বল্পালোকিত দেশে বিচরণ করিবার উপযুক্ত, যত বেশী আলো পাওয়া যায় ততই সুবিধা। পাশাপাশি আবার কোনোটির বা চক্ষু বলিতে কেবল দুইটি কালো ছিদ্রমাত্র রহিয়াছে। অন্ধকার রাজ্যে ব্যবহারের অভাবে দর্শনেন্দ্রিয় ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়াছে।

গভীরজলের মাছের ভিতর কতকগুলির আবার আরও একপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। জলের উপরে তুলিয়া আনিলে

সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। জলের নীচে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করিয়া যাহারা অনায়াসে চলাফেরা করে, অকস্মাৎ সেই চাপবিমুক্ত হইয়া তাহারা ফুলের ঘায়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন বেশী চাপের উপযুক্ত অস্থিমজ্জাদি সম্বলিত বলিয়াই উহারা স্বল্পচাপ মৃদু আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে দৃঢ়তা ও ভঙ্গপ্রবণতার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ নাই—খুব শক্ত জিনিষও যে ভঙ্গুর হইতে পারে সেটা আমরা কাচের কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারি।

ছিপওয়ালা মাছেরা গভীর জলের মৎস্যদের অন্যতম শ্রেণী। ইহাদের মাথার উপরে লম্বা একটা ছিপের মত থাকে এবং তারই অগ্রভাগে আবার বড়শীর মত একটা জিনিষ থাকে। ইহাদের ক্ষুধাবোধ অতি তীব্র—মুখগহ্বর বেশ বড় ও দন্তরাজি অতি তীক্ষ্ণ। যেমনি করিয়া আমরা বড়শীতে টোপ দিয়া মাছকে প্রলুব্ধ করি উহারাও সেইভাবে শিকার ধরে। ছিপের অগ্রভাগে মিটি মিটি আলো জ্বলে, অন্য মাছ মনে করে—কোন ক্ষুদ্র প্রাণী বুঝি, গিলিতে গিয়া ফাঁদে আটকা পড়ে।

এখানে আরও একপ্রকার মৎস্য পাওয়া গিয়াছে উহারা সর্বাপেক্ষা বেশী অদ্ভুত। ইহাদের স্ত্রীজাতীয় মৎস্যদের সহিত পুরুষেরা একই সঙ্গে সংযোজিত হইয়া স্বামী দেবতারা স্ত্রীর সহিত একদেহে লীন থাকে। পুরুষেরা আকৃতিতে অতি মাত্রায় ছোট, স্ত্রীজাতীয়েরা আকারে তিন চার ফিট—পক্ষান্তরে পুরুষেরা এক ইঞ্চিরও কম কখনও তিন চার ইঞ্চি হয়। পুরুষদের ওজন স্ত্রীর ওজনের শত বা সহস্রাংশ। স্ত্রীরা স্বামীকে যেন পকেটে পুরিয়া লইয়া চলে। কেহ কেহ আবার একাধিক স্বামী পোষণ বা ধারণ করে। পুরুষেরা কখনও স্ত্রীর মাথার মণি হইয়া শোভা পায়, কখনও বা বক্ষলীন শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন থাকে আমাদের কাণ, পশুদের লেজ বা মৎস্যের পাখনা। পুরুষদের মুখের অভ্যন্তরের অংশ স্ত্রীর দেহের সঙ্গে আটকাইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন মৎস্যেরা একেবারে সহস্র সহস্র ডিম দেয়—তাহার ভিতর অতি সামান্য সংখ্যক মাত্র পূর্ণাঙ্গ মৎস্যে পরিণত হয়। ডিম হইতে ফুটিয়া যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন পুং-মৎস্যেরা স্বভাবজ প্রেরণায় স্ত্রীমৎস্যদের খুঁজিয়া বেড়ায় এবং কখনও কেহ কোনটির দর্শন পাইলে তাহাকে আর ছাড়িয়া দেয় না—যেখানে হয় কামড়াইয়া ধরে। পরে এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে উভয়ের ঐ অঙ্গ সংযোজিত হয় এবং উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়। পুরুষ হয় স্ত্রীর পোষ্য—পরাসক্ত ও পরজীবী। পুরুষেরা বংশ রক্ষার আদিম প্রেরণায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া করে আত্মদান—পরিশেষে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী যায় সহমরণ।

আমাদের পরিচিত পরিপার্শ্বের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র এক জগৎ রহিয়াছে এত নিকটে অথচ কত অজানা! কত



মুখসর্বস্ব মৎস্য

কোটি কোটি বিচিত্র প্রাণীর বাস সেখানে — সেখানকার পরিবেশ, জীব ও তাহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম মানুষের চেনা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকম — অজানা ও অদ্ভুত সে রাজ্য সম্বন্ধে কল্পনাই করা চলে, কবে সেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার মিলিবে কে জানে? দূরগ্রহের পাথর স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াই আমরা, ঘরের কোণেই রহিয়াছে— কত না অজানা বিস্ময়— কত না বিচিত্র জীবনধারা!

স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের পীঠস্থান

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

সে আজ মাত্র ৮০ বৎসরের কথা। তখন দুর্গম-দুর্গ গোপ-গিরির শিরোপরি স্বাধীন হিন্দু মহারাষ্ট্রপতির গৈরিক পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন থাকিত। সে সময় সিন্ধিয়া বংশের নরপতিগণের প্রতাপ ও প্রতিপত্তিতে উত্তর ও মধ্য ভারত গৌরবান্বিত। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী মহারাষ্ট্র নরপতিগণ গোয়ালিয়র দুর্গে বসিয়া যে হিন্দুর পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতার ও উদার রাজ্য শাসনের ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন এখনও এই গোয়ালিয়রে দেখা যায়। এখনও 'জয় বিলাস' রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কিং জর্জ্জ পার্কের মধ্যে হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, শিখের গুরুদ্বার, খৃষ্টানের গীর্জ্জা, থিয়জফিক্যাল লজ পাশাপাশি অবস্থিত; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নর-নারী স্ব স্ব ধর্ম্ম তথায় অবাধে অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহাই ত স্বাধীন হিন্দুদের পরধর্ম্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধার নিদর্শন।

যদিও গোয়ালিয়রাধিপতি সিন্ধিয়া এখন আর তেমন সগর্ব্বে পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে পারেন না, তথাপি

বৃটীশ সম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম রাজশক্তির ছায়াতলে করদ মিত্র-রাজ্যরূপে সসম্মানে রাজ্য শাসন করিতেছেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা গোয়ালিয়র রাজ্যে এখনও প্রবাহিত। সিন্ধিয়া মহারাজের মূর্ত্তি অঙ্কিত তাম্রমুদ্রা এখনও গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রচলিত। এখনও ভারতীয় ডাক টিকিট ও পোষ্ট কার্ডের উপর সিন্ধিয়া রাজ-প্রতীক সর্প-সূর্যমূর্ত্তি অঙ্কিত ছাপ পড়িয়া থাকে। এখনও মহারাষ্ট্র সৈন্যদল "হর হর বোম্ মহাদেও" রবে গগন বিদীর্ণ করে।

বর্ত্তমানে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহার আয়তন প্রায় বার হাজার বর্গ মাইল। এই রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত 'বিদীশা' ও 'বেশনগর' বিখ্যাত মালোয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনও সেই বেতুয়া নদী কল কল নিনাদে অতীতের গৌরব কাহিনী শুনাইয়া চলিয়াছে। ভীলসা ষ্টেশনের সন্নিকটে বেশনগরে বাসুদেব মন্দির প্রাঙ্গণে ১৭০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পরমভাগবত গ্রীক্ হিলিয়োডোরাস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভটি এখনও মানব ও কালের সকল পীড়ন সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাচীন পালী গ্রন্থে উল্লেখিত 'বেশনগর' ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বর্ণিত 'বিদীশা' নগরের (বর্ত্তমান ভীলসার) বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পের নিদর্শন এখনও গোয়ালিয়র রাজ্যময় দেখা যায়। ভীলসা ষ্টেসন হইতে নয় মাইল দক্ষিণেই জগৎবিখ্যাত সাঁচীর স্তূপ অবস্থিত। ভীলসা হইতে ৪ মাইল দূরে উদয়গিরির অভ্যন্তরে বিশটি গুহা গুপ্তযুগের শিল্প ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। একটি গুহায় এক শিলালিপিতে ৫ম শতাব্দীর এক গুপ্ত সম্রাটের নির্ম্মিত বিরাট বরাহ অবতার মূর্ত্তি ও অনন্তশায়ী নারায়ণ মূর্ত্তি প্রাচীনত্ব ঘোষণা করে।

গোয়ালিয়র রাজ্যেই বিখ্যাত 'বাগ' গুহা ৫ম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহার, হিন্দুর দশ অবতার মূর্ত্তি ও মহাকালের মন্দির অতীত যুগের শিল্প ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন বক্ষে করিয়া রহিয়াছে।

শিপ্রা নদীতটে প্রাচ্য পুণ্যভূমি উজ্জয়িনী গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এইখানেই দ্বাদশ অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালের মন্দির বিরাজিত। এই উজ্জয়িনীতে হরিদ্বার, প্রয়াগ ও নাসীকের ন্যায় দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। এই উজ্জয়িনী রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন ও নবরত্নের স্মৃতি আজ দুই হাজার বৎসর (বিক্রম সম্বৎ ২০০০) বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই স্থানে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজা দৌলতরাম সিন্ধিয়ার প্রিয় রাণী বৈজাবাঈ বিখ্যাত 'গোপাল মন্দির' স্থাপনা করিয়াছিলেন।

আতরের দুর্গম দুর্গ (১৬৪৫ খৃঃ নির্ম্মিত), বাদহ বা বাদনগরের 'ষোল খাম্বা' দালান ও দশ অবতারের মন্দির এবং নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর জৈন দেবস্থান, চান্দেরীর ১১শ শতাব্দীতে কীর্ত্তিপাল রাজার দ্বারা নির্ম্মিত 'কীর্ত্তি দুর্গ', বৈশালী নদীতটে গোহাদের সুদৃঢ় দুর্গ, গোয়াবাসপুরের ৯৮২ শতাব্দীর অষ্ট খাম্বা ও বৌদ্ধস্তূপ, খেজারিয়া ভোপের গুহার বৌদ্ধবিহার ও চৈত, খোরের নৌ তোরণ, মৌয়ের ৭ম শতাব্দীর মহাদেবের মন্দির, মান্দেশ্বরের বিরাট দুর্গ মধ্যে শিবমন্দির ও যশধর্ম্ম রাজার স্তম্ভ (৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর), নারওয়ার বিরাট কিল্লা ও 'এক খাম্বা' ছত্রী, পাদাল্লীর জৈন ও হিন্দু মন্দিরশ্রেণী, ভবভূতি বর্ণিত পাওয়ার ৪০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গুপ্ত রাজাদের দুর্গ, রাজপুরের পঞ্চম শতাব্দীর 'কুনিলামধ্য' নামে বৌদ্ধস্তূপ, রাণোদের নাগ-রাজার মূর্ত্তি, সোন্দোনিয়ার যশোধর্ম্ম রাজার স্তম্ভ, সুহানীয়ার অম্বিকা দেবীর মন্দির, তেরাহির ষষ্ঠমুখ শিব ও চৌমুখ জৈন তীর্থাঙ্কর মূর্ত্তি, তুমেনের দশম শতাব্দীর তোরণ ও বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির (যাহা নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসোপরি নির্ম্মিত), উদয়পুরের উদয়েশ্বরের মন্দির (যাহা ১০৫৯—১০৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত) আদি প্রাচীন শিল্প ঐশ্বর্য্য ও প্রাচীন কাহিনী আজও শত-সহস্র হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টান দর্শকদের আকর্ষণ করে, এবং তাহাতে সকলের চিত্ত বিস্ময় ও পুলকে ভরিয়া উঠে।

সেই ইতিহাস-বিখ্যাত গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজধানী এখন গোয়ালিয়র; ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দৌলতরাম সিন্ধিয়া উজ্জয়িনী হইতে গোয়ালিয়র নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুণার পেশোয়ার সাহসী সেনাপতি রণজীরাও 'সিন্ধিয়া' রাজবংশ স্থাপন করেন; তদবধি এই বংশের অনেক বীর সন্তানের বীরত্ব-কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মাধোজী সিন্ধিয়ার সময়েই এই সিন্ধিয়া বংশের গৌরব সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল।

দিল্লী ও উত্তরভারত বিজয়ের বীরত্বের ফলে মাধোজী 'সিন্ধিয়া' বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাহার ফলে সিন্ধিয়া রাজ্য পুণার আধিপত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া পৃথক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান গোয়ালিয়র সহরটি 'গোয়ালিয়র', 'লস্কর' ও 'মুরার' তিন অংশে বিভক্ত। প্রাচীন গোয়ালিয়র—দুর্গের উত্তর পাদদেশ বেষ্টন করিয়া আছে, লস্কর মহল্লা কিল্লার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত—এই স্থানেই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাম সিন্ধিয়া ছাউনী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিল্লার পূর্ব্বাঞ্চলে মুরার পল্লী, এই স্থানে এক সময়ে ইংরাজদের ছাউনী ছিল এবং বর্ত্তমানে এখন রেসিডেন্ট সাহেব বাস করেন। যদিও তিনটি সহর পরস্পর দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত, তথাপি সুমার্জ্জিত বড় বড় রাজপথের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া একটি নগর বলিয়া মনে হয়।

গোয়ালিয়র দুর্গ

মধ্যযুগে ভারতের রাজন্যবর্গ আত্মরক্ষার নিমিত্ত পর্ব্বতশিরে সুদৃঢ় প্রাকার বেষ্টিত দুর্গম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। দৌলতাবাদের দেবগিরি, ভরতপুরের কিল্লা, চিতোরগড় ও চুণারের কিল্লা, অম্বরের দুর্গ প্রভৃতির ন্যায় গোয়ালিয়রের দুর্গ অভেদ্য ও দুর্গম; ইহার স্থাপত্য অপূর্ব্ব। এক মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"ইয়ে কিল্লা ভারতমাত কে কণ্ঠ কী দুর্গমালা মে মধ্য মোতিকে সমান হে।" এই দুর্গের ঐতিহাসিক কাহিনী নানা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই দুর্গ গুপ্ত, হুন, কচুহা, প্রতিহার, তোমরাস, পাঠান, মোগল, ইংরাজ ও মহারাষ্ট্র অনেক রাজা ও বীরের লীলা-নিকেতন। বহু রাজবংশের উত্থান ও পতনের সহিত এই দুর্গের ইতিহাস জড়িত। এই দুর্গের তোরণ ও প্রাকার কত শত আক্রমণকারীর গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, কত শত বীরের রক্তে এই দুর্গপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইয়াছিল।

সেই জনমুখরিত, বীর পদে কম্পিত, নানা ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত বিশাল দুর্গপুরী এখন শান্ত, নির্জ্জন, পরিত্যক্ত,



গোয়ালিয়র দুর্গ

আজব্ সহরের ন্যায় পড়িয়া আছে। স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করিতে আমরা জানি না, স্বাধীন মানুষের গৌরব আমাদের কল্পনাতীত, স্বাধীন মানবের সুখ-শান্তি আমাদের চিত্তে পুলক সঞ্চার করে না; তথাপি স্বাধীন ভারতের পুণ্যকথা শুনিলে, পুণ্যস্থান দর্শন করিলে চিত্তে উৎসাহ আসে, পুলকে মন ভরে উঠে ও আশার আলোক প্রাণে উঁকি মারে।

দুর্গটি সমতল ভূমি হইতে একেবারে সোজা তিন শত ফিট্ উত্থিত এক পাহাড়ের মস্তকোপরি অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে ১½ মাইল লম্বা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৬০০ হইতে ২৮০০ শত ফিট্ চওড়া। পূর্ব্বে দুর্গ প্রবেশের কয়েকটি পথ ছিল, বর্ত্তমানে দুইটি মাত্র পথ আছে। একটি উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে "গোয়ালিয়র তোরণ" মধ্য দিয়া দুর্গের মধ্যে গিয়াছে; অপরটি পশ্চিম দিক হইতে ক্রমে ক্রমে চড়াইতে উঠিয়া "উরবাঈ তোরণ" মধ্য দিয়া উপরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমটি এত অধিক চড়াই যে কোন প্রকার চক্রযানের দ্বারা পথ অতিক্রম করা যায় না। পদব্রজে বা হস্তির উপরে দুর্গে যাইতে হয়। সিন্ধিয়া রাজার হাতীশালা হইতে হাতী ভাড়া পাওয়া যায়। অপর রাস্তাটিতে শক্তিশালী মটর গাড়ি উঠিয়া যাইতে পারে।

'গোয়ালিয়র দ্বার' দিয়া প্রবেশ করিবার পথের প্রথমেই গিরি পাদদেশে সুদৃঢ় একটি দ্বার অবস্থিত, তাহার মধ্যের প্রাঙ্গণের চারিদিকের কক্ষগুলিতে সৈন্য-নিবাস। একটু উঠিয়া ডান দিকে যাইলে বিরাট 'গুজারী মহল,' আর বাম দিকে একটি তোরণ।

'গুজারী মহল' রাজা মানসিংহ (১৪৮৬—১৫১৬ খৃঃ) প্রিয়তমা মহিষী মৃগনয়নার বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাণী গুজারি বংশের কন্যা—সেইজন্য এই মহলটির নাম 'গুজারী মহল' হইয়াছে। প্রাসাদটি দ্বিতল ও প্রস্তর নির্ম্মিত, সুদৃশ্য শিল্পকার্য্যে পূর্ণ। হাতীর মাথা সংযুক্ত ব্র্যাকেট্ ছাদ ও কার্নিশের অবলম্বন স্বরূপ বিন্যস্ত; কার্নিস্ ও উড়পট্টির গড়নের মাঝে রঙ্গিন টালি বসান আছে। ছাতের উপর প্যারাপেটের সংলগ্ন ছোট ছোট চূড়াগুলি বাটীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই মনোরম প্রাসাদটি গোয়ালিয়র রাজ-এস্টেটের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনের সংগ্রহালয় রূপে ব্যবহার করিতেছেন। এখানে তৃতীয় পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা যুগের মূল্যবান প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, চিত্র, মূর্ত্তি, শিল্পনিদর্শন সুসজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক দ্রব্যটি যুগ, শিল্পধারা, স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সংরক্ষিত। সংগ্রহালয়টি ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভের ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান।

"গুজারী মহলের" উত্তরেই ইংরাজদের সমাধি ক্ষেত্র, ১৮৫৮ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র কিল্লা ইংরাজদের দখলে ছিল। সেই সময়ে সৈনিকগণের মৃতদেহ এই স্থানে সমাধিস্থ করা হইত।

পর্ব্বতে উঠিবার মধ্যপথে ডানদিকে পাহাড় কাটা একটি গুহাতে চতুর্ভুজ মন্দির অবস্থিত; সেইস্থানে খোদিত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কনৌজাধিপতি রামদেব গুহাটি কাটিয়া চতুর্ভুজ মন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন। উঠিতে উঠিতে ডান দিকে কপোত নীড়ের ন্যায় ছোট বড় অনেকগুলি গুহা ও কোলঙ্গ মধ্যে হিন্দু দেবদেবী ও জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। 'সারদা বোয়াদি' ও 'অনার বোয়াদি' নামে দুইটি জলাশয় পর্ব্বতের কৃষ্ণগাত্রে মণির মতন উজ্জ্বল হইয়া আছে।

পথের শেষেই 'হস্তি-তোরণ' মধ্যযুগের স্থাপত্যের অপূর্ব্ব কৌশল। তোরণটি মানসিংহ প্রাসাদের সংলগ্ন, পূর্ব্বে

এখানে একটী প্রস্তরের বৃহদায়তনের হস্তী অবস্থিত ছিল। সেইজন্ত ইহার নাম 'হস্তীতোরণ' বলিয়া খ্যাত।

মানসিংহ-প্রাসাদ

মহারাজ মানসিংহ শিল্প ও সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৪৮৬ হইতে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদানীন্তন হিন্দু রাজ-প্রাসাদের প্রকৃষ্ট নমুনা এই প্রাসাদটি। প্রাসাদের পূর্ব্ব অংশ খাড়া পাহাড়ের গাত্রেরই অংশ—তিন শত ফিট্ লম্বা ও ৮০ ফিট্ উচ্চ, এই দিকের ছয়টি গোল বুরুজ, ছাদের উপরের চূড়া ও গম্বুজ প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বাহির প্রাকারে মানব-মানবী, হংস, হস্তি, কুম্ভীর, বাঘ, কদলী বৃক্ষ অঙ্কিত নীল, সবুজ ও পীত বর্ণের মসৃণ টালি বসান থাকায় হর্ম্ম্যটির সৌন্দর্য্য ও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। আলিসায় হস্তী আকারের 'জালি' গোয়ালিয়র প্রদেশের প্রস্তর-শিল্পীদের দক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মান-মন্দিরের অন্দরমহল দুইটী পৃথক অংশে বিভক্ত; প্রথমটির প্রাঙ্গণের চারিদিকে "দেওয়ানী আম্"এর ন্যায় বড় বড় দালানের, স্তম্ভের, ব্রাকেটের, কার্নিসের ও দ্বারের কারুকার্য্য অতি মনোরম ও সূক্ষ্ম। অপর অংশ "শীস্-মহল" নামে খ্যাত। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট বড় কয়েকটি কক্ষ বিরাজিত। সূক্ষ্ম পাথরের কারুকার্য্যের সহিত রঙ্গিন টালি ও কাঁচ বসান থাকায় এই মহলটির নাম 'শীস্-মহল' হইয়াছে।

ইহার নিম্নতলে "তাওয়াইখানা"—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গৃহ-স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট পরিকল্পনা। ভূগর্ভে অবস্থিত এবং বাতাস ও উত্তাপ প্রবেশ পথ রুদ্ধ থাকায় এই দালানগুলি গ্রীষ্মকালে খুব ঠাণ্ডা থাকে এবং আরামদায়ক। স্থাপত্যের কৌশলে বাহির হইতে আলোক প্রবেশের পথও সে যুগের স্থপতিদের বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন। এইখানে একটি কূপ অবস্থিত, ইহাই যজ্ঞকুণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে তাহা মহলের ৮৮ বৎসর বয়স্ক প্রতি-হারীর নিকট শুনা যায়।

তাহার নিম্নের তলায় অন্ধকার মহলে মোগল সম্রাটগণের রাজদ্রোহী বন্দীদের অবরোধে রাখা হইত। ইহার এক কক্ষে সম্রাট সাজাহানের পুত্র মোরাদকে ঔরঙ্গজেব অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই স্থানটি দেখিলেই বক্ষ কম্পিত হইয়া উঠে।

মান-মন্দিরের পরই পর্ব্বতের শিরে ১½ মাইল লম্বা সমতল ভূমি। এই স্থানে এক সময় কত শত হর্ম্ম্য, মন্দির, হাতিশালা, ঘোড়াশালা, সৈন্যনিবাস, সামন্ত ও সর্দ্দারদের অট্টালিকা ছিল; এখন সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও দেখা যায়। প্রধান রাজপথের পার্শ্বে মান-মন্দিরের দক্ষিণে থাকে থাকে পাথর দিয়া বাঁধান পাড়ের মধ্যে 'সূর্য্যকুণ্ড' সরোবর। জলাশয় মধ্যে এক মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। এই জলটুঙ্গীতে যাইবার জন্ত প্রস্তরের একটি পোল আছে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটী ঘাট আছে। পশ্চিমের ঘাটের উপর দুই পার্শ্বে দুইটী গোল গম্বুজের মন্দির, একটিতে শিবলিঙ্গ ও অপরটিতে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

তেলিকা মন্দির

কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পথপার্শ্বে এক ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাথরের রঙ্গমঞ্চের গ্যালারীর ন্যায় বসিবার থাক থাক আসন। তাহার পর 'তেলিকা মন্দির'—মন্দিরটি এক শত ফিটের অধিক উচ্চ। ইহার গঠন পদ্ধতি অপরূপ ও নব পরিকল্পনায় নির্ম্মিত। শিখর দ্রাবিড়-স্থাপত্য রীতিতে গঠিত, দেখিতে ঠিক দক্ষিণ ভারত মন্দিরের গোপুরমের মতন, কিন্তু নিম্নভাগ উত্তর ভারতের আর্য্য শিল্পধারায় খোদিত। ইহা দ্রাবিড় ও আর্য্য (ইন্ডো-এরিয়েন) সংমিশ্রণে গঠিত স্থাপত্যের এক অপূর্ব্ব শিল্প-ঐশ্বর্য্য। বাহির অঙ্গে অনেক প্রকার স্ত্রী ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত —কিন্তু অভ্যন্তরের প্রাচীর গাত্র একেবারে সাদা—কোন কারুকার্য্য নাই। কিন্তু সংলগ্ন নাটমন্দিরের শিখর



তেলিকা মন্দির

সাদাসিধা প্রস্তর থাকে থাকে সজ্জিত মাত্র। মন্দির শূন্য, কোন বিগ্রহ মন্দিরে নাই।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে তিনটি বৃহৎ বৃহৎ জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি বসান আছে। সম্মুখের কারুকার্য্যময় তোরণটিতে লেখা আছে—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মেজর কীর্থ তোরণটি সংস্কার করিয়াছেন। দুর্গের একেবারে দক্ষিণ অংশে সামন্ত ও সর্দ্দারদের তনয়দের শিক্ষা দিবার জন্ত 'সর্দ্দার স্কুল' বিরাজিত; 'রণোজী', 'মাধোজী', 'শিবাজী' হর্ম্ম্য নামে

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের তিনটি বাটীতে বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকদের নিবাস অবস্থিত।

শ্বাস-বহু মন্দির

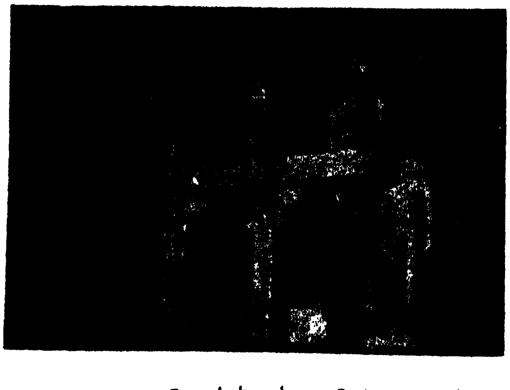
দুর্গমধ্যে 'শ্বাস-বহু' নামে দুইটি মন্দিরে অতীত ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন এখনও রহিয়াছে। একটি বৃহৎ, অপরটি ক্ষুদ্র আয়তনের। কিম্বদন্তী বলে একটি শ্বাশুড়ী, অপরটি বধূ দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া 'শ্বাস-বহু' নামে মন্দিরদ্বয় পরিচিত।



শ্বাস-বহু মন্দির

বড় মন্দিরের চাঁদনীতে খোদিত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কাচুয়া রাজপুত বংশের রাম মহীপালের রাজ্য সময়ে ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দুইটী মন্দিরই বিষ্ণু পূজার জন্য ব্যবহৃত হইত। দ্বারের, চৌকাঠের, ছাদতলের, বৃহদায়তন স্তম্ভগাত্রের কারুকার্য্য যেমন সূক্ষ্ম তেমনই মনোহর। ইহার কোলঙ্গ ও বারাণ্ডা খাজুরাহোর মন্দির পরিকল্পনায় গঠিত। ছোট মন্দিরটীর চাতালের উপর দাঁড়াইলে সমতল ভূমির ও নগরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়।

'উড়বাই' তোরণ দিয়া যে পথ ক্রমশ ঢালু হইয়া নামিয়া



গুহামধ্যে বিশফুট উচ্চ জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি

গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে পাহাড় গাত্রে কর্ত্তিত বহু গুহা ও কোলঙ্গ মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় জৈন তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি খোদিত আছে। কয়েকটি মূর্ত্তি বিশ ফিটের অধিক উচ্চ ও দিগম্বর। মূর্ত্তিগুলির গঠন ও চক্ষুর খোদন ভাবব্যঞ্জক ও মনোহর। এই পথ পর পর তিনটি তোরণ মধ্য দিয়া গিয়াছে। উপরের দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বারপাল মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

ঝান্সীর রাণীর ছত্রী

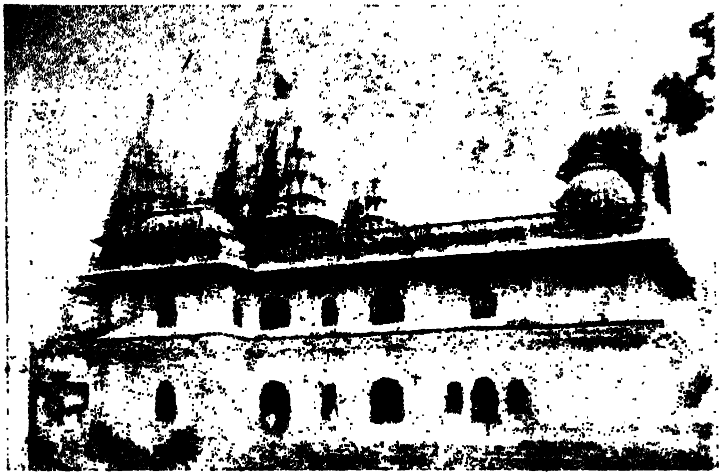
গোয়ালিয়রের নিকটেই ঝান্সীর শেষ স্বাধীন রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাঈ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং বিপুল ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চিতাভস্ম গোয়ালিয়রে যে স্থানে রক্ষিত সেই পুণ্যস্থানের উপরেই রাণী লক্ষ্মীবাঈএর স্মৃতি মন্দির (ছত্রী) নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনও স্বাধীনতাকামী নর-নারী মাত্রই সেই স্বাধীনতার উপাসিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে এই ছত্রীতে গমন করে।

লাস্করে জয়াজীরাও চকের সম্মুখে সিন্ধিয়া বংশের রাজা ও রাণীদের ছত্রীগুলি মহারাষ্ট্র শিল্প ও সমাজধারার নিদর্শন। জয়াজীরাও সিন্ধিয়ার ছত্রীটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত। গর্ভমন্দিরে জয়াজীরাও মহারাজের পূর্ণ অবয়বের কৃষ্ণ পাথরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরের মহারাণীর মূর্ত্তি বিরাজিত। রাজা যেমন যেমন পরিচ্ছদ পরিতেন তেমন তেমনই পোষাক তাঁহার মূর্ত্তিতে নিত্য পরান হয়। যে যে প্রিয় খাদ্য খাইতেন সেই সবই নিত্য ভোগ দেওয়া হয়। বিরাট নাটমণ্ডপে উৎসবের দিনে নৃত্য গীত হয়, প্রতিদিন ভজন ও নীতিকথা শুনাইবার ব্যবস্থা আছে। শিবলিঙ্গও নিত্য পূজিত হয়, লিঙ্গের সম্মুখে প্রস্তরের বৃহৎ বৃষ মূর্ত্তিটি মনোহর।

দৌলৎরাম সিন্ধিয়ার ছত্রীটিও বৃহৎ ও কারুকার্য্য মণ্ডিত। রাজার পূর্ণ সাদৃশ্য কৃষ্ণপ্রস্তরের প্রমাণ মূর্ত্তি বেদী উপরে স্থাপিত। এই ছত্রীর পার্শ্বে জানকজী রাও সিন্ধিয়ার ছত্রী, তাহার মধ্যে মহারাজার ও তিন রাণীর শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহা ব্যতীত দৌলতরাম সিন্ধিয়ার পিতামহী ও আর কয়েকটি রাজা ও রাণীর ছত্রী আছে।

আধুনিক সভ্যতার ও জীবনধারার সহিত গোয়ালিয়র সহর ও সমাজ সমান তালে চলিয়াছে। নগরের বিজলী বাতির আলো, জলের কল, ভূতলের প্রঃপ্রণালী, সাধারণ ক্রীড়া ভূমি, ভ্রমণ উদ্যান এ যুগের পৌর অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। 'জয়বিলাস' প্রাসাদ, জুম্মামসজিদ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, জয়ারোগ্য হাসপাতাল, টাউন হল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বাজার, জয়াজী রাও চক, কেন্দ্রীয় পুস্তকালয়, বিচারালয়, মতিমহল প্রভৃতি—সৌধাবলী বর্ত্তমান যুগের পূর্ত্ত স্থাপত্য কৌশলের নিদর্শন। কেন্দ্রীয় রাজকীয় গ্রন্থালয়ে

নানা ভাষার পুস্তকের সহিত বাঙ্গালা ভাষার পাঁচশতাধিক পুস্তক সংগৃহীত আছে। জয়াজীরাও সিন্ধিয়া, মাধোজী রাও সিন্ধিয়া, রাণী সাখ্যা প্রভৃতির ব্রোঞ্জের পূর্ণাবয়বের মূর্ত্তিগুলি পাশ্চত্য শিল্পীর জয়-ঘোষণা করিতেছে। বিড়লা কটন মিল, গোয়ালিয়ার পটারীওয়ার্ক, লেদার ফ্যাকটারী প্রভৃতি কয়েকটি কলকারখানা আধুনিক যান্ত্রিক যুগের প্রভাব বিস্তার করিতেছে। চিনিকা কল (গোয়ালিয়র পটারী ওয়ার্কস) বাঙ্গালী দীনেশ মজুমদার মহাশয়ের ২৫ বৎসরের সাধনার ফল। বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার ভাদুড়ী মহাশয়ের নাম নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহিত বিজড়িত।

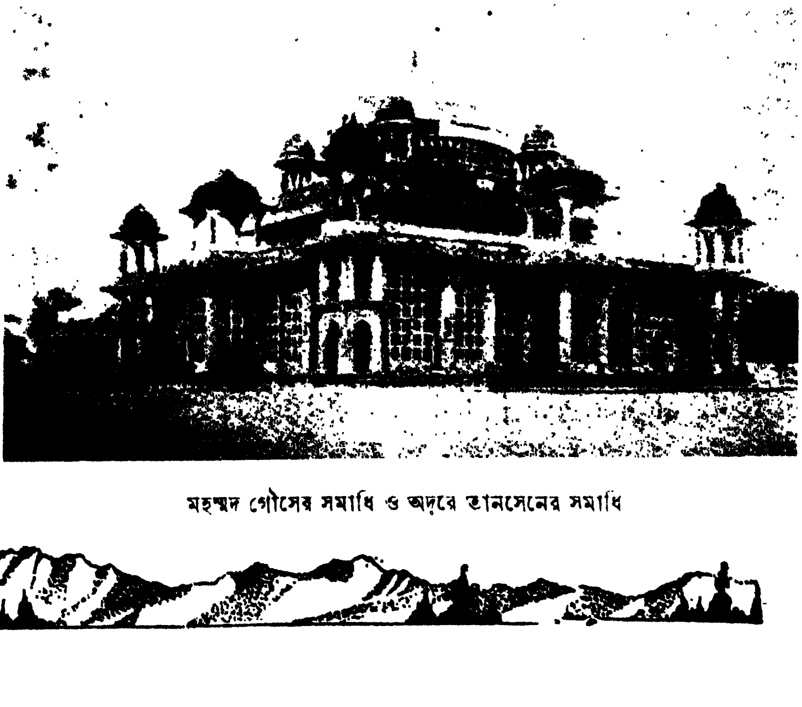


জয়াজীরাও সিন্ধিয়ার ছত্রী

গোয়ালিয়রের রাজকীয় দেবালয় দেখিলে স্বাধীন নরপতির পৃষ্ঠ-পোষকতা ব্যতীত যে জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না তাহাই উপলব্ধি হয়। এই রাজ্যের দেবদেউলে রাধাকৃষ্ণ, শিব, গণেশ আদি বিগ্রহের সেবানিষ্ঠা, পূজার সুব্যবস্থা, উৎসব রীতি, অতিথিসংকার, সঙ্গীত চর্চ্চা, শাস্ত্রপাঠএর ব্যবস্থা ও মন্দিরের ঐশ্বর্য্য স্বাধীন ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মহম্মদ গৌসের সমাধি

আকবর বাদশাহের অন্যতম গুরু পীর মহাম্মদ গৌস্‌এর সমাধি দুর্গ হইতে অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। সমাধি মন্দিরের স্থাপত্য ও কারুকার্য্য মোগল শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মধ্যে এক বিরাট গোল গম্বুজ ও চারিধারে বারাণ্ডা ও তাহার উপর থাকে থাকে কয়েকটি গম্বুজ সজ্জিত আছে। বারাণ্ডা বৃহৎ বৃহৎ সূক্ষ্ম পাথরের জালির পর্দ্দার দ্বারা বেষ্টিত। সৌধ মধ্যে শ্বেত পাথরের সমাধি বিরাজিত।



মহম্মদ গৌসের সমাধি ও অদূরে তানসেনের সমাধি

ইহারই প্রাঙ্গণের এক অংশে জগদ্‌বিখ্যাত তানসেনের সমাধি অবস্থিত। তানসেন আকবর বাদশাহের দরবারে নবরত্নের মধ্যে অন্যতম। সমাধিটি ক্ষুদ্র ও সাদাসিধা, তথাপি হিন্দু মুসলমান সঙ্গীতানুরাগী মাত্রই সমাধিটি শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিয়া থাকেন। তানসেনের মৃত্যুদিবস বৃহস্পতিবারে নগরের নটী ও গায়িকারা কেহই তাঁহাদের ব্যবসা গান-বাজনা করেন না। সেইদিন অনেকে গানবাজনা করিতে করিতে মিছিল করিয়া তানসেনের কবরে যাইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসেন। কবরের পার্শ্বে একটি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ আছে, তাহার পাতা চিবাইলে গলার স্বর তানসেনের কৃপাতে সুমিষ্ট হয় এই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত। সঙ্গীতানুরাগী অনেক ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত সেই তেঁতুল গাছের পাতা এখনও চিবাইয়া থাকে। গোয়ালিয়র এখনও ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র।



কথা ঃ—শ্রীমতী সুজাতা ঘটক বি-এ, বি-টি   সুর ও স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

বাগেশ্বরী—ত্রিতালা

ফুরাবে কবে ওমা
তোমার এ লীলা খেলা।
তাই ভাবিয়া যে গো
কাটে মোর সারা বেলা॥
মরণ-আঁধার ঘন ঘিরে আছে চারিধার—
মৃত্যু-ভয়-ভীত মানবের হাহাকার,
অভয় করে সবে মুছাও নয়ন-ধার,
পরাণ নিয়া মাগো একি তব হেলা-ফেলা॥

আনন্দময়ী শ্যামা আনো আনন্দে—
সুন্দর কর ধরা-রূপে-রসে-গন্ধে।

মঙ্গলময়ী মাগো মঙ্গল আনো,
অসুন্দরে তব অশনি হানো,—

বরাভয় হাতে ওমা অভয় দানো,—
মাটির পুতুলে আজি
ক'রোনা ক'রোনা হেলা॥

০ ১ + ৩

II। র্সা ণা ধা | ধা ধমা ধা র্সণা | ধা পধা পমা পমা | গা মগা রা সা I
• ফু রা বে ক বে ও মা তো মা র্ এ লী লা খে লা

I। সা -ন্সা ণ্ধা | ণ্া সা গা গা | গা মগমা সা গমা | মধা ধা মধণর্সা র্সা II
• তা ই ভা বি য়া যে গো কা টে • • মোর্ সা রা বে•• লা

II মা মা মধা ধণা | ণর্সা -া র্সা র্সা | র্সর্রা র্র্সা ধা পমা | ধর্সা র্সা র্সা -া I
ম র ণ• আঁ ধা র্ ঘ ন ঘি• রে আ ছে চা• রি ধা র্

I র্সা -র্গা র্গা র্গা | র্র্গা -র্মর্গা র্রা র্সা | না র্সা র্রা র্সা | ধা ণা ধা -া I
মৃ • ত্যু ভ য় •• ভী ত মা ন বে র হা হা কা র্



হানাবাড়ী

(নাটিকা)

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

চতুর্থ দৃশ্য

[৭নং বাড়ীর দ্বিতলের একটি শয়ন-কক্ষ]

মাণিক। কি রকম বাড়ী গুপী-দা ?

গুপী। পেল্লায় বাড়ী। কিন্তু আমি ভাবছি, এতবড় বাড়ীটাতে রাত কাটাতে হবে দু'জনকে।

মাণিক। তোমার ভয় করছে নাকি ?

গুপী। না না ভয় ঠিক নয়, তুমি কিন্তু হ্যারিকেনটা জ্বালাবার ব্যবস্থা কর। বাড়ীওয়ালার আক্কেলটা দেখেছ। যদিই বা একটা হ্যারিকেন দিলে, তাও কোন্ মান্ধাতার আমলের পুরোণো ঝড়্ঝড়ে। আদ্ধেক রাত্তিরে বিগড়ে না যায়। যাই হোক্ তুমি আর দেরী কোরো না—আলোটা জ্বেলেই ফেল, এদিকে সন্ধ্যেও ত হয়ে এল। তার ওপর আবার আকাশটা কি রকম ঘনঘটা করে আসছে দেখেছ।—নাঃ দেবতারা পর্য্যন্ত পেছনে লেগেছে দেখছি।

মাণিক। বর্ষাকালে মেঘ করবে সেটা আর বিচিত্র কি—গুপী-দা ?

গুপী। আহা কালও ত বর্ষাকাল ছিল হে। কিন্তু

আকাশে একছিটে মেঘ দেখেছিলে? যত মেঘ কি বাবা আজকের জন্যে জমা করে রাখা হয়েছিল? তা বলে মনে কোরো না আমি ভয় পেয়েছি। আসল কথা কি জান—মেঘ করলে মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে যায়!

মাণিক। তা তো বুঝলুম, কিন্তু যতই অন্ধকার বাড়তে থাকবে তোমার মেজাজও ততই যদি উত্তরোত্তর বিগড়োতে থাকে তাহলেই ত মুস্কিল।

গুপী। আরে না না, ও আমি ঠিক সামলে নোবো।—তুমি এখন ঝপ্ কোরে লণ্ঠনটা জ্বেলে ফেল দেখি। আর টর্চ্চ-দুটো এখন থেকেই বের করে রাখলেই ত হয়। রাত-বিরেতে সাপ্-খোপের ভয় থাকতে পারে তো! আর দেখ, টিফিন্-কেরিয়ারটা বার করে আলো থাকতেই দুজনে খেয়ে নিই এস। রাত্তিরে-বিত্তিরে বাইরে আঁচাতে বেরোনোটা—বুঝেছ কি না···

মাণিক। তুমি পাগল হলে নাকি গুপী-দা। এই তো খানিক আগে দুজনে খাবারের দোকানে বসে পেট ঠেসে জলযোগ করে নিলুম;—আবার এখুনি কখন খাওয়া যায়?

গুপী। তবে যা খুসী কর! আমার কিন্তু বাবু···আরে ওটা আবার কাদের বাড়ী? বাড়ীটা ত বড় সুবিধের নয়।

মাণিক। আবার কি হোলো?

গুপী। আরে, এই জানলাটার ধারে এসে দেখে যাও না ছাই। নাঃ—চারদিক থেকে সবাই মিলে যেন একজোট হয়ে বজ্জাতি সুরু করেছে।

মাণিক। কৈ, কোথায় আবার বজ্জাতি দেখলে?

গুপী। ঐ দেখ না! বাড়ীটির চেহারাখানা দেখেছ একবার! ওদিকে চাইলেই যেন গা ছম্ ছম্ করতে থাকে। কলকাতার সহরের ওপর এমন ঝিয়ে-ভাঙ্গা খাস্তার বাড়ী ত চোদ্দপুরুষে কখন দেখিনি।

মাণিক। তাতে তোমার কি হোলো শুনি? তোমাকে তো আর কেউ ও-বাড়ীতে রাত্রিবাস করতে বলছে না।

গুপী। তা ত কেউ বলছে না; কিন্তু এ-বাড়ীর সঙ্গে ও-বাড়ীটা যে একবারে গায়ে-গায়ে লাগান,—সেটা লক্ষ্য করেছ। ঢের-ঢের বাড়ী দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন বিদ্‌ঘুটে বাড়ী কখন দেখিনি। বাড়ী তো নয়, যেন দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। ভিতের গায়ে কি রকম অশত্থ গাছ জন্মেছে দেখেছ?

মাণিক। সবই দেখেছি, কিন্তু তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি!

গুপী। তা তো বুঝলুম—কিন্তু···। আবার দেখেছ উঠোনে কি রকম প্রকাণ্ড একটা বেলগাছ খাড়া হয়ে উঠেছে! নাঃ সারলে দেখছি। তাও যদি মানুষ বাস করতো, তাহলেও না হয় বোঝা যেতো। একবারে ডাহা পোড়ো বাড়ী।

মাণিক। নাঃ—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি। ও রকম করে এখন থেকেই যদি ·····

গুপী। আরে না না, ঠিক্ আছি—ঠিক্ আছি। কি জান ভায়া—চারদিকে একটু নজর রাখতে হয়। হ্যাঁ আর এক কথা, আমার সুটকেশের মধ্যে একটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে—বের করে ফেল দেখি!

মাণিক। কৃত্তিবাসী রামায়ণ?

গুপী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কেন, জানতে নেই নাকি? আরে বাবু আটঘাট বেঁধে কাজে নামা ভাল!

মাণিক। তার মানে?

গুপী। মানেটা খুবই সোজা; একটু বুদ্ধি খাটালেই বুঝতে পারতে। আরে ভায়া পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র বই আছে যার পাতায় পাতায় রাম-নাম লেখা!

মাণিক। নাঃ—তুমি এইবার সত্যিই হাসালে গুপী-দা।

পঞ্চম দৃশ্য

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ জমেছে এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। দুর্য্যোগের পূর্ব্বলক্ষণ।

গুপী। বলি ও মাণিকলাল—ঘুমোলে নাকি?

মাণিক। না ঠিক ঘুমোই নি।—একটু তন্দ্রা এসেছিল।

হঠাৎ দূরে কোন গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে তিনটে বাজলো

গুপী। রাত তিনটে বাজলো, শুনতে পেয়েছ? অর্দ্ধেক রাত তো কাটিয়ে দেওয়া গেল।

মাণিক। বাকি অর্দ্ধেকও ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে, কিচ্ছু ভয় নেই।

গুপী। আলোটা আর একটু জোর করে দিলে হয় না? যে রকম নিব্-নিব্ করে জ্বলছে হঠাৎ কখন্ না নিবে যায়। ঐ আলোটুকু ত সম্বল।

মাণিক। কিচ্ছু ভেবো না—চুপ্‌চাপ শুয়ে থাকো।

গুপী। তাছাড়া আর করছিই বা কি?—বলি কৃত্তিবাসী রামায়ণটা মাথার শিয়রে আছে ত?

মাণিক। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।

গুপী। বাইরে কিন্তু কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে।

মাণিক। কৈ না!

গুপী। একটু কান খাড়া করে শোন দেখি!

মাণিক। হ্যাঁ, একটা খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে।

গুপী। দূরে কে যেন খড়ম পায়ে দিয়ে চলাফেরা করছে। আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছ?

মাণিক। না, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গুপী। পাশের ঐ পোড়ো বাড়ীটা থেকে। সম্ভবতঃ বেলগাছটার তলায়।

মাণিক। যাক্ গে, ও নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। হয়ত কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে সত্যিই চলাফেরা করছে।

গুপী। রাত তিনটের সময় এই দুর্য্যোগে খড়ম পায়ে দিয়ে কে পায়চারি করতে যাবে শুনি? আর তাছাড়া ও বাড়ীতে ত কেউ বাস করে না। লোকজন থাকলে সন্ধ্যে থেকে একবার না একবার সাড়া পাওয়া যেতো।

মাণিক। তা বটে, যাক্ গে ওকথা ছেড়ে দাও!

হঠাৎ দূরে ছোট ছেলের কান্নার মত কি যেন শুনা গেল

গুপী। (সভয়ে) ও, আবার কি! মাণিকলাল!—মাণিকলাল!

মাণিক। কি হোলো?

গুপী। চুপ্! ছোট ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছো!

মাণিক। হুঁ!

গুপী। পোড়োবাড়ীতে ছোট ছেলের কান্না!

মাণিক। (কম্পিত কণ্ঠে) যাক্ গে, তুমি চুপ করে শোও!

এই সময় সহসা শোঁ শোঁ শব্দে বাহিরে ঝড় উঠলো এবং ভীষণ শব্দে দূরে কোথায় বাজ পড়লো

গুপী। ও আবার কিসের শব্দ!

মাণিক। বাইরে ঝড় উঠলো বোধ হয়।

গুপী। ওঃ, কি ভীষণ দুর্য্যোগ! সার্সির কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছ কি রকম মুহুর্মুহু বিদ্যুত চমকাচ্ছে!

মাণিক। তা হোক্ গে, চুপ করে শুয়ে থাকো।

গুপী। রাতটা ভালোয় ভালোয় কাট্‌লে বাঁচি।

মাণিক। তুমি কিন্তু ওরকম করে আমাকে ঠেসে ধোরো না, দম বন্ধ হয়ে যাবে যে।

গুপী। তা যাক্ গে! একটা রাত না হয় একটু কষ্ট করেই শুলে! আর কটা ঘণ্টা বৈ ত নয়! কিন্তু ও কিসের আওয়াজ?

হঠাৎ দূর থেকে কার ভয়ার্ত্ত বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—"কেও!—কেও!—কেও!" এবং পরক্ষণেই দূর থেকে কে যেন উত্তর দিলে—"তুমি!—তুমি!—তুমি!"

গুপী। মাণিকলাল, শুনলে?

মাণিক। হুঁ!

গুপী। কিছু বুঝতে পারলে?

মাণিক। না!

গুপী। আমার হাত-পা সব কেমন যেন ঝিম্-ঝিম্ করছে। কি করি বল দেখি? তুমি কথা কইছো না কেন?—উত্তর দাও না ছাই।

মাণিক। হুঁ!

গুপী। হুঁ কি? ভাল করে কথা কও না!

মাণিক। (কম্পিত কণ্ঠে)—চুপ কর!

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভোর হয়ে এসেছে।…রাত্রের দুর্য্যোগ কেটে গিয়ে পূর্ব্বগগনে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে

গুপী। বাপ্—কি ফাঁড়াটাই কেটেছে। তোমার সস্তার বাড়ীর খুরে-খুরে দণ্ডবৎ মাণিকলাল;—আর নমস্কার তোমার বাড়ীওয়ালাকে। আস্ত চিজ্ একখানি! কি হে চুপ করে রইলে যে?—যাও, দাঁও মারগে যাও!—বড় যে তড়পানি।

মাণিক। এ যে তোমার অন্যায় রাগ-করা গুপীদা! পাশের বাড়ীতে যদি ভূতের উপদ্রব থাকে, তার জন্যে এ বাড়ীর দোষ দিলে চলবে কেন?

গুপী। (টিট্‌কারীর সুরে)—বেশ ত হে, তুমি এসে সপরিবারে এই বাড়ীতে বাস কর না?—

মাণিক। আহা সে কথা কে বলছে?

গুপী। তবে ওসব ছেঁদো কথা বলে লাভ কি শুনি? শালার ঘরের শালা মেরে ফেলতে বসেছিল! আবার ন্যাকামী কত!—গো-ব্রাহ্মণ আপনারা, আপনাদের কাছে কি আর মিছে কথা বলতে পারি। শালা আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! ব্যাটাকে ফাঁসী দেওয়া উচিত। খুনে-ব্যাটা কোথাকার।

মাণিক। যাক্ গে, এখন বাড়ী ফেরবার যোগাড় দেখা যাক্!

গুপী। (টিট্‌কারীর সুরে) কেন সস্তার বাড়ীতে থাকবে না?

মাণিক। তাহলে একটা রিক্স ডেকে আনি—কি বল!—কে ওখানে?

ঘরের দরজার কাছে একটি লোককে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেল

গুপী। উনি আবার কে?

মাণিক। বাড়ীওলার চাকর-বাকর কেউ হবে বোধ হয়।—কে হে ভেতরে এস না!

লোকটি হাতজোড় করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে! নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক।

গুপী। কি হে, তোমার বাবু বুঝি মজা দেখতে পাঠিয়ে দিলেন?—হাঁ করে দেখছ কি? ভাবছো, লোক দুটোর কি অখণ্ড পরমায়ু,—এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে—শিতমুখ খিঁচিয়ে মরে পড়ে নেই!—শালার ঘরের শালা কোথাকার।

মাণিক। আঃ কি করছো গুপীদা!—আগে দেখাই যাক্ লোকটা কে?

গুপী। তুই থাম্ থাম্! ও সব শালাকেই আমার জানা আছে।

আগন্তুক। আজ্ঞে আমি ত কোন অপরাধ করিনি বাবু! আমার ওপর খামকা…

গুপী। আর ন্যাকামী করতে হবে না!

আগন্তুক। আজ্ঞে, আমি ত আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না হুজুর!

গুপী। তোর বুঝেও কাজ নেই! তুই তোর সেই হারামজাদা বাবুকে পাঠিয়ে দিগে যা—একবারে চূড়োন্তো করে বুঝিয়ে দেবো!

মাণিক। ওহে দেখ, তুমি গিয়ে তোমার বাবুকে বলগে যে তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। তিনি যেন এখুনি একবার আসেন।

আগন্তুক। আজ্ঞে, আমার ত কোন বাবু নেই!

মাণিক। এ বাড়ীর বাড়ীওলার তুমি চাকর ত?

আগন্তুক। আজ্ঞে না!

গুপী। (রুক্ষস্বরে) তবে তুই কে শুনি?

আগন্তুক। আজ্ঞে আমি হারুগয়লার পো মথুর।

গুপী। তা, এখানে কি করতে উঁকিঝুঁকি মারছিলে শুনি?—এটা তোমার গোয়াল পেয়েছ শালা?

মাণিক। আহা, কি করছ গুপীদা, ও বেচারী কি অপরাধ করলে?

মথুর। দেখুন ত বাবু! শুধু শুধু আমাকে গাল পাড়চেন।

মাণিক। যাক্—কিছু মনে কোরো না;—তা তুমি এখানে কি চাও বল দেখি?

মথুর। আজ্ঞে, আপনারা এ বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছেন

শুনলুম, তাই ভাবলুম একবার হুজুরদের সঙ্গে দেখা করে আসি যদি বাবুদের দুধ-টুধ দরকার হয়। আপনাদের পাশের বাড়ীতেই থাকি। গরীব মানুষ। দুধ বিক্রি করে খাই। ভাবলুম যদি খদ্দের করতে পারি। এতে আর এমন কি অপরাধ হয়েছে বাবু?

গুপী। কি বল্লি? পাশের বাড়ীতে থাকিস্? ঐ পোড়ো বাড়ীটাতে নাকি?

মথুর। আজ্ঞে হ্যাঁ!

মাণিক। ও বাড়ী ত খালি পড়ে আছে।

মথুর। আজ্ঞে, খালি পড়ে থাকতে যাবে কেনে বাবু? আমরা সাতপুরুষ ও বাড়ীতে বাস করে আসছি!

গুপী। কাল রাত ১২টা পর্য্যন্ত ত ও বাড়ীতে কোন ব্যাটার টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত শুনিনি। ওর কথা শোন কেন তুমি। যত সব জোচ্চোরের দল।

মথুর। আজ্ঞে, কাল রাত ১২টা পর্য্যন্ত আমরা কেউ বাড়ীতে ছিলুম না হুজুর!

গুপী। কেন ছিলে না শুনি!

মথুর। আজ্ঞে, আমার এক ভাগ্নীর বিয়েতে বাড়ীশুদ্ধ সব নেমন্তন্ন খেতে গেছলুম। ফিরতে প্রায় রাত ১টা বেজে গেছলো।

মাণিক। এখন সব বুঝতে পারছো গুপীদা?

গুপী। অনেক বুঝেছি, আর নতুন করে বোঝাতে হবে না।

মাণিক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো,—ঠিক করে বলবে?

মথুর। কেন বলব না হুজুর!

মাণিক। আচ্ছা, কাল রাত্তিরে ওরকম করে কে চেঁচাচ্ছিল বল ত?

মথুর। চেঁচাচ্ছিল?

গুপী। (টিটকারী সুরে) না, মিহিকণ্ঠে ঠুংরী ভাঁজছিলো! ব্যাটা ন্যাকা কোথাকার!

মাণিক। দেখ, রাত তখন তিনটে হবে। আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলুম, তোমাদের বাড়ীতে কে যেন চেঁচাচ্ছে—কেও! কেও! কেও!

মথুর। ও হরি, তাই বলুন। ও আমার ঠাকুরদা মশাইয়ের গলা। উনি ত রোজই ওরকম করে চেঁচান।

গুপী। বুঝতে পারছো না মাণিকলাল!—ও ওর স্বর্গগত পিতামহের কথা বলছে।—কিরে ঠিক কিনা!

মথুর। আজ্ঞে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমরা। আপনাদের মতন গুছিয়ে কথা বলতে জানি কি হুজুর! ঠাকুরদাদা,—বাবারও বাবা;—সগ্‌গগত বৈকি বাবু!

গুপী। শুনলে ত মাণিকলাল!

মাণিক। হুঁ।

গুপী। বুঝলে না, এখনও সংসারের মায়া কাটাতে পারেনি।

মথুর। আজ্ঞে যা বলেছেন!—এখনও সংসার সংসার করে অস্থির।

গুপী। এখন ঠেলা বোঝো ভায়া! যাকগে মরুকগে, এখন আমাদের যাবার ব্যবস্থা করো! আর এ বাড়ীতে এক দণ্ড থাকা নয়।

সহসা সিঁড়িতে কার জুতাসমেত পায়ের শব্দ শোনা গেল

মাণিক। কার জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায় না?

গুপী। দেখি, আবার কোন মহাত্মা এসে হাজির হন্‌।

বাড়ীওয়ালার প্রবেশ

বাড়ীওয়ালা। প্রাতঃপ্রণাম মশাই!

গুপী। এই যে এসেছেন!—বলি, সত্যযুগে না জন্মে দয়া করে এ পাপ কলিযুগে জন্মেছেন কেন বলতে পারেন?

বাড়ীওয়ালা।—তার মানে?

গুপী। তার মানে, এতবড় সত্যবাদী লোকের ত কলিযুগে জন্মাবার কথা নয়।

বাড়ীওয়ালা। আপনি কি যে বলছেন, কিছুই ত বুঝতে পারছি না!

গুপী। তা বুঝতে পারবেন কেন? বলি, এ মানুষ-মারা ব্যবসা কতদিন থেকে সুরু করা হয়েছে শুনি!

মাণিক। তুমি চুপ কর গুপী-দা, যা বলবার আমি বলছি।—দেখুন মশাই, এরকম করে ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রতারণা করাটা কি আপনার উচিত হয়েছে?

বাড়ীওয়ালা। প্রতারণা?

মাণিক। প্রতারণা বৈকি! আপনার এ বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব নেই স্বীকার করি, কিন্তু পাশের বাড়ীতে যে রকম ভূতের উপদ্রব, তাতে যে এ বাড়ীতে ছেলেপুলে নিয়ে বাস করা আদৌ নিরাপদ নয়, সে কথা আপনি ত জানতেন। তা সত্ত্বেও……

বাড়ীওয়ালা। পাশের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব? বলেন কি মশাই?

গুপী। একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে!—যেন কিছুই জানেন না।

বাড়ীওয়ালা। সত্যিই আকাশ থেকে পড়লুম মশাই।

মাণিক। কিন্তু ওবাড়ীর লোকেরা নিজেরাই যে স্বীকার করছে।

বাড়ীওয়ালা। স্বীকার করছে যে ওবাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে?

মাণিক। বিশ্বাস না হয়, এই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করুন।

বাড়ীওয়ালা। কি রে মথুর, তুই স্বীকার করেছিস্ যে তোদের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে?

মথুর। আজ্ঞে!—আমি কখন স্বীকার করলুম হুজুর?

গুপী। শোন মাণিকলাল। এখন বলে কিনা—বলিনি। জোচ্চোর কোথাকার!

মাণিক। তুমি বল্লে না যে, তোমার স্বর্গগত ঠাকুরদাদা রোজ রাত্রে 'কেও, কেও' করে চিৎকার করেন?

মথুর। তাত বলিছি হুজুর, কিন্তু ভূতের উপদ্রবের কথা ত একবারও বলিনি।

মাণিক। বুঝুন মশাই।

বাড়ীওয়ালা। তোর ঠাকুরদাদা স্বর্গগত হোলো কবে রে?

মথুর। আজ্ঞে গয়লা হলেও তিনি ত আমার বাবারও বাবা, কাজেই আপনাদের মতন ভদ্দরলোকের কাছে সগ্‌গগত না হলেও, আমার কাছে সগ্‌গগত বৈ কি বাবু!

বাড়ীওয়ালা। আরে ব্যাটা, স্বর্গগত মানে কি জানিস?

মথুর। বলি, লেকাপড়া শিকিনি বলে এটুকু কি আর জানি না হুজুর? সগ্‌গগত মানে ভক্তি-ছেদ্দার পাত্তর আর কি!

বাড়ীওয়ালা। তোর মাথা!—স্বর্গগত মানে কি জানিস্? যে স্বর্গে গেছে, অর্থাৎ যে মারা গেছে। তোর ঠাকুরদাদা মরেছে না কি?

মথুর। বালাই; মরতে যাবেন কেনে! কালও খড়ম পায়ে দিয়ে রাতদুপুরে গোয়ালঘরের পাট করেছেন।

বাড়ীওয়ালা। তবে ব্যাটা জ্যাঠামী করে শুদ্ধ ভাষায় কথা কইতে গেছলি কি করতে শুনি?—এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আপনারা?

মাণিক। কিছু কিছু পাচ্ছি বৈ কি!

গুপী। তা তো হোলো! কিন্তু জিজ্ঞেস করি—তোমার ঠাকুরদাদাটি রাত তিনটের সময় ওরকম করে 'কেও—কেও' করে বিকট শব্দে চিৎকার করছিলেন কেন শুনি?

মথুর। আজ্ঞে ও ত উনি রোজই করে থাকেন।

মাণিক। রোজই করেন? কেন ভয়-টয় কিছু দেখেন না কি?

মথুর। আজ্ঞে তা নয়!

মাণিক। তবে?

মথুর। ওঁর বড্ড নাক ডাকে কি না।

মাণিক। তা—অমন 'কেও, কেও' করে চেঁচান কেন?

মথুর। আজ্ঞে, ঘুমোবার পর থেকেই ওঁর নাক ডাকতে সুরু করে, তার পর ঘুম যতই পাকতে থাকে নাক ডাকার আওয়াজও তত জোর হতে থাকে। শেষ কালে এত জোরে নাক ডাকতে থাকে যে নিজের নাক ডাকার আওয়াজে নিজেরই ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ধড়মড় করে লাপিয়ে ওঠেন। তখন ভয় পেয়ে চেঁচাতে থাকেন—কেও?—কেও?—কেও? আমি তখন পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠি—তুমি!—তুমি!—তুমি!

মাণিক। তার মানে?

মথুরা। আজ্ঞে, তার মানে, ওঁকে মনে করিয়ে দিই যে ও আর কিছু নয়—তোমারই নাক ডাকার আওয়াজ!

মাণিক। কি আপদ!

বাড়ীওয়ালা। কাণ্ডটা বুঝুন মশাই!

মাণিক। এখন সব বুঝলে গুপী-দা?

গুপী। যাক্‌গে, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও! হ্যাঁ দেখুন মশাই, আমাদের হচ্ছে ভদ্দরলোকের এক কথা। যখন বলেছি আপনার বাড়ী ভাড়া নেবো, তখন ভূতের উপদ্রব থাকলেও নেবো, না থাকলেও নেবো—কি বল মাণিকলাল?—তাহলে আমরা আজই সন্ধ্যের দিকে মালপত্তর নিয়ে হাজির হচ্ছি। আপনি কিন্তু ঘরদোরগুলো একটু সাফ্‌সুদরো করিয়ে রাখবেন।—আর দেখ ঘোষের-পো, নেহাত ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, নইলে তোমার ঐ পূজনীয় ঠাকুরদাদা মশাইটির পায়ের ধূলো নিয়ে আসতুম। আর নেহাত গরীবের ঘরে জন্মেছি, নৈলে তোমার ঠাকুরদাদা মশাইয়ের ঐ বনেদী নাকটিকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতুম?

সুন্দরের অন্তর্ধান

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

যে রূপে জীবন ভরি' ভুলা'লে নয়ন,
যে অমৃতে পূর্ণ করি' রাখিয়াছ মন,—
সে রূপ কোথায় তব লুকা'লে সুন্দর
এ সন্ধ্যায়? তোমারও কি যৌবনের পর
জরা আসে, মরণের আতঙ্ক মাখিয়া,
কুৎসিতের আবরণে সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া?

সুন্দরের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী পদ্মাবতী
কোন দুঃখে, কার শাপে সাজিল জরতী?
অথবা আমারই ভুল! অভিশপ্ত প্রাণ
চির-সুন্দরের বুঝি হারা'ল সন্ধান,
সুকৃতির অন্তে যেন! গঙ্গাবক্ষে তাই,
সাহারার মরু-অস্থি দেখিবারে পাই!

বায়ু আজি বিষদিগ্ধ; সুনীল আকাশ
মৃত্যুশরে মূর্চ্ছাহত; কুসুম-সুবাস
গন্ধকের গন্ধে ভরা; হরিৎ কান্তার
হৃত-শোভ; নীলসিন্ধু পরে লৌহ-হার!
ধরার সৌন্দর্যাসার মানবের মুখ
দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট যেন প্রতিমূর্ত্ত দুখ!

যৌবন কোথায় গেল? বার্দ্ধক্যে জরায়
কে দিল আচ্ছন্ন করি' আজি এ ধরায়?
পথে-পথে গৃহহীন ভুখারী ভিখারী
মরণের নাভিশ্বাস টানে সারি-সারি
কিম্বা একা নিঃসহায়! দুর্ব্বল দু'পায়
উঠিয়া দাঁড়ায়, তারও নাহিক উপায়।

সহজ আনন্দ, যাহা চিহ্ন জীবনের,
আজি তা' কল্পনা-কথা বিস্মৃত দিনের!
হায়রে সুন্দর, যার করেছি আরতি
সুদীর্ঘ জীবন ভরি',—এই তার গতি!
চীৎকারে চৌদিকে শিবা, অদূরে শ্মশান,
আকাশে গর্জ্জিয়া ফিরে প্রলয়-বিষাণ!

আয়ুর্ব্বেদে ধমনী নির্ণয়

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি (কলিঃ) এম ডি (বার্লিন) আয়ুর্ব্বেদভূষণ

২। ধমনী অর্থে জ্ঞানকর্মবাহী পথ (Nerve)

পূর্বে (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৫১) ধমনী সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ধমনী অর্থে সকল স্থানেই nerve বুঝায়, কোনও স্থানেই artery নির্দেশ করে না।

এক্ষণে সুশ্রুত ও চরক হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যাহাতে ইহা সকল স্থানেই nerve নির্দেশ করে—কোনও স্থানেই artery নির্দেশ করে না। যথা—

১। কণ্ঠ নালীর উভয় দিকে ৪টি ধমনী আছে—দুইটির নাম নীলা এবং দুইটির নাম মন্যা। কণ্ঠনালীর এক এক দিকে এক একটী করিয়া নীলা ও এক একটী করিয়া মন্যা আছে। তাহারা অভিভূত হইলে মূকতা (বাক্ রাহিত্য) বা স্বর বৈকৃত্য এবং আস্বাদ-গ্রহণ শক্তিহীনতা হয়। সু-শা—৬।৬৭

২। কুপিত বায়ু সর্বদেহস্থ ধমনীসকলকে আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টসাধ্য দণ্ডাপতানক নামে আর এক প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে। তাহাতে দেহ দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি শক্তি রহিত হয়। সু-নি-১।৪৬,৪৭

৩। অত্যর্থ কুপিত বায়ু যখন শরীরের অন্যতর পক্ষের অর্থাৎ শরীরের বাম বা দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্যগগামী ধমনী সকলকে আশ্রয় করিয়া সেই পক্ষের সন্ধি বন্ধন সকলকে শিথিল করিয়া ফেলে, তখনই সেই পক্ষ নষ্ট অর্থাৎ অকর্মণ্য ও অচেতন হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকেই পক্ষাঘাত কহিয়া থাকেন। সু-নি-১।৫৩

৪। কফযুক্ত বায়ু শব্দ বহ ধমনী সকলকে আবরণ করিয়া মানবকে অক্রিয়ক অর্থাৎ হয় বোবা, না হয় খনা, না হয় গদগদ ভাষী করিয়া থাকে। সু-নি-১।৭০

৫। প্রকুপিত দোষ প্রসরণপূর্বক ধমনীতে (পুরীষবাহিনী ধমনীতে) উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে অধোমুখে গমনপূর্বক গুদনাড়ীকে আশ্রয় করে ও তদ্বস্থ বলিসমূহকে দূষিত করিয়া তাহাতে মাংসাঙ্কুর সকল জন্মাইয়া থাকে। এই মাংসাঙ্কুরকেই অর্শঃ কহে। সু-নি-২।৩

৬। স্নেহে অবগাহন করিলে সেই স্নেহ শিরামুখ দ্বারা, রোমকূপ দ্বারা, ও ধমনীসমূহ দ্বারা শরীরের সর্বত্র গমন করিয়া শরীরকে তর্পিত এবং বলিষ্ঠ করিয়া থাকে। সু-চি-২৪।২০

৭। বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরবহ ধমনী সকলে অধিষ্ঠান করত স্বরকে বিনষ্ট করে। ইহাতেই স্বর-ভেদ রোগ উৎপন্ন হয়। সু-উ ৫৩।২

৮। বাতাদি দোষ সকল যখন মনোধিষ্ঠান চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় ও মনোবহ ধমনী সকলে প্রবেশ করে, তখনই মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। সু-উ-৪৬।২

৯। কন্যাদিগের স্তন সংশ্রিত ধমনী সকল রুদ্ধদ্বার থাকে, অতএব তাহাদের স্তনরোগ জন্মেনা। সেই সকল স্ত্রীই গর্ভিণী ও প্রসূতা হইলে তাহাদের সেই স্তন সংশ্রিত ধমনী সকল স্বভাবতই মুক্তদ্বার হয়, সেই জন্যই তাহাদের স্তনরোগ জন্মিয়া থাকে। সু-নি-১০।১৮,১৯

১০। প্রসবের তিনদিন বা চারিদিন পরে হৃদয়স্থ ধমনী সকলের মুখ বিবৃত হওয়ায় স্ত্রীলোকদিগের স্তন সম্যক প্রবৃত্ত হয়।—সু-শা-১০।১৩

১১। ঋতু শোণিত একমাসে উপচিত হইলে বায়ু তাহাকে ধমনী মার্গ দ্বারা যোনিমুখে আনয়ন করে।—সু-শা-৩।৭

১২। গর্ভিণীর রসবহ ধমনীসমূহের উপস্নেহ অসঞ্জাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগ গর্ভকে জীবিত রাখে।—সু-শা ৩।১৭

১৩। প্রাণবহ ধমনীসকল হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। সু-শা-৪।৩০

১৪। গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টু, কঞ্জীব, খঞ্জ, পঙ্গু, বাতকণ্টক, পাদদাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, বাধির্য ও ধমনীগত বাত রোগসমূহে যথা প্রয়োজন শিরা বেধ করিবে।—সু-চি-৫।২৩

১৫। বায়ু কুপিত হইয়া শিরোগত ধমনীসমূহে প্রবেশ করত মস্তকে মহৎ শূল উৎপাদন করে।—চ-সূ ১৭.৮

১৬। অপস্মার রোগ সম্পর্কে চরক বলেন—বাতাদি দোষ ধমনী দ্বারা হৃদয়কে পীড়ন করে। হৃদয় সংপীড্যমান হইয়া ব্যথিত, প্রাস্তচিত্ত, মোহপ্রাপ্ত......চ-চি ১০ ৪

১৭। নাভীতে যেমন অমরা নাড়ী প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ে সেইরূপ দশটি ধমনী এবং প্রাণবায়ু, উদানবায়ু, মন, বুদ্ধি, চেতনা ও মহাভূত অবস্থিত। চ-সিদ্ধি-৯।৩

১৮। অপতানকগ্রস্ত রোগী কফ ও বাত দ্বারা রুদ্ধমার্গ হয়। তীক্ষ্ণ প্রধমন দ্বারা সংজ্ঞাবহ ধমনীসকল বাত শ্লেষ্ম হইতে মুক্ত হইলে তাহার সংজ্ঞা লাভ হইবে।—চ-সিদ্ধি ৯।১১

১৯। অতি সংঘট্টনে...শিরা ও ধমনীসমূহের হৃদ (শিড়িশিড়িবৎ পীড়া), শ্বাস ও কাসাদি রোগ জন্মে —চ সিদ্ধি-১২।৭

২০। উন্মাদ নিদান প্রসঙ্গে চরক বলেন—বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বুদ্ধি স্থান হৃদয়কে এবং তদাশ্রিত মনোবহ দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মানুষের চিত্তকে বিকৃত করিয়া ফেলে অর্থাৎ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে।—চ-চি-৯।৩

এই সকল স্থানে শব্দবহ, স্বরবহ, মনোবহ, রসবহ, প্রাণবহ, সংজ্ঞাবহ ইত্যাদি ধমনীর কথা বলা হইয়াছে। সুশ্রুতের ধমনী ব্যাকরণ শারীর অধ্যায় ভিন্ন উপরোক্ত উদ্ধৃত স্থানগুলিতে যে ধমনী শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, ধমনী অর্থে artery হইলে তাহার কোনটিরই অর্থ হয় না। পরন্তু ধমনী অর্থে nerve হইলে সকলগুলিরই অর্থ সুস্পষ্ট।

এক্ষণে ধমনী ব্যাকরণ অধ্যায়ের ৯ ও ১০ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের এই অংশ সমাপ্ত করিতেছি।

সুশ্রুত বলেন—

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষুচ।
ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরূপচীয়তে॥

সু-শা—৯.৯

অর্থাৎ যেমন মৃণাল ও বিসসমূহে স্বভাবতঃ ছিদ্র থাকে, ধমনীদিগেরও সেইরূপ স্বভাবতঃ ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্র দ্বারা রস উপচিত হয়।

এই বচন দ্বারা ধমনী সছিদ্র বলা হইয়াছে। এই ছিদ্র মৃণাল অর্থাৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ পদ্মের শিকড়স্থিত অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র যাহা দ্বারা রস শোষণ করে। সুশ্রুত বলিয়াছেন যে ধমনী স্বেদ এবং রস রোমকূপ দ্বারা নির্গত করায়। মৃণাল ও বিসের ছিদ্র মানব শরীরের রোমকূপরূপ ছিদ্রের সহিত তুলনীয়, রক্তবাহী শিরার সহিত নহে। উহার পূর্বের বচনে তীর্যগ্‌গা ধমনী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাসাং মুখানি রোমকূপ প্রতিবদ্ধানি" এই মুখ শব্দ সুষিরা না অসুষিরা নির্দেশ করে? প্রকৃতপক্ষে ইহা সুষিরা কিন্তু এই ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম। টীকা প্রসঙ্গে ডল্লন বলেন, 'তৈরেব মনোহসুগতৈঃ সুখাসুখরূপং স্পর্শং কর্মাত্মা গৃহ্নীত। তাঃ

সর্ব্বাঙ্গগতা স্পর্শ গ্রহণাধিকৃতত্বাৎ, তদগতং মনোঽপি সর্ব্বাঙ্গ স্রোতোগত মেব। এস্থলে ধমনী মনোবহা ও স্পর্শ জ্ঞানের বাহক, মন ও স্পর্শ জ্ঞান এই সূক্ষ্ম মুখ দ্বারা প্রবেশ করে। ইহা কোনও দৃশ্য ছিদ্র নহে। এই ছিদ্রগুলি কিরূপ তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে। উর্দ্ধগ, অধোগ, ও তীর্য্যগ ধমনী যে সকল দ্রব্য বহন করায় তাহাদিগকে বাহক ভেদে দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

যথা—১। যাহাদের বাহক অসুষিরা অর্থাৎ অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ইহারা বায়ু, শব্দ, রূপ, রস (রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্য), গন্ধ, স্পর্শ, বাক্য, শব্দ, নিদ্রা, জাগরণ বহন করে।

২। যাহাদের বাহক সুষিরা অর্থাৎ দৃশ্য ছিদ্র বিশিষ্ট—শোণিত, রস, (অন্নরস), অশ্রু, স্তন্য, বা শুক্র, অন্ন, অম্বু, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব শোণিত, পুরীষ, স্বেদ, অভ্যঙ্গ পরিষেকাদির বীর্য, এই দৃশ্য ছিদ্র বিশিষ্ট পথ দ্বারা অসুষিরা ধমনী ঐ সকল দ্রব্য বহন করায়। উপরোক্ত শ্লোক ইহাই নির্দেশ করে যে ধমনী মাত্রেই ছিদ্র বিশিষ্ট এবং এই ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু ইহা রস, রক্ত, মূত্র পুরীষবাহী দৃশ্য ছিদ্র বিশিষ্ট পথ নহে।

এই সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি কিরূপে ধমনীর মধ্যে রস উপচয় করে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। cocain, strychnine কিংবা এইরূপ ধমনীর (nerve) উপর কার্য্যকরী কোনও দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে উহা এই সকল সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধমনীকে অকর্মণ্য কিংবা উত্তেজিত করে। উপরোক্ত শ্লোকে "যথা স্বভাবতঃ খানি" এইরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র নির্দেশ করে, কখনও রস রক্তবাহী পথ (lymphatics and blood vessels) নির্দেশ করে না। এই "ছিদ্র" শব্দ দ্বারা যদি ধমনীর স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হয় তাহা নিরসন উদ্দেশ্যে সুশ্রুত তাহার পরের শ্লোকেই বলিতেছেন—

পঞ্চাভিভূতাস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়ন্তি।
পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা পঞ্চত্বমায়ান্তি বিনাশকালে॥
সু-শা-৯।১০

অর্থাৎ পঞ্চভূত সম্পন্ন ধমনীসকল পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট কর্ম্ম পুরুষকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান শ্রোত্রাদিপঞ্চকে পঞ্চবার সংযোজিত করে অর্থাৎ কর্ম্ম পুরুষকে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় পাঁচটি পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করায় এবং কর্ম্ম পুরুষকে শ্রোত্রাদি পঞ্চকে সংযোজিত রাখিয়া বিনাশকালে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান মতে Nervous system-এর প্রাঞ্জল বর্ণনা। সেইজন্য ধমনী শব্দ nerve বোধক শব্দ এবং Nervous system এর আয়ুর্বেদীয় নাম "ধমনী তন্ত্র"।

৩। ধমনী অর্থে—(ক) জ্ঞানকর্ম্মবাহী পথ (nerve) এবং (খ) রসস্বেদবাহী পথ (lymphatics etc)

জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতীর মতে ধমনী দ্বিবিধ—সুষিরা ও অসুষিরা। অসুষিরা জ্ঞানকর্ম্মবাহী পথ (nerve) এবং সুষিরা রসস্বেদবাহী পথ (lymphatics and capillaries)।

উর্দ্ধগ ১০টি ধমনীর ৩০টি বিভাগ সম্বন্ধে তিনি বলেন—জীবন যোনি প্রবন্ধ সম্ভূত শরীরের সর্ববিধ পোষণ কার্য্যের জন্য বাত পিত্ত কফ শোণিত ও রস এই পাঁচটি পদার্থের সঞ্চালন আবশ্যক। সেই সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রযোজক দশ প্রকার ধমনী। ইহারা সকলেই nerve। অধোকায় পোষণের জন্য এই দশবিধ অধোগ ধমনী আবশ্যক। ইহারাও সকলেই nerve। উর্দ্ধগ অপর ২০টি ধমনী যাহা শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি বহন করায় তাহারাও nerve। অধোগ (ক) পিত্তাশয়স্থ রসকে কিট্ট হইতে পৃথককারী, (খ) রসকে সর্বত্র বহন করিয়া শরীর পোষণকারী (গ) মূত্র, পুরীষ, আর্ত্তব শোণিত, শুক্র বিবেককারী ও বহনকারী ধমনীও nerve। তীর্য্যগ স্পর্শসুখ বা অসুখ অনুভবকারী ধমনীও nerve।

তাঁহার মতে যে সকল ধমনী সুষিরা অর্থাৎ lymphatics, capillaries ইত্যাদি তাহারা—

১। অধোগ ধমনীর মধ্যে যথা—অর্পয়ন্তি চ (রস) উর্দ্ধগাবাং তির্য্যগগানাঞ্চ—যে সকল ধমনী উর্দ্ধ ও তীর্য্যগ ধমনীতে রস অর্পণ করে। তাঁহার মতে ধমনীতে অর্পণ স্রোতঃ ব্যতীত হইতে পারে না। সেইজন্য ইহা সুষিরা।

২। রসস্থানঞ্চ অভিপুরয়ন্তি—যে সকল ধমনী রসস্থান (রসস্থান—হৃদয় উরসঃ) পূরণ করে। জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মতে রসস্থান = রসের সঞ্চার স্থান cisterna chyli।

৩। তীর্য্যগ্গা ধমনীর—(১) তাসাং (ধমনীনাং) মুখানি রোম-কূপপ্রতিবদ্ধানি তৈঃ স্বেদমভিবহন্তি—তিনি বলেন, প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ লোমকূপের কোনও অংশে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত। তাহা হইলে এই ধমনীগুলি সচ্ছিদ্র প্রণালী না হইলে লোমকূপের ন্যায় সছিদ্র প্রণালীর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না এবং তাহা দ্বারা কোনও দ্রব পদার্থ চলাচলও করিতে পারে না। এস্থলে ধমনীগুলি লোমকূপ প্রতিবদ্ধ দ্বার দ্বারা স্বেদকে লোমকূপে পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং ইহারা সছিদ্র না হইলে হইতে পারে না।

৪। অভ্যঙ্গ পরিষেক ইত্যাদি রোমকূপ পথে প্রবিষ্ট তৈল শরীরের ভিতরে যাইয়া থাকে। সুতরাং এই ধমনীগুলিও সছিদ্র। অর্থাৎ তাঁহার মতে বাতবাহী ধমনী অসুষিরা এবং রসায়নী ও স্বেদবাহী ধমনী সুষিরা।

এক্ষণে এই মত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে তিনি ধমনীকে কখনই রক্তবাহী পথ (artery) নির্দেশ করেন নাই। আরও উর্দ্ধগ ৩০টি ধমনী সকলগুলিই nerve। অধোগ ধমনীর ৩০টির মধ্যে ১৮টি nerve কেবলমাত্র অন্ন অম্বুবাহী ৪টি ও তীর্য্যগগামী ধমনীদিগকে স্বেদ অর্পণকারী ৮টি এই ১২টি সুষিরা। তীর্য্যগগা ৪টি ধমনীর স্পর্শ সুখ অনুভবকারী ধমনীটি nerve অপর তিনটি যাহা স্বেদ, রস ও অভ্যঙ্গাদির বীর্য বহন করে তাহারা সুষিরা। এক্ষণে এই সুষিরা ধমনীর স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

১। অন্ন অম্বুবাহী ৪টি ধমনী পিত্তাশয় হইতে অন্নরস রসস্থান পূরণ করে ও হৃদয়ে রস অর্পণ করে। এই কার্য প্রকৃতপক্ষে রসায়নী দ্বারা সম্পন্ন হয়। রসায়নী (lacteals) পিত্তাশয় হইতে অন্নরস বহন করিয়া cisterna chyli পূরণ করে ও পরে thoracic duct পথে পরিশেষে হৃদপিণ্ডে সেই রস অর্পণ করে। তথা হইতে উহা সর্বদেহে চালিত হয়। এ স্থলে এই রসায়নীকে ধমনী বলা যায় না। কারণ ধমনী nerve রূপে, বায়ু পিত্ত কফ শোণিত ও রস এই পঞ্চবিধ পদার্থ সঞ্চালন করে এবং তাহা বাতবহা, পিত্তবহা, কফবহা, রক্তবহা, রসবহা স্রোত দ্বারা বহন কার্য্য সম্পাদন করে ; অন্য পক্ষে অশ্রু, স্তন্য, মূত্র, শুক্র, শুক্রের প্রাদুর্ভাব, শুক্রক্ষরণ, আর্ত্তব শোণিত, পুরীষ ইত্যাদি বহন কার্য্যও অশ্রুবহা, স্তন্যবহা, মূত্রবহা, শুক্রবহ, আর্ত্তববহা, পুরীষবহা স্রোতঃ দ্বারা সম্পাদন করে। ধমনী যদি এই সকল স্রোতঃ দ্বারা এই সকল পদার্থ সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রযোজক হয় তাহা হইলে ধমনীও nerve রূপে রসায়নী রূপ রস স্রোতঃ দ্বারা রস বহন করাইতে পারিবে না কেন? প্রকৃতপক্ষে রসায়নী, স্বেদবাহী ও অভ্যঙ্গাদির বীর্যবাহী স্রোতঃ সকলেই সুষিরা। ধমনী এ সকল স্থলেও nerve রূপে এই সকল স্রোতের সঞ্চালন কার্য সম্পন্ন করায়, নিজে বহন করে না। সেইরূপ শার্ঙ্গধর, সঙ্গীত রত্নাকর, সুশ্রুত প্রভৃতির "ধমন্যোরসবাহিন্যো" ইত্যাদি বচনে "রসবহ" শব্দে "রসবহন করায়" এই অর্থই লইতে হইবে। (অন্তর্বাবিদ্ধিচ্)

২। "রসায়নী" শব্দ আয়ুর্বেদে কম প্রয়োগ করা থাকিলেও

"রসায়নী" বা "রসবাহিনী" শব্দই অন্নপানজাত অন্ন রসের বহনকারী পথের প্রকৃত ও উপযুক্ত শব্দ। চরক নির্দেশ দিয়াছেন যে শরীরে লক্ষ্য ও অলক্ষ্য ধাতুর গমন পথের নাম-স্রোতঃ, শিরা, ধমনী, রসায়নী, রসবাহিনী ইত্যাদি (চ-বি-৫।৫)। এতদ্ভিন্ন রসহারিণী, সংবাহিনী শব্দও পাওয়া যায় (চ-শা-৪।৮) আরও বমি এবং তৃষ্ণা নিদান প্রসঙ্গে রসায়নী ও রসবাহিনী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—সু-চি-১২।৮ ; চ-চি-২০।৭, ৯ ; ২২।৩ ; চ-শা-৭।৮, এই সকল শব্দের ব্যবহার হইতে দেখা যায় যে "রসায়নী" শব্দই অন্নপানজাত অন্নরসের পথ। এই অন্নরস দুইটি বিভিন্ন পথ দ্বারা অন্ত্র হইতে শরীরে গমন করে। মাংস (প্রোটিন) ও শর্করা (শ্বেতসার) জাতীয় খাদ্য পরিপাকান্তে যে আগ্নেয় রস-উৎপন্ন হয় তাহা গ্রহণী (ক্ষুদ্রান্ত্র) হইতে শোষিত হইয়া portal vein পথে যকৃতে গমন করে। অন্য পক্ষে স্নেহ জাতীয় (দুগ্ধ ঘৃতাদি) খাদ্যদ্রব্য পরিপাকান্তে যে সৌম্যরস (chyle) উৎপন্ন হয় তাহা বিভিন্ন পথে (lacteals পথে) প্রথমে cisterna chyli ও পরে thoracic duct, subclavian vein হইয়া পরিশেষে হৃদপিণ্ডে গমন করে। এইরূপে (১) অন্ত্র মধ্য হইতে রসায়নী দ্বারা হৃদপিণ্ডে অন্নরস সংবহন এবং (২) সর্বশরীরে রসবাহিনী (lymphatics) দ্বারা লসিকা (lymph) সংবহন এই দুই প্রকারের রস সংবহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উভয় প্রকার সংবহনকারী প্রণালীকেই রসায়নী বলা যাইতে পারে। কিন্তু অন্নরস ও লসিকার পার্থক্য নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। অন্নরস ও লসিকার পার্থক্য এই অন্নরস আহারভুক্ত ও সম্যক পরিণত (জীর্ণ) হইলে তাহা হইতে যে তেজোভূত পরম সূক্ষ্ম সার পদার্থ প্রথম উৎপন্ন হয় তাহাই রস নামে অভিহিত (সু-সূ-১৪।২) লসিকা—যে জল সর্বশরীর ব্যাপ্ত বাহ্যত্বককে পোষণ করে, ত্বগভ্যন্তরে ব্রণগত হয় এবং মাংস অভ্যন্তরস্থ জলকে লসীকা বলে (চ-শা-৭।১০)। রস ও লসীকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। রস সার ধাতু, লসিকা রসের মলধাতু। ধমনী এই সকল রসায়নীকে nerveরূপে চালিত করিয়া রস লসিকা বহন করায়। এইরূপে স্বেদবাহী স্রোতঃ দ্বারাও স্বেদ বহন করায়। ইহাতেই প্রমাণিত হইল ধমনী মাত্রেই জ্ঞান কর্মবাহী।

জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী বলেন—সুশ্রুতের কতকগুলি স্থানে, যথা—"যৈঃ ছিদ্রৈঃ রসউপচীয়তে, অভিবহন্ত্যঃ শরীরং তর্পয়ন্তি (চোর্দ্ধগতানাং) রসস্থানঞ্চ পূরয়ন্তি—"বহন করায়" এরূপ অর্থ হয় না, "বহন করে" এই অর্থ হয়। সেইজন্য তিনি ২৪টি প্রধান ধমনীর ৬৪ (৩০ + ৩০ + ৪) শাখার মধ্যে অন্ন ও অম্বুবাহী (৪টি) স্বেদবাহী (৮ + ৩ = ১১) এই মোট ১৫টি ধমনীকে সুষিরা রস স্বেদবাহী পথ ও বাকী সকলগুলিতে অসুষিরা জ্ঞান-কর্মবাহী পথ নির্দেশ দিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে অধোগ ধমনী "অর্পয়ন্তি চোর্দ্ধগতানাং" ঊর্ধ্বগত ধমনীকে রস অর্পণ করে…ইহা যদি সুষিরা ধমনী (lymphatic) দ্বারা সংঘটিত হয় তাহা হইলে তাহারা কিরূপে ঊর্ধ্বগ অসুষিরা ধমনী (Nerve)কে তাহা অর্পণ করিবে? কারণ ঊর্ধ্বগ ৩০টি ধমনীই যে nerve সে বিষয়ে তিনি একমত। সেইজন্য আমার মনে হয় অন্য সকল ধমনী যেমন nerve রূপে রস, রক্ত মূত্র পুরীষ বহন করায় এগুলিও সেইরূপ nerve রূপে রসায়নী ও স্বেদবাহী পথ দ্বারা রস স্বেদ বহন করায় নির্দেশ করিলে সকল ক্ষেত্রেই ধমনীকে nerve বলা যাইতে পারে

উপসংহার

আয়ুর্বেদে ধমনী সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা আছে তাহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে এবং ব্যাকরণের "অন্তর্ধাবী নিচ্" প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ ধমনী নিজে বহন করে না, বহন করায় এই অর্থে সকল স্থলেই ধমনী জ্ঞানকর্মবাহী পথ (nerve) নির্দেশ করে। কোনও স্থানে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (artery) নির্দেশ করে না।

ধমনী মাত্রেই যে একরূপ পদার্থ—nerve, এবং lymphatics capillaries ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ নহে তাহা সুশ্রুতের নিম্নলিখিত বচন হইতে প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি সর্বপ্রকার ধমনীর কার্য একই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

যদা তু ধমনীঃ সর্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ।
তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহু দেহং মুহুশ্চরঃ॥ সু-নি-১।৪৫

অর্থাৎ, কুপিতবায়ু যখন ঊর্ধ্ব অধঃ ও তির্যগ্‌গামী ধমনীসকলকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আক্ষেপরোগ উৎপাদন করে, ইহাতে কুপিতবায়ু মুহুর্মুহু সঞ্চরণ ও মুহুর্মুহু অঙ্গকে ইতস্ততঃ পরিচালন করিতে থাকে। সু-নি-১।৪৫

অধোগমাঃ সতির্যগ্‌গা ধমনীরূর্ধ্বদেহীনাঃ।
যদা প্রকুপিতোঽত্যর্থ মাতরিশ্বা প্রপদ্যতে॥ সু-নি-১।৫৩

এই শ্লোকের অর্থ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত গ্রন্থ বিবরণী

গণনাথ সেন—প্রত্যক্ষশারীরম্ (১৯২৪)
„ সংজ্ঞাপঞ্চকবিমর্শঃ (১৯৩১)
গঙ্গাধর শাস্ত্রী জোশী—গণনাথ সেন কৃত
কৃষ্ণ শাস্ত্রী কাবাডে—সংজ্ঞাপঞ্চকবিমর্শ হইতে উদ্ধৃত
জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী—আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলন পত্রিকা
নভেম্বর ১৯৩৯ (পৃঃ ৫৬৫) নভেম্বর ১৯৪০ (পৃঃ ৪৯১)
ডিসেম্বর ১৯৪০ (পৃঃ ৫৪৪) এবং অন্য বিভিন্ন স্থানে।

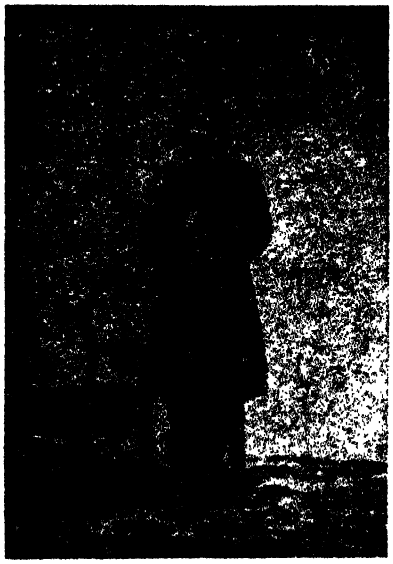
উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ-আর-ই-এস্

(৩)

লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের লণ্ডনস্থ আবাসভবন খৃষ্টীয় মিসনরীদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার সুবিধা ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টান হইলেও দেশকে ভালবাসিতেন, স্বজাতিকে সমাদর করিতেন। একবার তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ খৃষ্টান"। ধর্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি যে জাতিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ একথা কখনও ভুলেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারই আবাসভবনে উমেশচন্দ্র অন্যান্য ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় এবং ভারতবন্ধু উদারনীতিক ইংলণ্ডীয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহারা একত্র হইলে অনেক সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিক অক্ষমতার কথা উঠিত। এই সকল বিষয়ে নিয়মিত ভাবে আলোচনা করিবার নিমিত্ত ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভবনে "লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী" নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাদাভাই নৌরোজী উহার সভাপতি এবং



জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

উমেশচন্দ্র কিছুকাল উহার সম্পাদক ছিলেন। উহাতে ইংলণ্ড-প্রবাসী বহু ভারতীয়—হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী যোগদান করিয়াছিলেন। দাদাভাই নৌরোজীর সেই সময়ে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—



দাদাভাই নৌরোজী

"ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রধান সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত। উহা আকারে ক্ষুদ্র এবং উহার কোন ক্ষমতা নাই এবং উহা কোন সংস্কার সাধিত করিতে অক্ষম বলিয়া উপহসিত হইতে পারে। কিন্তু উহা দ্বারা প্রতীত হয় যে এক রাজনীতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিরূপে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবন্ধন সুদৃঢ় করিতেছে এবং কিরূপে কালে এইরূপ ক্ষুদ্র বীজ প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হইতে পারে। এই ক্ষুদ্র সভার প্রত্যেক সদস্য যে প্রেরণা লইয়া যাইতেছেন তাহা ফলপ্রসূ হইবে ;—যেমন বীজ হইতে শস্য উৎপাদিত হয়—সে ফল আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের আচরণের গুণে মিষ্ট বা তিক্ত হইবে।"

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মাবলী এরূপভাবে গঠিত ছিল যে ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে তাহাতে প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। লাটীন, গ্রীক প্রভৃতি প্রতীচ্য প্রাচীন ভাষার পূর্ণসংখ্যা পূর্ব্বে সংস্কৃত আরব্য প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার পূর্ণসংখ্যার সমান ছিল, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যলাভের পর শেষোক্ত বিষয়ের পূর্ণসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়। বোধ হয় মনোমোহনের অকৃতকার্য্যতার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী এই বিষয়ে আন্দোলন করেন এবং সেক্রেটারী-অব-ষ্টেটের নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখেন। ফলে, সংস্কৃত ও আরব্য পরীক্ষার পূর্ণসংখ্যা পূর্ব্বের মত বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন

লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর কার্য্য কতিপয় ভারতবন্ধু উদার-হৃদয় ইংরাজের সহানুভূতি আকৃষ্ট করে। অধ্যাপক ফসেট প্রভৃতি কতিপয় পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মূক অধিবাসীর পক্ষ হইয়া দুই চারি কথা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বলিতেছিলেন। এক্ষণে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর সদস্যগণ এই সকল উদারনীতিক ইংরাজগণকে লইয়া একটি বৃহত্তর সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে পরিণত হইল। এই সভার প্রথম দুই বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ, পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড ও কমন্স সভার খ্যাতনামা সদস্য, এবং ভারতীয়দের মধ্যে দাদাভাই নৌরোজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার কে, এম, দত্ত প্রভৃতি এই সভায় মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধপাঠের পর বিতর্কে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই এই সভার এক অধিবেশনে উমেশচন্দ্র "ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। স্যর হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ কে সি-বি, সি-এস-আই, উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য বিবরণীতে মুদ্রিত এই প্রবন্ধটি হইতে অংশবিশেষ নিম্নে অনুবাদিত করিয়া দেওয়া হইল :—

"কি ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে সে সম্বন্ধে নিয়মাদি আলোচনা করিবার সময় নাই। অনেকে এ বিষয়ে অনেক প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলি গম্ভীর মনোযোগের সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। আমার মতে একটি প্রতিনিধিদের এসেম্ব্লি বা সভা এবং একটি সিনেট বা মন্ত্রণা সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, গবর্ণর-জেনারেলের অভিমত তাহার উপর কার্য্যকরী হইবে কিন্তু আমেরিকায় যেরূপ আছে তাঁহার ক্ষমতা সেইভাবে সঙ্কুচিত হইবে, এবং হয়ত ভারতেশ্বরীর শেষ আদেশ দিবার অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা থাকিবে।"

পুনশ্চ,—

"ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ভাল করিয়া জানিতে গেলে তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তাহাদের বুদ্ধি অনন্যসাধারণ। তাহারা সকল বিষয়ে কার্য্যক্ষম, কিন্তু সে কার্য্য রূঢ়ভাবে আদেশ দিয়া করাইলে চলিবে না। তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাদের প্রতি সামান্যতম ভাবেও বিশ্বাস প্রদর্শন করিলে তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না, এবং তাহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান তাহাদিগকে প্রদত্ত যে কোনও কার্য্যের ভার অতি যত্ন ও দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত করাইবে। এই দায়িত্বজ্ঞান তাহাদিগের দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র সাফল্যের সহিত পরিচালিত করাইবে। আমি অস্বীকার করি না যে তাহাদিগের বিদ্যা য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে যৎসামান্য—প্রায় কিছু নহে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে

বলা যাইতে পারে যে তাহারা প্রতিনিধিমূলক প্রজাতন্ত্রের উপকারিতা যথেষ্টরূপে বুঝিতে পারে। জনসাধারণ হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন না হইতে পারে, কিম্বা সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, কিন্তু জীবন যাত্রার সাধারণ সমস্যা সমূহের সমাধানে তাহারা যতদূর সম্ভব সাবধানতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকে। তাহারা অমিতব্যয়ী বা অমিতাচারী নহে, তাহারা যাযাবর জাতি বা দুর্নীতিপরায়ণ নহে। তাহারা পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা পরিবারবর্গকে, সমৃদ্ধিতে না হউক, সুখে রাখে। "এ সকল গুণ হয়ত শিক্ষার ফল নহে, কিন্তু ইহা দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু প্রতীয়মান হয় যে লোকেরা পড়িতে না জানিলেও সাধুপ্রকৃতির লোক, তাহাদের সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান আছে, তাহারা স্বার্থপর নহে, তাহারা জানে কিসে ধনী নির্ধন—সমাজের সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি হয়, কিসে দেশের কল্যাণ হয়। ভোট প্রদানের অধিকার দিয়া যদি কাহাকেও বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সকল লোকদিগকেই বিশ্বাস করিয়া ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। যদি এই সকল যুক্তি অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্য না হয়, অর্থাৎ যদি আপনারা বলেন ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ভারতবাসীরা অজ্ঞ নহে, তাহা হইলে আমি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিকারের—পরলোকগত মিষ্টার জাবেজ অষ্টিনের যুক্তি প্রদর্শন করিব। তিনি এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—

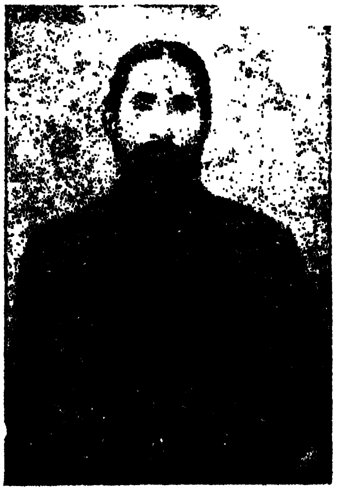
"কোন অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে প্রজাতন্ত্র—যতই ভীষণ জটিলতাপূর্ণ হউক না কেন—কি রাজতন্ত্র অপেক্ষা কম অসুবিধাজনক নহে? এবং যদি শাসনতন্ত্র প্রজাতন্ত্রমূলক না হয় তাহা হইলে জাতি কি কখনও অন্ধকার হইতে আলোকে আসিবে? রাজনীতি শাস্ত্রের অজ্ঞতা—যাহা কুশাসনের মূল কারণ, তাহা হইতে রাজনীতি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করাই কি কুশাসন দূর করিবার প্রধান উপায় নহে?" প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রে প্রজাসাধারণের যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা উচিত তাহা ভারতবর্ষীয়েরা কেন বুঝিতে পারিবে না এবং সেই কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করিতে পারিবে না, তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখিতে পাই না।"

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের একটি অধিবেশনে জেনারেল স্যার এডওয়ার্ড গ্রীন কে-সি-বি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মেজর ইভান্স বেল উহাতে 'গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদে ভারতবাসীদের নিযুক্ত হইবার দাবী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধপাঠের পর স্যর হেনরি রিকেট্‌স্‌, কাপ্তেন বার্কার, চিসহল্‌ম এন্‌ষ্টি, মিঃ ডেণ্ট, নীল পোর্টার, দাদাভাই নৌরোজী, ফিরোজ শা মেটা, জেনারেল ব্রিগ্‌স্‌, উমেশচন্দ্র বোনার্জী, ডাক্তার কে, এম, দত্ত বিতর্কে ও আলোচনায় যোগদান করেন। ডব্লিউ সি বোনার্জীর বক্তৃতাটী সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মর্ম্ম এই:—



সার ফিরোজ সা মেটা

"যদিও ভারতবাসীর পক্ষে শাসন পরিষদে নিযুক্ত হইবার কোন আইনসঙ্গত বাধা নাই, এবং যদিও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসনসংস্কার বিষয়ক বিল পেশ করিবার সময়ে লর্ড মেকেলে, বলিয়াছিলেন যে পদের উপযুক্ত হইলে ভারতবাসীরাও বড়লাটের শাসন পরিষদে স্থান পাইবেন তথাপি এ পর্য্যন্ত কোনও ভারতবাসীকে ঐরূপ পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। দাদাভাই নৌরোজী বিস্মৃত হইয়াছেন যে বে-সরকারী য়ুরোপীয়েরা শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এক্ষণে মহামাননীয় মিষ্টার ম্যাসি ও মিষ্টার মেন পরিষদের সদস্য আছেন। মুসলমানগণের শাসনকালে ভারতীয়েরা শাসন ও মন্ত্রণা পরিষদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা রাজস্ব ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিভাগে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং সাধারণের কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। যে সকল পদে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে শাসন-পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যাইতে পারে সে সকল পদ হইতে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়া পরে তাহাদিগের উপর অক্ষমতা দোষ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। যদিও প্রাদেশিক সিবিল সার্ভিসের সভ্যগণ (চিহ্নিত) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সভ্যগণের অনুরূপ কার্য্য করেন এবং যদিও উভয় সার্ভিসের সভ্যরা সমান বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সার্ভিসের সভ্যগণের সদস্য নিযুক্ত করিতে কোন আইনসঙ্গত আপত্তি নাই তথাপি উহাতে চিহ্নিত কর্ম্মচারীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আমরা চাই যে সিভিল সার্ভিসের একাধিপত্য দূর করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উহাতে নিযুক্ত করা হয়। আমি বলিতে পারি বর্ত্তমানে এমন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও কর্ম্মক্ষম ভারতবাসী আছেন যাঁহারা সিভিল সার্ভিসের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনও য়ুরোপীয়ানের সমান যোগ্যতার সহিত শাসন পরিষদের কার্য্য করিতে সমর্থ। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের কূটনীতি ও পররাষ্ট্র বিভাগে কোন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয় নাই সুতরাং দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনের কোন সুযোগই তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। আমার মনে হয় যে, যে সকল দেশবাসীকে বিচার বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অনায়াসে রাজনীতিক বিভাগেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ভারতবাসীরা চায় তাহাদিগের উপর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে কুশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল এই দায়িত্বের অভাব। বর্ত্তমানে শাসকসম্প্রদায়ের উপর ভারতবাসীরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিলেও উহাতে তাহাদের কোন দায়িত্ব নাই এবং এই দায়িত্বশূন্য প্রভাব সাধারণের পক্ষে হিতকর নহে। যদি ভারতবাসীর পরামর্শ লওয়াই প্রয়োজন বোধ হয় তাহা হইলে তাহা প্রকাশ্যে লওয়া হউক, সেক্রেটারীর খাসকামরায় নহে। য়ুরোপীয়গণের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অভিযোগ এই যে তাঁহারা জনসাধারণের সহিত পরিচিত নহেন, সুতরাং যদি কোন ভারতবাসী শাসন পরিষদের সদস্য হন যাঁহাকে দেশবাসীরা চিনে, সকল অভিযোগ ও অসন্তোষ তাঁহারই বিরুদ্ধে বর্ষিত হইবে,—প্রধান শাসনকর্ত্তার উপর নহে—সুতরাং স্বার্থের খাতিরেও শাসন



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিষদে ভারতবাসীকে স্থান দেওয়া উচিত। সিভিলিয়্যান ব্যতীত কেহ শাসন পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্য নহে বলা মূর্খের প্রলাপ, কারণ একটা বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কোনও ব্যক্তির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা হওয়া খুবই অসম্ভব। ভারতবাসীরা অনেক উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সে সকল কর্ম্মে অসাধারণ নিপুণতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং আমি মনে করি নীতি ও ন্যায়ের খাতিরেও, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত স্বার্থের খাতিরেও দেশের শাসন-কার্য্যে দেশবাসীর দাবী গ্রাহ্য হওয়া উচিত।"

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে স্যার হেন্‌রি রলিন্সন কে সি-বি, এম্-পি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রবার্ট নাইট "ভারতবর্ষ: তাহার সহিত ইংলণ্ডের আর্থনীতিক সম্বন্ধ" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ, সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই মূল্যবান প্রবন্ধটি বিশদভাবে আলোচনা করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধ-লেখককে উহা নজীরসহ মুদ্রিত ও বিতরিত করিতে অনুরোধ করা হয় এবং পরবর্ত্তী ১লা এপ্রিল তারিখে জেনারেল ব্রিগ্‌স্-এর সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। রবার্ট নাইট ভারতবর্ষ-শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে যে যুক্তিসঙ্গত ও নির্ভীক প্রতিবাদ করেন—ভারত হিতকামী মাত্রেই তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আলোচনায় মিষ্টার পীল, উমেশচন্দ্র বোনার্জ্জী, কর্ণেল সাইক্‌স্, নীল পোর্টার, মিষ্টার ম্যাকলীন, মিষ্টার ফসেট, রেভারেণ্ড হর মাঞ্জদজী পেষ্টনজী, কর্ণেল হ্যালি ও দাদাভাই নৌরোজী যোগদান করেন। তখন অধ্যাপক ফসেটই পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের হইয়া দুই চারি কথা বলিতেন। তিনি পূর্ব্বেই কয়েকটা যুদ্ধ-ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কি কি ব্যয় ইংলণ্ডের বহন করা উচিত এবং কি কি ব্যয় ভারতবর্ষ বহন করিবে তাহার বিচারের জন্য একটি রয়্যাল কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের খসড়া মিষ্টার ফসেট ও উমেশচন্দ্র সংশোধন করিলে উহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভায় গৃহীত হয়। উমেশচন্দ্র বলেন যে মিষ্টার নাইট যথার্থই বলিয়াছেন সিপাহী বিদ্রোহের ব্যয় ভারতবর্ষকে বহন করিতে বলা উচিত হয় নাই এবং তজ্জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আচরণ তিরস্করণীয়। কারণ বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের শাসন ধ্বংস করা। আয়ার্ল্যাণ্ডে এরূপ নীতি অনুসৃত হয় নাই। সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে রাজকীয় কমিশনের দাবী করিয়া সেক্রেটারী-অব-ষ্টেটের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভার পক্ষ হইতে তদানীন্তন সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট স্যর ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোটের সহিত ২২শে এপ্রিল সাক্ষাৎ করিয়া এই পত্র পেশ করেন :—

কর্ণেল সাইক্‌স্ এম্-পি, মিঃ টি ব্যাজলি এম-পি, মিঃ জন পীল এম-পি, মিঃ জেকব ব্রাইট এম্-পি, মিঃ এ-ফসেট্ এম-পি, মিঃ এ-গ্রেহাম এম-পি, জেনারেল সি-এফ্-নর্থ আর-ই, মিঃ আর-এন-ফাউলার, মিঃ এস-পি-লো, মিঃ ই-বি-ইষ্টউইক সি বি, কাপ্তেন বার্বার, মিঃ দাদাভাই নৌরোজী, মিঃ নীল পোর্টার, মিঃ পি পি গর্ডন, মিঃ রবার্ট নাইট, মিঃ এ রডিক, এবং মিঃ ডব্লিউ-সি-বোনার্জী। সেক্রেটারী অব-ষ্টেট মন্ত্রীসভায় এ বিষয় উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন।

পরীক্ষায় সাফল্যলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাগমন

অবাধ্য হইয়া কালাপানি পার হইয়াছিলেন বলিয়া, উমেশচন্দ্রকে কখনও তাঁহার পিতা ক্ষমা করেন নাই, অর্থ সাহায্য দূরে থাক পত্র লিখিলে উত্তর পর্য্যন্ত দিতেন না। ছাত্রবৃত্তি নিয়মিত সময়ে হস্তগত না হওয়ায় উমেশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে হইত। তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু (সম্পর্কে মাতুলপুত্র) দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যকে তিনি এই বিষয়ে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ডে কি কষ্টে তিনি কালযাপন করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গাচরণের দৌহিত্র শ্রীযুত মাণিকলাল মুখার্জ্জী সম্প্রতি এই সকল পত্র W C Bonnerjee, Snap shots from his life and his London letters নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন। পত্রগুলি কৌতুহলোদ্দীপক। উহা হইতে প্রতীত হয় যে তিনি ভূতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং জিওলজিক্যাল সোসাইটীর সদস্য (F. G. S.) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইলেও উমেশচন্দ্র চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তবে জননী ও অন্তরঙ্গ দুর্গাচরণের জন্য তাঁহার সর্ব্বদা প্রাণ কাঁদিত।

(১১ই জুন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিড্‌ল্ টেম্প্‌ল্ নামক ব্যারিষ্টার সম্প্রদায় ভুক্ত হন। বদরুদ্দীন



রমেশচন্দ্র দত্ত

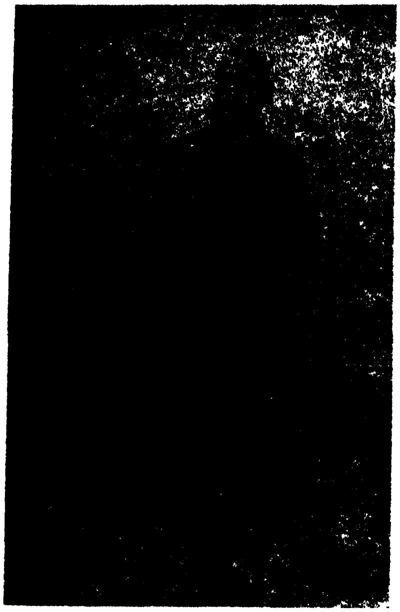
তায়েবজী এবং ফিরোজশাহ মেটাও এই সময়ে ব্যারিষ্টার হন। মনোমোহন ঘোষ কয়েকমাস পূর্ব্বে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।



বিহারীলাল গুপ্ত

মিঃ টি-এইচ-ডার্ট, সি-এডওয়ার্ড-হ্রাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া উমেশচন্দ্র ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী

হইয়াছিলেন। ১৮৬৮খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্চ্চ তিন জন যুবক আই-সি-এস পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডযাত্রা করেন। ইঁহারা তিনজনই পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন এবং পরে সাহিত্য ও দেশসেবার দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলে উমেশচন্দ্র সাউথাম্পটনে গিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লণ্ডনে নিজ বাসস্থানে অতিথিরূপে লইয়া আসেন এবং পরে লণ্ডনের য়ুনিভার্সিটী কলেজের নিকটে বার্ণার্ড ষ্ট্রীটে তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দেন ও পড়া শুনার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে এবং রমেশচন্দ্রও তাঁহার স্মৃতি-কথায় উমেশচন্দ্রের সস্নেহ ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যাগমন করিবার অত্যল্পকাল পূর্ব্বে উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। উমেশচন্দ্রের সমুদ্র যাত্রার জন্য তাঁহার নিষ্ঠাবান পিতা অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং উমেশচন্দ্রকে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনারও অবসর দিলেন না। পুত্রের সমুদ্র যাত্রার জন্য তাঁহার জননী ও পরিবারবর্গকে সমাজচ্যুত বা 'একঘরে' করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু শোভাবাজারের মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মধ্যবর্ত্তিতায় সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার উদারহৃদয়া স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় পৈত্রিকগৃহে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু উমেশচন্দ্র তাঁহাকে বলেন "মা, যদি সমুদ্র যাত্রা এতাদৃশ পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় যে তাহাতে ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই এই গৃহের পবিত্রতা কলুষিত হইবে না আমি এরূপ মনে করি না।" উমেশচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রায় প্রত্যহ তাঁহার মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করিতে যাইতেন এবং পরিবারস্থ অন্যান্য



মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পরিবার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া সংসার যাত্রার সমস্ত ব্যয়ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মহারাজ সুরথ দেবীর যে পূজা করিয়াছিলেন সেই পূজা আমাদের দেশে বাসন্তী পূজা নামে প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসে শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। বৈশ্য সমাধিও দেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনার বস্তু ছিল—পরাজ্ঞান ও মুক্তি। আমাদের দেশে দেবীর পূজা সুখসম্পদ লাভের জন্য, বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য। সুরথ তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য, জয়লাভের জন্য, সৌভাগ্যলাভের জন্য পূজা করিয়াছিলেন। সেজন্য সুরথের পূজাই চলিয়াছে এবং সুরথই দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তক। সুরথের পর কত রাজা রাজন্য শত্রু-জয়ের কামনায় ভারতবর্ষে এই পূজা করিয়া আসিয়াছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আগে রাজগণ ও বীরগণ দেবীর পূজা করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিত। সাধারণ গৃহস্থের পূজা ইহা ছিল না। বড় ঘটা করিয়া বহু ব্যয় করিয়া এই পূজা করা হইত। কাজেই সাধারণ গৃহস্থের এ পূজা ছিল না।

সুরথ রাজা মর্ত্ত্যে এই পূজার প্রচার করেন, কিন্তু স্বর্গে আগে হইতেই এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা মধুকৈটভের ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথমে এই পূজা করেন। মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধের আগে এই পূজা করেন। দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া ইন্দ্র এই পূজা করেন। দেবীর কৃপায় ইন্দ্র আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া পান।

পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ইত্যাদিতে আছে—রামচন্দ্র রাবণবধের শক্তিলাভের জন্য দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। তিনি শরৎকালে দেবীর বোধন করেন। শরৎকাল দেবীর পূজার পক্ষে ঠিক কাল নয়, অকাল। রামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করিয়া ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়া পূজা করিয়া বর লাভ করেন। তাহার পর হইতে দেবীর পূজা শরৎকালের শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে চলিয়া আসিতেছে। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা নাই।

বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বাসন্তী মহাদেবীর পূজা হয় বটে, কিন্তু শরৎকালেই রামচন্দ্রের মত বাঙ্গালীরা দেবীর পূজা করে। ইহাই দুর্গোৎসব।

বাঙ্গালীর পক্ষে শরৎকালে দেবীর পূজা করাই স্বাভাবিক। বর্ষাকালে বাঙ্গালাদেশে দুর্গতির অবধি থাকে না। নদীতে বন্যা আসে, যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়, পথঘাট কাদায় ভরিয়া যায়, ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়।

বর্ষা শেষ হইয়া আসিলে শরৎকালে আকাশ নির্ম্মল হয়। পথ ঘাট শুকায়। নদীগুলি শান্তভাব ধারণ করে। জল নির্ম্মল হয়। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের প্রধান সম্বল যে ধান—সেই ধানে ধানে তাহার মাঠ ভরিয়া উঠে। বাঙ্গালায় এইত পূজার সময়, উৎসবের সময়, আনন্দের সময়। মার কাছে সারা বৎসরের অন্নের জন্য, সুখশান্তির জন্য প্রার্থনা করিবার সময় এই শরৎকাল। বড় বড় কাজ আরম্ভ করিবার সময়ও ইহাই—তাহার আগে মায়ের পূজার প্রয়োজন। মায়ের দয়া ছাড়া ত কোন কাজ সিদ্ধ হইতে পারে না।

শুনা যায়, উত্তর বঙ্গের রাজা কংসনারায়ণ খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রতে চাহিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বিধান দিলেন, কলিযুগে অশ্বমেধ করা নিষিদ্ধ—তাহার বদলে দুর্গোৎসব করিলেই চলিবে। কলিযুগে দুর্গোৎসবই অশ্বমেধ।

তারপর হইতে বাংলার জমিদারেরা প্রায় সকলেই শরৎকালে মাটির প্রতিমা গড়িয়া দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। এইভাবে মাটির প্রতিমা গড়িয়া দুর্গোৎসব বাংলাদেশেই চলে—অন্যান্য দেশে ঘটে-পটে পূজা হয়। বাংলার দেখাদেখি এখন উড়িষ্যাতেও এইভাবে দুর্গোৎসব হয়।

জমিদারদের দেখাদেখি এখন সাধারণ গৃহস্থেরা দুর্গাপূজা করিয়া থাকে। জমিদারদের মত সবাই ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিতে পারে না। তাহারা সাধ্যমত আয়োজন করে। ভক্তির দ্বারা আয়োজনের ত্রুটী সারিয়া লয়।

কথিত আছে—সুরথ রাজা রাজত্ব ফিরিয়া পাওয়ার পর লক্ষ বলি দিয়া পূজা করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের রাজারা লক্ষ না হউক, বহু মেষ মহিষ ছাগ বলিদান দিয়া মায়ের পূজা করিত। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে এইরূপ বলি দিয়া পূজা করার প্রথা ভারতবর্ষের অনেক অংশে উঠিয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশের জমিদারেরা বৌদ্ধযুগ শেষ হওয়ার পর অনেক পশু বলি দিয়া পূজা করিত।

সাধারণ গৃহস্থেরা সাধ্যমত ছাগমেষ বলিদান করিয়া পূজা করিত। এখন বলির প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। মহিষাসুর মহিষের রূপ ধরিয়া দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া মহিষ বলি দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে।

আজকালকার পণ্ডিতেরা চণ্ডীর নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—পশুর অর্থ মানুষের মনের পাশবিক বৃত্তি অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি। দেবী সেইগুলিরই বলি চান। সেইগুলির বদলে পশুবলি দেওয়া হইত। কাজেই মায়ের সম্মুখে সেই কুপ্রবৃত্তিগুলির বলিদান দিলেই মা তুষ্ট হইবেন। দেবী চামুণ্ডারূপে অসুরের রক্তপান করিয়াছিলেন, তাই রক্ত দিয়া মার পূজার প্রথা হইয়াছে। সুরথ রাজার যখন রাজ্য ছিল না, তখন তিনি বুকের রক্ত দিয়া পূজা করিয়াছিলেন—তাহাতেই দেবী প্রসন্ন হইয়াছিলেন। রাজ্য পাইয়া তিনি বুকের রক্তের বদলে লক্ষ পশুর রক্ত দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। দেবীর প্রকৃত পূজা অন্য জীবের রক্ত দিয়া নয়। নিজের বুকের রক্তই তাঁহাকে দিতে হইবে। জ্ঞানিগণ বলেন, এই বুকের রক্তের অর্থই হইতেছে ভক্তি। ভক্তি দিতে পারিলে আর কোন জীবের রক্তের প্রয়োজন হয় না। যাহারা এই বুকের রক্ত দিতে পারে না, তাহারাই নিরীহ ছাগ মেষ মহিষের রক্ত দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাঙ্গালী শরৎকালের রামচন্দ্র প্রবর্ত্তিত দেবীপূজাই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সুরথ রাজের প্রবর্ত্তিত বাসন্তী পূজাও একেবারে ছাড়ে নাই। বাঙ্গালার প্রকৃতি কেবল চণ্ডী বা ভীষণাই নয়—বাংলা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি। এই ভূমি বাঙ্গালীকে অন্ন দিয়া চিরকাল প্রতিপালন করিতেছে, শুধু বাঙ্গালী নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশও বাংলার অন্নে প্রতিপালিত। তাই বাংলা শুধু চণ্ডী নয়—বাংলা অন্নপূর্ণা। তাই বাঙ্গালী দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সভার কবি ভারতচন্দ্র এই অন্নপূর্ণা দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অন্নদা-মঙ্গল নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। দেবীর এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির পূজা হয় সুরথ রাজার মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির বদলে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাংলাদেশের বহু গৃহে দুর্গোৎসবের বদলে অন্নপূর্ণা জননীর পূজা হইয়া থাকে।

বাংলাদেশ শুধু শক্তিপূজার দেশ নয়—ভক্তির বন্যাতেও এদেশ ভাসিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির বন্যায় বাংলাদেশ ভাসাইয়াছেন। প্রকৃত বৈষ্ণব ধন-মান সুখ-সম্পদ মোক্ষ পর্য্যন্ত চায় না। শক্তিপূজা তাহা নয়। সুরথ সুখসৌভাগ্য চাহিয়াছিলেন, সমাধি চাহিয়াছিলেন মোক্ষের উপায়। বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, তাহার সহস্র দুঃখ, নিত্যই তাহার সংসারের অভাব, সে নানা রোগে জীর্ণ-শীর্ণ, সে বড়ই অসহায়—সে বড়ই বিপন্ন। সে চায় শক্তি, সে চায় ধন-ধান্য। সে চায় বিপদ হইতে পরিত্রাণ। সে জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যার মধ্যেও সে শক্তিপূজা ত্যাগ করে নাই। সে তাই চণ্ডীদেবীকে সুরথের মত প্রাণপণে ডাকিয়াছে। যিনি ইহলোকের সুখসৌভাগ্য দান করেন—তিনিই ত পরলোকে মুক্তি দেন।

চণ্ডীতে আছে—

ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেবচ
শত্রুহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তূয়তে সা না কিং জনৈঃ।

যাঁহার প্রসাদে সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুহানি এবং শেষ পর্য্যন্ত মোক্ষও পাওয়া যায় তাঁহাকে কে না স্তব করিবে? মোক্ষও

তাঁহার অনুগ্রহেই মিলে। সমাধিকে তিনি মোক্ষই দিয়াছিলেন। অতএব ইহলোক পরলোক দুই লোকেরই গতি যিনি—বাঙ্গালী তাঁহার পূজা ছাড়িবে কেন?

বাঙ্গালী তাই প্রার্থনা করিয়াছে—

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি।

দেবী, সৌভাগ্য, আরোগ্য, পরমসুখ, রূপ, জয় ও যশ দান কর এবং আমার শত্রুদের বধ কর। দেবতারা অসুর-বিজয় চাহিয়াছেন। তাঁহারা চাহিয়াছেন—"দেবি, আমাদের শত্রুগণ মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ ইত্যাদি দৈত্যদের বিনাশ কর"। বাঙ্গালী সৌভাগ্য, আরোগ্য, রূপ, যশ যে চাহিতেছে—তাহার অর্থ বুঝি। কিন্তু দেবতাদের মত বা ঋষিদের মত তাহারা বিজয় চায় কেন? শত্রুগণকে বধ কর বলিয়া স্তব করে কেন? তাহাদের শত্রু কাহারা? কাহাদের সে জয় করিতে চায়? বাঙ্গালীর শত্রু অনেক। তাহার শত্রু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবাত্যা, বন্যা, কালবৈশাখী, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সহস্রবিধ রোগের জীবাণু ও বাহন, বাঘ, সাপ, কুমীর, আরও কত কি! বাংলার শস্যের শত্রুরাও তাহারই শত্রু। মহামারীর বিষ হইতে রক্তবীজের এক এক বিন্দু রক্ত। ইহারা শুম্ভ-নিশুম্ভ মহিষাসুরের চেয়ে কেহই কম নয়। এই সকল শত্রুদের জয় করিবার শক্তি সে দেবীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছে। বাঙ্গালী বলিয়াছে—"মা তুমি এই সকল শত্রুদের বধ করিয়া আমাদের বিজয়ী কর"। আর যদি আধ্যাত্মিক অর্থই ধর তবে বলিতে হয়—"মা, আমার মনের লোভ, লালসা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, অহঙ্কার ইত্যাদি শত্রুদের বধ করিয়া আমাকে জয় দাও।" মহিষ একটি বলবান্ পশু। আমাদের পক্ষে যাহা পাশবিক বৃদ্ধি—চণ্ডীতে তাহাই ত মহিষাসুর।

কিন্তু তবু বলি, বাঙ্গালী আজ শক্তিপূজার শক্তি ও অধিকার হারাইয়াছে। আবার সেই শক্তি, সেই অধিকার তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। কেন তাহা বলি।

আমরা মানুষ হিসাবে যে শক্তি লাভ করিয়াছি সেই শক্তির সাধনা যদি না করি তবে আমরা শক্তিপূজার অধিকার পাইব না।

দেবী দয়া করেন সত্য, কিন্তু যে নিজের শক্তির প্রয়োগ করে না—দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত মা মা করিয়া চীৎকার করে সে তাঁহার কৃপা পায় না। সুরথ ও সমাধি নিজের শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র নিজের শক্তিকে আরও প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য মায়ের কৃপা চাহিয়াছিলেন। তাই রাবণ বধ করিতে পারিয়াছিলেন, বিজয়ী হইয়াছিলেন। যাহার যতটুকু শক্তি আছে—সে যদি তাহা সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়া দেবীর কৃপা প্রার্থনা করে—তবেই দেবী তাহার শক্তিকে বাড়াইয়া দেন—তাহাকে কৃপা করেন—আমরা নিজের শক্তির প্রয়োগ একেবারে ভুলিয়া গিয়া শক্তির আরাধনা করি, সেজন্য তাঁহার কৃপা পাই না। বাঙ্গালীকে আবার শক্তিপূজার অধিকার ফিরাইয়া পাইতে হইবে—সেজন্য সুরথ-সমাধির মত সাধনা করিতে হইবে—নিজের শক্তিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে শক্তিপূজা অশক্তের পূজা নয়—তাহার জন্য হরিসংকীর্ত্তন আছে। বাঙ্গালী এতদিন নিজের শক্তির কথা ভুলিয়া নিজের পৌরুষের কথা ভুলিয়া, শক্তিপূজা করিয়াছে তাই কোন ফল হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালী জাতিকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং কেমন করিয়া আত্মশক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া শক্তির আরাধনা করিতে হয়, তাহা শিখাইয়াছেন।

আমরা চণ্ডীর যে শক্তির পূজা করি প্রকৃতপক্ষে তাহা আত্মশক্তি। চণ্ডীতে আছে—দেবতাদেরই শক্তি চণ্ডীরূপ ধরিয়া অসুর বধ করিয়াছে। চণ্ডী একটা স্বতন্ত্র শক্তি নয়। দেবতাদের মনে যখন নির্য্যাতনের ফলে সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিল—তখনই অসুর বধ সম্ভব হইল।

একজনের শক্তি সামান্য, তাহাতে বৃহৎ কোন কাজ করা যায় না। বহুর শক্তি একত্র মিলিত হইলেই মহাশক্তির জন্ম হয়। তাহার দ্বারাই অসাধ্যসাধন করা যায়। চণ্ডীর ইহাও একটি শিক্ষা। দেবতাদের প্রত্যেকের শক্তি প্রচুর নয়—সকলের শক্তি একত্র মিলিত হইয়া চণ্ডীদেবীর রূপ ধরিল। তবেই অসুর বধ সম্ভব হইল।

চণ্ডী হইতে বাঙ্গালীকে এই শিক্ষাগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মশক্তিই প্রকৃত শক্তি—আত্মশক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে না করিলে দৈবীশক্তি লাভ করা যায় না এবং বহুর শক্তি একত্র মিলিত না হইলে মহাশক্তির উদ্ভব হয় না। পরস্পরের মধ্যে দেখাদেখিই দুর্ব্বলতা, সকলের একত্র মিলনই শক্তি। এই শক্তিলাভ করারই অর্থ চণ্ডীর কৃপালাভ।

দেবীর উপাসনায় যেমন দেবতাদের মিলন হইয়াছিল—সুরথ-সমাধির মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল—চণ্ডীর আরাধনায় তেমনি বহুর একত্র এক উদ্দেশ্যে মিলন হয়। সেজন্য উপাসনার প্রয়োজন। একত্র মিলনে যে শক্তির সঞ্চার হয় তাহার সুফলই চণ্ডীর কৃপা।

ভারতে কয়লার ভাণ্ডার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতে মোট কত পরিমাণ কয়লা আছে, তাহা লইয়া বহু মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও [1]মতে সকল প্রকার কয়লার ভাণ্ডার আনুমানিক ৬,০০০ কোটি টন, আবার কাহারও মতে[2] ৭,৯৯০ কোটি টন। এই অঙ্কের প্রত্যেকটাই আনুমানিক এবং ইহার পর আবার নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইলে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে; পক্ষান্তরে যাহা উদ্ধার করা সম্ভব হইবে বলা যাইতেছে, তাহা পরে কার্য্যের উপযোগী না-হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Fox-এর মতে ভারতের ভাণ্ডার মোট ৬,০০০ কোটি টন; তাঁহার মতে প্রাপ্তি স্থান নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা চলে:—

(১) *Memoirs, Geological Survey of India, Vol. LVI* (1930)—C. S. Fox.
(২) *"The Coal Reserves of the World, 1913,"*

		কোটি টন
(১)	দার্জিলিঙ এবং পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ	১৫
(২)	গিরিডি, দেওঘর ও রাজমহল পাহাড়	৩৫
(৩)	রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো এবং করণপুরা ক্ষেত্র	২,৫০০
(৪)	শোণ উপত্যকা—আওরাঙ্গা হইতে উমারিয়া ও সোহাগপুর	১,০০০
(৫)	ছত্রিশগড় এবং মহানদী (তালচের)	৫০০
(৬)	সাতপুরা অঞ্চল—মোপানী হইতে কনহান্ এবং পেঞ্চ উপত্যকা	১৫০
(৭)	ওয়ার্দ্ধা গোদাবরী—ওয়ারোরা হইতে বেদাদানুরু	১,০০০
	মোট	৬,০০০

ইহার মধ্যে চার ফুট পুরু কয়লার স্তর (seam) ও শতকরা কুড়ি-ভাগ ছাই এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে এক হাজার ফুটের অনধিক গভীর স্থানের কয়লা হিসাব করিলে ইহা মাত্র ২,০০০ কোটী টনে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার সংস্থান এইরূপ।

		কোটি টন
(১)	দার্জ্জিলিঙ পর্ব্বতের পাদদেশ, লিস্-রামথী অঞ্চল	২
(২)	গিরিডি, জয়ন্তী ও রাজমহল পাহাড়	১১
(৩)	রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো ও করণপুরা ক্ষেত্র	১,০০০
(৪)	শোণ উপত্যকা—আওরাঙ্গা হইতে উমারিয়া এবং সোহাগপুর	২০০
(৫)	ছত্রিশগড় এবং মহানদী (তালচের)	১২০
(৬)	সাতপুরা অঞ্চল মোপানী হইতে কন্হান্ এবং পেঞ্চ উপত্যকা	২৫
(৭)	ওয়ার্দ্ধা-গোদাবরী—ওয়ারোরা হইতে সিঙ্গারেনীর পর কতকাংশ পর্য্যন্ত	৬৪০
	মোট	২,০০০ টন

এই ২,০০০ কোটী টন কয়লার মধ্যে ৫০০ কোটী টন খুব ভাল কয়লা অর্থাৎ তাহা ধাতু প্রস্তর অথবা ধাতু সংক্রান্ত কাজে অত্যুচ্চ তাপ উৎপাদনে লাগিতে পারে। ভূপৃষ্ঠ হইতে এক হাজার ফুট নিম্ন-প্রদেশ পর্য্যন্ত স্তরে ৩৫০ কোটী টন, এবং তন্নিম্নে অর্থাৎ এক হইতে দুই হাজার ফুট নিম্নপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্থানে এইরূপ কয়লা আরও ১৫০ কোটী টন পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া এই জাতীয় কয়লার প্রধান ক্ষেত্র এবং এই ৫০০ কোটী টনের মধ্যে এই দুই স্থান হইতে ৩৫০ কোটী টন কয়লা আশা করা যায়। কেহ কেহ মনে করেন ৫০০ কোটী টন হয়ত হিসাবে কিছু বেশী ধরা হইয়াছে; মোট পরিমাণ ৪৫০ কোটী টন পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ভারতের নানা স্থানে কয়লার অবস্থান সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে যাঁহারা সন্ধানরত তাঁহাদের লিখিত পুস্তকাদি[৪] হইতে একস্থানে সমস্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য বে-সরকারী পুস্তক পত্রিকাদি হইতে নানা পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে কয়লার ভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভবতঃ অন্যান্য খনিজ অপেক্ষা অধিক, কারণ ভারতীয় খনিজের মধ্যে কয়লার উৎখাতন ও ব্যবহার অপর খনিজ অপেক্ষা বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই কয়লার ক্ষুদ্রবৃহৎ ভাণ্ডার রহিয়াছে; ইতস্ততঃ ভাবে বা ভাণ্ডারের পরিমাণ হিসাবে পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা প্রদেশের বাঙ্গালা বর্ণানুক্রমিক ধারায় ভাণ্ডারগুলির নাম উল্লেখ করা হইল।

আফ্গানিস্থান

আফ্গান-টার্কিস্থান (চাহিল এবং সীমা আলঙ উপত্যকা)।

আসাম

(১) আরব ও মিরি পর্ব্বতমালা;

(২) ডাফ্লা ও আকা পর্ব্বত;

(৩) নাগা, পাতকাই ও সিঙপো পর্ব্বত; নামচিক্; মাকুম, জয়পুর[১]; নাজিরা[২]; জাঞ্জি[৩]; দিশাই;

(৪) মিক্রি পর্ব্বত শ্রেণী: লঙলই; দিগ্‌শোমা ও দিয়ঙ নদী; নাম্বর ও দয়ঙ্গ্ নদী অঞ্চল;

(৫) গারো পর্ব্বতমালা[৪]; ঢরিগাঁ, সিজু; দারুয়াঙগিরি; রঙ্গ্রেঙগিরি; কালু নদী অঞ্চল;

(৬) খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্ব্বতশ্রেণী; মাওবেলিরকর; চেরাপুঞ্জি ও মাওলঙ; লাইরুঙগাঁ; মাওসান্‌রাম্, উমব্রায় নদী অঞ্চল; উমরিলঙ, ওয়াপুঙ;

(৭) শ্রীহট্ট ও কাচার।

উড়িষ্যা

তালচির (ব্রাহ্মণী নদীর উপত্যকা), (রামপুর, রায়গড়-হিঙ্গির)

কাশ্মীর ও জম্মু

লাড্ডা-সাঙ্গার-মার্গ; সিরো উপত্যকা; কোত্রা; মোহোউগোলা কালাকোট ও ডাণ্ডলি; আন্স নদী ও জেলাম নদী (অঞ্চল)।

বাঙ্গালা

বর্দ্ধমান জেলা (রাণীগঞ্জ খনির অংশ)[১]; দার্জ্জিলিঙ, বক্সা দুয়ার, চট্টগ্রাম।

বালুচিস্থান

খালচোটিয়া; খোস্ত; সারিগ; সোর রেঞ্জ ও মাক্।

বিহার

রাজমহল পাহাড়; জয়ন্তী, সাজুরি ও কুণ্ডিট্ কুরিয়া[২]; গিরিডি[৩]; রাণীগঞ্জ অংশ, ঝরিয়া[৪]; বোকারো-ঝরিয়া[৫]; বোকারো-রামগড়[৬]; উত্তর[৭] ও দক্ষিণ[৮] করণপুরা; চোপে, ইথিকুরি, আওরাঙ্গা[৯]; হুটার[১০]; ডালটনগঞ্জ[১১]।

---

(১) জয়পুর—আয়তন ২৫ বর্গ মাইল।
(২) নাজিরা—১৬ বর্গমাইল।
(৩) জাঞ্জি—৩ বর্গমাইল।
(৪) গারো পর্ব্বতমালা—মোট আয়তন ২০ বর্গমাইল।

(১) বাঙ্গলা ও বিহারে অবস্থিত রাণীগঞ্জ খনি ৬০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত।
(২) জয়ন্তী, সাজুরি ও কুণ্ডিট কুরিয়া, সম্মিলিত অঞ্চল ১৭৫ বর্গমাইল।
(৩) গিরিডি ক্ষেত্র আয়তনে ১১½ বর্গমাইল।
(৪) ঝরিয়া খনি: ১৭৫ বর্গমাইল।
(৫) বোকারো-ঝরিয়া ক্ষেত্র: ২২০ বর্গমাইল।
(৬) বোকারো-রামগড়: ৪০ বর্গমাইল।
(৭) উত্তর করণপুরা খনি: ৪৭২ বর্গমাইল।
(৮) দক্ষিণ করণপুরা খনি: ৭২ বর্গমাইল।
(৯) আওরাঙ্গা খনি: ৯৭ বর্গমাইল।
(১০) হুটার খনি: ৫৭ বর্গমাইল।
(১১) ডালটনগঞ্জ খনি: ৩০ বর্গমাইল।

---

(৩) Sir L. L. Fermor, Kt., O. B. E., D. Sc., F.R. S.,—*Bulletin of Indian Industries and Labour*, No. 54, "*India's Coal Resources*, 1935.

(৪) *Memoirs of the Geo. Sur. of India* : Vol. XLI (1913) *The Coalfields of India* by V. Ball, C. B., LL. D., F. R. S., entirely rewritten by R. R. Simpson, M. Sc, Inspector of Mines.

বোম্বাই

কাথিয়াবাড় : থান। সিন্ধু : লাইনিয়ান। কচ্ছ : এখো, শীসাগড়, ভমিরি।

পঞ্চনদ

দসবান্দগোলা[১], ডাণ্ডোট, ইসা-খেল (মিয়াল-ওয়ালী)[২], চৈ, আটক; ডোর উপত্যকা, হাজারা; কালকা।

মধ্যপ্রদেশ

উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের খনি রামকোলা-তোতাপাণি[১], ঝিলমিলি[২], বিশ্রামপুর[৩]; বানসার, লখনপুর[৪], পাঁচভৈনী, সিন্দুরগড় বা সেতুরগড়; দামামুণ্ডা; রামপুর (গোরগুজা), কুরাসিয়া[৫], কোরিয়াগড়[৬]।

ছত্রিশগড় অঞ্চলে কোর্‌বা[৭]; মণ্ড নদী অঞ্চল[৮], রামপুর; লাখেলা ঘাট; ইত্যাদি।

ওয়ার্দ্ধা উপত্যকায় ওয়ারোরা, ঘুগুস্[১০], ঁঙ্গ্, ধঙ্গী, পাওনি, বল্লারপুর।

---

(১) এক বর্গমাইল বিস্তৃত

(২) মিয়ানওয়ালী অবস্থিত ইসা-খেল খনি আয়তনে ৩½ বর্গমাইল।

(১) রামকোলা তোতাপাণি খনি আয়তনে ১০০ বর্গ মাইল।

(২) ঝিলমিলি খনি : ৮০ বর্গ মাইল।

(৩) বিশ্রামপুর খনি : ৪০০ বর্গ মাইল।

(৪) লখনপুর খনি ১৩৫ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

(৫) কুরাসিয়া খনি আয়তনে ৪৮ বর্গ মাইল।

(৬) কোরিয়াগড় খনি : ৬ বর্গ মাইল।

(৭) কোর্‌বা খনি : ২০০ বর্গ মাইল।

(৮) এই অঞ্চলের খনি ৩০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

(৯) রামপুর খনি : ৪০০ বর্গ মাইল।

(১০) ঘুগুস্ খনি : ১০০ বর্গ মাইল।

বল্লার[১১]।

সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণীতে মোপানী; সাপুর[১২] (বেতুল); ছিন্দবারা (পেঞ্চ উপত্যকা খনি[১৩])।

মধ্যভারত

উমারিয়া (আয়তন ৬ বর্গ মাইল); কোরার (আয়তন ৯½ বর্গ মাইল); জোহিলা (আয়তন ১৫ বর্গ মাইল), সোহাগপুর (আয়তন ১,২০০ বর্গ মাইল), সিঙ্গ্রাউলি (আয়তন ৯০০ বর্গ মাইল)।

মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত

মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, পণ্ডিচেরী, প্রেসেস্ গার্ডেন, চিঙলপুট, বেলারী, নেলোর; কড়প (কদ্দাপা) কৃষ্ণা জেলা।

গোদাবরী উপত্যকা : বেড্ডাডানোল।

রাজপুতানা

বিকানীর, পালানা।

হায়দরাবাদ

কুম্মিগিরি, মাধাভারম্[১] বা সেমার চেলা, লিঙ্গলা, সিঙ্গারেণী[২], আসাপল্লী, কামারাম্[৩], চিন্নুর, ওগুর[৪], আক্‌সাপুর, অস্তরগী, মহ্[৫]। কোটগুদাম[৬]।

(১১) বল্লার খনি : ৬০০ বর্গ মাইল।

(১২) সাপুর খনি : ২৬ বর্গ মাইল।

(১৩) পেঞ্চ উপত্যকার খনি সমষ্টি আয়তনে ৭২ বর্গ মাইল।

(১) মাধাভারম্ খনি আয়তনে ২৪ বর্গ মাইল।

(২) সিঙ্গারেণী খনি : ১০ বর্গ মাইল।

(৩) কামারাম্ মাত্র ১২৬ একর বিস্তৃত।

(৪) ওগুর খনি আয়তনে ৭ বর্গ মাইল।

(৫) মহ্ খনি : ১½ বর্গ মাইল।

(৬) কোটগুদাম খনিতে ১৯১৩ সালে "Mr R R. Simpson" কর্ত্তৃক "Memoirs" লিখিত হইবার পর কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

বাহির-বিশ্ব

অতুল দত্ত

গত তিন সপ্তাহে ফ্রান্সের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উত্তর ফ্রান্সে নাৎসী বাহিনীর পরাজয়, দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের নূতন সৈন্যের অবতরণ এবং সমগ্র ফ্রান্সে স্বদেশভক্ত ফরাসীদের অভ্যুত্থান এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। ফরাসী জাতির ৪ বৎসরের বন্ধনশৃঙ্খল চূর্ণ হইতে যে আর বিলম্ব নাই, তাহা সুস্পষ্ট।

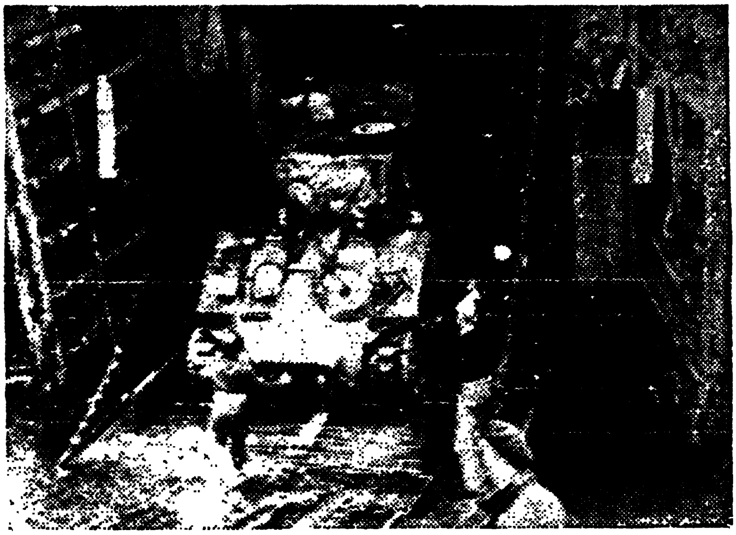
ফ্রান্সে মুক্তি-সংগ্রাম

উত্তর ফ্রান্সে নরম্যাণ্ডী ও বৃটেনী উপদ্বীপে মিত্রপক্ষ প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; উত্তর-পশ্চিম উপকূলে লোরিয়েঁ ও সাঁৎ নাজেরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সামান্য যায়গা ও এই দুইটি বন্দর এখনও মিত্রপক্ষের হাতে আসে নাই। এদিকে, নাঁন্তে, আঁগার্স, লা মাঁ, অর্লিয়েঁ প্রভৃতির পতন ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলে ফালাজে জার্ম্মানীর ৭ম আর্মি মিত্রপক্ষের সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিল; ইহাদের অধিকাংশ পলাইতে সমর্থ হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ অবস্থায় সেন নদী অতিক্রম করিয়াছে। এই সময় প্যারিসের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মিত্রপক্ষের সেনা সেন্ পার হইয়াছে, একটি বাহিনী প্যারিস্ অতিক্রম করিয়া ৫০ মাইল আগাইয়া গিয়াছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে একদল মার্কিণ সেনা সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সময় প্যারিসের অভ্যন্তরে স্বদেশভক্ত ফরাসীদের অভ্যুত্থান ঘটে। তাহারা প্রায় সমগ্র রাজধানী অধিকার করিয়া লইয়াছিল, মিত্রপক্ষের সৈন্য তখন প্যারিসে প্রবেশ করিতে থাকে। এখন পর্য্যন্ত প্যারিসের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে সেখানকার প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিয়া ওঠা শক্ত।

সম্প্রতি বিস্কে উপসাগরের তীরে বোর্দোর নিকটে মিত্রপক্ষের সৈন্যের অবতরণের এক অসমর্থিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। পরে জানা গিয়াছে যে, স্বদেশভক্ত ফরাসীদের সহযোগিতায় মিত্রপক্ষ বোর্দো অধিকার করিয়াছেন; অথচ বিস্কে উপসাগরের তীরে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণের সংবাদ এখনও সমর্থিত হয়

নাই। শুনা যায়, মঁাতে অধিকারের পর একদল মার্কিণ সৈন্যের কোন খবর পাওয়া যাইতেছিল না। কেহ কেহ মনে করেন, উহারাই বোর্দোয় পৌঁছিয়াছে।

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সৈন্যের অবতরণই গত তিন সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গত ১৫ই আগষ্ট মার্সাই ও নিসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ১শত মাইল উপকূলে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। এই অবতরণে বিমানবাহী সৈন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল; ৩ ঘণ্টায় মধ্যে ১৪ হাজার সৈন্য বিমানযোগে অবতরণ করে। এই অঞ্চলে বহু ফরাসী সৈন্যও অবতরণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ফরাসী সৈন্য তুলুস্ অধিকার করিয়াছে, মার্সাইতে প্রবেশ করিয়াছে, তুলোঁর পতন এখন আসন্ন। এদিকে মিত্রপক্ষের সেনা রোঁ নদীর তীর ধরিয়া আগাইয়া যাইতেছে। মার্কিণ সেনা গ্রেনোব্‌ল্ অধিকার করিয়াছে; তাহারা নাকি সুইস্ সীমান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে।



ফ্রান্সে আমেরিকান ট্যাঙ্ক নামান হইতেছে

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণের দুই দিন পূর্ব্বে আভ্যন্তরীণ ফরাসী বাহিনীকে অভ্যুত্থানের জন্য আবেদন জানান হয়। অস্থায়ী ফরাসী গভর্ণমেণ্ট স্বদেশভক্ত ফরাসীদের জানান—The hour of liberation has struck, সুতরাং তাহারা যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে জার্ম্মানদিগকে আক্রমণ করে। সেই আবেদন প্রচারিত হইবার পর সমগ্র ফ্রান্সে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে; ইতিমধ্যে গণবাহিনীর সাফল্য সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গিয়াছে। মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী যে সব সহরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই সব যায়গায় সহরগুলি অধিকারে গণবাহিনী তাহাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেছে। নিয়মিত সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ব্যতিরেকে গণবাহিনী নাকি ভিসিতে তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, লিয়ঁ অধিকার করিয়াছে; রোঁ উপত্যকায় শত শত গ্রাম তাহারা জার্ম্মানদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, ফ্রাঙ্কো-স্পেন সীমান্তে তাহারা এখন প্রতিষ্ঠিত, প্রায় সমগ্র প্যারিস্ তাহারা নিঃসঙ্গভাবেই অধিকার করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সেতু ধ্বংস করিয়া, রেল লাইন উপড়াইয়া, রসদ লুট করিয়া ফরাসী গণবাহিনী সর্ব্বত্র জার্ম্মানদিগকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।



জার্ম্মান বন্দীগণ আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে

জার্ম্মানী যে অতি সত্বর সমগ্র ফ্রান্স ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফ্রান্সের গণ-বাহিনী আজ মিত্রপক্ষের অভিযাত্রী বাহিনীর সহযোগী। ফরাসী ভূমিতে জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে এখন আঘাত আসিয়াছে দুই দিক হইতে। ভিতর ও বাহিরের এই আঘাতে বিশ্বের কোন শক্তির পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়। গত ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' ফরাসী গণ-বাহিনীকে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানাইতে মিত্রপক্ষের দ্বিধার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলাম এবং ইহাকে ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সাফল্যে বিলম্ব ঘটিবার অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। জার্ম্মানীর উড়ন্ত বোমার উৎপাতে মিত্রপক্ষের এই দ্বিধা কাটিয়া যাইবার আশাও প্রকাশ করিয়াছি। উড়ন্ত বোমার উৎপাতেই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক ফ্রান্সের গণ-বাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটাইয়া ফ্রান্সের যুদ্ধ দ্রুত শেষ করিবার প্রকৃত ব্যবস্থা এখন হইয়াছে। এখন সমগ্র ফ্রান্সের মুক্তি সত্যই আসন্ন।

জার্ম্মানীর দিক হইতে বলা যায়, ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার

আশা ও ইচ্ছা সে ত্যাগ করিয়াছে। তবে, যুদ্ধে যথাসম্ভব বিলম্ব ঘটানোই তখন তাহার নীতি। এইজন্ত মিত্রপক্ষের ক্রান্স অধিকারে যতদূর সম্ভব দেরী করাইতে সে সচেষ্ট হইবে। সময় লাভের জন্ত জার্ম্মানীর এই আগ্রহের কারণ দুইটি; প্রথমতঃ ইহার ফলে অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি খাস জার্ম্মানীকে রক্ষার জন্ত নিয়োজিত হইতে পারিবে। সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া জার্ম্মান ভূমি যদি কিছুকাল রক্ষা করা যায় এবং বৈজ্ঞানিকদের কোন নূতন আবিষ্কারের ফলে মিত্রপক্ষকে যদি বিব্রত করিয়া তোলা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধি (Negotiated Peace) হইতে পারে বলিয়া জার্ম্মান রাজনীতিকরা বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয়তঃ মিত্রপক্ষের শিবিরে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হইবার আশা জার্ম্মান কূটনীতিকরা ছাড়িতে পারিতেছে না। বস্তুতঃ এই আশা চলিয়া গেলে তাহারা



স্পেনে আমেরিকান সৈন্ত

আর বাঁচিবে কি লইয়া? কাজেই, জার্ম্মান রাজনীতিকরা সময় পাইলেই মিত্রপক্ষের শিবিরের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কাছে গোপনে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে থাকিবে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গন

পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জার্ম্মান সেনাবাহিনী সম্প্রতি লালফৌজকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিয়াছে। ইহার ফলে কেবল লালফৌজের পূর্ব্ব প্রুসিয়ার প্রবেশে সাময়িক বাধা ঘটে নাই, বাল্টিক অঞ্চলে আটক নাৎসী বাহিনীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বেষ্টনী এক যায়গায় বিদীর্ণও হইয়াছে। অবশ্য ইতিমধ্যে সোভিয়েট বাহিনী ট্যালিন্-রিগা রেলপথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর এক দিক হইতে জার্ম্মানদিগকে বিশেষ অসুবিধায় ফেলিয়াছে; খাস রিগার বিপদও এখন ঘনাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার সীমান্তে জার্ম্মানদের প্রতিরোধের প্রাবল্য দেখিয়া বোঝা যায়, খাস জার্ম্মানভূমি রক্ষার জন্ত তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সব দিক হইতে জার্ম্মানীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভূপাতিত করা যে এখনও সহজ-সাধ্য নয়, ইহা তাহারই ইঙ্গিত।

লালফৌজ ওয়ার্স'য় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে নাই; তাহারা সহরটিকে পার্শ্বে রাখিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়া আগাইয়া যাইতেছে। লালফৌজের ওয়ার্স'য় প্রবেশ করিতে সচেষ্ট না হইবার হয়ত রাজনৈতিক কারণ আছে। ইহারা ওয়ার্স'র নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র এই সহরে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহীরা লণ্ডনের পোলিস্ গবর্ণমেণ্টের অনুগত; সেই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশেই এই বিদ্রোহ ঘটে। পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের এই সোভিয়েট-বিরোধী অনুগতদের রুশ কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিতে পারেন না; ইহাদের সহিত সহযোগিতা করাও সম্ভব নয়। কাজেই, ইহাদের বিদ্রোহের সময় লালফৌজ ওয়ার্স'য় প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইলে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইত। বিশেষতঃ লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এখনও কোনরূপ মিটমাট হয় নাই।

দক্ষিণ অঞ্চলে লালফৌজ কিছুকাল নিষ্ক্রিয় ছিল। সম্প্রতি তাহারা এই অঞ্চলে তৎপর হইয়া জাসী এবং বেসারেবিয়ার রাজধানী কিসনেভ অধিকার করিয়াছে। ইহার পরই এই অঞ্চলে জার্ম্মানীর একটি প্রধান তাঁবেদার দলত্যাগ করিয়াছে। দক্ষিণ রণক্ষেত্রে লালফৌজের দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয়তার কারণ এখন আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যবনিকার অন্তরালে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা চলিতেছিল বলিয়াই এখানে সামরিক তৎপরতা বন্ধ রাখা প্রয়োজন হয়।

রুমানিয়ার দলত্যাগ

রুমানিয়া অক্ষশক্তির দল ছাড়িয়া রুশিয়ার প্রদত্ত যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছে। এই সর্ত্তগুলি এখনও জানা যায় নাই। রুমানিয়ার ফাসিস্ত চাই আণ্টোনেস্কু বন্দী হইয়াছেন। রাজা মাইকেল্ সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন; এই মন্ত্রিসভায় জাতীয় দল, কৃষক দল, উদারনৈতিক, কম্যুনিষ্ট ও সোস্তাল্ ডিমোক্রাট দল যোগ দিয়াছে। গত ২৪শে আগষ্ট মিত্রপক্ষের সহিত রুমানিয়ার যুদ্ধ বিরতির কথা ঘোষণা করিবার সময় রাজা মাইকেল্ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ট্রান্সীলভেনিয়া অধিকারের জন্ত অগ্রসর হইবেন। অর্থাৎ রুমানিয়া কেবল জার্ম্মানীর সহিত সম্বন্ধই ত্যাগ করে নাই; সে এখন হাঙ্গেরীর তথা জার্ম্মানীর সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছে।

রুমানিয়ার অদূর অতীতের ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। রুমানিয়ার তৈল ব্যবসায়ে বৃটিশ বণিকদের সঞ্চিত স্বার্থ রক্ষার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালে চেম্বারলেন মন্ত্রিসভা রুমানিয়াকে আক্রমণকারীর

হাত হইতে বাঁচাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ; দালাদিয়ার মন্ত্রি-সভার পক্ষ হইতেও এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয়। ফরাসী বণিকদের স্বার্থের জন্ম তখন পোল্যাণ্ডকেও বৃটেন ও ফ্রান্স এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেপ্‌টেম্বর মাসে আশ্বাসপ্রাপ্ত পোল্যাণ্ডের দ্রুত পতনে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল্ ভয় পান। তাহার পর ফ্রান্সের পতন হইলে তিনি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির আশ্বাসে আর মোটেই ভরসা পান না ; তিনি তখন হিট্‌লারের পক্ষপুটে আশ্রয় লন। এই সময়—১৯৪০ সালে জুন মাসে রুমানিয়া রুশিয়ার সঙ্গত দাবী মানিয়া লইয়া বেসারেবিয়া প্রদেশ এবং বকুভিনা ও মল্‌দাভিয়ার কতকাংশ ত্যাগ করে। হাঙ্গেরির সহিত ট্রান্‌সীলভেনিয়া লইয়া রুমানিয়ার মনোমালিন্য ছিল। এই বৎসরই আগষ্ট মাসে হিট্‌লার ভিয়েনায় বসিয়া ট্রান্‌সীল্‌ভেনিয়া প্রদেশের কতকাংশ হাঙ্গেরিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইহাই ভিয়েনা সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিচিত। এই সিদ্ধান্তে রুমানিয়ায় বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। রাজা মাইকেল তাঁহার সাম্প্রতিক ঘোষণাবাণীতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর উক্তি করিয়া এবং ট্রান্‌সীলভেনিয়া পুনরুদ্ধারের জন্ম সচেষ্ট হইবেন বলিয়া রুমানিয়ান্ জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ১৯৪০ সালে রাজা ক্যারল তাঁহার পুত্র মাইকেলের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই বৎসর নভেম্বর মাসে রুমানিয়ায় মার্শাল অণ্টোনেস্কুর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে ২২শে জুন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রুশিয়া আক্রমণের ৬ দিন পরে রুমানিয়াও রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে বৃটেন ও আমেরিকা রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। প্রথমে বেসারেবিয়া প্রদেশ পুনরুদ্ধারের জন্ম রুমানিয়ান্ সৈন্স রুন্‌ষ্টেডের অধীনে যুদ্ধ করে ; পরে তাহারা ষ্ট্যালিনগ্রাড্ পর্য্যন্ত আগাইয়া যায়। ষ্ট্যালিনগ্রাডে জেনারল পলাসের অধীনে বহু রুমানিয়ান্ সৈন্স আটক পড়ে। ক্রিমিয়ায় ও ওডেসাতেও বহু রুমানিয়ান্ সৈন্স নষ্ট হইয়াছে। বিপুল-সংখ্যক সৈন্স ধ্বংস হওয়ায় রুমানিয়ায় অত্যন্ত অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর, গত এপ্রিল মাসে লালফৌজ প্রায় সমগ্র বেসারেবিয়া প্রদেশ পুনরধিকার করিয়াছে ; দক্ষিণ রণক্ষেত্রে লালফৌজের পরবর্ত্তী তৎপরতা আরম্ভ হইলে সমগ্র রুমানিয়া বিধ্বস্ত হইত।

রুমানিয়ার দলত্যাগে হিট্‌লারের সর্ব্বপ্রধান তৈলভাণ্ডার ও একটি বিশাল গমের ক্ষেত্র হস্তচ্যুত হইল। বুল্‌গেরিয়া এখন অসহায় হইয়া পড়িল, তাহার দলত্যাগেও হয়ত আর বিলম্ব নাই। এদিকে যুদ্ধ হাঙ্গেরির গৃহদ্বারে পৌঁছিল, মুরুব্বি জার্ম্মানীর এই দুর্দ্দিনে সেখানেও অবিলম্বে রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। মার্শাল টিটোর সহিত লালফৌজের প্রত্যক্ষ সংযোগের সোজা পথ এখন উন্মুক্ত—অদূর ভবিষ্যতে যুগোস্লেভিয়া হইতে প্রত্যক্ষভাবে অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরি আক্রান্ত হইতে পারিবে। চতুর্দ্দিক হইতে খাস জার্ম্মানী আক্রান্ত হইবার ব্যবস্থা এইবার শেষ হইয়া আসিতেছে ; ষ্ট্যালিনের ভাষায় এখন "হিংস্র নাৎসী পশুকে তাহার গহ্বরে" আঘাত করিতে হইবে।

ইটালীর যুদ্ধ

গত ১১ই আগষ্ট মিত্রপক্ষের ক্যানাডীয় সৈন্স ফ্লোরেন্সে প্রবেশ করিয়াছে। তবে এখনও জার্ম্মান সৈন্স ফ্লোরেন্সে কামান চালাইতেছে। ইটালীতে জার্ম্মাণদের প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রবল। এখানে জার্ম্মানদের প্রতিরোধ-ব্যূহশ্রেণী গথিক্ লাইন বলিয়া



আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্ত্তৃক মাইন ধ্বংস করা হইতেছে

পরিচিত ; পিসা হইতে ফ্লোরেন্সের মধ্য দিয়া রেমিনি পর্য্যন্ত এই ব্যূহশ্রেণী প্রসারিত। এই গথিক্ লাইন রক্ষার জন্ম জার্ম্মাণ সেনাপতি কেশারলিং প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অধিকার বিস্তৃতির ফলে এবং রুমানিয়ার আত্মসমর্পণে ইটালীয় রণাঙ্গনে নূতন অবস্থা উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অধিকার বিস্তৃতিতে কেশরলিংএর পশ্চাদ্দেশ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। লালফৌজের সহিত মার্শাল টিটোর সংযোগ স্থাপিত হইলে পূর্ব্ব দিক হইতেও তাঁহার এই বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিবে। কেশারলিং

এখন গথিক্ লাইনে বা পো নদীর তীরে প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিবার নীতি ত্যাগ করিয়া, মিত্রপক্ষের অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাইবার যে সাধারণ নীতি জার্ম্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবেন। এখন কেসেলরিংকে সম্মুখের শত্রু অপেক্ষা পিছনের শত্রুর প্রতিই বেশী সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চার্চ্চিল-টিটো-সুবাসিক্ আলোচনা

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিঃ চার্চ্চিল রোমে যাইয়া যুগোস্লোভিয়ার কমুনিষ্ট নেতা মার্শাল টিটো ও নূতন যুগোস্লোভ প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ষ্টিভ্যান্ সুবাসিকের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। সুবাসিক-মন্ত্রিসভার সহিত টিটোর আপোষ হইয়া গিয়াছে। এই আপোষের সর্ত্তে জাতীয় মুক্তি-পরিষদকে যুগোস্লেভিয়ার অস্থায়ী সরকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; যুগোস্লেভিয়ার সকলকে টিটোর পক্ষে শত্রুর বিরুদ্ধে যোগ দিতে বলা হইয়াছে। যুগোস্লেভিয়ার যোদ্ধাদের মিত্রপক্ষ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন্। যাহারা গোপনে বা প্রকাশ্যে জার্ম্মানদিগকে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে জনগণের বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা হইবে।

রোমে যখন রাজনীতিকদের এই আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় জার্ম্মানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য জেনারল আলেকজাণ্ডার ইটালীর স্বদেশভক্তদিগকে আবেদন জানাইয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের সহিত যুগোস্লেভ নেতাদের আলোচনা এবং জেনারল আলেকজাণ্ডারের এই আবেদন বল্কানে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতার পূর্ব্বাভাস। ইহার পর, রুমানিয়ার সহিত যুদ্ধবিরতিতে বল্কানে তৎপরতা চালাইবার আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হইল।

প্রাচ্য-অঞ্চল

খাস জাপানে মার্কিণ বিমানের বোমা বর্ষণ প্রাচ্য অঞ্চলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতিক ঘটনা। গত ১১ই আগষ্ট একবার এবং ২০শে আগষ্ট ৭ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার "সুপার ফোর্টেস্" বিমান খাস জাপানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। জাপানে এই বোমা বর্ষণের প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—২৩শে আগষ্ট নূতন প্রধান মন্ত্রী কইসো জাপানীদিগকে "এই অভূতপূর্ব্ব জাতীয় সঙ্কটের" সম্মুখীন হইতে আবেদন জানাইয়াছেন; এই দিন সম্রাট মন্ত্রীদের বৈঠকে বলিয়াছেন, "যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থার ফলাফলের উপরই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।" সম্রাট নিজে প্রিফেক্টদিগকে তৎপর হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আধা-ফিউড্যাল্ রাষ্ট্র জাপানে সম্রাটের এই ব্যক্তিগত অনুরোধের মূল্য অসাধারণ এবং অবস্থা যখন সত্যই অসাধারণ মনে হয়, তখনই এইরূপ অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরিয়া গিয়াছেন। খাস জাপানে বোমা বর্ষণের প্রাবল্য বৃদ্ধি এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সফরে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মিত্রপক্ষের তৎপরতা আরও বাড়িবার সূচনা। ইতিমধ্যে মার্কিন সৈন্য গুয়ামে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূল ও ফিলিপাইনের পক্ষে এবং খাস জাপান ও তাহার সাম্রাজ্যের সংযোগ-সূত্রের বিরুদ্ধে গুয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত ও উত্তর ব্রহ্ম এখন বর্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত নীরব। মিত্রপক্ষের ১৪শ বাহিনী ব্রহ্মদেশের মধ্যে ৫ মাইল প্রবেশ করিয়াছে—এই গুরুত্বহীন ঘটনাই এই অঞ্চলের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংবাদ। ২৫ ৮.৪৪

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদনের চেষ্টা

সকলেই জানেন যে ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং এখানকার শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কৃষিজীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সমৃদ্ধি যে বৃদ্ধি পাইতে পারে, ইহা প্রশ্নাতীত সত্য। শিল্প-প্রসারের প্রয়োজন এদেশে কৃষির উপর চাপ কমাইবার জন্য এবং ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারিত হইলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সাহায্যে ও নিজেদের স্বচ্ছলতায় কৃষকের জীবন-মানের অবশ্যই উন্নতি হইবে। কৃষিজীবনের স্বাচ্ছল্য সম্পাদনের তীব্র প্রয়োজন সকলেই অনুভব করিলেও এতকাল এদেশের শাসক-সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের স্বার্থগত ক্ষতির যেন সম্বন্ধ আছে এমনি একটি ভাব তাঁহারা প্রকাশ করিতেন। তারপর অবশ্য বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রভাবে নানা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের মনোভাবেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থায় এখন বড় ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে সুতরাং কর্তৃপক্ষের দিক হইতেও সনাতন রীতি আঁকড়াইয়া থাকিলে যে ক্ষতি তাঁহাদেরই, একথা আজ তাঁহারা ভালভাবেই বুঝিয়াছেন। ভারতের কৃষিকে অষ্টাদশ শতকে ঠেলিয়া রাখার শাসকসম্প্রদায়ের যে লাভই থাকুক, ভারতীয় জনমত কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে এমন উদাসীনতার সহিত দেখিতে ইচ্ছুক নয় এবং জনমতের চাপে পড়িয়া ভারতসরকারও বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাবের সহিত কৃষির কথা বিবেচনা করিবার লক্ষণ দেখাইতেছেন।

কৃষির উন্নতিসাধনে অন্যতম প্রধান সমস্যা সারের জোগান। জমির যে উৎপাদিকা শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতে থাকে তাহা পূরণ করিবার জন্য জমিতে ভাল সার লাগাইতে হয়। ভারতীয় কৃষক এতকাল গোময়, খৈল, সব্জীসার, উদ্ভিজ্জসার প্রভৃতি সাধারণ সারের সহিত পরিচিত ছিল। বেসিক সুপারফস্ফেট, পটাসিয়াম্ নাইট্রেট, এ্যামোনিয়াম্ ক্লোরাইড, পটাশ লবণ,

এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রভৃতি নামে যে কোন রাসায়নিক সার আছে এবং তাহাদের প্রয়োগে জমির উর্বরতা বাড়িয়া যাইতে পারে, এ সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের সংবাদ ভারতীয় কৃষক এতকাল পায় নাই। বিলম্বে হইলেও ভারত সরকার বর্তমানে রাসায়নিক সারের সহিত ভারতের কৃষকসম্প্রদায়কে যে পরিচিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সত্যই আশার কথা।

নাইট্রোজেন শিল্প বা রাসায়নিক সারের উৎপাদন ভারতের কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এই শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিবারও প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ষোল বৎসর পূর্ব্বে স্তার পদমজী গিনওয়ালার সভাপতিত্বে ট্যারিফ বোর্ড ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন কিন্তু অদূরদৃষ্টিবশতঃ গভর্ণমেণ্ট সেই অনুমোদন গ্রাহ্য করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের সুপারফস্‌ফেট নামক রাসায়নিক সার উৎপাদনের এই অনুমোদন অগ্রাহ্য করার সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল এদেশে ঐ শিল্পের উপযোগী কাঁচামালের অভাব। সুপার-ফস্‌ফেট উৎপাদনের উপাদান—ফস্‌ফেট রক ও গন্ধক ভারতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু পৃথিবীর যে চারিটি দেশ এই রাসায়নিক সার উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাদের (গ্রেট ব্রিটেন, জার্ম্মানী, নেদারল্যাণ্ড ও জাপান) প্রত্যেককেই বিদেশ হইতে ফস্‌ফেট রক আমদানী করিতে হয় এবং একমাত্র জাপান ছাড়া কাহারও নিজ দেশে গন্ধক পাওয়া যায় না। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে তখন ভারতসরকার অনায়াসেই এদেশে উপরোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে পারিতেন এবং তাহাতে ভারতীয় কৃষির যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, যুদ্ধের চরম সুযোগে ভারতে যে রাসায়নিক সার উৎপাদনোপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। সম্প্রতি ভারতসরকার রাসায়নিক সার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কাটালাইসারস্ মিশন বসাইয়াছেন এবং ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের কারখানা খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। ভারতসরকারের বাণিজ্যসচিব জানাইয়াছেন যে, এই ধরণের প্রথম কারখানা হইতে প্রথম বাৎসরিক উৎপাদন পাওয়া যাইবার পরে জনসাধারণের মধ্যে কারখানার মালিকানা সংক্রান্ত কিছু পরিমাণ অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিবের উপরোক্ত ঘোষণায় অধিকাংশ লোকের মনে আশার সঞ্চার হইলেও চিন্তাশীল বহু ভারতীয় এরূপ বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। ইমপিরিয়াল কেমিকেল ইন্‌ডাসট্রিস নামক সম্রান্ত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান এদেশে রাসায়নিক মূলবস্তুসমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে, ভারতসরকার প্রথম হইতে প্রস্তাবিত এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের কারখানায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অনেকের আশঙ্কা যে, প্রথম উৎপাদনের পর জনসাধারণের হাতে ভারতসরকার এই শিল্পের মালিকানা ছাড়িয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আইনগত বাধা নাই বলিয়া ইম্‌পিরিয়াল কেমিকেল ইন্‌ডাসট্রিজের পক্ষে সেই অধিকার লাভ করা কিছুই কঠিন হইবে না। ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে অথচ ভারতবাসী আমদানী করা পণ্যের মত শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্য কিনিতে বাধ্য হইবে, এরূপ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কোন সুহৃদয় ভারতবাসীই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

ইম্পিরিয়াল কেমিকেলকে মাথা গলাইতে না দিয়াও ভারত-সরকার এই সার প্রস্তুতের চেষ্টা করিতে পারেন এমন ইঙ্গিতও কেহ কেহ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ না করিয়া ভারতসরকার আমেরিকার সার প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাতাদের সহিতও পরামর্শ করিতে পারিতেন। মহীশূরে যে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা হইয়াছে তাহাতে আমেরিকান যন্ত্র বসান আছে এবং তাহাতে যে কাজ পাওয়া যাইতেছে তাহা সর্ব্বাংশে নির্ভরযোগ্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকান যন্ত্রে রাসায়নিক সার উৎপাদনে যে ব্যয় হয়, ব্রিটিশ যন্ত্রাদিতে খরচ তাহার প্রায় দ্বিগুণ লাগে।

তবে এ সকল কথা লইয়া এখন হইতে বাদানুবাদ করিয়া লাভ নাই, কারণ ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে জনসাধারণের হাতে এ শিল্প পরিচালনার অধিকার দিবেন ইহা এখনও আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় নাই। মোটের উপর আমরা আশা করি যে, ভারতীয় জনগণের বৃহত্তম অংশের উপকারের জন্যই ভারতসরকার রাসায়নিক সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পরিকল্পনায় ভারতীয় জনসাধারণই উপকৃত হইবে। তবে এই শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাহিরের আমদানী সারের উপর শুল্ক বসান অবশ্যই কর্ত্তব্য। যুদ্ধের পরে পৃথিবীর সকল রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী-দেশেই উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং তখন ভারতের এই শিশু-শিল্প শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখোমুখী হয়তো দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। ব্রিটেন যখন এই শিল্প প্রথম আরম্ভ করে তখন বিদেশের রাসায়নিক সার আমদানীর উপর শতকরা ৩৩⅓ ভাগ মূল্যানুযায়ী কর বসান হইয়াছিল এবং এই অতিরিক্ত সুবিধা লাভের ফলেই ব্রিটেন আজ এই শিল্পে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা সরকারের কৃষিমন্ত্রী একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে আসানসোলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের কারখানা বসাইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক বাংলা-দেশের মধ্যে আসানসোল অঞ্চলই এই কারখানা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কয়লাখনি অঞ্চলে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার বাড়তি সুবিধা আছে, কারণ জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) হইতে কারখানা চালাইবার যে খরচ, তাহা অপেক্ষা কয়লাখনি অঞ্চলে যন্ত্রপাতি বসাইয়া থারমাল ইলেক্‌ট্রোলাইটিক প্রক্রিয়ায় সার উৎপাদন করিলে শতকরা ১০ ভাগ খরচ কম হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যাহা হউক আমরা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি যে, বিলম্বে হইলেও ভারতসরকার ও বাংলাসরকারের ভারতীয় কৃষকদের দুঃখমোচনের যে সুমতি হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইয়া শীঘ্রই আমাদের দেশের বিরাট একটি সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে।

মুনাফাখোরের সাজা

যুদ্ধের সময় জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশায় লজ্জাকর সুবিধা লইবার মত হীনচেতা ব্যবসায়ী পৃথিবীর বহুদেশেই আছে এবং

সব দেশের গভর্ণমেণ্টই এই সব দুর্নীতিপরায়ণ লোভীদের শাস্তি দিয়া চোরাবাজারের জুলুমবাজী বন্ধ করিতে চান। পারস্তে এই শ্রেণীর অপরাধীকে জরিমানা ও কারাদণ্ড দুইই ভোগ করিতে তো হয়ই, উপরন্তু নগরের প্রকাশ্যস্থানে তাহাদিগকে বেত মারিয়া কর্ত্তৃপক্ষ শাস্তি দিয়া থাকেন। সম্প্রতি কোন এক সহরের একটি জল সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও একাউণ্টেণ্টকে পারস্যসরকারের বিচারবিভাগ দুশো ঘা বেত মারিবার আদেশ দিয়াছেন। অপরাধীদ্বয় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে সরবরাহ করা জলের মূল্য দ্বিগুণ করিতে চাহিয়াছিলেন এই অভিযোগে পুলিশ তাঁহাদের বিচারার্থ চালান দেয়। জলের মত নিত্যব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য বৃদ্ধিতে দেশবাসীর অসুবিধা অনুমান করিয়াই বিচারকগণ দোষীদের উপরোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান যুদ্ধের দুর্লভ সুযোগে অনেক ব্যবসাদারই লক্ষপতি হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং নিরপরাধ দুস্থ দেশবাসীর রক্ত শোষণ করিয়া তাঁহাদের অনেকেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ভারতসরকার এইসব মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীকে দণ্ডদানের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কার্য্যতঃ অর্থদণ্ডই প্রধান হওয়ায় চোরাবাজারে দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া দৈবাতক্রমে ধরা পড়িলে দুটাকা জরিমানা দিবার দায়িত্ব ব্যবসায়ীরা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করিতেছেন। লাভের লোভে নীতিকথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যাও এদেশে কম নয়। ইহাদের স্বার্থপরতায় দেশের যে ক্ষতি হয় তাহা সত্যই পরিমাপ করা যায় না। অন্যায় লাভের সন্ধানী এই সব দুরাচারীদের কঠোরতর শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিলে হয়তো বৃহত্তর ক্ষতির ভয়ে ইহারা অপেক্ষাকৃত সংযত হইবে এবং সেই সঙ্গে সরকারী আন্তরিকতায় পণ্যাদির জোগান ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইলে বাজারের দরকারী জিনিষ এখনকার মত জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে থাকিবে না। বহুসংখ্যক দেশবাসীর স্বার্থে সামান্য কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে যদি কঠোর মনোভাব ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে কোন অন্যায় হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

ভারতে খাদ্যাভাব

যুদ্ধ বাধিবার প্রায় তিনবৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংলণ্ডের খাদ্যসচিব যুদ্ধকালীন খাদ্যব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমগ্র দেশে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁহার এই দূরদৃষ্টিই বলিতে গেলে ইংলণ্ডে বেসামরিক জনগণকে যুদ্ধজনিত অসুবিধা হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছে। দিল্লীর এক সাংবাদিক বৈঠকে সম্প্রতি ইংলণ্ডের খাদ্যসচিবের দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার হেনরী ফ্রেঞ্চ ইংলণ্ডের খাদ্যনীতির সহিত ভারতের খাদ্যনীতির তুলনা করিয়া বিশেষভাবে এই দূরদৃষ্টি কথাটার উপর জোর দিয়াছেন। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনসাধারণকে Forces on the Front Line মনে করা হইতেছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব সরকার সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। এদিক হইতে ভারতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। যুদ্ধের পূর্ব্বে যুদ্ধ যে কোনদিন বাধিতে পারে এবং তাহার ফলে স্বাভাবিক ঘাটতি এই দেশে খাদ্যশস্যে টান পড়িতে পারে, একথা কর্ত্তৃপক্ষের মনে জাগে নাই। রেশনিং প্রথা চালু হওয়ার পরও তাঁহাদের অব্যবস্থার জন্যই দেশবাসীকে প্রভূত দুঃখ সহিতে হইতেছে। মাত্র কতকগুলি সহরে বর্ত্তমানে বরাদ্দ প্রথা চালু হওয়ায় এই ব্যবস্থার দ্বারা সারা দেশের জঠরজ্বালা যে মিটেনা একথা বলাই বাহুল্য, অথচ সেই সহরগুলির বাহিরে যে হাজার হাজার গ্রাম আছে সেখানে সহরের রেশনিং-এর নামে লোভী ব্যবসাদারেরা যথেচ্ছাচার চালাইতেছে। যেখানে খাদ্য বরাদ্দ-প্রথাভুক্ত হইয়াছে সেখানেও বিতরিত খাদ্যের পরিমাণ এত কম যে, তাহা দ্বারা লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা হওয়া সত্যই সম্ভব নহে। এইভাবে ভারতে রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা ও কর্ম্মশক্তির অভাবের জন্য রেশনিং নীতি সফল হইতেছে না। খাদ্যযোগান ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিল। বাংলার খাদ্যাভাব বিশেষ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ হয় নাই এবং বিশেষজ্ঞগণের অভিমত যে, সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সময়ে খাদ্যাদি আনিয়া বাংলায় জমা করিতে পারিলে ও সুবিধামত বিদেশ হইতে খাদ্য-আমদানী করিতে পারিলে এই বিপর্য্যয় ঘটিতে পারিত না। বাংলায় দুর্ভিক্ষ যে প্রাকৃতিক কারণে হয় নাই একথা গতবৎসর ৩১শে অক্টোবরের কাগজে ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকও স্বীকার করিয়াছেন :—
As we have often observed, India has been lucky that her man-made famine has so far remained uncomplicated by any failure of the monsoon. ভারতে আবার দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে এমনি সম্ভাবনা অনুমান করিয়া বিলাতের শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে জনমত গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের যে অবস্থা তাহাতে দুর্ভিক্ষ যে বাংলাদেশ হইতে একেবারে দূর হইয়াছে এমন কথা এখনও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বাংলা সরকার খাদ্যশস্য বাড়াইবার জন্য যে আন্দোলন করিলেন, তাহা সহরের টাউনহলে আর রেডিও ষ্টেশনেই শেষ হইল, অথচ ইহার জন্য একবৎসরেই সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হইল প্রায় দেড়কোটি টাকা।

সম্প্রতি পৃথিবীব্যাপী সমালোচনার চাপে পড়িয়া বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারতসরকার দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। কমিশনের সভাপতি স্যার জন উডহেড গত জুলাই মাসে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, শুধু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক খাদ্যদপ্তর নয়, সৈন্য বিভাগের নিকট হইতেও কমিশন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান দুর্ভিক্ষ কমিশনের নিকট এবিষয়ে স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন তথ্যানুসন্ধান করিয়া প্রকৃত দোষীদের যে শাস্তিই বিধান করুন তাহাতে ভারতের ঘাটতি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু যদি অপরাধীগণের শাস্তিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও যোগানের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহারা যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিতে পারেন তাহা হইলেই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশবাসী কিঞ্চিৎ উপকৃত হয়। ভারতে যে পাঁচ কোটি একর কৃষির উপযোগী জমি পড়িয়া আছে সমগ্র দেশে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ নীতি চালাইয়া ও অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে ভালভাবে চাষের বন্দোবস্ত করিলেও উপস্থিত এদেশে খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে। গ্রেগরী কমিটি বা ভারতসরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত

খাদ্যশস্য নীতি নির্দ্ধারক সমিতি ভারতের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া প্রথম বৎসরে যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি আমদানী হইতে এখনও বাকী আছে; যে কোন বিপদের ঝুঁকি লইয়া অবিলম্বে সেই খাদ্যদ্রব্য ভারতে আনিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। আমরা ইহাও আশা করি যে, দুর্ভিক্ষ কমিশন গতানুগতিক ভাবে বহু সাক্ষ্য গ্রহণের পর ধীরে সুস্থে উপদেশাত্মক বিরাট এক রিপোর্ট প্রকাশ করার অপেক্ষা এমন কোন সুচিন্তিত অভিমত যথাসত্বর প্রকাশ করিবেন যাহা দ্বারা বাংলার সহিত সমগ্র ভারতের খাদ্য ব্যবস্থায় উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে চলিয়া ভারতসরকার খাদ্যনিয়ন্ত্রণ নীতিতে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারেন। খাদ্য উৎপাদন অধিক হইলে এবং যোগান ব্যবস্থা ভাল হইলে বরাদ্দ নীতি ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের সময় রেশনিং প্রথা এদেশে চালু থাকুক ইহা সকলেই চায়, তবে বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থার এত বেশী ত্রুটি রহিয়াছে যে উহা দ্বারা উপকার অপেক্ষা দেশবাসীর অসুবিধা হইতেছে বেশী। বরাদ্দ দ্রব্যাদির সংখ্যা এবং পরিমাণ বাড়াইয়া সারাদেশে নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলে দুঃস্থ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতবাসী সত্যই লাভবান হইবে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধের পরেও তিন চারি বৎসর রেশনিং প্রথা চালু রাখার ইচ্ছা ভারতসরকার পোষণ করেন। পরিকল্পনায় যতই ঔদার্য্য ও সাধুতা থাক, যে নীতি বর্ত্তমানে সহরগুলিতে চলিতেছে তাহা বাস্তবিকই সন্তোষজনক নহে এবং বরাদ্দ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতিসাধন না করিয়া রেশনিং প্রথা যুদ্ধের পরেও দীর্ঘদিন চালাইলে তাহা নিরর্থক হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এ-সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যে পথই অবলম্বন করুন তাহা দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য করিবেন ইহা আশা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেদিক হইতে রেশনিং প্রথা যুদ্ধোত্তর কালে তিন চারি বৎসর চালাইবার পূর্ব্বে দেশবাসীর বাস্তব সুখদুঃখের কথা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা ভারতসরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রুটি স্বীকার

গত মাসের ভারতবর্ষে আমার 'দুনিয়ার অর্থনীতি' প্রবন্ধে দুইবার টাকার স্থানে ষ্টার্লিং ও একবার ডলারের জায়গায় টাকা ছাপা হইয়া গিয়াছে। অসাবধানতাজনিত এই ভুলের জন্য আমি দুঃখিত।

টানাটানির দুনিয়া

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

—হ্যালো—হ্যাঁ, কে অরুণা? কামারহাটির বাগান থেকে—রমেশ। কেমন আছ?

—বাঃ বেশ! দেখা সাক্ষাৎ, চিঠি-পত্র কিছু নেই। বুঝেছি।

—হ্যালো! মোটে বোঝনি। সংক্ষেপে, টানাটানির দুনিয়া। রাগ ক'র না।

—আন্তরিক—

—না না ওসব না। আন্তরিকতার অভাব নাই। প্রাণের মধ্যে, রক্ত-স্রোতের তালে তালে, ছন্দে ছন্দে ইত্যাদি ইত্যাদিতে—তোমার মূর্ত্তি আঁকা। হ্যালো, কোকিলের গানে, ভ্রমরার তানে, ইত্যাদি ইত্যাদি, মাত্র তিন মিনিট সময়, তোমার বীণা বাজে, মধুর রাগিনী। স্বপনে শয়নে, ইত্যাদি—

—বেশ! বেশ! রসিকতা করতে হবে না। খোঁজ খবর নেই—বেশ—

—হ্যালো। রাগ কর না। মান ত্যজ মানিনি ইত্যাদি। তিন মিনিট—হ্যাঁ খোঁজ খবর। র‍্যাসন কার্ড। তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে তার ওপর জলন্ত সিগারেট ফেলে পুড়িয়ে, ফেললাম। দরখাস্ত করলাম নূতনের। তদন্ত, কৈফিয়ত ইত্যাদির ঠ্যালায় তিনদিন অনশন। পালিয়ে এসেছি কামারহাটি—

—তা একটা খবর—

—খবর? ট্রামে হাতলধরা একজনের কোমর ধরে শিয়ালদহ, টিকিট ঘরে খুচরার টানাটানি, ট্রেণে—

—হ্যালো! আমি এক্সচেঞ্জ, তিন মিনিট হয়ে গেছে।

—হ্যালো! সর্ব্বনাশ। আচ্ছা! লাগে আর তিন মিনিট। হ্যালো! অরুণা! হ্যাঁ ট্রেণে স্থানাভাব। হাতল ধ'রে পাদানিতে দাঁড়িয়ে—

—আহা! এমন গৌরাঙ্গভূমি কবে?

কি করব অরুণা। পাশের গাড়িতে এক মহিলা ছিলেন। জরদা ও পানের মুখামৃত ছাড়লেন হাওয়ার বুকে, গবাক্ষ-পথে, খদ্দরের জামা রঙিয়ে দিলেন। হাত ছেড়ে মুছতে পারিনা, ট্রেণ ছুটছে ইত্যাদি। জামা ফুঁড়ে পৈতে গাছটা স্থানে স্থানে লাল হ'ল। পৈতের সুতা কণ্ট্রোল মণ্ট্রোল কি হ'য়েছে—নূতন হয় নি। মহালয়ায় বোধ হয় ঐ পৈতেই ডাহিনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করতে হবে অরুণা।

—বাজে বকচ। চিঠি লিখলে তো পারতে।

—হ্যালো। সে গুড়ে বালি অরুণা। কাগজ কণ্ট্রোল। চাকরির জন্য দরখাস্ত করবার কাগজ নেই, আবার প্রেম পত্র। অরুণা ভীষণ ভালবাসি—

—হ্যালো। আমি এক্সচেঞ্জ।

—তোমার প্রেমে এই অনাটনের দুনিয়ার ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, কঠোরতা, ইত্যাদি—

—হ্যালো তিন মিনিট—

—টেলিফোনের তিন মিনিটেই বলছি। অনন্ত তোমার প্রেম—

—হ্যালো। আমি এক্সচেঞ্জ—টেলিফোন বালিকার সঙ্গে প্রেম ডি, আই রুলে পড়ে—এখনি গেরেপ্তার—

—হ্যালো! সর্ব্বনাশ। তুমি নও। অরুণা! তোমার মূর্ত্তি নয়—অরুণার দিব্যকান্তি। হ্যালো ভোকাট্টা! কেটে দিয়েছে। জাহান্নমে যাক টানাটানির এ ক্ষুদ্র জগত। খাদ্য কম, পানীয় কম, কৃষ্টিসাধনা সব সংক্ষেপ—মায় জীবনের যে মধুর কাম্য-প্রেমালাপ—তাকেও করতে হবে সংক্ষিপ্ত। না! না! অরুণা আহা বলেছে। সার্থক জীবন। থাকি সে আর আমি বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হ'য়ে যাক, আর যা রহিবে বাকি।

পোল্যাণ্ড সমস্যার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

অপমানের প্রতিক্রিয়া

১৯১৮ সালের পরে যদি কেউ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে চান, তিনি দেখবেন যে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির রাজনীতি প্রতি পদে ভুল করেছে যে ভুলের জন্য আজকের যুদ্ধের হয়েছে সৃষ্টি। জার্মানীকে সবদিক থেকে পঙ্গু করার চেষ্টা জার্মান জাতির মনে আহত সাপের মত আক্রোশই জাগিয়েছে শুধু। জার্মানীকে যুদ্ধমনোবৃত্তির (War-guilt) দোষ দেওয়া হয়েছে, তার গায়ে অপরাধীর ছাপ মারা হয়েছে, তার কাছে বেশী রকম ক্ষতিপূরণের দাবী করা হয়েছে। তার দেশকে মিত্রশক্তির কবল থেকে মুক্ত করা হয়নি। তাকে অনাহারে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে এবং জাতিসংঘে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। ফলে জার্মানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবার। কিন্তু জার্মানীর নেতারা জনবিপ্লবের ভয়ে ক্ষমতা তুলে দিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী হিটলারের হাতে। হিটলার কোন নতুন রাজনীতির সৃষ্টি করলেন না; বরং পুরানো নীতিকে আরো চরমে নিয়ে গেলেন। যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করা হোল তাঁর প্রথম পরিকল্পনা। যুদ্ধ ঘোষণা না করে আক্রমণ করা হোল তাঁর আর একটি নীতি।

জাতিসংঘের অপপ্রয়োগ

জাতিসংঘের অক্ষমতা হোল আর একটী লক্ষ্য করার বিষয়। তার আন্তর্জাতিক রূপ ও শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বার্থান্বেষী স্বাধীন শক্তিগুলো নিজেদের কুচক্রকে কাজে খাটানোর জন্য জাতিসংঘকে ব্যবহার করলে। তাদের কেহই সঙ্কটের সময় আন্তর্জাতিক মঙ্গলের জন্য চিন্তা করলে না; ভাবলে শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণকে বাধা দেওয়া হোল না। আবিসিনিয়া, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভেকিয়া—সব কটিই লীগের ব্যর্থতার এক একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকটি ব্যাপারে আক্রমণকারী বিনা আয়াসে জয়লাভ করলে। চক্রশক্তির নেতারা বাজিয়ে দেখলেন যে জাতিসংঘ বড়জোর একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে পারে; তার বেশী কোন ক্ষমতা তার নেই। বৃটেন বাধা দিতে ভয় পায়। ফলে তাঁরা জাতিসংঘকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

চেম্বারলেনের আপোষ

তারপর সুরু হোল চেম্বারলেনের আপোষ নীতি। মৃতপ্রায় লীগের স্থান গ্রহণ করলে এই নীতি। এই নীতিও অন্যায় আক্রমণকে মেনে নিলে। চেম্বারলেন মাঝে মাঝে মুখে প্রতিবাদ জানালেন শুধু, জনগণকে তুষ্ট রাখার জন্য। কিন্তু কেন? বৃটেন ও আমেরিকার ধনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকবল চক্রশক্তির চেয়ে অনেক বেশী। তবু তোষণ নীতির অর্থটা কি? এটা বুঝতে গেলেই আমাদের সোভিয়েট রুশিয়ার কথায় আসতে হবে।

সোভিয়েট বিরোধী কেন?

সোভিয়েট রুশিয়ায় তখন সমাজতন্ত্রের হচ্ছে প্রতিষ্ঠা। সেখানে জনগণের সঙ্গে মুষ্টিমেয়ের বিলাসিতা চলে না। শ্রেণী-বিভেদ-হীন সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা জনসাধারণের হাতে। শোষণ নীতি সেখানে আজ নেই। তাই ধনতান্ত্রিক বৃটিশ সাম্রাজ্য ও মার্কিণ শক্তি সোভিয়েটের জন্মের দিন থেকে তাকে অঙ্কুরেই শেষ করতে চেয়েছে। প্রেসের সাহায্যে ও অন্য নানারকম উপায়ে এরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে ধামা চাপা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এঁদের মনে সর্বদা ভয় ছিল। যদি কোনরকমে সোভিয়েটের উন্নতির খবর বাইরে প্রকাশ পায় তাহলে কি হবে? গণবিপ্লবকে তাহলে তো আটকানো যাবে না। তাই এঁরা ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলোকে দুধকলা দিয়ে পুষছিলেন, আপোষনীতির সাহায্যে তাদের দিয়ে চিরশত্রু সোভিয়েটকে শেষ করানোর জন্য। যাতে সমাজতন্ত্র বা সত্যিকারের গণতন্ত্র পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়।

ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম্

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ফ্যাসিষ্টরা, কম্যুনিষ্টদের শত্রু মনে করবে কেন। তারাও তো সমাজতান্ত্রিক বলে নিজেদের? এখন তাহলে দেখতে হবে ফ্যাসিজম্ আর কম্যুনিজমের পার্থক্য কোথায়।

ফ্যাসিজম্ ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যগত অধিকারকে মেনে নেয়, কিন্তু মূলধনীদের রাষ্ট্রের নির্দেশমত চলতে হয় অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা উদারপন্থী ধনতান্ত্রিক দেশের চেয়ে কম। শ্রমিকদের স্বাধীনতা আরো কম। আন্তর্জাতিকতা তার চিরশত্রু। জাতি-সংঘের ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলোর নীতি ছিল যে প্রত্যেক জাতির সভ্যদের থাকবে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব (Each racial or national unit has its own seperate independent authority) ফ্যাসিজমের চরমপন্থী জাতীয়তা ও নিষ্কলঙ্ক-রক্ত (Pure blood) সম্বন্ধে স্তুতিগান, পাশ্চাত্য তথাকথিত গণতন্ত্রের চরম রূপ। কালো চামড়া ও সাদা চামড়ার মূল্য বিভেদ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। তবে কোন নীতিকে কৃতকার্য্য হতে হলে জনসাধারণকে আন্দোলিত করা চাই। ফ্যাসিজমের আন্দোলন যে জোরের পথে চলে, ইহুদী দলন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রাচীন রোমে এই দলন খুব বেশীই ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাসিজম্ হচ্ছে ধনতন্ত্রেরই জাত ভাই; তবে এরা পুরাতন-পন্থী ও মেজাজ তার আরো কড়া। দমন নীতির প্রতি ও শোষণনীতির প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এবং সামন্ত যুগের (Feudal age) উপযুক্ত তার শক্তির প্রতি বিশ্বাস। অপমানের প্রতিক্রিয়া থেকেই এই নীতির সৃষ্টি। বৃটেনেও যেটুকু রাজ-নৈতিক উদারতা আছে, সঙ্কট মুহূর্ত্তে তা আর থাকে না। তখন তার কাজকর্ম ফ্যাসিষ্ট দেশের মতই হয়ে যায়।

কম্যুনিজম্ও শক্তিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সে শক্তি আক্রমণের

জড় নয়—আত্মবলায় জড়। পরকে মেরে সে বড় হতে চায় না। ফ্যাসিজম্ ও ধনতন্ত্র পরকে মারার জন্ত এবং স্বার্থকে বড় করায় জন্ত শক্তি পূজা করে। কম্যুনিজম্ সকলকে সমান সুবিধা দিতে চায়। পাছে সোভিয়েট রুশিয়ার সম্বন্ধে সত্যকথা বাইরে প্রকাশ পেলে দরিদ্র জনসাধারণের সংঘবদ্ধ শক্তি বিপ্লব আনতে চায়, তাই ধনতান্ত্রিক নেতারা পরিকল্পনা করে মিথ্যা খবর রটাতে সুরু করেন। আজ এতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে তাঁরা যা করতে পারেন নি, ২৫ বছরের চেষ্টায় কৃষিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, জীবিকায় এবং শক্তিতে সোভিয়েট রুশিয়া তার চেয়ে অনেক বেশী করেছে; অধিকাংশ সম্পদেই সে আজ জগতের শীর্ষস্থানীয়। তাই ধনতান্ত্রিক নিন্দাবাদ সে সবদিক দিয়ে চায়না। তাই ধর্ম্মবিরোধী অপযশ দেয় রুশিয়াকে। সকলে যে কত বড় ধার্ম্মিক তা জানাই আছে। সোভিয়েট রুশিয়া ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামীকে ও ধর্ম্মের সাহায্য নিয়ে শোষণ ও শাসনকে সহ্য করে না অর্থাৎ রাজনীতি ও ধর্ম্মকে মিশতে দেয়নি। ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসে, ধর্ম্মপ্রচারে ও ধর্ম্মবিরোধী প্রচারে বাধা দেয়না, এমনকি ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ও আজকাল ভোট দিতে পারে। তবে গোড়ার দিকে ধর্ম্মের নামে নবজাত সোভিয়েটের ক্ষতিকরার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল বলে এতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে সকলকে সংস্কারান্ধ ও পঙ্গু করে রাখতে সোভিয়েট দেয়নি। সেদিন রুশিয়ার আর্চবিশপ এসোসিয়েটেড্ প্রেসের লোককে বলেছেন, "অধিকার কেড়ে নেওয়া মানে অত্যাচার বোঝায় না—বোঝায়, সোভিয়েট বিরোধী কার্য্যকলাপের জন্ত অভিযুক্ত করা এবং ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় সব জমিজমা তাদের হাতে থাকার জন্ত সব সুখ সুবিধা ভোগ করতেন, তা কেড়ে নেওয়া। কৃত্রিম উপায়ে লোকদের ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য করার ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার ফলে, তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ই শুধু বিদায় গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারকেই দেশবিদেশে ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার বলে প্রচার করা হয়। এটা অত্যাচার মোটেই নয়, বরং এর ফলে ধর্ম্মের সেবকেরা অকৃত্রিমভাবে তাদের কর্ত্তব্য করতে পেরেছে, ধর্ম্মকে জীবিকানির্ব্বাহের একটা উপায় না ভেবে। সরকার ও ধর্ম্মের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন অদল-বদল দরকার নেই; আমাদের অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত। আমাদের কোন অন্তায়রকম সুখসুবিধা নেই বটে, কিন্তু সরকার আমাদের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবনে কোনরকম হস্তক্ষেপ করে না।"

ষ্ট্যালিনের দূরদৃষ্টি

যাহোক যুদ্ধের আগেই বৃটিশ ও মর্কিণশক্তির তোষণনীতিকে বুঝতে হলে, ষ্ট্যালিনের ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ্চের বক্তৃতা থেকে খানিকটা তুলে দেওয়া যেতে পারে—"আজকের সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধের একটি নতুন বিশেষত্ব হচ্ছে যে আক্রমণ-শক্তিগুলোর জয়লাভ, নির্লিপ্ত মার্কিন, ইংরাজ ও ফরাসী শক্তিগুলোর স্বার্থে ঘা দিচ্ছে; কিন্তু তবু তারা আক্রমণকারীদের সুবিধার পর সুবিধা ছেড়ে দিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে। এই একতরফা যুদ্ধের কারণ কী? কারণ হচ্ছে গণবিপ্লবের ভয়। তাই তারা নির্লিপ্ততার শরণ নিয়েছে। এই নির্লিপ্তনীতির রূপ হচ্ছে,—যারা যে ভাবে খুশী যুদ্ধ করুক এবং আত্মরক্ষা করুক; আমরা এদের ও-দের দুজনের সঙ্গেই বাণিজ্য চালাব।—এই নীতি জার্ম্মাণীকে সোভিয়েট-এর সঙ্গে যুদ্ধে বাধা দিতে চায়না—চায় যুদ্ধে লিপ্ত করতে। দুইদল যখন যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত ও দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, তখন শান্তি স্থাপনের অছিলায় এরা রঙ্গমঞ্চে এসে এঁদের সর্ত্ত মানতে বাধ্য করবেন। সেদিন এদের কাগজগুলো রুশ বাহিনীর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছিল, জার্ম্মানীকে পূর্ব্বদিকে এগিয়ে যেতে তাতিয়ে দেবার জন্ত, যেন এদের বক্তব্য হচ্ছে—বলশেভিকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝানু বুর্জোয়া কূটনৈতিকেরা বলেন যে রাজনীতি হচ্ছে রাজনীতিই। কিন্তু যে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক জুয়া খেলা তাঁরা সুরু করেছেন, তার ফল তাঁদের পক্ষেই হয় তো মারাত্মক হতে পারে। যুদ্ধের কবলে আজ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের পাঁচশ কোটি লোক। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিকে দৃঢ় করার আশায় জাতিসংঘের মত দুর্ব্বল সংঘকেও আমরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি, আর কিছু না হোক অন্ততঃ আক্রমণকারীদের আসল রূপকে প্রকাশিত করা যেত এই সংঘের সাহায্যে। আজ আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে কোন কারুর প্ররোচনায় যুদ্ধে জড়িত না হওয়া—কেন না তাদের চিরকালের অভ্যাস হচ্ছে অন্তের সাহায্যে পোড়া বাদামকে তাদের জন্ত আগুন থেকে বার করে খাওয়া।"

এবার বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য লর্ড হার্লেকের উক্তি শোনা যাক—"The solidarity of the christian civilisation is necessary to stem the most sinister growth that has arisen in European History... Locarno means that the present German Govt ....is throwing in its lot with the Western party." যে ভীষণ জিনিষ ইউরোপের ইতিহাসে জন্মেছে আজ তার গতিরোধ করার জন্ত (বলশেভিজম্) খ্রীশ্চান-সভ্যতার দৃঢ়তা দরকার। লোকার্নোর সন্ধির মানে হচ্ছে যে বর্ত্তমান জার্ম্মানী পাশ্চাত্য দলের সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়েছে। অর্থাৎ রুশ-বিরোধী হয়েছে। তাহলে এখন দেখা গেল মিথ্যা প্রচারের রূপকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে তিনটি দল রয়েছে···

(১) সমাজতান্ত্রিক রুশিয়া, (২) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি, (৩) প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান। শেষের দুটি দলের উদ্দেশ্য একই—রাষ্ট্রব্যবস্থাও এক; তফাৎ এর মধ্যে মাত্রা কম আর বেশী। সুতরাং সুবিধা পেলেই তারা একযোগে সাধারণ শত্রু প্রথম দলটিকে শেষ করবে। অবশ্য স্বার্থের হানাহানি তাদের মধ্যেও আছে। সোভিয়েট নিজে বরাবরই শান্তিরক্ষার চেষ্টা করেছে, দুই দলের সঙ্গেই করতে চেয়েছে অনাক্রমণ চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি।

রঙ্গমঞ্চে সোভিয়েটের আগমন

১৯৩৪ সালে সোভিয়েট যখন জাতি সংঘের সভ্য হোল, তার আগে পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর তার উপর আক্রোশ ছিল। ১৯৩৩ সালে

সোভিয়েট ও জার্ম্মানীর মধ্যে বার্লিনের চুক্তি হয় এবং জার্ম্মানী সোভিয়েটকে ২০০০০০০০০ মার্ক ধার দেয়। চুক্তির সর্ত্ত হোল যে এই দুটি শক্তির কোন একজন যদি তৃতীয় পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয়, অপর পক্ষ সে যুদ্ধে জড়িত হবে না।

হিটলারের আশা ও নীতি

১৯৩৪ সালে বল্টিক রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা চুক্তিতে সোভিয়েট জার্ম্মানীকে স্বাক্ষর করতে বলে, কিন্তু জার্ম্মানী রাজি হোল না। সোভিয়েট রুশিয়া যে ভার্সাই সন্ধির কর্ত্তৃপক্ষের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে এটা জার্ম্মানী পছন্দ করলে না। সোভিয়েট কিন্তু তখন থেকেই জোরজোড় করে অস্ত্র নির্ম্মাণ সুরু করলে—কারণ বল্টিক চুক্তি করতে না চাওয়াটা ষ্ট্যালিন সন্দেহের চোখে দেখলেন। তাঁর মনে এল যে বল্টিক রাষ্ট্র হিটলার যদি করায়ত্ত করে, তারপরেই হচ্ছে সোভিয়েটের সীমানা এবং সেখান থেকেই কামানগুলি লেনিনগ্রাদে পৌছবে। যাহোক সোভিয়েট যেই জাতিসংঘের সভ্য হতে গেল, হিটলারও কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি করলেন চক্রশক্তির সঙ্গে। যাঁরা বলেন যে ফ্যাশিজমে ও কম্যুনিজমের বিশেষ কোন তফাৎ নেই সুতরাং ষ্ট্যালিন্ ও হিটলারের বন্ধুত্ব সম্ভব—তাঁদের জন্য ১টি বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি, Mein kampf (হিটলারের আত্ম-জীবনী) থেকে।

"আজ যদি ইউরোপে নতুন স্থানের কথা ভাবতে হয় তাহলে প্রধানতঃ রুশিয়া ও তার সীমান্তের রাজ্যগুলোর কথাই মনে পড়ে। ভাগ্যবিধাতা এইখানে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। আমাদের জাতীয়তার নীতি যে নির্ভুল তার প্রমাণ স্বরূপ যে বিরাট ধ্বংস কার্য্য ঘটবে, ভাগ্য আমাদের মনোনীত করেছে তার দর্শক হিসাবে (অর্থাৎ কর্ত্তা হিসাবে) "রুশ বলশেভিজমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইহুদী জাতির পৃথিবীতে আধিপত্য করার চেষ্টা (যদিও সোভিয়েট পার্লামেন্টে ইহুদীর সংখ্যা এখনো বেশী নয়)" এক নব চিন্তাধারার সমস্ত অনুপ্রেরণাটুকু দরকার পৃথিবীকে এই আন্তর্জ্জাতিক সর্পের দংশন থেকে মুক্ত করতে। আমরা যদি তাদের সঙ্গে মিত্রতা করি তাহলে কি করে জার্ম্মান শ্রমিকদের বোঝান যাবে যে বলশেভিজম্ মানবতা বিরোধী মহাপাতক ?... .....কিন্তু যে মিত্রতার পিছনে যুদ্ধের সংকল্প লুকানো নেই তার কোন মানে নেই, কোন মূল্য নেই।" (অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার জন্যই সাময়িক মিত্রতা দরকার হয়।)

সোভিয়েটের শান্তি প্রচেষ্টা ও বৃটেনের তোষণনীতি

১৯৩৪ সালে সোভিয়েট রুশিয়া জাতিসংঘের সভ্য হয়। শান্তি স্থাপনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করার চুক্তিতে বৃটেন যোগ দিতে রাজী হোল না এবং শেষে পোলাণ্ডও যোগ দিল না। অস্ত্র ত্যাগের (Dis-armament) প্রস্তাব সোভিয়েটই দিয়েছিল। তাও বৃটেন শুনলে না। লর্ড লণ্ডনডেরী অস্ত্রত্যাগ প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিলেন। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল এই দেখে যে জেতা বৃটেন বিজিত জার্ম্মানীর সঙ্গে নৌ-চুক্তি করলে। তারপর হোল হোর-লাভাল্ চুক্তি। মুসোলিনীর আক্রমণ নীতিকে [illegible] হোল না। [illegible] ফ্যাসিষ্ট করলে যেতে সাহায্য করা হোল। ১৯৩৮ সালে হিটলারের অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর সোভিয়েট একবার সংঘবদ্ধ শান্তি প্রচেষ্টার কথা বল্লে ১৭ই মার্চ্চ, কিন্তু লণ্ডন তাকে অস্বীকার করলে ২৪শে মার্চ্চ। ১১ই মে কালিনিন্ ওয়াশিংটনে আবার চেকোশ্লোভেকিয়া ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার কথা বল্লেন এবং এই একই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলেন ২রা ও ১১ই সেপ্টেম্বরে। কিন্তু কেউ কোন উত্তরই দিল না। শেষে চেম্বারলেনের মিউনিক চুক্তিতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে বৃটেন ও ফ্রান্সের ফ্যাশিষ্ট শক্তিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগতে চায়—যার জন্য হিটলার অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া ইত্যাদি পেলেন, আগাম টাকা হিসাবে।

১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট মলোটভ্ বল্লেন, "এখন আমাদের সোভিয়েট জনগণের ও সোভিয়েট গণতন্ত্রের স্বার্থের কথা ভাবতেই হবে।" ১৯৩৯ সালে চেকোশ্লোভেকিয়া গেল। তবু সোভিয়েট শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ে নি। কিন্তু বৃটেনের তখন মতলব অন্য রকম। জনসাধারণের চোখে ধূলা দেবার জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তির চেষ্টা হতে থাকলো, সঙ্গে সঙ্গে কায়দা করা হোল যেন চুক্তিটা কৃতকার্য্য না হতে পারে। তাহলে শেষকালে কৃতকার্য্য না হবার দোষটা সোভিয়েটের ঘাড়ে চাপানো যাবে। যখনই চুক্তিটা একটু এগোয় অমনি বৃটিশ সরকার হিটলারকে নতুন করে তোষণের একটা বন্দোবস্ত করেন। এমন কি চেকোশ্লোভেকিয়া আক্রমণ করা যে হিটলারের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা, সেটাই চেম্বারলেন ১৬ই মার্চ্চ পার্লামেন্টে অস্বীকার করলেন।

এর পরেও ১৮ই মার্চ্চ, হিটলারের রুমানিয়ার দিকে নজর দেখে, সোভিয়েট আবার বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট-পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও তুরস্কের একটি সম্মিলিত সভা ডাকতে চাইলে। প্রস্তাবটি এই দারুণ সঙ্কটের মুহূর্ত্তের পক্ষে অতি সুন্দর, কেননা যদি চুক্তি হোত হিটলার কখনই যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহসী হতেন না। কিন্তু প্রস্তাবটিকে অপরিপক্ব (!) বলে বাতিল করা হোল ১৯শে মার্চ্চ (বৃটেনের দ্বারা ও পোলাণ্ডের দ্বারা)। চেম্বারলেন বল্লেন, "বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করে না যে ইউরোপে দলাদলির সৃষ্টি হোক।" কিন্তু ২২শে মার্চ্চ হিটলার যখন ড্যানজিগ্ নেবার উদ্যোগ করলেন তখন চেম্বারলেনের ভয় হোল এবং ৩১শে মার্চ্চ সোভিয়েটের সহযোগিতা না নিয়েই তিনি পোলাণ্ডকে অভয়বাণী দিলেন; কিন্তু বোঝা গেল না যে সোভিয়েটের প্রস্তাবকে দুদিন আগে অপরিপক্ব বলে কেন উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং কি করে সোভিয়েটের সহযোগিতা ছাড়া পোলাণ্ডকে তিনি রক্ষা করবেন। তিনি বল্লেন, "পোলাণ্ডকে অভয় দিতে হোল কারণ পোলাণ্ড আক্রমণের জন্য একটি পুরো দিনও হয় তো অপেক্ষা করতে হবে না।" তার কয়েক দিনের মধ্যেই "টাইমস্" পত্রিকায় জার্ম্মানীর শক্তি ব্যবহারের নিন্দাবাদ ছাপা হোল এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হোল—বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি ও কথাবার্ত্তা চালিয়েই যখন বিনা রক্তপাতে জার্ম্মানী যা চায় তা পেতে পারে, তখন আক্রমণ করার কি দরকার? তারপর বৃটেন, গ্রীস ও রুমানিয়াকেও অভয়বাণী দিলে কিন্তু সোভিয়েটকে ডাকলে না।

১৩ই এপ্রিল চেম্বারলেন, সোভিয়েটের [illegible] যে

রাশিয়া পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে রক্ষা করতে রাজী কিনা। ১৭ই এপ্রিল রাশিয়া বল্লে যে শুধু পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার কথা বলার মানে হয় না। ফ্রান্স ও বৃটেন যে কোন দেশের আক্রমণ-বিরোধী চুক্তি করতে বাধ্য আছে কিনা—কেন না অন্য দেশগুলো তাহলে আক্রান্ত হবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে কোন জবাব এল না। আমেরিকার একটি পত্রিকা লিখল, "বৃটিশ সিংহের প্রতিরোধ ইচ্ছা সবচেয়ে কম" (British lion is the lion of least resistance ।) । ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি কৃতকার্য্য হচ্ছে না দেখে, ১৯শে মে লয়েড জর্জ্জ পার্লামেন্টে বলেন, "চুক্তি পথে বাধা কোথায় হচ্ছে সেটা জানা দরকার।"

মিঃ চেম্বারলেন কটূক্তি করলেন "দরকারটা দেখছি একলা মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের।" উত্তর হোল "না দরকারটা দেশের।" চেম্বারলেন কোন উত্তর দিলেন না।

আপোষনীতি বনাম লয়েড জর্জ্জ

ইতিমধ্যে জুলাইএর তৃতীয় সপ্তাহে ডের ভোল্‌টাট্ নামে এক ভদ্রলোকের কাছে বৃটেনের সামুদ্রিক বাণিজ্যবিভাগের সেক্রেটারী জানালেন যে বৃটেন জার্ম্মানীকে তুষ্ট করার জন্য ১০০০০০০০০০ পাউণ্ড ধার দিতে রাজী আছে তার শক্তিবৃদ্ধির জন্য। ২৯শে জুলাই লয়েড জর্জ্জ বল্লেন—"চার মাস ধরে কথাবার্ত্তা চলছে, কতদূর এগিয়েছে তা জানি না। আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সাহায্য চাইছেন। শত্রুকে দাবী জানাচ্ছেন না। বন্ধুর সাহায্য চাইছেন। চেম্বারলেন জার্ম্মানীতে গিয়ে সোজাসুজি হিটলারের সঙ্গে কথা কইলেন, তিনি এবং হ্যালিফ্যাক্স রোমে গিয়ে মুসোলিনীর হস্তমর্দ্দন করলেন, তাঁকে বাহবা দিলেন। কিন্তু রাশিয়ায় কাকে পাঠানো হোল ? নিম্নতম মন্ত্রীকেও পাঠানো হোল না। পাঠানো হোল একজন কেরাণীকে। এটা অপমান। তবু সরকার তাদের বিরাট সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সাহায্য চান, তাদের বীর জনগণের সাহায্য চান—যাদের চেয়ে বীর জগতে কেউ নেই—যাদের দেশবাসীর মুক্তির জন্য বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এদিকে হিটলার ড্যানজিগকে সুরক্ষিত করছে ব্রেসলাউ এবং বার্লিনের মত। আমাদের সরকারের কোন জ্ঞান নেই তাই তাঁরা বুঝছেন না যে সারা পৃথিবী আজ পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করেছে এবং স্বাধীনতা আজ বিপদগ্রস্ত।"

ইতিমধ্যে ২৩শে জুলাই মস্কো বৃটেন ও ফ্রান্সের একটি সম্মিলিত মিলিটারী মিশনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠানোও হোল, কিন্তু জেনারেল গামেলিন্ বা লর্ড গর্ট কাউকে পাঠানো হোল না। যাদের পাঠানো হোল তাদের হাতে পাকা কথা কইবার ক্ষমতাও দেওয়া হোল না। সুতরাং ফল কিছু হোল না। সোভিয়েটএর চেষ্টা একটির পর একটি ব্যর্থ হতে লাগলো।

পোল-সরকারের কুচক্র

তারপর সোভিয়েট যখন জানলে যে সোভিয়েটএর সীমান্ত যখন জার্ম্মানীর সংলগ্ন নয় তখন পোলাণ্ডের বিপদে সাহায্য করতে হলে সোভিয়েট বাহিনীকে জার্ম্মান বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার জন্য পোলাণ্ডের ভিতরে যেতে দেওয়া দরকার—যেমন বৃটেন ও আমেরিকা ১৯১৮ সালে ফ্রান্সে বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল। তার উত্তরে ফ্রান্স ও বৃটেন জানাল যে পোলাণ্ড সোভিয়েটের সাহায্য চায় না অর্থাৎ পোলাণ্ডের শক্তি না থাকা সত্বেও তাকে সাহায্য নিতে না দেওয়ার ফলেই পোলাণ্ডকে অতগুলো জীবন হারাতে হয়েছিল। সোভিয়েট দেখলে যে পোলাণ্ডকে শেষ করে জার্ম্মানী রুশসীমানায় না আসা পর্য্যন্ত জার্ম্মানবাহিনীকে বাধা দেওয়া যাবে না ; তার মানে সোভিয়েট নিজের বিপদজনক অবস্থাকে বেশ ভাল ভাবেই টের পেলে। রুশিয়া বুঝলে যে জার্ম্মানীর সমস্ত শক্তিকে সে রুশিয়ার বিরুদ্ধে লাগাতে চায়।

সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি

লেনিন বলেছিলেন যে নবজাত সোভিয়েটকে যদি ধনতন্ত্র-বেষ্টিত অবস্থার মধ্যে বাঁচতে হয় ও উন্নতি করতে হয় তাহলে তার চারিপাশের সমস্ত রাজ্যগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যসম্পর্ক রাখতে হবে। তা সে সব দেশ তথাকথিত গণতান্ত্রিক হোক, বা আধা-ফ্যাসিষ্ট হোক বা পুরা ফ্যাসিষ্ট হোক। তবে তারা সব চুক্তি ভেঙ্গে যদি আক্রমণ করে, তার জন্য আত্মরক্ষার উপায়ও ভাল ভাবে করে রাখা চাই। তাই বলেই যে সোভিয়েট ফ্যাসিজম্ বিরোধী হবে না এমন কথা নেই। সুতরাং বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি করার আশা যখন আর থাকলো না, তখন সে যদি জার্ম্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিটা আরো ভাল করে ঝালিয়ে নেয় নিজের নিরাপত্তারক্ষার আশায়—তাতে কিছু বলার নেই। কার্য্যতঃ হোলও তাই। এদিকে টাইমস্ কাগজ ছাপলে, "জার্ম্মানীর জনগণ যদি বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে তাহলে নাৎসি দলকে তারা বাধ্য করবে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, পোলাণ্ডকে একটি পুত্তলিকা রাষ্ট্র করতে—কারণ সেই ভাবেই ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।" এটা বোঝাই যায় যে ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা মানে সোভিয়েটকে ধ্বংস করা। তাই জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া সোভিয়েটের আর কোন উপায় থাকল না। মিঃ চার্চ্চিল তাই ১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল বল্লেন, "কি করে আমরা সোভিয়েটের সহযোগিতা আশা করতে পারি ? নিশ্চয়ই তার সদিচ্ছার ওপর আমাদের কোন দাবী নেই এবং তারও আমাদের ওপর নেই।"

রুশ-জার্ম্মান চুক্তি

জুলাইএর শেষের দিকে জার্ম্মানী নিজেই সোভিয়েটএর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দিলে। মস্কো থেকে এই অনাক্রমণ চুক্তি করার ঠিক দুদিন আগে বৃটেনকে জানানো হোল যে যদি চুক্তি না দুদিনের মধ্যে করে, তাহলে সোভিয়েট জার্ম্মানীর সঙ্গে চুক্তি করবে। কোন ফল না হওয়ায় চুক্তি হয়ে গেল ২৩শে আগষ্ট। নিউজ ক্রনিকল্ লিখলে, "ষ্ট্যালিন যখন শেষ পর্য্যন্ত দেখলেন যে পোলাণ্ড ও পাশ্চাত্যশক্তিরা সাম্যমূলক সহযোগিতা চায় না, তখনই বাধ্য হয়ে তিনি জার্ম্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করলেন। ..." এর পর দেখা যাবে এই চুক্তির দ্বারা কার কি সুবিধা হোল।

সাময়িকী

বাঙ্গালার দুরবস্থা—

গত বৎসর অর্থাৎ ১৩৫০ সালে বাঙ্গালা দেশের উপর দিয়া যে দুর্ভিক্ষ চলিয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণনা এখন নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু নানা দিক হইতে যতই আমাদের বলা হইতেছে যে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই, ততই সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ বাড়িয়া যাইতেছে। গত বৎসর শ্রাবণ ভাদ্রমাসে চালের মণ ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে বহু খাদ্যসামগ্রী সুলভ থাকায় লোক সেই সকল সুলভ খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে চাউলের মণ ১৬।০ হইলেও লোকের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। চাউল, চিনি ও আটাই মাত্র বাঁধা দরে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যাইতেছে। তাহার সকল স্থানগুলিতে আবার বাঁধা দরে লবণ বা গুড় পাওয়া যায় না। কেরোসিন তৈল ও কয়লা স্থানে স্থানে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে পাইবার সুবিধা নাই। এই সকল কারণে প্রত্যেক লোককেই লবণ, গুড়, কেরোসিন ও কয়লা প্রায়ই অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। তাহা ছাড়া তরি-তরকারী ও মাছের মূল্য এত বাড়িয়াছে যে সাধারণ লোকের পক্ষে সে সকল জিনিস ক্রয় করাই অসম্ভব হইয়াছে; আলু পাঁচ সিকা সের এবং যে কোন তরকারী ৮ আনা সেরের কম দরে পাওয়া যায় না। নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশের লোককে যে কখনও তিন টাকা সের দরে মাছ কিনিয়া খাইতে হইবে, ইহা সকলেরই কল্পনাতীত ছিল। দুধও বাজারে পাওয়া যায় না—যদি বা পাওয়া যায়, তাহা ১২ আনা সের। এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে ক্ষীণজীবী হইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। চিকিৎসকগণ বলিতেছেন, কুইনাইন, সল্ট প্রভৃতি ঔষধের অভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হওয়ায় লোক মারা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, না খাইয়া লোক ক্ষীণজীবী হইয়া মারা যাইতেছে। ইহার উপর অতি বৃষ্টি ও বন্যায় হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার বহু স্থান বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়াছে। ফসলও অনেক স্থানেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতিবৃষ্টিতে নানা স্থানে তরি-তরকারীর চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বাঙ্গালার সাধারণ লোকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের সময় সকলে নিজ নিজ সঞ্চয় নষ্ট করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়াছে—এবার তাহারা কি করিবে। কাজেই এখন হইতে লোকের একাহার আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধ কবে মিটিবে, তাহা জানা নাই। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পূর্ব্বে যদি যুদ্ধের মধ্যেই লোক মরিয়া যায়, তবে কাহাদের জন্য বা কাহাকে লইয়া পুনর্গঠন করা হইবে?

পূজার কাপড়ের বাজার—

পূজার সময় কলিকাতার বাজারে এবার যেরূপ কাপড়ের অভাব দেখা যাইতেছে, সেরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ গৃহস্থ পূজার সময় সারা বছরের পরিধানের কাপড় সংগ্রহ করিয়া থাকেন—ধনী লোকেরা পূজার সময় দামী পোষাক কিনিলে ও সাধারণ লোক আত্মীয় স্বজনকে ব্যবহারের উপযোগী নিজ নিজ সাধ্যমত মোটা কাপড়ই দেন। কিন্তু বাজারে দোকান সমূহে কাপড় নাই। মাড়োয়ারী বণিক সভা এ বিষয়ে ভারত সরকারের বস্ত্রবিষয়ের কমিশনারকে জানাইয়াছেন—সরকারী হিসাবে বাঙ্গালার বস্ত্রের চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ ৮০ কোটি গজ কম বলিয়া ধরা হইলেও আসল ঘাটতি আরও অনেক বেশী। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক গড়ে জন প্রতি ১৬ গজ কাপড় বৎসরে ব্যবহার করিলেও বাঙ্গালার লোক তদপেক্ষা বেশী কাপড় ব্যবহার করিত। এখন বাঙ্গালার চাহিদা জনপ্রতি বৎসরে ১২ গজ মাত্র ধরা হইয়াছে, গত কয়েক মাসে অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় যে বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও চীনে প্রেরণ করা হইয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় কাপড়ের অভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য পূজার বাজারে লোক দোকানে যাইয়াও কাপড় পাইতেছে না, ইহার প্রতীকার কে করিবে?

রেশনের দোকানে অখাদ্য—

নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য যে সকল দোকান খোলা হইয়াছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সেই সকল দোকান হইতে যে মাল সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা মানুষের আহারের অনুপযুক্ত। এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। চাউলের মধ্যে অর্দ্ধেক ভাঙ্গা, আটা দুর্গন্ধযুক্ত এবং চিনির সহিত বালি ভেজাল চলিতেছে। চায়ের কাপের তলায় প্রত্যহই বালি পাওয়া যায়। আটা ও চাল খারাপ বলিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে অধিকাংশ লোক উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইতেছে। এত সরকারী পরিদর্শক কর্ম্মচারী সত্ত্বেও কি ইহার কোন প্রতীকার করা সম্ভব হইবে না?

ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যত—

সম্প্রতি বাঙ্গালায় কাচ প্রস্তুতকারী সমিতির বার্ষিক সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন 'ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যত' সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এখন হইতে সকলের চিন্তা করা প্রয়োজন। ১৯১৪ সালের

মহাযুদ্ধ শেষ হইলে যে ভাবে গভর্ণমেণ্ট বিদেশী মাল এদেশে আনিবার সুবিধা করিয়া দিয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে নষ্ট হইতে দিয়াছিলেন, এবারও যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট সেই নীতি অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। যে সকল ভারতীয় শিল্প মহাযুদ্ধের মধ্যে অতি কষ্টে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় যদি তাহারা নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহা ভারতের পক্ষে সত্যই দারুণ দুর্দ্দশার পরিচায়ক হইবে। কাচ ব্যবসায় সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যদি রক্ষা-নীতি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের পর এদেশে কোন কাচের কারখানাই টিকিয়া থাকিবে না।

মৎস্যের চাষ শিক্ষাদান—

কলিকাতার বাজারে মাছের দাম তিন টাকা সের হওয়ায় ক্রমে মৎস্যের চাষের প্রতি সকলের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সরকারী মৎস্য বিভাগ নানা জেলায় মাছের চাষ বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও এম-এ ক্লাসে 'মৎস্যের চাষ' একটি বিষয় স্থির করিয়া পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষাদানে উদ্যোগী হইয়াছেন। এদেশে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণকে প্রায়ই চাকুরী খুঁজিতে দেখা যায়, কেহই জীবিকা-হিসাবে কৃষিকার্য্য গ্রহণ করেন না। মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে যাহাতে ঐ একই প্রথা প্রবর্ত্তিত না হয়, প্রথম হইতে সেইরূপ ব্যবহারিক শিক্ষা বেশী পরিমাণে দিবার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সরিষার তেল—

সরিষার তেল বাঙ্গালা দেশের লোকের একটি প্রধান খাদ্য। অথচ মহাযুদ্ধের জন্য এদেশে সরিষার তেল প্রায় দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। দেড় টাকা সের দিয়াও বাজারে ভাল খাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে সরিষার চাষ বাড়াইবার জন্য প্রায়ই চেষ্টা হইয়া থাকে। তথাপি কেন যে সরিষার তেলের এই অভাব তাহা বুঝা যায় না। বহু বাঙ্গালী সরিষার তৈল ছাড়িয়া তিল তৈল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পর আর কি হইবে?

কাগজের অভাব—

কাগজের অভাব শুধু সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বই প্রভৃতি প্রকাশের পথে বাধা দিতেছে না—ছাত্রগণ কাগজের অভাবে লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। এ বিষয় লইয়া ঢাকায় শিক্ষকগণের সহিত ছাত্রদের হাতাহাতিও হইয়া গিয়াছে। চাল, চিনির মত কণ্ট্রোল দরে ব্যাপক ভাবে ছাত্রদের ভিতর কাগজ সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরুর মুক্তির দাবী—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মুক্তি দাবী করিয়া আমেরিকা নিউইয়র্কের একশত খ্যাতনামা লোকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র বৃটিশ সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ পত্রের উত্তরে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জানাইয়াছেন—পণ্ডিত নেহরুকে মুক্তি দেওয়া না দেওয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন—ঐ ব্যাপারে বৃটীশ গভর্ণ-মেণ্টের কিছু করিবার নাই। মজার উত্তর বটে।

পরলোকে নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—

বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি-ই নাট্যবিদ্যাভারতী মহাশয় গত ১৭ই ভাদ্র সকাল ৭টার তাঁহার সিউড়ীর বাড়ীতে অকস্মাৎ পরলোক-গমন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিপজ্জনক বেরি-বেরিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নানাস্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনেও কোন ফল হয় নাই। ইহার উপর পুনঃ পুনঃ প্লুরিসীর আক্রমণ এবং রক্তের চাপ বৃদ্ধি তাঁহার অবস্থা আশঙ্কা-জনক করিয়া তুলিয়াছিল। প্রায় একমাস পূর্ব্বে তাঁহার জ্বর হয়। বহু চিকিৎসাতেও জ্বর উপশমিত হয় নাই। সেই জ্বরেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। রায় বাহাদুরের পিতা যাদবলাল আপন অধ্য-বসায়, উদ্যম, সততা ও পরিশ্রম সাফল্যে বিশাল সম্পত্তি ও বিপুল অর্থসম্পদের অধিকারী হন। নির্ম্মলশিব বাবু ধনীর সন্তানরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা কারণে কৈশোরে স্কুল কলেজের শিক্ষা তাঁহার অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তিনি আপনার অক্লান্ত চেষ্টায় যৌবনেই ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে অধিকার অর্জ্জনপূর্ব্বক শিক্ষিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কিশোর বয়সেই তিনি যেমন অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হন, তেমনই কবিতা ও গল্প লিখিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহাদের লাভপুরের বাড়ীর যে প্রকোষ্ঠে তিনি সমবয়সী সঙ্গীদের লইয়া নাটকাভিনয়ের খেলা খেলিতেন, সেই ঘরখানি আজিও "নাটকের ঘর" নামে পরিচিত। স্থানীয় সংবাদপত্র 'বীরভূম বার্ত্তা'য় তাঁহার দুই একটী কবিতা ও 'বীরভূমি' মাসিকপত্রে কয়েকটী গল্প প্রকাশিত হইলেও তিনি "বীর-রাজা" নাটকখানি লইয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। বীররাজা মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল। অতঃপর "নবাবী আমল" নাটক, "বাহাদুর" গীতিনাট্য, "রাতকানা" "মুখের মত" "রূপকুমারী" "ভুলের খেলা" প্রভৃতি প্রহসন কলি-কাতার ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের "এ্যামে-চার থিয়েটারে" বহুবার অভিনীত হইয়াছে এবং প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। অনাবিল হাস্যরসের উৎস "রাতকানা" তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। "ভারতবর্ষে" তাঁহার অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটী গল্প তিনি "প্রভাত-স্বপ্ন" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকটী গল্প আজিও অপ্রকাশিত আছে। প্রথম যৌবনে লিখিত তাঁহার একখানি উপন্যাসের কিয়দংশ অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। নাট্যকার রূপে যেমন, সুঅভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক রূপেও তেমনই, তিনি রসিক সমাজের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "মুখচোরা" নামে আর একটী প্রহসন কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরভূমের বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। লাভপুরের যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, গণেশ চতুষ্পাঠী ও দাতব্য চিকিৎসালয় আদি তাঁহার সম্পাদকতায় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়াছে। সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, বীরভূম জেলা বোর্ডের সভ্য ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং লাভপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতির কার্য্যে তিনি জনসাধারণ ও বাঙ্গালা সরকারের নিকট

সমভাবে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উপাধি দানের পূর্বেই বীরভূমে আহূত সপ্তদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদে বরণ করিয়া বীরভূমের শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বহু সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ পর পর তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও এম-বী-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। পণ্ডিতসমাজ হইতে তিনি "নাট্যবিত্তাভারতী" ও "কবিভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

গান্ধী জিন্না মিলন ও শ্রীমতী পণ্ডিত—

গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় বঙ্গীয় ছাত্রসমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতার সাংবাদিকগণের এক সভায় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সকলকে বলিয়াছেন—যতদিন না গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ হয়, ততদিন কেহ যেন সে সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করেন। কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সাক্ষাতের ফল সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন উত্তর শ্রীমতী পণ্ডিত দেন নাই।

কলিকাতার পুরাতত্ত্ব রক্ষা—

কলিকাতা টাউন হলের বাড়ীটি যখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রয়োজনে দখল করেন, তখন ঐ গৃহে কলিকাতার যে সকল প্রাচীন চিত্র, দলিল প্রভৃতি রক্ষিত ছিল, সেগুলি বাড়ীর মালিক কলিকাতা কর্পোরেশনকে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলেন। কর্পোরেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জিনিষগুলি লইতে বলিলে বিশ্ববিদ্যালয় তাহা করিতে সম্মত হন নাই। শেষ পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সেগুলি রাখার ব্যবস্থা হয়; এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও স্থানাভাব হওয়ায় সেগুলি রাখার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। মফঃস্বলে কোন বড় বাড়ীতে কি সেগুলি রাখার ব্যবস্থা হইতে পারে না?

রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী—

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য সার লক্ষ্মীপতি মিশ্র সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ৭ বৎসরে ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারতের রেলসমূহে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য উচ্চ প্লাটফরম, পুল, ভাল পাইখানা, বিশ্রামের অতিরিক্ত স্থান, অধিক পরিমাণে জল সরবরাহ, তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান, টিকিট বিক্রয়ের জন্য অধিকতর কেন্দ্র, যাত্রীদের বসিবার জন্য অধিক পরিমাণ স্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু বর্তমানে রেলে সকল শ্রেণীর যাত্রীদিগকে যে সকল কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সকলের প্রতীকার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এই সকল দুর্দ্দশা ভোগের পর যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারাই সুখভোগ করিবে। কয়জনের ভাগ্যে সেই সুখভোগ করা সম্ভব হইবে, তাহা কে জানে?

শিক্ষা বিভাগের ঔদাসীন্য—

গত কয় বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার্থী বালিকাদের জন্য নূতন তিনটি বিষয় স্থির করিয়া দিয়াছেন—(১) সঙ্গীত (২) গৃহস্থালী ও (৩) স্বাস্থ্য নীতি। কিন্তু এই সকল বিষয় শিক্ষাদানের যোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অবহিত করিয়াও কোন লাভ হয় নাই। কে তবে এই সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে?

সার জিয়াউদ্দীন ও শিক্ষা ব্যবস্থা—

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডক্টর সার জিয়াউদ্দীন আহমদ বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরীক্ষার্থীদের জন্য বর্তমানে যেভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, তাহাকে লটারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা বা পরীক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা কোন শিক্ষাব্রতীই সমর্থন করে না। অথচ ইহার পরিবর্তনের জন্যও কেন যে সংঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্টা হয় না, তাহা বুঝা যায় না।

ইষ্টার্ণ-কমাণ্ড ও খাদ্যসমস্যা

ইষ্টার্ণ-কমাণ্ড নামক যে সুবৃহৎ সৈন্যবাহিনী বর্তমানে বাঙ্গালা দেশে আছে, তাহার কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্য-দ্রব্য নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একদিন কলিকাতার সাংবাদিকগণকে তাঁহাদের কার্য্য দেখান হইয়াছে। এই ভাবে এখন সকলকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইবার চেষ্টা করেন, তবে আজিকার এই দারুণ অভাব মিটিবার উপায় হইবে।

ভয়াবহ বন্যা—

উড়িষ্যার পুরী জেলায় ও উত্তর বিহারের কয়েকটি জেলায় বন্যার পর বাঙ্গালাদেশেরও ৩৪টি জেলায় ভীষণ বন্যা হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় কিয়দংশের শস্য বন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায়ও বন্যায় ক্ষতি হইয়াছে। বন্যা যেন এই অঞ্চলে বার্ষিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, অথচ ইহার প্রতীকারের কোন উপায় অবলম্বিত হইতে দেখা যায় না। ডক্টর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা বলিয়াছেন দামোদর বন্যার প্রতীকার করা না হইলে শীঘ্রই একদিন কলিকাতা সহর বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। বাঙ্গালা নদীমাতৃক দেশ—সেই নদীগুলি এখন মজিয়া যাইতেছে—সেগুলিকে পুনরায় বহতা করার ব্যবস্থা না করিলে এই সকল বন্যারও কোন প্রতীকার হইবে না এবং আমরা বৎসর বৎসর এই দুর্ভোগ ভুগিতে থাকিব।

ঢাকায় বালিকাদের সাফল্য—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে তিনটি বালিকা ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরাজীতে কুমারী করুণা গুপ্ত, দর্শনে কুমারী উষারাণী মুখোপাধ্যায় ও অর্থনীতিতে মীরা আইচ প্রথম হইয়াছেন, বালিকারা এখন সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই বালকদের অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় সাফল্য অর্জন করিতেছেন।

গান্ধী-বড়লাট পত্রালাপ—

মহাত্মা গান্ধী মুক্তিলাভের পর গত ১৫ই জুলাই পাঁচগণি হইতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহার সহিত ২খানি পত্রের আদান প্রদান হইয়াছে। শেষ পত্রে লর্ড ওয়াভেল ১৫ই আগষ্ট গান্ধীজিকে জানাইয়াছেন যে যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতে 'জাতীয় গভর্ণমেণ্ট'

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে শাসন যন্ত্রের কোন-রূপ পরিবর্ত্তন সাধন করার বৃটীশ গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা নাই। ইহার পর গান্ধীজিকে মিটমাটের চেষ্টায় বিরত হইতে হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলায় চাউলের অভাব—

মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বত্র চাউলের দারুণ অভাব হওয়ার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (উচ্চতর পরিষদ) এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার পর ভোটে সরকার পক্ষ জয়লাভ করেন। জেলার মফঃস্বলে কোথাও দোকানে চাউল পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ জানাইয়াছেন যে সহরের দোকানে সাড়ে ছয় আনা সের দরে চাউল পাওয়া যায়। ইহার পরও যদি কর্ত্তৃপক্ষ চাউল সরবরাহের চেষ্টা আরম্ভ করেন।

বহরমপুরে আটার অবস্থা—

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের দোকানগুলিতে অত্যন্ত খারাপ আটা বিক্রীত হইতে দেখিয়া বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান সরকারী গুদামের ১৩ হাজার মণ আটা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটর অনুমতি লইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিষয়টির আলোচনা করিতে দেওয়া হয় নাই। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে কোন কোন খুচরা বিক্রয়ের দোকানের আটা খারাপ ছিল বটে, কিন্তু সরকারী গুদামের সব আটা খারাপ ছিল না।

লবণের অভাব—

বাঙ্গালা দেশের অনেক জেলাতেই লবণের মূল্য মধ্যে মধ্যে এক টাকা সের হইতে দেখা যাইতেছে। যে সময়ে লবণ আমদানী হয়, সে সময়ে হয় ত ২।১ দিন ৪ আনা সের দরে লবণ পাওয়া যায়; সে সময়ের পর আবার বাজারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ হয়। লবণ ছাড়া বাঙ্গালীর সংসার এক বেলাও চলে না। কাজেই লবণের অভাবে দরিদ্র জনসাধারণের কিরূপ কষ্ট হইতেছে তাহা বলার প্রয়োজন নাই। অথচ করাচীতে প্রচুর লবণ জমা হইয়া আছে—গভর্ণমেণ্ট তাহা রেলে আনিবার অনুমতি দিলেই এখানে অনায়াসে ৩ আনা সের দরে লবণ বিক্রীত হইতে পারে। বাঙ্গালার সমুদ্র তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহেও লবণ প্রস্তুত করার বাধা আছে। তাহা দূর করা হইলে, অন্ততঃ কতকটা লবণ এ দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে।

বাঙ্গালায় দুগ্ধ সমস্যা—

১৯৪১ সালে কলিকাতার বাজারে ৪ আনা সের দরে দুধ পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন ১২ আনা সের দিয়াও কলিকাতার লোক ভাল দুধ সংগ্রহ করিতে পারে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের কৃষি-মন্ত্রী নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী মারা গিয়াছে—সৈন্য সমাবেশের ফলে মাংসের জন্য গরু হত্যা করা হইয়াছে…জনসাধারণও গোপালনে পূর্ব্বের ন্যায় অবহিত না থাকায় বাঙ্গালায় গাভীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এই সকল কারণ একত্র হইয়া বর্ত্তমানে দুধের বাজার এইরূপ করিয়া তুলিয়াছে। পশু খাদ্যের মূল্যও মানুষের খাদ্যের মূল্যের মত ৩,৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে দেশবাসী সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া এ অবস্থার প্রতিকারের উপায়ান্তর নাই। আবার যদি প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ দুগ্ধ সমস্যা মিটাইবার জন্য প্রত্যেকে গোপালন আরম্ভ করেন, তবেই বাঙ্গালার দুগ্ধ সমস্যার সমাধান হইবে।

বেহালার বামাচরণবাবু—

বিগত জন্মাষ্টমীর দিন বাংলার স্বনামখ্যাত সঙ্গীতনায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি ১২৬৯ সালে রাওয়লপিণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরিয়া পনের বৎসর হইতেই সঙ্গীত সাধনা করেন। তৎকালে মেটিয়া-বুরুজে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি সাহেবের দরবারে এক বিরাট সঙ্গীতের আসর ছিল। বিখ্যাত ধ্রুপদী তাজ খাঁ ও আহমদ খাঁর কাছে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করেন। বামাচরণবাবুর কণ্ঠের



বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশিষ্ট্য এমনই ছিল যে ওস্তাদরা তাঁহাকে বলিতেন—"আল্লানে তুম্ কো ধ্রুপদকা ওয়াস্তে বানায়া"—আবার খেয়াল বা টপ্পা শুনিয়াও অনুরূপ উক্তি করিতেন। আলি বক্স ও লছমীনারাণ বাবাজীর কাছে তিনি তান, লয় ও সুরের ভেদজ্ঞান ও খেয়াল শিক্ষা করেন।

মেয়েদের প্রস্তুত কাগজ—

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী মজুমদারের চেষ্টায় ও কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত এক বৎসর কাল ৯৩।১এ বৌবাজার ষ্ট্রীটে একটি কারখানায় বহু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মহিলাকে হাতে কাগজ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিক্ষিতা মহিলাদের প্রস্তুত কাগজ—নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের হওয়ায় কাগজগুলি সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বিক্রয় হইয়া যায়। কাগজের এই মহার্ঘতার দিনে এক দল মহিলা যদি এই শিল্প দ্বারা আত্মনির্ভর হইতে পারেন, তবে তাহা কম লাভের কথা নহে।

চীনা সংস্কৃতি প্রচার—

চীনাদেশীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ ভারতে চীনা ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য ভারতের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০টি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যেক বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক ১৫০০ মার্কিণ ডলার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে ৫টি করিয়া বৃত্তি দান করা হইয়াছে। চীনা গভর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

যাতায়াতের অসুবিধা—

কলিকাতা সহরে ও সহরতলীগুলিতে যাতায়াতের কিরূপ অসুবিধা ও কষ্ট হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাসের সংখ্যা কম হওয়ায় ও পেট্রল সরবরাহ হ্রাস পাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। সে জন্য কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্স' ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন—সরকার এ-আর-পি'র জন্য যে বাসগুলি আটকাইয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি ফেরত দিন এবং তাহাদের জন্য অধিক পেট্রল দিবার ব্যবস্থা করুন। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য লোকজনকে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া সরকারের এ বিষয়ে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

'শত্রুকে ফাঁকি দিতে যাইয়া ক্ষতি'—

জাপানী শত্রুর আক্রমণ যখন আসন্ন হইয়াছিল, তখন ভারত গভর্ণমেণ্ট শত্রুকে ফাঁকি দিবার জন্য বহু নৌকা, বাইসাইকেল, গাড়ী ও হাতী নষ্ট করিয়াছিলেন। সেই সকল জিনিষের ক্ষতিপূরণ বাবদ এপর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অবশ্য যেসকল জিনিষ পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব হইবে, সেগুলি বিক্রয় করিয়া পরে ঐ ক্ষতির কিয়দংশ পূরণ করা হইবে।

দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে দান—

কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার স্বর্গত পিতা সতীশচন্দ্র সেনের নামে নিজ গ্রাম হুগলী জেলায় গুপ্তিপাড়ায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য হুগলী জেলাবোর্ডের হাতে ৬০ হাজার টাকা মূল্যের বাড়ী ও যন্ত্রপাতি এবং ৪০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। দাতা শতং জীবতু।

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ—

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ গত ২৬শে আগষ্ট সকালে কলিকাতায় দেহরক্ষা করিয়াছেন—সংসার আশ্রমে তিনি ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করেন এবং ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যায় সরকারী চাকরী করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করিয়াছিলেন। বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মেডিকেল ইনিষ্টিটিউসন নামক স্কুল ও হাসপাতাল তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি বহুদিন হইতে ধর্মজীবন যাপন ও ধর্মপ্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং ২ বৎসর পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। স্বামী ভোলানন্দ গিরির সংস্রবে আসার পর হইতে তিনি অধিকাংশ সময় জনসেবা কার্য্যে ব্যয় করিতেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়।

সমাবর্ত্তন উৎসবে উপদেশ—

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডক্টর বি-বি-দে বর্ত্তমানে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল। গত ২৪শে আগষ্ট মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইলে তিনি যুবক ছাত্রগণকে বলিয়াছেন—"আজ সমগ্র বিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, এই ধ্বংসরাশির মধ্য হইতেই নূতন জগতের জন্ম হইবে। সময় কঠিন বটে, কিন্তু হাল ছাড়িলে চলিবে না। দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিরাই জীর্ণ অতীতের জন্য শোক করে। কিন্তু যৌবনের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। তাহার উদ্দেশ্য স্থির, চেষ্টা একাগ্র। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানে। অতীতের অবসান ঘটাইয়া শান্তি ও প্রগতির যুগ প্রবর্ত্তনের জন্য যুবকগণ, অগ্রসর হও।" আশাবাদী ডক্টর দে'র এই উপদেশের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

বস্ত্র শিল্প বিদ্যালয়—

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিল্প গবেষণা কমিটী আমেদাবাদ সফর করিয়া তথায় একটি বস্ত্র শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যদি ৫০ লক্ষ টাকা দেন, তাহা হইলে আমেদাবাদের মিল মালিক সমিতি ৫০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই কার্য্যে অর্থের অভাব হইবে না—কারণ এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আজ কেহই অস্বীকার করেন না।

গোল আলুর অভাব—

বাঙ্গালা দেশে যে আলু উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা বাঙ্গালার চাহিদা মিটান যায় না। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ আলু এদেশে আমদানী করা হইত, এখন আর তাহা সম্ভব হয় না। বিহার, আসাম ও মাদ্রাজ প্রদেশ পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে প্রচুর আলু পাঠাইত। বর্ত্তমানে ঐ সকল দেশেও আলুর চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে আলু প্রেরণ বন্ধ করিয়াছেন। ফলে বাঙ্গালা দেশে এক টাকা সের দরে লোককে আলু ক্রয় করিতে হইতেছে। বাঙ্গালা সরকার উক্ত ৩টি প্রদেশের নিকট আলু ভিক্ষা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। বিহার ও আসাম সরকার আলু পাঠাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। মাদ্রাজ সরকার আগষ্ট মাসে ৫ শত টন মাত্র আলু পাঠাইয়াছেন। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কতটুকু?

তরী-তরকারীর অভাব—

১৩৫০ সালের আষাঢ় শ্রাবণ মাসে চাউলের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলেও বাঙ্গালা দেশে তরী-তরকারী সুলভ থাকায় লোক ভাতের পরিবর্ত্তে অধিক পরিমাণে তরকারী খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু ১৩৫১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তরকারীর দাম ৪ গুণ বাড়িয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের দুশ্চিন্তার সীমা নাই। গভর্ণমেণ্টের 'ফসল ফলাও' আন্দোলনের এত প্রচার সত্বেও বাজারে তরি-তরকারীর আমদানী অত্যন্ত কম—ফলে তাহাদের দাম অত্যন্ত চড়া। এই অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ৩ হাজার বিঘা জমী লইয়া নৈজদের জন্য তরকারীর চাষ করিতেছেন। সেই চাষের খরচ কিরূপ হইবে, তাহা

অবশ্য আমাদের জানা নাই। যাহা হউক, বাজারের তরকারী যদি সৈন্যদের জন্ত ক্রয় করা না হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোক হয়ত কিছু সুলভে তরকারী পাইবার আশা করিতে পারে।

নৌকাযোগে খাদ্য প্রেরণ—

যুদ্ধের জন্ত রেলের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় রেলযোগে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ এখন একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্ত বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমান বৎসরে ১২ হাজার বড় মালবাহী নৌকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার নদীপথগুলি অধিকাংশ স্থানেই মজিয়া গিয়াছে। বর্ষাকাল ছাড়া অন্ত সময়ে সে সকল জলপথে নৌকা চলে না। এ অবস্থায় নদী পথগুলিও সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। তাহার ফলে মজা নদী বহতা হইলে দেশ প্রচুর লাভবান হইবে। যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার মফঃস্বলে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—

গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে ১২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে মোট ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও বহির্বাণিজ্য যে কমে নাই, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

বাঙ্গালায় লবণের অবস্থা—

বাঙ্গালা দেশে বৎসরে ৯৩ লক্ষ টন লবণের প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে বাঙ্গালার লবণের কারখানাগুলি বৎসরে ৩০ হাজার টন লবণ প্রস্তুত করে এবং কুটীর শিল্প মারফত ৯ লক্ষ টন লবণ প্রস্তুত হয়। বাকী লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। সেইজন্ত লবণ সমুদ্রের ধারে বাস করিয়াও এ বৎসর বাঙ্গালীকে দেড় টাকা সের দরে লবণ ক্রয় করিতে হইয়াছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

জমীদারদের সুদিন—

বাঙ্গালা দেশের বহু জমীদার নিজ নিজ জমীদারী পরিচালনা করিতে অসমর্থ হইয়া ও ঋণগ্রস্ত হইয়া জমীদারীগুলির পরিচালনভার গভর্ণমেন্টের কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে জমীদারীর আদায় পূর্ব্ব বৎসরের দ্বিগুণ হওয়ায় ১৩টি জমীদারীর মালিকগণ নিজ নিজ জমীদারী ফেরত লইয়াছেন। ঐ ১৩টি জমীদারীর বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা। দুর্ভিক্ষের বৎসরে এইভাবে এক সম্প্রদায় বিশেষ লাভবান হইয়াছেন।

রাজবন্দীর সংখ্যা—

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন জানাইয়াছেন যে গত ১৪ই জুলাই তারিখে বাঙ্গালা দেশের মোট ১২৬৯ জন দেশসেবক ভারতরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। শুনা গিয়াছিল, গভর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার জন্ত একজন বিশেষ বিচারকও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিচারের ফল কিছুই জানা যায় নাই।

পরলোকে শরৎকামিনী দেবী—

দিনাজপুর বালুবাড়ীর ৺ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী শরৎকামিনী দেবী গত ৬ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় (৫ কন্যা ও তিন পুত্র রাখিয়া প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে) দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় পুণ্যবতী ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। কলিকাতা ছোট আদালতের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা।

পরলোকে বিলাসচন্দ্র সেন—

বরিশাল জেলার গুঠিয়া গ্রাম নিবাসী বিলাসচন্দ্র সেন গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বগ্রাম গুঠিয়ায় তাঁহার পিতার নামে মহেশচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন (উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়) স্থাপনা করেন এবং আজীবন তাহার সেক্রেটারী থাকিয়া স্কুলটিকে একটি আদর্শ শিক্ষায়তনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বরিশাল জেলার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার, নলকূপ খনন এবং বহুবিধ কল্যাণকর কার্য্যে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।



বিলাসচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত কমল বসু—

শ্রীযুক্ত কমল বসু ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের বাঙ্গালা বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার জন্ত সম্প্রতি লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলিকাতা কেন্দ্রের সহকারী প্রোগ্রাম পরিচালক ছিলেন। ইনি সুবক্তা ও সুলেখক এবং বেতারের ছোটদের আসর স্থাপয়িতা, ছোটদের প্রথম বন্ধু গল্পদাদুর (৺যোগেশচন্দ্র বসু) জ্যেষ্ঠপুত্র।

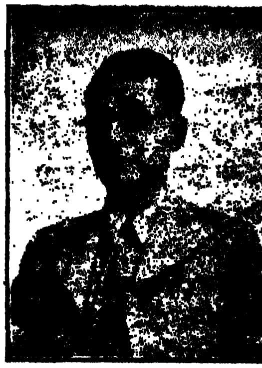
শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার—

বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ডক্টর জেঙ্কিন্স ছুটী লওয়ায় তাঁহার স্থানে হুগলী মহসীন কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ কে জ্যাকেরিয়া শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার হইয়াছেন। মিঃ জ্যাকেরিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার এই নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইবেন। তাঁহার স্থানে ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (কথা-সাহিত্যিক 'ভাস্কর') হুগলী মহসীন কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলা ঃ

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, মস্কোর গ্রীষ্মকালীন খেলাধূলার উদ্বোধন উপলক্ষে খ্যাতনামা সোভিয়েট মুখপাত্র প্রাভদা এক বিশেষ প্রবন্ধে লিখেছেন, 'The attraction of sports is one of the manifestation of patriotism and love for one's country. "Thousands of our sportsmen have distinguished themselves in the Armed services. Througout the siege of Leningard the annual races were always held, and this year they will be run over the recent battle fields."

'সামার ক্রশ কান্ট্রি রেস' মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এক মস্কো এলাকায় ৪০,০০০ হাজার উপর প্রতিযোগী যোগদান করে। তার মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক বিজয়ী হয়ে 'Ready for valour and defence bagde' অর্জ্জন করেছে।

* * * *

পৃথিবীর ক্রীড়া জগতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা এবং সম্মান বেশী। রাশিয়াতেও ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কম নয়। সোভিয়েট অল্ ইউনিয়ন স্পোর্টস কমিটি ফুটবল খেলার প্রসারকল্পে বার বছর থেকে আঠার বছর বয়সের ছেলেদের ফুটবল খেলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েট স্কুলের মারফৎ ছাত্রদের ফুটবল খেলার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে। বিখ্যাত সোভিয়েট ফুটবল ক্লাব ডায়নামো, স্পার্টাক এবং টর্পেডো এই পরিকল্পনায় যোগদান করেছেন।

ফুটবল বিদেশী খেলা হলেও বাঙ্গলা দেশের জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে। বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা ভারতের অন্য প্রদেশকে অনেকখানি অতিক্রম করেছে। কিন্তু সব থেকে দুঃখের কারণ যে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল মাঠে বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের আর পূর্ব্বের মত সম্মান নেই। প্রতিযোগিতায় জয়লাভের উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা বাঙ্গালী ফুটবল প্রতিষ্ঠানকেও অবাঙ্গালী খেলোয়াড় আমদানী করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের আর তেমন সুবিধা পাচ্ছেন না। আজ চারিদিক থেকেই রব উঠেছে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক পড়ে গেছে। তরুণ খেলোয়াড়দের খেলাধূলার উপর কোন উৎসাহ নেই। খেলা ধূলায় স্পৃহা এবং উদ্দীপনা বেশী দেখা দেয় ছাত্র জীবনে। স্কুল এবং কলেজ ছাত্রদের যদি খেলাধূলার উৎসাহ দানের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে জাতীয় সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে কোন জাতিই সক্ষম হবে না। আমাদের দেশে সঙ্গতি সম্পন্ন স্কুল কলেজ কিম্বা খ্যাতনামা প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড়দের অভাব নেই। অভাব কেবল আন্তরিক উদ্দীপনার। একার পক্ষে সম্ভব না হ'লে একত্রিত হয়ে স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কয়েকজন নাম করা ফুটবল খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ফুটবল খেলার অনুশীলনের ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারেন। ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন নামে আমাদের দেশে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই প্রতিষ্ঠান যদি বিভিন্ন স্কুলের ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা করতেন তাহলে ভবিষ্যতে ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আশা করতে পারতাম। স্কুল এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের নাম পাঠিয়ে দিয়েই কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন। প্রতিযোগিতার জন্য তাদের বিশেষভাবে তৈরী করার ব্যবস্থা নেই। অনুশীলনের প্রয়োজন তাঁরা মনে করেন না। জয়লাভের অদম্য বাসনায় আবার খেলোয়াড় ভাড়া ক'রে আনতেও দেখা গেছে। অবশ্য খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে খেলায় যোগদান করে এমন প্রতিষ্ঠানও আছে। খেলাধূলায় অন্য প্রদেশের ছাত্রদের কাছে আমাদের দেশের ছেলেদের বার বার শোচনীয় পরাজয়ও আমাদের চেতনা আনতে পারে নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ নির্লিপ্ততা কেবল তাঁদের পক্ষেই অপমানজনক নয় ভবিষ্যত দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

ক্রিকেট মরসুমে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আকর্ষণ সব থেকে বেশী। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড আগামী রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক জোনের খেলা চারদিনব্যাপী হবে। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলায় উভয় দলের দু' ইনিংস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খেলতে হবে। রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার যোগদানকারী প্রত্যেক খেলোয়াড় তার এসোসিয়েশন মারফৎ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে জানাবে সে কোন প্রদেশের পক্ষে যোগদান করবে। প্রতিযোগিতার প্রত্যেক জোনের প্রথম খেলা ১১শে ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই নূতন

ব্যবস্থা অনুযায়ী জোন ফাইনাল ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ফাইনাল ৩রা মার্চ্চ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দক্ষিণাঞ্চল :—(১) মহীশূর : মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (বাঙ্গলোর।
(২) মাদ্রাজ : হায়দ্রাবাদ (হায়দ্রাবাদ)।

পূর্ব্বাঞ্চল :—(১) বাঙ্গালা : যুক্তপ্রদেশ (কলিকাতা)।
(২) বিহার : হোলকার (জামসেদপুর)।

উত্তরাঞ্চল :—(১) দিল্লী : উত্তর ভারত (লাহোর)।
(২) দক্ষিণ পাঞ্জাব : রাজপুতানা (পাতিয়ালা)।
(৩) গোয়ালিয়র : ১নং বিজয়ী।

পশ্চিমাঞ্চল :—(১) গুজরাট : পশ্চিম ভারতদল (আমেদাবাদ)।
(২) জামনগর : মহারাষ্ট্র (পুণা)।
(৩) সিন্ধু প্রদেশ : বোম্বাই (করাচী)।
(৪) বরোদা : বিজয়ী ১নং

সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালা প্রদেশ ১৬৮-৬১ পয়েন্টে বোম্বাই প্রদেশকে পরাজিত করেছে। একমাত্র মহিলাদের সন্তরণ বিভাগেই বোম্বাই প্রদেশ বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

ওয়াটার পোলো : বাঙ্গালা প্রদেশ ৮-৩ গোলে বোম্বাই প্রদেশকে পরাজিত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বোম্বাই ঃ

কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই প্রদেশ ৬৩-৫৩ পয়েন্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে।

১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি, ৩ × ৫০ মিডলে রীলে এবং ৪ × ৫০ মিটার রিলেতে বোম্বাই প্রদেশ জয়ী হয়েছে। ওয়াটার-পোলো খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

শীল্ড খেলা ঃ

আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের পর আই এফ এ পরিচালিত কয়েকটি প্রতিযোগিতার খেলা এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটবল খেলার আকর্ষণও ফুটবল ক্রীড়ানুরাগীদের কাছে কম নয়।

গত কয়েকবছর আই এফ এ শীল্ড খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কিন্তু দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেনি। মফঃস্বল থেকে আগত ফুটবল দলের মধ্যে অনেক দলেরই শীল্ড খেলায় যোগদানের মত খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ছিল না। এইসব নিম্নশ্রেণীর ফুটবল দলের যোগদানের ফলে শীল্ড খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেকখানি নিম্নস্তরের হয়েছে। নূতন দলকে যোগদানের সুবিধা দিলে তরুণ খেলোয়াড়দেরই খেলার সুযোগ দেওয়া হয় বুঝি কিন্তু তার জন্ম আরও অনেক প্রতিযোগিতা আছে। আই এফ এ শীল্ড খেলার মত একটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় নিম্নশ্রেণীর ফুটবল দলকে খেলবার সুযোগ দেওয়ার কোন যুক্তি দেখিনা। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে কারও আপত্তি নেই কিন্তু অযোগ্যের প্রতি অহেতু এতখানি দরদ আই এফ এ-র কি কারণ থাকতে পারে তা অবোধ্য। এবারের শীল্ড খেলার সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, চ্যারিটি খেলার টিকিটের নির্দ্ধারিত মূল্যের মূল্যে বহু দর্শককে বেশী টিকিট সংগ্রহ করতে হয়েছে। ক'লকাতা সহরে বহু লোকের সমাগম হয়েছে সুতরাং খেলার মাঠে তারই যে একটা বৃহৎ অংশ সমবেত হয়ে আই এফ এ-কে বিব্রত করবে তার আর আশ্চর্য্য কি! মাঠের নির্দ্দিষ্ট আসনের তুলনায় লোকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সব দিক বিচার করেও আমরা কোন মতেই আই এফ এর টিকিট বণ্টন ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারি না। এবারের চ্যারিটি ম্যাচগুলির টিকিট সংগ্রহ করা রীতিমত একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাহিদামত সব লোকের আসনের ব্যবস্থা আই এফ এর পক্ষে সম্ভব নয় স্বীকার করি কিন্তু যারা অনুগ্রহভাজন হিসাবে খেলার পূর্ব্বাহ্নে টিকিট সংগ্রহ করেছিল তাদেরই অনেককে উচ্চমূল্যে টিকিট বিক্রী করতে দেখা গেছে। খেলার পূর্ব্বদিনে অথবা খেলার দিন সকালে আই এফ এ যদি রিজার্ভ সিটের টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা করতেন তাহলে সাধারণের চাহিদা না কমলেও লোকের অন্ততঃ বলবার কিছু থাকতো না। পূর্ব্বাপর বৎসরে এইভাবেই লোকে আই এফ এর অফিস থেকে টিকিট সংগ্রহ করে এসেছে। শীল্ড খেলার চ্যারিটি ম্যাচের রিজার্ভ সিটের টিকিট কোথায় এবং কোন সময়ে আই এফ এ জনসাধারণকে বিক্রী করবেন এরূপ কোন সংবাদ সংবাদপত্র মারফৎ জানানোর প্রয়োজনও মনে করেন নি। এরূপ ব্যবস্থাও যদি তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল তাহলে রেল কোম্পানীর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী 'ভীড়ের জন্মে আরও খেলা দেখা কমান' এরূপ বিজ্ঞাপন দিলেও প্রখর রৌদ্র, শ্রাবণের বর্ষা, লোকের হাতাহাতি, এবং ঘোড়ার লাথি উপেক্ষা করে কম দর্শকই মজা দেখার জন্ম লাইন দিত। টিকিট সংগ্রহ করতে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর এ সব হাঙ্গামার বালাই নেই এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনদেরও বোধ হয় নেই। সাধারণ দর্শকদের দুঃখ দুর্দ্দশা সেই কারণে তাঁরা অনুমান করলেও কোনদিন তাঁদের অনুভবের অভিজ্ঞতা নেই বলেই এতখানি অব্যবস্থা উপেক্ষা করেন। তাছাড়া ফুটবল দর্শকদের ভাবাবেগের গতির বেগ তাঁদের জানা আছে, শত অপমান মুছে ফেলেও তারা যে মাঠে হাজির হবে এ অভিজ্ঞতা বহুদিনের। দর্শকদের আর কত দিন এভাবে হীনতা স্বীকার করতে হবে জানি না। আই এফ এ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান তার অব্যবস্থা আমাদের জাতীয় সম্মানের পক্ষে অপমানজনক মনে করেই আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল ঃ

ফলাফল : আই এফ এ—২ : ঢাকা—০ ; দিল্লী—৩ : ইউ পি—২ ; ইউ পি—৫ : বিহার—৩ ; দক্ষিণ অঞ্চলের খেলায় হায়দ্রাবাদ ৪—২ থেকে মাদ্রাজদলকে পরাজিত করেছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

এবছরের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ১৯২০ সালে প্রতিযোগিতার

প্রথম বছরে ইউরোপীয়রা প্রথম বিজয়ের সম্মানলাভ করে। ১৯২১ সালে ভারতীয়দল প্রথম বিজয়ী হয়। ১৯২৪-২৭ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে চারবার বিজয়ী হয়ে ভারতীয়দল রেকর্ড করেছে। এপর্য্যন্ত ১২ বার ভারতীয়দল জয়ী হয়েছে। খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে ৩ বার। ১৯৫০ সালে খেলা হয়নি। ইউরোপীয়-দল জয়ী হয়েছে ৯ বার।



সমীর মিত্র

ব্যাডমিণ্টন ঃ

১৯৪৪ সালের ওয়াই এম সি এ (কলেজ ব্রাঞ্চ) সামার ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান ও ১৯৪৩ সালের উক্ত প্রতিযোগিতার ডবলস বিজয়ী। সি বি সি টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ক'রে টেবল টেনিসেও সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

ট্রেডস কাপ ঃ

গতবছরের ট্রেডস কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব ১—০ গোলে মিলন সমিতিকে পরাজিত করে এবারও ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয়েছে। ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯১৩ সালে। এরিয়ান্স ক্লাব প্রথম বছর কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। ১৯৩৮ সালে মোহন-বাগান ক্লাব প্রথম ট্রেডস কাপ পায়।

ইণ্টার-ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল ফুটবল ঃ

খুলনা দেশ ৩—২ গোলে হাওড়া জেলা স্কুলকে পরাজিত ক'রে ফাইনাল বিজয়ী হয়েছে।

মোহনবাগান বনাম বি এণ্ড এ রেলদল ঃ

রেডক্রশ চ্যারিটি খেলায় এ বছরের লীগ বিজয়ী মোহন-বাগান ক্লাব ৩—২ গোলে শীল্ড বিজয়ী বি এণ্ড এ রেলদলকে পরাজিত করে।

চিঠির জবাব ঃ

খেলাধূলা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছ থেকে যে সব চিঠি পাওয়া যায় তার জবাব যতদূর সম্ভব দেওয়া হয়। যাঁরা কোন দলগত স্বার্থ নিয়ে আত্মগোপন ক'রে চিঠি পাঠান তাঁদের চিঠি সম্বন্ধে আমরা কোন গুরুত্ব আরোপ করি না। খেলাধূলার সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়াও এই বিভাগে খেলাধূলার প্রসারকল্পে অভিমত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকে। আমরা জানি নিরপেক্ষ সমালোচনাও সকল দলের সমাদর লাভ করতে পারে না। এক পক্ষের বিরাগভাজন হতেই হবে। কোন দেশের লোকই খেলাধূলায় জয়লাভ করাটাই খেলাধূলার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে না। কিন্তু একদল হুজুগে সমর্থক দেখা যায় যাদের নীতির কোন বালাই নেই। আমাদের দেশে সেই শ্রেণীর সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী দেখছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "রাষ্ট্রবিপ্লব"—১৷৹
শ্রীশিশিরকুমার সেন প্রণীত উপন্যাস "সূর্য্য তপস্যা"—৩৲
শ্রীপ্রতিভা বসু প্রণীত উপন্যাস "মনোলীনা"—২৷৹
শ্রীপ্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "পার ঘাটের যাত্রী"—২৷৹
বনফুল রচিত নাট্য-সংগ্রহ "দশ ভাণ"—২৸৹
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়া ও পরকীয়া"—২৲
শ্রীনরেন্দ্র দে অনূদিত "আধুনিক সোভিয়েট গল্প"—১৸৹
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "ঠগী-সর্দ্দার"—১৷৹
প্রভাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "সোনালী কাজল"—১৸৹
রেজাউল করীম প্রণীত "সাধক দারা শিকোহ্"—২৷৹
শ্রীহিমাংশু গুপ্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জাপানী কিকথ্ কলম"—১৷৹
এম. আকবর আলি প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ
"মুসলিম বৈজ্ঞানিক জাবির এবনে হাইয়ান"—১৲
রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত
মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"—
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা"—৩৲
ও "গল্প ভারতী"—১৲
ডক্টর রমা চৌধুরী প্রণীত "নিম্বার্ক দর্শন"—১৷৹ ও "বেদান্ত দর্শন"—৷৹
শ্রীকনক বন্দ্যোঃ এম-এ প্রণীত "কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন"—২৲
ডক্টর বিমলাচরণ লাহা প্রণীত "জৈনগুরু মহাবীর"—১৲
শ্রীভূষণচন্দ্র বিজলী প্রণীত কবিতা পুস্তক "বগদারর"—১৲
এস, ওয়াজেদ আলি প্রণীত "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য"—১৷৹
ও "গল্পের মজলিস"—৸৹
সব্যসাচী প্রণীত শিশু-উপন্যাস "শেষ বজি"—১৲
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত
"শ্রীশ্রীজগবন্ধু হরিলীলামৃত"—পঞ্চভাগ তৃতীয় খণ্ড—১৷৹
নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি"—২৲
আশুতোষ লাইব্রেরী প্রকাশিত শিশুদের "বার্ষিক শিশুসাথী"—৩৲
শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনী 'দুর্গাদাস'—১৷৹
শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত শিশুনাট্য 'বনভোজন'—৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রসকীর্ত্তন ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



:—১৩৫১

প্রথম খণ্ড	দ্বাত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

বাজে কাগজ

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পিএইচ্-ডি, বি-লিট্ (লণ্ডন)

ইতিহাসের দৃষ্টিতে একসময় যাহা বাজে কাগজ বলিয়া বিবেচিত হইত এখন আর তাহাকে তুচ্ছ করা চলে না। তখন ইতিহাসের কারবার ছিল রাজা বাদশাহ আমীর ওমরাহ লইয়া। প্রজা না থাকিলে যে রাজা থাকা সম্ভব নহে, সাধারণের সমষ্টির উপরই যে অসাধারণের প্রভুত্ব, এই সহজ কথাটা তখন স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং যে কাগজে দরবারী খবর পাওয়া যাইত না, মহতের মাহাত্ম্যের প্রমাণ যে কাগজে থাকিত না সে সব কাগজ সরকারীই হউক আর বে সরকারী হউক, আস্তাকুড়ে যাইত। বাজে কাগজের কুড়িয় রেওয়াজ হইয়াছে অল্প দিন। অথচ এই সকল কাগজে হয়ত দেশের সামাজিক অবস্থার, সাধারণ দশজনের জীবনযাত্রার খবর বেশী পাওয়া যাইত। তাই যখন ইতিহাস রাজা ছাড়িয়া রাজ্যের লোকের কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই এই সকল বাজে কাগজের দিকে সকলের নজর পড়িয়াছে।

নাদির শাহের মত যাহারা ডাকাতি করিতে করিতে রাজ-তক্তের রাস্তা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ইতিহাস তাঁহাদিগকে বরাবরই প্রাপ্য মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু যে কারণে যে অবস্থায় অতবড় দস্যুসর্দারের আবির্ভাব হইয়াছিল ছোট ডাকাতেরাও যে সেই রকম অবস্থায়ই তাহাদের ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে উৎপাত অত্যাচার করিয়াছে তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধারণের দশজনের এবং সমগ্র দেশের কথাই যদি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হয় তাহা হইলে ছোট বলিয়া নগণ্য বলিয়া ইহাদের কার্য্যকলাপও ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না। নাদির শাহের লুঠের ফিরিস্তিতে যদি দিল্লীর বাদশাহের অপার ঐশ্বর্য্যের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ ডাকাতের কবুল জবাবে গ্রাম্য জমিদারের গৃহের নিত্য ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, গহনা গাটি, তৈজস পত্রের খবর পাওয়া যাইবে না কেন?

সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে এই রকম একটা স্বীকারোক্তি পাইয়াছি। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী হেনরী লজের নিকট রত্তনদি কালিকাপুর পরগণায় দেউলিয়া নিবাসী মহম্মদ হোসেন নামক এক ডাকাত আপনার অপরাধ কবুল করিয়া জবানবন্দী দেয়। সেকালে সুন্দরবন অঞ্চলে ভয়ানক ডাকাতের উপদ্রব ছিল। লজসাহেব সুন্দরবনের ডাকাতি দমন করিবার ভার পাইয়া ১৭৮৮ সালে বাখরগঞ্জে আসেন। মহম্মদ হোসেনের জবানবন্দী হইতে জানা যায় যে পুলিশের লোকেরাই স্থানীয় জমিদারদিগের

যোগাযোগে অনেক সময় ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। প্রজাদের মধ্যে ডাকাত থাকিলে জমিদারেরা তাহাদের লুঠের বখরা দাবী করিতেন। মহম্মদ হোসেনের মনিব মহম্মদ হায়াত তখনকার একজন পুলিশ কর্মচারী ছিলেন। কোম্পানীর সরিষাতেই ভূত থাকায় মন্ত্রপূত সরিষাদ্বারা অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ করা সম্ভব হয় নাই।

মহম্মদ হোসেনের দল বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার পল্লী অঞ্চলে ডাকাতি করিত। তখন সেখানকার সাধারণ লোকের মধ্যে কড়ির প্রচলন ছিল। ডাকাতেরা এক বাড়ীতেই পাঁচ কাহন (৬৪০০) কড়ি পাইয়াছিল। সম্পন্ন লোকের সঞ্চয়ের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম, সোনা রূপার তালই ধনীর ভাণ্ডারে বেশী থাকিত। মহম্মদ হোসেনের একরার হইতে জানা যায় যে তাহারা কোথাও পনর হাজারের বেশী নগদ টাকা পায় নাই, কিন্তু এক পোদ্দারের বাড়ীতে এক মণের অধিক সোনা পাইয়াছিল। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন মহিলারাও রূপার গহনা পরিতেন, হাতে রূপার পৈঁচি, কঙ্কণ ও বালা, গলায় রূপার হার, রূপার তক্তি, আঙ্গুলে রূপার আংটি এবং পায়ে রূপার গুজরি পরিবার রেওয়াজ ছিল। বাঙ্গালীর বহু পরিচিত মলের (অধুনা বিস্মৃত) প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকিলেও সাধারণভাবে পায়ের যে অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে তাহা মল হওয়া অসম্ভব নহে। রূপার নথের কথা কিন্তু মহম্মদ হোসেনের জবানবন্দীতে কোথাও পাওয়া যায় না। অবস্থায় কুলাইলে সকালেই বোধ হয় সোনার নথ নাকে পরিতেন, বাখরগঞ্জের বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিদিগের গৃহিণীরা বোধ হয় কখনও মণিমুক্তা চক্ষে দেখেন নাই, কারণ লুঠের ফিরিস্তিতে কোথাও হীরা বা মুক্তার উল্লেখ নাই। কর্ত্তারাও শাল দোশালার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ডাকাতেরা সোনাউল্লা চৌধুরী নামক একজন মুসলমান জমিদারের বাড়ীতে চারি বস্তা রেশমের কাপড় পাইয়াছিল, কিন্তু শাল পাইয়াছিল মোটে দুইখানা। এতদ্ব্যতীত মহম্মদ হোসেনের একরারে আর একবার শালের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাউল, লবণ, তৈল, সাদা কাপড়, পিত্তলের বাসন কিছুই যখন তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই তখন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে শালের প্রাচুর্য্য থাকিলে ডাকাতেরা তাহা নিশ্চয়ই ফেলিয়া যাইত না। নিত্য ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে পিত্তলের লোটা, বাটি, থালা, পানদান প্রভৃতির নাম আছে, কিন্তু কোন কাঁসার জিনিসের উল্লেখ নাই। অধুনা অপ্রচলিত ভুতিনাগ নামক মিশ্রধাতুর বাসনের ব্যবহার বেশী হইত বলিয়া মনে হয়। খুচরা মুদ্রার মধ্যে সিকি ও আধুলির উল্লেখ আছে। সন্দীপের এক চৌধুরীর বাড়ীতে দুই পণ সিকি ও আধুলি পাওয়া গিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বরিশাল ও নোয়াখালিতে অবস্থাপন্ন লোকেরাও পিত্তলের থালা বাটীতে ভাত খাইতেন, রূপার গহনা পরিতেন, অর্থের মধ্যে অনেক কড়ি রাখিতেন (অর্থাৎ জিনিস পত্রের দাম ছিল খুব কম) এবং গণনা করিতেন বুড়ি, পণ, কাহন হিসাবে।

সরকারী দপ্তরে বাজে কাগজ বেশী নাই। স্থানাভাব হইলেই অপ্রয়োজনীয় কাগজ নষ্ট করিয়া ফেলা হইত। সুতরাং সাধারণ লোকেরও পল্লীসমাজের ধারাবাহিক খবর সরকারী কাগজ পত্রে পাওয়া যাইবে না। গ্রামের প্রাচীন পরিবারগুলির পুরাতন কাগজ পত্র ঘাঁটিলে হয়ত সেই ইতিহাসের উপকরণ জুটিতে পারে। কিন্তু অযত্নে ও অবহেলায় এই জাতীয় কাগজ বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়াছে। বাজারের হিসাব বা বিবাহ ও পূজাপার্ব্বণের খরচের খাতার যে কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বে অনেকের ধারণাই হয় নাই। সুতরাং একশত বৎসর পূর্ব্বের হিসাব পত্রও বেশী পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

মহম্মদ হোসেনের একরারের পর পঞ্চাশ বৎসর বাদ দেওয়া যাউক। বরিশাল ও নোয়াখালি হইতে কলিকাতায় আসুন। দেখা যাউক ১৮৩৮ সালে কলিকাতা সহরে সাধারণ শ্রমিকেরা কিরূপ মজুরী পাইত। সরকারী বাষ্পীয় পোত বিভাগের অধ্যক্ষ জনষ্টোন সাহেব ১৮৩৮ সালে তাহার কারখানায় মজুরদের বেতনের একটা হিসাব পেশ করিয়াছিলেন। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে ১২৫ জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র দুইজন রোজ ।৶০ হিসাবে মজুরী পাইত, একজন পাইত ।/০, অধিকাংশ লোকের দৈনিক আয় ছিল ।০ হইতে ।৵০, সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার রোজ ৶০। মজুরদিগের মধ্যে দুইটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থ (?) সন্তানের নাম পাওয়া যায়। অপর সকলের জাতি নির্ণয় করা সম্ভব নহে কেন না নামের সঙ্গে পদবী দেওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণ রাম মুখার্জি রোজ এক সিকি পারিশ্রমিক পাইতেন, ঠাকুর দাস চাটার্জ্জি পাইতেন আর এক আনা বেশী। রামমোহন ঘোষ ডিসেম্বর মাসে (১৮৩৭ সালে) দৈনিক তিন আনা হিসাবে ২৩ দিন কায করিয়া ৪৸৶০ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ভদ্র সন্তানেরা হয় লেখাপড়ার ধার ধারিতেন না, না হইলে তাহাদের মুরুব্বির জোর ছিল না। বোধ হয় সে বৎসর বিবাহের বাজারেও মন্দা পড়িয়াছিল, না হইলে মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় কুলতিলকেরা একটা সিকির জন্য কারখানায় গতর খাটাইতে যাইবেন কেন?

সাধারণ মজুরদের তুলনায় সূত্রধরেরা ভাল বেতন পাইতেন। নারায়ণ, মধুসূদন ও তারাচাঁদ মিস্ত্রীর মজুরী ছিল রোজ ।০, এখনকার তুলনায়ও নিতান্ত মন্দ নহে। লোহার মিস্ত্রী মাসিক ১২৲ ও রং মিস্ত্রী মাসিক ১০৲ হারে বেতন পাইতেন। পিত্তলের মিস্ত্রীর বেতন ছিল ইহাদের চেয়ে বেশী—মাসিক ১৬৲।

তখনও দরোয়ানরা বাঙ্গালার বাহির হইতে আসিতেন। জনষ্টোন সাহেবের তালিকায় তিনজন দারোয়ানের নাম পাওয়া যায়— Wollah sing (উলা সিং) More thewarry (মোর তেওয়ারী), Conny sing (কানাই সিং) প্রত্যেকে মাসিক ৭৲ তঙ্কা পাইতেন। আফিসের বাবুদের কাছে টাকা লগ্নি করিতেন কিনা, কত সুদে টাকা ধার দিতেন, সরকারী কাগজ সে সম্বন্ধে নীরব। শম্ভু নামধের একজন "সরকার" ও দারোয়ানদিগের সমান হারে বেতন পাইতেন। হয়ত কিছু উপরিও ছিল।

দৈহিক পরিশ্রম করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে, সমাজে তাহাদের স্থান সকলের নীচে। ধোপদস্ত কাপড় পরিয়া যাহারা কলম চালায় তাহারাই মানী মানুষ। এই মানের লোভে এখন ব্যবসায়ীদিগের বংশধরেরা ইংরাজী শিখিয়া কেরাণীগিরি করিতেছেন। সর্ব্বপ্রথম কোন মহাপুরুষ ইংরাজী ভাষা আরত্ত করিয়া মালক্ষীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সরকারী কাগজপত্র ভাল করিয়া দেখিলে সেকালের ইংরাজীনবীশ কেরাণীদের অন্ততঃ কয়েকজনের নাম

পাওয়া যায়। ইহাদের ভাষা-জ্ঞান কতটা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে নাম স্বাক্ষর করিবার মত ইংরাজী বিদ্যা তাহারা অর্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই এবং লাট সাহেবের আফিসের কাগজপত্র নথিভুক্ত করিবার অধিকার যখন তাহাদের ছিল তখন নথির বিষয়টা বুঝিবার মত ইংরাজীও বোধ হয় তাহারা জানিতেন। এখন দেশের লোক তাহাদিগকে ভুলিয়া গেলেও ইহারা নিঃসন্দেহে একালের ইংরাজীনবীশদিগের পথপ্রদর্শকের গৌরব দাবী করিতে পারেন।

নথির উপর যাহাদের সহি আছে ইংরাজী শিক্ষার সেই অগ্রদূতদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য আমার তালিকা অসম্পূর্ণ, কারণ ভারত সরকারের মহাফেজখানার হাজার হাজার নাম পড়িবার অবকাশ আমার হয় নাই। আর হাজার পরিশ্রম করিলেও সেকালের কৃতী কেরাণী-দিগের নাম বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া খ্যাতির সুবর্ণ ফলকে উৎকীর্ণ করা যাইবে না। ১৭৯০ সাল হইতে আরম্ভ করা যাউক। ঐ বৎসরের দুইটি নথিতে নিম্নলিখিত নাম দুইটি পাওয়া যাইতেছে—

Collypersaud Day—কালিপ্রসাদ দে।

Durpnarain—দর্পনারায়ণ।

১৭৯০ সালের মাত্র দশখানি নথি দেখা হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহি আছে।

Rammohan—রামমোহন

Radamohon—রাধামোহন

Buddinaut—বদ্দিনাথ

Radanaut Dey—রাধানাথ দে

Buddinaut Nundy—বদ্দিনাথ নন্দী

Jaggernaut Dos—জগন্নাথ দাস

Gocoolchander Ghos—গোকুলচন্দ্র ঘোষ

Durpnarrine } দর্পনারায়ণ
Durpnarrine }

Gaurharry Mitter—গৌরহরি মিত্র

Punchanun—পঞ্চানন

ইহাদের মধ্যে বৈদ্যনাথ ও বৈদ্যনাথ নন্দী অভিন্ন ব্যক্তি, হস্তাক্ষর দেখিলে ইহাতে সন্দেহ থাকে না। ১৭৯৩ ও ১৭৯০ সালের দর্পনারায়ণও একই লোক। নামের বানানে পার্থক্য থাকিলেও হস্তাক্ষরে পার্থক্য নাই। রাধানাথ দে সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। রাধামোহনের স্বাক্ষরের সঙ্গে তাহার স্বাক্ষরের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহা একই আদর্শ লিপি অনুকরণের ফলে হওয়া অসম্ভব নহে। ১৭৮৭ সালের তিনখানি নথিতে একটি নাম মিলিয়াছে—

Radakisono Dey রাধাকৃষ্ণ দে।

ইহার নামের আত্যংশের রাধামোহনের এবং রাধানাথ দের নামের আত্যংশের লেখা অনেকটা এক রকম। দর্পনারায়ণ, রাধামোহন ও রামমোহনের পদবী পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং ইহারা বাঙ্গালী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু বদ্দিনাথ নন্দী সর্ব্বত্র আপনার পদবীর উল্লেখ করেন নাই। কাগজপত্র ভাল করিয়া খুঁজিলে হয়ত ইহাদের পদবীও মিলিতে পারে। পঞ্চানন খাঁটি বাঙ্গালী নাম। যাহাদের সম্পূর্ণ নাম পাওয়া যাইতেছে তাহারা সকলেই কায়স্থ। কেরাণীর কাম কায়স্থদিগের কৌলিক পেশা। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায়ও বোধ হয় তাহারাই অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইহাদের নামের বর্ণবিন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কেতার নিদর্শন দেখা যাইতেছে।

নন্দী, দে, ঘোষ, মিত্র ও দাস মহাশয়েরা হয়ত সেকালে কোম্পানীর সরকারে কায কবিয়া সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরেরা কি এখনও কলিকাতায় আছেন এবং তাহারা কি এই ইংরেজীনবীশ পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন?

এখানে আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়। বাঙ্গালী বৈদ্যনাথ, রাধামোহন, রামমোহন, পঞ্চানন, দর্পনারায়ণ কেবল নিজেদের নাম লিখিয়াছেন, পদবী লেখেন নাই। এখনকার দিনে কিন্তু কেহ পদবী বাদ দিয়া কেবলমাত্র নামটি স্বাক্ষর করেন না। এই পদবী লেখার রেওয়াজ কি ইংরাজী আমলে হইয়াছে? নবাবী আমলের শেষে এবং কোম্পানীর আমলের গোড়ায় বড় বড় লোকেরা নামের সঙ্গে পদবী লিখিতেন না—কখনও রাজা জানকী রাম, রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা রাজ বল্লভ, মহা-রাজা নন্দকুমার, রাজা নবকৃষ্ণ, রাজা শিবচন্দ্র, ইহারা পারসী-বানানের অনুকরণে শিও চন্দ, নবকিষণ—প্রভৃতি নামেও পরিচিত হইতেন। বাঙ্গালার বাহিরেও মহারাষ্ট্রীয় সমাজে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। অন্তাজী মানকেশ্বর, শিবাজী বিঠ্‌ঠল, রামাজী মহাদেব প্রভৃতি নামের সঙ্গে উপনাম বা পদবী সাধারণতঃ ব্যবহার হইত না। এখন কিন্তু ইংরাজী প্রভাবে ছোট বড় সকলেই নিজের উপনামের দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন। স্বনামের সংক্ষেপ করিয়া তাহার আদ্যক্ষর মাত্র উল্লেখ করিবার রীতিও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের নিকট অল্প বিস্তর গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশেও কৌলিক নামের ব্যবহার কি ইংরাজী আমলেই সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে? মুসলমান আমলের বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে উভয়প্রকার দৃষ্টান্তই দেখা যায়।

এখন বাঙ্গালীদিগের দৃষ্টি আবার ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। বহু বাঙ্গালী এখন ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং অধুনা বিস্মৃত দুই জন বাঙ্গালী শরফের নাম সরকারী কাগজ পত্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা বোধ হয় অনুচিত হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে যেমন সহসা বাজার হইতে পয়সা, আনি, দুয়ানি প্রভৃতি খুচরা মুদ্রা অন্তর্দ্ধান করিয়া-ছিল, ১৭৮৭ সালে সেইরূপ রৌপ্য মুদ্রার কমতি হইয়াছিল। ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্ত সরকার হইতে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। কমিটির সদস্তেরা নিম্নলিখিত শরফ-দিগকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।—

Nunderam & Bydenaut—নন্দরাম ও বৈদ্যনাথ।

Hurry Persaud—হরিপ্রসাদ।

Gopaul Doss—গোপাল দাস।

Seboram Paul—শিবরাম পাল।

Nillember Seal—নীলাম্বর শীল।

শেষোক্ত দুইজন নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী। ইহাদের উত্তর পুরু-

যেয়া কোথায় আছেন, কি করিতেছেন? তাহাদের নিকট কি পুরাতন কাগজপত্র আছে? থাকিলে তাহা হইতে সেকালের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিবরাম পালের গোমস্তা নিমাইচরণ ও নীলাম্বর শীলের গোমস্তা কানাইশীল কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ইহাদের পরিবার সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পোকায় কাটা কতকগুলি বাক্সে কাগজের বস্তায় বন্দী ছিল। হয়ত তাহার অনেক কাগজই নষ্ট হইয়াছে। বাকী যাহা আছে এখন হইতে তাহার খোঁজ না করিলে তাহাও অচিরে নষ্ট হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের তরুণ বিদ্যার্থীরা যদি এ বিষয়ে অবহিত হন তাহা হইলে বিস্মৃত ইতিহাসের বহু উপাদান এখনও উদ্ধার হইতে পারে।

সুন্দরকাণ্ডের অর্থ কি?

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

বাংলা রামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখেই আমার ছয় বছরের নাৎনী রমা আমাকে একদিন প্রশ্ন করল যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অর্থ কি? দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম যে তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে যেমন সেই সেই কাণ্ডের নামের একটা সম্বন্ধ আছে সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার সহিত এই নামের কোন সম্বন্ধ আপাতত সে দেখিতে পাইতেছে না। প্রশ্নটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। কারণ এতটুকু মেয়ের মনে যে প্রশ্নটা উঠিয়াছে তাহা হাসিয়া উড়াইবার মত নহে, বাস্তবিকই বিবেচনার বিষয়। অথচ এ প্রশ্নটা আমার মনে কখনও জাগে নাই এবং কোথাও ইহার আলোচনাও দেখি নাই। সুতরাং প্রশ্নটা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা পাশ করিয়া বুড়া বয়সে নাৎনীর নিকট ফেল হইব ইহাও ভাল লাগিল না। আপাতত কোনমতে রেহাই পাইবার জন্য বলিলাম—ও কাণ্ডটা খুব সুন্দর কিনা তাই ইহার নাম সুন্দরকাণ্ড। নাৎনী ভাবিল আমি তাহাকে ঠাট্টা করিলাম—সে হাসিয়া উঠিল, উত্তরটা মোটে গ্রাহ্যই করিল না।

বাড়ী ফিরিয়া সংস্কৃত রামায়ণ ও তাহার যে দুই একখানি টীকা ছিল তাহা পড়িলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গের কোন উল্লেখই তাহাতে পাইলাম না। তখন ভাবিলাম যে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন কিনা দেখা যাউক। রামায়ণ সম্বন্ধে জার্ম্মান পণ্ডিত য়্যাকোবির (Jacobi) প্রণীত Das Ramayana নামক গ্রন্থই সুবিখ্যাত। এই বইখানি পড়িয়া দেখিলাম যে প্রশ্নটি আমার নাৎনী করিয়াছে এবং দেশীয় পণ্ডিতেরা যাহা একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই জার্ম্মান পণ্ডিত তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা উত্তর দিয়াছেন আমি উপস্থিতবুদ্ধিমত আমার নাৎনীকে সে উত্তর দিয়াছিলাম প্রায় তাহারই অনুরূপ। তিনি লিখিয়াছেন যে সম্ভবতঃ সুন্দরকাণ্ডে অনেক কবিত্বময় মধুর বর্ণনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। আমার নাৎনী জার্ম্মান জানেন না, নচেৎ য়্যাকোবির বইখানা দেখাইয়া প্রমাণ করিতে পারিতাম যে আমার যে উত্তর শুনিয়া সে হাসিয়াছিল, জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত তাহার সমর্থন করেন। কিন্তু পরে দেখিলাম আর একজন বড় জার্ম্মান পণ্ডিতও এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নাই। পণ্ডিতপ্রবর বিন্টার-নিট্স্ তাঁহার জার্ম্মান ভাষায় লিখিত সুপ্রসিদ্ধ 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নামক' বিপুল গ্রন্থে 'সুন্দরকাণ্ড' নামের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি য়্যাকোবির মতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ড অপেক্ষা সুন্দরকাণ্ডে অনেক বেশী পরিমাণে কাহিনী, আখ্যান ও আশ্চর্য্য ঘটনা (Marchen haften, Romantische) আছে। ভারতীয় রুচি চিরকাল এই সমুদয়কেই সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেই জন্যই রামায়ণের এই খণ্ডের নাম হইয়াছে সুন্দরকাণ্ড। এই মতটিও খুব সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

আমার পূর্ব্বপরিচিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কলিকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ লেখার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঢাকায় থাকিতে তাঁহার সহিত একযোগে 'রামচরিত' নামক দুরূহ দ্ব্যর্থবোধক কাব্য সম্পাদনের সময় সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট সুন্দরকাণ্ড সমস্যা ব্যাখ্যা করিয়া এযাবৎ অনুসন্ধান করিয়া যে ফলাফল পাইয়াছি তাহা বলিলাম এবং এ বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কিছু লিখিয়াছেন কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে এবং এ বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলাম। কিছুদিন পর এ বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে যে পত্র পাই নিম্নে তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"রামায়ণের কয়েকখানি টীকা দেখিলাম, সুন্দরকাণ্ডের

সুন্দর শব্দের ব্যাখ্যা কোথাও পাইলাম না। আমার বোধ হয় আপনার প্রশ্ন—কেন সুন্দরকাণ্ড এই নাম হইল—অদ্যাপি অমীমাংসিত রহিয়াছে। আপনার প্রশ্ন মীমাংসার জন্য সুন্দরকাণ্ড ২।৩ বার পড়িলাম। পুনঃ পুনঃ পাঠ করার পর আমার এই ধারণা হইয়াছে যে এখানে "সুন্দর" শব্দে দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর তীর বুঝাইতেছে (দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তীরমুত্তরং—রাঃ সুঃ)। অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে লঙ্কা পর্য্যন্ত যে ভূ-বিভাগ ছিল তদনুসারেই রামায়ণের অযোধ্যাদি পঞ্চকাণ্ডের নামকরণ হইয়াছে। সুন্দরকাণ্ড তাহাদেরই একটি। সুন্দরকাণ্ডের মধ্যেই অযোধ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়—"বিন্ধ্যারণ্য," "মলয়মহাগিরি," পরে "সমুদ্রাভিহত মহেন্দ্র পর্ব্বত" ও "বেলাবন"। ঋষি এই "বেলাবন" কথাটি বারবার বলিতেছেন এবং এই কথাটি আমার মনে লাগিতেছে যে "সুন্দর" (বন) এই "বেলাবনের"ই নামান্তর। "সুন্দর" শব্দটি বৃক্ষবিশেষ অর্থে সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায়। লবণাম্বুপ্রদেশে—বেলাবনে—এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে, তাহার নামানুসারে "বেলাবনের" সুন্দরবন নাম হওয়া খুবই সম্ভব (বাংলার দক্ষিণ উপকূলস্থিত সমুদ্রবন তুলনীয়) এবং ইহাও সম্ভব যে রামায়ণোক্ত "বেলাবন" বিভাগ কোনকালে "সুন্দরবন" নামে অভিহিত হইত এবং তাহারই নামানুসারে "সুন্দরকাণ্ড" এই নাম হইয়াছে। আমার আরও বক্তব্য এই যে, "সুন্দরকাণ্ডের" অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জন্যও ইহার "সুন্দরকাণ্ড" নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আরও কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তন্মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"সুন্দর এই নামকরণের অর্থ কি, সে বিষয়ে কাণ্ড সুন্দর বলিয়া উহার নাম সুন্দর হইয়াছে Jacobir (য়্যাকোবির) এই মত আমারও মনে স্থান পায় না। আমার সন্দেহ হয় 'সুন্দর' শব্দ এখানে স্থানবাচক এবং উহার লঙ্কার এক পুরাণ নাম—যেমন উজ্জয়িনীর 'বিশালা' অযোধ্যার 'সাকেত' ইত্যাদি। হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় আসিয়া কি দেখিলেন ও কি করিলেন তাহারই বর্ণনা এই কাণ্ডে পাই। মললসেকেরা প্রণীত "Dictionary of Pali Proper Names II"তে পাইলাম যে, 'চুল্লবংশে' লঙ্কাদ্বীপে এক ছোট পাহাড়ের নাম আছে সুন্দর পর্ব্বত এবং 'সুন্দর' নামক এক নগরে বুদ্ধ কস্সপ ও বুদ্ধ কোনাগমন সাধনা করিয়াছিলেন এই সংবাদ 'বুদ্ধবংশে'র 'অট্ঠ কথা'য় পাওয়া যায়। রামায়ণের ষষ্ঠকাণ্ডের যথার্থ নাম যুদ্ধকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড নহে।"

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ও ক্ষেত্রেশবাবু উভয়েই 'সুন্দর' নামক স্থান হইতে সুন্দরকাণ্ড এই নাম হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডের নাম হইতে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামায়ণে এইরূপ স্থানবাচক নামের কোনই উল্লেখ না থাকায় এই সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অথচ কবিত্ব বা আখ্যানের সৌন্দর্য্যের জন্যই এইরূপ নাম হইয়াছে ইহাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুদ্র এক বালিকার প্রশ্নে যে সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে এযাবৎ আমি তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই এবং ইহার সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া আবশ্যক—কারণ 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ'। এই জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। যদি কেহ সুন্দরকাণ্ড নামের অন্য কোনরূপ সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারেন তবে একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

কড়ায় গণ্ডায়

একাঙ্কিকা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি

["Refund" শীর্ষক বিখ্যাত ইংরাজি একাঙ্কিকার ছায়াবলম্বনে]

একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কক্ষ; বড় টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার, দুই পার্শ্বে পুস্তকের আলমারি, টেবিলে একটি "কলিংবেল" ও স্তূপাকার ফাইল, দেয়ালে একটি ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের বয়স প্রায় ষাট বৎসর, চোখে চশমা দিয়া তিনি কি একটা লিখিতেছেন।

কেরাণীবাবুর প্রবেশ ও নমস্কার

প্রিন্সিপ্যাল। (চোখ তুলিয়া) কি সুধীর, কি খবর?

কেরাণীবাবু। একজন visitor এসেছেন, এখনি দেখা করতে চাইছেন।

প্রিন্সিপ্যাল। কার্ড দিয়েছেন?

কেরাণীবাবু। কার্ড চেয়েছিলাম, বল্লেন কার্ড নেই।

প্রিন্সিপ্যাল। বসতে বলো, একটা দরকারী কাজ করছি।

কেরাণীবাবু। এখনি দেখা করতে চান, বললেন বসবার সময় নেই।

প্রিন্সিপ্যাল। অদ্ভুত ত! চেহারা কেমন?

কেরাণীবাবু। বেশ হৃষ্টপুষ্ট! একটু ষণ্ডামার্কা বটে!

প্রিন্সিপ্যাল। মেজাজটা কেমন বুঝলে?

কেরাণীবাবু। একটু উগ্রমূর্ত্তি।

প্রিন্সিপ্যাল। হু, তা হ'লে কোন ছাত্রের অভিভাবক হ'বে বলে মনে হচ্ছে না, কি বলো?

সুধীর। হ্যাঁ, তা ঠিক্।

প্রিন্সিপ্যাল। ছেলের প্রমোশন, নয় মাইনে কমান এই নিয়েই ত তাদের দরবার।

সুধীর। তা বটে।

প্রিন্সিপ্যাল। তবে কে এসেছে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ডেকে দাও গিয়ে।

প্রিন্সিপ্যাল আবার কাজে মন দিলেন, কেরাণীবাবু লোকটিকে ডাকিয়া দিতে গেল।

অল্পক্ষণ পরে প্রবেশমুখে একটি গানের কলির শেষটুকু শোনা গেল—"পরাণ আমার কি যে চায়?" পরেই একটি নধরকান্তি যুবকের প্রবেশ।

যুবক। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, চিনতে পারেন?

প্রিন্সিপ্যাল। (গ্রীবা দোলাইয়া) কৈ, না।

যুবক। আমার নাম বীরেন্দ্রবিনোদ, দশ বছর আগে এই কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছি।

প্রিন্সিপ্যাল। (মাথায় হাত বুলাইয়া) বীরেন্দ্রবিনোদ!

যুবক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বীরেন্দ্রবিনোদ, মনে পড়ছে না? সেই যে আপনার ঘর থেকে কার্পেটটা তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম।

প্রিন্সিপ্যাল। ওঃ সেই ষণ্ডামার্কা ছেলে, যাকে হলঘরে কাণ ধরে দাঁড় করে রেখেছিলাম।

বীরেন্দ্রবিনোদ। (বেশ সপ্রতিভ ভাবেই) তা শাস্তিটা দিয়েছিলেন বড্ড বেশী।

প্রিন্সিপ্যাল। তারপর, বীরেন্দ্র, কি মনে করে? আমার সময় বড় কম, চট্ করে বলে ফেলো।

বীরেন্দ্র। আমারও সময় বেশী নেই, এখনি বলছি।

প্রিন্সিপ্যাল। আচ্ছা, কি কথা বলো।

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ, তাই বলতেই ত এসেছি। দেখুন দশ বছর হয়ে গেলো আমি আপনার কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেছি। এত দিনেও কোথায় পাকা চাকরী পেলুম না। যেখানেই কাজে লাগি তাদের পছন্দ মত হয় না।

প্রিন্সিপ্যাল। হু, তারপর?

বীরেন্দ্র। আমার ধারণা হয়েছে, আপনার কলেজে আমার কিছুই শেখা হয় নি। সুতরাং—

প্রিন্সিপ্যাল। (একটু ক্রুদ্ধস্বরে) সুতরাং কি?

বীরেন্দ্র। সুতরাং চার বছর আপনার কলেজে ফিস্ বাবদ যা কিছু দিয়েছি, সব সুদে আসলে ফিরে চাই।

প্রিন্সিপ্যাল। বীরেন্দ্র, এতো তোমার বড় অদ্ভুত প্রস্তাব! এমন তো কোথায়ও শুনিনি।

বীরেন্দ্র। আমি ভেবে চিন্তে ঠিক্ করেছি, এ আমার প্রাপ্য।

প্রিন্সিপ্যাল। আমার বিশ বছর প্রিন্সিপ্যালগিরিতে এই প্রথম এমন কথা শুনলুম।

বীরেন্দ্র। এখন তাড়াতাড়ি আমার প্রাপ্যটা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমার টাকার বড় দরকার।

প্রিন্সিপ্যাল। (একটু উত্তেজিত হইয়া) তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা পেয়েছ?

বীরেন্দ্র। না, স্যার, আমি এমন স্থির চিত্তে আর কখনও কথা বলি নি। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হুকুম করুন।

প্রিন্সিপ্যাল। যদি না করি?

বীরেন্দ্র। আমি রাস্তায় ঘাটে এ কলেজের মুণ্ডপাত করে ছাড়বো। অতি বাজে কলেজ, কিছুই লেখাপড়া শেখায় না—বলে বেড়াব?

প্রিন্সিপ্যাল। (একটু বিচলিত হইয়া) তোমায় কি আমরা ভাল শিক্ষা দিই নি?

বীরেন্দ্র। কিছুতেই না, তা হলে কি এমন ভাবে ঘুরে বেড়াই।

প্রিন্সিপ্যাল। (চিন্তা করিয়া) বি-এতে তোমার কি কি বিষয় ছিলো?

বীরেন্দ্র। ইংরাজি, অঙ্ক ও অর্থনীতি।

প্রিন্সিপ্যাল। ইংরাজি ত আমিই পড়িয়েছি। কেমন না?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ, স্যার, অঙ্ক পড়িয়েছেন ডক্টর সেন, আর অর্থনীতি ঘোষ সাহেব।

প্রিন্সিপ্যাল। বেশ, তুমি একটু ঐ বিশ্রামের ঘরে গিয়ে বসো, আমি আর আর প্রফেসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার উত্তর দিচ্ছি।

বীরেন্দ্র। তাড়াতাড়ি পরামর্শ সেরে ফেলুন স্যার, আমার সময় বড় অল্প। টাকাটা নিয়ে আজই দিল্লী রওনা দেবো।

প্রস্থান

"মন তুমি কৃষি কাজ জানো না"—গানের সুর বাহিরে শোনা গেল।

প্রিন্সিপ্যাল কলিংবেল টিপিলেন।

কেরাণীবাবুর প্রবেশ

প্রিন্সিপ্যাল। দেখ সুধীর, তাড়াতাড়ি সেন আর ঘোষকে আসতে বলো। বড় দরকার, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

কেরাণীবাবু অধ্যাপক সেন ও ঘোষকে সংবাদ দিতে বাহিরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

অধ্যাপক সেন ও অধ্যাপক ঘোষের প্রবেশ

প্রিন্সিপ্যাল। আসুন, বড় বিপদেই পড়া গিয়েছে। একেবারে অদ্ভূত! তাই আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি। বসুন।

সেন ও ঘোষ। (উভয়ে উপবেশন করিয়া) কি ব্যাপার বলুন ত।

প্রিন্সিপ্যাল। বীরেন্দ্রবিনোদ নামে একটা ছেলে দশ বছর আগে আমাদের কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছিল। সে এসেছে সুদে আসলে তার সব ফিস্ ফিরিয়ে নিতে।

সেন ও ঘোষ। (উভয়ে) কেন, কেন?

প্রিন্সিপ্যাল। সে বলছে দশ বছর চেষ্টা করেও সে কোন চাকরীতে পাকা হ'তে পারে নি। তাই তার ধারণা হয়েছে এখানে তার কিছুই শিক্ষা হয় নি, সুতরাং সে এখানে যা কিছু দিয়েছে সবই তার ফিরে পাওয়া উচিত।

ডক্টর সেন। হুঁ, আপনি তাকে কি বললেন ?

প্রিন্সিপ্যাল। আমি বলেছি প্রফেসরদের সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তর দেবো। ঐ পাশের ঘরে তাকে বসিয়ে রেখেছি।

অধ্যাপক ঘোষ। (উত্তেজিত হইয়া) এখানে কি সে রসিকতার জায়গা পেয়েছে ?

ডক্টর সেন। আপনারা এত ব্যস্ত হবেন না। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

প্রিন্সিপ্যাল। কি রকম ?

ডক্টর সেন। তাকে ডেকে বলুন আমরা সাধারণভাবে তার পরীক্ষা করে দেখবো—সত্যি এখানে সে ভাল শিক্ষা পেয়েছে কিনা।

প্রিন্সিপ্যাল। তার পর ?

ডক্টর সেন। যদি সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তো, তার উত্তর দেওয়া সহজ হ'বে।

প্রিন্সিপ্যাল। সে মেনে নেবে ত ?

ডক্টর সেন। অবশ্য, তাকে আগে থাকতেই আমাদের সর্ত্তে রাজী করাতে হ'বে।

প্রিন্সিপ্যাল। তা হ'লে ওকে ডাকতে পাঠাই।

প্রিন্সিপ্যাল "সুধীর" বলিয়া ডাকিলেন. কেরাণীবাবু প্রবেশ করিলে প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে বীরেন্দ্রবিনোদকে লইয়া আসিতে বলিলেন।

বীরেন্দ্রবিনোদের প্রবেশ। সে বীরপদভরে কক্ষটি কাঁপাইয়া প্রিন্সিপ্যালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন্দ্র। সব old fossils এক জায়গায় হয়েছে যে।

ঈষৎ হাস্য

প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপক ঘোষের মুখ রাগে রক্তিম হইয়া উঠিল, অতি কষ্টে তাঁহারা ক্রোধ দমন করিলেন। ডক্টর সেন ঠোঁট চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ডক্টর সেন। চমৎকার, বীরেন্দ্র, চমৎকার। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব লিখুন, manners excellent,

বীরেন্দ্র। (একটু চমকিত হইয়া) বেশ, এবার বলুন, কি ঠিক্ করলেন। (wrist watchটার দিকে তাকাইয়া) শীগ্‌গির বলে ফেলুন, আমার সময়টা বড় কম।

ডক্টর সেন। দেখো, বীরেন্দ্র, আমরা স্থির করেছি, তোমার সাধারণ ভাবে পরীক্ষা করে দেখবো, এখানে তোমার শিক্ষা কেমন হয়েছিল। যদি বুঝি তোমায় ভাল শিক্ষা দেওয়া হয়নি, তা হ'লে তোমার সব টাকা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। এতে তোমার কি মত ?

বীরেন্দ্র। তা, আমায় পাশ করাতে পারবেন না বলে দিচ্ছি।

ডক্টর সেন। সে আমরা বুঝবো।

বীরেন্দ্র। বেশ, বেশ, চট্ করে পরীক্ষাটা শেষ করে ফেলুন। আমি কিছুতেই পাশ হবো না।

ডক্টর সেন। তা বলা যায় না, দেখা যাক্ কি হয়।

প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকাইয়া

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রথমে আরম্ভ করুন।

প্রিন্সিপ্যাল। হাঁ, বীরেন্দ্র, (একটু হাত বুলাইয়া) আচ্ছা, ইংরাজি কবিতা কিছু জানো ?

বীরেন্দ্রবিনোদ সুর করিয়া আরম্ভ করিল

"I met a lame man
in a lane,
A sly fox met a hen
and the hen ran."

প্রিন্সিপ্যাল। (কবিতা শুনিয়া অবাক্ হইয়া) এমন অদ্ভুত কবিতা তো কখনও শুনিনি।

বীরেন্দ্র। (হাসিয়া) এবার আমায় পাশ করান, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

প্রিন্সিপ্যাল। তাই ত !

ডক্টর সেন। (উঠিয়া) চমৎকার কবিতা ! একেবারে অতি আধুনিক, ভাব আধুনিক, ছন্দ আধুনিক, ভাষা আধুনিক। Elliot, Ezra pound কোথায় লাগে। কি বলেন, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

প্রিন্সিপ্যাল। (একটু জোর করিয়া মৃদু হাসিয়া) নিশ্চয়ই।

ডক্টর সেন। তবে লিখে দিন, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, ইংলিশ very good, remark A ; বেশ ভাল পাশ করেছ, বীরেন্দ্র।

প্রিন্সিপ্যাল। হাঁ, হাঁ, বীরেন্দ্র, ইংলিশ excellent ; এখন অধ্যাপক ঘোষ আরম্ভ করবেন।

অধ্যাপক ঘোষ উঠিতেই বীরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এই যে Malthus Ghoshও আছেন দেখছি ; আপনি জানেন না, ক্লাসে আপনি Malthusএর popu'ation theroy নিয়ে এত বকতেন যে ছেলেরা আপনার নাম মন্মথ ঘোষকে Malthus ঘোষ করে দিয়েছিল।

উচ্চ হাস্য

অধ্যাপক ঘোষের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি অতি কষ্টে আত্মদমন করিলেন

ঘোষ। শোন, বীরেন্দ্র, একটা দেশের population আর production এর rate of increase কি রকম বলতে পার ?

বীরেন্দ্র। ঠিক্ ঠিক্, এবারে আর কিছুতেই আমাকে পাশ করাতে পারবেন না। population যদি বাড়ে harmonic progressionএ, production বাড়বে arithmetic geometric progressionএ। কেমন, Malthus সাহেব, এবার পাশ করাবেন আমাকে। পারবেন ?

অধ্যাপক ঘোষ। (রাগে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) অদ্ভুত উত্তর ! তাই তো—

ডক্টর সেন। অতি সরল উত্তর, বীরেন্দ্র বলতে চেয়েছে production এর বাড়তি যদি ধরা যায় sine graph, population এর বাড়তি হ'বে tangent graph ; কি বলো বীরেন্দ্র, এই না ?

বীরেন্দ্রও অবাক হইয়া ডক্টর সেনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডক্টর সেন। অর্থাৎ, productionএর একটা maximum point আছে, তার পরেই নামতে থাকবে, কিন্তু population বেড়ে যাবে একেবারে infinityতে। ঠিক্ না, মিঃ ঘোষ ?

বলিয়া চোখের ইসারা করিলেন।

অধ্যাপক ঘোষ। (শ্মশ্রুদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে) একেবারে ঠিক, চমৎকার !

ডক্টর সেন। তবে লিখুন, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, ইকনমিক্‌স্ excellent, passed with credit.

প্রিন্সিপ্যাল। এই যে লিখে দিলাম, ইকনমিক্‌স্ very good কি বলেন, মিঃ ঘোষ ?

অধ্যাপক ঘোষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রিন্সিপ্যাল। এইবার ডক্টর সেন আরম্ভ করবেন, বুঝলে বীরেন্দ্র।

ডক্টর সেন উঠিতেই

বীরেন্দ্র। এই যে ডক্টর থিটারাম (বলিয়া উচ্চহাস্য)। আপনি ক্লাসে trigonometryর অঙ্কে কেবল থিটা ব্যবহার করতেন বলে আমরা আপনার সীতারাম নাম বদলে রেখেছিলাম থিটারাম। (হা, হা, হা) (হাসি থামিলে) আপনিই ত দেখছি যতো ষড়যন্ত্রের মূল। এবার পাশ করান দেখি আমাকে।

ডক্টর সেন। (তীব্র বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া) দেখো, বীরেন্দ্র, আমি তোমায় দুটি প্রশ্ন করবো, একটি সহজ আর একটি শক্ত ; শক্তটায় বেশী নম্বর বুঝলে ?

বীরেন্দ্র। চটপট করে সেরে ফেলুন। এবার দেখবো কেমন করে আমাকে পাশ করান।

ডক্টর সেন। আচ্ছা, দেখি। শোনো, একটা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে দশ দিন, আলো সেকেণ্ডে চলে একশ পঁচাশী হাজার মাইল, তা হ'লে ঐ নক্ষত্রটা পৃথিবী থেকে কত দূরে বলতে পারো ?

বীরেন্দ্র। (কিছু না ভাবিয়াই) পাঁচ বছর, ১১ দিন, ছ ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট। কেমন পাশ করান দেখি।

প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপক ঘোষ উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

ডক্টর সেন। চমৎকার উত্তর, একেবারে up-to-date, আইনষ্টাইনের উপর টেক্কা দিয়েছে। দেশ ও কাল পরস্পর সম্বন্ধী, সুতরাং দূরত্বের মাপটাকে একেবারে সময়ের মাপকাঠিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ধন্য, বীরেন্দ্র, আপেক্ষিকতাবাদের চরম ব্যাখ্যা তুমিই করেছ। কিন্তু তবুও, তোমায় পাশ করাতে পারলুম না। একটু ভুল হয়েছে, তুমি পঞ্চাশ সেকেণ্ড বাদ দিয়েছো।

প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর সেনের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে চাহিলেন।

বীরেন্দ্র। হা, হা, হা (উচ্চহাস্য)। দিন, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমার টাকা ফিরিয়ে দিন।

ডক্টর সেন। তা তো দিতেই হ'বে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, mathematicsএ লিখুন প্রথম প্রশ্নে unsuccessful।

প্রিন্সিপ্যাল কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন

ডক্টর সেন। (বাধা দিয়া) এখন, বীরেন্দ্র, তোমার হিসেবটা ঠিক্ করে ফেলো।

বীরেন্দ্র। (পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া) সে আমার ঠিক্ করাই আছে। ধরুন প্রথম বছরে মাসে দশ টাকা হিসাবে বছরে ১২০ টাকা, তারপর কলেজ ইউনিয়নের চাঁদা, ম্যাগাজিনের চাঁদা, খেলার চাঁদা, আরও অনেক বাজে চাঁদা নিয়ে বছরে ত্রিশ টাকা, হ'লো ১৫০ টাকা, শতকরা ৪ টাকা হিসেবে সুদ ১৩ বছরে ৭৮ টাকা। দেখছেন সুদ আমি বেশী ধরিনি, একেবারে ব্যাঙ্ক রেট। দ্বিতীয় বছরেও সবশুদ্ধ ১৫০ টাকা আর সুদ ১২ বছরে ৭২ টাকা। তৃতীয় বছরে মাসে ১২ টাকা হিসেবে এক বছরে ১৪৪ টাকা, চাঁদা বাবদ বছরে একত্রিশ টাকা মোট ১৭৫ টাকা, সুদ ১১ বছরে ৭৭ টাকা, আর চতুর্থ বছরেও ১৭৫ টাকা এবং সুদ ১০ বছরে ৭০ টাকা। দেখান simple interest ধরেছি, Compound ধরিনি ; তা হ'লে মোট হলো ৩০০ টাকা আর ৩৫০ টাকা, সুদ ১৫০ টাকা আর ১৪৭ টাকা, অর্থাৎ ৯৪৭ টাকা। একেবারে চুল চেরা হিসেব।

বলিয়াই উচ্চহাস্য

ডক্টর সেন। চমৎকার, এমন সুদ সমেত টাকা কড়ির সূক্ষ্ম হিসেব ক'জন গণিতের অধ্যাপক করতে পারেন। বীরেন্দ্র, এটাই ছিলো আমার কঠিন প্রশ্ন এবং তা'তে তুমি পাশ করেছ with Credit ; সুতরাং প্রিন্সিপ্যাল সাহেব লিখুন mathematics very good.

প্রিন্সিপ্যাল। (হাসিয়া লিখিতে লাগিলেন) mathemetics very good.

ডক্টর সেন। এইবার বীরেন্দ্রের certificateটা দিয়ে দিন।

প্রিন্সিপ্যাল। হ্যাঁ, দিচ্ছি ; তা হ'লে বীরেন্দ্র, তোমার এই সার্টিফিকেট বুঝলে ? manners excellent, English very good, Economics very good, mathematics very good, conduct exceptional, এই আমি সই করে দিচ্ছি। নিয়ে যাও।

বীরেন্দ্র। (অস্পষ্টস্বরে) অ্যা, অ্যা। তা হ'লে আমার—

ডক্টর সেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমিই এর উত্তর দিচ্ছি।

বলিয়াই ডক্টর সেন দরওয়ানকে ডাকিলেন।

দরওয়ান আসিলে

ডক্টর সেন। জবর সিং, ইস্‌কো কান পাকড়কে কালেজ গেটকা বাহার লে যাও।

দরওয়ান অগ্রসর হইলে

বীরেন্দ্র। আমিই যাচ্ছি, আমিই যাচ্ছি।

বলিয়া পশ্চাদপসরণ

প্রিন্সিপ্যাল। বেরোও, এখনি বেরোও, বখামি করবার আর জায়গা পাওনি সকাল বেলা এতটা সময় নষ্ট। বেরোও শীগ্‌গির বেরোও।

অধ্যাপক ঘোষ। আমি Malthus ঘোষ, কেমন না ? পাজী, নচ্ছার, বেরোও।

ডক্টর সেন। আমি থিটারাম, কেমন না ? জোচ্চর, বেরোও।

প্রিন্সিপ্যাল। আমরা সব old fossils, কেমন না ? বেরোও।

তিনজনেই উঠিয়া 'বেরোও', 'বেরোও' বলিতে বলিতে অগ্রসর হইলেন

যবনিকা পতন

বাঙ্গালার প্রথম মহামহোপাধ্যায়

প্রত্নকত্ম

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫০ রাজ্যাব্দে ১৮৮৭ সনের জুবিলি উপলক্ষে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রাজশক্তির শাসনাধীন "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎসম্পর্কে বড়লাটের বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত হইল।

His Excellency the Viceroy and Governor-General having taken into his consideration that adequate means do not exist whereby he can recognize eminent distinction in learning among the loyal Hindu and Mahomedan subjects of Her Most Gracious Majesty the Queen-Empress of India, and being desirous to Commemorate the event of the Jubilee of Her Majesty's Accession to the Throne, has resolved to institute a new title for eminent services rendered by Hindus or Mahomedans in the promotion of Oriental learning. 1.

এই নূতন উপাধি নামের পূর্ব্বে বসিবে, মহামহোপাধ্যায়গণকে উপাধির চিহ্নস্বরূপ "উষ্ণীষ" ও "উত্তরীয়" অর্থাৎ পাগ্‌ড়ী ও শাল প্রদত্ত হইবে এবং দরবারে তাঁহাদের স্থান হইবে "রাজাদের" পরেই।

বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা এই উপাধিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের ক্রমোল্লেখ অবিকল উদ্ধৃত হইল :

No. 812 I. His Excellency, the Viceroy and Governor General is pleased to Confer the title of Mahamahopadhyaya on the following gentlemen as a personal distinction.

Bengal—Lower Provinces

Bhuvan Mohan Vidyaratna
Mahes Chandra Nyayaratna
Sri Ram Siramani
Rakhal Das Nyayaratna
Prasana Chandra Nyayaratna
Dina Bandhu Nyayaratna
Chandra Kanta Tarkalanker
Tarini Charan Siramani

ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়াদি লিখিত হইল।

১। ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন

নবদ্বীপনিবাসী। জন্ম ফাল্গুন ১২৩০—মৃত্যু ১৯ শ্রাবণ ১৩০০। বারেন্দ্রশ্রেণী। বিদ্যাসাগরের ভাষায় ইনি "এদেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক" ছিলেন এবং বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের ইনি অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যথা, গদাধর ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী (১০০৬-১১১০ বঙ্গাব্দ)—কৃষ্ণদেব বিদ্যাভূষণ—হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত—কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু ১১২৬ বঙ্গাব্দ)—শ্রীরাম শিরোমণি (মৃত্যু ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)—ভুবনমোহন। নৈয়ায়িক সমাজে তাঁহার প্রতিভা সূচনা করিয়া প্রবাদ প্রচলিত হয় "ভুবনাস্তো গদাধরঃ।" তিনি পিতার নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি পারিবারিক কলহ হেতু তিনি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলেন এবং নিজ প্রতিভাবলেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরমোহন তর্কচূড়ামণির মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপে ন্যায়ের "প্রধান" পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার অগণিত শিষ্যমণ্ডলী ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিরাজমান ছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র ছিল। তাঁহার ছাত্র কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশও দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। ভুবনমোহন রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় আমরা জানি না। (নবদ্বীপ মহিমা ২য় সং, পৃ ৩৩১—৩৩ দ্রষ্টব্য)

২। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

হাওড়ার অন্তর্গত "নারীট" গ্রামনিবাসী। জন্ম ১১ ফাল্গুন ১২৪২—মৃত্যু চৈত্র ১৩১২। রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটীবংশীয় ভাগবত টীকাকার বিখ্যাত শ্রীধরস্বামীর ইনি অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। যথা, শ্রীধর স্বামী—শ্রীকর বিদ্যার্ণব—রমানাথ বিদ্যানিবাস—কৃষ্ণানন্দ তর্কপঞ্চানন—জানকীনাথ চূড়ামণি—রাজেন্দ্র সার্ব্বভৌম—গোবিন্দ তর্কালঙ্কার—শ্রীপতি ন্যায়বাচস্পতি—গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশ—রাধাবল্লভ তর্কবাগীশ—হীরারাম তর্কশিরোমণি—হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত—মহেশচন্দ্র। এই বংশে মহেশচন্দ্রের পূর্ব্বে বিংশতাধিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। পঠদ্দশায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তাঁহার অন্যতম ন্যায়গুরু সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্বয়ং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বঙ্গানুবাদের (৯২১ বিক্রমাব্দ) বিজ্ঞাপনে প্রশস্তি করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৫ সনে দশবৎসর কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া মাসিক ১২৫০৲ টাকা বেতন পাইয়া অবসর গ্রহণ করেন। একমাত্র ভূদেব ব্যতীত এত অধিক বেতনে শিক্ষাবিভাগে কোন বাঙ্গালী গতশতাব্দীতে নিযুক্ত হন নাই। তাঁহার অধ্যাপনা নৈপুণ্য চিরপ্রসিদ্ধ। অধ্যক্ষ Cowell সাহেবকে তিনি কুসুমাঞ্জলি, মুক্তাবলী প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন। তদ্রচিত কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্য্যবিবরণ (১৮৬৪) এবং বাক্যপ্রকাশের তাৎপর্য্যবিবরণ (১৮৬৬) উল্লেখযোগ্য টিপ্পনীগ্রন্থ। সোসাইটি হইতে মুদ্রিত সায়ণভাষ্যসহ তৈত্তিরীয় সংহিতার ৩য় হইতে

1. Foreign Dept, Notification. No. 811 I 16th Feb. 1887. Vide *Calcutta Gazette*, Feb. 28, 1887, Part I A, p. 28.

৫ম খণ্ড তিনি সম্পাদন করেন (১৮৭২-৯৪)। মীমাংসাদর্শন ও শবরভাষ্যসহ তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল (১৮৬৩-৮৭)। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি টোলের ছাত্রদের পরীক্ষা সৃষ্টি। বাঙ্গালা-দেশে সংস্কৃতশিক্ষায় যে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে তাহার ফলাফল ধীরভাবে এখন আলোচনাযোগ্য। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দৃঢ়তার সহিত পঞ্জিকাসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি সৃষ্টিতে ও তাঁহার প্রেরণা ছিল সন্দেহ নাই এবং বাঙ্গালায় এই প্রতিভাপূজার পৌরোহিত্য তিনি কিরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন বিগত শতাব্দীর মহামহোপাধ্যায়গণের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে এই প্রতিভাশালী মহাপ্রভাবসম্পন্ন পুরুষবরের কোন জীবনী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৮১ সনে তিনি "সি-আই-ই" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

৩। শ্রীরাম শিরোমণি

মুর্শিদাবাদ বাসী। জন্ম চৈত্র রামনবমী ১২৩০—মৃত্যু ৭মাঘ ১৩১৩। বারেন্দ্রশ্রেণী কুলীনশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির বংশে তাঁহার জন্ম। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্য ও চরিত্র বলে সমগ্র বঙ্গদেশে সুখ্যাতিলাভ করেন। কাশীম-বাজারের রাজা আশুতোষনাথ রায়ের জননী পুণ্যশীলা আর্য্যকালী দেবী মুর্শিদাবাদে যে জুবিলীটোল প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরাম শিরোমণির অধ্যক্ষতায় তাহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তিনি নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন এবং গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

৪। রাখালদাস ন্যায়রত্ন

ভট্টপল্লীনিবাসী। জন্ম ২৮ ভাদ্র ১২৩৬-মৃত্যু ২ অগ্রহায়ণ ১৩২১ পাশ্চাত্য বৈদিক। সাধকশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ঠাকুরের ইনি অধস্তন নবম পুরুষ। তদীয় প্রধান ছাত্র শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় "কাশীবাস" গ্রন্থে (১৩১২) তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ব্যতীত ভট্টপল্লীর বাহিরে অন্য কাহারও নিকট পাঠ স্বীকার করেন নাই। ভট্টপল্লীর পাণ্ডিত্যখ্যাতি বর্ত্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশে যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ প্রতিভার অবতার হলধর তর্কচূড়ামণি ও রাখালদাসেরই কীর্ত্তি বটে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত তদ্রচিত "তত্ত্বসার" গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ভূমিকায় মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডের দুরূহস্থল সমূহে তাঁহার স্বোদ্ভাবিত বিচারাবলী ব্যতীত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" প্রভৃতি গ্রন্থে সম্পূর্ণ নূতন বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রের পঠনপাঠন লুপ্ত না হইলে রাখালদাসের নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

৫। প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন

নদীয়া জেলার বিল্বপুষ্করিণী (বেলপুকুর) গ্রাম নিবাসী ১১ বৈশাখ, ১২৯৭ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে বেলপুকুরের ঠাকুরবংশ চিরবিখ্যাত। সাগরদিয়া বন্দ্যবংশে রত্নগর্ভের প্রপৌত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই মহাপুরুষের বংশ ও শিষ্যমণ্ডলী বাঙ্গালার বহুস্থানে এখনও বিরাজমান। নিজ বেলপুকুরে দুইটিমাত্র ধারা বিদ্যমান আছে। প্রসন্নচন্দ্র রামচন্দ্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। যথা, রামচন্দ্র—রামগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার—মহাদেব ন্যায়বাগীশ—রামগোপাল তর্কবাগীশ—গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—রামতনু—প্রসন্নচন্দ্র। বিভিন্ন জেলায় এই বংশে বহুতর সাধক ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রসন্নচন্দ্রের পূর্ব্বে একমাত্র বেলপুকুরেই তদ্বংশীয় ৫৬ জন পণ্ডিতের নাম আমরা পাইয়াছি। প্রধানতঃ ইঁহাদের পাণ্ডিত্যবলে নিজ নবদ্বীপের সহিত সমকক্ষতা করিয়া বেলপুকুর একটি বিশিষ্ট সারস্বত কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। প্রসন্নচন্দ্র নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে নানা দেশীয় বহু ছাত্র পড়াইয়া খ্যাতিলাভ করেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অবসর গ্রহণের পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক পদে তাঁহাকে নিয়োগ করার চেষ্টা হয়, কিন্তু চিরাচরিত বংশানুক্রমিক শাস্ত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি চাকরী গ্রহণে অসম্মত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্নও একজন প্রবীণ নৈয়ায়িক ছিলেন।

৬। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন

হুগলীর অন্তর্গত কোন্নগর নিবাসী। ২৬ আশ্বিন ১৩০২ সনে ৭৬ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন। রাঢ়ীয়সমাজের কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশের বিখ্যাত কুলীন গঙ্গাগতির এক অকুলীন ধারায় অধস্তন একাদশ পুরুষে তাঁহার জন্ম। যথা—নারায়ণখণ্ড—আনন্দ সার্ব্বভৌম—গোপীনাথ—রামেশ্বর—রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—শ্রীনিবাস তর্কবাগীশ (১১২২ সনে ৪০ বৎসরে মৃত্যু)—রামকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত (১২২২ সনে ১০৩ বৎসরে মৃত্যু)—কাশীনাথ ন্যায়বাচস্পতি (১২৪০ সনের আশ্বিনে ৬৬ বৎসরে মৃত্যু)—হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (৮০ বৎসরে ৪ কার্ত্তিক ১২৮০ সনে মৃত্যু)—দীনবন্ধু। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি শঙ্কর তর্কবাগীশ। তাঁহার চারিজন প্রধান ছাত্র "নাথ-চতুষ্টয়" নামে তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর পিতামহ দিগ্বিজয়ী কাশীনাথ এই নাথচতুষ্টয়ের অন্যতম। তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় কোন্নগর তৎকালে "দ্বিতীয় নবদ্বীপ" নামে পরিচিত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর জীবদ্দশায় কোন্নগরের এই সুখ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি নবদ্বীপের মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত মুর্শিদাবাদের শ্রীরাম শিরোমণি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভায় ও অধ্যাপনাগুণে আকৃষ্ট হইয়া বহুতর কৃতী ছাত্র কোন্নগরে বিদ্যালাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলার নৈয়ায়িক সমাজে দীনবন্ধুর গভীর পাণ্ডিত্য ও চতুর পরিহাসের কথা এখনও বৃদ্ধমুখে প্রচারিত আছে।

৭। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

মৈমনসিংহ সেরপুর নিবাসী। জন্ম ১৯ কার্ত্তিক ১২৪৩—মৃত্যু ২০ মাঘ ১৩১৬। রাঢ়ীয়শ্রেণীর বন্দ্যবংশীয়। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পর এইরূপ "সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র" মহাপণ্ডিত বঙ্গদেশে

আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার জীবদ্দশায় ১২৯৬ সালের নব্যভারতে (আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা, পৃঃ ৩৪৭-৫১) তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। পঠদ্দশায় স্মৃতিশাস্ত্রই তাঁহার পাঠ্য বিষয় ছিল এবং বহু অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বিক্রমপুর পুরাপাড়া নিবাসী দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়। কিন্তু তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা প্রথম হইতেই নব্যস্মৃতির সঙ্কীর্ণগণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিরাট সংস্কৃতসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে শফরীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল এবং তাঁহার রত্নপ্রসূ লেখনী কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, প্রাচীন ও নব্যস্মৃতি, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল গ্রন্থরত্ন প্রসব করিয়াছে তাহার সংখ্যা ও মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। তাঁহার এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিগত শতাব্দীতে নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির একনিষ্ঠ সেবক পণ্ডিত সমাজে ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। গুণগ্রাহী মহেশচন্দ্র তাহা উপেক্ষা করিয়া এই অনতিপ্রাচীন পাণ্ডিতকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণের মধ্যে চন্দ্রকান্তই বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সাধারণ শিক্ষিতসমাজ সংস্কৃত গ্রন্থাদির পাণ্ডিত্যগ্রহণে অসমর্থ। চন্দ্রকান্তই সর্ব্বজন-বোধ্য সরল ভাষায় দুরূহ ষড়্‌দর্শনের তাৎপর্য্য "ফেলোশীপের লেক্‌চারে" বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

৮। তারিণীচরণ শিরোমণি

ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং গৌরালীর বশিষ্ঠ গোষ্ঠীকে বিদ্বৎসমাজে খ্যাতিসম্পন্ন করেন। তিনি দক্ষিণ বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং যদিও তিনি গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তথাপি নব্যস্মৃতির দুরূহ স্থলে তাঁহার বিশিষ্টমত ছাত্রপরম্পরায় এখনও প্রচারিত থাকিয়া তাঁহার প্রতিভা সূচনা করিতেছে। তিনি স্মৃতি-শাস্ত্র বিক্রমপুর পুরাপাড়া নিবাসী দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সামাজিক আন্দোলন বিশেষে জড়িত হইয়া তিনি জীবন-সন্ধ্যায় কলিকাতায় আসিয়া পাথুরিয়া ঘাটা রাজবাটীর সভাপণ্ডিতরূপে প্রভূত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৭ সনে প্রবীণ বয়সে তিনি স্বর্গত হন এবং ৮জন মহামহোপাধ্যায়ের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

বঙ্গদেশে এই ৮জন মহাপণ্ডিতের সমকক্ষ আর কেহ তৎকালে জীবিত ছিলেন না মনে করিলে ভুল হইবে। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি তৎকালে কেহ কেহ এই উচ্চ সম্মান স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক প্রসন্নকুমার তর্করত্নের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণ সকলেই দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের সন্তান এবং মহেশচন্দ্র ব্যতীত প্রত্যেকেই আজীবন শাস্ত্র ব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। প্রতিভা, ছাত্রসম্পদ্ এবং অধ্যাপনা নৈপুণ্যের সমাবেশ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উপাদান ছিল, গ্রন্থ রচনা নহে। গত শতাব্দীর শেষেও বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র লীলাক্ষেত্র ছিল বাঙ্গালীর নিজস্বকীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ নব্যন্যায় এবং তদ্‌ঘটিত নব্যস্মৃতি।

হিন্দু-উত্তরাধিকার বিধি

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল

গত ভাদ্র সংখ্যায় আমরা সপিণ্ড, সাকুল্য ও সমানোদক-এর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অতি সংক্ষেপে 'বন্ধু'-র অর্থ জ্ঞাপন করিব।

(ঙ) বন্ধু—মিতাক্ষরায় 'বন্ধু' অর্থে ভিন্ন-গোত্র সপিণ্ড। বন্ধু স্ত্রীলোকের সম্পর্কে সম্পর্কিত একটী বিশেষ শ্রেণীর উত্তরাধিকারিগণ। মিতাক্ষরা অনুসারে 'বন্ধু' ত্রিবিধ, যথা—(ক) 'আত্মবন্ধু' (খ) 'পিতৃবন্ধু' ও (গ) 'মাতৃবন্ধু'।

(ক) আত্মবন্ধু হইতেছেন—(১) পিতার ভগিনীর পুত্র
(২) মাতার ভ্রাতার পুত্র
(৩) মাতার ভগিনীর পুত্র

(খ) পিতৃবন্ধু হইতেছেন—(১) পিতার পিতার ভগিনী-পুত্র
(২) পিতার মাতার ভ্রাতার পুত্র
(৩) পিতার মাতার ভগিনীর পুত্র

(গ) মাতৃবন্ধু হইতেছেন—(১) মাতার পিতার ভগিনীর পুত্র
(২) মাতার মাতার ভ্রাতার পুত্র
(৩) মাতার মাতার ভগিনীর পুত্র

বর্ত্তমানে ভারতীয় হাইকোর্ট কিন্তু বলেন যে মাত্র উপরিউল্লিখিত নয় জনই বন্ধু, অপর কেহ 'বন্ধু' নহে এমত নহে, শাস্ত্রোল্লিখিত উপরিউক্ত অনুজ্ঞা অনুজ্ঞা নহে, উহা উদাহরণ মাত্র; আসলে পিতার দিক দিয়া ৭ম পুরুষ পর্য্যন্ত ও মাতার দিক দিয়া ৫ম পুরুষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সম্পর্কে সম্পর্কিত সপিণ্ডকে 'বন্ধু' ধরা হইয়াছে ও ইহার উপর আবার নিজের অধস্তন সাত পুরুষ ভিন্ন-গোত্র সপিণ্ডও 'বন্ধু' পর্য্যায়-ভুক্ত হইয়াছে।

যাহাই হউক এ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়—মিতাক্ষরায় যাহাই থাকুক না কেন দায়ভাগে 'বন্ধু' সম্পর্কে বিশেষ গোলযোগ নাই। একমাত্র বিবাহের সময় 'ত্রিগোত্রান্তরিত সিদ্ধান্ত' আলোচনা ব্যাপারে গোত্র গণনাকালে বন্ধুর খোঁজ হয় (১)। উত্তরাধিকার ব্যাপারে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'বন্ধু' সম্বন্ধে আলোচনা না করিতেও পারি কেন না আমাদের আলোচনা মুখ্যত দায়ভাগ সম্বন্ধে। মিতাক্ষরায় উল্লিখিত নয় জন বন্ধুর মধ্যে কয়েক-জনকে ত' আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের ২ ও ৩ নং তালিকায় দায়ভাগ সপিণ্ডগণের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

মোটামুটি ভাবে আমরা কয়েকটী সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলাম। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা পিণ্ড সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

(১) ১৩৫০ সালের আষাঢ় সংখ্যায় ভারতবর্ষে প্রকাশিত মৎলিখিত "হিন্দু বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ—পৃঃ ৩৪ ১ম কলম দ্রষ্টব্য।

দুঃস্বপ্ন

শ্রীসুবোধ বসু

ভবতোষের বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলাম। রাত এগারোটা, ট্রাম বাস্ অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হণ্টনং ছাড়া উপায় নাই। খাওয়াটা একটু গুরুতর রকম হইয়া গিয়াছে, নহিলে রাসবিহারী এভেনিউ-র মতো এমন চওড়া, চকচকে সড়ক দিয়া হাঁটিতে পারা তো রীতিমত একটা বিলাসিতা। বেজায় ঘুম পাইয়াছে, হাতের কাছে একটা চাইনিজ রোল্‌স্ অর্থাৎ রিক্সা পাওয়া গেলে চড়িয়া বসিতাম। কিন্তু সে সকল কোনটারই সন্ধান না-পাওয়ায় চিকিৎসককুলের উপদেশকেই সম্মান দেখাইতে সংকল্প করিলাম—ডিনারের পর এক মাইল হাঁটা যে একান্তই উচিৎ, সে-বিষয়ে আমার আর সন্দেহমাত্র রহিল না।

মধ্য রাত্রে রাস্তায় হাঁটিবার একটা বড় রকম সুবিধা আছে। মাত্র এই সময়েই হুঁসিয়ার না-হইয়া রাস্তা চলা যায়। যেমন ইচ্ছা রাস্তার মধ্যখানে যাও, যেমন ইচ্ছা রাস্তা পার হও, যেমন ইচ্ছা আঁকিয়া বাঁকিয়া, চোখ মেলিয়া চোখ বুজিয়া ফুটপাথ দিয়া চল, সংঘাতের আশঙ্কা নাই। ইচ্ছামত কল্পনা করিতে করিতে, স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, ছাইপাঁশ ভাবিতে ভাবিতে চল, কাহারও ঘাড়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া জবাবদিহি হইতে হইবে না।

আমিও এমন সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ১৯৪৪ সনের রাসবিহারী এভোনিউ দিয়া চলিতে চলিতে ১৯৩০ সনের বালিগঞ্জ এভেনিউর কথা মনে পড়িয়া গেল। তারও আগে এর নাম ছিল, মেইন স্যুয়ার রোড—বড় নর্দ্দমার রাস্তা—কিন্তু নর্দ্দমার কল্পনা আমাকে কোনও দিনই মুগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া কল্পনা আজও তাহাকে এড়াইয়া বালিগঞ্জ এভেনিউ-তে পলাইয়া আসিল। তখন এই লম্বা রাস্তাটার দু-পাশে মাত্র সামান্য ক'খানা বাড়ি, ইচ্ছা করিলেই আঙুলে গোণা যাইত। গড়িয়াহাটার মোড়টা তো ফাঁকা মাঠ ছিল। একটু রাত হইলে এখান দিয়া চলিতে গা-ছমছম করিত। নানা আকার আকৃতির রহস্যপূর্ণ নিঃঝুম গাছগুলির দিকে বারবার আশঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে মনোহরপুকুর দিয়া কালীঘাটের ট্রাম ধরিতে আগাইয়া যাইতাম।

ক্রমে ক্রমে সেপকুলেটারদের প্রচারের ফলে বালিগঞ্জের সুবিধা সহরবাসীদের নিকট প্রকট হইতে লাগিল, বালিগঞ্জের প্রসিদ্ধি বাড়িতে লাগিল, নতুন বাড়ি নতুন স্থাপত্য-ভঙ্গিতে তৈয়ারী হইতে লাগিল, ঢাকুরিয়া লেক শহরের বেড়াইবার সেরা জায়গা হইয়া উঠিল (ট্রামের অল্-ডে টিকিট কিনিয়া উত্তর-কলিকাতার লোকেরা গর্ব্বিত-ভাবে এখান হইতে বেড়াইয়া যাওয়া সুরু করিল), সাহিত্যে বালিগঞ্জের যুবক-যুবতীরা ফ্যাসন হইয়া উঠিল, কেহ কেহ লেকের জলে ডুবিয়া মরিয়া লেককে অধিকতর সম্রান্ত করিতে সাহায্য করিল, পাড়া হিসাবে সেদিনের বালিগঞ্জ সকলকে টেক্কা দিয়া গেল। রাসবিহারী এভেনিউ সেই হঠাৎ-সমৃদ্ধ, ফ্যাসান-নিষ্ঠ, বাংলার বুর্জোয়া ও সম্রান্ততাকামীদের আখড়া বালিগঞ্জের প্রধানধমনী। চমৎকার রাস্তা, এখানকার বাসিন্দাদের সুরুচি, সম্রান্ততা ও সমৃদ্ধির প্রতীক...

'শুনচো, বাবু ?'

চমকাইয়া চাহিলাম। দেখিলাম, ত্রিকোণ পার্কের পাশের চওড়া চকচকে ফুটপাথ দিয়া চলিয়াছি। রেলিঙের ধারে গাছের ছায়ার মধ্যে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়-তোলা শুধু গায়ে একটা লোক হাত চারেক দূরেই দাঁড়াইয়াছিল, বুঝিলাম সেই প্রশ্ন-কর্ত্তা।

'ও বাবু, কথাডা শুনচো ?'

'বিলক্ষণ', দক্ষিণী পাড়া-গেঁয়ে টান শুনিয়া কহিলাম, 'কিন্তু ধান-কাটতে না-গিয়ে শহরেই রয়ে যাওয়া হয়েচে কেন ?'

'ইচ্ছা কইরে কি আর রয়েচি', ঈষৎ রাগত-স্বরে লোকটা কহিল, 'তোমরা পাঁচজনে রেখে দিলে, তাই রয়ে গেলু।'

'কি রকম ? তোমার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে কখনও মোলাকাৎ হয়েছিল নাকি ?'

'হয়নি তাই বইলবে কে ?' লোকটা না দমিয়া কহিল, 'আমার সঙ্গে দেকা হয়ি না থাক্‌লে, আমাদেরের আর কারুরি সাথে দেখা হয়ি থাকবে। এদের কারুরি ডেকে জিগেস কইরবো ?...

'এ যে রীতিমত কৈফিয়ৎ-তলবের ব্যাপার দেখছি। কিন্তু কই, আর কাউকে তো দেখছি নে।...'

'আচে, এ-ধারি ও-ধারি আশে পাশে সব শুয়ে আচে।' লোকটা নির্লিপ্তভাবে কহিল। 'কত-যে, তার গোণা-গুন্‌তি নেই। ডাকলেই উটে আসবে।' বলিয়া ওই, উই, হইস্ প্রভৃতি অদ্ভুত সম্বোধনে ডাক ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে, যেন অন্ধকারের মধ্য হইতে, ছায়া ও অদৃশ্য আড়াল হইতে অগুন্তি শীর্ণকায়, বলীরেখাঙ্কিত ললাট, গাত্রবাসহীন, কঙ্কালসার লোক পিল্‌পিল্ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের কোটরে-ঢোকা চোখের দৃষ্টি ক্ষুধিত, আহত ; দেহগুলি আছড়াইয়া আছড়াইয়া কে যেন সকল মাংস ও সৌষ্ঠব ঝরাইয়া দিয়াছে, ক্ষুধাতুর দাঁতের মতো পাঁজরাগুলি চামড়া ফুঁড়িয়া যেন হাঁ করিয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কঙ্কালের মতো এই জীবগুলি আমাকে চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। নানা জনের অস্ফুট, আহত, তিক্ত প্রশ্নজালে চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল। 'কেন ?' 'জবাব দাও ?' 'ক' পয়সা দান কইরেচ ?' 'চা খেয়ে, খাইয়ে কত পয়সা জলে ফেলেছ ?' 'কটা কয়ে' পদ খেতে ?' 'কালো বাজারে কি কি জিনিষ বেচেছ ?' 'ক মণ চাল মজুদ করেছিলে ?' 'মুনাফাকারী আত্মীয় বন্ধুদের একবারও কি নিন্দা করেছিলে ?' 'আমরা যে ধান ফলিয়েছি, তোমরা তা ছিনিয়ে নিয়েছ।' 'শস্য ফলাব আমরা, আর ভোগের বেলায় তোমরা ?' 'অকৃতজ্ঞ বাবুরা, অকৃতজ্ঞ বাবুরা...' প্রশ্নগুলি অফুরন্ত বাণের মতো আসিয়া বিঁধিতে লাগিল।

'আচ্ছা বাচাল হয়েছ তো সব !' আমিও রাগিয়া কহিলাম, 'ভাতের যে-সব ফ্যান নর্দমাতে না-ফেলে তোমাদের দিয়েছি,

তার জন্য খুব কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছ তো ? ও না হলে আর চাষা-গেঁয়ো !···সব দোষই আমাদের হলো, কেমন ? আমরাও ছা-পোষা মনুষ্যই, বাবাজীবনেরা, এক একটা লাট-বেলাট নই। আমরাও আপন বাঁচাতে গলদঘর্ম হয়েচি। দোষ যদি দিতে হয়, দাও গবর্ণমেণ্টকে—দেশের লোকের জন্য ভাবনা-চিন্তা করবার ভার তাদের। ইচ্ছে হয়, দোষ দাও গিয়ে···'

'গর্বমিণ্টকে আর পাচ্ছি কোথা ? তোমারাই তো গবর্মিণ্ট।' সেই প্রথম বাচাল লোকটা অভিযোগের সুরে কহিল—'তোমরাই জজ-ম্যাজিষ্টর, হাকিম-কেরাণী, মিনিষ্টার বাহাদুর···'

'আহা, আবার মিনিষ্টারদের কেন ? তারা নিজের মনে চাকরি করচে, কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—সাক্ষীগোপাল বললেই হয়। দোষ দেবার হয়, দোষ দাও গবর্ণমেণ্টকে, কারুরই গায়ে লাগবে না।···হোম ফ্রণ্ট্ কাকে বলে জানো ? টোটেল ওয়ার কাকে বলে জানো ? এ-যুদ্ধ বড় কঠিন যুদ্ধ, যারা পিছনে থাকে, তাদেরও ছেড়ে কথা কয় না। তোমরা হলে গিয়ে, হোম ফ্রণ্টের হতাহত, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। যুদ্ধ, রপ্তানি, যুদ্ধের দরুণ বাড়তি লোক আমদানি, মানুষের ঘুষ-খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মুনাফা বাড়াবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ইন্‌ফ্লেশান, মানে মুদ্রাস্ফীতি, এ-সব নানা কারণেই দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়েছিল। তা, আমরা কি এ-সম্বন্ধে খবরের কাগজে কম লিখেছি, কম ফ্যান আর লাপ্‌সি তোমাদের বেঁটে দিয়েছি, সুমনা-সুচেতা, মালতী আরতিদের চ্যারিটির জন্য কম নাচিয়েছি ? আমি তো হিসেব করে' দেখেছি, ট্রামের এক পয়সা-ই কুপনে, ডবল পয়সা, এক আনায় মিলে দুর্ভিক্ষের সুরু হ'তে এ-পর্য্যন্ত নিজের পকেট থেকে অন্তত এক টাকা চৌদ্দ আনা পয়সা ব্যয় করেছি। অথচ সেই তোমরাই আমাকে একলা পেয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছ, যেন তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের জন্য একলা আমিই দায়ী···'

যুক্তির সারবত্তায় লোকটা বোধ হয় একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। এমন সময় কোলে একটা পাঁজরা বাহির করা শিশু লইয়া, স্বল্প এবং ছেঁড়া কাপড় পরা একটা কঙ্কালসার স্ত্রীলোক ভিড় ঠেলিয়া সুমুখে আগাইয়া আসিল। আসিয়াই কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, 'না, তোমার দোষ হবে কেনে, দোষ কারুর লয়, তবু কাতারে কাতারে আমরা শেষ হয়ে গেলাম। সেই গেল সনে, দুপুর বেলা সেই যখন টেরামে উঠছিলে, কত করে' মাথা কুটে এক আনা পয়হা চালাম, বার বার কোলের শিশুটারে দেখালাম, কইলাম, তিন-তিনটে দিন ধরে' না খেয়ে এটার প্রাণ ধুকধুক করতিছে, কান্‌বার পর্য্যন্ত জোরটুকু নেই, মরা চারাটার মতো নেতিয়ে পইড়েচে, এরে বাঁচাও বাবু, মায়ের সন্তানটারে বাঁচাও। তা দিলে কি চারটে পয়হা ? কইলে, সারা দিন তো ভিক্ষে কইরে বেড়াচ্ছিস, চারটে পয়হা জোগাড় হলো নি ? তোদের যে মিছিল চইলেছে, সারাক্ষণ চেয়ে চেয়ে তোরা কি আমাদের মাথা খারাপ করে' দিতে চাস ? অত পয়সা দেবার ক্ষমতা আমাদেরই কোথা ? খিঁচুড়ি সবাই পাচ্ছে, আর তুই পাচ্ছিস নে ? বলে তুমি পানের দোকানে গিয়ে দু আনার সিগারেট কিনলে। বলি, বাবু, মনে আচে সে কত্তাটা ?··· ···'

'এই যে, বাবু কর্ত্তা, চিনতে পারতিছ ?' বলিয়া একটা লোলচর্ম্ম বুড়া লাঠিতে ভর করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বায়স্কোপের বাড়িটার সুমুখে দেকা হইছিল ? রাস্তার ও-পারে তখন আমার বুড়ি ধুঁকচে, ব্যাটার বউটার ওলাউঠো সুরু হয়েচে, নেড়ী আর পটলা ক্ষিদেতে মরে যাচ্চি, দাদু। একটু ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও গো' বলে রাস্তার ধারে পড়ে' কাটা-ছাগলের মতো পা দাপড়াচ্চে। আমি তোমাকে হাওয়া-গাড়ি থেকে আর পাঁচজন বাবুর সঙ্গে নামতে দেখে মরিয়া হয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ানু। চাষার ছেলে আমি, গতর খাটিয়ে, মাটি চষে' সংসার প্রতিপালন ক'রেছি, কারুর কাছে কোনওদিন কাণা কড়িটির জন্যি হাত পাতিনি। লজ্জা সরমের মাতা খেয়ে, তোমার কাছে গিয়ে হাত পাইতলাম—বাবু, বাঁচাও, দু আনা চার আনা যা হয় দাও; আমি গেরস্ত মানুষ, স্ত্রীপুত্র নিজে আজ পতে ব'সছি।—তা তুমি কি জবাব দিলে ? 'এখন যাও, সব সময়ে বিরক্ত ক'রো না; তোমাদের জ্বালাতনে আর পারি না। সর্ব্বক্ষণ কাঁহাতক পারা যায়।—অমিয়, শীগ্‌গির যা ভাই, আবার টিকিট পাওয়া গেলে হয়। যা ভিড় হয় আজকাল ছিনেমাতে, কে বইলবে আমরা দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে চইলেছি। আর লোকে করবেই বা কি। চতুর্দ্দিকের আবহাওয়ায় মন এমন খারাপ হয়ে থাকে···'

'হ্যা গো, বাবু', বলিয়া একটা হাড়্ডিসার বছর দশ বারোর ছোক্‌রা হাতে একটা ঢিল উদ্যত করিয়া ভিড়ের মধ্য হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দেখি, মজা মন্দ নয়, অ্যাং-ব্যাং, খল্‌সে-পুঁটি সবাই দেখি বীরত্ব ফলাইতে সুরু করিয়াছে।

কহিলাম, 'তুমি শ্রীমান কে বট ?'

'কে বটি ?' ছোক্‌রা ভিমরুলের সুরে কহিল, 'বেশ কথা হলো, কে বটি ? ঠ্যাংটা ভেঙে দিয়ে এখন বেশ ভুলে মেরেছে দিলে। সেই যে গো, সরকারী বাগিচার সুমুখে। ছুট্টে রাস্তা পার হচ্চিনু। হুইস ক'রে হাওয়া-গাড়ী নিয়ে ঘাড়ে এসে পইড়লে। সেই বাবুগুলির সুমুখে তুমি ছিলে না ? ঝুঁকে বইললে না, 'না, মরেনি, মামা। পায়ের ওপর দিয়ে গ্যাচে। আর দেরী লয়, পাঁচটা টাকা ফেলে এইবার সটকে পড়ো। এত জোরে চালানো তোমার ঠিক হয়নি, সেই মোটা বাবুটি কইলেন, 'আন্‌কোরা লতুন গাড়ি, বেরেকটা কাজ কইরবে না, কি কইরে বুঝব ? ইস্‌পীডটা টেরাই করছিলুম।' তুমি বইললে, 'শীগগির করো, বেলেক মার্কিটে যা মুনাফা ক'রেছ, লোক মারার দায়ে পইড়ে সেগুলি আবার ঘর থিকে বার কইরে না দিতে হয় !' মোটা বাবুটি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে কইলেন, 'হ্যাঁ, হলেই হলো। দুদিন পরে এটা তো না-খেয়ে অমনি লিকেশ হ'তো। পাঁজরা ছাড়া এটার আর আছে কি।—এই ছোক্‌রা, চেঁচিয়ে মরবি নাকি ? এই নে, কোনও দিন দেকেচিস পাঁচ টাকার লোট চোকে ?' ব'লে চারদিকে তাইকে' দেকে তোমরা আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলে। তুমি কইলে, 'সাবধান, অত জোরে চালিও না। এদিকটা ভিকিরিতে ভর্ত্তি, রাস্তায় কোনও আইনও ওরা গেরাহ্যি করে না···'। তোমাদের দলের সেই ঢেঙা-পানা লোকটা ব'ললে, 'মিলিটারি কনট্রেক্‌টের পয়হায় কেনা গাড়ি কিনা, মিলিটারি ইস্‌পীডে চ'লতে চায়···'। ফুটপাথের ধারের ঘাসের ওপর আমাকে ফেইলে রেকে, গাড়ি হাঁকিয়ে তোমরা পেইলে' গেলে। এখন বলচ, মনে নেই।—মানব এই ছিল ?···'

'তা বাছাধন, একবার চেষ্টা করে দেখতে পার', আমি না রাগিতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম। 'কিন্তু দুর্ঘটনায় স্বাস্থ্য বা তেজের কোনও কম্‌তি হয়েচে বলে তো মনে হয় না। সেই সামান্ত অ্যাক্‌সিডেণ্টের দৌলতেই তো আজও বেঁচে আছ; পাঁচ পাঁচটা টাকা তো একটা জমিদারি···'

'ভারি তো দিলে! এক মিনিটও আমার কাছে থাকলো কি?' ছোকরাটা বেশ রাগত-স্বরে কহিল। 'তুমি যেতে না যেতেই পাহারাওয়ালাবাবু এইসে বল্লে, 'বজ্জাত চোর, লোট কোত্তা পেইচিস বল? কার পকেট থিকে মেরে দিইচিস বল?' যতই আমি বলনু, 'বাবুরা গাড়ি-চাপা দিয়ে আমার ঠ্যাং মুচড়ে দিয়ে আমারে বক্‌শিষ দিয়ে গ্যাচে', ততই সে গোঁফ্ পাইকে' পাইকে' আরও খাপ্পা হয়ে উঠল। শ্যাষে আমার কান মইলে, ব্যাটা ক্ষুদে চোর বলে গালি দিয়ে, লোটটা হাত থিকে কেড়ে নিলে··। বড় কাজে লাগল তোমাদের পাঁচটা টাকা। ইদিকে খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে ভিক্ষে ফিরতি পারি নে, খিচুড়ি খাওয়ার জায়গায় যেতে পারি নে, ধুঁকে ধুঁকে, উপোসে উপোসে, তেষ্টায় তেষ্টায়, ছটফটিয়ে, পা-দাপড়িয়ে তারপর একদিন শ্যাষ হয়ে গেলাম······'

'শেষ হয়ে গেলে কোথায়?' আমি কহিলাম, 'এখনও দিব্যি খোস্ মেজাজে, বাহাল তবিয়তে রাজধানীর হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ, দেখচি। গাঁয়ে ফিরে যেতে বোধ হয় আর মন উঠচে না···'

'আজ্ঞে, সি-টি বলবেন না,' প্রথমকার সেই মুখ-ফোঁড় লোকটা প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'ওর আর ফিরে যাবার উপায় নেই। এই ফুটপাথের ইদিক থেকে ওদিক তক্ ওর সীমানা। আমাদের সববারই সীমানা। ইচ্ছে মত যেথা সেথা যাবার আর উপায়টি রাখোনি, বাবুরা। আমরা এইটুকু চৌহদ্দির মধ্যে কায়েমি হয়ে রইচি, শ্যাষ সময় যে যেখানে প'ড়েছিলাম, সেইখেনেই রয়ে গিইচি। এইখেন থেকে শুয়ে শুয়ে রাত্তির দিন তোমাদেরকে শাপশাপান্তর করি, তোমাদের সকলকার বাড়িতে বিষালো শ্বাস আর দিষ্টি পাইঠে' দিই। তোমরা যারা পাঁচ পদ, চর্ব্ব-চষ্যি খেয়ে, বাইস্কোপ দেখে, সিগারেট ফুঁকে, বাড়তি মুনাফার টাকায় ইস্ত্রী পরিবারকে দামি শাড়ি আর গয়না কিনে দিতে দিতে আমাদেরকে এক আধ্‌লা ছুঁড়ে দেছ, আর উঃ আঃ করে' রাস্তায় পড়ে থাকা আমাদের জন্তি দুঃখু জানিয়েছ, তোমাদের শাপমন্যি করবার জন্তি আমরা রয়ে গিচি। তাহটা পুড়ে ছাই হলেও আমাদের বিষ যায়নি, আমাদের জ্বালা···'

'দেহ পুড়ে ছাই হয়েচে।' আমি চমকাইয়া সবিস্ময়ে কহিলাম।

'আজ্ঞে, অনেক দিন। ধাঙড়েরা আমাদের পাইকিরি ভাবে চিতের চড়িয়ে দিয়ে ছ্যালো। তুমি বলছিলে, বাবু, ধান-কাইটতে গাঁয়ে ফিরে যাইনি কেনে? ভেবেচ, শহরে বুঝি মজা লেগেছে। রামচন্দ্র! এমন দয়া ধম্মহীন জায়গায় শখ করে' মানুষে এক দণ্ডও থাকে! ধান কাটার যখন সময় এলো, ফিরে যাবার আর জো রইল নি—ওকি, বাবু, ছুটচ কেনে? একটা জবাব দিয়ে যাও। যা মিথ্যে কতার কচকচি লয়, মিটিঙের বক্তিমে লয়, এমন একটা হক্ জবাব দিয়ে যাও···ডর কি, ডর কেনে?···'

উল্টা দিকের ডিপো-অভিমুখী একটা ট্রামের ঘণ্টায় চমকাইয়া দেখিলাম, ত্রি-কোণ পার্কের পশ্চিম দিকের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। পিছন হইতে সেই মূর্ত্তিগুলি তখনও যেন প্রশ্ন করিয়াই চলিয়াছে—'জবাব চাই, জবাব চাই?' 'কি বলবার আছে বলো,' 'দলে দলে তিলে তিলে মরেছি, কতটুকুন করেছ?' 'আমাদের বাঁচার ইচ্ছা কি তোমাদের চেয়ে কম?' 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও··'

আমি আর পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম না। যত হোক, জায়গাটা খুব ভালো নয়। ফুটপাথটায় বহু ভিখিরি অনাহারে অচিকিৎসায় মরিয়াছে, তা তো নিজের চোখেই দেখিয়াছি। রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় যে দুর্গতেরা তিলে তিলে, বুভুক্ষায়, ব্যাধিতে, গৃহহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় উদাসীন নাগরিকদের চোখের সমুখে শৃগাল কুকুরের মতো অসহায়ভাবে মাসের পর মাস ধরিয়া মৃত্যুর মিছিল করিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রেতাত্মা শহরের ফুটপাথ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে কিনা এবং শহরের সকল সমৃদ্ধির উপর বিষাক্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে কিনা জানিনা, কিন্তু সেই স্মৃতি সুখের নয়। ইহার সঙ্গে আমাদের অসহায়তা ও স্বার্থপরতার কাহিনী মেশানো আছে।

লেক-ভিউ রোডে মোড় লইয়া লেকের বাতাসের স্পর্শ পাইলাম। ঘুমের ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। মাথাটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল। পেটের সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ; পেট-গরম হইলেই আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভালো খাওয়া দেখিলে কিছুতেই জিহ্বাকে শাসনে রাখিতে পারি না।

এ জীবন নয় মায়া নয়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কালের দুরন্ত স্রোতে ভেসে চলে যায়
একে একে দিনগুলি। রক্তিম সন্ধ্যায়
প্রভাতের অবসান। সন্ধ্যা হয় লীন
উষার ধূসর বুকে। আসে নব দিন
ল'য়ে তার সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুজল।
বসন্তের কচি কচি নব পত্রদল

আর এক বসন্তে ঝ'রে পড়িছে বাতাসে!
সান্ধ্যবায়ু কাঁদে ঝরা-পুষ্পের নিঃশ্বাসে!
জীবন-মৃত্যুর খেলা চলে ঘুরে ঘুরে।
বিচিত্র সৃষ্টির নাট্য মেঘে ও রোদ্দুরে।
জানিনা হঠাৎ যাত্রা ফুরাবে কখন!
চলে যাবো বহুদূরে। আসিবে নূতন।

যুগ যুগ চলিতেছে একই অভিনয়।
তবু বলি, এ জীবন নয় মায়া নয়।

ক্যাম্‌ব্রিজী বাংলা

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

মিশনরী বাংলা বুঝি, মুসলমানী বাংলা বুঝি, কিন্তু ক্যাম্‌ব্রিজী বাংলা? একেবারে সগোত্র না হইলেও, সেও একরকম আছে বটে। অবধান করুন।

এক সময় ছিল, যখন ভারতীয় বিচারকের ইউরোপীয় আসামীদিগকে দণ্ড দিবার অধিকার ছিল না। ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের স্মৃতি এখনও আমাদের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দিগের জন্য আলাদা ব্যবস্থা বিচার ক্ষেত্রে এখন নাই বটে, কিন্তু যেখানেই দেশী ও বিলাতীর একত্র সমাবেশ ঘটে সেইখানেই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এখনও পূর্ণভাবে বিদ্যমান। শ্বেতচর্মদের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের Ecclesiastical Department যে টাকা খরচ করেন, তাহার বিরুদ্ধে বহু ব্যর্থ আন্দোলন হইয়াছে। এমনি দৃষ্টান্ত পদে পদে পাওয়া যাইবে। কালাধলার বিরোধের আর এক দৃষ্টান্তস্থল শিক্ষাবিভাগ।

Anglo-Indian ও European মিলিয়া যে কয়েক লক্ষ লোক এদেশে বাস করে এবং সর্বদা Sweet Homeএর দিকে সতৃষ্ণনয়ন মেলিয়া থাকে, তাহাদের শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কত টাকা খরচ করেন? হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে লোকশিক্ষার অনুপাতে তাহা অত্যন্ত বেশী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম বটে কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সেই আলোচনার স্থান নাই। আমাদের দেশীয় শিক্ষাসত্রসমূহকে ইউরোপীয়-সমাজ বিষবৎ দূরে পরিহার করেন, ইহার কথাও তুলিবনা। ইহাদের স্কুলে দেশীভাষার যে দুর্গতি হয়, তাহাই বর্তমান আলোচনার বিষয়।

বেশীর ভাগ ইউরোপীয়ান স্কুল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত;—অর্থাৎ ক্যাম্‌ব্রিজের Junior Local, Senior Local, Higher Local পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশীভাষা শিক্ষা এখনও ঐচ্ছিক বিষয় মধ্যে গণ্য; তবে সাধারণতঃ সকল 'ক্যামব্রিজ' স্কুলেই উহার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে এবং কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই সব ড্যাম-নেটিভ্‌ ভাষা শিখিয়াও থাকেন বটে। কিন্তু নামমাত্রের চেয়েও কম। এর চেয়ে না শিখাই ছিল ভাল। দেশী স্কুলে ৭।৮ বৎসর বয়সের শিশুরা নিম্নতম শ্রেণীতে যেটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করে তাহাও এদের হয়না। না হয় নাই হইল। আমাদের ভাষার প্রতি এই হা-ঘরেদের অবজ্ঞা দীর্ঘজীবী ও জয়যুক্ত হউক। কিন্তু বিপদ বাঁধিয়াছে আমাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে লইয়া।

স্বাধীন জাতির মধ্যে অশনেবসনে ভাষায় সহবতে প্রভুদের অনুকরণ করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা হইতে এখনও আমাদের মুক্তি হয় নাই; বোধহয় হইবেনা। যাহাদেরই কিছু পয়সা আছে, ছেলেমেয়েদের 'নকল ইউরোপীয়ান বানাইবার তাঁহাদের বড় ঝোঁক। তাই দেখি দলে দলে ভারতীয় ছেলেমেয়ে ইংরেজদের স্কুলে ঢোকে। ভারতের যেখানে যত স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সেখানে এই রকম স্কুলের সমারোহ এবং ভারতীয় তীর্থযাত্রীর ভীড়। দেরাদুন তেমন ভাল স্বাস্থ্যকর স্থান নহে; তবু সাহেবী স্কুল আছে ছয়টি। সব মিলাইয়া ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দেড় হাজার হইবে। বারশতের বেশী ভারতীয়। যে শ্বেতচর্মগণ আমাদের বিদ্যাপীঠসমূহের ছায়া মাড়ায় না, তাহাদের বিদ্যালয়ের দরজায় আমরা ধর্ণা দিতেছি। অপমান অবজ্ঞা সহিয়া, কোনরকমে বাঁকাবাঁকা ইংরেজী বুলি এবং দেশীভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, দেশী আচার ব্যবহার অশনবসনের বিরুদ্ধে নাক সিঁটকানো শিক্ষা করা চাই। দেরাদুনের একটি মেয়ে স্কুলে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশী-বিলাতী-বিভাগ আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবু এত অপমানেও জ্ঞানের বা মানের চক্ষু উন্মীলিত হইল না। স্কুলের দরজায় সেই রকম তীর্থযাত্রীর ভীড়। আর ইহারাও টাকা রোজগারের এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িবে কেন? নহিলে নেটিভের সঙ্গে ঘেষাঘেসি করিতে ইহাদের বহিয়া গিয়াছে। বোকা ঠকাইয়া টাকা রোজগার করিতে যত্রতত্র যে সে স্কুল খুলিয়া বসে; অধিকাংশ কাজ জো-হুকুম দেশী শিক্ষকই করেন। হাজার হাজার টাকা এই রকম অন্ধ অনুকরণ মত্ত ভারতীয়দের পকেট হইতে লুটিয়া যাইতেছে তাহার হিসাব রাখে কে।

তবু শুধু অর্থনাশ হইয়াই যদি প্রায়শ্চিত্ত চুকিয়া যাইত তাহা হইলে বলিতাম মন্দের ভাল। কিন্তু মনস্তাপও আছে। এই সব স্কুলে পড়িয়া যাহারা বাহির হয়, তাহারা প্রত্যেকে দেশের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আগে যেমন প্রত্যেক ভারতীয় খৃষ্টান দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হইত, ধর্মত্যাগ দেশদ্রোহিতার সমপর্যায়ভুক্ত ছিল এখন এই ক্যামব্রিজ-শিক্ষাও আমাদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছে। কয়েক বৎসর বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এক একটি নিষ্পাপ ভারতীয় শিশুকে আমরা এমনই উপায়ে অভারতীয় করিয়া তুলি। একমাত্র ডুনস্কুলেই তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। এখানে এমন একটি স্বাভাবিক আবহাওয়া আছে যে ছেলেরা ইংরেজী ভাষাই শিখে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি ঘৃণা শিখে না।

ইংরেজ মিশনরী পরিচালিত যত বিদ্যালয় ভারতে আছে' তাহার ভারতীয় ছাত্রসংখ্যা সর্বসাকুল্যে হয়ত একলক্ষও হইবেনা। এই সামান্য সংখ্যক বালক-বালিকার জন্য এত মাথাব্যথা কেন—জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কেন বলিতেছি।

I. C. S. ইত্যাদি সর্বভারতীয় চাকুরীতে ইংরেজী জানই সাফল্যের প্রধান সম্বল বলিয়া ক্যামব্রিজ স্কুলের পড়ুয়ারাই প্রায় সর্বত্র দাঁও মারে। মৌখিক পরীক্ষায় যে পাঁচশ-মার্ক আছে, ক্যামব্রিজওয়ালারা প্রায় পূর্ণ নম্বর লইয়া আসে এবং লিখিত পত্রে ভাল না করিয়াও উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাই সংখ্যায় নগণ্য হইলেও দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ক্যামব্রিজ স্কুল-সমূহ নগণ্য নহে। আমি গত চার বৎসর ধরিয়া I. C. S.

Probationerদের শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, যত দেশী I. C. S. হইয়াছে, তাহাদের শতকরা ৬০ ভাগ এইসব ক্যামব্রিজ স্কুলের ছাত্র। ইহারা বাল্যে, ইংরেজী স্কুলের কল্যাণে উত্তম ইংরেজী শিখে, বিদেশী চালন-চলন অশনবসনে অভ্যস্ত হয়, কোনরকম রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে না আসায় রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন হয়, ইহার প্রত্যেকটিই আই-সি-এস্ হইবার পথ সরল করে। তার উপর যদি ক্যামব্রিজ স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, সোজা বিলাত চলিয়া যায়, তবে ত আর কথাই নাই। তাই বলিতেছিলাম, সংখ্যায় নগণ্য হইয়াও ক্যামব্রিজ স্কুল নানা দিকে আমাদের দুর্ভাগা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। তাই ইহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি না।

ইউরোপীয় স্কুলে দেশপ্রেম নষ্ট করিবার যতগুলি উপায় আছে, দেশীভাষার জ্ঞান নিবারণ তাহার অন্যতম। এদিকে School Certificateকে দেশী প্রবেশিকা পরীক্ষার চেয়ে এক বৎসর উঁচু বলিয়া ধরা হয়। School Certificate পাশ ছেলে সোজাসুজি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইবার অধিকারী। অথচ মাতৃভাষার জ্ঞান এক রকম হয় না বলিলেই হয়। স্থানাভাবে School Certificate পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যে সময়ে দিকে দিকে দেশীভাষায় শিক্ষাপ্রবর্তনের উৎসাহ জাগিয়াছে, উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত দেশীভাষায় দিবার আয়োজন চলিতেছে, তখন আমাদের ধনীসন্তানগণ এইভাবে মাতৃভাষায় আকাট মূর্খ থাকিয়া পাকাপাকিভাবে বিদেশী বনিয়া যাইতেছে।

হিন্দী ও উর্দুতে একটি করিয়া অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র আছে—যাহাতে ভাষাজ্ঞান আর একটু অগ্রসর হয়। ডুনস্কুলে প্রায় সকল ছেলের জন্য এই অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র আবশ্যিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অন্য কোন ভাষায় ঐ উচ্চতর প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা নাই। এমন কি বাংলায়ও না। বাংলা আবার এমন কি একটা ভাষা যে হিন্দী উর্দুর সমান অধিকার দাবী করিবে!

প্রবাসীবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত দিল্লী অধিবেশন বর্তমান লেখকের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে ক্যাম্ব্রিজ পরীক্ষায় দেশভাষার মান অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশনের সমান হউক। আজকাল দেশীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষাই বাহন বলিয়া সাহিত্য ছাড়া অন্যবিষয় চর্চায়ও ভাষাজ্ঞান বাড়ে। School cirtificateএ যখন ইংরেজীই বাহন, তখন ন্যূনতাপূর্ণ করিবার জন্য বর্তমানের এক আনা স্থলে তিন আনা প্রশ্নপত্র দেশী ভাষায় করা উচিত। যতদিন উক্ত পরিবর্তন না হইতেছে ততদিন, হিন্দী উর্দুর মত বাংলায়ও একখানা অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র প্রবর্তিত হউক। ইহার পূর্ব হইতেই আমি আমার স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহোদয়ের সাহায্যে ব্যাপারটি ক্যাম্ব্রিজ স্কুল কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিবার প্রয়াস পাইতেছি। সম্মিলন কর্তৃপক্ষ গৃহীত প্রস্তাবটি এখনও যথাস্থানে পাঠাইয়াছেন কিনা সন্দেহ আছে।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়াও ভারতীয় শিক্ষাসত্রসমূহ দেশীভাষার মান (Standard) বাড়াইবার চেষ্টাকে সফল করিতে পারেন। তাঁহারা নিয়ম করুন যে যতদিন School certificate পরীক্ষায় দেশীভাষার মান যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো না হয়, ততদিন তাঁহারা ঐ পরীক্ষাকে স্বীকার করিবেন না। I. C. S. ইত্যাদি পরীক্ষায় দেশীভাষায় কঠিন প্রশ্ন করা যদি আবশ্যিক করা যায়, তবেও কাজ হয়। শ্বেতাঙ্গ ছাত্রগণ সাধারণতঃ School certificate পর্যন্ত বিদ্যালাভই পরমমোক্ষ মনে করে। চাকরীর বাজারে তাহা আমাদের বি-এর সমান বলিয়া গণ্য! কিন্তু আমাদের ছেলেরা ঐ পরীক্ষা দিবার পর, কলেজে পড়িতে আসে। দেশভাষার মান নীচু রাখার অপরাধে যদি School certificate পরীক্ষা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়, তবে কলেজের দ্বার রুদ্ধ দেখিলে বাছাদের টনক নড়িবে। ইংরেজীতে যেমন তিনখানা প্রশ্নপত্র আছে, দেশীভাষায়ও তেমনি তিনখানা করা চাই। তার উপর ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে আরো এক বা দুইখানা। দেশীভাষাকে শিক্ষার বাহন যখন করা হইবে না, তখন অন্য উপায়ে ঘাটতি পূর্ণ করিতেই হইবে। তাছাড়া বর্ষে বর্ষে পাঠ্য পরিবর্তন প্রয়োজন—যেমন ইংরেজীতে হইয়া থাকে। পাঠ্য-পুস্তক প্রসঙ্গে বাংলার কথা আবার বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার।

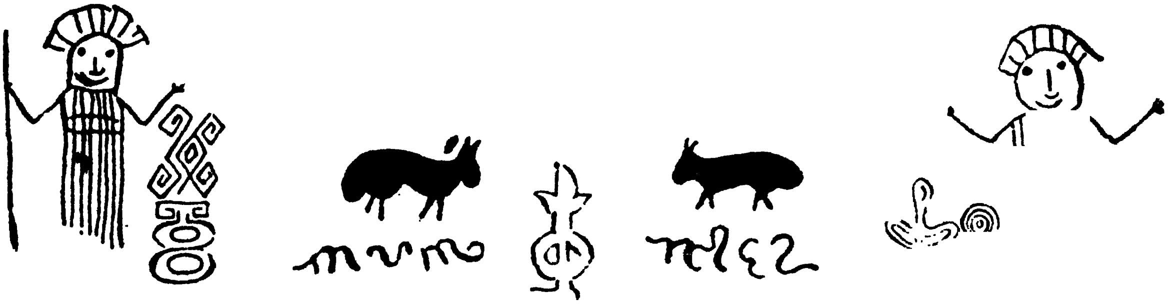
বাংলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষাও অবহেলার পাত্র হইলেও বাংলার দুর্ভোগে একটু রকমারী আছে। তারকনাথ গাঙ্গুলীর লেখা স্বর্ণলতা নামক একখানা উপন্যাস আজ পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরিয়া ইউরোপীয় স্কুলে, মিশনরীস্কুলে, বাংলা শিক্ষার্থী I. C. S. Probationerদের পাঠ্য তালিকায় জাঁকিয়া বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে কত রাজা রাজ্য পরিবর্তন হইল, কত সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইল, বাংলাভাষা সাহিত্যের যুগান্তর আসিল, কিন্তু স্বর্ণলতার আর স্থানচ্যুতি ঘটিল না।

বলিতেছি না যে স্বর্ণলতার কোন মূল্যই নাই। শুধু পুরাতন বলিয়াই ইহার উপর কোন আক্রোশ নাই। আমরা যাহা Classics নামে অভিহিত করি, তাহা যে শুধু পুরাতন তাহাই নহে, লোকে তেমন পড়েও না। তবু প্রত্যেক সাহিত্যের ভাণ্ডারে Classics অক্ষয় নিধির মত বিরাজ করে। স্বর্ণলতাকে কোনমতেই যদিচ বাংলা classics শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। তবু ইহার সাময়িক খ্যাতির কথা স্মরণ করিয়া ইহাকে সম্মান দিতে প্রস্তুত আছি।

গত তিন বৎসর ধরিয়া I. C. S. Probationer দের পাঠ্য-তালিকায় 'স্বর্ণলতা' আর নাই—প্রথম পরীক্ষায় শরৎচন্দ্রের "পল্লী সমাজ" স্বর্ণলতার স্থান লইয়াছে। হিন্দী উর্দুতে অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র বর্তমান বলিয়া, বাংলা অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র প্রবর্তন তেমন কঠিন হইবে না। খবর পাইয়াছি, সাময়িক ভাবে এই ক্ষুদ্র পরিবর্তন হইতেছে।

ব্রেজিলে কয়েকদিন

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)



"Careless talk costs lives" অতএব কিভাবে কতদিনে এই যুদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ডের উপকূল ছেড়ে ব্রেজিলের একটি বিখ্যাত বন্দরে এসে পৌছে গেলাম, তা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারা গেল না।

শুধু চারিদিকে জল, জল আর জল, শীত আর কনকনে হাওয়া। এইভাবে ক্রমাগত তিন সপ্তাহের ওপর উত্তর আটলান্টিক পাড়ি দিতে দিতে প্রায় নিউ ইয়র্কের কাছে এসে যখন পৌছে গেছি—তারপর যে কি হল তা পাঠকদের অনুমানের উপর ছেড়ে দিলাম। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে হাভানায় কোলঘেঁসে, সেই নির্জ্জন দ্বীপটির যেখানে কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের আটকে রাখা হয় তার পাশ দিয়ে আমাদের জাহাজ চলেছে ত চলেইছে।



একটি প্রাচীন গীর্জ্জা

এ যেন নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী আমরা, কূল নাই কিনারা নাই, জাহাজে জল নাই, খাবারও ফুরিয়ে গেছে—শুধু আছে 'Wave on wave on wave to the west.

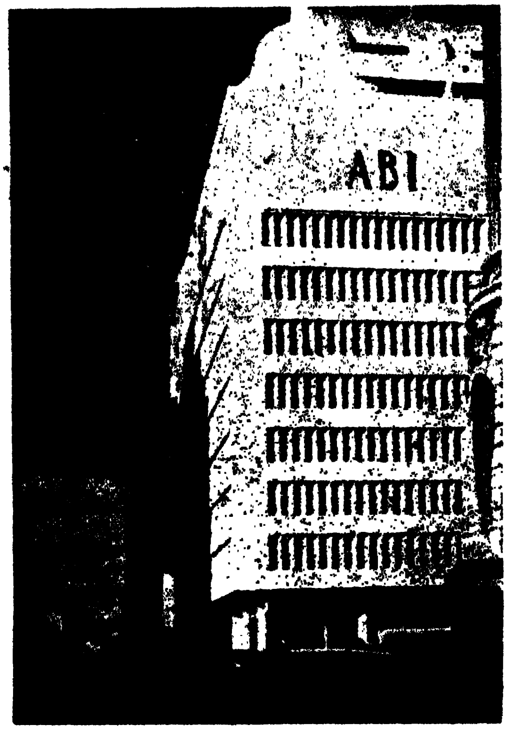
কাপ্তেন নিজেও জানে না কোথায় চলেছি আমরা। লণ্ডন থেকে প্রতি মিনিট Admiralty খবর পাঠাচ্ছে জাহাজ কোন্ দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌছিবে এবং কাপ্তেনকে ঠিক সেইমত চলতে হচ্ছে। কেননা যুদ্ধের সময় Royal Navy হোক, আর Merchnt Navy হোক Admiralty যা আদেশ করবে তাই তারা শুনতে বাধ্য।

তবে এইটুকু বুঝলাম যে উত্তর আটলান্টিক পার হয়ে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসমুদ্রে এসে পড়েছি। প্রায় নভেম্বরের শেষ কিন্তু ভীষণ গরম বোধ হতে লাগল। আরও বেশী হাঁফিয়ে উঠলাম জাহাজের খাবারের অবস্থা দেখে। রোজ একই মাছের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে বলা হোত 'বেঙ্গল কারি', লঙ্কাবাটা দিয়ে সেই মাছই পরের দিন 'মাদ্রাজ কারি', আবার কিছু মশলা বদলিয়ে 'মাদ্রাজ কারি' 'বোম্বে কারি' নামে টেবিলে আসত। জলের অভাবে জল খাওয়াত প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

সবচেয়ে মজার বিষয়, এই একঘেয়ে সন্ত্রস্ত জীবনযাত্রা পরস্পরের কাছে একেবারে দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠল। দিনের পর দিন পরিচিত একই মুখ দেখে দেখে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, "মশায় পেছন ফিরে বসুন।" ফলে এই দাঁড়াল যে কিছুদিনের মধ্যেই এইসব কর্ম্মহীন মস্তিষ্ক নিয়ে কয়েকটি অকর্ম্মণ্যের দল গড়ে উঠল।

একজন বেপরোয়া যাত্রী তার 'টুটুঙ্কিরাইটু' দাড়ি এবং সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে কোটুপাতলুন মাথায় "হ্যাজার" হাতে

জাহাজের আনাচে কানাচে ঘন ঘন বান বর্ষিবণ করায় বিশেষভাবে মহিলা যাত্রীদের ভীতচকিত করে তুললেন। শুনলাম এর বিরুদ্ধে কাপ্টেনকে বলায় ঐ রাত্রে Bar-এ একটি কাচের জিনিষের অস্তিত্ব ছিল না। ডেকে নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে ঘুমোনর আর উপায় রইল না, আজ একজনের "হ্যামাক্" কেটে দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে সরে পড়েছে, অন্যজনের বিছানা নিখোঁজ। এরূপ আর কত কি। দিনের বেলায় ত' কথাই নেই, চারিদিকে বৈঠক, তাসপাশা, গানবাজনা, রাজনৈতিক চর্চ্চা, হট্টগোল লেগেই আছে। জাহাজের একজন বৃদ্ধামহিলাযাত্রী এদের একটু উপদেশ



প্রেস এসোসিয়েসন্—রিও

দিয়ে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করায় ছেলেদের দল তার নাম দিল 'ডাইনি-বুড়ী'। সেই থেকে তাকে আর বড় একটা দেখা যেত না। ঠিক এমনি অবস্থায় দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের একজন চা-বাগান মালিকের হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। প্রথম প্রথম তাকে যাত্রীরাই সেবা-শুশ্রূষা করত, কিন্তু শেষে এমন হল যে তাকে কেবিনে রাখা ছাড়া আর উপায় নেই।

জাহাজে আমাদের দুর্দ্দশা যখন এইরূপ—হঠাৎ এক-দিন সন্ধ্যার আরক্ত রক্তিমায় ব্রেজিলের উপকূল-রেখা চোখের ওপর ভেসে উঠল। সে কি আনন্দ, ধীরে ধীরে জাহাজটি বন্দরের বাইরে এসে নোঙর ফেলছে, কেননা রাত্রে জেটিতে যাওয়া আমাদের সম্ভব হবে না। সে রাত্রে চোখে আর ঘুম নেই, ডেকের ওপর থেকে ব্রেজিলের নৈশজীবন উপভোগ করছিলাম—আর মাঝে মাঝে তার থেকে আলোক সঙ্কেতে বন্দরের কর্তৃপক্ষ আমাদের জাহাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

ভোর হতে না হতেই একটি পাইলট্ বোট্ আমাদের জাহাজকে ধীরে ধীরে জেটিতে এনে পৌছে দিয়ে গেল। জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই দেখি একখানি Diplomatic জাহাজ ইতালীর এবং জার্মান ছেলেমেয়েদের নিয়ে বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেননা এই সবেমাত্র ব্রাজিলিয়ান সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই সহরে যাওয়ার জন্যে ছাড়পত্রের অফিসার এবং ডাক্তার এসে আমাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করে জাহাজ থেকে নামবার অনুমতি দিয়ে গেলেন এবং বললেন যে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় পরের দিন জাহাজে আমরা পাউণ্ড নোট্ ভাঙিয়ে ব্রাজিলিয়ান টাকা পেতে পারি। এক পাউণ্ড ভাঙালে প্রায় ৮০ মিল্‌রে পাব, কিন্তু কে তার কথা শোনে। জাহাজ থেকে হুড়মুড় করে নেমেই যে দোকান সামনে পাওয়া গেল সেই দোকানে বহু লোকসান দিয়ে পাউণ্ড নোটগুলি ভাঙিয়ে নিলাম।

এতদিন পরে জল ছেড়ে স্থলে এসে নেমেছি, আমাদের জাহাজের যাত্রীদের যেন আর দিক্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না। নেমেই রাস্তার ফুটপাতে দেখি অজস্র রকমের ফল নিয়ে ফেরিওয়ালা বসে রয়েছে। যে যার মত ডাব, কলা, আনারস, আম এমনভাবে খাওয়া সুরু করে দিলাম যে ফুটপাতে দেখতে দেখতে লোকের ভীড় জমে গেল। সবাই ভাবছে এই অপরিচিত বুভুক্ষিত যাত্রীর দল কারা। তবে কিছুদিন থেকেই ব্রাজিলিয়ানরা জার্মান ইউ বোটের দৌরাত্ম্যে এরূপ দৃশ্য দেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সমস্ত সহরটা যেন আমাদের জাহাজের যাত্রীরা আক্রমণ করে ফেলল। আমাদের সাঙ্কেতিক পরিচয় ছিল "6 Six 6"—যেখানেই যাই সবাই ব্যতিব্যস্ত এই "6 Six 6" যাত্রীদের নিয়ে।

সুন্দর সাজান সহর, আধুনিক যুগোপযোগী লোকগুলি পর্তুগীজ, স্প্যানিস্ এবং নিগ্রোদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কেউ খুব ফর্সা, কেউ একটু তামাটে, আবার কেউ গৌরবর্ণ। এর মধ্যে বেশ একটা বৈচিত্র্য আছে। ইউরোপের সেই একঘেয়ে ভাবটা এখানে চোখে পড়ল না। তবে আমরা সবচেয়ে মুস্কিলে পড়লাম তাদের কথা বুঝতে না পেরে। অধিকাংশ লোকই স্প্যানিস্ ভাষায় কথা বলে—ইংরেজী কেউ বোঝে না।

দোকানে বাজার করা আমাদের পক্ষে বেশ হাস্যজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। মজা এই—তাতে দোকানদারেরা বিরক্ত কিংবা ক্ষুব্ধ মোটেই হ'ত না। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। চা কিনতে একটা দোকানে ঢুকেছি,

'Tea' আছে কিনা ক্রমাগত জিজ্ঞেস করেও যখন বোঝাতে পারলাম না তখন একরকম রেগেই বলে উঠলাম, "চা", "চা" আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তখুনই সে "চা" এক পাউণ্ড নিয়ে এল এবং লেবেলের উপরেও দেখি ব্রাজিলিয়ান ভাষায় লেখা "C H A", বোধহয় পর্তুগীজ নাবিকদের কাছ থেকে ভারতবর্ষে এই চা কথাটার প্রচলন হয়েছে। শুনলাম আমার আরও ছু'-একটি বন্ধু 'সার্ট' বলে দোকানদারকে বোঝাতে না পেরে 'কুর্ত্তাকামিজ' বলার সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার জিনিষগুলি বের করে দিয়েছিল।



ইয়াবা (ব্রোঞ্জ), ব্রজিলিয়ান আধুনিক ভাস্কর্য্যের নমুনা

আমাদের জাহাজ প্রায় ১২দিনের ওপর এখানে থাকবে। তাই বেরিয়ে পড়া গেল সহরের আশপাশ এবং গ্রাম দেখার জন্যে। কয়েকজন বন্ধু মিলে রওনা দিলাম 'ওলিন্দ কেরল' দেখতে। ঠিক বোম্বের মালাবার হিলের মত সমুদ্রতীরে সুন্দর সাজান জায়গা। শিক্ষিত এবং অভিজাতবংশীয় লোকদেরই বসবাস এখানে। পূর্বদিকে অনন্ত সমুদ্র আটলান্টিক এবং এই 'ওলিন্দ কেরল' এ সমুদ্রস্নানের একমাত্র ব্যবস্থা আছে।

সমুদ্রতীরেই স্নানার্থীদের জন্যে প্রকাণ্ড হল যেখানে পোষাক পরিচ্ছদ বদলান যায়। কিন্তু কোন আবরুর ব্যবস্থা নেই এবং কেউ তাতে লজ্জাবোধ করে না। এখানকার এই স্বাভাবিক নিয়ম।

আমি ও আমার কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু জলে নেমে পড়লাম। পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ যদিও এখানে ততটা ছিল না, কিন্তু রংএর খেলা যা দেখলাম তা জীবনে ভোলা অসম্ভব। জলে নামতেই ছায়ের রং—একটু যেতেই ফিকে সবুজ, তারপর গাঢ় সবুজ ও হলুদ রং মেশানো, ক্রমশঃ জলের রং নীল হয়ে গেছে এবং আরও দূরে গাঢ় নীল। ছোটবেলায় ভূগোলে এই আটলান্টিকের কত ভয়াবহ কথা শুনেছি—আর সেখানে আজ অবগাহন করছি ভাবতেও এক অভূতপূর্ব আনন্দ পেলাম।

স্নান করতে করতে দেখি ছুটি ব্রেজিলিয়ান মেয়ে করল। পরিচয় দিয়ে বললাম ভারতবাসী, তাতে আরও উৎসুক হয়ে ইংরেজীতে নানারূপ প্রশ্ন সুরু করে দিল। মেয়েটির নাম নিনা ও সঙ্গে তার বান্ধবী; বলল স্কুলে ইংরেজী প্রধান ভাষা হিসেবে নিয়েছে বলে সে ইংরেজী বলার জন্যে সব সময় উৎসুক হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের সব খুঁটিনাটি কত কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞেস করে আমাকে বলল যে তাদের বাড়ী 'ওলিন্দ কেরলেই' এর মধ্যে, সেখানে গেলে তাদের বাবা-মা খুব খুসী হবেন।

অনুরোধটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। যদিও নিনার বাবা-মা আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইতে পারলেন না কিন্তু নিনা দো-ভাষীর কাজ করে দেওয়ায় কোন অসুবিধাই হল না। আতিথেয়তার চূড়ান্ত পরিচয় পেলাম এবং যাওয়ার সময় নিনাকে বলে দিলেন—আমাকে সহরের মিউজিয়ম, আর্টগ্যালারি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বইয়ের দোকানগুলি দেখাতে।

আধুনিক ব্রেজিল খুব প্রগতিশীল এবং বিশেষভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এখানে বেশী থাকায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই খুব উন্নত বলে মনে হল। শিক্ষার



সম্বা নৃত্য

নমুনা দেখেই বুঝলাম এদের সাহিত্যও খুব পুষ্ট হবে।

ব্রাজিলিয়ান ভাষায় বই দেখে খুব গর্ব্ব বোধ করলাম। মিউজিয়ামে আমার সবচেয়ে ভাল লাগল রেড্ইণ্ডিয়ানদের শিল্পকাজ দেখে।

বর্ত্তমান যুগে আধুনিক কোন সহর সঠিকভাবে বোঝা যায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তার নৈশ-জীবন দেখা যায়। তাই একদিন সহরের বিখ্যাত "ইম্পিরিয়াল ক্যাবারে" কয়েকজন বন্ধুসহ ঢুকে পড়লাম। প্রকাণ্ড হল—ব্রাজিলিয়ান সঙ্গীত বাজছে আর এককোণে একজন নিগ্রো তরুণী অভিনেত্রী মিরাণ্ডার অনুকরণে ইংরেজীতে "I, I, I, I, like you Brazil" বলে চমৎকার একটি গান গাইছে। মনে পড়ে গেল দেশের সেই চিরমধুর গানটির কথা, "সে আমাদের বাংলা দেশ আমাদেরই বাংলা রে।"

হলে গিয়ে দেখি প্রায় সবই "6 six 6" এর যাত্রী, অবশ্য আমেরিকান লেডি-অফিসারও বহু ছিল। গান থামতেই সুরু হল ব্রেজিলিয়ানদের বিখ্যাত নৃত্য "সম্বা"। হলের প্রায় অধিকাংশ লোকই "সম্বা" জানে না—সে এক উদ্দাম নৃত্য। সুতরাং লজ্জার কোন কারণ ছিল না, ঘণ্টাখানেক নাচবার পর আর এই উদ্দামতা মোটেই ভাল লাগছিল না বলে চলে যাচ্ছি দেখেই সেনোরিটা জিজ্ঞেস করল, "Me no like"। বললাম, "No like."

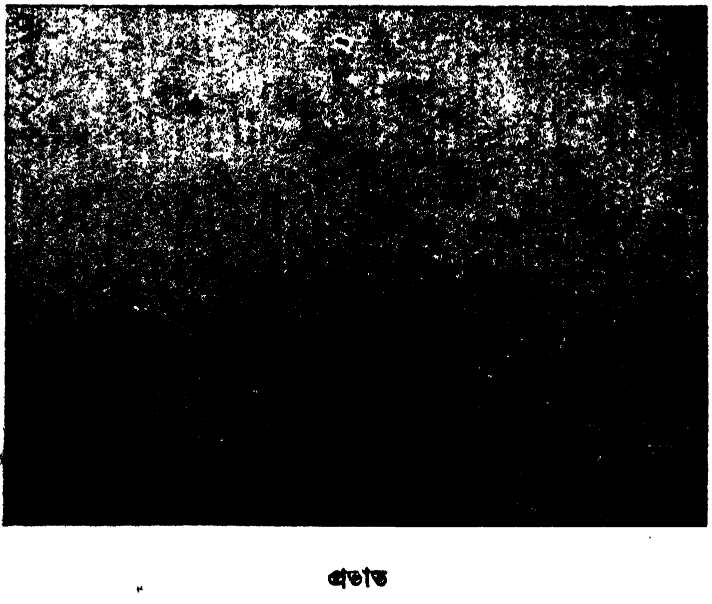
১২ দিন পর আমাদের জাহাজ যে সন্ধ্যায় ব্রেজিলে এসে পৌছিয়ে ছিল ঠিক সেই সন্ধ্যার সময় তার উপকূল ছেড়ে রওনা দিলাম।

ব্রাজিল তার সহর, গ্রাম, জীবন সৌন্দর্য্য সব যেন স্বপ্নের মত মনে পড়তে লাগল। রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় ব্রেজিলের তীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর মাঝে মাঝে সেই সেনোরিটার গানের সুরের রেশ কানে এসে বাজতে লাগল, "I, I, I, I, like you Brazil, I like your·· ·········"

ফটোগ্রাফীতে চীনদেশীয় আর্ট

শ্রীনীরোদ রায়

চিত্রশিল্প প্রত্যেক দেশেরই সভ্যতার নিদর্শন। শিল্পীগণ তাহাদের নিজস্ব ধারার ভিতর দিয়া তাহাদের মাতৃভূমির রূপশিল্পের চর্চ্চা করিতেছেন। লক্ষ্য করিলে ইহা দেখা যায় যে প্রত্যেক দেশের চিত্রকলার ভাব ও ধারা বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন শিল্প রীতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত। একই দেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার থাকে ; কিন্তু



প্রভাত

উহাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকিবেই—কারণ তাহাদের মূলভিত্তি এক। সেইরূপ প্রত্যেক দেশের আর্ট বিভিন্ন ধারায় প্রকাশিত হইলেও তাহাদের মূলে একটা ঐক্য সর্ব্বদাই বিরাজমান। পাশ্চাত্য দেশের আর্টের সহিত ভারতীয় আর্টের কতকটা সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই, তথাপি ভারতীয় আর্ট তাহার নিজস্ব ধারায় প্রকাশিত হইয়া তাহার সভ্যতার পরিচয় দিতেছে—একথা অস্বীকার করা যায় না।

আর্টের সৃষ্টির আদর্শ এক এবং তাহার উদ্দেশ্যও এক। তাহার গতিবিধি জাতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন প্রকারের হইয়া দাঁড়ায়। জাতীয় সভ্যতার রুচি অনুযায়ী আর্টের অভিব্যক্তি ও প্রসার হইয়া থাকে, তাই বিভিন্ন রুচিতে বিভিন্ন আর্ট, বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজস্বরূপে প্রকাশ পায়।

চিত্রাঙ্কনের টেক্‌নিক্ সবদেশে সমান নহে—ইহা প্রত্যেক দেশীয় শিল্পীগণের আদর্শ ও প্রতিভার উপর নির্ভর করে। চীনদেশীয় আর্টের টেক্‌নিক্ ভারতীয় আর্টের টেক্‌নিক্ হইতে বহু অংশে পৃথক এবং উহা এক নূতন ধারায় ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের চিত্রের ভাব ও ধারা তাহাদের নিজস্ব আর্টের ধারায় প্রকাশ পাইতেছে। তদ্দেশীয় শিল্পীগণ কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া কোনও ছবির রূপদান করা পছন্দ করেন না। তাঁহারা বাস্তবের রূপ ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করেন মাত্র। যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরীভূত তাহারই সৌন্দর্য্যকে মুখ্য বিষয়রূপে ব্যবহার করিয়া এই আর্টের সাধনা চলিতেছে। চীনদেশীয় শিল্পী চিন্-সান্-সং তাঁহার একটী প্রবন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"Chinese artists of the traditional Schools are often

accused of painting from imagination. Nothing could be further from the truth. They do not pai t from imagination but from the memory. What differenciates them from the Western Artists is that they paint what they *have seen* instead of what they *are seeing*."

ভারতীয় চিত্রের বরং পাশ্চাত্য দেশের চিত্রের সহিত সাদৃশ্য আছে, কারণ ভারতীয় অনেক শিল্পী কল্পনা হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া চিত্রের রূপদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

চীনদেশীয় চিত্রে, এমন কি পথে-ঘাটে যে সমস্ত সাধারণ ছবি বিক্রয় হয় তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা অতি সাধারণ উপায়ে একটীমাত্র মুখ্য বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন এবং অবাঞ্ছিত বস্তু গ্রহণ না করিয়া আশে পাশে ফাঁকা রাখিয়া দিয়াছেন। যতটুকু জিনিষে ভাব প্রকাশ পাইবে ততটুকুই মাত্র তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ছবিগুলিতে বিশেষ অবান্তর কারুকার্য্য না থাকাতে বিষয়বস্তুটী আপন বিশিষ্টতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে ছবিখানা ধরিয়া দেখিলে দৃষ্টি চারিপাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না। অন্য দেশীয় শিল্পীগণও ইহাতে একটা নূতনত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, কারণ ইহা এক নূতন ধারার প্রকাশভঙ্গিমায় দৃঢ়তা ও সাহস লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

চীন ও জাপান এই দুই জাতির সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বকার্য্যে বিশেষভাবে সাদৃশ্য আছে। এই দুই জাতির চিত্র শিল্পও যেন একই ধারায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। "চিঠিপত্র" নামক পুস্তকে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

"আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহত্ব দরকার আছে এই কথা বারবার আমার মনে হয়েছে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। টাইকান্. শিয়োমুরার ছবি একদিকে খুব আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশে-পাশের বাজে জিনিষ নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই, কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপসা কিম্বা পাঁচমিশেলি রং চং দেখা যায় না। ধব্‌ধবে প্রকাণ্ড সাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটা ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।"

চীনদেশীয় এই আর্ট ফটোগ্রাফীতেও একটী নূতনত্বের আভাষ দিয়াছে এবং ইহা ফটোগ্রাফারদের পক্ষেও একটী আদরণীয় বস্তু হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফটোগ্রাফী, আর্টের দিক হইতে বিচার করিলে, চিত্র শিল্পের বিশেষ সহায়ক হইতে পারে একথা আজ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ফটোগ্রাফী দ্বারা প্রত্যেক দেশেরই চিত্র শিল্পের ভাব ও ধারার প্রসার বৃদ্ধি করা যায় এবং ইহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। চীনদেশীয় ফটো-গ্রাফারগণ তাহাদের নিজস্ব আর্টের ভাব ও ধারা গ্রহণ করিয়া ছবি তুলিতেছেন, যাহা তদ্দেশীয় তুলিকা চিত্রের অনুরূপ।

যে ফটোগ্রাফার তুলিকা চিত্রাঙ্কনের আর্ট ও নিয়ম-কানুন বুঝিতে পারেন তিনি অনায়াসে তুলিকা চিত্রের অনুরূপ ছবি প্রস্তুত করিতে পারেন। যদিও ইদানিং ফটোগ্রাফী দ্বারা কাল্পনিক ছবিও প্রস্তুত হইতেছে, তবুও প্রায় ফটোগ্রাফই বাস্তব চিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। চীন-দেশীয় শিল্পীগণ বাস্তব বিষয় লইয়াই ছবি প্রস্তুত করেন—যাহা ফটোগ্রাফারগণও সমভাবে এবং অতি সহজেই ব্যবহার করিতে পারেন।

চীনদেশীয় আর্টের কতকগুলি নিয়ম হইতেছে যে—দূরের জলের ঢেউ নাই, দূরের বৃক্ষের পাতা নাই এবং দূরের মানুষের চোখ নাই। মোট কথা দূরের বস্তু একটু অপরিষ্কারভাবে একটা মাত্র আভাষ দিয়া বুঝাইয়া যাইতে হইবে, যাহাতে আসল বিষয় বস্তুটা প্রধান বিষয়বস্তুরূপে ফুটিয়া [illegible]

করিতে পারেন। ছবিখানা আগাগোড়া সাদা টেক্‌নিকের ভিতর দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ফটোগ্রাফীতে আমরা 'High key' বলিতে যাহা বুঝি তাহারই অনুরূপ।

ফটোগ্রাফীতে চীনাদশীয় আর্ট প্রকাশ করিতে হইলে 'Composite Picture অর্থাৎ একের বেশী negative হইতে একটী মাত্র ছবি গড়িয়া তোলা সুবিধাজনক। কারণ বিভিন্ন negative হইতে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিষটুকু একটা কাগজের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া অবশিষ্টাংশ ফাঁকা রাখিয়া দিলেই চলিবে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রত্যেকটী বিষয় যেন সমানভাবে মিলিত হইয়া একটীমাত্র ভাব লইয়া প্রকাশ পায়, নতুবা উহা একটী অস্বাভাবিক চিত্র হইয়া দাঁড়াইবে। শিল্পীকে তাহার পরিকল্পিত ছবির জন্য বিভিন্ন negative বাছিয়া লইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার চিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

'Composite Picture'এর সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি চীন-দেশীয় আর্ট প্রস্তুত করা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। কারণ ক্যামেরার সাহায্যে যে দৃশ্য গৃহীত হইবে তাহাতে সর্ব্ববিষয়ে এই আর্টের ভাব



অঙ্গমুখ শোভা

ফুটাইয়া তোলা সুবিধাজনক নাও হইতে পারে। অবাঞ্ছিত অনেক বস্তু ইহাতে আপত্তিজনক হইতে পারে। Composite Picture দ্বারা এই সমস্ত অসুবিধা পরিহার করা যায়। বিভিন্ন negative হইতে বিভিন্ন বিষয়, যেমন—বৃক্ষ, পাহাড়, মেঘ ইত্যাদির ছাপ একত্রিত করিয়া একটী 'মনের মত' প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রস্তুত করা যায়। অর্থাৎ বহু প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্যটুকু একক্ষেত্রে সম্মিলিত করিয়া একটী মনোজ্ঞ ছবি প্রস্তুত করা যায়।

টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেকটী negative কতখানি exposure দিলে অপর negative গুলির সহিত সম্মিলিত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং সম্পূর্ণ ছবিটার tone এক হইবে, ইহা পূর্ব্বেই ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। [illegible] বেশী-বেশ প্রকাশ না পায়। ছবিটার আলো [illegible]

যথেষ্ট ফাঁকা রাখা প্রয়োজন। সাদার উপর যে সমস্ত ছবি তোলা হয় তাহা **Dull Rough Matt Paper**এ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে এবং এই ধরণের ছবির সৌন্দর্য্যও ঐরূপ কাগজেই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইবে।

Portrait অথবা যে সমস্ত ছবি একটীমাত্র **Negative** হইতে প্রস্তুত হইবে তাহা **High Key** প্রণালীতে অর্থাৎ সাদার উপর করিতে সক্ষম হইলে এবং চারিদিকে ফাঁকা রাখিয়া দিলে, আমরা অনেকটা এই নূতন আর্টের আভাষ পাইব। ছবিখানা সম্পূর্ণ হইলে পর চারিপাশে কালো কালির রেখা টানিয়া দিলে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতীয় আর্টের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীগণ যদি চীনদেশের এই সুন্দর আর্টও গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে শিল্পীগণ এই নূতন আলোর সংস্পর্শে আরও নূতন কিছুর আভাষ পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে একটা নূতন কিছু আয়ত্বের ভিতর আনিতে হইলে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চ্চা প্রয়োজন। মাত্র দু'একটী ছবি দেখিয়াই নূতন আর্টের ধারণা করা কঠিন এবং শিল্পীগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

বস্ত্র-শিল্পে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস

মহাপ্রাণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরলোকগমনে দেশবাসী আজ শোকচ্ছায়ে আচ্ছন্ন। চারিদিক হইতে হাহাকার উঠিতেছে। বিশেষভাবে আজ বাঙ্গালীর দুঃখের সীমা নাই। বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার গৌরবাকাশ যে কয়েকটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কিরণ দ্বারা সমুদ্ভাসিত হইতেছিল, আচার্য্যদেবের প্রয়াণের সহিত সে সব কয়টিই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বাঙ্গালী আর কাহার পানে চাহিয়া গৌরব অনুভব করিবে, কাহার বাণী শুনিয়া উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিবে, সঙ্কটে ও বিপদে কাহার অনুগামী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে! বাঙ্গালার এ দুর্দ্দিনে আচার্য্যদেবের প্রয়াণে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। আজ বাঙ্গালী সত্যই নিজকে বড়ই অসহায় মনে করিতেছে।

আচার্য্যদেবের পরলোকগমনে আমি নিজকে যে কতদূর অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর আমি তাঁহারই আশীর্ব্বাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম এবং তাঁহারই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এতদিন যথাশক্তি কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজ আচার্য্যদেবের অভাবজনিত সন্তাপের সহিত মনে বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, তাঁহার একটী বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার সময় আমি পাইলাম না।

১৯৩৫ সালে আমেরিকা হইতে যখন দেশে ফিরিয়া আসি, তখন আমার সহায়-সম্বল কিছুই ছিল না। আমেরিকায় বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, কেবল মাত্র তাহাই আমার মূলধন ছিল। বিদেশ গমনের পূর্ব্বে আচার্য্যদেবের শিল্পোন্নতি বিষয়ক নানা উপদেশ ও বাণী আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ লাভ করাই আমার সর্ব্বপ্রথম কাম্য হইল। আচার্য্যদেবের ছাত্ররূপে তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া অথবা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পূর্ব্বে কখনও পাই নাই, সুতরাং তিনি আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা ভাবিয়া প্রথমতঃ কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরে তাঁহার মহানুভবতার কথা স্মরণ করিয়া একদিন সাহসের সহিত তাঁহার চরণে উপনীত হইলাম। আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার তারকনাথ দাস লিখিত আমার একখানি পরিচয়-পত্র পাঠ করিয়া তিনি স্মিত বদনে আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে নানা বিষয়ে অনেক কথা বলিতে হইল। বিদেশে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় আমাকে যে ভাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছে তাহার বর্ণনা তিনি মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন, বুঝিলাম তাঁহার মহৎ হৃদয়ে আমার একটু স্থান হইয়াছে। আমার সম্বন্ধে মাসাচুসেটস্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর অধ্যাপক বর্গের এবং কতিপয় মার্কিণ বস্ত্রকল কর্ত্তৃপক্ষের যে কয়েকখানি চিঠি ছিল সেগুলি পাঠ করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, দেখ্‌ছি, বিদেশে বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছ। গবেষণা কার্য্যেও কৃতিত্ব দেখিয়েছ। কিন্তু এ দেশে গবেষণার আদর কে করবে! বাঙ্গালার বস্ত্রের অভাব পূরণ করতে হবে। দেশের কাজে লেগে যাও। এখন দেশের পক্ষে তোমাদের মত উপযুক্ত যুবকের খুবই দরকার। প্রথম পরিচয় দিবসে আচার্য্যদেব হইতে এতটা স্নেহ ও অনুকম্পা পাইব, কল্পনা করিতে পারি নাই। আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

একটি বস্ত্র-কল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন শেষ করিয়া অপর একদিন যখন সায়েন্স-কলেজ গৃহে আচার্য্যদেবের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া আমার উদ্দেশ্য ও আরব্ধ কার্য্যের কথা বিবৃত করিলাম, তখন তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "ঠিক কাজ করেছিস্। দেশ যে তোদের কাছে এরূপ কাজই আশা করে। চাকরী করবিনে জেনে খুবই খুশী হলুম। বলছিস্ কৃত্রিম রেশমী সূতা নিয়ে প্রথমে কাজ আরম্ভ করবি, ভাল, কিন্তু ঐ সূতা যে বিদেশী রে। এখনও ত এদেশে rayon yarn তৈরী হয়না। ঐ সূতা তৈরী করতে পারবি ত? আমি বলিলাম, ভবিষ্যতে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ঐ কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন। আচার্য্যদেব বলিলেন, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে অর্থাভাব প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বল্ বাঙ্গালায় কৃত্রিম রেশমী সূতা তৈরীর জন্য তুই চেষ্টা করবি.—ইহা বলিয়া তিনি সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। আমি আচার্য্যদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলাম, করব। আচার্য্যদেব একটু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "করবি নাত কে করবে! ও জিনিষটা তৈরী হলে দেশের বহু টাকা যে বেঁচে যাবে।"

আমার বস্ত্র-কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উৎসবে পৌরহিত্য করিবার জন্য আচার্য্যদেবকে অনুরোধ করা হইলে তিনি বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিত অনুসারে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবার ভার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে দেওয়া হয়। কতকটা অসুস্থতা এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আচার্য্যদেব উৎসবে যোগদান করিয়া তাহার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সেদিন তাঁহার নয়নে যে উৎসাহ দীপ্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, এখনও তাহা আমার চোখে ভাসিতেছে। বাঙ্গালায় শিল্প-বিস্তার দ্রুত অগ্রসর হউক, ইহা আচার্য্যদেবের একান্ত কাম্য ছিল। তাঁহার অপরিসীম উৎসাহের মধ্যে নৈরাশ্যের স্থান ছিল না। নানা অসুবিধা এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের প্রাণে অনুপ্রেরণা যোগাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ঐ দিবস আমি আচার্য্যদেবের যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলাম—তাহাই আমার কর্ম্মপথের সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিতেছে। আজ সজলচক্ষু নয়নে একটি কথা স্মরণ না করিয়া পারিতেছিনা। ঐ দিন আচার্য্যদেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তোমার বস্ত্রকলে একদিন কৃত্রিম রেশমী সূতা তৈরী হবে, কিন্তু হয়ত আমি তা দেখে যেতে পারব না।" আজ সন্তাপের মধ্যে ঐ কথা কয়টা আমার প্রাণে বারবার জাগিয়া উঠিতেছে। কৃত্রিম রেশমী সূতা তৈরী করিয়া আচার্য্যদেবের চরণে নিবেদন করিতে পারিলাম না—এই দারুণ দুঃখ আমার রহিয়া গেল। এই দুঃখ জীবনে দূর হইবার নহে। বর্ত্তমান মহাসমরজনিত আন্তর্জ্জাতিক গোলযোগ হেতু আবশ্যক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় ঐ কার্য্যে সচেষ্ট হইতে পারি নাই। আচার্য্যদেব তাহা জানিতেন এবং আমাকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিতেন। আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত এই নূতন শিল্পের পথ সুগম করিয়া দিবে, এ বিশ্বাস ও ভরসা আমার আছে ও থাকিবে।

জঙ্গম

বনফুল

৪২

হাসি অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে বসিয়া জবাবদিহি লিখিতেছিল।

গত পরীক্ষায় এত কমসংখ্যক ছাত্রী পাশ করিয়াছে কেন স্কুল-কমিটি জানিতে চাহিয়াছেন। হাসি সত্য কথাই লিখিতেছিল। লিখিতেছিল এই অল্প কয়েকজন ছাত্রীই যে পাশ করিতে পারিয়াছে এজন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পিতামাতারা যদি নিজেদের কন্যাদের লেখাপড়া বিষয়ে অবহিত না হন, বাড়িতে যদি তাহারা পড়াশোনা না করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসিলেই তাহারা কোনকালে পাশ করিতে পারিবে না। স্কুলেও তাহারা নিয়মিত আসে না। যখন আসে তখনও পড়ায় মন দেয় না। অমনোযোগী হইবার জন্য সামান্য শাস্তি দিলেও কান্নাকাটি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসে যে কিছু বলিতে ভয় করে। অনেক অভিভাবক এবং স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় বেশী মেয়ে পাশ করিলেই আমি বিস্মিত হইতাম। লেখাপড়ায় মেয়েদের এবং তাহার অভিভাবকদের যদি আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকে···এই পর্য্যন্ত লিখিয়া সে থামিয়া গেল। বারান্দায় কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। বিছানায় বসিয়া হেঁট হইয়া লিখিতেছিল সে, কলম ছাড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দ্বারে মৃদু করাঘাত পড়িল।

কে?

কোন উত্তর নাই।

কে?

খোলই না—

গলার স্বরটা যেন চেনা মনে হইল, কিন্তু কাহার তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল. কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইল এবং আগাইয়া গিয়া খিলটা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল একজন লাল পাগড়ি কনেষ্টবল।

"চিনতে পারছ?"

লোকটার সামনের দাঁত একটাও নাই। এক মুখ গোঁফ-দাড়ি। তবু চোখের দিকে চাহিয়া হাসি চিন্ময়কে চিনিতে পারিল এবং বিস্মিত হইয়া গেল।

"ঠাকুরপো!"

ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া চিন্ময় বলিল—"চুপ, আস্তে। জেল থেকে পালিয়ে এসেছি"

"পুলিশের পোষাক কেন?"

"ছদ্মবেশ"

হাসি আরও খানিকক্ষণ চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমি যে এখানে আছি সে খবর কে দিলে তোমাকে"

"বেলা মল্লিক"

"সে [illegible]"

"তুমি তাকে চেন না, আলাপ হবে—ভয় নেই"

চিন্ময় হাসিল। হাসিতেই তাহার মুখের বীভৎসতা আরও প্রকট হইয়া পড়িল। সামনের দাঁত একটাও নাই, ঠোঁটগুলো কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো। সমভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হয় না।

"তোমার দাঁত কি হল?"

"মেরে ভেঙে দিয়েছে। লোহার নাল বসানো বুটের লাথি—" বলিয়া সে আবার হাসিল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হাসি চাহিয়া রহিল।

চিন্ময় বলিল—"গোঁফ দাড়ি দিয়েও এ হাসি ঢাকা যাবে না। ধরা পড়তে হবেই। তার আগে একটা দল গড়ে দিয়ে যেতে চাই"

"কিসের দল?"

"সব বলছি"

৪৩

অর্দ্ধ-নিমীলিত লোচনে শঙ্করের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজীবলোচনের অন্তরে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। ছোঁড়ার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলে কেমন হয়! পুণ্য যে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। বলে কি! পিতার সঞ্চিত অর্থ হইতে নির্ব্বিকারভাবে দশ হাজার টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিবে! দেবতা, না পাগল—কি এ!

বক্তব্য শেষ করিয়া শঙ্কর কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "আপনার কাছে অবশ্য বাবার কত টাকা জমা আছে তা আমি জানি না ঠিক। কিন্তু দশহাজার টাকা আমার চাই"

রাজীব অর্দ্ধ-নিমীলিত-লোচনেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চোয়ালটা বার দুই নড়িল।

"আমার কাছে কত টাকা আছে তা তোমার না জানবার কথা নয়। টাকা নিয়ে তোমার বাবাকে আমি রসিদ দিয়েছি"

"সে কোথায় আছে আমি খুঁজে দেখি নি"

রাজীবলোচনের ভাবলেশহীন মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির একটা আভাস যেন ফুটিয়া উঠিল।

"আমার কাছে টাকা আছে তাহলে জানলে কি করে"

"ছেলেবেলা থেকেই জানি। বাবা আর তো কোথাও টাকা রাখতেন না"

এই বুদ্ধি লইয়া ছোকরা উৎপলের জমিদারি চালাইতেছে না কি! মনে মনে মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন···ছেলেবেলা থেকেই জানি! আরে বাপু তার প্রমাণ কি? আমি যদি এখন অস্বীকার করি, একটি আধলা যদি না দিই? গাড়োল কোথাকার! তাঁহার চোয়াল আরও বার দুই নড়িল, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এ বছরের সুদটা এখনও হিসেব করি নি। গত বছর পর্য্যন্ত কুড়ি হাজার টাকা ছিল। এ বছরের সুদ নিয়ে বেশী হবে আরও কিছু"

"তাহলে দশ হাজার টাকা দিন আমাকে"

হঠাৎ রাজীবলোচন [illegible] চোখ [illegible]

এবং তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, "একটি কপর্দ্দক দেব না"

"দেবেন না ? কেন !"

"তোমার বাবা আমার বন্ধু লোক ছিলেন। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বরবাদ করতে দেব না আমি। বিশ্বাস করে' তিনি আমার হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন"

শঙ্কর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একটু সসঙ্কোচে বলিল, "কিন্তু আমার দরকার যে"

"ও দরকার কোন দরকারই নয়। ও টাকা কেনারাম দিক —ওই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল—ওই খেয়েছে টাকাটা—ওকেই চেপে ধর"

"আমার হুকুমেই টাকাটা খরচ হয়েছে, আইনত আমিই দায়ী"

"আমার কাছ থেকে কিছু পাবে না"

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "এ কি রকম কথা বলছেন আপনি। আমার টাকা, আমি পাব না—"

"টাকা তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। উইলের কপি আমার কাছেও দিয়ে গেছে অম্বিক"

"বেশ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসছি আমি"

"চিঠি নিয়ে এলেও হবে না, সাক্‌সেশন্‌ সার্টিফিকেট চাই, করালিচরণ বক্‌সিরও ক্যাচাং আছে একটা—"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া রাজীবলোচনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এ সব সত্ত্বেও দিতাম যদি বুঝতাম টাকাটা ন্যায্য খরচ হবে। তা যখন বুঝছি না তখন ঝাগড়া দেব! বিশেষত তোমার কাছে যখন কোন প্রমাণ নেই যে টাকাটা আমার কাছে আছে তখন তো কিছুই করতে পার না তুমি। আগে রসিদ বার কর—"

রাজীবলোচনের চক্ষু দুইটি পুনরায় অর্দ্ধ-নিমীলিত হইল। শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কানের পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পিতৃবন্ধুকে কোন অসম্মানজনক কথা সে বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রাজীবলোচন পুনরায় চোখ খুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

"অতিশয় নির্ব্বোধ তোমরা। অগ্রপশ্চাৎ কিছুই চিন্তা কর না, হটাৎ করে একটা কিছু করে' বসাটাই স্বভাব তোমাদের। গদাইটা যে অতি নচ্ছার তা আমি জানি, ওকে শাসন করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওকে ধরে চড়টা চাপড়টা দিলে পারতে, আমার গোলায় আগুন দিতে গেলে কেন বাপু। আমার কি ক্ষতি হল তাতে, লাভই হল বরং, ইন্‌শিওর করা ছিল সব। মরতে মল কতগুলো গরীব। ঠিক পাশের একটা ঘরে গরীব চাষীদের পাটের বাণ্ডিলগুলো ছিল, কোথাও রাখতে জায়গা পায় না রেখে গেসল ওখানে, সেগুলো পুড়ে গিয়ে তাদেরই লোকসান হল। আমার আর কি হল ?"

"আমি ও সবের মধ্যে ছিলাম না"

শঙ্কর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

"আচ্ছা আমি চললাম এখন তাহলে"

"টাকার জন্যে চিন্তা কোরো না, দরকারের সময় ঠিক পাবে, কিন্তু বরবাদ করতে দেব না আমি—"

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রাজীব দত্ত একটু মুচকি হাসিলেন।

অন্ধকারে শঙ্কর গ্রামের পথে পথে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবিলম্বে দশ হাজার টাকা কোথায় কি উপায়ে পাওয়া যায়? রাজীব দত্ত সত্যই টাকাটা দিবে না, না কি…নিপুণা গেলেন কোথায়…কলেরা ক্রমশঃ বাড়িতেছে…হরিয়া কাক ফরিদকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব কি…সুরমা আর তো তাহার কোন খোঁজ করিল না…ডাকিতে না পাঠাইলে আর সে যাইবে না…নানা অসংলগ্ন চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ভীড় করিতেছিল।

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল তখন অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"ছি ছি কত রাত করলে তুমি"

"বেশী রাত তো হয়নি, সাড়ে দশটা"

"ও"

অমিয়ার চোখে ঘুম ছিল তাই সে শঙ্করের চিন্তাচ্ছন্ন মুখটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল না। তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকাইয়া শুইয়া পড়িল। শঙ্করও শুইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়াও যখন কিছু হইল না তখন সে উঠিয়া বসিল। অমিয়া খুকী উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দচরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। পাশের ঘরেই আলমারিটা আছে। বাবার বিরাট আলমারিটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সে। বহুকাল এটাকে খোলা হয় নাই। ইহার চাবি যে কোনটা তাহার মনে নাই। চাবির গোছাটা আনিয়া একটার পর একটা লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। রসিদটা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

চিঠির বাণ্ডিল খাতা ডায়েরি বই ফাইলের স্তূপের ভিতর বসিয়া শঙ্কর রসিদ খুঁজিতেছিল। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা শব্দ হইল

"রাম নাম সৎ হ্যায়—"

সে চমকাইয়া উঠিল। কে মারা গেল? ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল ভোর হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। সমস্ত রাত খুঁজিয়াও কোন রসিদ বা পাশ বই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল সে। কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল লেটার বক্সে একখানা চিঠি রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল খামের উপর তাহারই নাম লেখা। কাহার চিঠি? খুলিয়া পড়িল—

শ্রীচরণেষু,

আমি আর থাকতে পারলাম না, চললাম। কেন বা কোথায় তা বলব না। বৃহত্তর যে আহ্বানের অপেক্ষা করছিলাম তা

এসেছে। আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। তুমি আপনার কাছে রইল। ওর ভার আপনাকে দিয়ে গেলাম। কোন্ অধিকারে যে এত বড় ভার স্বচ্ছন্দে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি তা জানি না। মনে হচ্ছে কিন্তু অধিকার আছে। কোন সঙ্কোচ হচ্ছে না। আর একটা কথা। যে দশ হাজার টাকার জন্তে আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল তা আমার কাছেই ছিল এতদিন। টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। সে টাকা আমার ট্রাঙ্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, আমি আর কি করব ও নিয়ে। এতবড় গোপনীয় চিঠিটা আপনার খোলা লেটার বক্সে রেখে যেতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু তাছাড়া আর উপায় কি। একটা ভরসার কথা, খোলা জায়গাতেই গোপনীয় জিনিস সব চেয়ে নিরাপদে থাকে। সন্দেহ জাগে না কারও। আশাকরি আমার জন্তে বিপদে পড়বেন না। চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনাকে একটা প্রণাম করে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না, দূর থেকেই তাই প্রণাম জানাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে যাহোক একটা গল্প বানিয়ে প্রচার করে' দেবেন। যদি কোনদিন ফিরি আবার দেখা হবে। আর না যদি ফিরি তাহলে এই শেষ। ইতি প্রণতা হাসি।

শঙ্কর নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস্ করিতে পারিতেছিল না। হাসি কোথায় গেল? কেন গেল? তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সে। হাসির কোয়ার্টাসে গিয়া দেখিল হাসি নাই। চাকরটা কিছুই বলিতে পারিল না। তুমি উঠিয়াছে এবং গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ছোট্ট মৃন্ময় যেন।

"মা কোথায়"

"জানি না"

"আমাদের বাড়ি যাবে? চল"

তুমি গম্ভীরভাবে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইল।

তাহার পর বলিল, "চলুন"

কোন আপত্তি করিল না, জামাটি গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। শঙ্কর স্কুলের চাকরটাকে ডাকিয়া যখন তাহার মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলিয়া দিল তখনও সে কোন প্রশ্ন করিল না।

"চল"

শঙ্করের পিছু পিছু সে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল—"তোমার মা একটা কাজে গেছেন। কিছুদিন পরে আবার আসবেন। ততদিন আমাদের কাছে থাক।"

"আচ্ছা"

হাসির ব্যবহারে শঙ্কর অবাক হইয়া গিয়াছিল। আরও অবাক হইয়া গেল তুমির ব্যবহারে। তাহার মনে হইতে লাগিল—তুমি যেন সব জানে, কেবল আত্মসম্মানে বাধিতেছে বলিয়া কিছু বলিতেছে না।

শঙ্কর অমিয়াকে সত্য কথাটা বলিল না। বলিল, হাসি স্কুলের কাজে কিছুদিনের জন্ত কলিকাতায় গিয়াছে। যতদিন না ফেরে ততদিন তুমি তাহার নিকট থাকিবে।

অমিয়া বলিল—"বেশ তো—"

সব চেয়ে খুশি হইয়া উঠিল খুকী। সে তাড়াতাড়ি তুমির হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য্য সম্ভার দেখাইতে বসিল।

"এইতে হাতি, এইতে খুকু, এইতে মোতল—"

শঙ্কর পুনরায় আসিয়া আলমারির সম্মুখে বসিয়াছিল। খাতাপত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া রাখিতে রাখিতে হাসির কথাই ভাবিতে লাগিল। 'বৃহত্তর আহ্বান' কি হইতে পারে। হাসিকে সে কোন দিনই বুঝিতে পারে নাই। তখনই আবার মনে হইল কাহাকেই বা আমরা বুঝি। যাহাকে বুঝি বলিয়া মনে করি তাহাকে হয়তো ভুল বুঝি। চকিতে সুরমার কথাটা মনে পড়িল। সুরমার কথাই ভাবিতে লাগিল সে। কিছুক্ষণ পরে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। রসিদ খুঁজিবার আগ্রহ তাহার তো আর নাই। হাসির অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাইয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে! যদিও এখনও ট্রাঙ্ক খুলিয়া—সহসা মনে হইল ট্রাঙ্কের চাবি তো আমার কাছে নাই! বাসায় নিশ্চয়ই আছে কোথাও। পরে গিয়া লইয়া আসিলেই হইবে। টাকাটা আছে নিশ্চয়। হাসি শুধু শুধু মিথ্যা কথা লিখিবে কেন। তখনই আবার মনে হইল— "ও টাকা এমন ভাবে খরচ করাটা কি ঠিক হইবে। দেখা যাক—"

চিন্তা-স্রোত ব্যাহত হইল।

'রাম নাম সৎ হ্যায়'—'রাম নাম সৎ হ্যায়'—রাম নাম সৎ হ্যায় আবার? শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল মুশাই আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিল গ্রামে খুব কলেরা সুরু হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়মান মর্ত্ত্যভূমি হ'তে
যাহারা যেতেছে চলি' অমর্ত্ত্যের পথে
একাকী নিঃসঙ্গ যাত্রী,—তাহাদের তরে
সেথায় কি থাকে কেহ? অনুরাগ ভরে
দিশাহারা অচিনেরে স্নেহে হাতে ধরি
লভ হারানিধি সাথে লয় আগুসরি?
অভিষিক্ত করি পুণ্য মন্দাকিনী নীরে,
মঙ্গল বরণ-ডালা পরশিয়া ধীরে,
ললাটে অঙ্কিত করি তিলক চন্দনে
কণ্ঠে দেয় মুক্তি ডোর অলখ বন্ধনে?
জন্ম জরা আধি ব্যাধি ভরা মৃত্যু শোক
নিত্যের ক্ষণিক বাস এ অমৃত লোক,—
হেথাকার নিরুপায় ব্যথাতুর প্রাণী
সেথা কি শোনাতে পারে সুগভীর বাণী
অশ্রুসিক্ত বেদনার? অন্তিম অর্চনা
আরতি করিয়া ফিরে করুণ মূর্চ্ছনা॥

ক্রুক্‌স্ সাহেবের আধ্যাত্ম ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

(৩)

পঞ্চম শ্রেণী

কাহারও স্পর্শ ব্যতীত মেজে থেকে টেবিল ও চেয়ারের উর্দ্ধে উঠা

এইরূপ ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথা প্রায়ই উঠে যে কেবলমাত্র টেবিল চেয়ার শূন্যে উঠে কেন? গৃহের আসবাবপত্রের ভিতর কেবল ঐগুলিরই ঐ প্রকারের গুণ কেন দেখা যায়? ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে পারি, যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বর্ণনা করা মাত্র আমার উদ্দেশ্য. উহাদের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করা নয়।

তবে ইহা বলা যায় সাধারণ ভোজনগৃহের কোন ভারী নির্জ্জীব পদার্থ সচরাচর মেঝে থেকে উপরে উঠিতে হইলে টেবিল চেয়ার ছাড়া সেখানে আর কিছু থাকে না, তবে কেবল টেবিল চেয়ারই যে ঐরূপ মেঝে হইতে উর্দ্ধে উঠিতে পারে. অন্য কোন কিছু পারে না, তাহা নহে—ঐ কথাটির প্রমাণ আমি যথেষ্ট পাইয়াছি। যে শক্তির দ্বারা এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে—সেই শক্তি যে সকল জিনিষ সে পাইতে পারে তাহার উপরই সে শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তাহা আমি পরীক্ষার ফলে পাইয়াছি।

একটি ভারী খাবার টেবিল পাঁচবার বিভিন্ন সময়ে মেঝে হইতে কয়েক ইঞ্চি হইতে ১½ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চে শূন্যে উঠিতে দেখিয়াছি—এবং উহা এরূপ অবস্থার মধ্যে ঘটিয়াছে যে সেখানে প্রবঞ্চনা অসম্ভব। আর একবার যখন আমি মিডিয়ামের হাত পা ধরিয়া ছিলাম, তখন উজ্জ্বল আলোতে একটি ভারী টেবিল মেঝে থেকে উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। আর একবার ঐ টেবিল শূন্যে উঠে—তখন, শুধু যে কেহ তাহা স্পর্শ করিয়া নাই তাহা নহে, আমি পূর্ব্ব হইতে এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম যে ঐরূপ শূন্যে উঠার প্রমাণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ষষ্ঠ শ্রেণী

মানুষের শূন্যে উঠা

এইরূপ ঘটনা আমার সমক্ষে চারবার অন্ধকারে ঘটিয়াছে। উহার বাস্তবতা পরীক্ষা করিতে আমার বুদ্ধিতে যত সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা সম্ভব তাহা আমি করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব হইতে যে বদ্ধমূল ধারণা আছে তাহা চক্ষুর প্রমাণ ভিন্ন ঘোঁচে না, তজ্জন্য আমি এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম ; উহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে যুক্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

একবার একখানি কেদারা যাহার উপর একটি মহিলা বসিয়া ছিলেন, তাহা মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উর্দ্ধে উঠিতে দেখিয়াছি। আর এক সময়ে পাছে এইরূপ সন্দেহ হয় যে মহিলা নিজে কোনরূপ কারসাজি করিয়া ঐরূপ করিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য ঐ মহিলা চেয়ারের উপর এমন ভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলেন যে চেয়ারের চারটি পায়াই আমাদের সকলেরই দৃষ্টিগোচর ছিল। উহা তারপর মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উপরে উঠিয়া, দশ সেকেণ্ড শূন্যে থাকে, পরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। আর একবার পৃথক পৃথক ভাবে দুইটি ছোট ছেলে চেয়ার সমেত পূর্ণ দিনের আলোতে মেঝে থেকে শূন্যে উপরে উঠে। উহা এমন সন্তোষজনক ব্যবস্থার মধ্যে ঘটে যে আমার ঐরূপ শূন্যে উঠার বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ; কারণ আমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া একান্ত সতর্কতার সহিত দেখিতে ছিলাম যে কেহ চেয়ারের কোন পায়া না স্পর্শ করে।

এইরূপ শূন্যে ওঠার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আমি যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাহা মিষ্টার হোম সম্বন্ধে। আমি তিনবার তাঁহাকে বিভিন্ন সময়ে ঘরের মেঝে থেকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে শূন্যে উঠিতে দেখিয়াছি—একবার আরাম কেদারায় (easy chair) তিনি তখন বসিয়া ছিলেন ; আর একবার তাঁহার চেয়ারে তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ছিলেন ; তৃতীয়বার দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রত্যেকবার এইরূপ ঘটনা খুব ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করিবার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা আমার ঘটেছে।

মিষ্টার হোমের মাটি থেকে শূন্যে উঠিবার অন্ততঃ পক্ষে এক শত দৃষ্টান্তের কথা কাগজে পত্রে লেখা আছে। উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক প্রত্যক্ষ করেছে। তন্মধ্যে তিনজন সাক্ষীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য. আর্ল্ অফ ডানরেভন্ (Earl of Dunraven), লর্ড লিণ্ডসে (Lord Lindsay) এবং ক্যাপটেন সি, উইন (Captain C. Wynne)—তাঁহার প্রত্যেকে যাহা প্রত্যক্ষ করেছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা অর্থে মানুষ মাত্রেরই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা ; কারণ ধর্ম্মের ইতিহাসে বা রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ দেখা যায় না।

মিষ্টার হোমের মাটি থেকে শূন্যে উঠার প্রমাণ প্রচুর। ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় যে যদি এমন কেহ জীবিত থাকেন, যাঁহার সাক্ষ্য বৈজ্ঞানিক জগৎ নিঃসন্দেহে মানিয়া লইবে, তাঁহার এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে ধৈর্য্য সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ শূন্যে উঠা প্রত্যক্ষ করেছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেও সম্মত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাক্ষীর অভাব ঘটিবে বা পাওয়া দুষ্কর হইবে।

সপ্তম শ্রেণী

কাহারও স্পর্শ ভিন্ন নানা প্রকারের ছোট ছোট জিনিষের নড়াচড়া

এই শ্রেণীর ঘটনার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা মাত্র যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা আমি বর্ণনা করিব। ঐ সমস্ত ঘটনা এমন অবস্থার মধ্যে ঘটিয়াছে যে ঐরূপ অবস্থায় কোনরূপ প্রতারণা করা অসম্ভব। এই সব ঘটনার মধ্যে কোনরূপ কারসাজি আছে এইরূপ মনে করা বৃথা, কারণ যাহা এখানে উল্লেখ করিলাম তাহা মিডিয়ামের ঘরে নহে, উহা আমার নিজের বাড়ীতে ঘটিয়াছে, ওখানে পূর্ব্ব থেকে কোনরূপ বন্দবস্ত করা অসম্ভব। একটি মিডিয়াম আমার খাবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, যখন এক কোনে বসিয়া আছে,—যেখানে একাধিক ব্যক্তি তাহাকে খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে,—তখন আমার নিজের হাতে ধৃত একর্ডিয়ান (accordion) যাহা আমি নিজের হাতে উন্টা দিকে অর্থাৎ তাহার চাবি (keys) গুলি নীচের দিকে ছিল তাহা উঠাইয়া কোনরূপ কারসাজি দ্বারায় বাজাইতে পারে না ; আবার তাহাকে ঘরময় বেড়াইয়া বেড়াইয়া ও বাজাইতে পারে না। সে ঘরের মধ্যে এমন কোন যন্ত্র আনিতে পারে না, যাহা দ্বারা জানলার পর্দা উড়ানো যায় ; আট ফুট দূরে স্থিত খড়খড়ির পাখিগুলি খুলিতে

পারে—বা রুমালের কোনে একটা গাঁট বাঁধিয়া ঘরের দূরের এক কোনে রাখিতে পারা যায় বা দূরে স্থিত পিয়ানোতে সুর বাজানো যায় বা একখানা কার্ডের প্লেট্ ঘরে উড়িয়া বেড়াইতে পারে বা টেবিলের উপর থেকে জলের বোতল ও গ্লাস তুলিতে পারে বা একটি প্রবালের নেক্লেস খাড়া হয়ে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে ; একখানি পাখা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের বাতাস করিতে পারে ; বা দেয়ালের গায়ে শক্ত করে সিমেণ্ট দিয়া আঁটা গ্লাসকেসের মধ্যে স্থিত পেণ্ডুলাম (pendulum) দোলাইতে পারে। অথচ এই সমস্তই আমার ঘরে হইতে দেখিয়াছি।

অষ্টম শ্রেণী

জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর আবিভাব

এই সব জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ এত ক্ষীণ জ্যোতির যে ঘর অন্ধকার করা আবশ্যক। অবশ্য, পাঠককে এ বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র যে আমি পূর্ব্ব হইতে এরূপ সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করিয়াছি যাহাতে ফস্ফরাস মিশ্রিত তৈল বা অন্য কোন প্রকারে প্রতারণা না করিতে পারে। ইহা ব্যতীত সেইরূপ আলো আমি কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি কিন্তু পারি নাই।

খুব কড়াকড়ি বন্দবস্তের মধ্যে আমার ঘরের ভিতরে টার্কী মুর্গীর ডিমের আকারের একটি জ্যোতির্ম্ময় কঠিন বস্তুকে নিঃশব্দে শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতে আমি দেখায়াছি। উহা মেঝে থেকে এত উপরে ছিল যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াও তাহা ছুঁইতে পারে নাই, পরে উহা ধীরে ধীরে মেঝের উপর নামিয়া আসে। উহা দশ মিনিটেরও অধিককাল দেখা গিয়াছিল এবং উহা অন্ধকারে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনবার টেবিলকে একটি কঠিন বস্তুর দ্বারায় আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ সশব্দ আঘাত করিয়াছিল। তৎকালে মিডিয়াম একটি আরাম কেদারায় অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়াছিল।

আমি বিভিন্ন ব্যক্তিদের মাথার উপরে অনেকগুলি জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুকে উড়িয়া স্থায়ীভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। আমার সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় উজ্জ্বল আলোর দপ্‌দপানির দ্বারায় আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। অনেকগুলি আলোর স্ফুলিঙ্গকে টেবিলের উপর হইতে উঠিয়া ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত যাইতে দেখিয়াছি—আবার সেইগুলি টেবিলের উপর সশব্দে পড়িতে দেখিয়াছি। আমার সম্মুখে শূন্যে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা সংবাদ আমি পাইয়াছি—তৎকালে আমি সেই অক্ষরগুলির ভিতর আমার হাত ঘুরাইয়াছি। ঘরের দেয়ালে উচ্চে টাঙ্গান একটি ছবির দিকে একটি জ্যোতির্ম্ময় মেঘকে নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিয়া যাইতে আমি দেখিয়াছি। খুব কড়াকড় ব্যবস্থার মধ্যে আমার হস্তের উপর আর একটি কেবলমাত্র (অন্য অঙ্গহীন) হস্তের দ্বারা একটি জ্যোতির্ম্ময় শক্ত স্ফটিক পদার্থকে একাধিকবার রাখা হইয়াছে—সেই হস্তটি তৎকালে যাহারা সেই ঘরে ছিল তাহাদের কাহারও নয়। দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন একটি টেবিলে স্থিত একটি হেলিওট্রোপ ফুল গাছের উপর একটি জ্যোতির্ম্ময় মেঘ স্পষ্ট আলোতে উড়িয়া বেড়াইল দেখিয়াছি এবং মেঘ ঐ ফুল গাছের একটি কচি ডাল ভাঙ্গিয়া উহা এক মহিলাকে আনিয়া দিতে দেখিয়াছি। আমি কয়েকবার ঐরূপ জ্যোতির্ম্ময় মেঘকে ধীরে ধীরে হস্তের আকার ধারণ করিতে দেখিয়াছি এবং তাহাকে ছোট ছোট জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। এইগুলি পরবর্ত্তী শ্রেণীর ঘটনার ভিতরে ধর্ত্তব্য।

নবম শ্রেণী

জ্যোতির্ম্ময় হস্ত ও সাধারণ আলোকে দৃষ্ট কেবলমাত্র হস্তের আবির্ভাব

সিয়ান্সে সাধারণতঃ অন্য অঙ্গহীন কেবলমাত্র একখানি হস্তের আবির্ভাব অন্ধকারেই অনুভূত হইয়া থাকে—কিন্তু তাহা দেখা যায় না। তবে কয়েক-বার আমি ঐরূপ হাত দেখিয়াছি। যেখানে ঐরূপ ঘটনা অন্ধকারে হইয়াছে তাহা আমি উল্লেখ করিব না। আলোতে যাহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহারই ভিতর কতকগুলি বাছিয়া এখানে লিখিলাম।

একটি খাবার টেবিলের (কাঠের) মধ্যের একটি ফাঁক দিয়া একটি সুন্দর ছোট হাত বাহির হইয়া উঠিয়া আমাকে একটি ফুল দেয়। কিছু সময় বাদে বাদে তিনবার হাতখানি দেখা যায় ও মিলাইয়া যায়। আমার হাত যেমন বাস্তব সেই হাতখানিও তেমনই বাস্তব তাহা সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করিবার আমার যথেষ্ট সুবিধা ছিল। এই ঘটনা আমার ঘরের মধ্যে আলোতে ঘটে, যখন আমি মিডিয়ামের হাত পা ধরিয়া ছিলাম।

আর একবার একটি কচি শিশুর হাতের মত ছোট হাত ও বাহু আবির্ভাব হইয়া আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি মহিলার সহিত যেন খেলা করে—পরে ঐ হাত আসিয়া আমার বাহুতে মৃদু মৃদু আঘাত করে এবং আমার কোট্ ধরিয়া বহুবার টানে। আর একবার একটি আঙ্গুল ও বুড়া আঙ্গুল মাত্র বাহির হইয়া হোম সাহেবের (মিডিয়ামের) কোটের বোতামের সংলগ্ন একটি ফুলের কতকগুলি পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া হোম্ সাহেবের নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে রাখিয়া দেয়।

আমি এবং অন্যান্য অনেকে অনেকবার একখানি হাত মাত্র একর্ডিয়ান্ বাজনা বাজাইতে দেখিয়াছি যখন হোম্ সাহেবের দুই হাতই দেখা যাইতে ছিল, এমন কি যখন তাঁহার দুই হাতই তাঁহার নিকটস্থ লোক দ্বারায় ধৃত ছিল।

ঐ হাত ও আঙ্গুলিগুলি সকল সময়েই সজীব ও শক্ত (solid) বলিয়া বোধ হয় নাই। অনেক সময়ে যেন সাদা (nebulous) মেঘ জমাট বাঁধিয়া হস্তের আকার ধারণ করিয়াছে ঐরূপ বোধ হইয়াছে। আবার তাহা উপস্থিত সকলেই ঠিক একই রকম দেখে নাই—যথা একটি ফুল বা একটা ছোট জিনিষ নড়িয়া বেড়াইল—একজন দেখিল একটা জ্যোতির্ম্ময় মেঘ তাহার চারিধারে আছে—আর একজন দেখিল একটা সাদা মেঘের হাত (nebulous looking hand)—অন্য অনেকে কেবল একটি সচল ফুল মাত্র দেখিল। আমি একাধিকবার প্রথমে দেখিয়াছি একটি জিনিষ নড়িয়া বেড়াইল—তাহার পর একটা জ্যোতির্ম্ময় মেঘ তাহার চতুর্দ্দিকে আবির্ভাব হইল এবং তাহার পর ঐ মেঘ জমিয়া একটি পুরাদস্তুর হাতের আকার ধারণ করিল। এই শেষ সময়ে ঐ হাতখানি সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল। উহা সব সময়েই কেবল হাতের অনুরূপ আকার মাত্র নয়—কখনও কখন পুরাদস্তুর জীবন্ত সুন্দর মানুষের হাত—তাহার আঙ্গুলগুলি নড়ে—এবং তাহার মাংস ও জীবন্ত মানুষের মতন। কিন্তু কব্জি ও বাহুর কাছ থেকে উহা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া একটা জ্যোতির্ম্ময় মেঘ হইয়া যায়।

ঐ হাত স্পর্শে কখনও কখনও বরফের মত ঠাণ্ডা ও নির্জ্জীব মনে হয় —কখনও কখন উষ্ণ ও সজীব বলিয়া অনুভব হয় এবং তাহা আমার হাতকে পুরাতন বন্ধুর মতন চাপিয়া ধরিয়াছে

একবার কোনরূপ ছাড়িব না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঐ হাত আমি আমার হাতে সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখি ; আমার হাত থেকে ছাড়াইয়া লই-বার জন্য কোনরূপ চেষ্টা বা জোর করিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা যেন বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আমার কবল হইতে মিলাইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

(কলিকাতায় এই বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা সমিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার ব্যবস্থা থাকিলে, তাহা দয়া করিয়া জানাইবেন। ভাঃ সঃ)

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

(৪)

ব্যারিষ্টারীতে প্রবেশ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর উমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে আরও তিন জন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রবীণতম জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইলেও অধিকাংশ কাল ইংলণ্ডে থাকিতেন এবং এদেশে ব্যারিষ্টারীতে প্রবৃত্ত হন নাই। তৃতীয় ব্যারিষ্টার মাইকেল মধুসূদন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর ব্যারিষ্টার হইয়া পর বৎসর ৭ই মে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন কিন্তু তাঁহার অপরিণামদর্শিতার ফলে তাঁহাকে এমনভাবে জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল যে ধীরভাবে ব্যবসায়ে মনোযোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টে নাম লিখিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় পরিচ্ছদে চোগা চাপ্‌কান পরিয়া কোর্টে যাওয়ায় যুরোপীয় ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে প্রথমে বার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং কয়েকটী টার্মে তাঁহার খানা খাওয়া হয় নাই বলিয়াও তাঁহাকে ব্যারিষ্টারী করিতে দিতে আপত্তি হয়। পরে এ আপত্তি খণ্ডিত হয়



উমেশচন্দ্র

এবং বার লাইব্রেরীর এক কোণে 'এসিয়া মাইনর' নামে উপহসিত স্থানে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। মনোমোহন ফৌজদারী মোকদ্দমা গুলিতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং মফঃস্বলের অত্যাচার সমূহের প্রতিকারার্থে তিনি অনেক সময়ে বিনা পারিশ্রমিকে মোকদ্দমা করিতে যাইতেন। এই সকল মোকদ্দমার অভিজ্ঞতা যেমন তাঁহাকে মফঃস্বলের হাকিমগণের ভীতির কারণ করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনই তাঁহাকে বিচার ও শাসনবিভাগের পার্থক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদিত করিবার জন্য প্রজাদের এক নির্ভীক পক্ষসমর্থক করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আজীবন বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে প্রভূত সাফল্য ও অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রও প্রথমে বার লাইব্রেরীর তথাকথিত 'এসিয়া মাইনরে' আসন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা, প্রগাঢ় জ্ঞান ও অবিচলিত অধ্যবসায় অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্য ও অনুবর্ত্তীরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হাইকোর্টে দেশীয় ব্যারিষ্টারগণ যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে যুরোপীয় ব্যারিষ্টারদিগের গৌরবদীপ্তি মলিন হইয়া গিয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর অধ্যক্ষ-সভ্য

উমেশচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার শিক্ষালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর অতি দুরবস্থা হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গতাসু হইলে তাঁহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ক্রমশঃ উহার অবনতি ঘটিতে থাকে এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলেজীয় উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিয়া উহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়ান হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হরেকৃষ্ণ স্কুলের পরিচালন ভার একটি সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। এই পরিচালন সভা বা অধ্যক্ষ সভায় বিদ্যালয়েরই নিম্নলিখিত কৃতী ছাত্রগণ ছিলেন।

(১) গিরিশচন্দ্র ঘোষ—'বেঙ্গলী'র দেশবিখ্যাত সম্পাদক।

(২) যদুলাল মল্লিক—বিখ্যাত ধনী এবং কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।

(৩) কৈলাসচন্দ্র বসু—এসিষ্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেল।

(৪) বেচারাম চট্টোপাধ্যায়—'বেঙ্গলী'র কার্য্যাধ্যক্ষ এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এষ্টেটের কর্মচারী।

(৫) উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যারিষ্টার।

উমেশচন্দ্র আজীবন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই সমিতিতে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সেমিনারীকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করেন এবং নূতন নিয়মাবলী দ্বারা উহার পরিচালন ভার একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর প্রদত্ত হয়। উহার প্রথম সভ্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মিঃ ডব্লিউ-সি-বোনার্জ্জী, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, রায় অনাথনাথ মল্লিক বাহাদুর, মিঃ ও-সি দত্ত, বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় (উমেশচন্দ্রের সহোদর), বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় রাধাচরণ পাল, বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (বেঙ্গলী সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র), অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, গোপীনাথ চন্দ্র, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

উমেশচন্দ্র এই সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন। নূতন ভাবে সংগঠিত করিয়া উমেশচন্দ্র এই বিদ্যালয়কে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়রূপে পুনঃ পরিণত করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর হিন্দুপেট্রিয়ট ও বেঙ্গলীর প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশপ্রেমিক গিরিশচন্দ্র ৪০ বৎসর মাত্র বয়সে অকালে পরলোক গমন করেন। তিনি সৈন্য সংক্রান্ত হিসাব বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যের উপর সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্র সম্পাদন করিতেন এবং

বিরলপ্রাপ্ত অবসরে বেথুন সোসাইটী, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট, হাবড়ার ক্যানিং ইনষ্টিটিউট, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রভৃতি নানা সভায় সভাপতি বা বিশিষ্ট সভ্যরূপে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে—উমেশচন্দ্র বেথুন সভা, সমাজ-বিজ্ঞান সভা, ক্যানিং ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি সভায় সদস্য হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পরে নানাস্থানে, বিশেষতঃ টাউনহলে হিন্দুসমাজের নেতা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট শোকসভা হয় এবং উহাতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য একটি স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে বহু য়ুরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে উমেশচন্দ্রও অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এই সমিতির চেষ্টায় সংগৃহীত অর্থে প্রতি বৎসর গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাস্থান ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর দ্বিতীয় শ্রেণীর (এখন নবম মানের) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে এক বৎসরের জন্য একটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেহ রক্ষা

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন বাঙ্গালার মহাকবি বাণীর বরপুত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহলোক হইতে অপসৃত হন। স্বীয় অপরিণামদর্শিতার ফলে তাঁহার শেষ জীবন কিরূপ দুঃখময় হইয়াছিল এবং কিরূপ দারিদ্র্যদশায় তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহরক্ষা করেন তাহা তাঁহার জীবনচরিত পাঠকগণ অবগত আছেন। যে সকল অকৃত্রিম ও সহৃদয়



মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে)

বন্ধু তাঁহাকে অর্থসাহায্যাদি দ্বারা তাঁহার শেষজীবনে কথঞ্চিৎ শান্তির ব্যবস্থা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে উমেশচন্দ্র ও মনোমোহনের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। মধুসূদনের জীবনচরিতে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন :—

"রোগশয্যায় মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্য্যে প্রশংসাপ্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্যদান ও সহানুভূতি এবং তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা, মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঁহাদের দুইজনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মধুসূদনকে আরও দুর্দ্দশায় জীবন শেষ করিতে এবং তাঁহার শিশু দুইটীকে প্রকৃতই রাজপথের ভিক্ষুক হইতে হইত।

মধুসূদনের বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোমোহন বাবু তাঁহার রোগশয্যায় সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।"

মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার অনাথ শিশু সন্তানগণের শিক্ষায় ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হয়। উমেশচন্দ্র উহার সম্পাদক ছিলেন। অন্যান্য সদস্যগণের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।—

মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

দ্বারকানাথ মিত্রের পরলোকগমন

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ হাইকোর্টের বিচারপতি সুপণ্ডিত দ্বারকানাথ মিত্র পরলোকে গমন করেন। উমেশচন্দ্র যখন হাইকোর্টে যোগদান করেন তখন ইনিই একমাত্র দেশীয় বিচারপতি ছিলেন। স্যর হেনরি কটন তাঁহার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Indian and Home memories নামক গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন যে সকল ভারতবাসী অলঙ্কৃত করিয়াছেন তিনি বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ইনি কোমতের প্রবর্ত্তনের অনুরাগী ছিলেন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কোমতের অনুরাগীদিগের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, উমাকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্ত উমেশচন্দ্র দ্বারকানাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে উক্ত বৎসর ২৭শে মে টাউনহলে একটি সাধারণ শোকসভা আহূত হয়। বিচারপতি মিঃ কেম্প সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শেরিফ মানকজী রস্তমজী, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, ব্যারিষ্টার প্রবর মিঃ মণ্টিয়ু, রাজা (পরে মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মিঃ অ্যাল্যান, আমীর আলি খাঁ বাহাদুর, আশুতোষ ধর, মৌলভি (পরে নবাব) আব্দুল লতিফ খাঁ বাহাদুর এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। এই সভা দ্বারকানাথের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ একটি সমিতি গঠন করেন। উহাতে য়ুরোপীয় বিচারপতি ব্যারিষ্টার প্রভৃতির সহিত অনেক উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালী ছিলেন, তন্মধ্যে উমেশচন্দ্রকে অন্যতম সদস্য এবং তাঁহার পিতৃব্য ভৈরবচন্দ্রকে অন্যতম অবৈতনিক সম্পাদকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ৺কাশীপ্রাপ্তি

এই বৎসরেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল শোভাবাজারের সদ্বিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ৺কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। ইনি ও মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উমেশচন্দ্রের পিতৃবন্ধু এবং উমেশচন্দ্রের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কালীকৃষ্ণ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইহার জীবন ও সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভারতবর্ষে ১৩৪৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ ও কমলকৃষ্ণের প্রতি

যে তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাত প্রথম পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন কমলকৃষ্ণ শেলী এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন কালীকৃষ্ণ উড্। শেলী নামক জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ কবি উমেশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং স্তর চার্লস উড* সেকালে ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেটরূপে ভারতবর্ষের



রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

অনেক কল্যাণসাধন করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাহা কিছু কল্যাণকর তাহা গ্রহণ এবং যাহা কিছু অকল্যাণকর তাহা বর্জ্জন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত



কমলকৃষ্ণ শেলী বনার্জ্জী

* কেহ কেহ বলেন কালীকৃষ্ণ উড বনার্জ্জী ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ কালে উমেশচন্দ্র উড নামক এক ইংরাজ পরিবারের সহিত বাস করিতেছিলেন, এবং সেইজন্য নবজাত সন্তানের নাম উড রাখা হয়।

ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণের নামকরনেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাপুরুষগণের নামের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র সরলকৃষ্ণ কীট্‌স-এর নাম তাঁহার প্রিয় অপর ইংরাজ কবি জন কীট্‌সের নাম অনুযায়ী



কালীকৃষ্ণ উড বনার্জ্জী
(পত্নী শ্রীযুক্তা মৃণালবালা দেবী)

রাখিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্র রতনকৃষ্ণ কারান্যের দ্বিতীয় নাম প্রসিদ্ধ আইরিশ স্বদেশ প্রেমিক ও বাগ্মী কারান্‌-এর নামানুসারে রক্ষিত হয়।



রতনকৃষ্ণ কার‍্যান বনার্জ্জী (পত্নীসহ)

ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অত্যল্পকাল মধ্যেই উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টারের ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

যখন হাইকোর্টে যোগদান করেন তখন ইংরাজ ব্যারিষ্টারদিগেরই প্রাধান্ত এবং সাধারণ ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দেশীয় অপেক্ষা ইংরাজ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে উৎসুক হইতেন। তথাপি উমেশচন্দ্র যে শীঘ্রই অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের মতে তাহার তিনটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, বহু এটর্ণি ও উকিল তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করেন। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি ও তথ্য সংগ্রহে নিপুণতা। তৃতীয় কারণ, সরলভাবে প্রকৃত তথ্যগুলি বিচারকক্ষে বুঝাইয়া দিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

শোভাবাজার রাজবংশের মহারাজা কমলকৃষ্ণ, রাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি উমেশচন্দ্রের বিশেষ হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান গবর্ণমেণ্ট প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, উকিল (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীনাথ দাস, নীলমাধব বসু, উমাকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

ইংরাজ ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে প্রবীণতম ব্যারিষ্টার মিঃ ডব্লিউ-এ-মণ্টেগু যিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া এদেশে আসেন এবং অফিসে নিয়মিতভাবে হুঁকায় ধূমপান করিতেন, চার্লস্ পিফার্ড, যিনি লাঞ্চের সময় এক বোতল শ্যাম্পেন প্রত্যহ পান করিতেন, স্যর চার্লস পল যিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এডভোকেট জেনারেলের পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন জেমস-টি-উড্রফ (বিচারপতি স্যর জন উড্রফের পিতা), "টাইগার" জ্যাকসন, পিট কেনেডি, আর্ণেষ্ট ট্রেভেলিয়ান, গ্রিফিথ ইভ্যান্স, এস, জি, সেল প্রভৃতি সকলেই উমেশচন্দ্র ও মনোমোহনের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।



স্যর চার্লস পল

আনন্দমোহন বসু, আমীর আলি, স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি কয়েক বৎসর পরে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন।

হাইকোর্টের য়ুরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণও উমেশচন্দ্রের প্রতিভার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

যে সকল মোকদ্দমায় ব্যবস্থাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রকটিত করিয়া ও যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া উমেশচন্দ্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্যবহির্ভূত ও নিষ্প্রয়োজন। তবে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ফৌজদারী মোকদ্দমার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরে একবার উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে মনোমোহন ঘোষের বাটীতে বেড়াইতে যান। সেই সময়ে মেহেরপুরের একজন য়ুরোপীয় সিভিলিয়ান এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে একজন নীচজাতীয়া দেশীয়া রমণী তাহার উপর বলাৎকারের অভিযোগ করে। নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বেল তদন্ত করিয়া মোকদ্দমাটী মিথ্যা বলিয়া 'ধামাচাপা' দেন। অতঃপর সেই রমণীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিবার জন্ত জেলা জজের নিকট নালিশ করা বলিয়া মনোমোহন বন্ধু উমেশচন্দ্রকে সেই দরিদ্রা রমণীর পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। উমেশচন্দ্র অতিনিপুণতাসহকারে রমণীর পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিচারক মিষ্টার ডব্লিউ এফ্ ম্যাকডনেল (পরে লর্ড ম্যাকডনেল) উমেশচন্দ্রের সমুচিত সুখ্যাতি করিয়া রমণীকে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন।

(২) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাগাণ্ডা নিবাসী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবক পত্নীকে হত্যা করিবার জন্ত হুগলী দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পায় যে তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরি নবীনের সুন্দরী যুবতী পত্নী এলোকেশীকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিপ্রায়ে এলোকেশীর বিমাতার সহিত ষড়যন্ত্র করে। এলোকেশী তাহার সতীত্ব রক্ষার জন্ত নবীনকে সমস্ত কথা অবগত করায় কিন্তু যানবাহনাদি না পাওয়ায় নবীন পত্নীকে স্থানান্তরিত করিতে অক্ষম হয় এবং অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বঁটী দ্বারা তাহার প্রাণাধিকা পত্নীকে হত্যা করিয়া তাহার সতীত্ব রক্ষা করে। এই ঘটনায় তৎকালীন সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। হিন্দু সমাজের অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহানুভূতি নীবনচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র নিজব্যয়ে প্রত্যহ হুগলী জজ আদালতে গিয়া নবীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমা করেন। কিন্তু বিচারে নবীনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। হিন্দু সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ লাটসাহেবের নিকট ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্ত আবেদন করেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে যুবরাজের (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের) আগমন উপলক্ষে নবীনকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে "ইস্! মোহন্তের এই কি কাজ!" "মোহন্তের বিলাপ" প্রভৃতি নাটক রচিত ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

(৩) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করিবার কিছুদিন পরে বাঙ্গালী "জেনানা" দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং হাইকোর্টের জুনিয়ার



অমৃতলাল বসু (তরুণ বয়সে)

মহাশয় যুবরাজকে নিজগৃহে নিমন্ত্রিত করেন। এই ব্যাপার লইয়া তৎকালীন হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন হয়। যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থ-ই উদার মতাবলম্বী হইতেন এবং পরিবারস্থ মহিলাগণকে সুশিক্ষিতা করিয়া অবরোধ মুক্ত করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এত গোলযোগ হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বহু ভদ্রব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাগণকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তাহাতে কেহই তাঁহাদের কার্য্যে কটাক্ষপাত করেন নাই। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় পর্দা মানিতেন এবং তাঁহার কোন উচ্চপদ বা উপাধিলাভের আশায় তিনি পরিবারস্থ মহিলাগণকে যুবরাজের সমক্ষে বাহির করিতেছেন এইরূপ অনুমান করিয়া অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধুগণের প্ররোচনায় তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ কবিতা 'বাজী মাৎ' রচনা করিলেন—

"বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে।
কিস্তি দানে, এক ভাড়াতে কল্লে বাজী মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।

* * * *

এগিয়ে এসো বড় ঠাকরুণ, সাত পোয়াতীর মা।
তক্ত পাবেন তোমায় তিনি তাও কি জান না?

* * * *

আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?"

জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া চারিদিকে রব উঠিল। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসু 'বাজীমাৎ' আবৃত্তি করিতে



জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়

লাগিলেন এবং উপেন্দ্রনাথের রচিত 'গজদানন্দ' নামে একটি প্রহসন (১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) অভিনীত করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিনয় বন্ধ করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ২৩শে ফেব্রুয়ারী নূতন নামে 'গজদানন্দ' অভিনীত হইল। অভিনয় বন্ধ করিবার কোনও আইন না থাকায় বড়লাট বাহাদুরের অর্ডিন্যান্স দ্বারা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ অভিনয় বন্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। পুলিশ নিষেধ করিলেও উপেন্দ্রনাথ 'হনুমান চরিত্র' নামে উহা পুনরভিনীত করিলেন। পরবর্ত্তী ১লা মার্চ উপেন্দ্রনাথের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নামক নূতন নাটকের অভিনয়ের পরে 'Police of Pig and Sheep' নামক একটি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসনে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ল্যাম্ব-এর অন্যায় আচরণের শ্লেষাত্মক সমালোচনা করা হইয়াছিল। শেষোক্ত প্রহসনের অভিনয় অর্ডিন্যান্স প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ধ করা হইল। এইবার পুলিশ ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র কোনও অংশের অভিনয় অশ্লীল বলিয়া উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালকে এবং থিয়েটারের সত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী ও অন্যান্য অভিনেতাকে পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত করিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার হয়। হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, 'আর্য্যদর্শন' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হাইকোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিটার মিঃ ওয়েন, ডাক্তার (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন গ্রন্থখানি অশ্লীল নহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলেন উহা অশ্লীল ত নহেই, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে উহা রচিত হইয়াছে। আচার্য্য ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে উহা যদি অশ্লীল হয় স্যার ওয়াল্টার স্কটের নভেলকেও অশ্লীল বলিতে হয়। যাহা হউক ডিকেন্স সাহেবের বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল দোষী সাব্যস্ত হন এবং (৮ই মার্চ ১৮৭৬) এক মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

উমেশচন্দ্র রঙ্গালয় ভালবাসিতেন এবং সাধারণ নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে তাঁহার শিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন। উমেশচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ প্রদত্ত হইবা মাত্র হাইকোর্টে বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবির নিকট উপস্থিত হইয়া উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালকে জামিনে মুক্ত করিলেন। অশ্লীল অভিনয় হয় নাই, এবং হইলেও এমন কোন আইন তখনও পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ হয় নাই যাহাতে এইরূপ দণ্ড প্রদত্ত হইতে পারিত। সকলেরই আশঙ্কা হইল ইহার প্রতীকার না হইলে দেশীয় নাট্যশালা পরিচালনা করা অসম্ভব হইবে এবং সকলেরই সহানুভূতি অভিনেতাদের প্রতি ধাবিত হইল। মোকদ্দমার সময় মেসার্স ব্রানসন, তারকনাথ পালিত ও মনোমোহন ঘোষ আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল উভয়েই নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করেন।

এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট Dramatic Performances' Control Bill বিধিবদ্ধ করেন।

দুখের দুলাল

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

তোরা সব দুঃখে ডরাস্ কঠোর ব'লে।
দুখেরি দহনে সব মরিস্ জ্ব'লে।
তোরা শুনে যা আমার কথা,
আমি ডরি না দুঃখ-ব্যথা,
দুখেরি পেষণ মোরে বেদনা ব'লে।
জীবনের সকাল হ'তে
জীবনের পথে পথে
দুঃখ মোরে করুন প্রহার নানান্ ছলে।
আমি তার ছলে, বলে, দলনে আর দাহন মাঝে
বিষম ধাক্কা খেয়ে হ'লাম জয়ী বীরের সাজে।
দুখেরি সাথে আসে দৈন্য-পীড়া,
তারা মোর কাছে যেন মাণিক হীরা,
তাদেরি ভালবাসি,—
তারা যে করুণ পালন তাদের কোলে।

অবসান

শ্রীঊষা মিত্র

১

বর্ষণ-ঘন শ্রাবণ দিন। মেঘাবৃত আকাশের নীচে পল্লীমায়ের শ্যামল অঙ্গনখানি ভ'রে উঠেছে অযত্ন-বর্দ্ধিত জানা-অজানা সহস্র প্রকার আগাছায়। জন-বিহীন গ্রামের শূন্য ঘর দ্বার কোথাও বা পরিণত হ'য়েছে ধ্বংস-স্তূপে, কোথাও ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। তারই মধ্যে যে কয়টি ঘর কোন রকমে টিঁকেছিল এতদিন, সন্ধ্যায় যেখানে জ্বলতো প্রদীপ, প্রভাতে প'ড়তো সম্মার্জ্জনীর স্পর্শ—আজ কয়দিন হ'লো সে গুলিও এক এক ক'রে শূন্য হ'য়েছে।

সবার শেষে পথে বেরিয়েছেন—আদিনাথ, তাঁর বিধবা পুত্রবধূ ক্ষমাকে সঙ্গে নিয়ে। যাবার আগে উভয়ে একবার দাঁড়ালেন শূন্য বাড়ীখানির দিকে ফিরে। ক্ষমার সীমাবদ্ধ জীবনের, অসীমের পথ চাওয়া মনের, যা কিছু সত্য এবং স্বপ্ন সবই যে বিকাশ লাভ ক'রেছিল এই গৃহটিকে কেন্দ্র ক'রে। শৈশব ভাল ক'রে অতিক্রান্ত হবার আগেই সে প্রবেশ ক'রেছিল বধূরূপে এই গৃহটিতে। তারপর ধীরে ধীরে তার জীবন-নাট্যের একটির পর একটি অঙ্ক যথাক্রমে অভিনীত হ'য়ে গেছে এই স্থানটিকে অবলম্বন ক'রে। প্রথম যখন সে এসেছিল, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের একমাত্র পুত্রবধূরূপে, আত্মীয় পরিজন সবার কাছে সমাদৃত হ'য়ে, তারপর অনেকগুলো দিনই কেটেছিল তার আশার অতীত সুখে। দুঃখ যেদিন এসে জানালে ক্ষমার জীবনে তা'র অধিকার, চোখের সামনের দৃশ্যে এল পরিবর্ত্তন। জীবন-যাত্রার ধারা গেল বদলে। তবু মুখে হাসি ও মনে আশা বজায় রেখে দিন সে চালিয়ে চ'লেছিল।

আদিনাথ তাঁর উপযুক্ত পুত্র অনাদিনাথকে অসময়ে হারিয়ে, শিশু পৌত্র ও বিধবা পুত্রবধূর মুখ চেয়ে কোন মতে কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতেন।

এমনি দিনে এল প্রলয়ের ঝড়। মৃত্যু-দেবতার এক নিমেষের লীলায় গ্রামের পর গ্রাম ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। উন্মাদ বন্যার জল ভাসিয়ে নিয়ে গেল সহস্র সহস্র সর্ব্বহারা নর-নারীকে। ওদের গ্রামখানিরও অধিকাংশই ধ্বংস হ'লো সেই প্রলয়-তাণ্ডবে। যে কয়খানা ঘর কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল, তাদের অধিবাসীরাও কিন্তু রক্ষা পায়নি সম্পূর্ণরূপে। এই সর্ব্বনাশা দুর্য্যোগে আদিনাথ ও ক্ষমাকেও হারাতে হ'য়েছিল একমাত্র আশাপ্রদীপ—শিশু দীননাথকে। বাকী যে কয়জন লোক গ্রামে ছিল, এক এক ক'রে তারাও যখন গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে লাগলো—কেহ বা ব্যাধিতে, কেহ নিরুপায়ে, কেহ মৃত্যুতে, কেহ বা অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায়,—তখনও আদিনাথ ক্ষমাকে নিয়ে পিতৃ-পিতামহের ভিটাতে কোন রকমে প'ড়ে থাকতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু এবার নিতান্তই অচল হ'য়েছে; তাই আজ ওদেরও বাহির হ'তে হ'য়েছে পথে। পথ চলার অনভ্যস্ত পদ ক্ষণে ক্ষণে বাধা সৃষ্টি করছে। ক্ষমাকে বারে বারেই থামতে হচ্ছে। সকরুণ স্নেহে আদিনাথ চেয়ে দেখছেন তার দিকে—সান্ত্বনার কোন বাণী খুঁজে পাচ্ছেন না।

২

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত পথ হাঁটার পর এবার হ'ল চলার শেষ। গ্রামের আঁকা বাঁকা মেঠো পথ, সরু রাস্তা, পরিচিত অপরিচিত নানা দৃশ্যের পর এল স্বল্প-পরিচিত বিরাট নগরী। সু-অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে কখনো কখনো ক্ষমা এসেছে এখানে আদিনাথের সঙ্গে। তাঁকে সাথী পেয়ে গাঁয়ের আরও কত লোক তখন আসতো। সে কি উৎসাহ! কালীদর্শন, গঙ্গাস্নান, সহরের দেখবার স্থানগুলি বেড়ানো—দিনগুলো কেটে যেত' কত শীঘ্র। দু-চার দিন পরে আনন্দ ও তৃপ্তি-ভরা মন নিয়ে আবার ফিরে গিয়েছে সে তার ক্ষুদ্র নীড়খানিতে। সেই কয়টি দিনের স্মৃতি তার ছোট মনটিকে কত বিভিন্নভাবে দোলা দিয়েছে। আজ সে-সবই ছায়ার মত মিলিয়ে আসছে ওর মনের অন্তরালে। জনারণ্য এই পথের দিকে চেয়ে ওর বোধ হচ্ছে এ যেন কোন্ অপরিচিত স্থান, যার সঙ্গে কোন দিন কোন সম্বন্ধ ওর থাকতে পারেনা। এই কি জীবনের শেষ সীমানা? মানুষের সংসার ছাড়িয়ে সকলে এসে পড়েছে এ কোন্ প্রচণ্ড শক্তির নির্ম্মম সংহার-ক্ষেত্রে?

ভয়ে বেদনায় সে কেঁপে উঠে, দাঁড়াতে পারেনা; গাছতলায় এলিয়ে পড়ে তার দেহভার। শীর্ণ দেহে, দীর্ণ মনে আদিনাথ ব'সে পড়েন তারই কাছে, রাজপথের একধারে—আরও অগণিত তাদেরই মত নিরুপায় ভাগ্যহতরা যেখানে জড়ো হ'য়েছিল, সেইখানে।

মনে এল নূতন চিন্তা—এবার তারা কি ক'রবে? দুজনে চাইলে পরস্পরের দিকে। ক্ষমার দিকে চেয়ে সস্নেহে আদিনাথ বললেন—"তুমি এমন ক'রে ভেবনা বৌমা! আমি ত' আছি, উপায় যা হয় একটা হ'য়ে যাবে;"—যদিও এই কথা ব'লে নিজের মনকে কোনমতেই তিনি শান্ত করতে পারছিলেন না। উপায় হওয়াটা যে কত কঠিন, তা তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন।

৩

সঙ্কীর্ণ গলির দুইধারে সারি সারি কাঁচাঘরের বস্তী; অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসে। উন্নতিহীন, আলোহারা, হতাশ্বাস অনেকগুলি মানুষ থাকে এখানে। তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর সমস্তক্ষণ মুখরিত ক'রে রাখে এই ক্ষুদ্র পরিবেশটিকে।

এই বস্তীরই একখানি ঘরের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়েছিল ক্ষমা ম্লান শুষ্ক মুখে। পরণে তার শতছিন্ন মলিন কাপড়, অঙ্গনে দড়ির আলনার আর একখানি কাপড় সে শুকাতে দিয়েছিল; সেখানির অবস্থাও এর চেয়ে কিছুমাত্র ভাল নয়। ক্ষণিকের জন্য

ক্ষমা মুখ তুলে চেয়ে দেখলে একবার আকাশের দিকে। শেষ বর্ষার আকাশ, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও একটু আলোর রেখা চোখে পড়ে। তারপর সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দাওয়ার একধারে উনানটির কাছে। পাখা হাতে ক'রে আগুন ভাল ক'রে ধরিয়ে, যে কয়টি চাল ছিল চড়িয়ে দিলে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস-কুণ্ডলী-পাকান বদ্ধ ধোঁয়ার মত—তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। গালে হাতটি রেখে সে ব'সে পড়্‌লো মাটীতে সেইখানে। মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌লো হাহাকার,—

"আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার ?"

এখানে আসার পর সঙ্গে যে অল্প কিছু সঞ্চয় ছিল তারই সাহায্যে আদিনাথ ক্ষমাকে নিয়ে আশ্রয় ক'রে আছেন এই স্থানটিতে কোন মতে। 'কণ্ট্রোল্‌' দোকান থেকে চাল কিনে ও গোপনে তাই বিক্রী করে প্রতিদিন অন্ন সংস্থানের উপায় ক'রে নিতে হয়। প্রৌঢ় বয়স, শোকভগ্ন মন, এই অনভ্যস্ত বিভীষিকাপূর্ণ জীবন, দেহ যেন বহন করতে পারে না আর নিজের ভার। দিনে দিনে অচল হ'য়ে পড়্‌ছে অবস্থা। বর্ত্তমানের সমস্যাকে কোন রকমে দুই হাতে ঠেলে আশাহীন অজানা ভবিষ্যতের দিকে শুধু এগিয়ে চলা।

ক্ষমা একবার জানিয়েছিল,—"সে যদি একটা কোন কাজ নেয়—যেমন এখানের অনেক মেয়েই নিয়েছে, দত্তদেরই মত গৃহস্থ ঘরের মেয়েও এখানে আছে। সকরুণ ব্যগ্র-কণ্ঠে আদিনাথ বল্‌লেন—আমি বেঁচে থাক্‌তে নয়, যতটা তোমায় কষ্ট দিয়েছি, এই তো যথেষ্ট ; এর বেশী আর সইবে না।"

সহরের অবস্থা হ'য়ে উঠ্‌ছে ভয়াবহ। প্রভাত হ'তে রাত্রি পর্য্যন্ত আর্ত্তকণ্ঠে ক্ষুৎ-পিপাসাতুর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অবিরাম যাচ্ঞা, মর্ম্মভেদী ক্রন্দন।

সাড়া পৌঁছিল নাগরিকগণের মনে। পুরাতন সংস্কৃতি-সম্প্রদায় সচকিত হ'য়ে উঠলেন সুসংস্কৃত গর্ব্বিত নগরীর অবস্থায়। নগর-লক্ষ্মীরা বাহির হ'লেন অন্নপাত্র হাতে। দলে দলে ধনীরা দিলেন আর্থিক সাহায্য, মধ্যবিত্ত দিলেন অর্দ্ধাহারের অংশ। এমনি ক'রে সকল সামর্থ্য এক হয়ে স্থানে স্থানে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য ছত্র খোলা হ'য়েছে। সেখানে গিয়ে সাহায্য ওরা নিতে পারে না, কারণ উন্মত্ত বুভুক্ষিতের ভীড়ে ঠেলাঠেলি করে পথের পাশে ব'সে আহার করার মত অকুণ্ঠ মনের অবস্থা তখনও ওদের আসেনি। একদিন জন্ম হ'য়েছিল যে সংস্কৃতির মধ্যে, এখনও তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি ;—ভুলতে পারেনি কোন দুর্দ্দশাতেই।

৪

মহাপূজার সপ্তমী।—

আলোকে, শিশিরে, কুসুমে, ধান্যে নিখিল অবনী আজ হেসে ওঠেনি। গ্রামে গ্রামে শূন্য ঘর দ্বার, জনহীন পথঘাট নীরবে নিবেদন করছে তাদের অপরিমাণ নিঃস্বতা! জনাকীর্ণ নগরীর পথে পথে বুভুক্ষিতের দল স-স্বরে প্রকাশ করছে "বেদনার করুণ কাহিনী", অন্তিম আবেদন। এই মহা-শ্মশানের মাঝে মাঝেও আয়োজন হ'য়েছে মহামায়ার আবাহনের—স্থানে স্থানে প্রতিমায় পূজা হ'য়েছে, আর তারই সঙ্গে 'কাঙালী-ভোজনের' অনুষ্ঠান। বেশভূষা ক'রে সুসজ্জিত বালক বালিকার দল ছুটে চলেছে, তরুণীরা আনন্দ ও হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে পথে পথে,—কুড়িয়ে নেবার আগ্রহেরও অভাব নেই। স্বেচ্ছা-সেবিকারা ব্যস্ত, স্বেচ্ছা-সেবকরা প্রাণপণ করে শৃঙ্খলা রাখবার চেষ্টায় হতাশ্বাস। শুচি-শুদ্ধা গৃহিণীরা প্রাণপণে শুচিতা রক্ষা ক'রে পথ দেখে কাপড়-চোপড় সাম্‌লে চলেছেন মণ্ডপের দিকে—দেরী হ'য়ে গিয়েছে পথের অপরিচ্ছন্নতায়। তাঁদের প্রতিযোগীতায়ই যেন এক এক দল অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে পথে পথে লুটিয়ে চলেছে সাড়ী, ধুতি, পায়জামা। নির্ব্বিকার ওরা সত্যই।

এই উৎসব, অর্চ্চনা, আনন্দ-চাঞ্চল্যের গতিপথের অদূরে হয়ত প'ড়ে আছে নিরন্ন শিশুর নগ্ন মৃত-দেহ। নিরন্ন অর্দ্ধনগ্না কঙ্কালিনী ছুটে যেতে চাইছে টল্‌মলে পায়ে ; তাকে ঠেলে ফেলে যেতেও বাধছে না ওরই মধ্যে যাদের প্রাণ আছে, সেই সব পশুবৎ বালক যুবতীদের। কোথাও কোন প্রৌঢ়া নারী চামুণ্ডার মত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলার চেষ্টা করছে, দৃঢ়ভাবে সকলের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়ে।

ফুটপাথের একধারে একখানা চটের উপর চুপ ক'রে ব'সে আছে ক্ষমা, শঙ্কাকুল দৃষ্টি পথের পানে মেলে ; সামান্য জিনিষপত্র ক'টা কাছেই রেখেছে পাঁচিলের কোল ঘেঁসে।

আজ কয়দিন হ'লো এইখানেই তারা শেষ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে একটা খাবারের দোকানে আদিনাথ কাজ পেয়েছিলেন। ওদের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রায় অল্পদিন তাতেই এসেছিল একটু স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্বাস ফেলবার যেন একটু অবসর মিলেছিল। কিন্তু সবই বিপরীত হ'য়ে গেল, আদিনাথ সহসা অসুস্থ হ'য়ে পড়ায়। প্রাণপণ চেষ্টায় ও যত্নে ক্ষমা যদিও তাঁকে রোগমুক্ত ক'র্‌লে, কিন্তু আদিনাথের পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরে এল' না। সঞ্চয়েরও শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত শূন্য হ'য়ে গেল। ঘর ভাড়ার দায়ে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা এড়িয়ে অবশেষে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন এই রাজপথে—যেখানে সকলেই আজ এক পংক্তিতে ভুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে—প্রথম কয়দিন যাহোক্‌ কিছু আহার্য্য জুটেছিল ; গত দু-দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কেটেছে। আজ কোন রকমে অচল শরীরটাকে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে আদিনাথ অগ্রসর হলেন অদূরবর্ত্তী পূজা-মণ্ডপের দিকে, প্রসাদের আশায়। দশভূজার প্রসন্ন মুখের পানে চেয়ে ক্ষমার করুণ ক্লিষ্ট মুখখানিই তখন তাঁর হৃদয় অধিকার ক'রে বসেছিল। বঞ্চিত হ'তে হ'ল না তাঁকে। পাত্র পরিপূর্ণ প্রসাদ-অন্ন নিয়ে কৃতজ্ঞ মনের মিনতি ও প্রণাম নিবেদন ক'রে কোনমতে আদিনাথ ভীড়ের বাহিরে এলেন, পরিশ্রান্ত ক্লিষ্ট। অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষমার ভয়ার্ত্ত দৃষ্টির সাম্‌নে কম্পিত দেহে তিনি এসে বসে পড়লেন, দাঁড়াবার আর সামর্থ্য নেই। গাছের তলায় ফুটপাথের উপর কম্বল পেতে ক্ষমা তাঁকে সযত্নে শোয়ালে। ঘটির জল নিয়ে মুখে চোখে ছিটিয়ে দিলে। হাতের প্রসাদটি নামিয়ে নিয়ে এক গ্রাস মুখের কাছে এনে খাওয়াবার চেষ্টা করলে ; ব্যাকুল স্বরে বারবার সে ডাক্‌লে

তাঁকে অঞ্জলি ভ'রে জল পান করালে। ক্ষমার আহ্বানে আর সাড়া এল না, মুহূর্ত্তের জন্য শুধু চোখ খুলে তিনি একবার ক্ষমার মুখের দিকে চাইলেন সজল করুণ দৃষ্টি। তারপর চিরতরে মুদে গেল। ক্ষমা ব্যাকুল আর্ত্তস্বরে চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো তাঁরই দেহের উপর।

ওপারের ফুটপাথের উপর তখন এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী হ'তে আর একটা প্রাণহীন দেহ নামিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। মিনিট কয়েক আগে চিকিৎসার আশায় তাকে রওনা করা হ'য়েছিল হাসপাতালের উদ্দেশে, পথেই হয়েছে তার মৃত্যু।

স্বেচ্ছাসেবকেরা মৃতবাহী গাড়ীর উদ্দেশে ফোন্ ক'রে সংবাদ দিলে দুটি হতভাগ্যের সংকারের জন্য।

অদূরে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের বাজনার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ক্ষমার ও ক্ষমার মত শত শত ভাগ্যহারার ক্রন্দন রোল মিশে যাচ্ছে তারই সঙ্গে।

পোল্যাণ্ড

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্ম্মান চুক্তির ফলাফল

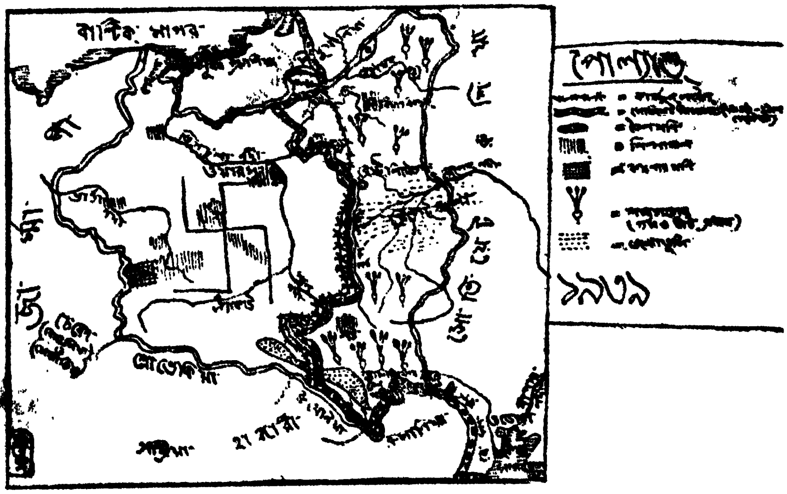
রুশিয়ার স্থবিধা—চুক্তির ফলে নাৎসিদলের মধ্যে একটা রহস্যের সৃষ্টি হোল, কেননা বলশেভিকদের সঙ্গে চুক্তিটা অতি আশ্চর্য্য। বামপন্থী দলরা সুবিধা পেলে তাদের সাম্যবাদ প্রচার করায়। ইতালী গেল চটে। ফ্রাঙ্কো গেলেন ঘাবড়ে, তাই স্পেন যুদ্ধে জড়িত হোল না। আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকল অর্থাৎ রাশিয়া খানিকটা সময় হাতে পেল। সোভিয়েট বিরোধী ব্লক আর তৈরী হোল না। এতগুলো সুবিধা কম নয়।

জার্ম্মানীর উপর প্রভাব—সোভিয়েটের যা লাভ, জার্ম্মানীর তাই ক্ষতি। তবে সোভিয়েটকে সে গোড়ার দিকে তার শত্রুর সংখ্যা থেকে বাদ দিয়ে রাখলো এইটুকু তার সুবিধা, যদিও সে সুবিধার জন্য দায়ী সোভিয়েট নয় কারণ সে গোড়ায় জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করতে চায়নি।

বৃটেন ও ফ্রান্সের উপর প্রভাব—সোভিয়েটের সুবিধাগুলোকে এদেরও সুবিধা বলা চলে। ইটালী ও স্পেন অন্তত: কিছুদিনের জন্য বৃটেনের ও ফ্রান্সের ভূমধ্য সাগরীয় বাণিজ্য বাধা দিতে পারলে না। কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে আসলে চক্রশক্তিকে দৃঢ়ভাবে দলবদ্ধ করা হয়েছিল, যার ফলে সেই মুহূর্ত্তে হংকং বা সিঙ্গাপুর আক্রান্ত হতে পারতো কিন্তু রুশ জার্ম্মান চুক্তি সে সম্ভাবনাকে পেছিয়ে দিলে। 'টাইম্‌সের' কথা থেকেই একথা বোঝা যাবে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তি হবার পর, টাইম্‌স্ লিখলে, "এই নতুন চুক্তিটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিতাপের বিষয়। গুজব রটছে যে এই চুক্তি ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জার্ম্মান ও জাপানী অর্থনীতির প্রভাব বাড়াবে এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে হংকং ও সিঙ্গাপুরে। গুজবটি নেহাৎ বাজে নয়।"

সোভিয়েট সেই যুদ্ধকে কিছুদিন পেছিয়ে দিয়েছে মাত্র, চিরশান্তির প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সাহায্য না পেয়ে। সোভিয়েট যুদ্ধ চেয়েছে একথা তার অতি বড় শত্রুও বলতে পারেনি কোনদিন। চুক্তির পর সে জার্ম্মানীকে কাঁচা মাল দিয়ে নিজে পাকা মাল অর্থাৎ যন্ত্রপাতি নিয়ে লাভবান হয়েছে। কাঁচা মাল তো অযুদ্ধমান সব শক্তিই সকলকে দিতে পারে আন্তর্জ্জাতিক আইন হিসাবে। ইংরাজ ও আমেরিকা জাপান ও জার্ম্মানীকে যুদ্ধের মাল দেননি? পোলাণ্ড আক্রান্ত হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সরকার ও যুদ্ধশক্তি লোপ পেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট সেনা আত্মরক্ষায় অপারগ পোলদের রক্ষা করার জন্য পোলাণ্ডে প্রবেশ করলে। তারপর সোভিয়েট সেনা গেল দক্ষিণ দিকে রুমানিয়ার নাৎসী অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে। বিভিন্ন দেশ সোভিয়েটকে ছিছি করে উঠল।

(২) প্রথমে তারা বল্লে যে সোভিয়েট পিছন থেকে ছুরী মারলে। তারা বল্লে যে পোল সেনারা সুন্দর বাধা দিচ্ছিল এমন সময় সোভিয়েট বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তার উত্তরে টাইম্‌সের পোলাণ্ড প্রবাসী প্রতিনিধির কথাই তুলে দেওয়া যাক। (১৬ই সেপ্টেম্বর):—



"পোলাণ্ডের অবস্থা আজ আর সংঘবদ্ধ পশ্চাদপসরণ নয়, পোলাণ্ডের রণাঙ্গন সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। যেটুকু আছে তা অতি সহজেই জার্ম্মানরা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। দুদিন পরে 'টাইম্‌স' আবার লিখলে, লালফৌজ আসবার আগেই, দুএকটি জায়গায় ছাড়া পোলাণ্ডের প্রতিরোধ লোপ পেয়েছিল।" সুতরাং লালফৌজ পোল সেনার প্রতিরোধে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। তারা অপারগ হবার পরই লালফৌজ এসেছে।

অভিযোগ বিশ্লেষণ

আর একটি কথা হচ্ছে যে যাঁরা বলেন যে (১) এই রুশ জার্ম্মান চুক্তিই যুদ্ধকে ডেকে আনলো তাঁরা যেন মনে রাখেন যে রুশিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারেও আশার আলোক খুঁজে যখন পায়নি, তখনই নিজের নিরাপত্তার জন্য পুরানো বার্লিন চুক্তিকে নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছে মাত্র। যুদ্ধ চেয়েছিল ইংরাজ এবং চেয়েছিল সোভিয়েটের ওপর, কিন্তু

হিটলার ও ষ্ট্যালিন

(৩) কেউ কেউ বলেন যে সোভিয়েটের সঙ্গে জার্মানী গুপ্তভাবে চুক্তি করেছিল পোলাণ্ডকে ভাগাভাগি করার। সেটাও সত্য নয়, কারণ পোলাণ্ডে জার্মানীর কূটনীতি সোভিয়েটের কাছে পরাজিত হয়েছে। ষ্ট্যালিনের কাছে হিটলার কখনই হারবার ব্যবস্থা করে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাছাড়া দুচার দিন আগেও যদি লালফৌজ যেত তাহলে জার্মানীর সুবিধা হোত। পরে গেলেও জার্মানীর লাভ হোত। যে মুহূর্তে লালফৌজ গেল তাতে হিটলারের সাহায্য তো হোলই না বরং তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বাধা পেলেন।

পলাতক পোল সরকার

(৪) যারা বলেন যে রুশ-পোল অনাক্রমণ চুক্তিকে সোভিয়েট মানলে না তাঁদের বলবার হচ্ছে এই যে, যে পোল্ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল তারাই যদি ইতিমধ্যে দেশকে ফেলে রুমানিয়ায় পালিয়ে থাকে তাহলে চুক্তি ভঙ্গের প্রশ্নই ওঠে কি? কেউ মরে গেলে কি তার সঙ্গে করা চুক্তি মানার কোন অর্থ হয়? তার দেশতো জার্মানীর হাতে, সে তো পলাতক। সে সরকারের চুক্তির কথা বলার অধিকারই নেই। সেনা-কানুনে পলাতকের (Deserter) যা শাস্তি বিহিত আছে তাই তার একমাত্র প্রাপ্য। তাছাড়া রুশিয়া তো বৃটেনকে আগেই জানিয়েছিল যে এবং পোলাণ্ডকেও বলেছিল যে চেকোশ্লোভেকিয়া আক্রমণ যদি সহ্য করা হয় তাহলে রুশ পোল অনাক্রমণ চুক্তির কোন মূল্য দেওয়া হবে না। ফ্রান্স তো বিশ্বাসঘাতকতা করে ইথিয়োপিয়াকে ইতালীর কবলে ফেলে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তবে তাহা আবার অন্যকে দোষ দেয় কোন সাহসে? চেম্বারলেনেরা কি মিথ্যাভাবে চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি?

সোভিয়েটের সাম্রাজ্যবাদ?

(৫) আবার কেউ কেউ বলেন যে সোভিয়েট পোলাণ্ড আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দিয়েছে। প্রথমতঃ সোভিয়েট যদি সত্যিই সাম্রাজ্যবাদী হোত তাহলে এঁরা সোভিয়েটের সব কাজে জোর করে অপরাধ খুঁজে বার করতেন না, গলাগলি ভাব করতে যেতেন। আমাদের দেশে যাঁরা কম্যুনিজম্ বিরোধী অথচ বৃটিশ বিরোধী তাঁদের আমার অদ্ভুত লাগে। কারণ যে বৃটিশের অন্য সব কথাকে তাঁরা মিথ্যা প্রচার (Propaganda) বলে উড়িয়ে দেন, সেই বৃটিশের সোভিয়েট বিরোধী সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচারগুলোকে তাঁরা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করেন। পড়াশোনা করে সত্য মিথ্যা যাচাই করাও তাঁদের দরকার হয় না। তাছাড়া বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার ওপর তাঁদের যখন রাগ, তখন তার ঠিক বিপরীত-ধর্মী ব্যবস্থাটাই ভালো হওয়া উচিত তাঁদের মতে অর্থাৎ যা বৃটিশের উল্টো তাই ভালো হবে। বৃটিশ শাসনপদ্ধতি যদি খারাপ হয়, যে শাসনপদ্ধতিকে বৃটিশ গালাগাল দেয় (অর্থাৎ কম্যুনিজম্) এক কথায় যাকে ভয় পায়—পাছে সেই পদ্ধতি বৃটিশ রাজনীতিকে গ্রাস করে, সেটাই তাহলে ভালো হবার কথা। বৃটিশ যা চায় সেটার ফল দেখা যাচ্ছে আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে। সুতরাং বৃটিশ যেটা হতে দিতে চায় না সেটাই আমাদের একমাত্র ভাল করতে পারে। যাহোক সোভিয়েট যদি সাম্রাজ্যবাদীই হোত তাহলে বৃটিশ কি—"এসো দাদা এসো তুমিও তাহলে আমাদের দলে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কি ভালো?"—না বলে নিজে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ অধিকার করে সোভিয়েটের সাম্রাজ্যবাদী যে য প্রচার করত?

পোলাণ্ডের লাভ না ক্ষতি?

প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে সোভিয়েট না এলে সমস্ত পোলাণ্ড জার্মানী অধিকার করত। ফলে ইহুদী ও অজার্মান জাতিদের কি অবস্থা হোত তা বোঝাই যায়। হিটলার বলেছেন, "জাতিপ্রেমিক হিসাবে এবং জাতিগত ভিত্তিতে মানবতার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করতে হলে, আমার স্বজাতিকে আমি তথাকথিত (ইউরোপের) শোষিত জনগণের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলতে পারি না কারণ আমি জাতির উচ্চনীচ ভেদাভেদ মানি।" সুতরাং ইহুদী জাতি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই পোলাণ্ডের ইহুদীদের ও তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ ও নিম্নতর জাতিদের অবস্থা কি হোত? সোভিয়েটের সবচেয়ে বড় শত্রুও মনে করে যে ইহুদী এবং নিম্ন ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের প্রতি তার সুবিবেচক সদ্ব্যবহার সারা জগতের আদর্শস্থানীয়। সুতরাং সোভিয়েটের অধিকারে পোলাণ্ডের কি লাভ হবে না? তাছাড়া পোল্-সরকারও বরাবর আধা ফ্যাশিষ্ট ছিলেন, যার জন্য জনসাধারণের ওপর অত্যাচার কম হোত না। লয়েড জর্জ লিখেছেন, "পোলাণ্ড হচ্ছে একটি কদর্য্য অপরাধী। ১৯৩৪ সালের মাইনরিটি চুক্তিতে সেই প্রথমে বাধা দেয়।" জেনেভায় পোল্ সরকার বলেন যে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ ইহুদীর মধ্যে তাঁরা ২৫ লক্ষকে সরাতে চান। ১৯৩৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'ডেলি হেরাল্ড' লিখেছিল, "ইহুদীদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা ছাড়াও তাদের দেহের ওপর এমন নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, যার তুলনা জগতের ইহুদী ধর্ষণের ইতিহাসে মেলে না।…"

অত্যাচারী পোল্ সরকার

১৯৩৮শের ১০ই নভেম্বর "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্" ছাপলে, "আর একটি শৃঙ্খলাস্থাপনা চলেছে পোল্ ইউক্রেনে। আগে ঘোড় সওয়ার পুলিশ ও সেনা পাঠিয়ে গ্রাম থেকে চাষীদের ধরে এনে চাবুক মারা হোত, তাদের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হোত। এখন শৃঙ্খলা স্থাপন হচ্ছে অন্যভাবে। রাজনৈতিক শিক্ষার প্রতি আক্রমণ চলেছে এখন…।" সুতরাং পলাতক ফ্যাশিষ্ট পোল-সরকার (যাঁরা আজ লণ্ডনে বসে সোভিয়েটের অভিসন্ধি নিয়ে আসর গরম করছেন এবং যাঁরা কিছুদিন আগে পোল কর্ম্মচারী হত্যা করার দোষ দিয়েছিলেন সোভিয়েটকে) বা হিটলারের বদলে সোভিয়েটের পোলাণ্ড দখল কি পাপে বয় হয়নি? নিজের দেশকে বৃটিশ ও ফরাসী ষড়যন্ত্রের সাহায্যে এই পোল্ সরকারই তো হিটলারের হাতে তুলে দিয়ে ল্যাজ তুলে পালিয়েছেন প্রাণভয়ে। তাঁদের কী অধিকার আছে বিপদে পরিত্যক্ত পোলাণ্ড সম্বন্ধে কোন কথা বলবার? তাঁদের অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। পোলাণ্ডকে যদি কেউ আন্তরিকভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করে থাকে তো সে সোভিয়েট সুতরাং তার কথা সারাজগত শুনতে বাধ্য। তাছাড়া যে অংশ সোভিয়েট দখল করেছে সে অংশে ইহুদীর সংখ্যাই যে বেশী শুধু তা নয়। অতি সামান্য পোলই সেখানে বাস করে। অধিকাংশই শ্বেত-রুশীয় ও ইউক্রেনীয় বাসিন্দা। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইহুদী এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি। সুতরাং যুদ্ধের পর তাদের ওপর নতুন করে অত্যাচার করার জন্য সোভিয়েটের চিরবিরোধী পোল সরকারের আগ্রহ দেখানোর কোন অর্থই হয় না। এই পোল সরকারই একদিন সোভিয়েটএর জন্মের পর বিনা-যুদ্ধ ঘোষণায় সোভিয়েটকে ধ্বংস করার জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন। (War of intervention)।

লালফৌজ পোলাণ্ডের অর্দ্ধেক অংশ দখল করার পর, "China Spain and war" বইখানিতে পণ্ডিত নেহেরু লিখেছেন, "পোলাণ্ডের অর্দ্ধাংশ আজ যতখানি স্বাধীনতা লাভ করেছে, ততখানি স্বাধীনতার

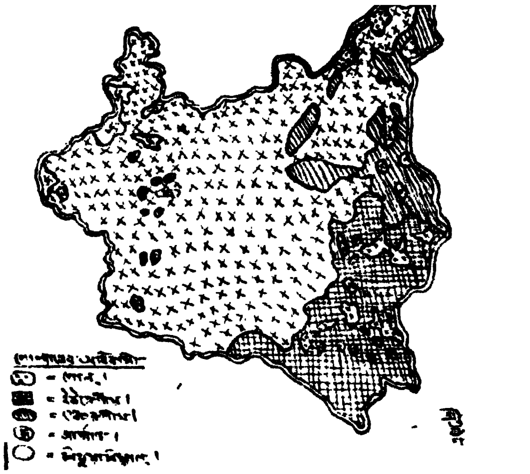
আবার পোল্যাণ্ড কোনদিন পায় নি। আজ মস্কো পার্লামেন্টে পোল্যাণ্ড প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে।"

সোভিয়েটের আত্মরক্ষা

আর একটি কথা বলার আছে। সেটা হচ্ছে সোভিয়েটের আত্মরক্ষার কথা। পোলাণ্ডের এই অংশটুকু দখল করার ফলে সোভিয়েটের সীমানা হিটলারের কবল থেকে কিছু দূরে থাকল। সোভিয়েটের এই কাজ, আর পাশের বাড়ীতে আগুন লাগলে পাছে সেই আগুন আমার বাড়ী এসে পড়ে সেই ভয়ে পাশের বাড়ীর আগুন নিভিয়ে দিতে যাওয়া, দুটিই এক ধরণের কাজ। তাছাড়া সোভিয়েটের পাশের বাড়ীর কর্ত্তা তখন নিজেই পালিয়ে ছিলেন। ১৯৩৯ সালের পয়লা অক্টোবর চার্চ্চিল বলেছিলেন "...রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্য রুশ বাহিনী সঠিক জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছে......রিবেনট্রপকে গত সপ্তাহে মস্কোয় ডেকে বলা হয়েছে যে নাৎসিদের তার বল্টিক রাজ্যগুলো এবং ইউক্রেনের ওপর নজর দেওয়া চলবে না।" এই ইউক্রেনের কথাই হিটলারের জীবন-চরিতে লেখা আছে সুতরাং সোভিয়েটের পক্ষে এছাড়া আর কিছুই করা চলত না। এর ফলে হিটলার বেশ ঘাবড়ে গেলেন কারণ তার আগে তাঁর সামনে এই রকম নির্ভীকভাবে আর কেউ দাঁড়াতে এবং তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সাহস করেনি। তাছাড়া বৃটেনও পরোক্ষে কম সুবিধা লাভ করেনি—তার চরম অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যা প্রচার সত্বেও। কারণ হিটলার গ্যালিসিয়ার ও রুমানিয়ার তেলের খনি ও গমের থেকে বঞ্চিত থাকলেন। আর একটা কথা। নতুন সোভিয়েট পোলাণ্ডের সীমানা কার্জ্জন লাইন মতেই হোল।

যুদ্ধের লক্ষ্য

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলোর যুদ্ধের তথাকথিত শেষ লক্ষ্য হচ্ছে পোলাণ্ডকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে তাদের সর্ত্ত পূর্ণ করা এবং হিটলার-বাদকে ধ্বংস করা। সোভিয়েটের লক্ষ্য কী? পোলাণ্ড সরকারের প্রতি সোভিয়েটের ভাল ধারণা নিশ্চয়ই নেই, কারণ সে সরকার সোভিয়েট এর সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে যুক্তিহীনভাবে এবং শ্বেত রুশীয় ও ইউক্রেনীয় ইহুদী ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য ফ্যাসিষ্ট-সুলভ অত্যাচার চালিয়েছে। সুতরাং অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ণ সম্মতির সঙ্গেই সোভিয়েট সে অঞ্চলকে পোল সরকারের হাতে ফিরিয়ে যেতে দেবে না। তার চেয়ে সোভিয়েট এখান মূলধন ও জমিদারের অধুপ হতে যাতে তারা সমাজতান্ত্রিক মতে স্বায়ত্ব শাসন চালাতে পারে (Autonomous Republic) সেটাই সোভিয়েট চাইবে। বাকি যে অঞ্চলে সত্যিকারের পোল জাতি বাস করে অর্থাৎ জার্ম্মান অধিকৃত অঞ্চলেও বৃটেন চালিত কুইসলিং জাতীয় কোন পুরানো পলাতক পোল সরকারকে নতুন করে আধিপত্য করতে দেবে না। আর হিটলারবাদকে শেষ করতে সোভিয়েট আন্তরিক ভাবেই চায়, বরং বৃটেনের আন্তরিকতাকে সে বিশ্বাস করে না এবং না করারই কথা। নেহাৎ বেকায়দায় পড়েই আজ মিত্রশক্তি সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। চার্চ্চিল যখন বক্তৃতা করেন তখন বলেন "জার্ম্মানীকে সমূলে ধ্বংস করবো, কিন্তু ষ্ট্যালিন্ যখন বক্তৃতা করেন কখনো তিনি হিটলারী জার্ম্মানী বা হিটলারীদের ধ্বংস করবো একথা বলতে ভোলেন না। হিটলারী কথাটাই লক্ষ্য করার বিষয়। জার্ম্মান জাতির প্রতি তাঁর কোন রাগ নেই এবং ভ্যান্সিটার্টনীতির সাহায্যে নতুন একটি যুদ্ধের বীজ বপন করার ইচ্ছা তাঁর মোটেই নেই। মিত্রশক্তি হিটলারকে ধ্বংস করে কি জাতীয় জার্ম্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে বিষয়েও



তাঁর সন্দেহ আছে। আবার যদি ধনতান্ত্রিক জার্ম্মানীর নতুন করে প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে ষ্ট্যালিনের বিশ্বাস যে আবার সোভিয়েটকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলবে। সুতরাং জার্ম্মানীতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই ফ্যাশিজম্ একমাত্র সমূলে বিনষ্ট হতে পারে এই তিনি মনে করেন। এইখানেই লাগবে মিত্রশক্তির সঙ্গে গণ্ডগোল। ত্রিশক্তি সম্মেলনের প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে যে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের ইচ্ছামত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রস্তাব যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় তাই ষ্ট্যালিন্ দেখবেন।

শারদ শ্রী

বন্দে আলী

চারিদিকে শুনি হাহাকার—
"এক মুঠি দানা দাও," নর-নারী করে চীৎকার।
পল্লীর ঘরে ঘরে ভাণ্ডার হইয়াছে খালি
পরণে ছিন্নবাস—সারা ঠাঁয়ে জোড়া আর তালি;
চালে কারো খড় নাই—বরষার বাস করা দায়—
মহাজন নিয়মিত প্রতিদিন আসে তাগাদায়।
হাঁড়িতে চাউল নাই—সবে মিলে রহে উপবাসী
হালের বলদ জোড়া হাটে লয়ে বিকায়েছে চাষী;
আর তার কিছু নাই সর্ব্বহারা নিরুপায় হয়ে
পথে আসে বাহিরিয়া বধূ আর ছেলে-মেয়ে লয়ে।
ভিখ্ মাহি মেলে কোথা—পল্লীতে নাই কিছু আর
শহরেতে যায় তারা—যদি তো বা মিলিবে খাবার।
নগরের রাজপথে গৃহহারা নর-নারী চলে
"একমুঠি খেতে দাও" জনে জনে সকাতরে বলে।
তাহাদের পানে কেহ ফিরে নাহি চায় একবার
আপন ব কাজে চলে—অবসর নাহি শুনিবার।
শিশু কাঁদে মা'র কোলে এক ফোঁটা দুধ লাগি হায়
"এইটুকু ফেন দাও।" মাতা তার দ্বারে দ্বারে চায়।
অনাহারে কাটে দিন—ফুকারিয়া কাঁদে ক্ষুধাতুর
"দয়া করো প্রাণ যায়"—হেথা হতে শুনি তার সুর
রাস্তায় ফেলে দেয়া এঁটো পাতা কুড়াইয়া সবে
খুঁটে খুঁটে ভাত ডাল খায় তারা মহা কলরবে।
মানুষে কুকুরে আজ কোনো যেন ভেদাভেদ নাই
রাজপথে চলি আর প্রতিদিন চেয়ে দেখি তাই।

দুনিয়ার-অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতে যুদ্ধকালীন প্রত্যক্ষ করের চাপ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে যুধ্যমান দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গৌরব বা অভিশাপ যাহার জন্যই হউক ভারতকে যুদ্ধজনিত বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শতকরা ৯০জন দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর অধিবাসীকে লইয়া যে দেশ, তাহার দুর্দ্দশা যে মহাসমরের পঞ্চম বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চরমে উঠিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবু সরকারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতে যে সামান্য পরিমাণ শিল্পপ্রগতি এই যুদ্ধের সুযোগে দেখা যাইতেছে, বলিতে গেলে অনেক দুঃখের বিনিময়ে ভারতের ইহাই একমাত্র লক্ষণীয় লাভ। গত মহাযুদ্ধেও আমাদের দিক হইতে দানের বা ত্যাগস্বীকারের কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি সে সময় প্রত্যেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার যে সুযোগ পাইয়াছিল, ভারতের ভাগ্যে তাহার কিছুই লাভ করা সম্ভব হয় নাই। এইবার মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের তটপ্রান্তে আঘাত করিয়াছে বলিয়া এ দেশের বহির্বাণিজ্য অত্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সামরিক ও বেসামরিক চাহিদার চাপে নিতান্ত অনিবার্য্য প্রয়োজনে ভারত সরকার এই যুদ্ধের আমলে ভারতে কতকগুলি পুরাতন শিল্পের প্রসার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই সব শিল্পের যাঁহারা কর্ণধার হইয়াছেন সেই সকল ভারতবাসী যথেষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই কাজে নামিয়াছেন এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের চরম সুবিধা লাভ করিয়া যদি তাঁহারা শিল্পসমূহকে যথেষ্ট প্রসারিত করিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতের বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত করিয়া বর্ত্তমান শিল্পগুলিকে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবেই ভারতের এই শিল্প প্রসারের দ্বারা দেশের স্থায়ী উপকার হওয়া সম্ভব। এখন যুদ্ধের দৌলতে লাভের মোটা অঙ্ক দেখিয়া একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, যুদ্ধোত্তর কালে এই সকল দেশী শিল্পকে শক্তিশালী, সুপরিচিত ও সংঘবদ্ধ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে হইবে এবং সেদিন লোকসানের ভয়ে ব্যবসা গুটাইয়া লইলে আজিকার শিল্প প্রগতি একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের আয়ের উপর ভারত সরকার বর্ত্তমানে যে ভাবে কর বসাইতে শুরু করিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধের পরে ঐ সকল শিল্পাদির অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৮ সালে, অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবার আগের বৎসরে ভারত সরকার কর হিসাবে দেশ হইতে যত আয় করিয়াছিলেন তাহার শতকরা ২৩ ভাগ ছিল আয়কর, সুপারট্যাক্স ইত্যাদি। যুদ্ধ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কিছু কিছু নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাণিজ্য ও পুরাতন শিল্প কিছু মাত্রায় প্রসারিত হইয়াছে। এখনকার বর্দ্ধিত আয় ভবিষ্যতের অনিবার্য্য বিশ্বব্যাপী মন্দা-বাজারে ভারতের নবগঠিত শিল্পাদির জীবন রক্ষায় সমর্থ হইতে পারে এরূপ আশা করা মোটেই অসমীচীন নয়। কিন্তু ভারত সরকার বর্ত্তমানে যে হারে শিল্প বাণিজ্যাদির আয়ের উপর কর বসাইতেছেন তাহা বর্ত্তমান শিল্প প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি ছাড়া অনাগত দুর্দ্দিনে ভারতীয় স্বার্থের ক্ষতি করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে যে পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে আদায় হইবে তাহার শতকরা ৬১ ভাগ উপরোক্ত ধরণের প্রত্যক্ষ কর হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডেও ব্যবসাদারদের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার স্যার জন এণ্ডারসন নূতন বাজেটে প্রত্যক্ষ করভার শিথিল করিবার দিকেই বিশেষ নজর দিয়া দেশের ভবিষ্যত-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং ট্যাক্স বসাইবার সর্ব্বনিম্ন আয়ের অঙ্ক বাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ডের অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ী করভার হইতে বহুলাংশে রেহাই পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে মোট কর হিসাবে আয়ের শতকরা ৫৫ ভাগ পাওয়া যাইত, যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পরে এই পরিমাণ শতকরা মাত্র ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। এখন অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে যাওয়ার পরও ভারতের নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য ও খাদ্যাদির পাইকারী হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা প্রায় ১৩৫ ভাগ অথচ ইংলণ্ডে সর্ব্বসাকুল্যে শতকরা মাত্র ২৫।৩০ ভাগের বেশী নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নাই। ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, ইংলণ্ডের সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে আমরা যুধ্যমান দেশের প্রাপ্য অসুবিধাসমূহ বিনা দ্বিধায় ভোগ করিতেছি, এ অবস্থায় স্বাভাবিক দরিদ্র আমরা যদি ইংলণ্ডের চেয়ে অধিক পরিমাণ যুদ্ধজনিত দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হই তাহা হইলে সত্যই আমাদের সান্ত্বনা খুঁজিবার স্থান থাকে না।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ

বিগত ১লা অক্টোবর হইতে ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড বি এন রেলপথের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ইংলণ্ডে সংঘবদ্ধ কোম্পানীর অংশীদারগণের লভ্যাংশ ভারত সরকার ভোগ করিবেন এবং রেলওয়ে বাজেটে বি এন আরের সম্পূর্ণ আয় ব্যয় সন্নিবেশিত হইবে।*

কিন্তু মুনাফা ভোগের পূর্ব্বে এই বিরাট রেলপথের কর্ম্মচারীদের সুখ সুবিধাবিধান সম্বন্ধে ভারত সরকারের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য আছে। ইউরোপীয় কোম্পানী পরিচালিত রেলপথে কোম্পানীর স্বদেশবাসীদের যে অহেতুক সুবিধা দেওয়া হইত তাহা সর্ব্বজনবিদিত এবং সেই তুলনায় ভারতীয় চাকুরীয়ার বি এন আর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে ব্যবহার লাভ করিতেন তাহা মোটেই সুখপ্রদ বলা চলে না। বি এন রেলপথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র খড়্গপুরকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, সেখানে ইউরোপীয়গণের ব্যবহারের জন্য যে এলাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে সেখানকার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই লোভনীয় এবং রেকের অর্থে ইউরোপীয় ভাগ্যবানের দল সেখানে সর্ব্ববিধ সুখ সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় বাসস্থানগুলিতে মানুষ যে কি ভাবে বাস করে তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। আলো বাতাস-হীন প্রথম ও দ্বিতীয় টাইপ কোয়ার্টারগুলি তো পশুশালার খাঁচার অনুরূপ, এমন কি তৃতীয় টাইপ কোয়ার্টারগুলি পর্য্যন্ত মনুষ্য বাসের যোগ্য নহে। এই সকল কোয়াটারে যাহারা বাস করেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের মাসিক বেতন একশত টাকার কাছাকাছি। দেড়খানি ঘরওয়ালা (সংখ্যাগুনতে অবশ্য তিনখানি) এই তৃতীয় টাইপ কোয়ার্টারে তবু যা হোক করিয়া মাথা গুঁজিয়া থাকা চলে কিন্তু রাস্তার কল হইতে অন্য কোয়াটারের অধিবাসীদের সহিত মারামারি করিয়া জল তুলিবার দুর্ভোগ যে কেমন করিয়া প্রতিদিন সেখানকার বাসিন্দাগণ

* এ সম্বন্ধে গত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে আলোচনা করা হইয়াছে।

পোহাইয়া থাকেন তাহা সত্যই কল্পনা করা যায় না। জল মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু, কোয়ার্টারে জলের কল না বসাইবার যে দুর্লভ যুক্তিই রেল কর্ত্তৃপক্ষ দিন, ইহা দ্বারা ভারতীয় কর্ম্মচারীদের মানুষ বলিয়া গণনা করিবার অনিচ্ছাই যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রেল কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য কটাক্ষপাতে বৈদ্যুতিক আলোর যে ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল তাহার অভাবেও ভারতীয় জনসাধারণ বর্ত্তমান কেরোসিন তৈলের অভাবের সময় অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমরা আশা করি রেল বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এ বৎসর ৪৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্তকে জোর করিয়া ৫৫ কোটিতে টানিয়া লইবার পূর্ব্বে ভারত সরকার বি এন রেলওয়ের ভারতীয় কর্ম্মচারীদের দুঃখ দুর্দ্দশার সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হইবেন। যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে পুনর্গঠন সম্বন্ধে ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন, ৩২০ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলওয়ে সমূহের উন্নতিসাধনের একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হইয়াছে, এ সময় ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড সরকারী সম্ভ্রম ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় রেলপথের আদর্শ অনুযায়ী তাঁহাদের হস্তগত এই নূতন রেল পথটির বিধিব্যবস্থা সংস্কারে যেটুকু অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা পালনের জন্য অবিলম্বে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামক যে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের একাংশে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যুদ্ধের সময় তাহার প্রয়োজন ও স্থিতি সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন অভিযোগ না থাকিলেও যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে প্রত্যেক সুহৃমনা ভারতবাসীই এই প্রতিষ্ঠানটির হাত হইতে এদেশের বহির্বাণিজ্যকে মুক্ত করিবার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। যুদ্ধের আমলে সামরিক কেন্দ্রসমূহে, বিশেষ করিয়া রাশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যে পণ্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইয়া অক্ষশক্তির প্রতি অনুরক্তির পথে নৈতিক বাধাসৃষ্টির জন্য ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের উদ্ভব হয়। যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানটি তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই নিজের দায়িত্বে এবং ভারতীয় স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া। ভারতসরকারের স্থিতি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান সামুদ্রিক বাণিজ্যের একাংশে অবাধ অধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছে। এতদিন যুদ্ধের নামে সামরিক সরবরাহ নীতি সম্বন্ধে কথা বলা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল সুতরাং উক্ত কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সম্বন্ধে কেহ কিছু বলে নাই। এখন মিত্রপক্ষের জয়লাভ অবধারিত হওয়াতে এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত লইয়া চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে।

অনেকে বলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইবার জন্য এবং ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক। এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ জাতীয় সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এদেশের বহির্বাণিজ্য চালাইয়া যাওয়া হইবে এবং কালক্রমে ইহার প্রভাবে ও চাপে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

কিন্তু আমাদের মনে হয় এভাবে প্রতিযোগিতা করিবার সংকল্প লইয়া নূতন কোন প্রতিষ্ঠান খোলা বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত হইবে না। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তাছাড়া ইহার পিছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সাহায্য রহিয়াছে, এ অবস্থায় এইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের পক্ষে কতখানি সম্ভব হইবে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। আমাদের যতদূর বিশ্বাস, এভাবে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনকে দমাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। ইহা অপেক্ষা যদি ভারতীয় জনসাধারণ ও ভারতসরকার প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের জন্য সচেষ্ট হন, তাহাতে বেশী কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল যুদ্ধান্তে তাহার বিলোপ সাধিত হইলে ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু থাকিতে পারে না। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন যুদ্ধের বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে সামরিক কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, ইহার কার্য্যাবলী সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এখন যুদ্ধশেষে অনর্থক ভারতের বাণিজ্য-বিস্তৃতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া ইহার স্থিতিকাল প্রসারিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না। যুদ্ধোত্তর শান্তির সময়ে ভারতের যোগ্যতা হিসাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসার সংকোচ ঘটুক, ইহাই সকলে কামনা করেন। ইংলণ্ডের বহুলোকও যুদ্ধের পর 'ইউ কে কে সি'র বিলোপ চায়। আমরা আশা করি ভারতীয় বাণিজ্যস্বার্থ রক্ষায় উৎসাহী জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট অনর্থক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া চিরকালের জন্য বিভ্রাট, মনোমালিন্য ও দায়িত্ব সৃষ্টি না করিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন যাহাতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ভাঁটার স্রোতের বেদনার সম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাতের রোদন লক্ষ ফুলের সমাধির বুকে নামে,
তোমার গানের মালা খানি আজ সঁপিবে কাহার হাতে!
আয়ু-বিহগের কঙ্কালগুলি দক্ষিণে আর বামে
এই নিরালায় চমকে বিজলী নিরাশা নিবিড় রাতে।
ভাঙ্গনের পথে মৃত্তিকা কাঁদে মৃত্যু-সম্ভাষণে
ভীরুতায় ভরা স্মৃতিচম্পক ভাবনার প্রাঙ্গণে
ঝরে ঝরে পড়ে কালের দৃষ্টিপাতে।
স্বপন মায়ার প্রহেলিকা ঘিরে এলো যে অন্ধকার,
চলে-যাওয়া কোন্ ফাগুন দিনের গন্ধের পথ বেয়ে,
নব অভিসারে-জয় আতিথ্য যে পেয়েছে বহুবার,
প্রণয়-মিলন মঞ্জুস্বরের প্রবাহের পানে চেয়ে
আনমনা তুমি ফিরায়ে তাহারে দিয়েছ বোশেখী ঝড়ে;
ভাঁটার স্রোতের বেদনার সম তার কথা মনে পড়ে
অবগুণ্ঠিত করেছ হৃদয় দ্বার।
বাসা যার ছিল তব ভালোবাসা—বুকে ছিল যার আশা,
তোমার রূপের নন্দিত রাকা ফুটেছিল যার প্রাণে
সে বিলাসী কোথা মনোভব হয়ে খেলিছে প্রেমের পাশা!
কী গভীর অভিমানে,
জীবন সুরার পাত্রখানিরে উপুড় করেছ রাণি!
তন্দ্রা-হারানো এই বিভাবরী তাহারি মৌন বাণী।

সাময়িকী

বিজয়াভিনন্দন—

পূজাবকাশের পর আমাদের লেখক, পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলকে যথাযোগ্য বিজয়াভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া আমরা পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। এবার হিন্দু-পর্ব্ব মহাপূজা ও মুসলমান-পর্ব্ব ঈদ একই সময়ে ঘটায় সর্ব্বত্র হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মিলনোৎসবের বিবরণ শুনা যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে এই মহাপর্ব্ব দুইটি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নূতন প্রেরণা আনয়ন করে—কাজেই আমরা আশা করি, এই পূজা-ঈদ মিলনোৎসব যেন বাঙ্গালায় স্থায়ী মিলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। ধ্বংসের পরেই সৃষ্টি—এই জগৎব্যাপী ধ্বংসলীলার পর নবসৃষ্টি দেখিবার জন্য সকলেই আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।

কাগজ-সমস্যা—

গত জুন মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট কাগজ ব্যবহার সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম করিয়াছেন, তাহার ফলে যাঁহারা ভারতের কল সমূহে প্রস্তুত কাগজ ব্যবহার করেন, তাঁহারা সকলেই বিপন্ন হইয়াছেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও এতদিন আমরা কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলাম। কিন্তু নূতন আদেশের ফলে অন্যান্য সকল সাময়িক পত্রিকার মত ভারতবর্ষের আকার ছোট করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। যে সকল সাময়িক পত্র 'নিউজ-প্রিণ্ট' নামক সুলভ কাগজ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের এই আইনের আমলে আসিতে হইবে না। কাজেই এই ব্যবহার বৈষম্যের ফলে সাময়িক পত্র জগতে নানাপ্রকার অসুবিধা সৃষ্ট হইবে। দিল্লী ও সিমলার কর্তৃপক্ষের নিকট দরবার করিয়াও এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু ফললাভ করিতে সমর্থ হই নাই। যতদিন না এই আইন পরিবর্ত্তিত হয়, ততদিন আশা করি, আমাদের পাঠকবর্গ, আমাদের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

গভর্ণর ও দেশের অবস্থা—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি-কেসি কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে মাত্র পৌনে তিন লক্ষ লোক অভাবগ্রস্ত আছে। আগষ্ট মাসে তিন লক্ষ লোক অভাবগ্রস্ত ছিল।" কিরূপ অবস্থায় লোককে গভর্ণর অভাবগ্রস্ত মনে করিয়াছেন আমরা জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অভাবগ্রস্তের সংখ্যা যে আরও বেশী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গত বৎসর এই সময়ে চাউল দুষ্প্রাপ্য ছিল বটে, কিন্তু তরিতরকারী, দুধ মাছ এত দুর্ম্মূল্য হয় নাই। এবার এখন ১৬৷৹ মণ দরে চাউল পাওয়া গেলেও উপকরণের অভাবে লোককে অখাদ্য খাইতে হইতেছে। আলু দেড় টাকা সের, মাছ তিন টাকা সের, দুধ টাকায় এক সের, বেগুন পটোল প্রভৃতি ৷৶৹ আনা সের, সরিষার তেল ১৷৹ সের, ঘৃত ৫৲ টাকা সের—এইরূপ মূল্য দিয়া বাঙ্গালায় শতকরা ১০ জন লোকও উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেজন্য দেশে মহামারীর শেষ নাই—মৃত্যুর সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা সরকারী হিসাব হইতেই বুঝা যায়। রক্তহীনতা রোগ এখন যেমন ব্যাপকভাবে দেখা যাইতেছে, সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। দুধের অভাবে শিশু মৃত্যুর হার বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান কেন্দ্রে যাহারা সাহায্য লাভ করিয়াছে, গভর্ণর শুধু তাহাদেরই অভাবগ্রস্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও কত লোক যে প্রত্যহ খাদ্যাভাবে বা অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া মারা যায় ও তিলে তিলে মরণের পথে আগাইয়া যায়, তাহাদের হিসাব কেহ রাখে না। আরও কিছুদিন অবস্থা এইরূপ চলিলে বাঙ্গালা দেশ যে ক্রমে জনশূন্য হইয়া পড়িবে, সে চিন্তা করিবার কেহই নাই।

কয়লা ও কেরোসিন তৈল—

যতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিবে, ততদিন পর্য্যন্ত লোককে যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চিনি খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বলা হইয়াছে, তেমনই যদি প্রত্যেক পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা ও কেরোসিন তৈল প্রদানের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে লোকের কিছু বলিবার থাকিত না। সহর ও সহরতলীগুলিতে কাঠ সুলভ নহে—কাজেই কয়লা ব্যবহার করা ছাড়া লোকের গত্যন্তর নাই। এ অবস্থায় কয়লার অভাবে লোককে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। কেরোসিনের অভাবও তেমনই লোককে বিষম অসুবিধায় ফেলিয়াছে। গত পূজার সময় কেরোসিনের সরবরাহ এত কম ছিল, যে বহু লোককে আনন্দের ৩.৪ দিনও অন্ধকারে থাকিতে হইয়াছে। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে দিন দিন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইতেছে—কিন্তু কর্ম্মচারীর সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। আরও কতদিন আমাদিগকে এই দুরবস্থার মধ্যে বাস করিতে হইবে?

খাদ্য সামগ্রী অপচয়—

সাধারণ লোকের মধ্যে যাহাতে অপচয় নিবারণ হয়, সেজন্য গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে নানারূপ চেষ্টা করা হইতেছে। লোক অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় খাদ্যও পাইতেছে না। অথচ সরকারী গুদামে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে,

তাহার একটি খবর পাওয়া গিয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে হাওড়া বেলগাছিয়া ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে যাইয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের গুদাম হইতে ২০০ লরী করিয়া পচা খাদ্য তথায় ফেলিয়া দিয়া আসা হইয়াছে। তথায় হাজার হাজার মণ পচা আটা, ময়দা, ছোলা, বাজরা, সুজি প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কি কারণে এত অধিক পরিমাণ খাদ্য এই ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহার তদন্ত হওয়া উচিত। ইহা ছাড়াও বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে কলিকাতার সরকারী গুদামে ৭৫ হাজার মণ আটা ও ১১ হাজার মণ চাউল মানুষের খাওয়ার অযোগ্য হইয়া পড়িয়া আছে। খুলনায়ও গভর্ণমেণ্টের বহু খাদ্যদ্রব্য পচিয়া গিয়াছে। নানা স্থানে কেন এই ভাবে মানুষের খাদ্য নষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝা কঠিন। অথচ বাজারে ঐ সকল মাল ছাড়া হইলে চাউল বা আটার দাম অনায়াসে কম করা যাইত। সরকার কর্ত্তৃক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ার ফলে যেমন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতেছে না, তেমনই তাহা কমও হয় নাই। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় খাদ্য-মূল্য যাহা ছিল, এখন উহা তাহার ৪ গুণ হইয়া রহিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা যত বাড়িতেছে, অব্যবস্থাও ততই অধিক হইতে দেখা যাইতেছে।

পূজায় বস্ত্র সমস্যা—

গত মহাপূজার সময় কলিকাতার বাজারে এমন বস্ত্রাভাব দেখা গিয়াছে যে লোক টাকা দিয়াও কোন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে নাই। মনের মত বস্ত্র সংগ্রহ করা ত দুরূহ ব্যাপার ছিল—অথচ সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হইয়াছে যে বাজারে প্রচুর বস্ত্র ছাড়া হইবে। পূজার সময় বাঙ্গালার লোক প্রায় সারা বৎসরের বস্ত্র ক্রয় করে—এ বৎসর অনেকের পক্ষেই তাহা করা সম্ভব হয় নাই। কবে আমাদের বস্ত্রাভাব ঘুচিবে, কেহই তাহা বলিতে পারেন না।

মৎস্যাভাব—

বাঙ্গালা দেশে এ বৎসর যেরূপ মৎস্যাভাব হইয়াছে, সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। কলিকাতার লোককে দুই মাসেরও অধিককাল তিন টাকা সের দরে মাছ ক্রয় করিতে হইয়াছে। এই সম্পর্কে মিঃ বি-সি-গুপ্ত কলিকাতা রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কলিকাতার চারিপাশে সহরতলী গুলিতে যে সকল পুষ্করিণী আছে, তাহাদের মালিকগণকে যদি ঐ সকল পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখিয়া তাহাতে মাছের চাষ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহা হইলে মাছের অভাব কতকটা দূর করা যায়। এ বিষয়ে তিনি আইন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সে কাজ করিবে কে? দেশের শাসক সম্প্রদায় যদি পূর্ব্ব হইতে এ বিষয়ে অবহিত হইতেন, তাহা হইলে লোককে খাদ্য সম্পর্কে আজ এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না।

অনুমতীর দান—

বসুমতীর স্বর্গত স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকগত পুত্র-কন্যা রামচন্দ্র ও প্রীতির স্মরণার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিন লক্ষ টাকা নগদ ও প্রায় এক লক্ষ টাকার



সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাড়ী ও সম্পত্তি খড়দহের নিকট রহড়ায় একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার শ্বশুর স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ



মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্ত কলিকাতা বেলিয়াঘাটা ২৪ সুরা লেনস্থ 'মেডিকেল এড্ সোসাইটী অব্ বেঙ্গলের' নিকট আরও ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সোসাইটীর 'বেঙ্গল মেডিকেল ইনিষ্টিটিউসন এণ্ড হাসপাতাল' নামক প্রতিষ্ঠান অতঃপর 'উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মেমোরিয়াল হাসপাতাল' (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থাপিত), নামে অভিহিত হইবে। বসুমতীর স্বত্বাধিকারীগণের এই সকল দান তাঁহাদিগকে দেশবাসীর নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।



রায়বাহাদুর নির্ম্মলাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
(গতমাসে ইহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)

আরামবাগে বন্যা—

গত ২৬শে আগষ্ট হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় দ্বারকেশ্বর নদীতে বন্যার ফলে আরামবাগ ও খানাকুল থানার মধ্যে সালেপুর, গৌরহাটি, কিশোরপুর, ঘোষপুর, ঠাকুরাণী চক, পোলে, জগৎপুর, নতিবপুর ও রাজহাটী প্রভৃতি ১০টি ইউনিয়নে প্রায় ১০০ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া গিয়াছিল। বহু কাঁচা বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও আউস ধান একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। এইরূপ বন্যা প্রতি বৎসর বাঙ্গালার কোন না কোন জেলাকে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। অথচ গভর্ণমেণ্ট হইতে সামান্ত চেষ্টা হইলে এইরূপ বন্যা বন্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার লোক কি কেহ নাই?

ট্রাম ও কর্পোরেশন—

কলিকাতা কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানীর নিকট কলিকাতার ট্রাম কিনিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা ঋণ করিয়া কোম্পানীকে ট্রামের দাম দিয়া দিবেন ও একজন প্রধান পরিচালক নিযুক্ত করিয়া কোম্পানী চালাইবেন। যত শীঘ্র ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, ততই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের কথা। ট্রামের অসুবিধা দূর হইলে লোক উপকৃত হইবে।

উত্তর বিহারে মহামারি—

বিহারের গভর্ণর সার টমাস রাদারফোর্ড গত ৯ই সেপ্টেম্বর মজঃফরপুরে এক সাংবাদিক সম্মিলনে স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৪৪ সালের প্রথম ৭ মাসে উত্তর বিহারে কলেরায় ৬৮ হাজার ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। খাদ্যাভাব ও অখাদ্য ভক্ষণ যে ইহার অন্যতম কারণ সে কথা কে অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালার অবস্থা আরও ভীষণ কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কোথায়?

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ মিত্র—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক, কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্নী মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গত ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ৯টায়, ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মণীন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার এল-ভি-মিত্র কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। মণীন্দ্রনাথ এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া এটর্ণী হইয়া যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জনসেবা করিতেন। গত কয়েক বৎসর তিনি হিন্দু জাগরণ আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর জামাতা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার শঙ্কর মিত্রও বিলাতে অবস্থানকালে ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাহায্য করিয়া সর্ব্বজনপরিচিত হইয়াছেন।



শ্রীযুক্ত কমল বসু
(ইনি বি-বি সিতে যোগদানের জন্ত সম্প্রতি বিলাতে গিয়াছেন গতমাসে সে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)

পূজার রেশন—

বাঙ্গালাদেশে যে সকল স্থানে বর্ত্তমানে রেশানিং অর্থাৎ চাল, আটা, চিনি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রয়প্রথা বর্ত্তমান, সে

সকল স্থানের অধিবাসীরা গত দুর্গাপূজায় জন্ম কোথাও অতিরিক্ত সামগ্রী পান নাই। তাহার ফলে সর্ব্বত্র পূজাবাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষকে দারুণ অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। পূজায় অন্নদান ব্যবস্থাই প্রধান বিষয়—সেই অন্নদানের জন্ম কোথাও অতিরিক্ত চাউল পাওয়া যায় নাই। সরকারের এই ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। রেশানিং ব্যবস্থায় মানুষ যে খাদ্য পাইতেছে, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। আরও কতদিন এই অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা চলিবে কে জানে ?

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্বর্দ্ধনা—

গত ১ই সেপ্টেম্বর বীরভূম সিউড়ী সহরে রামরঞ্জন টাউন হলে এক জনসভায় বীরভূমবাসীদিগের পক্ষ হইতে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত



শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভায় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জেলাবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

পরলোকে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১ই সেপ্টেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে কাজ করিতেন এবং গত ১৯২২ সালে জেলা সাব রেজিষ্ট্রার অবস্থায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ২৫খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঘিবাহিনী, বীরপূজা, রাজা গণেশ, রাণী ব্রজসুন্দরী প্রভৃতির নাম সর্ব্বজনবিদিত। তিনি পিতৃব্য বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শচীশচন্দ্র প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৮৮ বৎসর বয়সে কার্য্যশক্তি—

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক জর্জ্জ বার্ণার্ডশ'য়ের নাম জগদ্বিখ্যাত ; তিনি ৮৮ বৎসর বয়সে সম্প্রতি 'দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা' সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। এ বয়সে তাঁহার অপূর্ব্ব চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইয়া লোক বিস্মিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে নারীদের স্থান—

সম্প্রতি গ্র্যাণ্ড হোটেলে মিলনী ক্লাবের এক সভায় অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 'প্রাচীন ভারতে নারীদের স্থান' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"পুত্র ও কন্যা সমান আদরে পরিবারে পালিত হতো—শিক্ষা, দীক্ষা, উত্তরাধিকার কোন ব্যাপারেই কন্যা পুত্র অপেক্ষা কম অধিকার ভোগ করিত না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে মাতার সম্মান পিতার সম্মানের সহস্রগুণ বলে ঘোষিত হয়েছে। এমন কি, বিধবার সামাজিক অবস্থা ও বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক উন্নত ছিল। আজ ভারতের নবজাগরণের দিনে আবার নারীদের নিজ অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পুরুষদের দাবী দাওয়ার সঙ্গে নারীদের দাবী দাওয়ার বিধান বর্ত্তমান ভারতের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট দুইবার তাঁহার দুই জন প্রতিনিধিকে ভারত পরিদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন—প্রথম কর্ণেল লুই জনসনকে ও পরে মিঃ ফিলিপ্‌সকে। সম্প্রতি তাঁদের লেখা যে সব চিঠিপত্র আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জানা যায় যে তাঁরা বলেছেন—"ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি না দিলে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের সাহায্য কখনই পরিপূর্ণ হতে পারে না।" এই বিষয় লইয়া এখন আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলিতেছে এবং যাহাতে সত্বর ভারতকে স্বাধীনতা দানের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য এক দল মার্কিণ রাজনীতিক বিশেষ চেষ্টাও করিতেছেন। যুদ্ধের শেষ পরিণতি না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক বলেই আমরা মনে করি।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর সেন—

মুর্শিদাবাদ জেলার ৺নীলকান্ত সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর সেন এ বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টের 'রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট' পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ সম্মানসহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বিলাতের ইনকরপোরেটেড্ একাউণ্টেণ্ট' ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল।

কাশীধামে মহাপ্রভুর স্মৃতি—

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাতায়াতের সময় কাশীধামে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা 'চৈতন্যবট' নামে পরিচিত। ঐ স্থানটি কিছুদিন কাশী মিউনিসিপালিটির হাতে ছিল ও তথায় দধি দুগ্ধের বাজার বসিত। সম্প্রতি তথায় একটি চাঁদনী প্রস্তুত হইয়া গৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চাঁদনীর সম্মুখের রাস্তার নামও 'চৈতন্য রোড' করা হইয়াছে। তথায় চন্দ্রশেখরের যে ভিটায় মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ

ভট্ট প্রভৃতিকে শিক্ষা দান করিয়াছেন, সেই ভিটাটি ল্যাণ্ড একুইজিসন আইন অনুসারে বর্ত্তমানে ৮৫০০ টাকায় ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানটি ক্রয় করা হইলে কাশীতে তথায় মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের এক কেন্দ্র খোলা হইবে। কাশীর গৌরাঙ্গ মিশন এ বিষয়ে উত্তোগী হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এ জন্য আবশ্যক অর্থের অভাব হইবে না।

পরলোকে সত্যেন্দ্রমোহন রায়—

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সত্যেন্দ্রমোহন রায় গত ১৫ই ভাদ্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয়শিষ্য ভূপতিনাথ মহারাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রমোহনের কৃপায় কাকিনায় এবং স্থানান্তরের বহু লোক এবং বহু ছাত্র



সত্যেন্দ্রমোহন রায়

অন্নের, অধ্যয়নের এবং চাকুরীর সাহায্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা রবি রায় ও ভূমেন রায় মঞ্চ ও পর্দায় খ্যাতনামা অভিনেতা।

রবীন্দ্র সমিতি—

কলিকাতা সহরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি উপযুক্ত-ভাবে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি রবীন্দ্র সমিতি নামক এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত উহার সহ-সভাপতি, ডাক্তার এস-বি-দত্ত কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীমতী রেণুকা রায়, মিঃ বি-কে-গুহ ও রায় বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় অবৈতনিক সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। সমিতির কার্য্যালয় ৬এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোডে হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতি বিরাট পরিকল্পনা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, যোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহকগণ চেষ্টা করিলে সমিতির পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদ সভা—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মত কয়েকটি আইনের প্রস্তাব হইয়াছে। সেই আইনগুলি দেশের পক্ষে যে বিষম ক্ষতিকর তাহা জানিয়াও দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাহার কোন প্রতিবাদ হইতেছে না। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী উক্ত আইন-সমূহের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এ জন্য তিনি কলিকাতার নাটোর রাজবাড়ীতে ও স্বর্গত সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী এবং চন্দননগর গোন্দলপাড়ার জমীদার ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সভা করিয়া দেশের মহিলাগণকে আইনগুলির অপকারিতার কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা গত শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় ভারতবর্ষে প্রস্তাবিত আইন-সমূহের আলোচনা করিয়াছি। আশাকরি, সময় থাকিতে দেশবাসীর পক্ষ হইতে এ বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে।

গান্ধী-জিন্না আপোষ আলোচনা—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ দিন ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত নিখিল ভারত মুসলেম লীগের নেতা মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার যে আপোষ আলোচনা চলিতেছিল, ২৭শে সেপ্টেম্বরের আলোচনার শেষে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া উভয় পক্ষই ঘোষণা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে এই আপোষ আলোচনার কথা চলিতেছিল এবং মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হইয়া অবধি মিঃ জিন্নার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, উভয়ে পরস্পরের মনোভাব খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিলেই ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। ইহার পূর্ব্বেও বহুবার কংগ্রেস ও মুসলেম লীগের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে মিঃ জিন্নার সহিত তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের আপোষ আলোচনা হয়। তৎপরে ১৯৩৮ সালে প্রথমে ২৮শে এপ্রিল বোম্বায়ে গান্ধীজির সহিত মিঃ জিন্নার, ১১ই মে বোম্বায়ে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সহিত মিঃ জিন্নার ও শেষে ২০শে মে পুনরায় গান্ধীজির সহিত মিঃ জিন্নার আলোচনা হয়। ১৯৩৯ সালে ১০ই অক্টোবর দিল্লীতে পুনরায় সুভাষচন্দ্র-জিন্না সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয় এবং ১লা নভেম্বর দিল্লীর লাটপ্রাসাদে গান্ধী-রাজেন্দ্রপ্রসাদ-জিন্নার বৈঠক বসে ও পরদিন ২রা নভেম্বর দিল্লীতে গান্ধী-জহরলাল-জিন্না আলোচনা হয়। কিন্তু কোন আলোচনাই ফলবতী হয় নাই। ১৯৪০এর ২৩শে জুন বোম্বায়ে গান্ধী-জিন্না আলোচনাও ব্যর্থ হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রস্তাব লইয়া পণ্ডিত জহরলালের সহিত মিঃ জিন্নার সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই

অপরকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। কংগ্রেস সভাপতিরূপে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত মিঃ জিন্নার আলোচনার চেষ্টা হইয়াছিল—কিন্তু মিঃ জিন্না আজাদ সাহেবকে কংগ্রেসের হাতের পুতুল বলিয়া উপহাস করায় আজাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

বর্ত্তমান ১৪ দিনব্যাপী আলোচনার সময় মিঃ জিন্না ও গান্ধীজির মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, উভয়ের অনুমতিক্রমে সংবাদপত্রে সেগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। সুদীর্ঘ পত্রালাপের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে গান্ধীজির সুদৃঢ় অভিমতই জিন্না সাহেবের সহিত মতভেদের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (১) ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবে নির্দ্ধারিত স্বাধীনতার দাবী মহাত্মাজী ছাড়িতে সম্মত নহেন (২) তৃতীয় পক্ষ অপসারিত না হইলে প্রকৃত ঐক্য সম্ভব নহে, সুতরাং ঐক্য-প্রয়াসীদের প্রথম কর্ত্তব্য তৃতীয় পক্ষের অপসারণে অগ্রসর হওয়া—মহাত্মাজীর এই দাবী এবং (৩) হিন্দু ভারতীয় ও মুসলমান ভারতীয়কে পৃথক জাতি বলিয়া মানিতে মহাত্মাজীর অস্বীকৃতি। মুসলমান-ভারতীয়গণের পৃথক জাতিত্ব প্রমাণের প্রয়াসীদের উত্তরে গান্ধীজি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকল ভারতীয়ের সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"ইতিহাসে ইহার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই না যে, একটা ধর্ম্মান্তরিত অংশও তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে পৃথক জাতিত্বের দাবী করিতেছে। ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যদি একজাতি থাকিয়া থাকে, তবে বহুসংখ্যক ভারতীয় ধর্ম্মান্তরিত হইবার পরেও সেই একজাতিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।"

গান্ধী-জিন্না আলোচনার এই ব্যর্থতার পর রাজাজীর মীমাংসা-প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। রাজাজীর প্রস্তাবের দ্বারা মিঃ জিন্নার দাবী মিটাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে এই আশাতেই গান্ধীজি উহা গ্রহণ ও অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মিঃ জিন্না রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেজন্য আলোচনার মধ্যেই গান্ধীজিকে স্বতন্ত্র এক আপোষ-প্রস্তাব স্থির করিতে হইয়াছিল। গান্ধীজির প্রস্তাবেও মিঃ জিন্না সম্মত হন নাই।

গান্ধী-জিন্নার এই আলোচনা ব্যর্থ হইলেও আলোচনার শেষে উভয়েই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই আলোচনাই তাঁহাদের শেষ আলোচনা নহে। ইহার পরেও তাঁহারা উভয়ে হয় ত কোন দিন নূতন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কাজেই ভারতের হিন্দু মুসলমানে আপোষ সম্বন্ধে লোকের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

আড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ২০শে সেপ্টেম্বর মহাষষ্ঠীর দিন সকালে আড়িয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ ৬ শত স্থানীয় মধ্যবিত্ত দরিদ্রকে একখানি করিয়া বস্ত্র ও একটি করিয়া টাকা দান করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সরকার সেই দান উৎসবে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। অনাথ ভাণ্ডারের বাটীতে যাহাতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্ম ভাণ্ডারের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপ্রাণ



আড়িয়াদহ অনাথ-ভাণ্ডারে বস্ত্র-বিতরণ

চেষ্টা করিতেছেন এবং সে জন্ম কিছু অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণের সাহায্য লাভ করিলে শীঘ্রই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ—

গত ১৩ই আগষ্ট ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্য্যালয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দজীর সভাপতিত্বে সংঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ ধর্ম্মপ্রচার, তীর্থসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংগঠন ও সেবাকার্য্যের বার্ষিক বিবরণ উপস্থিত করিয়াছিলেন।' বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে গঠনমূলক সেবা কার্য্য পরিচালনের জন্ম ও সংঘের হিন্দু সংগঠন কার্য্যকে স্থায়ী ও ব্যাপকরূপ দিবার জন্ম যথাক্রমে ৫ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকার দুইটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। সংঘ দেশব্যাপী যে জনহিতকর কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

কমিটি ও কমিশন—

আমাদের কোন অভাব অভিযোগ উপস্থাপিত হইলেই গভর্ণমেণ্ট একটা করিয়া কমিটী বা কমিশন গঠন করিয়া আমাদের আশ্বাস দিয়া থাকেন। নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি এক বিশেষ খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে—বড়লাট লর্ড ওয়াভেল উহার সভাপতি, স্যার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব—ডেপুটী সভাপতি, জঙ্গীলাট স্যার

ক্লড অচিনলেক, সার এডোয়ার্ড বেন্থল, সার আজিজল হক ও সার যোগেন্দ্র সিং—ঐ কমিটীর সদস্য। সকল বড় বড় রাজপুরুষই ঐ খাদ্য কমিটিতে আছেন, অথচ সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যাভাবের দারুণ প্রকোপ। এই সকল কমিটিগঠন অভাবগ্রস্ত লোকদের সেইজন্য শুধু হাস্যোদ্রেক করে।

পরলোকে উইণ্ডেল উইলকি—

প্রসিদ্ধ মার্কিন রিপাবলিকান নেতা উইণ্ডেল উইল্‌কি গত ৮ই অক্টোবর মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯২ সালে তাঁহার জন্ম হয় ও পর বৎসর তাঁহার পিতার সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইয়া যায়—কাজেই তাহাকে বিদ্যার্জ্জনের পর আইন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে হইত। ১৯৪০ সালে আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় তিনি মিঃ রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া পরাজিত হন। তিনি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পরাধীন দেশসমূহকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার লিখিত 'ওয়ান ওয়ার্লড্' নামক পুস্তক রাজনীতিক জগতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

পরলোকে সতীশচন্দ্র সিংহ—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় গত ৩রা আশ্বিন ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পাথুরিয়াঘাটাস্থ সিংহগড় নামক বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বগ্রাম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়



সতীশচন্দ্র সিংহ

স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গত দুর্ভিক্ষের সময় তথায় প্রত্যহ সহস্রাধিক লোককে অন্নদান করিতেন। তিনি টাব আয়রণ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

পরলোকে নারায়ণ রায়চৌধুরী—

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সিমলাগড়ের জমীদার ও "পূজনীয় গুরুদাস," "মরণ রহস্য" প্রভৃতির লেখক ৺জ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরীর



নারায়ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী

কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি খেলার মাঠে এবং সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, মোহনবাগান ক্লাব, জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী, বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গান্ধীজীর জন্ম দিবস—

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ৭৫তম জন্মদিবস বলিয়া ঐদিন কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত ৭৫ লক্ষ টাকা তাঁহার হাতে প্রদান করা হইয়াছে। কস্তুরবা ভাণ্ডারে এপর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ টাকা সমগ্র ভারতবর্ষে শিশু ও নারীদের কল্যাণকল্পে ব্যয় করা হইবে। মহাত্মাজী নিজে স্মৃতিভাণ্ডারের সভাপতিরূপে ঐ অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গালা হইতে ঐ ভাণ্ডারের জন্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অখণ্ড হিন্দুস্থান সম্মিলন—

গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে অখণ্ড হিন্দুস্থান নেতৃ-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা উদ্বোধন করেন এবং পুরীর শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বস্তিবাচন করেন। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এক প্রস্তাবে ভারতের অখণ্ডতায় দৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন করা হইয়াছে ও ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করা হইলে সমগ্র দেশের ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষতি হইবে বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। অখণ্ডতা বিনষ্ট করার চেষ্টা হইলে সকলকে সর্ব্বতোভাবে তাহাতে বাধাদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় ফুটবল ঃ

ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন ফুটবল খেলার উন্নতিকল্পে বহুবিধ কার্য্যকরী পরিকল্পনা করছেন। পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পরও তাদের জীবনযাত্রার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম বলা যায়। খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর পেশাদার খেলোয়াড়দের বেকার জীবন আর থাকবে না বললেই চলে। ফুটবল এসোসিয়েশন তাঁদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার (post war plan) জন্য অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। যুদ্ধের শেষে ফুটবল এসোসিয়েশনের সাব-কমিটি ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য কাজ সংগ্রহ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রয়োজন হ'লে লীগের জুবলী ফণ্ড থেকেও খেলোয়াড়দের জন্য অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

• • •

বিদেশী ফুটবল খেলা আমাদের দেশে বহুদিন থেকেই চলছে, বলতে কি বাঙ্গলা দেশের জাতীয় খেলার পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছে। অপরের অনুকরণ সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর নয়। আমাদের দেশের ফুটবল প্রতিষ্ঠান যদি ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে তাহলে ফুটবল খেলার উন্নতির পথে অন্তরায় হবে না বরং মঙ্গল হবে।

'অফ্ সাইড নিয়মের উচ্ছেদ ঃ

ফুটবল খেলার উৎকর্ষসাধনের জন্য ভূতপূর্ব্ব এফ এ কাপ ফাইনালের রেফারী এবং লিসেষ্টার রেফারী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ টম ক্রু তাঁর এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে, পেনাল্টি সীমানা ব্যতীত 'অফ্ সাইড' নিয়মের উচ্ছেদ। অপরাপর প্রস্তাব যেমন, যেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে সেই স্থান থেকেই পেনাল্টি কিক মারতে হবে কেবল এর ব্যতিক্রম হবে যদি গোল থেকে দু'এক গজ দূরে নিয়ম ভঙ্গ হয়। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে পেনাল্টি কিক করবার সময় গোলকিপার সম্পূর্ণ স্থির না থাকলেও আইনভঙ্গের অপরাধে শাস্তি পাবে না।

•

সন্তোষ ট্রফি ঃ

অল্ ইণ্ডিয়া ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লী দল ২-০ গোলে আই এফ এ দলকে পরাজিত ক'রে এ বছর সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রথম বছর আই এফ এ দল ৪-০ গোলে দিল্লী দলকে হারিয়ে প্রথম কাপ বিজয়ী হয়েছিল।

ফাইনালে আই এফ এ দল যে এরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করবে খেলার পূর্ব্বে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। বাঙ্গলা দলের তুলনায় দিল্লীর ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এ বছর খুব বেশী উন্নত ছিল না, বাঙ্গলার দল মনোনয়ন খুব সন্তোষজনক না হলেও সকলেই আশা করেছিল বাঙ্গলা দল ফুটবল খেলায় তার সুনাম এবারও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

ফাইনাল খেলায় দিল্লী দলের জয়লাভ সকল দিক থেকেই ন্যায় সঙ্গত হয়েছে। খেলার সূচনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত দিল্লী দলের খেলোয়াড়রা জয়লাভের উদ্দেশ্যে ফুটবল খেলার technique যথাযথ পালন করেছে। খেলায় জয়লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষার অভাব তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি।

আই এফ এ দলের এ পরাজয়ের জন্য মোহিনী ব্যানার্জির খেলা বিশেষভাবে দায়ী। ফুটবল খেলায় সেণ্টার হাফের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে দিন মোটেই সচেতন ছিলেন না। তাঁর নৈরাশ্যজনক খেলার জন্যই সমস্ত দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র আপ্পারাও ভাল খেলেন। রক্ষণভাগে কে দত্ত তিনবার গোল বাঁচান। শরৎ দাস তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখাতে পারেননি। মান্নাও তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে সক্ষম হননি। হাফব্যাক লাইনে অনিল দেই দলের জন্যে পরিশ্রম ক'রে খেলেছিলেন। ফুটবল খেলায় বাঙ্গলা দেশের যে সুনাম ছিল তা আজ হারাতে বসেছে। পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষমহলকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং মনোনীত খেলোয়াড়দের অনুশীলন চর্চ্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এ দুয়ের একান্ত অভাবের ফলেই যে বাঙ্গলা দল আজ হেরে এসেছে সে কথা স্বীকার করতে কর্ত্তৃপক্ষমহল বোধ হয় রাজী হবেন না।

কুচবিহার কাপ ঃ

এ বছরের কুচবিহার কাপ ফাইনালে মোহনবাগান দল বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে মোহনবাগান ক্লাব ১৪বার কাপ বিজয়ী হ'ল। কোন দলই এত অধিকবার এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে পারেনি।

নিম্নলিখিত বছরে মোহনবাগান কাপ বিজয়ী হয়েছে :—

১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২১, ১৯২২, ১৯২৫, ১৯২৮, ১৯৩১, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৪১ ও ১৯৪৪ সাল।

ফাইনাল খেলায় পরাজিত হয়েছে—১৯২৪, ১৯২৯, ১৯৩৪, ১৯৪০ ও ১৯৪২ সাল।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ঃ

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ এ বছর ইলিয়ট শীল্ড, লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড ও হেরম্ব মৈত্র মেমোরিয়াল শীল্ড বিজয়ী হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

রাজা শীল্ড ঃ

রাজাশীল্ডের ফাইনালে ভবানীপুর দল ৩-০ গোলে আর এ এফ বেলভেডারকে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

ইংলণ্ড বনাম স্কটল্যাণ্ড ঃ

গত ২১ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান মাঠে ইংলণ্ড বনাম স্কটল্যাণ্ডের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ইংলণ্ডের পেশাদার খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। এই খেলায় ইংলণ্ড ১-০ গোলে স্কটল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। কলকাতার মাঠে এই ভাবে ইংলণ্ডের পেশাদার খেলোয়াড়রা এই প্রথম নামলেন। যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় এ দেশে রয়েছেন তাঁদের নিয়েই ছুটি দল গঠিত হয়। ইংলণ্ডের পক্ষে খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেভিস কম্পটনকে লেফট সাইড আউটে খেলতে দেখা যায়।

পেশাদার খেলোয়াড়দের এই খেলাটিতে কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয় ছিল যার অভাব আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে একান্তভাবে দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথম দর্শনীয় ছিল, খেলোয়াড়দের দীর্ঘাঙ্গ ঋজু বলিষ্ঠ দেহ। প্রত্যেক খেলোয়াড়টি দৈহিক শক্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্ত তাদের খেলায় কখনও কখনও শারীরিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টাও আমাদের দুর্ব্বল চোখে ধরা পড়ে।

কম্পটনের খেলার বৈশিষ্ট্য ছিল, দু পায়ের ইনসাইড এবং আউটসাইড দিয়ে বল সট এবং পাশ করা এবং ড্রিবলিং করা। অহেতুক বলটি খুব উঁচুতে তুলে দর্শকদের মুগ্ধ করার অভ্যাস কারও ছিল না। মাথা দিয়ে বল নির্ভুল পাশ করার দক্ষতা খেলায় উল্লেখযোগ্য। মোট কথা এই প্রদর্শনী খেলাটিতে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদিদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে যে মুগ্ধ করেছে সে কথা আমরা অনেকদিন মনে রাখতে পারবো।

সার্ভিস একাদশ বনাম আই এফ এ দল ঃ

সার্ভিস প্রফেশনাল একাদশ বনাম আই এফ এ দলের প্রদর্শনী খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। আই এফ এ দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন পক্ষপাতিত্ব মূলক না হলে খেলার ফলাফল অন্তরকম হ'তে পারত। আই এফ এ দলের রক্ষণ ভাগের খেলার ত্রুটির জন্ত খেলাটি 'ড্র' হয় নি। দুর্ব্বল আক্রমণভাগের জন্তই ২টির বেশী গোল হয় নি। হঠাৎ সুনীল ঘোষ ও কাইজারের খেলার উপর এতখানি আস্থা কোন খেলা দেখে খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির জন্মাল তা আমাদের অবিদিত। অথচ অনিল দের মত নামকরা খেলোয়াড়ের নাম রিজার্ভের মধ্যেও পাওয়া যায় না। মনোনয়ন কমিটি নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় না দিলেও অনিল যে আহত টি আওয়ের স্থানে নেমে কেবল খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দেননি ভাল খেলে একটি অব্যর্থ গোল বাঁচিয়ে দলের সম্মান রেখেছেন। গোলে কে দত্তের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ডেভিস কম্পটনের পেনাল্টি সট প্রতিরোধ করেন। হাফ লাইনে ডি সেনের খেলা খুবই প্রশংসনীয় ছিল। আক্রমণভাগে নুরমহম্মদই ভাল খেলেছিলেন।

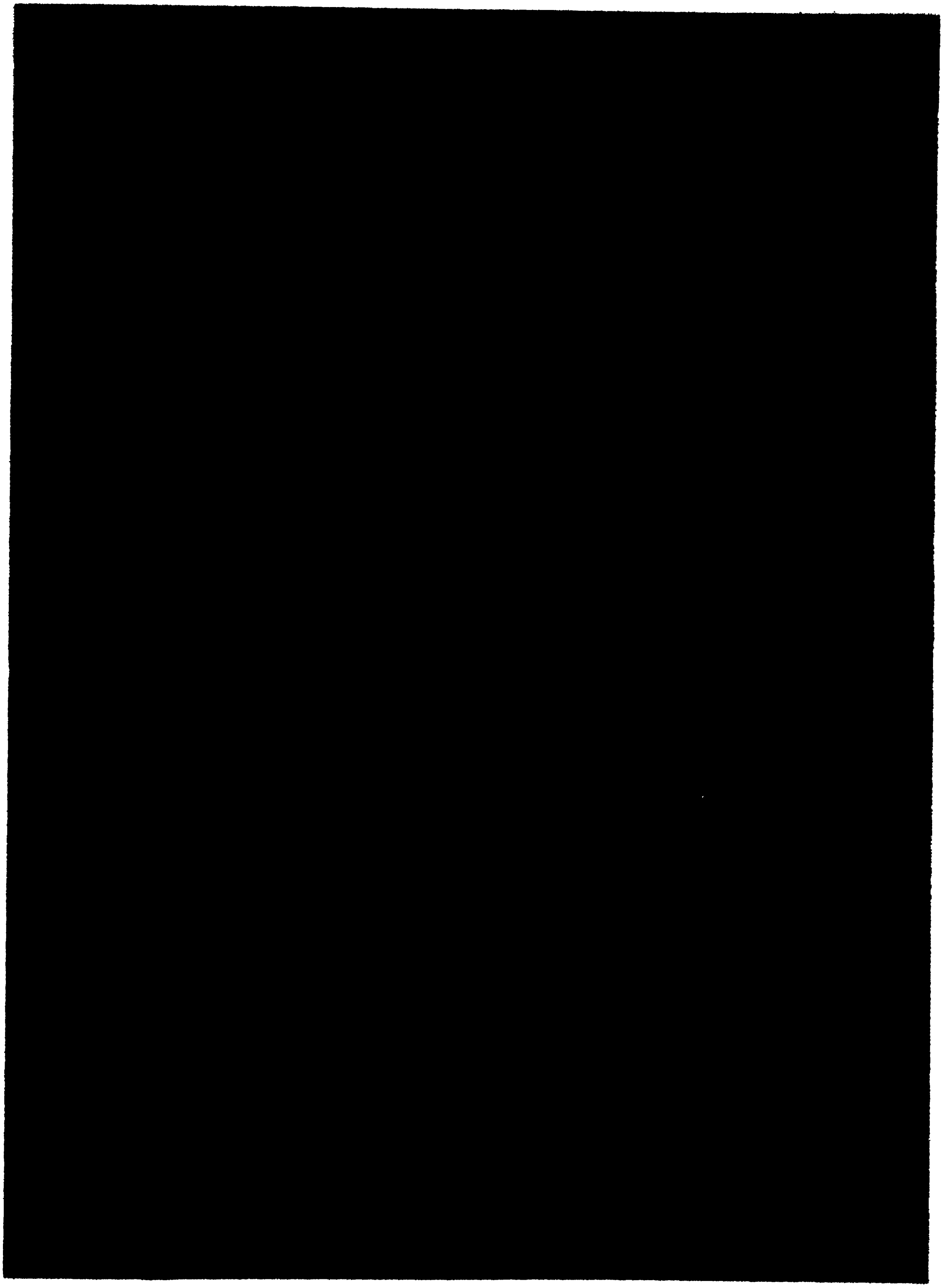
২৪ পরগণা স্পোর্টস এসোসিয়েশন ঃ

২৪ পরগণা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের অফিস থেকে আমরা নিয়মিত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালী ছাপা কাগজে পেয়ে থাকি। এই পুস্তিকা পড়লেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সকলেরই যে একটা উচ্চ ধারণা হবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। আমাদের দেশে খেলাধূলার ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম নয় কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি কাজের মধ্যে যতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ততখানি আমাদের দেশে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নরেন্দ্র দেব প্রণীত শিশুদের গল্প-গ্রন্থ "আনন্দ-মেলা"—২৲
পি, সি, সরকার প্রণীত "ম্যাজিকের খেলা"—১৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "অদর্শনা"—৩৲
শ্রীমতী আভা দেবী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "আরো এক পাতা"—১।০
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছোটদের উপন্যাস "ওপথের ছেলে"—৸০
দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "পিশাচ"—২৲
সতীকুমার নাগ ও শতদল গোস্বামী সম্পাদিত কবিতা সংকলন "মিছিল"—২৲
পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "উত্তর পথ"—১।০
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রণীত নাটিকা "সন্ধ্যাতারার বর"—৷৴০
সুবোধকুমার দাস প্রণীত উপন্যাস "জাগৃহি পৃথিবী"—২।০
নাটক "পুরুষ প্রকৃতি"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ডিটেকটিভ উপন্যাস "আত্মঘাতীর কীর্ত্তি"—১৸০
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত উপন্যাস "প্রদীপ ও শিখা"—২।০
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভারত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ"—২৲
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "যথাপূর্ব্বং"—২৲
শ্রীসজনীকান্ত দাস অনূদিত "মৃত্যুদূত" (The soul shall bear witness)—২৲ ও "রাজমোহনের স্ত্রী" (Rajmohon's wife)—২৲
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র প্রণীত "বিচিত্র মণিপুর"—১।০
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত "কংগ্রেস সংগঠনে বাঙ্গালা"—১।০
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু এবং শ্রীযুক্তা আরাধনা দেবী প্রণীত "নারী বিপথে যায় কেন" (১ম পর্ব্ব)—৩৲



শিল্পী—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ বিশ্বাস

প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



অগ্রহায়ণ—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

বিনয়াধিকারিক—প্রথমাধিকরণ

শ্রীশুক্র ও শ্রীবৃহস্পতিকে নমস্কার

পৃথিবীর[১] লাভ ও পালনের নিমিত্ত যতগুলি অর্থশাস্ত্র পূর্ব্বাচার্য্যগণ[২]-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রায় সকলগুলিকে একত্র সংগ্রহ (বা সংক্ষিপ্ত) করিয়া এই একটি অর্থশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে। তাহার ইহাই প্রকরণ ও অধিকরণ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ[৩] :—

১ বিদ্যাসমুদ্দেশ[৪]। ২ বৃদ্ধসংযোগ[৫]। ৩ ইন্দ্রিয়জয়। ৪ অমাত্যোৎপত্তি। ৫ মন্ত্রিপুরোহিতোৎপত্তি। ৬ উপধাদ্বারা[৬] অমাত্যগণের শুচিতা ও অশুচিতার[৭] পরিজ্ঞান। ৭ গূঢ়পুরুষোৎপত্তি। ৮ গূঢ়পুরুষ-নিয়োগ। ৯ স্বরাষ্ট্রে (শত্রুকর্তৃক) প্রলোভ্য ও অপ্রলোভ্য পক্ষসমূহের (শত্রুর প্রলোভন হইতে) রক্ষণ[৮]। ১০ পররাষ্ট্রে প্রলোভ্য ও অপ্রলোভ্য পক্ষসমূহের

---

১ পৃথিবী—ভূমি, রাষ্ট্র, রাজ্য। ২ পূর্ব্বাচার্য্য—শুক্র, বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ প্রভৃতি। ৩ সমুদ্দেশ—সংক্ষিপ্ত নির্দেশ বা বিবরণ, সংক্ষিপ্ত তালিকা, সূচী। ৪ বিদ্যাসমুদ্দেশ—বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণের ইহাই প্রথম প্রকরণ। এইরূপে প্রথমাধিকরণের অন্তর্গত অষ্টাদশ প্রকরণের নাম পর পর প্রদত্ত হইয়াছে। এই নামগুলিই প্রকরণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া থাকে। ৫ বৃদ্ধসংযোগ—বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ; তাহাদিগের সহিত মিলন। ৬ উপধা—নৃপতি-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভয় দ্বারা অমাত্যাদির পরীক্ষা; উৎকোচাদির প্রলোভন প্রদর্শন-পূর্ব্বক সাধুতা পরীক্ষা 'Temptations' (SHAMA SASTRI)। ৭ শুচিতা—চরিত্র-শুদ্ধি, সাধুতা। অশুচিতা—চরিত্রদোষ, অসাধুতা। ৮ মূলে আছে—'স্ববিষয়ে'; বিষয়—রাষ্ট্র। মূলে আছে—'কৃত্যাকৃত্যপক্ষোপগ্রহঃ'; কৃত্য—শত্রু যাহাকে ভাঙ্গাইয়া নিজের দলে টানিয়া লইতে পারে, শত্রুর প্রলোভনে যাহার বশীভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, শত্রুভেদ্য—ক্রুদ্ধ লুব্ধ প্রভৃতি ব্যক্তি। অকৃত্য—যে শত্রুর প্রলোভনে বশীভূত হইতে পারে না, অভেদ্য—সুহৃদাদি। স্বরাষ্ট্রের যে সকল ব্যক্তির শত্রুর প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ও যাহাদের এরূপ প্রলোভন জয় করিবার শক্তি আছে -এরূপ উভয়বিধ পক্ষসমূহকেই শত্রুর প্রলোভন হইতে সযত্নে

(প্রলোভনাদি দ্বারা স্বপক্ষে) আনয়ন[৯]। ১১ মন্ত্রাধিকার[১০]। ১২ দূত-নিয়োগ। ১৩ রাজপুত্র-রক্ষণ[১১]। ১৪ অবরুদ্ধ-বৃত্ত[১২]। ১৫ অবরুদ্ধের প্রতি ব্যবহার[১৩]। ১৬ রাজ-প্রণিধি[১৪]। ১৭ নিশান্তপ্রণিধি[১৫]। ১৮ আত্মরক্ষণ। ইতি বিনয়াধিকারিক প্রথম অধিকরণ[১৬]।

১ জনপদ-বিনিবেশ[১৭]। ২ ভূমিচ্ছিদ্রবিধান[১৮]। ৩ দুর্গ-বিধান। ৪ দুর্গবিনিবেশ[১৯]। ৫ সন্নিধাতার ধনাদি রক্ষণ বিষয়ে কর্ত্তব্য[২০]। ৬ সমাহর্ত্তার ধনসংগ্রহ বিষয়ে উপায় পরিকল্পন[২১]। ৭ মুদ্রাগণনা স্থানে গণনা-কারিগণের কর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব[২২]। ৮ সংগৃহীত অর্থের যে অংশ নিযুক্তগণ-ক অপহৃত হইয়াছে তাহার পুনরানয়ন[২৩]। ৯ উপযুক্ত-পরীক্ষা ১০ শাসনাধিকার[২৫]। ১১ কোশপ্রবেশ্য-রত্ন-পরীক্ষা[২৬] ১২ আকরকর্ম্মান্ত প্রবর্ত্তন[২৭]। ১৩ অক্ষশালায় সুবর্ণাধ্যক্ষ ১৪ বিশিখাতে সৌবর্ণিকের কর্ত্তব্য[২৯]। ১৫ কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ ১৬ পণ্যাধ্যক্ষ[৩১]। ১৭ কুপ্যাধ্যক্ষ[৩২]। ১৮ আয়ুধাগারাধ্য ১৯ তুলা-মান-পৌতব[৩৩]। ২০ দেশ-কাল-মান। ২১ ছ ধ্যক্ষ[৩৪]। ২২ সূত্রাধ্যক্ষ। ২৩ সীতাধ্যক্ষ[৩৫]। ২৪ সুরাধ্য ২৫ সূনাধ্যক্ষ[৩৬]। ২৬ গণিকাধ্যক্ষ। ২৭ নৌকাধ্য

রক্ষা। 'কৃত্যাঃ শত্রুভেদ্যাঃ ক্রুদ্ধাদয়ঃ অকৃত্যাঃ অভেদ্যাঃ সুহৃদঃ" (মমঃ গণপতি শাস্ত্রী)। 'Parties for or against one's cause'—(SHAMA SASTRI)। ৯ 'পরবিষয়ে কৃত্যাকৃত্যপক্ষোপগ্রহঃ' —প্রলোভন দ্বারা জেয় ও অজেয় যে সকল পক্ষ পররাষ্ট্রে বর্ত্তমান, উৎকোচাদির সাহায্যে তাহাদিগকে স্বপক্ষে ভাঙ্গাইয়া আনার উপায়। ১০ মন্ত্র—কর্ম্মারম্ভের উপায় নির্দ্ধারণ, মন্ত্রণা। ১১ রাজপুত্ররক্ষণ —রাজপুত্রগণ যাহাতে পিতা রাজার প্রতি দ্রোহাচরণ না করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে শত্রুকৃত, প্রলোভন হইতে দূরে সরাইয়া রাজপুত্রগণকে সযত্নে রক্ষার উপায়। ১২ অবরুদ্ধ-বৃত্ত—এইরূপে অবরুদ্ধ রাজপুত্রগণ পিতার প্রতি যেরূপ আচরণ করিবেন, তাহার নির্দ্দেশ ; বৃত্ত—আচরণ ; 'Conduct'—(SH)। ১৩ মূলে আছে—'অবিরুদ্ধে চ বৃত্তিঃ'— এই প্রকারে অবরুদ্ধ রাজপুত্রের প্রতি পিতার ব্যবহার কিরূপ হইবে, তাহার নির্দ্দেশ ; বৃত্তি—ব্যবহার ; treatment (SH)। ১৪ রাজপ্রণিধি—প্রণিধি-প্রণিধান, ব্যাপার চিন্তন (গঃ শাঃ) ; duties of a king (SH)। রাজা কোন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কি কার্য্য করিবেন তাহার তালিকা, রাজার কর্ম্মতালিকা (routine)। ১৫ নিশান্ত-প্রণিধি—নিশান্ত গৃহ (অমরকোষ) ; রাজভবন (গঃ শাঃ), harem (SH)। কোন্ স্থানে রাজভবন নির্ম্মিত হইবে, রাজভবনের কোন্ অংশ কিরূপে নির্ম্মিত হইবে, উহার কোন্ অংশে কাহার নিবাস নির্দ্দিষ্ট হইবে—এই সকল বিষয়ে বিচার। ১৬ বিনয়াধিকারিক— বিনয়—বিদ্যাদি শিক্ষা (গঃ শাঃ), ইন্দ্রিয়জয়, চরিত্রগঠন ; discipline (SH) ; অধিকার—প্রস্তাব ; topic, main section ; বিনয়-সম্বন্ধীয় অধিকার যাহাতে আছে, তাহা বিনয়াধিকারিক ; (a section) 'concerning discipline' (SH.)। অধিকরণ—একটি মুখ্য বিভাগ ; a topic, a book (SH)।

১৭ জনপদ—গ্রাম ; formation of villages (SH) ; internal colonization (Jolly)। ১৮ ভূমিচ্ছিদ্র—কৃষি ও বাসের অযোগ্য পর্ব্বত-বন-গর্ত্ত-বহুল ভূভাগ (গঃ শাঃ) ; ground unfit for tillage (J)। ১৯ দুর্গনিবেশ (শ্যাম শাস্ত্রী) :—দুর্গ—সুরক্ষিত নগর ; fortified town rather than a fort (J) ; fort—(SH)। ২০ সন্নিধাতৃচেয়কর্ম্ম (শাঃ), সন্নিধাতৃনিচয়কর্ম্ম (গঃ শাঃ) :—সন্নিধাতা—যিনি ধনাদি সঞ্চয়-পূর্ব্বক উহাদিগের নিধান করেন ; one who ever attends upon the king, chamberlain (SH) ; নিচয়কর্ম্ম—ধনাদি-রক্ষণ ব্যাপার (গঃ শাঃ)। ২১ সমাহর্ত্তৃ-সমুদয়-প্রস্থাপনম্ :—সমাহর্ত্তা—সকল আয়স্থান হইতে ধনসংগ্রহকর্ত্তা (গঃ শাঃ) ; Collector-general (SH) ; সমুদয়—ধনসংগ্রহ, ধনোৎপাদন (গঃ শাঃ) ; collection of revenue (SH) ; প্রস্থাপন —উপায়চিন্তন, মার্গ-পরিকল্পন (গঃ শাঃ) ; সমাহর্ত্তা কি কি ভাবে অর্থসংগ্রহ ও ব্যয়নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা এই প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২২ অক্ষপটলে গাণনিক্যাধিকার :—অক্ষপটল—offi of accountants (SH) ; অক্ষ—গণনাযোগ্য টাকা প্র (গঃ শাঃ) ; পটল—স্থান (গঃ শাঃ) ; গাণনিক্য—গণনায় নি (গঃ শাঃ)। যেখানে টাকাকড়ি গণনা হয়, সেস্থলে যাঁহারা ক নিযুক্ত, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ এই প্রকরণে আছে। ২৩ সমু যুক্তাপহৃতস্য প্রত্যানয়নম্ :—সমুদয়—সংগৃহীত অর্থ ; যুক্তাপহৃ কর্ম্মনিযুক্ত পুরুষগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত ; detection of what embezzled by Government servants (SH) ; f 'প্রত্যানয়ন' বলিলে কেবল 'চুরি-ধরা' (detection) বুঝায় চোরাই মাল উদ্ধার (recovery) পর্য্যন্ত বুঝায়। ২৪ উপযুক্ত যুক্ত—কর্ম্মনিযুক্ত পুরুষ ; উপযুক্ত—যুক্তগণের উপরে নিযুক্ত উৎ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী (গঃ শাঃ) ; Government servants (SH ২৫ শাসন, রাজশাসন, তাম্রপত্রাদিতে লিখিত রাজাদেশ ; অধিক বিধি। ২৬ কোশপ্রবেশ্য—যাহা রাজকোশে প্রবেশ করাই যোগ্য। ২৭ আকর—খনি ; কর্ম্মান্ত—ক্রিয়ানিশ্চয় (গঃ শাঃ manufactory (SH) ; মনুসংহিতায় (৭।৬২) 'আকরকর্ম্মান্ত' প পাওয়া যায় ; 'কর্ম্মান্তাঃ ইক্ষুকার্পাসাদ্যাগারঃ' (মেধাতিথি) ; 'ই ধান্যাদিসংগ্রহস্থানেষু' (কুল্লুক)। ২৮ অক্ষশালা—সুবর্ণরজত মুদ্রা নির্ম্মাণ ও গণনার স্থান (গঃ শাঃ) ; currency। ২৯ বিশি —আপণবীথী (গঃ শাঃ) ; high road (SH)। ৩০ কোষ্ঠাগার ধান্যগোধূমাদি সংগ্রহ-স্থান (গঃ শাঃ) ; store-house (SH ৩১ পণ্যাধ্যক্ষ—বিক্রেয়-দ্রব্যাধ্যক্ষ (গঃ শাঃ) ; superintende of commerce (SH)। ৩২ কুপ্য—সার-দারু-বেণুবল্লিবল্ক (গঃ শাঃ) ; যে সকল কাঠের মজ্জা বেশ সারযুক্ত তাহারা সার-দা বর্গের অন্তর্ভুক্ত ; বেণু—বাঁশ ; বল্লী—লতাজাতীয় উদ্ভিদ ; বল্ক যাহাতে ছিবড়া বেশী—fibrous plant (SH)। কুপ্য—fore produce (SH)। 'কুপ্য' অর্থে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য ধাতুকেও বুঝায় ; কিন্তু এ প্রকরণে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে। তুলামানপৌতব—তুলা—দাঁড়িপাল্লা (উন্মান-সাধন—গঃ শাঃ মান—বাটখারা (কুড়বাদি—গঃ শাঃ) ; তুলা ও মান দ্বারা পৌ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ—তুলা-মানের সংশোধন। যাহাতে ব্যাপারীরা ওজ কম না দেয়, তাহার নিরূপণার্থ এ প্রকরণ (গঃ শাঃ) ; superi tendent of weights and measures (SH)। ৩৪ শুল্ক পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের যে নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজাকে দেয় (গঃ শাঃ tolls (SH)। ৩৫ সীতা—কৃষি ; সীতাধ্যক্ষ—কৃষিতত্ত্ব ও বৃক্ষায়ুর্বে জানিয়া যিনি উহার প্রবর্ত্তন করেন (গঃ শাঃ) ; superintende of agriculture (SH)। ৩৬ সূনা—পশ্বাদিবধস্থান (গঃ শাঃ —কসাইখানা ; slaughter-house (SH)।

২৮ গোসমূহাধ্যক্ষ। ২৯ অশ্বাধ্যক্ষ। ৩০ হস্ত্যধ্যক্ষ। ৩১ রথাধ্যক্ষ। ৩২ পত্ত্যধ্যক্ষ[৩৭]। ৩৩ সেনাপতিপ্রচার[৩৮]। ৩৪ মুদ্রাধ্যক্ষ[৩৯]। ৩৫ বিবীতাধ্যক্ষ[৪০]। ৩৬ সমাহর্তৃপ্রচার[৪১]। ৩৭ গৃহস্থ-বণিক্-তপস্বীদিগের বেশধারী চরসমূহ[৪২]। ৩৮ নাগরিক-প্রণিধি[৪৩]। ইতি অধ্যক্ষপ্রচার[৪৪]নামক দ্বিতীয় অধিকরণ।

১ ব্যবহারস্থাপনা[৪৫]। ২ বিবাদবিষয়ক নিবন্ধ[৪৬]। ৩ বিবাহ-সম্বন্ধীয় (ব্যবহার)[৪৭]। ৪ দায়বিভাগ[৪৮]। ৫ বাস্তুক[৪৯]। ৬ সর্ত্তের অপরিপালন[৫০]। ৭ ঋণের আদান। ৮ ন্যাস-সম্বন্ধীয়[৫১] (ব্যবহার)। ৯ দাস-কর্ম্মকর-সম্বন্ধীয় বিধি[৫২]। ১০ সম্ভূয় সমুত্থান[৫৩]। ১১ বিক্রীত ও ক্রীত বস্তু সম্বন্ধে অনুশোচনা[৫৪]। ১২ দত্ত বস্তুর অপ্রদান[৫৫]। ১৩ অস্বামি-বিক্রয়[৫৬]। ১৪ স্বস্বামি-সম্বন্ধ[৫৭]। ১৫ সাহস[৫৮]। ১৬ বাক্পারুষ্য[৫৯]। ১৭ দণ্ডপারুষ্য[৬০]। ১৮ দ্যূত-সমাহ্বয়[৬১]। ১৯ প্রকীর্ণ[৬২]। ইতি ধর্ম্মস্থীয় তৃতীয় অধিকরণ[৬৩]।

---

৩৭ পত্তি—পদাতি; চতুরঙ্গ সেনার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ=১ রথ+১ হস্তী+৩ অশ্ব+৫ পদাতি। ৩৮ প্রচার—ব্যাপার। ৩৯ মুদ্রা—রাজচিহ্ন; seal; passport (SH)। ৪০ বিবীত—পশুচারণের উপযোগী অথচ কৃষির অনুপযুক্ত তৃণ-জল-বিশিষ্ট প্রদেশ (গঃ শাঃ); pasture lands (SH)। ৪১ সমাহর্ত্তা—আয়স্থান হইতে রাজকীয় অর্থ-সংগ্রাহক; revenue-collector (SH)। ৪২ "গৃহপতিবৈদেহক-তাপসব্যঞ্জনাঃ প্রণিধয়ঃ"—গৃহপতি—গৃহস্থ; বৈদেহ—বণিক্; প্রণিধি—চর। ৪৩ নাগরিক—নগরাধিকারে নিযুক্ত রাজপুরুষ; city superintendent (SH); প্রণিধি—প্রণিধান, ব্যাপার চিন্তা; duty (SH)। ৪৪ অধ্যক্ষপ্রচার—অধ্যক্ষগণের ব্যাপার; duties of Government superintendents (SH)।

৪৫ ব্যবহার স্থাপনা—ব্যবহার—মামলা; স্থাপনা—কিরূপ মামলায় জয় হইবে, কিরূপ মামলায় হইবে না—তাহার নিরূপণ (গঃ শাঃ); determination of the forms of agreements (SH)। ৪৬ "বিবাদপদনিবন্ধঃ" (মূল)—বিবাদ—মামলা; পদ—বিষয়; নিবন্ধ—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির বিচার (গঃ শাঃ); determination of lagal disputes (SH)। ৪৭ "বিবাহসংযুক্তম্"—সংযুক্ত—সম্বন্ধযুক্ত; concerning (SH)। ৪৮ দায়—পিতৃপিতৃব্যাদির ধন-সম্পত্তি; inheritance (SH)। ৪৯ পরে এই প্রকরণটির নাম দেওয়া হইয়াছে—"গৃহবাস্তুকম্" (J)। বাস্তুভিটা—পৈতৃক গৃহাদি; এস্থলে কেবল 'গৃহ' অর্থে ব্যবহৃত। ৫০ "সময়স্যানপাকর্ম্ম"—সময়—সর্ত্ত, agreements (SH); অনপাকর্ম্ম—অপরিপালন; nonperformance (SH); পক্ষান্তরে, গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় অর্থ করিয়াছেন—"ত্যাগাভাবঃ" ১২ সংখ্যক প্রকরণেও ("দত্তস্যানপাকর্ম্ম") অনপাকর্ম্মের অর্থ করিয়াছেন—"অপ্রদানম্"। উভয়স্থলে সামঞ্জস্য আছে বটে (কারণ 'ত্যাগাভাব' ও 'অপ্রদান' একই)। তথাপি সময়ের (সর্ত্তের) ত্যাগাভাব বলিলে যেন মনে হয় সময় ত্যাগ না করা অর্থাৎ সর্ত্ত পরিপালন করা। কিন্তু বস্তুতঃ অর্থ হইতেছে সর্ত্ত পালন না করা। অতএব, 'ত্যাগাভাব'এর একটু ঘোরাল ব্যাখ্যা করিতে হইবে—সময় (সর্ত্ত) ফিরাইয়া লওয়া (=গ্রহণ=ত্যাগাভাব)। মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে পাঠ আছে—"দত্তস্যানপকর্ম্ম চ"। কুল্লুক অর্থ করিয়াছেন—"দত্তস্য ধনস্য অপাত্রবুদ্ধ্যা ক্রোধাদিনা বা গ্রহণম্"। আপ্তে মহোদয় তাঁহার অভিধানে 'অপকর্ম্ম' পদের অর্থ করিয়াছেন—discharge, paying off (of a debt). এস্থলেও কুল্লুকের মতে—'অপকর্ম্ম' অর্থে—ফিরাইয়া লওয়া (=গ্রহণ=না দেওয়া=পালন না করা)। এরূপভাবে অর্থ করিলে গণপতি শাস্ত্রীর 'ত্যাগাভাব' অর্থ কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যায়। ৫১ ঔপনিধিক—উপনিধি—নিক্ষেপ, ন্যাস—তৎসম্বন্ধীয় ব্যাপার (গঃ শাঃ); concerning deposits (SH)। ৫২ দাস—অত্যন্ত পরাধীন সেবাদিকারী; কর্ম্মকর—আয়ুভরণের উদ্দেশ্যে সেবাদি কর্ম্মকর (গঃ শাঃ)। কল্প—বিধি; rules regarding slaves and labourers (SH)। পণক্রীত দাসের উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় (মৃচ্ছকটিক দ্রষ্টব্য)। ৫৩ বাণিজ্যকারী বা অন্য ব্যক্তিগণ একসঙ্গে বহু জনে মিলিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করা যায় তাহার নাম সম্ভূয়-সমুত্থান (গঃ শাঃ); co-operative undertakings (SH)। ৫৪ অনুশয় (মূল)—পশ্চাত্তাপ (গঃ শাঃ); recission of purchase and sale (SH)। ৫৫ দত্তস্য অনপাকর্ম্ম (মূল)—মনুসংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে—উহার কুল্লুক-কৃত টীকা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে; উহার অর্থ—যাহাকে একবার ধনাদি দান করা হইয়াছে, তাহাকে অপাত্র বোধে অথবা তাহার প্রতি ক্রোধবশতঃ উক্ত দত্তধনের পুনরায় গ্রহণ। গণপতি শাস্ত্রী অর্থ করিয়াছেন—ধর্ম্মাদি নিমিত্ত বাক্যের দ্বারা দত্ত (প্রতিশ্রুত) বস্তুর অপ্রদান। আবার বিষয়-বিশেষে—দত্ত বস্তুরও পুনর্হরণ—এরূপ অর্থও হইতে পারে; resumption of gifts (SH)। ৫৬ অস্বামী—পরদ্রব্য-ব্যবহারকারী; তৎকৃত বিক্রয় (গঃ শাঃ); sale without ownership (SH)। ৫৭ স্ব=বিষয়; স্বামী=উহার অধিকারী—উভয়ের সম্বন্ধ; ownership (SH)। ৫৮ সাহস—সহসা কৃত কর্ম্ম—দুঃসাহস (গঃ শাঃ); robbery (SH)। Rash act বলাই ভাল। ৫৯ বাক্পারুষ্য—বাক্যের দ্বারা কুৎসা-করণ (গঃ শাঃ); কটুবাক্য কথন; defamation (SH)। ৬০ দণ্ডপারুষ্য—দণ্ড-দ্বারা দ্রোহের আচরণ (গঃ শাঃ), তাড়না; assault (SH)। ৬১ দ্যূত—অক্ষক্রীড়া—জুয়াখেলার প্রধান উপায়; সমাহ্বয়—অজ-কুক্কুটাদি প্রাণিঘটিত জুয়া (গঃ শাঃ);—ঘোড়দৌড়, মেড়ার লড়াই, কুক্কুটের যুদ্ধ ইত্যাদি লইয়া বাজি রাখিয়া জুয়া-খেলাও ইহারই মধ্যে পড়ে; gambling and betting (SH)। ৬২ প্রকীর্ণ—পূর্ব্বোক্ত বিবাদ-বিষয়-সমূহের যাহা অন্তর্গত নহে (যথা, যাচিতকাদির অদান ইত্যাদি) সেই সকল বিবিধ বিষয় এই প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে; miscellaneous (SH.)। ৬৩ ধর্ম্মস্থীয়—'ধর্ম্ম' অর্থে ব্যবহার (LAW); আইন ঘটিত উনিশটি প্রকরণ এই তৃতীয় অধিকরণের অন্তর্গত। মনু উনিশের পরিবর্ত্তে অষ্টাদশ বিবাদ-বিষয় (ব্যবহার-পদ) বলিয়াছেন (মনুসং ৮।৭)। ক্রমশঃ



ফুলধনু

(ব্যঙ্গ নাটক)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

কলকাতার এক কলেজ-হোষ্টেলের তিন সিটের এক কক্ষ। তিন রুমমেট কথা কইছে।

সুকুমার। (কাপড় চোপড় পরতে পরতে) অতএব বুঝেছ রবি, শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে আসি, ফিরে এসে তোমাকে আকাশের চাঁদ ধরে দেব।

যোগেশ। তোমার পাঞ্জাবীর প্লিটো এবার ভাল হয়নি।

সুকুমার। হবে কোথা থেকে! জাননা বুঝি, আমাদের রজকপ্রধানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে?

রবীন্দ্র। তাই নাকি?

সুকুমার। হাঁ, সেদিন এল যখন, তোমরা তো বেড়াতে বেরিয়েছিলে, দেখি, উসকো-খুসকো চুল, চোখমুখ শুকনো, যেন কি হয়েছে; বললুম, বাবাজীবন, কি হয়েছে। বললে, আজ্ঞে, ইস্ত্রি মারা গেছে, কাপড় চোপড়ের হালচাল দেখে ভাবলুম, আহা, ইস্ত্রি যখন মারা গেছে, তখন এবারকার ইস্ত্রটা না হয় খারাপই হোক, কি আর করা যাবে!

যোগেশ।- ইস্ত্রি আছে বলেই ইস্ত্রির মূল্য বুঝেছ।

সুকুমার। ভগবান করুন, তোমরাও বোঝ। কিন্তু এখনও সময় হচ্ছে না, এইটাই দুঃখ; দেখি, এক একজন করে খেয়াপার করতে পারি কি না।

যোগেশ। আমার পারের কড়ি নেই ভায়া, আমায় পার করতে গেলে ঠকবে, যার আছে, তাকেই কর।

সুকুমার। ভয় নেই, নির্ভয়ে থাক। আজ শুভ শনিবার, কাল রবিবার, পরশু সোমবার এসে আমি কিছুদিনের ছুটিতে থাকব; সে ছুটী মিছে নয়, তা ভবিষ্যত স্বীকার করবে। যোগেশ, তোমাকেও আমার প্রয়োজন আছে।

যোগেশ। আমাকে আবার কি কাজে লাগাতে চাও? তুমি গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনলীলা তো তোমারই কাজ, আমাদের মত ওঁছো লোককে নিয়ে কি কাজ হবে?

সুকুমার। অতি সহজ কাজ। ছাত্রীশ্রেষ্ঠা সুনয়নী রচনামালা আমাদের (রবিকে দেখিয়ে) শ্রীমানের মানসে যে মাল্য রচনা করেছেন, সেটা বিনি সুতোর গাঁথা কিনা, তার একটু খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু আর এ সব নয়, আমায় একটু তফাত হতে দাও।

রবি। (হাসিমুখে) কিসের তফাত?

সুকুমার। তোমরা আর বাগড়া দিও না, একে তো সময় ও ট্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি।

রবি। আর কত সময় বাকী?

সুকুমার। কোন সময়টার কথা বলছ বল, ট্রেন ছাড়তে কত বাকী, না প্রিয়াপাশে উপস্থিত হতে কত বাকী? হায় সময়, একে তোমার সঙ্গেই পেরে উঠা যায় না, তার ওপর আবার ট্রাম, ট্রেন, ঠুনঠুন গাড়ী রয়েছে। বিরহীর কাছে এ কি হার্ডল্ রেস!

যোগেশ। আর আমাদের রবির এখন কি রেস হচ্ছে?

সুকুমার। রবির এখন হাইজাম্প।

যোগেশ। কেন?

সুকুমার। বুঝতে পারলে না ভায়া। শ্রীমতী রচনা যে তাঁদের হোষ্টেলের দোতলায় থাকেন।

যোগেশ। এ খবরও জোগাড় করেছ?

সুকুমার। এ কদিন কি আর নিশ্চিন্ত ছিলুম ভেবেছ? সব কথা আর তোমাদের বলিনি, শুধু প্ল্যান আঁটছি। হায় শ্রীমতী, কেনই বা তোমার আমাদের স্পেশ্যালে আসা, আর কেনই বা বৃহনি রূপশরীরে অগ্নিশর নিক্ষেপ করা!

এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে কে বললে, আসতে পারি?

রবি। এস, এস।

বিজন নামে একজন সহপাঠী প্রবেশ করল

বিজন। কোথায় চলেছ সুকুমার?

সুকুমার। হোষ্টেলনিবাসীদের কাছে সে কথা বলবার নয়।

বিজন। তাহলে তো ভাবনার কথা।

যোগেশ। বিষম ভাবনার কথা।

সুকুমার। ভাবনার কথা পরে হবে। এখন নিয়ে এস হারমোনিয়মটা, একখানা গান কর।

যোগেশ। তোমাকে বেরোতে হবে না?

সুকুমার। এখনও দেড় ঘণ্টা দেরী আছে।

বিজন। বাব্বাঃ, এত আগে থেকে জামা কাপড় পরে বসে আছ!

সুকুমার। ওহে অবিবাহিত অবোধ, এর অর্থ তোমরা কি বুঝবে! কাল রাত্তির থেকে পরে বসে থাকিনি কেন, তাই জিজ্ঞেস কর। তাও তোমরা শুধু বাইরের জামা-কাপড় পরাটাই দেখেছ—মন যে আমার কবে থেকে জামাকাপড় পরে বসে আছে, তাতো আর দেখনি। কিন্তু ছোটো—ছোটো—তাড়াতাড়ি হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসে একখানা গান শুনিয়ে দাও। বলতো আমিই যাই। পাইয়েকে দিয়ে যন্ত্র বইয়ে নিয়ে আসব, এ কথা ভাল নয়।

যোগেশ। আমি যাচ্ছি।

রবি। আমি যাই না?

সুকুমার। দেখেছ, মজা দেখেছ এবার। যাও যোগেশ ভায়া, তুমিই নিয়ে এস, তোমার সুবিপুল শরীরকে একটু মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া দেওয়া দরকার। এরা সব কৃশাঙ্গ, কৃশাঙ্গীর অর্ধাঙ্গ হওয়া ছাড়া এদের করণীয় আর কিছু নেই।

যোগেশ। উঠছি, কিন্তু তোমার শেষ কথাটার কি অর্থ করা উচিত?

সুকুমার। মতিমান্, অর্ধাঙ্গ বুঝি তাঁরাই শুধু হতে পারেন, আমরা হতে পারি না?

বিজন। ঠিক বলেছ।

যোগেশ বেরিয়ে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে এসে রাখলে

যোগেশ। নাও হে, আরম্ভ কর।

বিজন। কি গাইব?

সুকুমার। কি গাইবে বল তো কবিসম্রাট্?

রবি। তুমিই বল না।

সুকুমার। একখানা মান গাও।

যোগেশ। না হে, গোবিন্দদাসের সেই কীর্তনটা—

বিজনের গান

দূর কর বিরহিনী দুখ। নিরখে হেরবি পিয়া-মুখ।
অনুকূল করু উদযোগে। হামে পাঠায়েল আগে।
মো চিত উলসিত কান। তুয়া আশে আওল জান।
মিছু নহ ইহ আশোয়াস। কহতহি গোবিন্দ দাস।

গান শেষ হবার ঈষৎ আগে বাইরে থেকে কে ডাকলে, সুকুমার!

সুকুমার। কে?

বাইরে থেকে—'সুকুমার আছ'?

সুকুমার। (শশব্যস্তে চাপা গলায়) এই, স্যার এসেছেন।

বিজন। কে?

যোগেশ। সুপার?

সুকুমার। হাঁ। (একটু জোরে) যাচ্ছি স্যার।

দরজা খুলে দিতে প্রায়-বৃদ্ধ সুপারইন্‌টেনডেন্ট প্রবেশ করলেন

সুপার। সুকুমার, আজ তুমি বাড়ী যাচ্ছ তাহলে?

সুকুমার। (মাথা চুলকোতে চুলকোতে) হাঁ স্যার।

সুপার। তোমার বাবার কি অসুখ বল্লে?

সুকুমার। ব্রঙ্কাইটিস্ ধরণের হয়েছে বলে লিখছে।

সুপার। ও, তাহলে তো ভাবনার কথা।

সুকুমার। হাঁ স্যার।

সুপার। সোমবার ফিরতে পারবে তো?

সুকুমার। তা পারব স্যার।

সুপার। (অন্য সকলের দিকে চেয়ে) আজ শনিবার, তোমরা এখনও বেড়াতে বের হওনি যে?

যোগেশ। এই স্যার, সুকুমার বাড়ী যাচ্ছে সেইজন্যে।

সুপার। ও, আচ্ছা আচ্ছা।

বেরিয়ে গেলেন

বিজন। (আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে) খুব ধাপ্পাটা দিলে যাহোক। বাড়ী যাচ্ছে, বাবার অসুখ। এদিকে তো—

রবি। আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচান কাপড়।

যোগেশ। মুখেতে স্নো, পকেটে এসেন্স।

বিজন। সারাজীবন শুধু ষ্ট্যাটিকস্ আর ডাইন্যামিকস্ নিয়ে রইলেন, এ সবের খবর আর পাবেন কোথা থেকে।

সুকুমার। আসল ডাইন্যামিকস কি, তা সে আর চিনলেন না। সিঙ্গলসিটেড্ রুমে সারাটা জীবন কেটে গেল, ডাবল-সিটেড্ রুমে প্রবেশলাভ হল না।

যোগেশ। একান্ত ভাগ্যহীন, কি বল?

সুকুমার। মূঢ়মতি। ভদ্রলোক ডিমের সাদাভাগটা খেলেন, লালটা ছুঁলেন না; সরোবরে আবক্ষ নামলেন, মাথায় জল দিলেন না।

যোগেশ। ভায়ার আমার মুখে মুখে সাহিত্য।

সুকুমার। কার কক্ষসাথী সে খেয়াল নেই? নাম মাহাত্ম্য তো আছে! (হাতঘড়ি দেখে) এবার তাহলে পালা সাঙ্গ করতে হয়।

রবি। কেন, সময় হল বুঝি?

সুকুমার। তোমাদের কি মতলব বলতো, সময়কে কি এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাও নাকি?

বিজন। আচ্ছা, বৌদি এতক্ষণ কি করছেন সুকুমার?

যোগেশ। সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপটিতে মুখ দিচ্ছেন।

সুকুমার। না হে না, চা খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, অর্থাৎ আড়াইটার সময়। এখন অঙ্গপরিমার্জন করে প্রসাধন করছেন, ক্ষীণাঙ্গুলিতে রয়েছে স্নো, দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এটা কি আজ গণ্ডে না দিলেই নয়। কিন্তু এসব কথা আর বেশী নয়, কুমার তোমরা, ঔৎসুক্যে, চাঞ্চল্যে তোমরা এক একটি হাউই, হঠাৎ একটু আগুনের ছোঁয়াচ লাগলে কোথায় গিয়ে যে উড়ে পড়বে, তার ঠিকানা নেই।

বিজন। আমরা না হয় হাউই হলুম, তুমি কি তাহলে?

সুকুমার। আমরা হচ্ছি চরকি। শ্রীমতীদের হাতেই ঘূর্ণপাক খাই ফুলঝুরি ছড়িয়ে, শেষ হয়ে গিয়েও হাতেই আবদ্ধ থাকি, উড়ে পালাবার পথ পাইনা।

রবি। (হাততালি দিয়ে) সুন্দর! সুন্দর!

বিজন। একসেলেন্ট, একসেলেন্ট!

সুকুমার। এবার চলি ভাই, আর দেরী নয়।

যোগেশ। এস, আবার ফিরে এস।

বিজন। চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুকুমার। চল।

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলকাতার এক কলেজের মেয়েদের হোষ্টেলের লেডি সুপারইন্‌টেনডেন্টের অফিস ঘর। প্রৌঢ় নীলকণ্ঠবাবু ও তাঁর কন্যা মায়া সুপারের সামনে চেয়ারে বসে আছে। কাছে দাঁড়িয়ে পরিচারিকা কালী।

সুপার। আমাদের সবই সিঙ্গলসিটেড রুম, আপনার মেয়ের কোন অসুবিধে হবেনা।

নীলকণ্ঠ। হাঁ, ও একটু একা একা থাকতে ভালবাসে কিনা, তাই বলছিলুম। কোন তলায় রুম খালি আছে?

সুপার। দোতলাতেও আছে, তেতলাতেও আছে।

নীলকণ্ঠ। তাহলে দোতলাতেই দেবেন। তেতলা পর্যন্ত বারবার সিঁড়ি ভাঙা—(সামান্য হেসে) যদিও ওদের কাছে তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমাদের তো শুনলেই ভয় হয়।

সুপার। (কালীর প্রতি) দোতলাতে কোন কোন রুম খালি আছে?

কালী। একুশ নম্বর আর তিরিশ নম্বর।

নীলকণ্ঠ। তাহলে একবার একে দেখিয়ে নিয়ে আসতে বলুন, কোনটা পছন্দ হয়।

সুপার। কালী, যাও তো, দেখিয়ে নিয়ে এস।

নীলকণ্ঠ। যাও মায়া, দেখে এস।

কালীর সঙ্গে মায়া বেরিয়ে গেল

দেখুন, মাকে আমার একা ছেড়ে যেতে বড় ভাবনা; এতটা বয়স বরাবর ও আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরেছে, বড় অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছিল কিনা।

সুপার। ও।

নীলকণ্ঠ। পড়াশোনা করার বড় ঝোঁক, না হলে তো ভেবেছিলুম যে বিয়ে দিয়ে দিই। অবশ্য এখনও যে দুচার বছর অপেক্ষা করা যাবে, তাও নয়, যে বাড়ন্ত গড়ন। (ঈষৎ হেসে) বটুলায়কে আমরা যত গালাগালিই দিই না কেন, যুক্তিটা তার মন্দ নয় যে মেয়েদের ঘর দেখাই উচিত, পুরুষরা বাইরে দেখুক। অবশ্য আপনারা শিক্ষিতারা এ সম্বন্ধে কি ভাবেন, তা আমার জানা নেই।

সুপার। ও সমস্যার মীমাংসা হওয়া শক্ত।

নীলকণ্ঠ। (হঠাৎ কয়েকটা ছবি লক্ষ্য করে) আপনার যে মহাত্মাদের ছবি দেখছি, মহীয়সীদের ছবি রাখেন না কেন?

সুপার। (ঈষৎ হেসে) হাঁ রাখলেই হয়, তবে পাওয়া শক্ত।

নীলকণ্ঠ। তা সত্যি বলেছেন, যত সহজে গান্ধীজি, দেশবন্ধুর ছবি পাওয়া যায়, তত সহজে কস্তুরীবাঈ, বাসন্তী দেবীর ছবি পাওয়া যায়না। দেখুন না, বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দয়াময়ী দেবীর তো কোনও ছবিই আমরা দেখতে পেলুম না।

সুপার। তা সত্যি কথা। তবে সেটা মেয়েদের প্রয়োজন হয়নি, তাই বোধহয় হয়নি।

মায়া ও কালী প্রবেশ করিল

নীলকণ্ঠ। দেখে এলে?

মায়া। হাঁ।

নীলকণ্ঠ। কোনটা পছন্দ হল?

মায়া। তিরিশ নম্বরেরটাই ভাল।

নীলকণ্ঠ। তাহলে ওই রুমটাই ওর জন্যে রাখবেন, কাল সকালে বেডিং-টেডিং নিয়ে আসবে।

সুপার। আচ্ছা।

কালীর প্রস্থান

মায়া। বাবা, পাশের রুমের একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করছিল, কবে আসচ।

নীলকণ্ঠ। (হাসিমুখে) তাই নাকি? তুমি কি বললে?

মায়া। আমি বললুম, কাল আসব।

নীলকণ্ঠ। আলাপ হল নাকি?

মায়া। হাঁ।

নীলকণ্ঠ। তাহলেই ভাল। যে লাজুক মেয়ে তুমি মা, তাতে হোষ্টেলে যে কি করে থাকবে, তাই আমি ভাবি।

তিনটি ছাত্রী প্রবেশ করিল

সুপার। কি?

১ম ছাত্রী। (সামান্য দ্বিধাভরে) আমরা আজ একটু সিনেমায় যাব।

সুপার। কটার শোতে যেতে চাও?

১ম ছাত্রী। ছটায়।

সুপার। ছটায় কেন, তিনটের যাও না।

৩য় ছাত্রী। ছটায় হলেই ভাল হয়।

সুপার। আচ্ছা তাই যেও, তবে ফেরবার পথে আবার কারুর ওখানে গিয়ে দেরী করে এসনা যেন।

১ম ছাত্রী। না, দেরী হবেনা।

সুপার। আচ্ছা।

ছাত্রীদের প্রস্থান

নীলকণ্ঠ। মায়ার আমাদের সিনেমা দেখার বড় ঝোঁক, ভাবছিল, হোষ্টেলে থাকলে কি আর বেশী দেখতে পাবে। দেখলে তো, আর কোন ভাবনা নেই। তবে সাহেব পাড়ার দিকে বেশী গিয়ে বাহাদুরীটা দেখিয়ো না। বাঙালী মেয়েরা ইংরিজি ফিলমের বোঝেন কতটুকু, তার ঠিক নেই, তবু ইংরিজি ফিল্মের নামে নেচে ওঠা চাই। মেমসাহেবীয়ানা কত! মনে কিছু করছেন নাকি মিসেস্—

সুপার। দত্তরায়।

নীলকণ্ঠ। ও, মিসেস দত্তরায়। ঠিক বলছি কিনা বলুন মিসেস্ দত্তরায়?

সুপার। (সামান্য হেসে) তা ঠিক।

নীলকণ্ঠ। তাও ইংরিজি ফিলম্ দেখবে দেখুক, ক্ষতি নেই, উল্টে আবার দেশী ফিলমের নিন্দে এবং সেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তোমরা নিজেরা কোন সাদা চামড়ার সঙ্গে তুলনায় পার যে দেশী বলে নিন্দে কর?

সুপার। হাঁ, ওদের জিনিসের কোয়ালিটির সঙ্গে আমাদের সব জিনিসের কোয়ালিটি তুলনায় এক হবে, এ আশা করা ভুল।

নীলকণ্ঠ। নয় কিনা বলুন।

মায়া। বাবা তুমি বাঙ্‌লা ফিলম বড় ভালবাস, সেটা সব জায়গায় না বলে ছাড়বেনা।

নীলকণ্ঠ। শুনুন মেয়ের কথা! আরে, ভালবাসব না? এ যে ভালবাসবার জিনিস। দেশের সিনেমা থিয়েটার কি কম আদরের জিনিস নাকি? আচ্ছা, আজ আসি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম। (দাঁড়াল)

সুপার। না না, বেশ তো কথা হল।

নীলকণ্ঠ। তাহলে কাল একে পাঠিয়ে দেব। নমস্কার।

সুপার। (দাঁড়িয়ে) নমস্কার।

নীলকণ্ঠ ও মায়ার প্রস্থান

ক্রমশঃ

ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন

অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম-এ

ভারতের অবিচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। অকৃতজ্ঞ জামদগ্ন্যদের উন্মত্ত কুঠার আজ মাতৃবক্ষ বিদীর্ণ করিবার জন্য সমুদ্যত। মোহান্ধ দাবী প্রশ্রয় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে ভারতকে বলি দিবার আয়োজনের আর অন্ত নাই। ভারতে অখণ্ড ঐক্য কোনো দিন নাকি ছিল না, থাকিতে পারে না। সুতরাং অখণ্ড ভারত কথাটা নিরর্থক,—অনুদার, বাস্তব-বিমুখ, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ দ্বারা প্রচারিত। ভারতের অখণ্ডত্ব কোনো দিক দিয়াই নাকি প্রমাণিত হয় না।

মনে হয় কথাটা বুঝি ঠিক। এই অনন্ত বৈচিত্র্য, অশেষ বিভিন্নতা ও অসীম বিপুলতার মধ্যে ঐক্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়াই মুশকিল। আয়তনে রাশিয়া-রহিত সমগ্র ইউরোপের আয়তনের সমান এই দেশ, আবহাওয়ার তারতম্যও গুরুতর, জাতির বৈচিত্র্যও কম নয়—দীর্ঘকায় আর্য, হ্রস্বকায় অষ্ট্রিক, বিরলকেশ পীতাংগ মোংগোলীয় এবং কৃষ্ণাংগ দ্রাবিড় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ভারতবাসীর উদ্ভব; ভাষার পার্থক্যও লক্ষণীয়—প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা স্বতন্ত্র এবং উপভাষা অসংখ্য; ধর্মের অনৈক্যও চিন্তনীয়—জ্ঞানগ্রাহ্য সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম হইতে বিড়াল দেবতা (ষষ্ঠী দেবী) ওলা দেবী পর্যন্ত সংখ্যাতীত দেবদেবী ভারতবাসীর আরাধ্য দেবতা; ইহা ছাড়া বিদেশাগত শক্তিশালী ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম তো আছেই। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান অনৈক্য, অসাম্য ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ডতা কোথায়। সেই কথাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্যটুকু অনুধাবনযোগ্য। সভ্যতার উদয় ও বিলয় হইতে পারে—সংস্কৃতি (cultnre) অক্ষয় ও অমর, নানা নতুন সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করিয়া টিঁকিয়া থাকে।১ ভারতীয় সভ্যতার যে পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই, তাহার বহুপূর্ব হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সেই সুদূর অতীতে প্রাগার্য সংস্কৃতির ধারা আমাদের মধ্যে প্রবহমান। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা করিতে হইলে সেই অলক্ষ্য, ক্ষীণ ধারার উৎপত্তি স্থল আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে।

ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কোন্ জাতীয় লোক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে অনেকে বলেন অষ্ট্রিকদের ভারতে আগমনের পূর্বে এই দেশে অরণ্য সমূহে এবং সমুদ্রউপকূলে ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতি বাস করিত।২ ইহাদের মধ্যে সভ্যতার পত্তন হয় নাই, এবং ইহাদের কোনো সংস্কৃতির ছাপ পরবর্তী অধিবাসীদের মধ্যে রহিয়া যায় নাই।

বিদেশাগত জাতিদিগের মধ্যে অষ্ট্রিক জাতিই সর্বপ্রথম ভারতে আগমন করে। অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা সম্ভবতঃ ইন্দোচীন হইতে আসামের উপত্যকা ভূমি দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। নবাগত অষ্ট্রিক লোকেদের সহিত পূর্বস্থিত নেগ্রিটো লোকেদের রক্তের মিশ্রণ ঘটে, এবং কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির উদ্ভব হয়।৩ অষ্ট্রিক জাতি সুসভ্য না হইলেও তাহাদের ভাষা, জীবন ধারণের প্রণালী, রীতি নীতি পরবর্তী সভ্য জাতিদিগের মধ্যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিদিগের ভাষা মূল অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। ইহাদের ভাষার অসংখ্য শব্দ আর্যভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। অনেক জায়গায় নামের মধ্যে বহুতর অষ্ট্রিক শব্দ এখনো টিঁকিয়া আছে। এই অষ্ট্রিক জাতির লোকেরাই সর্বপ্রথম কৃষিকার্য আরম্ভ করে এবং সংঘবদ্ধ, সুস্থিত জীবনযাপন করিতে থাকে। ভারতের সামাজিক জীবনে ধান, পান, সিন্দুর, কলা, সুপারী প্রভৃতির স্থান অষ্ট্রিক প্রভাবের ফল। অষ্ট্রিকদের পূজিত নানা দেবদেবী ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে। হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদও সম্ভবতঃ অষ্ট্রিকদের কাছ হইতে গৃহীত হইয়াছিল।৪ ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এই অষ্ট্রিকদের কাল হইতে স্থাপিত হইল। কালক্রমে এই অষ্ট্রিক জাতির এক বিশাল অংশ তাহাদের ভাবধারণা, রীতি নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি লইয়া উদার হিন্দুসমাজের মধ্যে মিশিয়া যায়, এবং এখনও যে আদিম অষ্ট্রিক জাতির কিছু কিছু লোক পূর্বপুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্য রক্ষা করিয়া ক্ষীয়মান অবস্থায় টিঁকিয়া আছে তাহারাও সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে, অবিভাজ্য বিশাল ভারতীয় সমাজের সহিত একীভূত হইয়া যাইবে।

দ্রাবিড়দের আগমন ও অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন দ্রাবিড়দের আদিম বাসস্থান এই ভারতেই ছিল, কিন্তু আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মতে দ্রাবিড়রা বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। দ্রাবিড়গণ অষ্ট্রিকদের ভারতে আগমনের কিছু পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ দিয়া সম্ভবতঃ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। বালুচিস্থানের ব্রাহুই জাতীয় লোক দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে, ইহাতে দ্রাবিড় জাতির লোকেরা যে বালুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। ভারতে নবাগত দ্রাবিড়গণের সহিত ব্যাবিলন অধিবাসী সুমেরীয় জাতির নিকট সম্পর্ক ছিল। ইহা হইতে পারে যে দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা ব্যাবিলন অধিকার করিয়া পরে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল এবং মধ্য এশিয়া অথবা উত্তর এশিয়া তাহাদের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।৫

১ India & a new Civilization by Dr. Rajani Kanta Das, Introduction. XVII 1

২ জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১১

৩ ঐ, ১২

৩ ঐ, ১৪

৫ বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩

মহেঞ্জোদাড়োতে ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্বেকার যে সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই দ্রাবিড় সভ্যতা। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রীর সহিত সুমেরীয় জাতির প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রীর সাদৃশ্য ও ঐক্য পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন। মহেঞ্জোদাড়োতে দ্রাবিড় সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে এই সুসভ্য দ্রাবিড়গণ এক সুসমৃদ্ধ সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতবাসী দ্রাবিড়গণের এই সুপ্রাচীন সভ্যতা আর্য সভ্যতা অপেক্ষা যে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না, এবং পরবর্তী আর্যসৃষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতির উপর দ্রাবিড় সংস্কৃতি যে অপরিসীম, অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা আধুনিক আবিষ্কার ও গবেষণা-সমূহ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। দ্রাবিড় এবং আর্য—এই দুই প্রধান সংস্কৃতি সংগত হইয়া ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির জন্ম দান করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দু তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষী লোকেদের মধ্যে এখনও দ্রাবিড় ভাষা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে অসংখ্য দ্রাবিড় শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, এবং বাক্য গঠনপ্রণালী মূর্ধন্য বর্ণের ব্যবহার, বহুবচন জ্ঞাপক প্রত্যয়, ছন্দশাস্ত্র, শব্দের বিকৃতি ও রূপান্তর (যথা বাঙ্গালায় শব্দের আদিসংযুক্ত অক্ষরের বিশ্লেষ) প্রভৃতি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের উপর দ্রাবিড় প্রভাব বিদ্যমান। দ্রাবিড়দের অনেক দেব-দেবী আর্য ধর্ম ও সমাজের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, এবং সেই সব দেব-দেবী ভারতীয় হিন্দুগণের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজিত হইতেছে। হিন্দুর উপাস্য দেবতা শিব খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড় দেবতা। এই শিব অনার্য দ্রাবিড়দের মধ্যে সম্ভবতঃ ভৈরব কিংবা অনুরূপ কোনো নামে পরিচিত ছিলেন। বৈদিক রুদ্র প্রথমে প্রচণ্ড ও ভয়ানক দেবতা রূপে পূজিত হইতেন এবং পরে শঙ্কর ও মঙ্গলময় দেবতা রুদ্র শিবরূপে আর্যদের কাছে পূজা পাইতে থাকেন।৬ তেমনি অনার্য দ্রাবিড় শিব ভয়ংকর অথচ কল্যাণময় দেবতা রূপে তাঁহার অনার্য ভক্তদের দ্বারা পূজিত হইতেন।৭ কালক্রমে দ্রাবিড় শিব আর্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন এবং বৈদিক রুদ্রের সহিত একীভূত হইয়া যান। এখনও দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়দিগের মধ্যে শিবোপাসনা বহুলভাবে প্রচলিত। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে দেখা যায় যে আর্যদ্বেষী রাক্ষসগণ (দ্রাবিড়) সকলেই শিবকে আরাধ্য দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। রাবণ প্রভৃতি অনার্য শিবোপাসক। দক্ষযজ্ঞের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই অনার্য দেবতা শিব আর্য দেবতাদের সংগে নিমন্ত্রণ পান নাই, ইহাতে মনে হয় শিব বহুদিন পর্যন্ত আর্যসমাজে অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন। লিংগ পূজাও আর্যেরা দ্রাবিড়দের কাছ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়গণ শিবকে লিংগরূপে পূজা করিতেন এবং এই লিংগ-শিব কালক্রমে আর্য দেবতা হইয়া যান৮। পর্বত নন্দিনী উমা অথবা পার্বতীও যে দ্রাবিড় দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবাসী ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা করিয়া থাকে, এবং স্বদেশকেও মাতৃরূপে কল্পনা করে, ইহা নিঃসংশয় দ্রাবিড় প্রভাবের ফল। দ্রাবিড়গণের মধ্যে মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্রাবিড় পুরুষ গৃহের বাহিরেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিত, এবং সন্তানদিগের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সন্তানগণ মাতার সহিতই পরিচিত ছিল, এইভাবে তাহাদের মনের মধ্যে ভগবানের মাতৃভাব এবং দেশের মাতৃরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।৯ বিষ্ণু, শ্রী প্রভৃতি দেবতাও সম্ভবতঃ দ্রাবিড়দের ধর্ম হইতে আর্য ধর্মে স্থানলাভ করে। দ্রাবিড়দের গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা ও সম্পত্তির স্বত্ব স্থাপন বিষয়সমূহ আর্যদের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই যে রামচন্দ্র রাবণের কাছে রাজনীতি শিক্ষা করিতেছেন, ইহাতে অনুমান হয় যে দ্রাবিড়গণ রাজনীতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়গণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে যে কত উন্নত ছিলেন তাহা মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ হইতে জানা গিয়াছে। আর্যগণ ভারতে আগমন করিয়া দ্রাবিড় অধ্যুষিত ভারতের অধিকাংশ বলের দ্বারা দখল করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু বিজিত জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নানাভাবে বিজেতৃগণের মধ্যে অলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিল, এবং এই আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিশ্রিত হইয়া ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল।

দ্রাবিড়দিগের পর আর্যগণ এবং তারপর ভোট চীনাগণ (Tiboto chinese) ভারতে আগমন করে। ভোট চীনাগণ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মাঝামাঝি তিব্বতের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকটা দল উত্তর ও পূর্ববংগে বসবাস স্থাপন করে।১০। পূর্ববংগবাসী বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম-বাসিদিগের মধ্যে ভোটচীন ভাষার প্রভাব অনুমিত হয়। ভোট-চীন জাতির সহিত ভারতস্থিত অন্যান্য জাতিগুলির সংমিশ্রণ হইয়াছিল এবং তাই ভোটচীন জাতির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কোন কোন স্থলের জনগণের মধ্যে লক্ষিত হয়। ভারতীয়দিগের উপর ভোটচীন জাতির প্রভাব বিশেষ ব্যাপক নহে।

আর্যগণ কোন সময়ে ভারতে আগমন করেন সেই সম্বন্ধে নানা মত আছে, তবে আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে ভারতে প্রবেশ করেন, আর্যগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তবে আর্যদের কোন কোন দল যে পারস্য উপসাগর দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশে এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন এবং আর্যবংশীয় নরপতিগণ ৬০০ বৎসর ধরিয়া সেখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।১১। সেখানে তাঁহারা আসীরীয় ও ব্যাবিলনীয় জাতির

৬ Vaisnavism, Saivism & minor religions by R. G. Bhandarker p. 102

৭ Indian Thism by N, Macnicol, p, 161

৮ Vaisnavism, Saivism & minor religions systems

৯ Aryan rule in India by E. B. Havell, p. 12

১০ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮

সংস্পর্শে আসেন। ভারতে আগমন করিবার পূর্বে তাঁহারা পারস্য দেশে উপনিবিষ্ট হন এবং সেই দেশের সংস্কৃতি বহন করিয়া আনেন। ভারতে আগমন করিয়া তাঁহারা অনার্য অধিবাসিদিগের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করেন। পরাজিত দ্রাবিড়গণ পশ্চাদপসরণ করিয়া বিন্ধ্য পর্বতের অন্তরালে দাক্ষিণাত্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অব্যাহত রাখে। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দী হইতে ৫০০ শতাব্দী পর্যন্ত এই ১০০০ বৎসরের মধ্যে আর্য সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র উত্তর ভারতে নহে, আর্যগণ বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামায়ণের কাহিনী আর্যগণের দাক্ষিণাত্য গমনের সর্বপ্রাচীন দৃষ্টান্ত স্থল।১২। এক হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসমূহের অন্যতম—ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল এবং অধিকাংশ অনার্যগণ আর্যীকৃত হইয়া এই সংস্কৃতি অবলম্বন করিল; অবশ্য আর্যসমাজের মধ্যে অনার্যগণ বহুল পরিমাণে আপনাদের সংস্কৃতি প্রবেশ করাইয়া দিল ইহা সহজেই অনুমেয়। ইন্দো ইউরোপীয় মূলান্তর্গত বৈদিক ভাষা আর্যদের কৃষ্টির বাহন ছিল। এই ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহারা বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচনা করেন। এই বৈদিক ভাষা সম্ভবতঃ অবিকৃতরূপে খৃষ্টপূর্ব ৭০০ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বৈদিক আর্যগণ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, বৈদিক দেবদেবীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশ এবং তন্মধ্যে কুড়ি জন সাধারণতঃ অর্চিত হইতেন, উপনিষদের ধর্ম্ম পরব্রহ্মতত্বের মধ্যে আমরা ভারতীয় জ্ঞানমার্গীয় ধর্মের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করিতে পাই। চতুর্বর্ণ বিভাগ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর আর্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। গুণ এবং কর্মমূলক বর্ণবিভাগ শুধু যে ভারতীয় আর্যগণের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে। অনুরূপ জাতিবিভাগ জরথুস্ত্রীয়, ব্যবীলনীয়, মিশরীয়, টিউটনীয় জাতিদিগের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩

আর্য ক্ষত্রিয়দের শৌর্য ও বীর্যের গৌরবান্বিত কাহিনী আমরা রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যে দেখিতে পাই। রামায়ণে সূর্যবংশীয় ও মহাভারতে সোম অথবা চন্দ্রবংশীয় বীরদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। রামায়ণের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু-সূর্য এবং মহাভারতের উপাস্য দেবতা শিব পরবর্তী ভারতীয় ধর্মে সর্বপ্রধান দেবতারূপে পরিগণিত হন। ১৪

এক হাজার বৎসর ধরিয়া আর্যসংস্কৃতি ও ধর্ম প্রবল প্রভাবে ভারতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারপর সেই প্রভাব ক্ষীয়মান হইয়া আসিল। আর্যসভ্যতা ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রান্তদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, এবং বিশাল অনার্য সমাজ আর্যীকৃত হইয়া আর্যসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনার্যগণ আর্যসমাজের মধ্যে প্রবেশ করাতে আর্যগণ আর তাঁহাদের বিশুদ্ধ স্বাতন্ত্র্য এবং অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্রসর আর্য সভ্যতা সেই সময় বাঙ্গালার সীমা পর্যন্ত পৌছিল তখন তাহার মধ্য হইতে প্রভাবশালী চলৎশক্তি অবসিত হইল। মিথিলায় ব্রাহ্মণ প্রাধান্য লুপ্ত হইল এবং ক্ষত্রিয় প্রভাব স্বীকৃত হইল। ১৫ আর্য এবং অনার্যের যুগ্ম সংস্কৃতির বাহক ক্ষত্রিয় সমাজোদ্ভূত গৌতম বুদ্ধ বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নব ধর্মের প্রবর্তন করেন, এই বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি এক অখণ্ড এবং সমগ্র রূপ-বিগ্রহ করে। বুদ্ধ কোন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা অভিনব মতবাদ প্রচার করেন নাই, তাঁহার ধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উপাদান পূর্ববর্তী সাংখ্য দর্শন এবং উপনিষদগুলি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। (আগামীবারে সমাপ্য)

১২ Ibid, p. 42

১৩ Indian culture one & Indivisible by Dr. Bhupendra Nath Dutta (Hindusthan Standard, Puja number, 1942)

১৪ Aryan rule in India by E. B Havell, p. 41

১৫ India through the ages by Sir Jadunath Sarcar, p. 25

রুল-অফ্-থ্রী

শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত

ছুটির দিন। বেলা তখন এগারোটা হইবে। কাজের তাড়া নাই। অলস পদচারণায় বাড়ী ফিরিতেছি। বাড়ীর কাছে আসিয়া মোড় ঘুরিতেই বেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিলাম। বিশ-ফুট রাস্তায় ডবল-লাইন দিয়া মোটর-ট্যাক্সি-রিক্স-কেটিং অন্ততঃ দশ-বারোটা দাঁড়াইয়া আছে। লোকজনও নেহাৎ তুচ্ছ করিবার মত নয়। মেয়ে পুরুষে আট দশজন গোল হইয়া ফুটপাথে জটলা করিতেছে। হাসির উচ্ছ্বাস ও কলরোলে স্থানটি বেশ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। দু'তিন চ্যাঙ্গারী খাবার লইয়া চাকরও শশব্যস্তে প্রবেশ করিল। কী ব্যাপার! পাশের বাড়ীতেই সমারোহ অথচ তাহার বিন্দুবিসর্গ আঁচ পাইলাম না। অবশ্য পারিবারিক কিছু হইলেই যে পাড়াশুদ্ধ জানাইতে হইবে শাস্ত্রে এমন কিছু কথা লিখা দেওয়া নাই। তবু কৌতূহল হইল।

ঘরে ঢুকিয়া জামা ছাড়িতেছি। সেখানেও দেখি কৌতূহল আনাচে কানাচে উপচাইয়া পড়িতেছে। ছোটরা নাগাল পায় না; চৌকী-বাক্স-পেটরা যে যাহা পাইয়াছে তাহারই উপর উঠিয়া জানালার পর্দার উপর দিয়া উঁকী দিতেছে। বড়দের তো কথাই নাই। ছোটদের উপর হুমড়ী খাইয়া একাগ্রচিত্তে জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে।

"কী হয়েছে? দেখছ কি সব?"

কারো সাড়া নাই। কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া মুখ ফিরাইলেন বটে, কিন্তু সকলেই যেন মন্ত্র-মুগ্ধ, বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছে। একবার তাকাইয়াই যন্ত্রচালিতের মত আবার যে যাহার কাজে ডুবিয়া গেলেন।

অবশ্য মেয়েদের স্বভাবই এই। রাস্তায় একটা ফেরীওয়ালা

চীৎকার করিলেও যতটা চাঞ্চল্য, আবার কিছু না থাকিলেও হঠাৎ একটা গাড়ীর আওয়াজ পাইলেও সমান অস্থিরতা। 'কে গেলো', 'কাদের বাড়ীতে এলো' সমস্ত প্রশ্নগুলো যেন পোকার মত কিলবিল করিয়া ওঠে, হুড়মুড় করিয়া সবকাজ অবহেলা করিয়া আগে দেখা চাই-ই। বুঝিলাম এ তন্ময়তা সহজে ভাঙিবে না। বিনা বাক্যব্যয়ে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

বাহিরে আসিতেই, "শুনেচেন তো সব?"

প্রশ্ন করেন গজেনবাবু—"একা থাকার নানান ঝঞ্ঝাট, গিয়েছিলাম মার্কেটে, ফিরে দেখি এই। তা যাক্; সকলেই বলছে জানানো দরকার। তারপর, হ্যাঁ ঠিক কথা, আপনার নতুন হিন্দী রেকর্ডগুলো দিন তো দয়া করে একবার।" রেকর্ডগুলো বগলদাবা করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, আবার দু'এক পা পিছু হাটিয়া কিঞ্চিৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন, "একটু পরে আসছি, একটু কাজ আছে।"

গজেনবাবুকে আমরা এতকাল দেখিয়াই আসিতেছিলাম। শুনিবার অবকাশ হয় নাই। এখন দেখিলাম তড়বড় করিয়া বলিতে পারেন—যেটা না জানিলেও চলে এবং কিছু বুঝিবার আগেই চট্ করিয়া তিনি সরিয়া পড়েন, ভাবেন অনেক কিছুই বলা হইল। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। মেলা-মেশা বা পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখা তাঁহার বড় প্রয়োজন হয় না। সকালে পড়েন খবরের কাগজ, দুপুরে যান আপিস, আর সন্ধ্যায় একটু হাওয়া খান। সাংসারিক ভাবনাও তাঁহাকে খুব কমই ভাবিতে হয়। কেনা-কাটা যাহা কিছু ফেরীওয়ালা মারফৎ তাঁর স্ত্রীকেই ব্যবস্থা করিতে দেখি।

পাশের বাড়ীর মালিক এই গজেনবাবুই। সংসারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী। লোকজন বলিতে ঠাকুর ও চাকর। প্রত্যহই স্বামী-স্ত্রীতে বেড়াইতে যান সকাল-সন্ধ্যায়। ছুটির দিন গাড়ীতে, অন্যদিন পদব্রজে।

বেলা গড়াইয়া চলিয়াছে। স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

"চান কর্ত্তে যাচ্ছেন নাকি?" পিছন ফিরিয়া দেখি ললিতবাবু—"দেখেচেন তো একবার আক্কেলখানা!"

"আজ্ঞে।"—

"গজেনবাবুর কথা বলছি।" ললিতবাবু গজরান্।

"কি হয়েছে?" ভাবি ললিতবাবু হয়তো কিছু জানেন।

"আরে মশাই, আমরা পাড়ার পাঁচজনে জানতে পারলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো? প্রমোশান হয়েছে চাকরীতে। আত্মীয়-স্বজন আনন্দ করবে সে আর এমন কথা কি?"

"তাই নাকি, আপনি জানলেন কোত্থেকে? তা বেশ তো এমন একটা সুখবর যদি উনি লুকিয়েই রাখেন, চলুন না কেন, আমরাই কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্ জানিয়ে আসি।"

"রামোচন্দ্রো! ললিতবাবু সে শর্ম্মাই নয়। নিজে এসে যেচে বলে যাবে, সামাজিকতা ছেলেখেলা নয় মশাই।"

ললিতবাবুর নিকট কোন খবরই চাপা থাকিবার উপায় নাই। বিশেষ করিয়া তাহা যদি আবার নিমন্ত্রণ-সংক্রান্ত কিংবা পরের দুর্দ্দশার কাহিনী হয়, তাহা হইলে আর কথাই নাই। নিজে বকিবেন, অপরকেও বকাইবেন।

বলিলাম, "বেলা হলো অনেক, স্নানাহার…"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল। তা' ওবেলাই হবে'খন।" একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। মনে মনে ঠিক করিলাম, দুপুরবেলায়ই বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, নহিলে আর নিস্তার নাই। জোঁকের মত ললিতবাবু আসিয়া চাপিয়া বসিবে।

ও বাড়ীতে উৎসব পুরোদমে চলিয়াছে। হাসির হর্‌রা—গ্রামোফোনের চীৎকার—কান কাটিয়া যাইবার দাখিল। ভাবিলাম আছে বেশ। আসন্ন সৌভাগ্য ও আনন্দের আতিশয্যে দিব্যি হাবুডুবু খাইতেছে।

খাইতে বসিয়া শুনিলাম, ওদের বাড়ীতে আজ অনেকেই আসিয়াছে। এই কথাটি সাব্যস্ত করিতে এতগুলি মাথা এবং এতখানি সময় লাগিবে ভাবিলেও পুলক সঞ্চার হয়! গজেনবাবুর মাসীমা, দুই পিসী, শ্বশুরবাড়ীর কেহই নাকি বাকী নাই। সকলে নাকি প্রথমে এক কথাই বলিতেছে, "সেকি, কি হবে?"

বাস্তবিক আমরাও কম উদ্বিগ্ন নহি। মনে হইতেছে একটা কি যেন ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কী তাহা কে জানে!

দিবা নিদ্রায় অভ্যস্ত নহি। তবু কেন জানি না ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গিল বেলা প্রায় পাঁচটা, বাহিরে প্রচণ্ড কড়া-নাড়ার আওয়াজ। ললিতবাবু না কি! বলিহারী ভদ্রলোকের আক্কেলকে। গজেনবাবুর উপর তাঁহার রোখ—কিন্তু তাহার ফলভোগ করিতে আমরা হতভাগ্যের দল। দুনিয়ার সকলকেই যেন তাঁর পরামর্শ ও অনুমতি লইয়া চলিতে হইবে। নতুবা সকলেই "মুখ্যু, বোকা, পাজির পাঝাড়া।" কী মুস্কিলেই পড়া গেল। দরজা না খুলিয়াও উপায় নাই।—আরে, এ যে গজেনবাবু!

"কী খবর?"

"একটু টেলিফোন কর্ব্বো।"

"বেশ তো, আসুন।" তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসি।

"দেখুন আজ সন্ধ্যেবেলায় যাবেন কিন্তু। একটু ইয়ে—মানে, দু' পাঁচজন আসবে।"

"কোথায়? আপনার বাড়ী, ব্যাপারটা কী?"

"মানে, এরকমটিতো বড় হয় না। সকলেরই সমাবেশ হয়েছে। তাই একটু গান-বাজনা…।" সৌজন্যের হাসি অর্থাৎ একটু মুচ্‌কী হাসিলেন।

"সাউথ ১৭৮৯। হ্যাঁ সন্ধ্যের দিকে আজ একবার এসো। ক্ষতি?……না, মানে চাক্ষুষ পরিচয় করা দরকার। কার কাছে শুনলে এরি মধ্যে?…আচ্ছা ভুলোনা।" রিসিভার নামিয়ে আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে বলেন—"কী সব হলো বলুন দেখি? বিশ্বাস যদি না রাখতে পারে …দোষ দিচ্ছে আমাকেই। আপনিই বলুন সন্দেহের বিষ নিয়ে মানুষ বাঁচে কি করে?"

"তাতো ঠিকই—আদ্যোপান্ত কিছু না জানিয়াই সায় দিই। জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু আপনার ঠিক কি হয়েছে…?"

বাধা দিয়া বলেন, "সকালবেলা বেড়িয়ে এসেই দেখি এই—। চাকরটাও গেছে দোকানে। আপনিও তখন বাড়ী ছিলেন না। আমার ভায়ে যতীন—উকীল আলিপুর কোর্টের। আমাদের চেয়ে বোঝে ভাল। দেলুম তার কাছে। তারাও বল্লে 'তোমার সঙ্গে যাবো'। নিলাম তাকেও। রাস্তায় মেজোবোন 'বীনা'র

বাড়ী পড়ে। আমিও ভাবছিলাম, যতীনও ঠিক সময়ে বলে উঠ্‌ল—'মামীমা একবার ডেকেছিলেন, একবার নেবে যাই।' সেখান থেকে মীনা আর তার মেয়ে দু'জনেই আসতে চাইলে। তাদের আসতে বল্লাম ট্যাক্সি ক'রে। জানেন তো ওদের আবার গান-বাজনার ভয়ানক বাতিক। তাই আসবার সময় মাসীমার ছেলে মেয়েদের আসতে বল্লাম—ওরা গান-বাজনায় ওস্তাদ। ফিরে দেখি হারাধনটা ফিরেছে। সে আবার ইতিমধ্যে আমাদের আস্‌তে দেরী দেখে সোজা চলে গিয়েছিল নগেনের কাছে। নগেন কাছেই থাকে—ও আবার দূরসম্পর্কের—মানে, শ্বশুরবাড়ীর দিক থেকে একটা কি যেন হয়। সেও লোকজন সমেত এসে পড়েছে। তারপর থেকে তো আর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। তা'হলে নিশ্চয়ই যাবেন, আমি একটু বন্দোবস্ত করে রাখিগে এধারে...।" হঠাৎ হুস্ করিয়া উড়োন তুবড়ীর মত মিলাইয়া গেলেন।

ব্যাপারটা আরো জটিল হইয়া গেল। কি যে একগাদা বলিয়া গেলেন। কী যে আসলে ঘটিয়াছে ভাবিবার বিষয়। গজেনবাবুর কথার তোড়ে মাথাটা যেন আমার তকলীর মত ঘুরিতেছিল বন্ বন্ করিয়া। হঠাৎ তুলো গেল ছিঁড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে সব তালগোল পাকাইয়া একটা বীভৎস জটের সৃষ্টি করিল। সমস্যা আরো ঘোর করিয়া তুলিলেন অকস্মাৎ ললিতবাবু—

"কী বল্‌লে মশাই?" কোথায় ওৎ পাতিয়া ছিল, কে জানে? যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

"বিকেলের দিকে গানের আসর হবে তাই......"

"খবরদার যাবেন না মশাই; সদ্ভাব যদি রাখতে চান, তো ওদিক মাড়াবেন না!" সাবধান করিয়া দেন গম্ভীরভাবে।

আসলে বুঝিলাম কেন এ সতর্কবাণী। তাঁহাকে বলা হয় নাই, ত্রুটি এই। তবু জিজ্ঞাসা করি, যেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই—"কেন বলুন তো?"

"কেন?" কড়া হইতে যেন তেল ছিট্‌কাইয়া আসিল। মুখ শুকনো দেখে গোটা চারেক বড়ী পাঠিয়ে দিলাম। ফেরৎ দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, অসুখটা তার নয়, তার স্ত্রীর। আস্পর্দ্ধাটা দেখুন! পাঠিয়েছি যখন, ওষুধটা না খাইয়ে ফেরৎ দেবার মানে কি?"

"হুঁ" ছোট্ট একটু সায় দিই। কিই বা আর করিতে পারি। তবে মনে মনে ভাবিলাম, সব গণ্ডগোল চুকিয়া যাইত যদি ঔষধের নামটি পাঠাইয়া দিতেন। তারপর ঔষধ জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেও ললিতবাবুর আফশোষের কোন কারণ হইত না।

যাই হোক, একটা কথা অস্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ললিতবাবুর চিকিৎসা বড় সাফ। জানাশোনা, যে কয়জায়গায় চিকিৎসা করিয়াছেন, খুব তাড়াতাড়ি ফল হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক কোথাও কাটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। তবে কথাটা আমার নেহাৎ অবৈতনিক। তাই বেশী বলিতে সাহস হয় না। এইটুকু কেবল জানি, ওঁর বাড়ীর কাহারো অসুখ করিলে, ঔষধের বিধান দেন অন্য লোক, সে কথা উনি মুখে না প্রকাশ করিলেও আসলে অন্য ব্যবস্থাই চলে।

কি মনে হইল হঠাৎ, জানি না। অতি সহজেই নিষ্কৃতি দিয়া গেলেন, "আচ্ছা, যাচ্চেন যান, কি হয় 'আমায় জানাবেন।' মেজাজটা কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নই ঠেকিল বৈ কি!

আসর মন্দ হয় নাই। গান-বাজনার পর কিঞ্চিৎ জলযোগ দিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। গজেনবাবু খুবই ব্যস্ত। প্রথমে দেখিতেই পান নাই। হঠাৎ যেন হুঁস হইল—"এই যে এসেছেন! আপনার 'মেজারিং টেপ'টা একবার দিতে পারেন?"

গানের আসরে মাপিবার জন্য ফিতা! আশ্চর্য্য! বলিলেন, "আসুন না একবার।"

পাশের ঘরে সামনে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, "ওই"।

চাকর হারাধন ছিল পাশেই। বলিল, "অমন সুন্দর—আলমারী বাবু!"

বিস্ময়ে বলিলাম, "ভাঙল কি করে?"

গজেনবাবু যেন ধৈর্য্যের বাঁধ আর রাখিতে পারেন না—"তবে আর এতক্ষণ কি শুনলেন? ফিতে না হ'লে সাইজটা নোব কি করে! ডায়েরী কর্ত্তে হবে, ভাঙা জায়গাটার ডাইমেন্‌সান্ দিতে হবে!"

"ডায়েরী?"

"নিশ্চয়ই, আড়াই হাজার ক্যাশ, আপনি মনে করেন আমি চুপচাপ হজম করে যাবো?"

"চুরী হয়েছে তাহ'লে?" বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছই।

"সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ইয়ে? এত হৈ-চৈ, লোকজন—এ সমস্ত কেন তবে? আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না মশাই।"

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। বিরক্ত হইয়া সঙ্গে বলি, "তা চুরীর খবর বলবার অবকাশ পেলেন কৈ যে আমি শুনবো? হৈ-হৈ লোকজন, গান-বাজনা এই তো খালি শুনছি। যেন আকাশ থেকে পড়েন গজেনবাবু—সে কি কথা, বল্লাম না তখন হারাধন গিয়েছিল দোকানে, আমরা ছিলাম বাজারে, সেই অবসরে রাঁধুনী বামুনটা হয়েছে হাওয়া। সঙ্গে গেছে আড়াই হাজার ক্যাশ।"

এরপর বলিবার কিছুই নাই। ফিতা পাঠাইয়া দিই। চুরি হইলে ইহাদের মহোৎসব লাগিয়া যায় অতিথি সম্বর্দ্ধনায়; সারা দিন কাটিয়া যায়। রাত্রিবেলায় প্রয়োজন হয় ফিতার। আলমারী মাপিতে হইবে। নহিলে নাকি থানায় ডায়েরী করা চলিবে না। তাহা হইলে, ভগবান না করুন, কোনরূপ গুরুতর অঘটন ঘটিলে—কেহ যদি হঠাৎ মনে করুন ভবলীলা সাঙ্গই করেন, এদের মহোৎসব চলিবে ক'দিন? শেষকৃত্য সম্পন্নের জন্য একিসকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আনিতে হইবে কি?

অঙ্কটা বোধ হয় "ক্লল-অফ্-থ্রী"। ভাবনাটা বোধ হয় স-শব্দ হইয়াছিল! কেন না বন্ধা উত্তর দিল 'হ্যাঁ'। বন্ধা একটু একটু বুঝিতে শিখিয়াছে, ক্লাশ সিক্সে (বোধ-হয় পড়ে) আমি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করি—"কী"? বলিল, "হ্যাঁ, তিনটে আওয়াজই তো আমরা পেয়েছি—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, তিনটি শব্দ। তারপর নিস্তব্ধ। আলমারী ভাঙার আওয়াজ আমরা পেয়েছি।"

ললিতবাবু কি খবরটা শুনিয়াছেন?

কামবীজ ও রাসলীলা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ভাগবতে আছে—

"দৃষ্টা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমণনাভৃং নবকুঙ্কুমারুণম।
বনঞ্চতৎ কোমলাগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং
মনোহরম্ ।"১০।২৯।১

ব্রহ্মপুরাণে আছে—

"সহ রামেন মধুরম্ অতীব বনিতাপ্রিয়।
জগৌ কলপদং শৌবি নামতত্র কৃতব্রতম ।"১৬

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"সহ রামেন মধুরম অতীব বণিতা প্রিয়।
জগৌ কলপদং শৌবি নানাতন্ত্রী কৃতব্রতম ।"৫।১৩

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—

"চাকর তত্র কৌতুকাৎ বিনোদ মুরলীরবম।
গোপীনাং কামুকীনাঞ্চ কামোর্দ্ধনকারণম ।"

গীতগোবিন্দে আছে—

"সঞ্চরদধরসুধা মধুরধ্বনি মুখরিত মোহনবংশং।
বলিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলবতংসং।
রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং
স্মরতি মনোমথ কৃত পরিহাসং ।"২।৫।১

মুরারির করচায় আছে—

"অতস্তং পশ্য গোবিন্দো বংশীবট সমীপতঃ।
স্থিতো জগৌ কামবীজং গোপীজন বিমোহিতম্ ।১।৯

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন ।"২।৮।১০০

'কল' শব্দের অর্থ মধুর অথচ অস্ফুট স্বর (কলোতু মধুরাস্ফুটে—ইত্যমর্)। কিন্তু দেখা যাইতেছে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই কলশব্দ হাত বদলাইতে বদলাইতে ক্রমে কামবীজে পরিণত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ক, ল বামদৃক্ শব্দার্থ দীর্ঘ ঈকার, মনঃ শব্দের অর্থ চন্দ্র (অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু), ইহার দ্বারা কামবীজ ক্লীঁ ব্যক্ত হয়' (—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সারার্থ দর্শিনী টীকা)।

শ্রীধরস্বামী, জয়দেব, সনাতন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৈষ্ণব লেখকগণ রাসকে কামায়ন প্রচুর করিয়া বর্ণনা করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

আজ আমরা তাঁদের গতিপথের দিগদর্শন করিতে চাই।

কয়েকটি তারিখ মনে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া যাক। তাহাতে বুঝা যাইবে কাহার পর কে আসিলেন।

অশ্বলায়ন খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে (বুলার)। ভারত ও মহা-ভারতের সংবাদ অশ্বলায়নের মার্ফৎ পাওয়া যায়। মোটামুটি হিসাবে তারপর দেড় হাজার বৎসর 'পুরাণ' যুগ। তখন পুরাণের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য পাইয়া থাকি[২]। ইহার পর গীতগোবিন্দ। জয়দেব ১২শ শতকের প্রথম পাদে ইহা লেখেন[৩]। তাহার পর ৩০০ বৎসরের বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। একেবার আসিয়া পড়ি চৈতন্যযুগে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্য দেবের প্রথম চরিতকার। তিনি তাঁহার করচা গ্রন্থ সমাধা করেন ১৫২০ খ্রীঃ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত প্রকাশের তারিখ ১৬১৫ খ্রীঃ। বিশ্বনাথ তাঁর রচনা শেষ করেন ১৭০৪ খ্রীঃ।

তারিখগুলি আনুমানিক। প্রায় সবগুলিই 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থ হইতে নিয়াছি। তারিখগুলি সংশোধন সাপেক্ষ।

দিগদর্শনের পথে প্রথমেই চোখে পড়ে মহাভারত। ভারতের লেখক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। তিনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। ২৪০০০ শ্লোকে তিনি ভারত সংহিতা লেখেন। ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন ঐ ভারত-সংহিতা অর্জ্জুন পুত্র জন্মেজয়ের সর্পসত্রে বর্ণনা করেন। উগ্রশ্রবা-সৌতি ঐ ভারত-সংহিতা দেখিয়া লক্ষ শ্লোকে তাঁর মহাভারত গ্রন্থ লেখেন। এখন তাহাতে বহু কিছু যোগাযোগ করিয়া নব সংস্করণের মহাভারত আমাদের হাতে দেওয়া হইতেছে।

ভারত ও মহাভরত—দুইখানিই অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র হইতে জানিতে পারা যায়—"সুমন্ত জৈমিনি বৈশম্পায়ন পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যা যে চান্তে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু" (—অশ্বগৃহ্য সূত্র ৩।৪)।

মহাভারতের পরিশিষ্ট (খিল পর্ব্ব) হরিবংশ। ইহা কে ও

---

(১) শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বলেন, মুরারি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুসরণ করিলে 'জগৌ কলপদং' লিখিতেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত (অমৃতবাজার কার্য্যালয়ে ছাপা) করচায় 'জগৌ কামবীজং' আছে। এই নূতন সংস্করণ করচাখানি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মুরারির অনেক দিন পরে তাঁর টীকায় জগৌ কামবীজং-এর অভিনব ব্যাখ্যা করেন (—শান্তি পত্রিকায় 'মুরারির করচায় রাস' প্রবন্ধ—১৩৫১।তার)।

(২) জয়দেবের পূর্ব্বেও বাঙলায় বৈষ্ণবধর্ম্মের খোঁজ পাওয়া যায়। ৯ম হইতে ১২শ খ্রীঃ মধ্যে প্রাদেশিক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত অনেক বৈষ্ণব কবিতা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া কর্ণদেবের বীরভূম পাইকোড় গ্রামের শিলালিপি প্রমাণ করে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। যদিও মৎস্য মাংসে গোপালের ভোগ হয়। তুলসী পাতায় শিবপূজা হয়। চৌপতি ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ভোগবর্ম্মদেবের চেলাবলিপি—গোপীঃ গোপীশত কেলীকার—প্রমাণ করে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে সংগৃহীত শ্লোক রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক। সুতরাং তিনি বৈষ্ণব ছিলেন।

(৩) জয়দেবের তারিখ ঠিক নাই। বৈষ্ণবদিগদর্শনী মতে জয়দেবের জন্ম ১১০০-৩০ খ্রীঃ মধ্যে। চারু বন্দোপাধ্যায় বলেন গীতগোবিন্দ লেখা হয় ১১৫৯ খ্রীঃ। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ১১০৯-১১২১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। সুতরাং ১১২১ খ্রীঃ মধ্যে গীতগোবিন্দ রচনা হয়।

কবে রচনা করেন তাহার প্রমাণ নাই। হরিবংশে যাদবগণের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

ব্যাসদেব সেকালের গল্প, গাথা, আখ্যান, উপাখ্যানগুলি সংগ্রহ করেন। সেই সঙ্কলনের নাম পুরাণ-সংহিতা। তাহার সঙ্গে তাঁর তিন জন শিষ্যের সংগৃহীত তিনখানি উপসংহিতা যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত হইল (—বিষ্ণুপুরাণ)। এই সব পুরাণ মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহাভারতে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে গোপীজন-প্রিয় বলিয়াছেন। কিন্তু রাস বা গোপীসঙ্গমের কথা মহাভারতে নাই। 'ভারত' লেখক তাহা বলেন নাই। বলিলে তাহা মহাভারতে থাকিত। ইহা পরের কল্পনা। পরের কল্পনা বলিয়াই মহাভারতের-পরিশিষ্ট বলিয়া প্রচারিত হরিবংশে তাহা আসিয়াছে।

হরিবংশে আছে হল্লীশ ক্রীড়নের কথা (২০শ অধ্যায়ে)। গোপীদের নিয়া বেড়ানাচ বা মণ্ডল নৃত্যকে হল্লীশ বলা হইয়াছে। শারদীয়া রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের রমন বাসনা হইল। যুবতী গোপ-কন্যারা মণ্ডলীবদ্ধ হইল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে আকুল করিল। শেষে তাহারাও রতিশ্রমে ক্লান্ত হইল।—এতকাণ্ড হইলেও রাধার নামগন্ধ এখানে নাই।

ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে প্রায় অবিকল এক শ্লোকে রাস বর্ণনা আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে একটি অতিরিক্ত চিত্র আছে। তাহাতে এই কামপর্ব্ব গাঢ় হইয়াছে।

রাসারম্ভরসোৎসুক শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিয়া শরচ্চন্দ্র মনোরম রাত্রিকালের মান রক্ষা করিয়াছিলেন (—ব্রহ্ম ২১ ও বিষ্ণু ২৩)। রাস ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ একবার চলিয়া যান (—হরিবংশে নাই, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে আছে)। গোপীরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতে বাহির হইল। তাহারা এক বনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নের সহিত এক রমণীর—কৃতপুণ্যা মদালসার—পায়ের দাগ দেখিল (—বিষ্ণুপুরাণ)।

বিষ্ণুপুরাণের মুন্সিয়ানার বাহাদুরী আছে! কামপীড়ায় উন্মত্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগের সঙ্গে আর এক রমণীর পায়ের দাগ দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল।—এই ঘটনাটি বিষ্ণুপুরাণের নূতন উদ্ভাবনা।

বিষ্ণুপুরাণের এই অতিরিক্ত চিত্রটি ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে কল্পনার রঙীণ তুলিকাপাতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

ভাগবতে আছে গোপীরা এই রমণীটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তাহারা সকলে যমুনা পুলিনে আসিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিল (—ভাগবতে গোপী-গীত); তারপর শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের নিয়া রাস। ভাগবতের রাস অতিশয় কামায়ন।

হরিবংশে রাধা নাই। ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে রাধা নাই। ভাগবতে শুধু আছে—"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বর"। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাধা আসিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে—"চকার তত্র কৌতুকাৎ বিনোদ মুরলীরবম।" তারপর রতিযুদ্ধ হইল। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই আছে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ হইল। ব্রহ্মা এই বিবাহ দিলেন।

পদ্মপুরাণে রাধা চাপল্যহীন।

পুরাণ যুগের বহু পরে জয়দেব আসিলেন। তিনি তাঁর আদর্শ বাছিয়া নিলেন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে—"মেঘাবৃত নভো দৃষ্টা শ্যামলং কাননান্তরং, ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম"—এরূপ দুর্যোগ (—ব্র°বৈ° ১৫।৪)। তখন শিশু কৃষ্ণকে নিয়া রাধা যশোদার কাছে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ শিশুকৃষ্ণ নবকিশোর হইয়া গেলেন। তারপর—রহঃ কেলয়। শেষে যশোদার কাছে কৃষ্ণকে রাধা যখন ফেরৎ দিলেন তখন কৃষ্ণ শিশু হইয়া গিয়াছেন—জয়দেব এই আখ্যানটিই নিয়াছেন।

আমাদের পূর্ব্বগামীগণ পুরাণের অতিশয়োক্তি প্রভৃতি প্রতিবাদ করিবার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এখন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ঐ সব কথা সমালোচনা করিলে অপাঙক্তেয় হইবার ভয় কমিয়া গিয়াছে।

সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই চোখে পড়ে হরিবংশের উদ্ভব বিবরণ। হরিবংশ নাকি ব্যাসদেবেরই রচিত নয়! কত দিন গেল অথচ হরিবংশ কাহার রচনা তাহা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিল। সকলেরই ধারণা মহাভারতের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া ইহা চালানো হইতেছে। অথচ কৃষ্ণচরিত প্রথম জানান এই হরিবংশ।

তারপরেই চোখে পড়ে কি প্রকারে ঋকবেদের ইন্দ্রচরিত হরিবংশ কৃষ্ণচরিতে আরোপ করিয়াছেন। এইভাবে ইন্দ্রের সব কিছু অলৌকিকতা কৃষ্ণের উপর চাপাইবার কি প্রয়োজন হয়? প্রয়োজন হইয়াছিল নিশ্চয়। আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি। যুক্তি দ্বারা সে সব অনুমান দৃঢ় হয় কিনা দেখা যাক।

কৃষ্ণ আসার সময়েও লোকের ধারণা ছিল ইন্দ্র দেবতার রাজা। ইন্দ্র বৃষ্টি দেন তাই কৃষি হয়—লোক ছিল কৃষিজীবী। তাই ইন্দ্রযজ্ঞই ছিল সেকালে প্রধান যজ্ঞ, আর ইন্দ্রচরিতই ছিল আদর্শ চরিত। সেই ছাঁচেই হরিবংশ কৃষ্ণচরিত গড়িলেন। পূর্ব্বের কোনো বড় লোকের নাম পরের উদীয়মান লোকের নামের সঙ্গে জুড়িয়া তুলনা করা, আগেও ছিল এখনো আছে। যেমন শঙ্করাচার্য্য শিবের অবতার, চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার, রামকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার প্রভৃতি। এ সব বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ স্বীকার করা হয় যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো মহৎলোকের মতো একজন। কিন্তু কৃষ্ণের বেলায় তাহা করা তো হয়ই নাই, বরং অন্য কিছু করা হইয়াছে। হুবহু ইন্দ্রচরিত্রের আদর্শে কৃষ্ণচরিত রচনা করিয়াও কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তনকারীগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ইন্দ্রের দর্প—ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা চূর্ণ করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। এজন্য কৃষ্ণের নাম হইল শক্রেশ। শক্র ইন্দ্রের নাম। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে বিজয় করিলেন তাই নাম হইল শক্রেশ। এ কথা পরে বলিতেছি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৫১২ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে হয় (—হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা)। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে মহাভারত লেখা হইয়া থাকিলে কৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় এগারশত বৎসর পরে হরিবংশ প্রকাশ হয়। কোনো ব্যক্তিকেই এগার শত বৎসরের চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব নয়, কৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে তো নয়ই।

ঋকের ইন্দ্র কর্ত্তৃক শকটভঙ্গ, পুতনাবধ, কালীয় দমন, পর্ব্বত ধারণ প্রভৃতি হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় উৎসব, দেহমধ্যে বিশ্ব

প্রদর্শন, বাণবিদ্ধ হওয়া, এমন-কি ৮ম গর্ভে হওয়ার কাহিনী পর্য্যন্ত হরিবংশ দ্বারা কৃষ্ণচরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। অবশ্য পারিপার্শ্বিক ঘটনার পরিবর্ত্তন করিয়া[৪]।

বাঙলার অন্যতম 'আদি বিদ্বান' ও শ্রেষ্ঠ মনীষী[৫] ভাগবত কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত ভগবত্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাও আমাদের জানা দরকার। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া তিনি ভাগবতের এই কথা বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার অভিমত এই যে—শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে স্থাপিত-গণ্ড গোপীর মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাম্বুল গ্রহণ করিতেছেন—ভাগবত-উক্ত এই সমস্ত সর্ব্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ বেদান্তের কোন শ্রুতি বা সূত্রের অর্থ হইতে পারে না এবং ব্যাসদেব অন্য সব পুরাণ রচনার পর তৃপ্তি না পাওয়ায় শ্রীভাগবত রচনা করেন, এইরূপ উক্তি সত্য হইতে পারে না[৬]। তাঁহার মতে ভাগবত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে যে ভাগবত্তা আরোপিত হইয়াছে তাহা মনু বিরোধী। মনুর বিপরীত বাক্য গ্রাহ্য নহে[৭]।

কৃষ্ণ আসিয়া ইন্দ্রকে উৎখাত করেন। কৃষ্ণ গোকুলে ইন্দ্র পূজার পরিবর্ত্তে গোপূজা ও গিরিপূজার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নিজেই গিরিধারী। সুতরাং তাঁহারই পূজা। তাহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া অতি বৃষ্টিতে গোপকুলকে বিপন্ন করেন। তখন কৃষ্ণ আসিয়া কোথাও পাথরের বাঁধ, কোথাও পর্ব্বত কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেন। গোপগণ রক্ষা পায় (—পুরাণ প্রবেশ পৃঃ ২৭৩)। পুরাণ কাহিনীর সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা কৃষ্ণলীলার অন্য সব ঘটনা জানেন। আমাদেরও তাহা জানা প্রয়োজন। পুরাণকারগণ আপন খুশিমতো কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছেন। এমন পুরাণও আছে যাহাতে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ (একটি কেশের সমান) বলা হইয়াছে (—বিষ্ণু পুরাণ)। তাহাতে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পরিচালনা, এমন কি পাণ্ডবের সঙ্গে সখ্যতার কথাও নাই। অথচ হিন্দুসমাজে

---

(৪) ইন্দ্রের দ্বারা শকটভঙ্গ (৪।৩৩।১০ ও ১০।৭৩।৬ ঋক)। ইন্দ্রের দ্বারা পুতনা বধ (৪।৩০।৮ ঋক) ইন্দ্রের দ্বারা অহিবধ (৮।৩৮।৪ ঋক)। ইন্দ্রের পর্ব্বতধারণ ও সঞ্চালন (২।১২।৯ ঋক)। ইন্দ্রের দধিক্ষীরপ্রিয়তা (৯।৬৮।৮ ঋক)। ইন্দ্র গোপতি (৪।৩০।২২ ঋক)—কৃষ্ণ গোপাল। ইন্দ্র দ্বারা অপহৃত গো উদ্ধার (৮।৩৬।২ ঋক)। ইন্দ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খধারক (ঋ ১।১০০।২ ঋক)—কৃষ্ণও পাঞ্চজন্যধারক। ইন্দ্র গরুৎমান (১।১৬৪।৪৬ ঋক)—কৃষ্ণও গরুৎমান। ইন্দ্রের চারি অর্দ্ধ্যদেহ (১০।৫৪।৪ ঋক)—কৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ। ইন্দ্র বাসব (১।৫৭।৩ ঋক)—কৃষ্ণ বাসুদেব। ইন্দ্র সূর্য্যাগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন (৪।২৮।২ ঋক)—কৃষ্ণ অগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন। ইন্দ্রও হরি (৮।৯।৪ ঋক)। ইন্দ্রও গোবিন্দ (১।১০৩।৬ ঋক)। ইন্দ্রকে 'বংশ' বানবিদ্ধ করে (৪।১৮।৯ ঋক)—কৃষ্ণকে 'জরা'ব্যাধ বাণবিদ্ধ করে। ইন্দ্র ৮ম গর্ভ মার্ত্তণ্ডত্যক্ত (১০।৭২।৮ ঋক)—কৃষ্ণ ৮ম গর্ভ মাতৃত্যক্ত। ইন্দ্রের কুক্ষিতে বিশ্ব লুকাইত (৩।৩২।১১ ঋক)—কৃষ্ণের উদরে বিশ্বভাণ্ড। ইন্দ্রবর্ত্ম সকলে অনুবর্ত্তন করে (১০।৫৯।১ ঋক)—কৃষ্ণের আচরিতবর্ত্ম ও সকলে অনুবর্ত্তন করে। ইন্দ্র কর্ম্মপদ্ধতি দেন সর্ব্বজীবার্থে (১।৪৯।১ ঋক)—কৃষ্ণ গীতায় উপদেশ দেন সর্ব্বজীব হিতে। ইন্দ্র দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন (৩।৪৬।২ ঋক)। ইন্দ্রসখা অর্জ্জুন কুৎস প্রধান যোদ্ধা (৫।২৯।৯ ঋক)—কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন প্রধান যোদ্ধা। মায়াবলে ইন্দ্র বহুরূপী হন (৬।৪৭।১৮ ঋক)। কার্ত্তিকী শারদ পূর্ণিমায় বৃত্রবধে উৎসব (২।১২।১২ ঋক)—কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কৃষ্ণের রাস।

—'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচরিত' প্রবন্ধ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি—প্রবর্ত্তক, আষাঢ় ১৩৪৮।

(৫) রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩ খ্রীঃ)।

(৬) রাজা রামমোহন বলিয়াছেন—অন্য সব পুরাণ রচনা করিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় ব্যাসদেব শ্রীভাগবত রচনা করেন—ইহা সত্য নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কোনো ঋষিবাক্য নাই। শ্রীভাগবতের পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশখানি পুরাণ ব্যাসদেব রচনা করেন। যথা শ্রীভাগবতে ১২ স্কন্ধে—

"ব্রহ্মাং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্ঠি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্বিংশতি শৈবকং।
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি॥"

বিষ্ণুপুরাণে—

"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা॥"

—ইত্যাদি বচন দ্বারা শ্রীভাগবত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ অপেক্ষা শ্রীভাগবতের প্রাধান্য উল্লেখ হয়। ইহা প্রশংসাসূচক উক্তি। তাহাতে অন্য পুরাণের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই। প্রায় সকল পুরাণের শেষে নিজ প্রাধান্যের কথা উল্লিখিত আছে। এইভাবে গীতায় বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব, চণ্ডীতে দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব, মহেশ্বর গীতায় শিবের শ্রেষ্ঠত্ব, বৃহদারণ্যকে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশ্নোপনিষৎএ প্রাণবায়ুর শ্রেষ্ঠত্ব, গরুড় মাহাত্ম্যে (আদি পর্ব্বে) গরুড়ের শ্রেষ্ঠত্ব—এ সকলই প্রশংসাসূচক। গৌতম কনাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দর্শনকারগণ ব্যাসদেবের সমকালীন। আপনি দর্শনের ভাষ্য নিজে কেহ করেন নাই। অন্যান্য আচার্য্যেরা করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নিশ্চয় ব্যাসদেব নিজে করেন নাই। ভাষ্যকারেরা বেদান্তমতকে অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভাগবতে যিনি প্রতিপাদ্য তাঁহার পরিমিত রূপ, তিনি সরকার গোপীজন-বল্লভ। তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য এমন কেহ উল্লেখ করেন না। বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান মনু সেই অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মনুর বিপরীত বাক্য গ্রাহ্য নহে। ভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে। মনুর মতে বিষ্ণু মনুষ্যের এক অঙ্গের অধিষ্ঠাতা। মনের অধিষ্ঠাত্রী চন্দ্র, কর্ণের—দিক, পদের—বিষ্ণু, মলের—শিব, বাক্যের—অগ্নি, গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা—মিত্র, ইত্যাদি।… শ্রীভাগবত যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে ইহা যুক্তির দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ভাগবতের দধিদুগ্ধ চুরি করিয়া খাওয়া, না পাইলে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা ইত্যাদি (১০।৮।২২ ভাগ°), গৃহমধ্যে মলমূত্রাদি ত্যাগ (১০।৮।২৪ ভাগ°), গোপীদের বস্ত্রহরণ (১০।২২।১২ ভাগ°), শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে স্থাপিত গণ্ড, গোপীর মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুল গ্রহণ (১০।৩০।১৪ ভাগ°)—এই সকল সর্ব্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ তাহা বিজ্ঞব্যক্তিরা পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন বিবেচনা করিয়া দেখেন না?

—রাজা রামমোহন রায়ের 'পণ্ডিতগণের সহিত বিচার' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষের মর্ম।

(৭) শ্রুতি ও মনুস্মৃতিতে বিরোধ হইলে মনুর মতই প্রধান হইবে। যথা—

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥"—স্মার্ত্তধৃত বচন।

(৮) বাসুদেব = শ্রীকৃষ্ণ। শক্র = ইন্দ্র। সর্বেশ = সর্ব্বজিত্বী বসুদেব কৃষ্ণ।

এই পুরাণখানি অপ্রচলিত নয়। ইহা হইতে কি বুঝায়? অবশ্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজ হইলে ইহা এতদিন অপ্রচলিত হইয়া যাইত। শুধু অপ্রচলিত নয়—অস্পৃশ্য হইয়া যাইত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায়।

কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেন—কৃষ্ণের দেবত্বের কথা সবই আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত[১]।

বৃত্র বধ করিয়া দেবতাদের রাজা হইলেন ইন্দ্র। ঋক তাহা ডঙ্কা বাজাইয়া প্রচার করিল। রাবণ বধে ও ভারত যুদ্ধে নায়কত্ব করিয়া রাম ও কৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোকের প্রধান দেবতা হইলেন। ভারতের প্রধানতম মহাকাব্যদ্বয়—রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ের জয়ডঙ্কা বাজাইল। যত কিছু অলৌকিকতা তাঁহাদের উপর চাপানো হইল। শান্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহাদের নিয়া রসিক সাহিত্যিকগণ রসকাব্য রচনা করিলেন। একখানির পর অন্যখানি রসকাব্যে রঙের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। অবশ্য সবই কাল্পনিক ঘটনা নিয়া। কৃষ্ণচরিত্রে এই রসকথা বেশি বেশি আরোপ করা হইয়াছে। রামচরিত্রে এতোটা নয়। ইহার হেতু সামাজিক অবস্থা। সমাজের মনোবৃত্তি। এই রস-চিত্রই—রাস।

আগামীবারে সমাপ্য

অশ্বঘোষের বাসুদেব চরিতে বাসুদেব কৃষ্ণকে 'শৌরিঃ' বলা হইয়াছে (১।৫০)। বাসুদেবের ১২শ নাম—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর। কেশবাদি ১২শ নাম দ্বারা মার্গশীর্ষাদি ১২শ মাস বুঝায় (Alberanis, India, Vol I, p402).

এই বাসুদেবেরা কি 'তুষার'—বাসুদেববংশীয় রাজগণ? বিষ্ণুপুরাণে ইহারা কাণ্বায়ন নামে উক্ত হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন ভগবানের ১০ অবতারের ৮ম অবতার কৃষ্ণ। কিন্তু অনেক স্থলেই বলরামকেই ৮ম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাগবত মতে কৃষ্ণ, ভগবানের ২০তিতম অবতার (১।৩।২৩ ভাগ°)। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, আদিপুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রায় সকল গ্রন্থকারই আপন মত রক্ষা করিয়াছেন।... তন্মধ্যে কতকগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু কতকগুলি বৃত্তান্ত এতই অনৈসর্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যে তাহা শুনিলেই অবিশ্বাস করিতে হয়। যাঁহারা সকল পুরাণ উপপুরাণকেই ব্যাস প্রণীত ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন কৃষ্ণ বৃত্তান্ত যেখানে পাওয়া যায় তাহা সকলই সত্য। কৃষ্ণ ত আর আমাদের মত সামান্য মানুষ নয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাতে সকলেই সম্ভবে।...বিষ্ণু-পুরাণমতে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অংশ বা পূর্ণ অবতার নহেন। একগাছি কেশমাত্র। বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের ভারতযুদ্ধে সহায়তা বা পাণ্ডবের সখ্যতা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই (—বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৪২৮)

(১) কৃষ্ণ দেবাবতার বলিয়া প্রথমে লোকের সংস্কার ছিল না। মহাভারত বর্ণিত শিশুপাল, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির ব্যবহার ও বাক্যাবলী আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, এমন কি মহাভারতের যে যে অংশে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কথা আছে, সেই সেই অংশ আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত।

হরিদ্বারে কয়েকদিন

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

লাহোর ছেড়ে একদিন হরিদ্বারের দিকে রওনা হয়ে পড়লুম। লাহোরের প্রকাণ্ড জংসন ষ্টেশন, অসংখ্য আনাগোনার পথ, ট্রেনেরও যেমন যাওয়া আসার অন্ত নেই, যাত্রীর ভীড়ও তেমনি, গন্তব্য প্ল্যাটফর্ম খুঁজে বের করা এক সমস্যা। এই যা রক্ষা ষ্টেশনের ব্যবস্থা ভালো, টিকিট চেকার টিকিট দেখে কোন প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে বলে দেয়। কোলকাতায় এই ব্যবস্থার অভাবে, নানা দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের যাত্রী ঢাকা মেলে ওঠে, আসাম মেলের যাত্রী শিলিগুড়িতে চড়ে। প্ল্যাকার্ড দেখে নেবার মত শিক্ষা দীক্ষা সকলের থাকেনা, স্মরণেও সব সময় আসেনা।

ভীড়ের আতঙ্কে, রীতিমত দ্রুততার সঙ্গে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলুম, কিন্তু বৃথাই আশা, বৃথাই সতর্কতা, দেরাদুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনে প্রবেশ করতে না করতে লোভাতুর পিপীলিকার মত গাড়ী ও প্ল্যাটফর্ম জনতায় ভরে উঠলো। নগ্ন স্বার্থপরতার চরম রূপ গাড়ীর এই কামরাতে দেখতে পাওয়া যায়, দৃষ্টি থেকেও অন্ধ, শ্রুতিশক্তি থেকেও বধির, কলের পুতুলের মতই, আসন যারা একবার দখল করেছে নীরব নিথর। মৃত্যুলীলাও যদি ওদের সুমুখে সংঘটিত হয়, তবু ওরা নিস্পন্দ।

মেয়ে গাড়ীতেও তিল ধারণের স্থান রইল না। পাঞ্জাব প্রদেশের মেয়েরা যে ট্রেন ট্র্যাভেল বেশী করে তা স্বীকার করতেই হবে। কামরার অধিকাংশ মেয়েই "সায়ের" করতে বেরিয়েছে, অর্থাৎ বেড়াতে বেরিয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির দিক থেকে এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক। বাঙলা দেশের মেয়েরা কবে গৃহগণ্ডী থেকে মুক্ত হবে, তাই ভাবি; পূজাপার্বণ ব্যতীত বাঙলা দেশের ট্রেনের মেয়ে-কামরাগুলো প্রায় ফাঁকা দেখতে পাওয়া যায়।

পৌনে দশটা বাজতে গাড়ী ছেড়ে দিল—লাক্সার জংসন হয়ে হরিদ্বার যাবে। বসবার মত একটু জায়গা পেয়েছিলুম, এইবার সঙ্গিনীদের দিকে মন দিয়ে তাকালুম। যুক্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, ফ্রণ্টিয়ার প্রদেশের মেয়ে ওরা, ওদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য আছে, তাই রূপ আছে, রং আছে, ওদিক্‌কার জলবায়ু যে ভালো তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ওরা কেউ শালোয়ার পরেছে, কেউ শাড়ী, জর্জেট কাপড়ের ছড়াছড়ি। এতবেশী জর্জেট—মনে হয় জাতীয় সুতোর প্রতি একটা সহজাত অবজ্ঞা রয়েছে। গাড়ীর মধ্যে আমি একা বাঙালী,—আমার সম্বন্ধেও ওদের মধ্যে বেশ একটা কৌতূহল ছিল, বর্ত্তমানের এই সঙ্কটজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভ্রমণে বেরিয়েছি বলে অনেকে বিস্ময়-প্রকাশ করলো। যুদ্ধের প্রভাবে বাঙলা দেশের অবস্থা কিরূপ জানতে অনেকের মধ্যেই আন্তরিক ব্যগ্রতা রয়েছে দেখলুম। কোলকাতায় বোমা পতনের নিখুঁত সংবাদ অনেকে জানতে চাইল। দেখতে দেখতে গাড়ী লুধিয়ানা জলন্ধর পার হয়ে যেতে লাগলো, বারোটা একটা বাজলো, সঙ্গিনীরা কেউ কেউ তখনও গল্পে মেতে রইল, সেই মেয়েলি গল্প, চাল ডাল ইত্যাদির আলোচনা। দূর ছাই, চাল ডাল আর ভালো লাগেনা,—ওসব সংসারিক আলোচনা তোমরা সংসারে ফিরে গিয়ে করনা, ট্রেনের

কামরায় ভ্রমণের মাধুর্য্য অপচয় কর কেন? একটু নিঃশব্দ, একটু নীরব থাকো, আপন অন্তরকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা নিকেতনের স্পর্শে সম্পদ-সুন্দর ও উজ্জ্বল করে তোল। সম্মুখে শুক্লা ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নাময় আকাশের বিপুল সমারোহ, একটু সঙ্গোপন মনের কল্পনায় আমি নিজেকে নিয়োজিত করলুম।

পরদিন বেলা দশটায় লাক্সারে পৌঁছলুম, এইবার ভিন্ন শাখা লাইনে গাড়ী হরিদ্বার যাবে। হরিদ্বার স্বর্গের পথের ইঙ্গিত, বদ্রীনারায়ণ, কেদারনাথের তোরণদ্বার, গঙ্গোত্রীর জন্মস্থানের প্রথম সোপান ওইখানেই। সেই পথের যাত্রী আমি, জানিনা কেন! হিন্দু আমি, হয়তো হিন্দু নারীর আজন্ম সংস্কার বশতঃ মনটা আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল, প্রকৃতির চেহারারও এবার পরিবর্ত্তন সুরু হোল। রুক্ষ অনুর্বর মাঠ আর নয়—প্রান্তরে প্রান্তরে অরণ্যানীর আভাষ—পলাশ বনের রাঙা প্রাচুর্য, দূরান্তে পর্বতের রেখা,—কোথাও ধূসর কোথাও শ্যামল, উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা হয়ে দিগন্তে মিশে গিয়েছে। কয়েকটি ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা দু'একের মধ্যে গাড়ী হরিদ্বারে এসে পৌঁছলো।

এক কথায় বলতে গেলে হরিদ্বার একটি ছোট সহর। ষ্টেশনও খুব বড় নয়। রাস্তায় ঘাটে নানা বয়সের নানা জাতের তীর্থযাত্রী শুধু দেখা যায়, বাঙ্গালীর দর্শন দুর্লভ। ষ্টেশন থেকে কোয়ার্টার মাইলের মধ্যে মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ধর্মশালা। বর্ত্তমান সময়ে টাঙ্গা-ভাড়া দশ বারো আনা—আমরা "ভোলাগিরি" ধর্মশালায় উঠেছিলুম—দোতলা বেশ প্রকাণ্ড বাড়ী, পাণ্ডারা ভদ্র, রাস্তা থেকে যত্ন করে নিয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সমস্ত সুবিধের দিকে আন্তরিক দৃষ্টি রেখেছিল। সাত দিন ভোলাগিরিতে থাকবার নিয়ম। কোলকাতার মতই জিনিষ পত্রের দাম ওখানে, দোকান থেকে ভাত আনাতুম, একজনের উপযোগী আনা বারো চৌদ্দ—ডাল, তরকারী, ভাজা আর একটু চাটনি দেয়,—সে একেবারে অখাদ্য,—তার চেয়ে পুরি অনেক ভালো। আনাজ পাতির দাম কিন্তু বাঙলা দেশের সঙ্গে তুলনা হয়না, আকাশ পাতাল প্রভেদ—তিন চার সের একটা লাউ দুই পয়সার বেশী হয়না,—ওখানে তা পাঁচ ছয় আনা সের দরে বিক্রী হয়,—বেগুন ঢেঁড়স টমেটোর দরও তদ্রূপ। তীর্থস্থান,—জাল জুয়াচুরী প্রবঞ্চনার উৎপাত নেই, ভাঙ্গানি পয়সার সমস্যায় পয়সা না দিতে পারলে পসারীরা স্বচ্ছন্দে সুবিধে মত দিতে বলে দেয়। তীর্থযাত্রী সবাই, দু'দিনের আনাগোনা সকলের, অথচ কী নিবিড় বিশ্বাস,—ধর্মস্থান তাই ন্যায়ের মর্য্যাদাও রক্ষা হয়। আমাদের সমাজ জীবনের ভিত্তি কবে এমনি ন্যায়, সত্য এবং বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই ভাবি।

তখন বৈশাখ মাস—কিন্তু আবহাওয়া সুন্দর—কাঁচা মিঠে আমের মত ঈষৎ শীত ও উষ্ণ দুই সমান—শেষরাত্রে রীতিমত ঠাণ্ডা পড়ে। ভোলাগিরিতে আমরা যে ঘর পেয়েছিলুম, রাস্তার ধারে, ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় দাঁড়ালে খানিকটা দূরে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিতা, মৃদু তরঙ্গায়িতা গঙ্গা দেখা যায়। নীলবসনা গঙ্গা যত দেখি তত চেয়ে থাকি,—বিস্ময়ে ও মুগ্ধতায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, খুশিতে দৃষ্টি আপ্লুত হয়। মনে হয় যেন ওই সুন্দরী গঙ্গার অঙ্গভঙ্গীতে আদিকালের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, পুরাণের স্বপ্ন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেছে। কলকল, ছলছল ঢেউর তরঙ্গ-ধ্বনি যেন কোন্ সুদূর সঙ্গীত, যেন হিমালয়ের বাণী বহন করে আনছে। ঝুরঝুরে ঠাণ্ডা বাতাসে মন প্রাণ মেতে ওঠে। ভোলাগিরি থেকে কোয়ার্টার মাইলের মধ্যে এই গঙ্গারই তীর্থঘাট "ব্রহ্মকুণ্ড"—হরিদ্বারে গেলে এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান না করে ফিরতে নেই। ফলমূল, তরী তরকারী, চাল ডাল, পুরী মিঠাই সরবত, চা কাপড় জামা ইত্যাদি বাজার দোকান পার হয়ে এই ব্রহ্মকুণ্ডে যেতে হয়। বেশ বড় বাঁধানো ঘাট, সুউচ্চ প্রাচীরের ব্যবধানে নারী ও পুরুষের ঘাট পৃথক—মেয়েদের ঘাট বেশ আব্রু সম্পন্ন, প্রবেশের দরজা, বিনা সঙ্কোচে স্নান করা যায়, ও দেশের মেয়েরা সম্পূর্ণ নগ্নভাবেই স্নান করে। বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা জল, স্নান করে বড় সুন্দর লাগ্‌লো। কোলকাতায় মেয়েদের স্নানের ঘাটে কবে এই আব্রু হবে তাই ভাবি। মনে পড়ে একবার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ম রক্ষায় কোলকাতায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে—এই আব্রুর অভাবে জামা কাপড় শুদ্ধ স্নান করে, তারই উপর শুক্‌নো কাপড় চড়িয়ে বাড়ী ফিরে ছিলুম। ঘাটের উপরে আলোকচিত্র, ধর্মপুস্তক ইত্যাদির দোকান, একপ্রান্তে লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা দেবদেবীর মূর্ত্তি। প্রণামীর কোনও দাবী নেই,—সামর্থ্য মত দিলেই হয়। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট সান্ধ্যভ্রমণের সুন্দর মজলিশি জায়গা, কতকটা লেকের মত, তবে ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এখানকার আনন্দের প্রধান বিষয়। সন্ধ্যের পর মন্দিরে মন্দিরে আরতি শেষ হইলে দলে দলে নরনারী সেখানে জমা হয়, রাত্রি নটা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক বাতী জ্বলে, ফুলের মালা, ডালমুট ভাজা, মালাই বরফ ইত্যাদি বিক্রয় হয়। ধর্মযাজক বাজনার সঙ্গে ধর্মসঙ্গীত করে, কেউ বা ধর্মপ্রচারের বক্তৃতা করে, কেউ বা ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। ভ্রমণকারীরা আপন আপন রুচিমত স্থান বাছাই করে নেয়। বৃত্তাকারে গঙ্গা, চতুর্দিকে প্রবাহিতা, মধ্যে দ্বীপের অনুকরণে খানিকটা জায়গা বাঁধানো, দুই ধারে বাঁধানো সেতু রয়েছে, পার হয়ে ওই দ্বীপে যেতে হয়। বিড়লা প্রদত্ত ওইখানে একটি টাওয়ার ক্লক রয়েছে। আমরা যেদিন গিয়েছিলুম, পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে, নদী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অপরূপ সে সমারোহ।

"দেখ ওই সুধাসিন্ধু উছলিছে,
পূর্ণ ইন্দু পরকাশে—"

ভোলাগিরি থেকে মাইল দুই দূরে একদিন কণখল গিয়েছিলুম। আসা যাওয়া টাঙ্গা ভাড়া দুই টাকা, গঙ্গার ক্যানেল, দোকান বাজার অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত নির্জন গাছপালার ছায়ায়ঢাকা পল্লী-পথের একপ্রান্তে টাঙ্গা থামিয়ে গাড়োয়ান জানালো, "কণখল নামতে হবে"। পায়ে চলা পথে খানিকটা এগিয়ে গেলুম, পৌরাণিক যুগের কাহিনী, দাম্ভিক নৃপতি প্রজাপতি দক্ষের আলয়, আজও দক্ষালয় নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত যুগ যুগান্ত অতিবাহন করেছে, কালের প্রবাহে সে রাজপ্রাসাদ অবলুপ্ত হয়েছে, রাশিকৃত হয়ে ভগ্ন ইঁটের স্তূপ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে, তারই মধ্যে খানকয়েক কক্ষ, ভাঙ্গা দরজা জানালা দক্ষালয়ের সাক্ষ্য বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে এবং কক্ষগুলিতে প্রজাপতি দক্ষ শিব সতী প্রমুখ বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ধূপ, ধূনা প্রদীপ জ্বলছে, পূজারী মন্ত্রপাঠ করছে, প্রণামীর কোনও জুলুম নেই, সাধ্যমত দিলেই হয়। রাজপ্রাসাদ চিহ্নিত বহিঃপ্রান্তর আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ভিখারীরা আজও সেখানে দক্ষের নামে উপার্জন করছে। কণখলের আশে পাশে রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, হনুমানজী প্রভৃতির মন্দির। আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে জ্বালাপুর পল্লী পাওয়া যায়। ছায়া-নির্জন মনোরম প্রান্তর, এইখানে পিতৃগৃহে অপমানিতা সতী পতির নিন্দা সইতে না পেরে দেহত্যাগ করেছিলেন। একপ্রান্তের ছোট একটি পুষ্করিণী সেই স্মৃতিতে বিদ্যমান। নাম সতীকুণ্ড। নিকটেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি-মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির। সতীর এই করুণতম মৃত্যুকে আজও হিন্দু নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদর্শকে অনুসরণ করে। কত নারী স্বামীর ন্যায় অন্যায় বিচার না করে এই আদর্শের অন্ধ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে লম্পট দুশ্চরিত্র স্বামীকে সমর্থন করে যায়।

ফেরবার মুখে ওই প্রান্তেই মেয়েদের একটি উচ্চ প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় দেখে এলুম। লতায় পাতায় ঢাকা কুটিরখানি, ঠিক যেন প্রাচীন ঋষিদের বিদ্যাশ্রম, প্রাচীন এবং আধুনিক দুই আদর্শ মিলিয়ে

এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। বোর্ডিংও রয়েছে—একটি মাদ্রাসী মেয়ে পায়চারী করে বিদ্যা আ ত্ত করছিল।

হরিদ্বার থেকে পনেরো মাইল দূরে হৃষিকেশ, ট্রেন বাস উভয় যানেই যাওয়া যায়। আমরা সকাল ৮টার ট্রেনেই রওনা হয়েছিলুম, পর্বত টানেল ইত্যাদি অতিক্রম করে পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে হৃষিকেশ পৌছুলুম। পর্বতের প্রাচীরে যেন হৃষিকেশ বেষ্টিত, যে দিকে তাকাই পর্বতময়। ষ্টেশন থেকে কিছু দূরের মধ্যে লছমি নারায়ণের মন্দির ছাড়া দর্শনীয় আর বিশেষ কিছু নেই। আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে গঙ্গার ঘাট, এখানকার জলের স্রোত অত্যন্ত উদ্দাম। এখানে মৎস্যের প্রাণহানির আশঙ্কা নেই, মনুষ্য সমাজে অস্পৃশ্য ওরা, আবার দেবতার মত বরেণ্যও, কারণ মানুষ ওদের স্পর্শ না করলেও পুণ্য সঞ্চয় করতে ময়দার গুলি ওদের নৈবেদ্য দিয়ে থাকে। ওই ঘাটেই পয়সায় আটটা করে তথাকথিত গুলি বিক্রয় হয়। পরমানন্দে ওরা তা ভক্ষণ করে।

মাইল তিনেক দূরে প্রসিদ্ধ লছমন ঝোলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়লুম। টাঙা আসা যাওয়া জনপিছু এক টাকা চার আনা নেয়। প্রথমে মাইল খানেক ঘোড়া বেশ উদ্যমের সঙ্গে ছুটলো, তার পরেই পার্বত্য প্রান্তরে পৌছেই তার পায়ের গতি মন্থর হয়ে এল। এক দিকে উন্নত-বক্ষ হিমালয় পর্বত, অপর দিকে উদ্দাম প্রবাহিনী গঙ্গা, মধ্যের দুর্গম সঙ্কীর্ণ প্রান্তর বেয়ে আমাদের গাড়ী চলতে লাগলো। আরও খানিকটা পথ চল্‌বার পর গাড়ীর রাস্তাও অচল হয়ে এলো। এইবার পায়ে হেঁটে পর্বতে উঠ্‌তে সুরু করলুম, পাশ দিয়ে নীলকমলা গঙ্গা বেয়ে যেতে লাগলো। খানিকটা চড়াই পথে উঠে আবার উৎরাইতে নেমে লছমিনারায়ণের মন্দিরে এলুম, আরও কয়েক পা এগিয়ে লছমন ঝোলা সেতু। গঙ্গার উপর লৌহ বাঁধানো, অত্যন্ত সাধারণ সেতু, এরই নাম লছমন ঝোলা, অপর প্রান্তে শ্বেত বর্ণের স্বর্গদ্বার মন্দির। স্বর্গদ্বার, —হিমালয় গিরিশেখরের পাদদেশে গঙ্গানদীর তীরবর্তী এই স্বর্গদ্বার, এই তোরণ দিয়েই একদিন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানের দিকে যাত্রা করেছিলেন। কত যুগ যুগান্ত অতিবাহিত হয়েছে, তবু যেন মনে হয় পাণ্ডবগণের চরণ চিহ্ন আজও ওই প্রান্তরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দুর্গম ওই পার্বত্য প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলুম অনেকক্ষণ, সত্যই কী পাণ্ডব-ভ্রাতাগণ এই পথেই যাত্রা করেছিলেন? রাজ্যেশ্বর যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্ব ছিল এই কি পৃথিবীতে? হিন্দুরও গৌরবময় দিন ছিল?

"ছিল বই কি" দুইধারের নির্জন অরণ্যভূমির মধ্যে থেকে কে যেন উঠলো—"সমস্ত সত্তায় হিন্দু আজ রিক্ত হলেও, বঞ্চিত সে চিরকাল চি... া, তার দাবী একদিন গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।"

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

অনেকের ধারণা মেয়েদের বিপথগামী হওয়ার একমাত্র কারণ আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভুল। এঁরা ভুলে যান, শিক্ষা তিন প্রকারের, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক। নৈতিক শিক্ষার ভার এখনও পর্য্যন্ত অভিভাবকের উপরই ন্যস্ত। স্কুল কলেজে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মেয়েরা নৈতিক শিক্ষা পায় গৃহে। বাহিরের কুশিক্ষা ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের উপর বর্ত্তায় না। এই জন্য এক এক পরিবারের সকল মেয়েই ভাল হয়। এইজন্য ছেলে Rejeoted হলেও মেয়েরা প্রায়ই Rejeoted হয় না। এক এক পরিবারের আবার সকল মেয়েই দুষ্টা হয়। শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা সকলে সমভাবেই বিপথে চালিত হয়, বা হয় না। বরং শিক্ষিতাদের সহজে ভুলান যায় না। বিপথে গিয়ে পড়লেও পরে তারা সামলে নেয়। কিন্তু অশিক্ষিতরা বিপথে গিয়ে সহায়হীন হয়। ফেরবার পথ তারা খুঁজে পায় না। রূপজীবিনীদের মধ্যে একজনও শিক্ষিতা নেই। তারা সকলেই অশিক্ষিতা। মনে রাখা উচিৎ এটা Transitional Period. গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে, তখন সেই নূতন জলে অনেক খড়কুটা ভাসে। পরে জল থিতিয়ে গেলে, জল হয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। বর্ত্তমান সমাজও একদিন থিতিয়ে আসবে। পথ চলতে গেলে Aooident হতে পারে। তাই বলে পথ চলা বন্ধ করা মূর্খতা। প্রণয় সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। শিক্ষা দীক্ষার (পুঁথিগত) সহিত চরিত্রের কোনও সম্বন্ধ নেই, আছে সংস্কারের। অনেকে বলে, পূর্ব্বেকার যুগে নারীদের প্রেমাভিনয় কদাচিৎ ঘটেছে বা ঘটে নাই। কিন্তু একথা আদবেই ঠিক নয়। এ বিষয়ে আমি একজন ৭৫ বৎসরের দাদুশ্রেণীর সাক্ষ্য গ্রহণ করি। নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"তখন আমার প্রথম যৌবন। পাশের বাটীর বধূটীর সহিত আমার প্রেম হয়। সানেরঘাটে নালা (নারিকেলের) চেপে আমি চিঠি রাখতাম। জল তুলতে এসে সে চিঠি তুলত। বধূটীর স্বামী থাকত বিদেশে। আমরা অদ্ভুত উপায়ে পরস্পরে মিলিত হতাম, রাত্রযোগে অথচ প্রকাশ্যে। মোটা পৈতা ঝুলিয়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে খড়ম পায়ে ছাদে থাকতাম। আওয়াজ হত খট্ খট্। একাদিন ঠেলে উঠলাম বেলগাছের ডালে। দাদা বৌদি ছাদে ছিলেন। দুজনেই আমাকে দেখলেন। শুনলাম বৌদি বলছেন—ওগো দেখেছ। ধমক দিয়ে দাদা বললেন—রোজই দেখছি। ও আমার ছোড়দাদু। প্রণাম ঠুকে তাঁর ঘরে ঢুকলেন কাঁপতে কাঁপতে। বেলগাছ থেকে এলাম নিমগাছে, তারপর গাছ বয়ে সড় সড় করে নেমে এলাম পাশের বাড়ীর গোয়াল ঘরে। ওদিকে পাশের বাড়ীর মেজবৌ বাঁকা সিঁড়ী দিয়ে, ঘুমুর পরে নামতে থাকেন। ঘুমুর বেজে উঠে—ঝুম ঝুম। পরণে তাঁর লাল সাড়ী। মাথায় টক্‌টকে সিঁদুর। গোয়ালঘর থেকে শুনি শাশুড়ী বলছেন—চুপ কর, ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। মাথা ঠোকার আওয়াজও পেতাম—ঠক্ ঠক্। মাথা ঠুকতে ঠুকতে শাশুড়ী বলছিলেন—এমান অচলা হয়ে থেক মা'। পরের দিন শুনি দাদা বৌদিকে বকছেন—অত কথায় তোমার দরকার কি। পিঁড়ি দি যা না দি আমি বুঝব। খবরদার কথা যেন রাষ্ট্র না হয়। পাশের বাড়ী পান চাইতে গিয়ে শুনলাম, গিন্নীঠাকরুণ বাঁকা সিঁড়িতে তিন তিনটে ঘুমুর (টুক্‌রা) পেয়েছেন। ঘুমুর তিনটা ঠাকুর ঘরে রক্ষিত হয়েছে। ভয়েই হোক, ভক্তিতেই হোক, কেউ ঘর থেকে বেরুত না। আমরা নির্ব্বিঘ্নে সদালাপ করে ঘরে ফিরেছি, কেউ সন্দেহ করে নি, নিন্দেও না।

সেকালের চাষী মেয়েরাও অভিসারে যেত অদ্ভুত উপায়ে, মাথায় একটা সরা বা মালসা রেখে মাঝে মাঝে ধুনা দিত। আগুনটা থেকে থেকে জ্বলে উঠত দপ্ দপ্। আলেয়া মনে করে সেদিকে কেউ যেত না।

আধুনিকতার আবহাওয়ায়, সেকালের অনেক ভূতপেত্নীর সন্ধান আর মিলে না। আসলে কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আজও আছে। আজিকার ভূতপেত্নীরা লুকিয়ে প্রেমাভিনয় করে না। তাই তারা সমালোচনার পাত্র হয়। যে ভূত বা পেত্নীকে পূর্ব্বে দেখা যেত জিলের ছাদে, গাছের ডালে, তারাই আজ দৃষ্ট হয়, লেকের ধারে, পার্কে ও প্রান্তরে। তাদেরই দেখা পাই পথেঘাটে, ক্লাবে ও রেস্তরাঁয়, সিনেমাতেও। ভাল মন্দ নিয়েই দুনিয়া, তা একালেরই হোক, বা সেকালেরই হোক। সামাজিক শাসন কড়া করলে (একঘরে, বর্জ্জন প্রভৃতি) ভূত-পেত্নীরা ফিরে আসতে পারে। এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। সমাজ-পতিদের চিন্তাধারা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া উচিত। তা না হলে তাঁরা সমাজের উপকার করতে গিয়ে অপকারই করবেন বেশী। (ক্রমশঃ)

জঙ্গম

বনফুল

(৪৪)

সাইকেল চড়িয়া শঙ্কর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিল। এমন অসময়ে যে এত কলেরা হইতে পারে তাহা তাহার স্যানিটেশন বিভাগ কল্পনা করে নাই। চৌধুরি বলিলেন যে প্রথমটা যদিও তিনি খবর পান নাই, এখন কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কূপে কূপে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া হইয়াছে, গরীবদের পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট বিতরিত হইয়াছে, নূতন রোগী হইলেই স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হইতেছে, কিছু কিছু ভ্যাক্‌সিনও দেওয়া হইয়াছে তথাপি কেন যে কলেরা হইতেছে না সে জবাবদিহি করিতে তিনি অপারগ। তিনি যথাকর্তব্য যথাসাধ্যই তো করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। বহু লোক মরিতেছে। একটা ডাকবাংলোয় গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত একজন হেল্‌থ্‌ অফিসারের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ভদ্রলোক খাকির হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট পরিয়া মাথায় শোলার হ্যাট চড়াইয়া শঙ্করের মতোই সাইকেল-যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কলেরা কেন থামিতেছে না জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফস্‌ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া সক্রোধে উত্তর দিলেন—"কি করে বলব বলুন। কলেরা থামানো তো আমার কাজ নয়, আমার কাজ ওপর-ওলার হুকুম তামিল করা। তাই করে' যাচ্ছি প্রাণপণে। কলেরা থামল কি থামল না—তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই আমার—"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছেও নেই না কি। দিন একটা আমাকে। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে"

"এই যে আসুন। ইচ্ছে থাকবে না কেন মশাই, ইচ্ছে খুব আছে, উপায়ও জানা আছে, কিন্তু কিছু করা যাবে না"

"করা যাবে না কেন"

"বলি তাহলে শুনুন। কলেরার বিষ শুধু যে জল দিয়েই সংক্রামিত হয় তা নয়, যে কোন খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তা হয়। কিন্তু আমাদের যত আক্রোশ কেবল জলের ওপর, অন্য সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। এই গয়লানীগুলো দুধ বেচছে, এই যে সবাই পেয়ারা চিবুচ্ছে এদের ওপর আমাদের কোন কনট্রোল নেই। আমরা শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়েই খালাস—সব ফুটিয়ে খাও। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করে না"

"না করবার কারণটা কি"

"আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে ভেবেছেন? নট্‌ এ সিংগ্‌ল সোল। খাকি হ্যাট-কোট দেখলেই ভাবে পুলিশজাতীয় কেউ হবে বোধ হয় একজন—আমাদের হ্যারাস্‌ করতে এসেছে। আর আমরা পুলিশের 'হেল্‌প্‌' নিয়ে কাজও করি যে। সেইজন্যে লোকে আমাদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না। ওদের যত বিশ্বাস বৈদ্য কবরেজ গোঁসাই এই সবের উপর। কুয়োয় পার্মাঙ্গ্যানেট পর্যন্ত দিতে দেয় না মশাই। একটা গ্রামে কুয়োয় পার্মাঙ্গ্যানেট দিতে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। ভাগ্যে বাইক ছিল, চোঁ চোঁ দৌড়ে তবে প্রাণটা বাঁচে। আর একটু হলেই পশ্চিমে গোয়ালার লাঠিতে মাথাটি কাটত আমার সেদিন—" ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সবিস্তারে গল্পটি বলিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—"এ অবিশ্বাসের হেতু কি"

"তা জানি না মশাই, তবে এইটে বুঝেছি যে ফরসা-জামা-কাপড়-ওলা সো-কল্‌ড্‌ ভদ্রলোক মাত্রকেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। ফরসা কাপড় জামার ওপর ওদের ঘোর সন্দেহ। ওদের নিজেদের মধ্যেও কেউ যদি বেশ ফরসা কাপড় জামা পরে' একটু ফিটফাট হয় ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় যে তার চরিত্র খারাপ হয়েছে—মেয়েরা তো এই ভয়ে ফরসা কাপড় পরতেই চায় না। আর সত্যিই দেখা যায় যে যারা বেশ ফিটফাট তাদের চরিত্র খারাপ। আমাদের' সম্বন্ধেও ওদের ধারণা যে আমরা ভাল করবার ছুতোয় এসে ঠিক পকেট মেরে নিয়ে যাব"

একটু হাসিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, "আর পকেট মারিও আমরা। নেহাৎ মিথ্যে কথাও নয়"

"পকেট মারেন?"

"মারি না? আজই তো এক পাউণ্ড পারম্যাঙ্গ্যানেট এক পাউণ্ড কুইনিন বেচলুম। কিন্তু খরচ দেখিয়ে দিলুম। শুধু যে বেচি তা নয়, দানও করি। বন্ধু-বান্ধবদের স্পি'রিট, টিংচার আইয়োডিন, কুইনিন তো হরদম দিচ্ছি। কি করি, চাইলে 'না' বলতে পারি না—"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

"না বেচে কি করি বলুন, আমাদের ওপর তো জাস্টিস্‌ হয় না। দশ বছরের ওপর চাকরি করছি, এখনও পর্যন্ত একটা ডিস্‌পেন্সারি পেলাম না। অথচ আমার চেয়ে কত জুনিয়র ঢুকল আর পটাপট ডিস্‌পেন্সারি পেলে। আমার অপরাধ আমি বাঙালী আর হিন্দু। এই কংগ্রেস মিনিস্ট্রি আরও ডোবালে আমাদের মশাই। এতগুলো চোর যে কি করে' এক সঙ্গে জুটল এত অল্প সময়ের মধ্যে—এর চেয়ে সাহেব মনিব ঢের ভাল ছিল মশাই—সাহেব জাত গুণের কদর বোঝে—"

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

ডাক্তারবাবুও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন—"লাক্‌ লাক্‌—সবই লাক্‌ মশাই। যখন আই-এস-সি পাশ করলুম বাবা বললেন যা ইনজিনিয়ারিং পড়গে যা। তখন কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল, ডাক্তারিটা নোবল প্রফেসন, ডাক্তারই হতে হবে। মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, কোথাও ঢুকতে না পেয়ে শেষে দুর্গা বলে' কটক মেডিকেল স্কুলেই ঢুকলাম—তা-ও অনেক ঘুঁসঘাস দিয়ে। বার তিনেক ফেলও করলাম। শেষে অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে বেরিয়ে প্র্যাকটিস করতে বসলাম দিনকতক। কিছু হল না। আমাকে ডাকবে কে! ঢুকলাম শেষে চাকরিতে। বৃহৎ পরিবার ঘাড়ে কি করি বলুন। কিন্তু চাকরির তো এই দশা—"

"বৃহৎ পরিবার বুঝি আপনাদের"

"রাবণের গুষ্টি। আর সব এই শর্মার ঘাড়ে। গজাতে দিলে ম মশাই, অনেক কষ্টে যেই দুটি একটি পাতা ছাড়ছি, অমনি কেউ না কেউ এসে মুড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আজ ভাগনে, কাল ভাইপো, পরশু জামাই, তরশু বউ—একটা না একটা লেগেই আছে। শুধু মাইনেটি সম্বল করে' কি চলে মশাই? চলে না"

"আপনাদের উপরি কিছু নেই বুঝি?"

"ওই যা অ্যালাউন্স পাই—তাও যৎসামান্য। আর এই চুরি-চামারি করে' যা দু চার টাকা হয়। কলেরা থামবে কি করে? আমরা কেউ কি টাইলিং ওয়ার্কার? কেউ না। টাইলিং হবে কি করে বলুন,

আমাদের হাতে ক্ষমতাও দেয় না, পয়সাও দেয় না, আমাদের ওপর সুবিচারও হয় না। আমাদের কেবল I have the honour to be sir, your most obedient servant পর্য্যন্ত দৌড়—তাই করে যাচ্ছি। কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ করে না। সব চোর। আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামের গুরুদের কাছে কুইনিন, পটাশিয়ম পার্মাঙ্গ্যানেট দেওয়া, উদ্দেশ্য তারা গ্রামের গরীবদের বিনা পয়সায় বিতরণ করবে। কেউ তা করে' ভেবেছেন? সব বিক্রি করে। আর এই যে আপনারা সব ছ' টাকা আট টাকা মাইনে দিয়ে গুরু নিযুক্ত করেছেন, এরা কেউ কি পড়ায় ভেবেছেন ভাল করে? পাজির পা-ঝাড়া ব্যাটারা। কারো বারান্দায় কারো আটচালায়, খিয়েটেরিকালি এক একটা পাঠশালা খুলে রেখেছে খালি, কতকগুলো ছোঁড়া সেখানে বসে' গুলতানি করে মাঝে মাঝে, পড়াশোনা কিছু হয় না। অনেক গুরু আবার অন্য জায়গায় চাকরিও করেন। অথচ কাগজে কলমে দেখুন এত টাকা spent for education! এডুকেশন তো হচ্ছে কচু—"

"বলেন কি!"

"শুধু কচু নয়, কচু পোড়া! এ দেশের উদ্ধার নেই মশাই। এই আপনারাই যে পল্লীসংস্কারের জন্যে এত টাকা ঢালছেন তা কি হচ্ছে জানেন? আমার মতে দেশের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে কেবল। অধিকাংশ টাকাই পাঁচজনে লুটেপুটে খেয়ে ফেলছে, দেশ কিছুই পাচ্ছে না। কাজ করছে মিশনারিরা, দেখে আসুন গিয়ে—"

"কিন্তু আমাদের উপায় কি"

"উপায়? উপায় ভগবান"

বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"ওই যে আপনাদের চৌধুরী—যাকে আপনারা স্যানিটেশন বিভাগের কর্ত্তা করে রেখেছেন—একের নম্বর চোর ব্যাটা। চরণ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার মাঝে মাঝে কুইনিন নেয় আমার কাছে—'হাফ প্রাইসে' দিই তাকে আমি—এবারও তার জন্যে রেখেছিলাম কিছু, কিন্তু এবার সে নিলে না, বললে চৌধুরির কাছে পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছে ওয়ান ফোর্থ দামে। চৌধুরি পাঁচ পাউণ্ড কুইনিন পায় কোথা থেকে মশাই?"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কয়েকদিন আগেই চৌধুরী তাহার নিকট হইতে দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গিয়াছে!

ডাক-বাংলোর চৌকিদারটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারই আত্মীয় একটি শিশুর কলেরা হইয়াছে। বলিল চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। স্থানীয় কূপে দাবাই দেওয়া হইয়াছে, ছেলেটিকে 'অক্সন'ও দেওয়া হইয়াছিল, একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া 'পানি'ও চড়াইয়া গিয়াছেন, তবু ছেলেটির অবস্থা শোচনীয়। সাহেব যদি মেহেরবানি করিয়া একবার—।

"তোর বাড়ি কতদূর?"

"নগিচে হুজুর"

"যাবেন না কি, চলুন না দেখে আসা যাক, কাছেই বলছে"

"চলুন"

যাইতে যাইতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যান্টিকলেরা ভ্যাক্‌সিনের কি অভিজ্ঞতা আপনার?"

"সময় মতো হিসেব মতো দিলে খাসা কাজ করে। কাজেও বেশ উপকার হয়। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, ঠিক সময়ে ঠিক মতো সব হয়ে ওঠে না। এরা সব সময়ে ইনজেকশন নিতেই চায় না। কাঁহাতক সাধ্যসাধনা করে' বেড়াই ব্যাটাদের—"

রোগীর বাড়িতে গিয়া দেখা গেল রোগী মুমূর্ষু। তিন চারি বৎসরের একটি শিশু। শঙ্করদের ডিসপেন্সারির ডাক্তারবাবু 'স্যালাইন সাব-কিউটেনিয়াস' দিয়া গিয়াছেন। বগলের নীচেটা ফুলিয়া আছে। কাজ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খাওয়ানো হইতেছে। গোপনে গোপনে 'বৈদ'য়ের 'দাবাই'ও চলিতেছে। গলায় একটা মাদুলিও পরানো হইয়াছে। তবু অবস্থা শোচনীয়। চোখের কোল বসা, মাথার চুল রুক্ষ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শুষ্ক অধর। অন্ধকার ঘরের ভিতর পচা ভ্যাপসা একটা গন্ধ। বমি ও বিষ্ঠার উপর মাছি ভন ভন করিতেছে। কাল ইহার বড়টি মারা গিয়াছে, আজ এটিও যায় যায়। নির্জীবের মতো বিছানায় পড়িয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মৃত। ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস-টুকু এখনও থামিয়া যায় নাই কেবল। ডাক্তারবাবু ঝুঁকিয়া নাড়িটা দেখিলেন, তাহার পর মুখ-বিকৃতি করিয়া শঙ্করের পানে চাহিলেন।

মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল "মাই গে—"

মা পাশেই বসিয়া ছিল। ঝুঁকিয়া বলিল, "কি বেটা"

মেয়েটা দুই শীর্ণ হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। ভয় পাইয়াছে।

"ডর নেই বেটা, ডাকটর বাবু আইলোছে, ঘুর দেখে দ"

মেয়ে কিন্তু মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

মা তখন তাহাকে চুম খাইয়া খাইয়া ভুলাইতে লাগিল। "লালু মেরা, শুগা মেরা, ঘুর ঘুর দেখে দ"

ডাক্তারবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

"আর দেখবার দরকার নেই। যা দেখবার দেখে নিয়েছি। চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে। আরে ওই সে করকে চুম মত খাও। কিন তুমরা ভি হোগা—"

মা কিন্তু চুম খাইতে লাগিল, বারণ শুনিল না।

"ডিসগাষ্টিং! আসুন"

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু শ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু চৌকিদারটিকে বলিলেন যে চিকিৎসা ঠিক মতোই চলিতেছে, আর নূতন কিছু করিবার নাই। কাজটা ঘন ঘন যেন খাওয়ানো হয়। চৌকিদার 'জি হুজুর' বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

"চলুন যাওয়া যাক—"

নির্ব্বাক শঙ্কর ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু যেন যন্ত্রচালিতবৎ চলিতে লাগিল।

"ওকে বললুম বটে চিকিৎসা ঠিক মতো চলছে, কিন্তু ঠিক মতো চলছে না। অধিকাংশ ডাক্তারই মনে করে কলেরা হলেই স্যালাইন দিতে হবে। কোন রকমে "পানি চড়াতে" পারলেই যেন চিকিৎসার চরম হয়ে গেল—ওকি আপনি অমন গুম মেরে গেলেন কেন"

শঙ্কর তবু কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল।

"আপনার কি মনে হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। I respect your feeling—আপনার মনে হচ্ছে এত করেও কিছু হচ্ছে না। হবে কি করে—স্বচক্ষেই তো দেখলেন, মা-টা ওর মুখে মুখ লাগিয়ে চুম খাচ্ছে—চতুর্দ্দিকে মাছি ভন ভন করছে—পাশেই সরাতে পান্তা ভাত বাসি ডাল রয়েছে তাতে মাছি বসছে—একটু পরেই মাগী গিলবে ওগুলো গপ গপ করে'। আমরা জলে পারমাঙ্গ্যানেট দিয়ে আর কি করব বলুন"

ম্লান হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "সব বুঝেও কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। আমি আর ডাক-বাংলোয় ফিরব না, আপনি যান—"

"আপনি কোথা যাবেন"

"আমি আমাদের ডিসপেন্সারির দিকেই যাই একবার"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার"

"নমস্কার"

এক ছেলে মারা গিয়াছে, আশপাশে সকলে মারা যাইতেছে, রোগটা কত ভীষণ তাহা অজানা নাই, কি করিলে রোগের হাত হইতে বাঁচা যায় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বারবার তাহা বলিয়া দিতেছে সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তবু মা সন্তানের চুম খাইতেছে। শঙ্করের নিজের মায়ের কথা

মনে পড়িয়া গেল। তাহারই অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার সান্নিধ্য তিনি এড়াইতে চান।......অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ডিসপেন্সারির দিকে না গিয়া উল্টা দিকে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠে ফসল উঠিতেছে। কলাই মুগ কুরথি কাটা হইয়াছে, এখন গরু দিয়া তাহা মাড়ানো হইতেছে—এদেশে 'দৌনি' বলে। পাশাপাশি আট দশটা গরু মাঝখানে-পোঁতা একটা বাঁশের খুঁটাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক গরুর মুখে একটা করিয়া দড়ির জাল, জাল না দিলে ফসল খাইয়া ফেলিবে। গরুগুলা অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। যে লোকটা গরু হাঁকাইতেছে সে-ও অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। মাথায় একটা মলিন পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, ছেঁড়া ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর উঠিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার আনন্দের সীমা নাই। আশেপাশে যে এত লোক কলেরায় মরিতেছে তাহা যেন সে জানেই না। আনন্দে গান ধরিয়া দিয়াছে। নিকটেই 'ওসৌনি' হইতেছে। একদল মেয়ে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রত্যেকেই এক একটি করিয়া কুলা হাত দিয়া মাথার কাছে তুলিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছে। কুলায় আছে মাড়ানো ফসল। ফসল পায়ের কাছে পড়িতেছে, খোসাগুলি উড়িয়া যাইতেছে। মেয়েগুলিও সমস্বরে গান ধরিয়াছে। একটি যুবক ফসলগুলি মেয়েদের পায়ের নিকট হইতে সরাইয়া একজায়গায় জমা করিতেছিল, সে একটি যুবতীর পায়ের নিকট আসিয়া কি একটা রসিকতাই করিল বোধ হয়, মেয়েটি সকোপকটাক্ষে কৃত্রিমভাবে তাহাকে ছোট্ট একটি লাথি মারিল। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরুগুলি দ্রুততর বেগে ছুটিয়া যেন এ আনন্দে যোগ দিল। শঙ্করের মনের মেঘও সহসা যেন কাটিয়া গেল। এত দুঃখেও ইহাদের প্রাণের উৎসব থামিয়া যায় নাই তো! খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কলেরায় মরে তবু এত আনন্দ! দুঃখে হাহাকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সুখের দিনে উৎসব করিতেও ইহাদের বাধে না। কোন 'পরব' বাদ দেয় না, একটা কিছু হইলেই হইল। উপার্জন করিয়া, ধার করিয়া, চুরি করিয়া যেমন করিয়া হোক দলে দলে রঙীণ কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইবে—মিঠাই কিনিবে, পুতুল কিনিবে, নাচিবে, গাহিবে। সে মিঠাই, সে পুতুল, সে নাচ সে গান হয়তো উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাহাতেই উহারা আনন্দে বিহ্বল। আমরা উহাদের ঠিক চিনি না, উহারাও আমাদের ঠিক চেনে না, মাঝখানে কি একটা যেন বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। কি সেটা?......হঠাৎ অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া শঙ্কর পিছু ফিরিয়া চাহিল। একরাশ ধূলা উড়াইয়া নটবর ডাক্তার বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেলেন। মনে হইল গ্রামের ভিতরই গেলেন। ওই মেয়েটাকেই দেখিতে গেলেন না কি? শঙ্করও ফিরিল। সেই চৌকিদারের বাড়ির দিকেই আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখিল তাহার অনুমানই ঠিক। চৌকিদারের বাড়ির সামনের বেঁটে খেজুর গাছটায় নটবর ডাক্তারের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। আর একটু কাছে গিয়া শঙ্কর শুনিতে পাইল, নটবর তারস্বরে গালাগালি সুরু করিয়াছেন।

"এত না দেয় তক্ কেয়া করতা থা রে শালা সব। পুটুর পুটুর তাকে হায়! আগিন্ বানাও জল্দি—ফুকো জোর সে উল্লু কাঁহাকা—হট্—"

শঙ্কর দারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিল নটবর নিজেই উবু হইয়া বসিয়া একটা উনুনে ফুঁ দিতেছেন। তাঁহার বড় বড় লাল চোখ ধোঁয়ায় আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ ফুঁ দিয়া তিনি বলিলেন—"হুঁ হুঁ আচ্ছা কর কে" এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই শঙ্করের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল।

"আ রে আপনাকেও ডেকে এনেছে না কি ব্যাটা"

"না, আমি এমনিই এসেছি"

"চলুন বাইরে চলুন, এখানে বড্ড ধোঁয়া। শালারা উনুনটা পর্যন্ত ভাল করে' ধরিয়ে রাখে নি। অথচ ঘণ্টা দুই আগে আমাকে যখন ডাকতে গেসল তখন পই পই করে' বলে দিলাম—চরণ ডাক্তারকে খবর দিয়ে বিকেল নাগাদ আমি ঠিক পৌঁছব। তোরা উনুনে এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে রাখ গে যা, গরম জল চাই। কিছু করে নি শালা, কেবল ডাক্তার চেখে চেখে বেড়াচ্ছে, হেল্‌থ অফিসারটাকে পর্যন্ত ডেকে এনে দেখিয়েছে বলছে। আর যার যা খুশি ওষুধ ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছে, এখন তুই শালা সামলা। আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথাও আছে। এ ব্যাটাদের সতরঞ্চ মাদুর কিছু নেই যে বিছিয়ে বসি—সব শুয়ে মুতে একসা হয়ে আছে—আঃ! আসুন এইখানেই বসা যাক—"

বাড়ির সামনে গোটাকয়েক ইঁট পড়িয়াছিল। একটা ইঁট শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিয়া আর একটাতে নটবর উপবেশন করিলেন এবং হুকুম করিলেন—"বেগ লে আও"

জনৈক চৌকিদার তাড়াতাড়ি ঔষধের ব্যাগটি আনিয়া সম্মুখে রাখিল। নটবর ব্যাগ খুলিয়া কয়েকটা ইন্‌জেকশনের ঔষধ বাহির করিয়া করিয়া দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"এই মরেছে, কিছুই শালার মনে থাকে না—আঃ—"

"কি হল?"

"পি. ডির পিটুইটি নটা আনতে ভুলেছি, অথচ ওটা দরকার এখনি। যাই টপ করে' গিয়ে নিয়ে আসি। জলটা ততক্ষণ গরম হোক। আপনি বসবেন? আমি যাব আর আসব। ঘোড়ার পিঠে দু' কোশ যেতে আর কতক্ষণ লাগবে। আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু—হরিদার সেই ব্যাপারটা—আচ্ছা সে পরে হবে না হয়, ওষুধটা আগে দরকার— যাই"

"এখানে আমাদের ডিস্‌পেন্সারিতে ওষুধটা কি পাওয়া যাবে না?"

"যাওয়া তো উচিত"

বলিয়াই মুচকি হাসিয়া নটবর বলিলেন—"কিন্তু আমার নাম শুনলে আপনাদের ডাক্তার দেবে কি না সন্দেহ। সেদিন মদের ঝোঁকে লোকটাকে জুতো দিয়ে তাড়া করেছিনুম—"

এক মুখ হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিলেন।

"কেন কি হয়েছিল"

"সেদিন এই পাশের গ্রামেই ভোজু গোয়ালার বাড়িতে রুগি দেখতে গেছি। গিয়ে শুনলাম ভোজু ওঁকেও খবর দিয়েছে। বসে রইলাম ওঁর অপেক্ষায়। খানিকক্ষণ পরে উনি সুট চড়িয়ে খটমট করে' এলেন, রুগি দেখলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত কইলেন না। আমি নিজেই তখন উপযাচক হয়ে বললাম—পিঠের ডান দিকে নীচে 'ক্রিপিটেশান্' আছে বলে মনে হচ্ছে দেখেছেন সেটা কি। ব্যাটা বললে কি শুনবেন"

নটবরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

"কি"

"বললে কোয়াকের সঙ্গে আমি 'কনসাল্‌ট' করি না। শুনুন কথা একবার। বললাম—তবে রে শালা, তোর পাশের কিচুটি করেছে—বেরোও এখান থেকে। এ ভোজুর বাড়ী নয়, আমার বাড়ি। আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এই কি দাও বেরোও এখান থেকে এখ্‌খুনি। তোমাদের মোট মুখস্ত করে' চুরি করে' ঘুস দিয়ে পাশ করার যে মুরোদ কত—তা আমার জানা আছে। জেল দিতে পারলে আমিও একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারতাম। নিকালো শালা—। টং টং করে' দুটো টাকা ফেলে দিয়ে দূর করে' দিলাম। শালা হেঁট হয়ে টাকা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। চিকিৎসার 'ক' জানে না—'এটিকেট' মারাতে এসেছেন। খুব সম্ভব চুরি করে' পাশ করেছে ছোকরা—" ক্রমশঃ

আধুনিক জগতে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

যেদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নব-বিধান প্রবর্ত্তন করিতে মন্দিরে ভক্তমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হাতে ছিল প্রধান কয়েকটি ধর্ম্মের চিহ্ন-লাঞ্ছিত এক বিচিত্র ধ্বজা—হিন্দুর ত্রিশূল, মুসলমানের খণ্ড চন্দ্র ও খৃষ্টানের ক্রশ। সেদিন ঐ পতাকার পটভূমিকায় ধর্ম্মত্রয়ের পরস্পর বিরোধকে, ইতিহাসের পরম্পরাগত কাল-সত্যকে যেন ব্যঙ্গভরে উড়াইয়া দিয়া উহার মূলে আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথা তেমনই উচ্ছ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছিল। পরমহংসদেবের সাহচর্য্যে, তাঁহার সহিত ভাব বিনিময়ের ফলে হিন্দুর তথাকথিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ কেশবচন্দ্রের মনে তখন অনেকখানি হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। সেই ভাবোন্মাদ পূজারী ব্রাহ্মণের অশিক্ষিতপটু গভীর সাধনা, নির্বিকল্প সমাধি, প্রগাঢ় ভক্তি, দিব্যজ্ঞানের রসাপ্ত ব্যঞ্জনা,—সর্ব্বোপরি সকল ধর্ম্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মনিবেদন সংশয় দূর করিয়া তাহাকে এক নূতন চিন্তা-পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিল—তিনি একান্তভাবে উপলব্ধি করিলেন, সকল ধর্ম্মই সত্য।

এখানেও একটি রেখা টানিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্ম সত্য বটে, কিন্তু সত্যকে সকল ধর্ম্মের মধ্যে সমভাবে লাভ করা যায় এমন নহে—বস্তুত বিষয় দুইটির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। ঐ প্রভেদের সৃষ্টি বিভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পর-বিরুদ্ধ আচারপদ্ধতি ক্রিয়াকর্ম্ম লইয়া, ইহা বোধ-করি বলা বাহুল্য। সকল ধর্ম্মের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য, উচ্ছ্বাসের সাধনার চরম জ্ঞানের ঐক্য আছে, এই অর্থে সকল ধর্ম্ম সত্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড সকল ক্ষেত্রে কালোপযোগী বা নীতি-সম্মতও নহে, নির্দ্দোষও নহে—এবং যে পরিমাণে ঐগুলি গর্হিত, নীতিবিরুদ্ধ ও সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী ঠিক সেই পরিমাণে ধর্ম্মকেও অসত্য বলিতে হয়। এরূপ মতবাদ সত্ত্বেও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য হিন্দু ও খৃষ্টানের কতিপয় ক্রিয়ানুষ্ঠান তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের এই সাধু প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ধরিয়া ইতিপূর্ব্বে মাদাম ব্লাভাসকি প্রবর্ত্তিত থিওজফিক্যাল সোসাইটির মধ্যে দেখা দিয়াছিল। অক্লান্ত অধ্যবসায়, ধী-শক্তির অধিকারিণী এইরূপ মহিলা কার্য্যকলাপে শিক্ষায় দীক্ষায় অদ্ভুত রহস্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—তিনি না কি তিব্বতে দীর্ঘকাল কাটাইয়া অতিমানব মহাত্মাগণের গুপ্ত-ধর্ম্ম উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতীত অন্ধকার জীবন ও পরবর্ত্তীকালে ভৌতিক তথ্যান্বেষী spiritualist-সম্প্রদায়ের সহিত যোগাযোগের কাহিনী নৈতিক রুচিকে এমনই আঘাত করে যে, যে গুপ্ত বিদ্যা প্রচারে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার প্রতি আস্থা রাখিতে অনেকেরই তখন প্রবৃত্তি হয় নাই। তথাপি এ-কথা অস্বীকার করা চলে না, প্রাচ্যদেশের প্রাচীন ধর্ম্মগুলির উপর খৃষ্টান পাদ্রীদের শ্লেষ-কটু তিক্ত আক্রমণকে শুধু যে তিনি প্রতিহত করিতে চাহিয়াছিলেন এমন নয়—ঐ ধর্ম্মগুলির, বিশেষত মিশরীয় যাদু-তত্ত্ব ও ভারতের বৌদ্ধ, পৌরাণিক ধর্ম্মের মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব অবতারবাদ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন যে ঐ সব মতবাদের মধ্যে নিগূঢ় চিরন্তন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কালের প্রভাব ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার উহাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের উত্তরকালের রূপকে বিকৃত বলিয়া নিন্দা করিয়াও তিনি সনাতন-পন্থী গ্রীক গির্জ্জার অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ মতগুলি কতদূর বিচারসহ আমাদের তাহা আলোচনার বিষয় নহে। ইহা বলিলে বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে বৌদ্ধ, হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মের সমন্বয় সাধন ছিল তাঁহার লক্ষ্য এবং সেই অনুপ্রেরণার বলে মিসেস্ বেসেন্ট ধর্ম্মের ও রাষ্ট্রিকতার ক্ষেত্রে প্রাচী ও প্রতীচীকে নিকট বন্ধনে জড়িত করিবার জন্য দীর্ঘ জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

সকল ধর্ম্মের মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রয়াস জগতে নূতন নহে। ইরাণের প্রাচীন ইতিহাস হইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে। শাশানীয় যুগে মনী নামে এক মনীষী ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল,—ইহার প্রতিষ্ঠিত মনীশিজম্ (Manichaeism) একদা খৃষ্টীয় ও জরথুষ্ট্র সম্প্রদায়ের মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া একই কালে উহাদের মধ্যে বিলক্ষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মহাপুরুষ জরথুষ্ট্র-বর্ণিত ইষ্টানিষ্টের কারণ স্বরূপ অরমাজ ও আহারমান নামক দেবতাদ্বয়ের তথ্যসমূহে পারদর্শী ছিলেন, ইহুদ নীতি ও খৃষ্টানগণের রহস্যাবৃত ত্রিত্ববাদ যথারীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন,—এমন কি, শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের বিশ্বজনীন্ পরার্থ-পরতা ও করুণার সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। একই মূল সত্য, উদার নীতি সকল ধর্ম্মের মধ্যে অনুবিদ্ধ সূত্রের মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ভ্রমপ্রমাদ উহাদের প্রত্যেকটিকে কলুষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সত্যের বিকার ঘটে নাই—ইহাই ছিল তাঁহার বক্তব্য। এই যুক্তিসঙ্গত উদার ধর্ম্মমত আধুনিক মানবের সহনশীলতার গণ্ডী কোনমতে অতিক্রম করিবে না, হয়ত বা তাহার মনে উহার প্রতি সপ্রশংস শ্রদ্ধাও জাগিয়া উঠিতে পারে—সমসাময়িককালে ঐ প্রচার কার্য্যের ফলে তাহাকে কিন্তু জীবন হারাইতে হইয়াছিল। ধর্ম্মদ্রোহের অভিযোগে রাজা বহরাম জীবন্ত অবস্থায় তাহার চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া নৃশংস হত্যার ব্যবস্থা করেন এবং ঐ চর্ম্মে খড় ভরিয়া তোরণদ্বারে ঝুলাইয়া রাখেন। ধর্ম্মান্ধতার কী বীভৎস নিদর্শন!—

মোটামুটি বলিতে গেলে আজ আমাদের সকল ধর্ম্মের মূলে সত্যকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে কোন বাধা নাই, উচ্ছ্বাসের মুখে অনেক সময় আমরা ঐরূপ মনোভাব প্রকাশও করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা একটি পরম সত্য, অতীত ইতিহাসে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—তাহার কারণ

খুঁজিতে হয়ত অধিক দূর যাইতে হইবে না! ধর্মকে মানুষ জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সমান পংক্তিতে বসাইয়া রাখিয়াছে—উহার ঊর্দ্ধে ব্যক্তি-চেতনার মিলন-তীর্থে ভক্ত ভগবানের রহস্যপূর্ণ নিত্য সম্বন্ধের মধ্যেই মাত্র সীমাবদ্ধ করে নাই। শুধু তাহা নয়, সভ্যতার নামকরণ যেমন জাতিকে তেমন ধর্মকেও অনুসরণ করিয়াছে—তাইই উরোপে, আরবে, এমন কি ভারতভূমিতেও ঐতিহাসিক শক্তিপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাত জাতীয় প্রতিভায় বিচিত্র অভিব্যক্ত রূপে আচার পদ্ধতির, রীতি নীতিরও চিন্তাধারার উপর যে বিশিষ্ট ছাপ লাগিয়া দিয়াছে তাহাকেই আমরা খৃষ্টীয়, ইস্লামিক ও হিন্দু সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করি। বস্তুত ধর্ম্ম অন্তর্মুখী, মনস্তত্ত্বের বিষয়—সুতরাং একান্ত ব্যক্তিগত,—ব্যবহারিক আচার অনুষ্ঠান বা প্রথার সহিত উহার সম্বন্ধ নাই। শান্ত সমাহিত সশ্রদ্ধ চিত্ত শিব-সুন্দরের দূরাগত মন্দপবনে পালের মত ফুলিয়া উঠিয়া জীবন-তরণীকে যখন ভক্তি-সাগরে ভাসাইয়া দেয়, সত্যধর্ম্মের সাক্ষাৎ মানুষের তখনই মিলিয়াছে—মগ্ন চেতনার অন্তরালে চিন্ময় অনুভূতি রূপে।

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতো।
নাশান্তো মনসোহ্বাপি প্রজ্ঞানেনৈব আপ্নুয়াৎ।

কিন্তু ধর্ম্মের এই অন্তর্গূঢ় রূপ শুধু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক পুরুষের কাছে পরিস্ফুট হইতে পারে, জনসমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে উহা দুর্ব্বোধ্য, হয়তো বা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধন-মার্গের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিলেও এবং সর্ব্বকালে সকল ধর্ম্মের সাধকগণ (mystics) এই মার্গের অনুসরণ করিলেও সর্ব্বসাধারণের কাছে ধর্ম্মকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ লইয়া নয়, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মগুলিকে বাহক করিয়া,—যেন সহজ মানুষ ঐ সব পর্ব্বানুষ্ঠান দ্বারা ইষ্ট-দেবতার তুষ্টি সাধন করিতে পারে, আধি ব্যাধি বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হয়, যেন ইহলোকে কামনা চরিতার্থতার আনন্দ, দুঃখে শান্তি এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। মানুষের মনে প্রতীকের কল্পনা (symbolism) চিরদিন পরম বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। কাব্য-জগতে উপমা যেমন পরিচিতের সাদৃশ্যানুভূতিকে ভাবের মিশ্রণে মধুর করিয়া তোলে, উপলব্ধিজাত তত্ত্বজ্ঞানকে বাহ্য আকার দিয়া গণ-কল্পনা তৃপ্ত করিবার জন্য ধর্ম্ম তেমনই প্রতীকের আশ্রয় লইয়াছে। খৃষ্টানদের ত্রয়ী—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা—বৈদিক ধর্ম্মের ওমিত্যেবং অক্ষরং ধ্যায়ত্য আত্মানং, জরথুষ্ট্রের অগ্নি, পৌরাণিক যুগের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জ্ঞানতত্ত্বের ও জগৎ প্রকৃতির প্রতীক মাত্র, বিশেষ কোন কালে জাতি বিশেষের কল্পনায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রশ ও স্বস্তিক চিহ্নও তেমনি বিশিষ্ট ধর্ম্মের বাহ্য প্রতীক রূপে ভক্তের মনে অজানা জগতের বিরাট রহস্য—mysterium tremendum—ধর্ম্ম বিশ্বাসের পবিত্র অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। পলিনেসিয় জাতিগুলি বিশ্বাস করে, বস্তু বিশেষের মধ্যে গুণ-ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে, যাহাকে বলা হয় ম্যানা (mana)—যাহা মানুষের ভাগ্যের উপর শুভাশুভ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। প্রতীকের পবিত্রতা ঐরূপ ম্যানার মতই বিশ্বাসীর মনে ভক্ত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এ কথা বলা চলে বটে যে, একটা অসার জড়-রূপের মধ্যে প্রতীকস্থ চিন্ময় বস্তুকে হারাইয়া বসে—শুধু তাই নয়, প্রজ্ঞার দৃষ্টি রোধ করিয়া পরিশেষে উহা অন্ধ কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু মাত্র ঐটুকু বলিয়া প্রতীককে নির্ব্বাসিত করিলে মানব চিন্তার গঠন-প্রণালীকেই ভুল বোঝা হইবে। কেন না চিন্তা মনের বৃত্তি হইলেও বস্তু, প্রতীক বা অভিজ্ঞান উহার উপাদান এবং ঐ মাল-মসলাগুলিকে বাদ দিয়া মানসী চিন্তাকে গড়িয়া তোলা আকাশে সৌধ নির্ম্মাণের মতই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বোঝা যায়, যখন আমরা কোন বস্তুকে বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করি তখন বাক্যের সাহায্য লইয়া থাকি, কিন্তু ঐ বাক্য মানুষের কণ্ঠ হইতে উদ্ভূত বস্তুর প্রতীক, রূপের নাম মাত্র—বস্তু-রূপের সহিত শব্দের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ (association) আছে বলিয়া, নাম ও রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও একের সাহায্যে অপরকে সহজে চিনিতে পারা যায়। চিন্তা করিতেও আমরা মনে মনে বাক্যের ব্যবহার করিয়া থাকি যদিও তাহা যথারীতি উচ্চারিত হয় না, এবং এইজন্য Behaviourist মনস্তত্ত্বে চিন্তাকে অনুচ্চারিত ভাষা, এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। Thought is suppressed language. সে যাহা হোক, ধর্ম্মকে ব্যষ্টির সাধন-ক্ষেত্রের বাহিরে সমষ্টির মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে সমষ্টির বোধগম্য ও প্রিয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রতীকের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি ঐগুলিকে আপন চিন্তার অনুরূপ আকারে গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় সংস্কৃতির হোমকুণ্ডে ইন্ধনের মত ব্যবহার করে—ফলে, সংস্কৃতি পরিপুষ্ট উজ্জ্বল লেলিহান হইয়া উঠে।

জাতীয় সংস্কৃতিকে রূপ দান করিতে বীর-চরিত্রের প্রাচীন উপাখ্যানগুলি বড় অল্প সাহায্য করে নাই। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জয়-পরাজয়ের ঐ সব কাহিনী জাতীয় লাভ-ক্ষতির হিসাবের অঙ্ক লইয়া উপস্থিত হয় নাই, বরঞ্চ উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া একেবারে ধর্ম্মের সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে। প্রাচীন কালের দেবাসুরের যুদ্ধ, রামায়ণ মহাভারতের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক,—ইতিহাসবর্ণিত অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কাণ্ডগুলিও সনাতন নিয়মে কিরূপে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, মুসলমানগণের মহরম পর্ব্ব তাহারই এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপে জাতির অতীত জীবনের কীর্ত্তিগুলি ধর্ম্মের বারিসিঞ্চনে সতেজ হইয়া সংস্কৃতির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু উহা ধর্ম্মকে জাতির ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিশ্বজনীন করিবার পক্ষে কোন সহায়তা করে নাই। পক্ষান্তরে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপার আদান প্রদান —ব্যবহার বিধির যাবতীয় ব্যবস্থার ভার শাস্ত্রের উপর পড়িয়া, ধর্ম্ম জাতীয় সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা যে শুধু জাতির সঙ্গে জাতির বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারে নাই, এমন নয়—উন্নত সভ্যতা-গর্ব্বে নূতন নূতন বিধি সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা জাতীয় আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাও করিয়াছে। ইহা সত্য যে এই নিয়মের আংশিক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল যখন রোমান প্রতিভা অসাধারণ রূপে জাগিয়া উঠিয়া আইনকে প্রভূত পরিমাণে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিতে পারিয়াছিল. কিন্তু ঐ উদারনীতির অনুসরণ অন্য কোন জাতি করে নাই। চীনে কুঙ্-ফু-জির (Confucius-এর) নীতি বৌদ্ধ ও তাও

ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া প্রাণশূন্য ক্রিয়াকাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইসলামিক জগতে ধর্ম্মের প্রভাব রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনকে পুরাতন যুগে-ধরা আইন-কানুন ও শাসন-পদ্ধতির দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া সর্ব্ববিধ অগ্রগতির পথ রোধ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে তুর্কীকে 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' রূপে দীর্ঘকাল থাকিতে হইয়াছে, যতদিন না মুস্তাফা কামালের আবির্ভাব খিলাফতের—সেই মধ্যযুগীয় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের কবল হইতে জাতিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতে রাষ্ট্র বিদেশীর হাতে আছে বলিয়া ধর্মতন্ত্র মাথা খাড়া করিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু হিন্দুর ব্যবহার বিধি এখনো স্মৃতিশাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত—মুসলমানের যেমন ইসলামিক বিধানের উপর—এবং ঐ স্থায় ও কার্য্যবিধিগুলিকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া সমাজ ও জাতির মঙ্গল কল্পে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিবার আগ্রহ তেমন দেখা যাইতেছে না। বরঞ্চ এখানকার বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কল্পনায় মশগুল্ হইয়া আছে, এরূপ মনে করা কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না।

ধর্ম্ম ব্যাপারে জাতীয়তার রহস্যের আবরণ মুক্ত করিতে হইলে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজ যেমন ধর্ম্মকে চিরদিন রক্ষা করিয়াছে, তেমনই ধর্ম্মও সমাজকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং জাতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে উভয়কে বেষ্টন করিয়া। ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা ধারণ করে—ধৃ ধাতু মন্। ভারতীয়গণ ধর্ম্মকে শুধু religion অর্থে ব্যবহার করেন নাই,—যে সকল বিশিষ্ট গুণগ্রাম বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে ও প্রাণীকে, মানুষের জীবনকে ও সমাজকে শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্দ্ধনের মত ধারণ করিয়া আছে, উহাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছি, যেমন প্রাণ-ধর্ম্ম, মানব-ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম। আমাদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে জীবনের বিভিন্ন স্তরে আমরা এক একটি বিশেষ সত্যের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বল্লীতে বর্ণিত আছে, পিতার উপদেশ মত বরুণ-পুত্র ভৃগু ব্রহ্মকে জানিবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন, আর ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটিল, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে—অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ রূপে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদ (Theory of Relativity) যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা এই যে, দেশ-কালের (space-time) বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সত্যের ও জ্ঞানের রূপান্তর ঘটাইয়া থাকে—অন্য কথায়, সত্য ও জ্ঞান আপেক্ষিক। ঐ আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে মানব-ধর্ম্ম ও প্রাণ-ধর্ম্মকে দেখা যাইবে প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সত্যরূপে,—তাই আত্মরক্ষা ও বাঁচবার প্রবৃত্তি যেমন প্রাণের সত্য ধর্ম্ম, মানব-ধর্ম্মের চরম অভিব্যক্তি তেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিতর এবং উহাদেরই গুণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। ক্রম বিকাশের এই তুঙ্গ গিরিবর্ত্মে ধর্ম্ম আসিয়া দেখা দিয়াছে সমাজের হাত ধরিয়া, আর সমাজ তখন রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্রও ছিল না। এখনো আমরা এমন আদিম জাতি দেখিতে পাই যাহাদের মধ্যে রাষ্ট্র—State Government—বলিয়া স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নাই, সামাজিক অনুশাসনে তাহাদের গোষ্ঠী-জীবন পরিচালিত, আর দলপতি শুধু সমাজ গুরু বা ধর্ম্মনায়ক নহে, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ইহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থা গোষ্ঠীগত (trilal)—গোষ্ঠীর গণ্ডী মধ্যে গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। ধর্ম্মাচারের শক্ত চাড়ি—Bagehot যাহাকে hard crust of custom বলিয়াছেন—তাহাই ইহাদের সমাজকে ঘেরিয়া রাখিয়া ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ, তাহার স্বার্থবৃত্তির দমন, আর অসামাজিকতার উচ্ছেদ-সাধনও সমানে চলিয়া আসিয়াছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বাতাস, রোদ্দুর ও জল

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সার রবার্ট ম্যাক্‌ক্যারিসন একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, এম, এস্ অফিসার। তাঁর খাদ্যসম্পর্কে লেখা বইখানি সকলের পড়া দরকার। খুব সরল ভাষায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা তিনি লিখেছেন।* এই প্রবন্ধে বইখানি থেকে কিছু কিছু দরকারী কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শরীরের পুষ্টি, কার্য্যক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যের জন্য চারটে জিনিষের দরকার আছে। বাতাস, সূর্য্যালোক, জল আর খাদ্য। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই প্রত্যেকবার নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে বাতাস আমাদের ফুস-ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। বাতাসে অক্সিজেন থাকে। ফুসফুস সেই অক্সিজেন শরীরের রক্তধারায় সঞ্চারিত করে দেয়। পাকস্থলী রক্তের মধ্যে খাদ্যের যে সারভাগ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছে অক্সিজেনের কাজ তার সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং তাকে পুড়িয়ে ফেওয়া। খাদ্যের সারভাগ পুড়ে আমাদের শরীরে তাপের সঞ্চার করে, শরীরকে কাজ করবার শক্তি দেয়। অক্সিজেনের কাজ শরীরে প্রাণ-বহ্নিকে জ্বালিয়ে রাখা। আগুন যখন জ্বলে তখন তার থেকে গ্যাস বেরোয়। ধোঁয়া সেই গ্যাস। মানবশরীরে প্রাণ-বহ্নি (the fire of life) জ্বলবার সময়েও গ্যাস ছাড়ে। এই গ্যাস বিষাক্ত। শরীর থেকে এই গ্যাস বেরিয়ে না গেলে আমরা অসুস্থ হ'য়ে পড়তাম। শরীরের মধ্য দিয়ে চলবার সময় রক্ত তাই বিষাক্ত গ্যাসকে সংগ্রহ ক'রে ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। আমরা যখন নিঃশ্বাস ছাড়ি বাতাসের সঙ্গে ঐ গ্যাস বাহির হ'য়ে যায়। বাতাস থেকে সেই গ্যাস নিয়ে গাছপালা নিজেদের কাজে লাগায়। এমন ঘরে যদি ঘুমাই যার দরজা-জানালা বন্ধ, যেখানে ভালো বাতাস খেলে না তবে প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস

* Food by Sir Robert Mccarrison, C. I. E., M. D., D. SO, LL. D., F. R. C. P., Major-General, I. M. S. (Retired) Late Director of Nutritional Research Pasteur Institute

বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। একই কারণে কম্বল বা চাদরে মুখ ঢেকে শোয়া ঠিক নয়। খোলা বাতাসে বাস করা এবং ঘুমানো দরকার। ঘরের মধ্যে শুতে হ'লে জানালা-দরজা খুলে রাখা উচিত যাতে ঘরের মধ্যে প্রচুর নির্ম্মল বাতাস আসতে পারে। দরজা-জানালা খোলা রেখে যদি আমরা না ঘুমাই তবে ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা থাকে, ফুস্ফুসের কঠিন রোগও হতে পারে। দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে শুলে শরীর যে ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে তার কারণ অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ-বহ্নি তেমন ক'রে জ্বলতে পায় না। ফুস্ফুসের রোগ এবং স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার একটা প্রধান কারণ নির্ম্মল বাতাসের অভাব। সবসময়ে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়া উচিত নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে নয়।

সূর্য্য আমাদের পরম মিত্র, সূর্য্যালোক রোগের অনেক রকম বীজাণুকে বিনষ্ট। করে আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্ত ভাইটামিনের দরকার খুব বেশী। গায়ের চামড়ায় সূর্য্যের আলো লেগে আমাদের শরীরে ভাইটামিন ডি (vitamin D) তৈরী হয়। আমাদের হাড় শক্ত ক'রে তৈরী করবার জন্ত ভাইটামিন ডি প্রয়োজনীয়। দুধে, মাখনে, ঘৃতে, ডিমের কুসুমে, কডলিভারএ ভাইটামিন ডি আছে। কিন্তু সকল সময় গরীবদেশে এইসব খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই ব'লে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন গায়ে কিছুক্ষণ ধরে রোদ লাগালে দুধ ডিম না খাওয়ার যে ক্ষতি—তার পূরণ হয়ে যায়। খাবারে ভাইটামিন ডির অভাব ঘটলে অথবা গায়ে সূর্য্যালোক না লাগালে শিশুদের হাড় ভালো ক'রে তৈরী হয় না, হাড় নরম হয়, বাঁকা হয়। শিশুদের এই রোগকে বলা হয় রিকেট্স্ (rickets); ইউরোপে আমেরিকায় রিকেট্স্ খুব বেশী—শিশুরা সেখানে তেমন সূর্য্যালোক পায় না। ভারতবর্ষে রিকেট্স্ (rickets) রোগ কম কারণ এখানে ছেলেরা সূর্য্যালোকে খেলা করবার সুযোগ পায়। গ্রন্থকার বলছেন, In India many people are accustomed to rub the body over with oil while standing in the sun : this practice is a very good one because vitamin D gets into the body in this way. এর বাংলা : ভারতে অনেক লোক রৌদ্রে দাঁড়িয়ে তেল মাখাতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস খুব ভালো, কারণ এই উপায়ে আমাদের দেহে ভাইটামিন ডি ঢুকবার সুবিধা পায়। পর্দাপ্রথা অস্বাস্থ্যকর। অবরোধ প্রথা রৌদ্রকে ঠেকিয়ে রাখে। মরুপ্রদেশে সূর্য্য রৌদ্রদানে কার্পণ্য করে, কিন্তু এস্কিমো-ছেলেরা রিকেট্স্ রোগে আক্রান্ত হয় না। এর কারণ তাদের মায়েরা খুব মাছের তেল খায়—ছেলেমেয়েরা নিজেরাও বড়ো হ'য়ে মাছের প্রচুর তেল খায়। ক্যালসিয়াম এবং ফস্ফরাসের অভাবেও রিকেট্স্ হয়। রিকেট্স্ রোগ হ'লে ছেলেরা সোজা হ'য়ে হাঁটতে পারে না, তাদের হাড় নরম হ'য়ে যায়। রিকেটী ছেলেরা বেশীদিন বাঁচে না—যদি বাঁচে খর্ব্বকায় হ'য়ে থাকে। ভারতবর্ষের শিশুরা একহিসাবে ভাগ্যবান, কারণ রোদে তারা ছুটোছুটি করতে পায় আর সেই জন্তই তারা প্রায়ই রিকেট্স্ রোগকে এড়িয়ে যেতে পারে। যে সব দেশে রোদ্দুর কম, সূর্য্যের তেজ প্রখর নয় সেখানকার শিশুরা এই দিক দিয়ে ভারতীয় শিশুদের মতো ভাগ্যবান নয়। ভারতের চাষীরা পুষ্টিকর খাবার পায় না, তবুও যে তারা এত খাটতে পারে সে অনেকটা সূর্য্যের রশ্মি কল্যাণে।

রোদ্দুরে একরকমের রশ্মি আছে যাকে দেখা যায় না। এই রশ্মি শরীরকে ভাইটামিন ডি দিয়ে হাড়কে নরম হ'তে দেয় না। তা ছাড়া আরও একটা উপকার করে। এই অদৃশ্য রশ্মি ফুসফুসে, স্নায়ুতে, রক্তধারায় প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার ক'রে দেয়। তার ফলে শরীরে আমরা একটা স্ফূর্ত্তি অনুভব করি। তাই ব'লে খুব কড়া রোদ্দুর লাগানো ভালো নয়। প্রকৃতি ভারতীয় শিশুদের শরীর করেছেন পিঙ্গলবর্ণের। ফলে খালিগায়ে রোদ্দুরে তাদের বিশেষ অপকার হয় না। শ্বেতকায় শিশুরা প্রখর রোদ্দুর লাগালে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। তাদের শরীর ঢেকে রোদ্দুরে যাওয়া উচিত। মোটের উপর সূর্য্যের মত বন্ধু আমাদের খুব কমই আছে। গাছপালা প্রাণীজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর গাছপালার জীবন নির্ভর করছে সূর্য্যালোকের উপরে। সূর্য্য প্রাণের উৎস। তাই কি হিন্দুশাস্ত্রে সূর্য্য প্রণামের ব্যবস্থা? জল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই অনুকূল। আমাদের শরীরের প্রায় সবটাই জল দিয়ে ভর্ত্তি। রক্তের দশভাগের নয় ভাগ জল ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের মাংসেরও চার ভাগের তিন ভাগ জল। রক্তের মধ্যে এই যে জল আছে এই জল যা কিছু আমাদের শরীরকে পুষ্ট করে তাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে বহন ক'রে নিয়ে যায়, শরীরে যে ময়লা জমে তাকেও দেহ থেকে বার ক'রে দেয়। মাটির কলসীতে যেমন খুব ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, আমাদের শরীরেও তেমনি অসংখ্য ছিদ্র আছে। এই সব ছিদ্র পথে যে জল শরীর থেকে বাহির হ'য়ে যায় তাকে আমরা বলি ঘাম। ফুসফুস্ থেকেও জল বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা কাঁচের উপরে হাঁই দিলে এই জন্তই জলবিন্দু দেখা যায়। শরীরের অনেক জল মূত্রাশয় দিয়েও বাহির হয়—সেই সঙ্গে শরীরের ভিতরকার অনেক ময়লাও বেরিয়ে যায়। জল মলের সঙ্গেও বেরিয়ে যায় শরীরের আবর্জ্জনা নিয়ে। জলের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের পক্ষে যা অপকারী তাকে শরীর থেকে বাহির ক'রে দেওয়া। তার ফলে শরীরের অভ্যন্তর পরিষ্কার থাকে। যেহেতু শরীরের বেশীরভাগ জল এবং সেই জল অনবরত শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই জন্ত শরীর সব সময়েই জল চায়। যাকে আমরা বলি পিপাসা—তার মূলে শরীরে এই জলের প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক লোক জল কম খায়। ফলে শরীরে তারা একটা জড়তা অনুভব করে, তাদের রক্তে ময়লা জমে, তাদের খাবার ভালো ক'রে হজম হয় না, তাদের শরীর অত্যন্ত গরম হ'য়ে উঠে, শরীরের ভিতরটাকে তারা নির্ম্মলও রাখতে পারে না। প্রতিদিন সকালে আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত এক গেলাস বা দুই গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া—। এই জন্তই আমাদের দেশে উষাপানের ব্যবস্থা। সারাদিনই দু'চার ঘণ্টা বাদে বাদে জল পান করা ভালো। পিপাসা না পেলেও জলখাওয়ার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকার Sir Robert Mccarrison বলছেন, Every day first thing in the morning and between each meal we ought to drink a glass or two of cold water whether we feel thirsty or not. উষাপান আমাদের কোষ্ঠপরিষ্কারের পক্ষে অনুকূল। শরীরের বাইরেটা পরিষ্কার রাখবার জন্ত জলের যতটা প্রয়োজন ভিতরটাকে নির্ম্মল রাখবার জন্ত তার চেয়েও বেশী দরকার। যাদের শরীর খুব অসুস্থ তাদের প্রচুর জল খাওয়ানো উচিত, দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও।

পানীয় জল খুব নির্ম্মল হওয়া উচিত। জলে ময়লা থাকলে আমাশা, টাইফয়েড, কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ময়লা জলে যে সব বীজাণু থাকে—এই সব রোগের উৎপত্তি সেই বীজাণুগুলি থেকে। গ্রামের পাশ দিয়ে মাঠের কোল ঘেঁসে যে জল চলেছে তাতে ময়লা থাকাই স্বাভাবিক। জলের নির্ম্মলতা যেখানে সন্দেহের বিষয়—সেখানে জল ফুটিয়ে খাওয়া ভালো।

সব খাবারের মধ্যেই জল আছে—বিলাতী বেগুনের প্রায় সবটাই জল, একটা আলু ওজন করলে চারভাগের তিনভাগ জল দেখবে, ডিমের ও বেশীর ভাগই জলীয় অংশ। খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর জল আমাদের শরীরে যায়। তবুও পাঁচপোয়া থেকে দু'সের জল আমাদের প্রতিদিনই পান করা উচিত।

নদেরচাঁদ

দমোহন চক্রবর্তী

সুন্দরী স্ত্রী দুর্গারাণীর কোলে নবজাত সন্তানের নয়ন-জুড়ানো সৌন্দর্য্য দেখে আত্মহারা সাগরমণ্ডল তার নামকরণ করে—নদেরচাঁদ! নদীয়ার নিমাই ঠাকুরের পটের ছবির ছাপ নাকি ছেলেটির মুখে ছিল। সে যাই হোক, ছেলেটির রূপ দেখে হরিহরনগরের মত গণ্ডগ্রামের বিশিষ্ট বাসীন্দারাও চমকে ওঠেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁরা বলেন—চাষার ঘরে এ রূপ কোথা থেকে এলো, এ যেন সত্যিই নদের চাঁদ। শুনে সাগরের বুক আহ্লাদে ফুলে ওঠে, মনের উৎসাহ বাড়তে ন। ছেলেটির সুন্দর চেহারার মত স্বভাবটিও অনিন্দ্য সুন্দর, তার গলার মিষ্ট স্বর সবাইকে আনন্দ দেয়, গ্রামশুদ্ধ সকলেই তার সুখ্যাতি করে। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে নদেরচাঁদ চোদ্দ বছরে পড়তেই সাগরের স্ত্রী দুর্গারাণীর ওপর এলো ওপারের ডাক। কাজেই ছেলেটিকে স্বামীর হাতে সঁপে দিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললে সে। সাগর দশদিক অন্ধকার দেখলে, একমাত্র সন্তানটিকে আঁকড়ে ধরে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্ত যদিও সে বুক বেঁধেছিল, কিন্তু দশজন হিতৈষীর কথায় শীঘ্রই পাশের গাঁয়ের নন্দ বাউড়ির যুবতী কন্যা সরলাকে বিয়ে করে সব দিক বজায় রাখতে তার সে সঙ্কল্প ভেঙে গেল। এর ফল কিন্তু বিপরীত হয়ে দাঁড়ালে। যে ছেলে গ্রামশুদ্ধ সকলের চোখ জুড়িয়ে এসেছে শৈশব থেকে, এখন বিমাতার চোখে সে যেন কাঁটার মত বিঁধলো। নববধূ সরলা তার এই সতীন-পুত্রটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারলো না। সাগর ছেলের পক্ষ নিয়ে মাসকয়েক ধরে নানা রূপ চেষ্টা করেও যখন স্ত্রীকে টিট্ করতে পারলে না, তখন নিরুপায় হয়ে তারই হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে অদৃষ্টের দোহাই দিল। বেচারী নদেরচাঁদও গতিক বুঝে একদা এক বস্ত্রে সবার অজ্ঞাতে অদৃষ্টকে সাথী করে পথে বেরিয়ে পড়লে।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মাথায় করে মধুমতী নদী পার হ'য়ে নদেরচাঁদ এসে উঠলে মহম্মদপুরে রাজা সীতারামের ভগ্ন দেউলীতে। ক্ষুৎপিপাসায় বালক তখন অর্দ্ধমৃত। "শ্রী" দীঘিতে নেমে আকণ্ঠ ভ'রে জলপান ক'রে দীঘির প্রস্তর সোপানের ছায়ানিবিড় স্থানে এলিয়ে দিলে তার ক্লান্ত ক্ষুদ্র দেহলতা—প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে বালক ভুলে গেল তার দুঃখকষ্ট। কত সময় কেটে গেছে জানে না। পাশ ফিরতে মর্ম্মস্পর্শী কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে করলে আচ্ছন্ন। জননীর স্নেহমাখা সুর তার মরম বীণায় পরশ দিলে একটী স্নেহসম্ভাষণে "তুমি কাদের বাছা বাবা?"—নদেরচাঁদ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তড়িৎবেগে উঠে বসে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল, "মা, আমি পথের ছেলে।" বালকের সরল শান্ত কমনীয় মুখ দেখে নারীর হৃদয়ে মমতার উদ্রেক হ'লো। সে তার কক্ষ থেকে জলের কলসী নামিয়ে বালকের সাম্নে বসে কোমল কণ্ঠে তা'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। সরলমতি মাতৃহারা বালক মমতাময়ী নারীর স্নেহসম্ভাষণে মুগ্ধ হয়ে বিমাতার ব্যবহার ও গৃহত্যাগের কারণ বল্লে। স্নেহপ্রবণ নারী নয়নাশ্রু মুছে বালককে তা'র বাড়ী নিয়ে গেল।

নারীর নাম সৌদামিনী, কৃষক গৃহিণী। স্বামী নীলমণি এই গ্রামের বাসীন্দা, মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন চাষী। উঠানে পৌঁছিয়ে সৌদামিনী ডাকলে, "ওলো হারাণী, দেখ্ এসে, কে এসেছে!"—ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটী আট বছরের গৌরবর্ণা সুন্দরী মেয়ে। সে আগন্তুক বালককে চিন্তে না পেরে বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কে এ মা?" মা সংক্ষেপে উত্তর করলে, "এ তোর নূতন দা"। বালক বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে হারাণীর দিকে এগিয়ে তা'র কোমল হাত দু'খানি ধরে বললে, "হ্যাঁ, আমরা ভাই বোন।" সন্ধ্যায় হারাণীর বাবা নীলমণি যখন ঘরে ফিরলে তখন সৌদামিনী বালককে তা'র কাছে নিয়ে বল্লে, "ন্যাখো, ভগবান আমাদের ছেলে পাঠিয়েছেন।" তারপর সৌদামিনী স্বামীর নিকট বল্লে বালকের সব বৃত্তান্ত। নীলমণির একটী মাত্র সন্তান হারাণী, স্বামী-স্ত্রী একটী পুত্রের অভাব অনুভব কর্ত্তো সর্ব্বদাই; দৈব-প্রেরিত নদেরচাঁদ তাদের বুভুক্ষু হৃদয়ে বাৎসল্যের পীযূষ-ধারা সিঞ্চন করলে—নীলমণির গৃহে তা'র নীড় রচনা হ'লো।

উজিরপুরের মণি ঘোষ ধনী কায়স্থ জোতদার। লোকটী সৌখীন, সন্ধ্যায় তার বৈঠকখানায় গ্রামের সর্ব্বজাতির যুবকবৃন্দের সমাবেশ হয়। ফলে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গীতাভিনয়ের মহলা সারা গ্রামখানিকে গুলজার করে রাখে। সম্প্রতি স্থির হয়েছে কলকাতার সুবিখ্যাত 'মডার্ণ' থিয়েটি ক্যাল অপেরা পার্টির অনুকরণে এবার তারা অভিনয় করবে "সুরথ উদ্ধার"। এখন সমস্যা বেধেছে অধিরথের ভূমিকা নিয়ে—চাই একজন প্রিয়দর্শন ও সঙ্গীতপটু কিশোর বালক। অনেক চেষ্টা করেও এরূপ ছেলে মিলছে না। একদিন নন্দ পোদ্দারের ছেলে হরেকৃষ্ণ এসে খবর দিলে মামুদপুরে নীলমণি মোড়লের বাড়ী ভিন্‌গাঁয়ের এক সুন্দর ছোকরা এসেছে। মণি ঘোষের হুকুমে নীলমণি হাজির করলে নদেরচাঁদকে। ঘোষজা নদেরচাঁদের চাঁদমুখ দেখে উল্লাসে লাফিয়ে উঠ্লে—হাসিমুখে বললে—"আরে নীলু, এ যে সাক্ষাৎ রাজপুত্তর—একেই আমরা চাই।" নীলু হাতজোড় করে কাতরভাবে বল্লে, "কর্ত্তা, এ যে আমার সঙ্গে ক্ষেত খামারে যাচ্ছে।" মণি ঘোষ ধম্‌কে বললে, "বেটা, এমনি চাঁদপানা ছেলেকে তুই রোদে পোড়াবি, বিষ্টিতে ভিজাবি? এদ্দিন তোর চল্‌ছিল কেমন করে?" নদেরচাঁদ যাত্রার দলে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। নীলমণির জন্ত ৫৲ টাকা মাসহারা বরাদ্দ হ'লো।

চৈত্রসংক্রান্তি। রাজা সীতারামের স্মৃতিবিজড়িত মহম্মদ-পুর গ্রামে বারোয়ারীতলায় আজ অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ হয়েছে—"উজিরপুর থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি"র অভিনয় দেখ্তে। পাশের গাঁয়ের নীলমণি ও সৌদামিনী মেয়ে হারাণীকে নিয়ে যাত্রা শুন্‌তে আর তাদের নদেরচাঁদকে দেখ্‌তে এসেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুরু হ'লো "সুরথ উদ্ধার" অভিনয়। অসংখ্য জনতা নির্ব্বাক ও তন্ময় হ'য়ে শুন্‌ছে যাত্রা গান। বীর অভিরথের ভ্রাতা "অধিরথের" বেশে রাজপুত্র সেজে আসরে এলো

নন্দেরচাঁদ, তার অপরূপ সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি সাজসজ্জায় যেন সত্যিই রাজপুত্ত্বুর বলে মানিয়েছে। সে অপূর্ব্ব সুর সংযোগে গান ধরলে—সভাস্থ দর্শকবৃন্দ মন্ত্রার্পিতের ন্যায় বালকের সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধা পান করলো।

এই অভিনয়ের পরে বেড়ে গেল নন্দেরচাঁদের আদর। গ্রামের যুবকযুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা সবাই হ'য়ে গেল তার গুণমুগ্ধ। "উজিরপুর থিয়েট্র্যাল যাত্রা পার্টি"র ডাক পড়ে গেল গ্রাম গ্রামান্তরে—মণি ঘোষ আনন্দে আত্মহারা! দেখতে দেখতে দুই বছর কেটে গেল। নন্দেরচাঁদ আসন পাকা করলে ভদ্রসমাজে—কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে পোষাকপরিচ্ছদে কে বল্‌বে সে চাষার ছেলে! মণি ঘোষের ছেলের কাছে শিখ্‌লে সে বাংলা লেখাপড়া। প্রতিদিন সে যায় নীলমণির বাড়ী, সৌদামিনী স্নেহের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরে বুকে—নন্দেরচাঁদ অভিভূত হয়ে পড়ে তার অকপট অপত্য স্নেহের বন্ধনে। হারাণীও আকুল আগ্রহে তার প্রতীক্ষায় থাকে, নন্দেরচাঁদ এলেই সে ছুটে আসে, তার পাশে ব'সে নন্দেরচাঁদ গল্পে মেতে ওঠে, কথা আর ফুরোয় না,—কতদিনের যেন কত চেনা তাদের দুজনায়! এমনি করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল ক'বছর।

এক শীতের রাত্রে মণি ঘোষের ছেলে ফণির সঙ্গে নন্দেরচাঁদ এলো আজব সহর কলকাতায়। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে দেখলে সে এক নূতন জগত। কত রকমের কত লোক আর কি ভীড়, তাদের গাঁয়ের চৈত্র সংক্রান্তির মেলার চেয়ে অনেক বেশী। সে ভাবে এত লোক কোথায় ছুট্‌ছে, কিসের সন্ধানে! সে ফণির সঙ্গে আশ্রয় নিলে চীৎপুরের উপর এক মেস-বাড়ীতে।

এক মধ্যাহ্নে ফণি আপন কাজে বাইরে গেলে নন্দেরচাঁদ আপন মনে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। সে অন্যমনস্কভাবে দক্ষিণ মুখো হাঁটা সুরু করলে। কিছুদূর এগিয়ে সে এক দেয়ালের গায়ে, একটু উপরে তাকিয়ে দেখলে কাঠের ফলকে ঝুলছে "মভার্ণ থিয়েট্র্যাল যাত্রা পার্টি"; পড়ে তার বুকটা ছ্যাং করে উঠলো। তার মনে পড়ে গেল এই ত সেই বিখ্যাত অপেরা পার্টি—যার অনুকরণে উজীরপুরে মণি ঘোষের দল গড়ে উঠেছিল! সে যেন কোন এক অজানা আকর্ষণে উঠে পড়লো সেই বাড়ীর দোতালায়।

• • •

গাঁয়ের মেয়ে হারাণী! ছোট্ট মেয়েটি সত্যিই কোন্ দুষ্ট ঠাকুরের গোপন ইসারায় নন্দেরচাঁদের জন্য আনমনা, কিছু তার ভাল লাগে না। গাছ—মাঠ—নদী সবই যেন তার কাছে বিস্বাদ। মা বলে "হারাণী, অমন করে থাকিস্ নি—সে আস্‌বে, আমাদের ভুলে থাকবে না"—হারাণী বলে, "মা, দেবতা একবার গেলে আর কি আসে?" তার মা বলে, "তাই বলে কি তুই এমনি করে বেড়াবি?" হারাণী কি বলতে যায়, চোখে জল আসে আর বলা হয় না। মা ও মেয়ে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

কয়েক বৎসর পরে জমিদার কীরোদ গোঁসাই গাঁয়ের বাড়ীতে ফিরে এসে খুব ধুমধামের সঙ্গে কৌলিক কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করেছেন। উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য কলকাতার সেরা যাত্রা পার্টিকে মোটা টাকায় বায়না করা হয়েছে।

হারাণী এখন তার বাপ মাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যেও তার পূর্ণ যৌবনের অঙ্গশ্রী কুটীরের আগড় ঠেলে তাকে করেছে আলিঙ্গন। গ্রাম্য সম্পর্কে বৃদ্ধা খুড়ী মা তার অভিভাবিকা। মনের মধ্যে কত রকমের দুঃখের ছবি নিয়ে হারাণী কাটায় তার জীবন। জমিদার বাড়ীর উৎসবের হাওয়া সেখানেও এলো অযাচিতভাবে। কাকী তা'কে নিয়ে গেল সেই উৎসবে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মধ্য রাত্রে ভেঙ্গে গেল যাত্রার আসর। কাকী ডাকে "হারাণী ওঠ—চল্—যাত্রা যে ভেঙ্গেছে।" হারাণী মন্ত্রোত্থিতের ন্যায় দাঁড়ালো। নিঃশব্দে কাকীর পিছু পিছু এলো তার ক্ষুদ্র কুটীরে। একটা খণ্ড মেঘের আবরণে পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়েছে, আলো আঁধারের খেলা রাতের রূপকে যেন রহস্যময় করে তুলেছে। হারাণী তার কুটীর-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলে—কিন্তু নিদ্রা দেবীর পথ আগলে দাঁড়ালো যাত্রার পালার তরুণ নায়ক। যাত্রায় তার যাবার তত আগ্রহ ছিল না—কাকীর আগ্রহে সে গিয়েছিল, কিন্তু তা'র না গেলেই বোধ হয় ভাল ছিল! নন্দেরচাঁদকে সে দেখলে—যাত্রার আসরে অপরূপ সজ্জায়; তার সুন্দর শ্রী তার অন্তরকে জাগালে, পুরাণো স্মৃতি সজীব হ'য়ে তার অন্তরের লুকানো ব্যথায় আঘাত করলো। বাইরে কে ডাকলে, "মা!"—"হারাণী"। ও কি! গাছের ডাল থেকে একটা দুষ্ট পেঁচা চীৎকার করে উড়ে গেল—সেই শব্দ বাইরের শব্দ থামিয়ে দিলে। কিন্তু এবার বেশ স্পষ্ট ভাবে শুন্‌লে, "হারাণী কোথায়?" বাহিরের দরজায় আঘাতের শব্দ। হারাণী বুঝলে এতো আর ভুল নয়। তবে কি নন্দেরচাঁদ তাদের ভোলে নি?—এই কুটীরে এসেছে। হারাণী আত্মসম্বরণ ক'রে দরজা খুলে দিল। আলো আঁধারের ঘোর তখনও কাটে নি। হারাণী নন্দেরচাঁদ দাঁড়ালো মুখোমুখি হ'য়ে। নন্দেরচাঁদ প্রথমে কথা বললো, "হারাণী, মা বাবা কই?" হারাণী কি উত্তর দেবে, দুই চোখে তার অশ্রুর বন্যা নেমেছে। নন্দেরচাঁদ গাঢ় স্বরে বললে, "সব বুঝেছি হারাণী, দুঃখ কোরো না, রাগ কোরো না—আমার দোষ নেই। এসো বাইরে মধুমতীর শীতল তীরে শুন্‌বে আমার জীবনের ছিষ্টিছাড়া কাহিনী।" হারাণী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নন্দেরচাঁদের পিছু পিছু গেল নদীর তীরে। নদীর জলেও সেই কালো ছায়া!

হারাণীর বুকটা ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠে। কিন্তু নন্দেরচাঁদের সঙ্গ—তার কাহিনী শোনবার আগ্রহ তাকে কৌতূহলী করে। নন্দেরচাঁদ বলতে থাকে তার ভাগ্যোদয়ের কথা। কেমন করে সে কলকাতার মূল দলের আখড়ায় গিয়ে ওঠে, সেখানে তার 'এলেম' দেখিয়ে দলের অধিকারীর আদর পায়, তার পর নিজের যোগ্যতায় কি ভাবে সে দলের সেরা 'এক্টর' হয়েছে আজ—হারাণী সে সব কথা শুনলে মন্ত্রার্পিতার মত। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। নন্দেরচাঁদ ভাবে, হারাণী তাকে এখন কি ভাবে নিয়েছে। আর হারাণীর মনটি একবার দুলে উঠছে নন্দেরচাঁদের ভাগ্যোদয়ের আনন্দে আবার পরক্ষণে মুসড়ে পড়ছে তার নির্দ্দয় ব্যবহারে! তাই সঙ্কোচ কাটিয়ে সে-ই প্রথমে বললো—'তুমি সুখী হয়েছো, এ খুবই সুখের কথা; কিন্তু দুঃখ এই—সুখের সময় আমাদের কথা মনে পড়ে নি! ভাগ্যেস্ জমীদার বাড়ীতে তোমাদের দলের বায়না হয়েছিল, নইলে ত—'

হারাণীর কথা শেষ হবার আগেই নদেরচাঁদ বলে উঠলো—'বায়না এখানে না হলেও আমি আসতুম হারাণী; তোমাদের স্মৃতি আর মধুমতীর ঐ জল আমাকে টেনেছিল। সে ভারি মজার কথা, শোন বলি—কামরূপে আমাদের দলের খুব যশ হয়। কামাক্ষ্যা মন্দিরের বড় পাণ্ডা আমার উপর খুশি হয়ে এমন একটা মন্তর শিখিয়ে দেন—পূর্ণিমার ভরা রাতে সেটি জপ করলেই নাকি সত্য সত্য কুমীর হওয়া যায়! শুনেই মনে পড়ে মধুমতীর কথা, সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে তোমার মুখখানা। ভাবলুম, তোমাকে নিয়ে মধুমতীর জলের ধারে দাঁড়িয়ে মন্তরটা পরীক্ষা করা যাবে। আবার এমনি আশ্চর্য যে, সেইদিনই তারে খবর পাওয়া গেল—এখানে বায়না হয়েছে, কোজাগরী পূর্ণিমায় গান হবে। এখন তুমি যদি হারাণী—' বলতে বলতে আবেগভরে নদেরচাঁদ তার হাত দুখানি ধরে ফেললে। হারাণী তাড়াতাড়ি নদেরচাঁদের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললো—'থাক, আধিখ্যেতায় আর কাজ নেই; তোমার কথা থেকে এইটুকুই বেশ বুঝতে পেরেছি, আমাদের টানে তুমি আসনি, কামিক্ষ্যের মন্তর ফলে কিনা সেটা পরীক্ষে করবার জন্যই এসেছ, আমাকেও তাই ডেকে এনেছ মধুমতীর ঘাটে!' হারাণীর কথাগুলি যেন চাবুকের মত নদেরচাঁদের দেহে আঘাত দিল, নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে অপ্রতিভের মত সে উত্তর করলো—'না, না, সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে হারাণী, পাণ্ডার মন্তরে আমার বিশ্বাস নেই, মানুষ নাকি আবার মন্তর পড়ে কুমীর হয়! আসল মন্তরটাই আগে আমার বলা উচিত ছিল তোমাকে, এখন তবে বলি শোন, আমি তোমার আশাতেই এসেছি, আমি তোমাকে পেতে চাই, চলো তুমি আমার সঙ্গে, ব'লো তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হ'বে।" সে হারাণীকে দু'হাতে ধরে আকর্ষণ কর্তে গেলো; কিন্তু হারাণী আপনাকে মুক্ত ক'রে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললে "তা আর হয় না।" নদেরচাঁদ গম্ভীর হোল। একবার নিশীথ নিঝুম রাত্রের রূপকে দেখেই পরক্ষণে সে দৃষ্টিতে হারাণীর মুখের দিকে চাইলে; তারপর দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সে বলে উঠলো, "হারাণী, আমি বড়ই অভাগা। যে আশায় এতদিন বুক বেঁধে ছিলাম—তোমার একটী কথায় তা হ'লো চূর্ণ বিচূর্ণ; নদীর জলে ডুবে থেকে ভুলবো আমার মনের গোপন ব্যথা—" ন'দেরচাঁদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে খরস্রোতা মধুমতী নদীর সে তীরে ভাঙ্গন হোল, নদেরচাঁদের পায়ের তলার মাটী অনেকখানি নদেরচাঁদকে নিয়ে নদীর গভীর জলে পড়লো সশব্দে। হারাণী আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করে লুটিয়ে পড়লো মাটীতে। আকাশে এই সময় মেঘের পরদাটি সরিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ তার উজ্জ্বল মুখটা বার' করে নদীর আরনার উপর অলসভাবে নিবদ্ধ করলো। হারাণী স্বপ্নাবিষ্টার মত ঘাট বেয়ে জলের কাছে এগিয়ে এলো—ঘাটের কিছু দূরে একটা বিকট কালো জানোয়ার একবার ভেসেই জলে ডুবে গেল। হারাণীর সংজ্ঞাহীন দেহ এলিয়ে পড়লো কর্দ্দমাক্ত নদী-সৈকতে।

কতদিন কেটে গেছে—সেই ছোট্ট গাঁ'খানার বুকের ওপর দিয়ে কত আলো আঁধারের ছবি ফুটেছে, মুখ ঢেকেছে—হারাণী এখনও নিশীথ-রাতে ঘাটের ধারে খুঁজে ফেরে সেই দুর্জ্ঞেয় ঘটনায় হারাণো নিশানা! সে কারুর সঙ্গে বড় কথা বলে না; এক এক সময় আপন মনেই বলে, "পাবো, সে আসবে—আমার অপরাধের মার্জ্জনা করে যাবে—এই নদেরচাঁদ ঘাটে।"

প্রাক্‌মোঙ্গল ইরাণে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

পঞ্চদশ হিজিরাব্দে (খৃঃ অঃ ৬৩৭) খলিফা ওমানের সেনাপতি ওবেদ (Obeid ibn Othbath) সামানীয়বংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় খসরুর পুত্র ইয়েজদিজর্দকে পরাভূত করিয়া পারস্যে আরব অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করেন। তখন হইতে পারস্য খিলাফতেরই একটি প্রদেশরূপে গণ্য হইলেও পরবর্ত্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ অনেকেই স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিতে বিরত হন নাই(১)।

২০৩ হিজিরাব্দে (খৃঃ অঃ ৮২০) সব্যসাচী বলিয়া বিখ্যাত আমীর তাহের (Taher the Ambidextrous) খলিফার পাশমুক্ত হইয়া স্বাধীনতালাভ করিতে সমর্থ হন। আব্বাস-বংশীয় খলিফা আমিনের সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া তাহের বোগদাদ অধিকার করেন এবং খোরাসানীয় সৈন্যদল আমিনকে নিহত করে। এই অর্দ্ধস্বাধীন তাহিরীয় রাজাধরের অবসান ঘটে খলিফা মুতাওয়াকিলের রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ৮৪৭-৮৬২)। ইঁহাদিগের রাজধানী অবস্থিত ছিল সুবিখ্যাত নিশাপুর নগরীতে। তাহিরবংশীয় শেষ নরপতি মহম্মদ, সাফারীয় (saffarides) বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবন্ লেইস কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ইহা ৮৭২ খৃঃ অব্দের কথা। ইয়াকুবের পিতা লেইস্ তাম্র তৈজসাদি নির্ম্মাণ করিতেন। কারুশিল্পীর পুত্র হইলে কি হয়, ইয়াকুব নিজ প্রতিভাবলে সামান্য সৈনিক হইতে সেন্যনায়ক পদে উন্নীত হন। তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি সিজিস্তান অধিকার। ৮৭৩ খৃঃ অব্দে তিনি তাহিরের পুত্র মহম্মদকে খোরাসান হইতে বিদূরিত করেন এবং ইহার স্বল্পকাল পরেই তাবারিস্তান জয় করিয়া সমগ্র পারস্যেই নিজপ্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। রাজ্যচ্যুত মহম্মদকে ধৃত করিয়া খলিফা মুতাওয়াকিলের হস্তে সমর্পণ করায় ইয়াকুব তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ খোরাসান, কাবুল, বাল্‌খ্ (বাহ্লীক) ও ফারস্ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। এইরূপে খোরাসানে সাফারাইস্ (saffaride) অথবা সাফারীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ইতিহাসে অজ্ঞাতপ্রায় হইলেও অনুমিত হইয়াছে যে বোগদাদের সংস্কৃতি-ধারাই পারস্যের এ অংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

এইরূপ অপর একজন সমরকুশলী সেনাপতি খলিফার

(১) Manuel d'art Musulman, par Guston Migeon, p. 70 et seq.

প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়া যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া চীনদেশ পর্য্যন্ত আপন রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এই সামানীয় বংশের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। ট্রান্‌স্ অক্সিয়ানা প্রদেশে, বক্ষু (oxus) নদ সান্নিধ্যে, ইসমাইল সামানা নামক একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে উষ্ট্রপালক ও কাফিলার (caravanএর) চালকরূপে জীবিকার্জ্জন করিলেও সেনাপতি সামানা বংশগৌরবে ন্যূন ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাহনামা বর্ণিত ভীষকর সেনাপতি বাহ্‌রাম্ চুবিনের বংশোদ্ভব। তৎকালীন খলিফা শত্রুবোধে অম্‌র্ (Amr) নামক একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিতান্ত ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। খলিফার ধারণা জন্মিয়াছিল যে অম্‌রকে নিজপথ হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে তাঁহার আর মঙ্গল নাই। খলিফার আমন্ত্রণে ইস্‌মাইল অম্‌রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অচিরে তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন। এ আহবে অম্‌র্ প্রাণ হারাইলে পর খলিফার আর দুশ্চিন্তার কারণ রহিল না। খলিফা মামুন সামানার পৌত্র আহাম্মদকে কার্ঘানা প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। সামানাবংশীয়গণ ক্রমেই বিত্তশালী হইয়া আপনাদিগের শক্তি ও পরাক্রম বক্ষুর অপরতীরবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন এবং উহা অনায়াসেই খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। শুধু তাহাই নয়, ভুজবলে তাঁহাদের রাজ্যের পরিধি অবাধে চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সামানীয়েরা (Samanides) ছিলেন খাঁটি পারসীক, তাই ইহা প্রকৃত পক্ষে জাতীয়তাবাদী পারসীক শক্তিরই পুনরুত্থান বলিতে হয়। অধ্যাপক ভাম্বেরী (Vambry) স্বরচিত বোখারার ইতিহাসগ্রন্থে সামানীয় রাজগণ কর্ত্তৃক ভাগ্যলক্ষীর অদ্ভুত প্রসাদলাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সামানীয় বংশের দ্বিতীয় নাস্‌র্ (Nasr II) খলিফা মামুনের সহিত তুলিত হইয়াছেন। তাঁহারই রাজত্বকালে সে যুগের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ বোখারা দরবারে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বোখারার মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ চিত্রশিল্পকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু দশম শতাব্দে কবি রুদেকী বিদ্‌পাই কাহিনীর (বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রের) যে অনুবাদ রচনা করেন তাহা বোখারা দরবারেই চীনা চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়াছিল। সামানীয়দিগের রাজত্বকালেই আধুনিক পারসীক ভাষার সৃষ্টি হয় এবং প্রাচীন পেলেভি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়া আরবীয় লিপি গৃহীত হয়(২)। সামানীয় বংশের অবসান ঘটে ১০০৪ খৃঃ অব্দে।

সামানীয় বংশের পর বুইয়াহিদ্‌, অথবা বুভাইদ রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এ বংশের প্রথম নরপতির নাম বুইহা। ইঁহার পিতা সামানীয় রাজার অধীনে দিলেমের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হইয়া ৯৩৩ খৃঃ অব্দে যে স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপন করেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই কুলসম্ভূত সে রাজ্যের অধিপতিগণ বোগ্দাদ নগরী করতলগত করিয়া খলিফার উপর যথেচ্ছ প্রভাব বিস্তার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। খলিফারা ছিলেন ইঁহাদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। এ বংশের মোট রাজত্বকাল এক শত সপ্তবিংশতি বৎসর ব্যাপী। বুয়েহিদ রাজত্বে চিত্রশিল্প কোনওরূপ উৎসাহ পায় নাই(৩)।

বুয়েহিদ (Buweyhid প্রাক্‌মোজল ইরাণে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি) প্রাধান্যের মূলে ছিল খলিফার নৈতিক অধোগতি। বিলাস-ব্যসন আব্বাসীয় বংশে দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়াছিল। খলিফা মুতী (খৃঃ অঃ ৯৪৬—৯৭৪) বুয়েহিদদিগের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি খলিফা মুক্তাদির ও মুতাওয়াকিলের অনুকরণে নিজের প্রতিকৃতিযুক্ত পদক (medal) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই পদকে তাঁহার যে চিত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় তাঁহার হস্তে সুরার পাত্র(৪)। তিনি আসনপিঁড়ি (crosslegged) হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার এক পার্শ্বে একজন বাদক এবং অপর পার্শ্বে একজন পরিচারক মাছি তাড়াইবার জন্য একখণ্ড বস্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। আরব দেশে রাজসভায় চামরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। নতুবা চামরধারী কিম্বা চামরধারিণীর চিত্রই উৎকীর্ণ দেখিতাম। এই পদকটির পশ্চাদ্দেশেও একজন বাদ্যকরের চিত্র। তিনি ষড়তন্ত্রীযুক্ত একটি বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। তৎকালীন বোগ্দাদের এই মন্ডপ খলিফার রাজসভায় বাদ্যকর প্রভৃতিরই যে প্রাধান্য ঘটিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মানবীয় প্রতিকৃতি রচনা ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, খলিফারা তিনজন সে নিষেধ মানিয়া চলেন নাই।

খলিফাগণ যে সকল বেতনভোগী তুর্কজাতীয় শরীর-রক্ষীর দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিতেন তাহাদিগের মধ্যে উচ্চাশাপ্রণোদিত ব্যক্তির অভাব ছিল না। ইহাদেরই আলপ্তগিন অথবা আলপ্তগিন নামক এক ব্যক্তি আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত গাজনায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনিই গজ্‌নভি রাজবংশের আদি পুরুষ। সমকালীন সামানীয় নরপতি সহজেই এই পরাক্রান্ত তুর্ক আততায়ীদিগের কবলে পতিত হইয়া পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। আলপ্তগিনের পর রাজা হইলেন খৃঃ ৯৭৭ অব্দে তাঁহারই ক্রীতদাস সবক্তগিন। সোমনাথবিজয়ী সুলতান মামুদ সবক্তগিনেরই পুত্র। বহু সাহিত্যিক ও কবি মামুদের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মামুদের উৎসাহে ফির্‌দৌসি কর্ত্তৃক সাহনামা রচনার সহিত পারসীক চিত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে—যেহেতু এই পুস্তকেরই চিত্রণ প্রচেষ্টায় পারস্যে প্রকৃত ক্ষুদ্রক-চিত্র পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। সাহনামা লেখা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যে রাজাদেশে আজ্ঞাবহ শিল্পীনিচয় এতৎসংক্রান্ত চিত্র-রচনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল এরূপ একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। যে প্রকোষ্ঠটি শেখ সাদী সাহনামা রচনা করিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুলতান মামুদ নাকি তাহার ভিত্তিগাত্রে, কবির কল্পনাশক্তি উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য ইরাণের ঐতিহ্যমূলক নানা

(২) Dr. Denison Ross, Persian Painting, (Historical Introduction), p. 19.

(৩) Sir Thomas W. Arnold, Painting in Islam, p. 14, (Ed. 1928).

(৪) Arnolds Painting in Islam, p. 126.

আখ্যায়িকার ঘটনাবলী চিত্রিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ফরাসী শিল্প-সমালোচক মঁসিয়ে ব্লশে (Blochet) এ কথা সত্য বলিয়া মানিতে চাহেন না। কথিত আছে যে দার্শনিক ও ভিষগ্‌প্রবর ইব্‌ন্ সিনা (Avicenna) মামুদের রাজসভায় আমন্ত্রিত হইয়াও গাজ্‌নায় আগমন করেন নাই, মধ্যপথ হইতে নাকি ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মামুদ এ অবজ্ঞায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইব্‌ন্ সিনাকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া আনিবার জন্য নানাস্থানে আদেশপত্র প্রচার করেন। কতকটা আধুনিক 'হুলিয়া' করার প্রণালীতে ইব্‌ন্ সিনার এক একখানি প্রতিকৃতির নকলও এই আদেশপত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। সত্য হইলে এ ঘটনা মামুদের রাজসভায় যে চিত্রী-নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল ইহাই সমর্থন করিতেছে।

তুর্ক বলুন, তাতার বলুন, ইহারা আসলে ছিল যাযাবর জাতি। মোঙ্গলদিগের অধীনতাপাশ ইহারা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই ছিন্ন করিয়াছিল। তৎকালে তাহারা যে বৃক্ষবিহীন মালক্ষেত্রে (steppesএ) বাস বা বিচরণ করিত তাহার উত্তরাংশে পশুচারণ-ভূমির যতই অভাব ঘটিতে লাগিল, ততই তাহারা দক্ষিণাভিমুখে বক্ষুতীরবর্ত্তী উর্ব্বর ক্ষেত্রনিচয় লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই যাযাবর দলে যোগ দিয়াছিলেন সেলজুক্ নামক এক এক প্রতাপশালী গোষ্ঠীপতির বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ। যাজাগ্রহে এই গোষ্ঠান্বেষী যাযাবর সম্প্রদায় ক্রমে বোখারা ও সমরকন্দ অতিক্রম করিয়া খোরাসানে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিল। ইহার অনতিবিলম্বেই গজ্‌নভিবংশীয় রাজগণ ইহাদিগের প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তজ্জন্য বিশেষ পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব সহনশীলতাই এখন তাঁহাদের কালস্বরূপ হইল। সেল্‌জুকের দুইটি পৌত্র গজ্‌নভি বংশের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইলেন এবং ১০৪০ খৃঃ অব্দের মধ্যেই সমগ্র খোরাসান প্রদেশের কর্ত্তৃত্বভার সেলজুক্‌দিগের করায়ত্ত হইয়া গেল। ১০৫১ খৃঃ অব্দে তাহারা বুভাইদ্‌দিগের নিকট হইতে ইস্পাহান নগরী বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইল। খৃঃ ১০৫৫ অব্দে তাহাদের অধিনায়ক তুগ্রল বেগ বোগ্দাদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন।

কিরূপে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইহারা আরবীয় খলিফাদিগের রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিল এবং কিরূপেই বা বিশ্বস্ত রাজভৃত্য হইতে সামরিক আভিজাত্য অর্জ্জন করিয়া সম্রাটস্বরূপ সুলতান পদে উন্নীত হইল, সে ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করা এ প্রসঙ্গে সম্ভব নহে।

সামর্থ্যশূন্য ক্রীড়নকপ্রায় খলিফাকে শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত বুইয়ে-হিদ্ (বুভাইদ্) দিগের প্রভাবমুক্ত করিয়া সেলজুক-নেতৃগণ তাঁহাকে কিরূপে দৃঢ়তরভাবে আপনাদিগের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিয়া বুইয়েহিদ শক্তি বিনষ্ট করিলেন তাহা ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুগ্রল নিজ রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন তেহরণের নিকটবর্ত্তী রায়ী নগরীতে।

কন্থা সংগ্রহ করিয়া ক্রমে কিরূপে পন্থাবলম্বন করিতে হয় এবং পন্থা ধরিয়া ক্রমশঃ কিরূপে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হয় প্রবাদোক্ত এই পদ্ধতির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন এই সেলজুকবংশীয় তুর্কগণ। খোরাসান প্রদেশ জয় করিয়া ১০৩৭ খৃঃ অব্দে ইহারা মার্ভ ও নিশাপুর অধিকার করেন। ধীরে ধীরে একটির পর একটি প্রচেষ্টায় সফলকাম হইয়া সেলজুগেরা তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিলেন তাহার এক প্রান্তে ছিল চীনের জগৎবিখ্যাত প্রাচীর, আর অপর প্রান্তে কার্পেথীয়(৫) পর্ব্বতমালা (Carpathian Mountains)। ইহার দক্ষিণ সীমানা সিন্ধুনদের তটদেশ স্পর্শ করিয়াছিল।

কালক্রমে কৌমসম্পর্কিত সাধারণ্যের (tribal commonalty'র) অধিকারবিষয়ক সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া এই তুর্কজাতি রাজবংশ-প্রতিষ্ঠায় বিমুখ রহিল না। ইহাদিগের রাজবংশ আবার দুইটি শাখায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গাজ্‌না ও খোরাসানে দুইটি বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হইল। সেলজুকীয় সাম্রাজ্যের উহাই ছিল মূলভিত্তি।

(আগামীবারে সমাপ্য)

(৫) এই পর্ব্বতশ্রেণী মোরেভিয়া ও গ্যালিসিয়া হইতে হাঙ্গারী দেশ এবং রুমানিয়া হইতে বুকোনা ও ট্রান্‌সিলভ্যানিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহা ইউরোপের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত।

গান

কাদের নওয়াজ

অনেক দিনের পরে
চাঁদ হাসে মোর নভে,
মুকুল-ঝরা-পথ বেয়ে,
চম্পাবতী কোন্ মেয়ে,
এল ফুলেল্ হাওয়ায় যেন উড়িয়ে তারি,
ধূপ ছায়ারি সাড়ী,
তাই বকুল আকুল মুহু কুহু রবে।
) ব্যথার ব্যথী দরদী
হ'তে পার গো কন্যা যদি,

তবে চাঁদিনী গলানো সুধা,
দিয়ে মিটাবো তোমার ক্ষুধা
মেঘ হ'তে বিজরী
দিব খোঁপায় ধরি'
আর ডালিম-রাঙা গালের
তিলের বদল,
দিব ইহ-পর-কালের
সম্বল
ধরা স্বরগ হবে।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর্‌-ই-এস্‌

(৫)

সুরেন্দ্রনাথের বিচার

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের একটি মোকদ্দমায় বিচারপতি নরিস বিচারকালে বিচার কক্ষে শালগ্রাম শিলা আনয়ন করিতে আদেশ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ তৎ-সম্পাদিত 'ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ও'পিনিয়ন' নামক পত্রে এই সম্বন্ধে



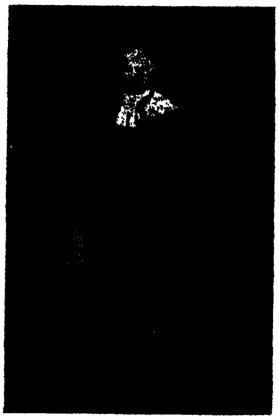
বিচারপতি নরিস

প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখেন যে, "আমাদের কলিকাতার ড্যানিয়েল' মূর্ত্তি দেখিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উহা শতবর্ষের পুরাতন হইতে পারে না। সুতরাং মিঃ জাষ্টিস নরিস কেবল আইন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ নহেন, তিনি হিন্দু দেবমূর্ত্তির পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধেও সুপণ্ডিত! তিনি যে কি নহেন বলা যায় না। রক্ষণশীল হিন্দুগণ বিচারালয়ে তাঁহাদের গৃহবিগ্রহ হাজির করিবার আদেশ নীরবে প্রতিপালন করিবেন কি না তাহা তাঁহারা



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচার করিবেন, তবে আমাদের মনে হয় যে এই তরুণ বিচারপতির পাগলামীর প্রতিবিধানের জন্য সাধারণের কোন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে উক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সহকারী (পরে আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার ও বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পিতা) আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করেন এবং জাষ্টিস নরিসকে জেফ্রিজ ও স্ক্রগস্‌ নামক দুই বিচারকগণের সহিত তুলনা করেন। ফলে, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের ও 'বেঙ্গলী'র মুদ্রাকর রামকুমার দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের অবমাননার জন্য অভিযোগ আনীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম অপ্রকাশ রাখেন এবং সমস্ত দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। মনোমোহন ঘোষ অসুস্থ থাকায় উমেশচন্দ্র এই সর্ত্তে সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমা গ্রহণ করেন যে সুরেন্দ্রনাথ ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কারণ সম্পাদকীয় মন্তব্য যে অন্যায় ও অনুচিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, কানিংহাম, ম্যাকডনেল ও নরিস সম্মিলিত হইয়া এই মোকদ্দমার বিচার করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলিশম্যান পত্রে পাটনার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার টেলরসাহেব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের অবমাননাসূচক এক প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে প্রধান বিচারপতি স্যর বার্নেস পিকক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড ও একমাস কারাবাসের আদেশ দেন; কিন্তু আদেশ প্রদত্ত হইবামাত্র টেলর সাহেব ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কারাদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। রমেশচন্দ্র এই মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যেহেতু সুরেন্দ্রনাথ ত্রুটী স্বীকার করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে কোনও দণ্ড প্রদান করা অনুচিত। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রমেশচন্দ্রের অভিমত গ্রহণ না করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি দুই মাস কারাবাসের আদেশ দেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী যুবকগণের আরাধ্য দেবতা সদৃশ ছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা তাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়া দিত। তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে জনসাধারণ উন্মত্তবৎ হইবে, এজন্য পুলিশ যথেষ্ট সতর্ক ছিল এবং যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিল। তথাপি,



প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ

শুনা যায়, যুবক ছাত্রগণের নেতা (পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদলবলে



রমেশচন্দ্র মিত্র

হাইকোর্টের সার্সীর কাচ ভাঙ্গিয়া দক্ষযজ্ঞভঙ্গের অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের কিছু পূর্ব্বে যখন রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্ত ইংলণ্ডে গমন করেন তখন উমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হয় এবং সংবাদপত্র-সম্পাদন ও অন্তান্ত উপায়ে সুরেন্দ্রনাথ যে দেশসেবা করিতেছিলেন তাহা তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। উমেশচন্দ্র কৈশোরে সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কোনও বিপদে পড়িলে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। 'রেইস্ এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'ষ্টেটস্‌ম্যান'-সম্পাদক রবার্ট নাইটের বিপদের সময় তিনি



স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কিরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

হিন্দু উইলস্ অ্যাক্ট

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র হিন্দু উইলস্ অ্যাক্ট সম্পাদিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য হিন্দু আইন সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি তরুণ বয়সে উমেশচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। উমেশচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পরেই হাইকোর্টে ঠাকুর উইলের বিখ্যাত মোকদ্দমা হয়। উমেশচন্দ্রের সম্মানিত বন্ধু প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা কমলাকে বিবাহ করিবার পর তাঁহার পিতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর একটি উইল প্রস্তুত করেন, উহাতে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সম্পত্তি হইতে দেববিগ্রহ ও আত্মীয়স্বজনগণকে যথোচিত দানের ব্যবস্থার পর অবশিষ্ট সমস্ত (তৎকালে প্রায় তের লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের) সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও উত্তরকালে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঠাকুরবংশের জ্যেষ্ঠ শাখার জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে ভোগ করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে বলিয়া উইলে লিখিত হইলেও তাঁহার প্রথমবার হিন্দুমতে বিবাহকালে তাঁহাকে যে ৭০০০৲ টাকা আয়ের বিষয় প্রদত্ত হয়



আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

এবং প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার অলঙ্কারাদির মূল্য স্বরূপ যে অর্থ প্রদত্ত হয় তদ্ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্রমোহন কিছু পান নাই। প্রথমবার মোকদ্দমা উঠিলে বিচারপতি স্তর জন বার্ড ফিয়ার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দাবী মঞ্জুর করেন নাই। আপীল আদালতে প্রধান বিচারপতি স্তর বার্ণেশ পিকক ও জাষ্টিস নরম্যান এই অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রসন্নকুমারের উইল অনুসারে ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন তাঁহার জীবতকালে বিষয়ের স্বত্ব উপভোগ করিতে পারেন কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রসম্মত উপায়ে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন তাহার প্রামাণাভাব। ভিন্ন ধর্ম্মগ্রহণ করিলেই ত্যজ্যপুত্র হয় না। সুতরাং যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন সমস্ত বিষয় পাইবেন। উইলে যে

প্রথায় পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বিধিবহির্ভূত। যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই তাঁহাদিগকে দান করা অসিদ্ধ। প্রিভিকাউন্সিলও এই মত সমর্থন করেন।

আচার্য্য কৃষ্ণকমলও এই মত পোষণ করিতেন এবং রায় বাহির হইলে উমেশচন্দ্র কৃষ্ণকমলকে প্রায়ই বলিতেন "You are the father of unborn generations." কৃষ্ণকমল বলেন, unborn generations কথাটা স্তর বার্ণেস পিকক্ই তুলিয়াছিলেন কিন্তু "ডাব্লউ-সি-বনার্জী আমার ঘাড়ে উহা জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া নহে, আমার বিশ্বাস তিনি ভুল করিয়া ঐ কথা বলিতেন। আবার কখনও কখনও তিনি কতকটা ভ্রমবশতঃ, কতকটা পরিহাসের ছলে, 'বিদ্যাম্বুধি'র পরিবর্ত্তে আমাকে 'দীর্ঘাঙ্গী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঐ বিদ্যাম্বুধি উপাধিটি আমি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।"*

* মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩৬

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই, প্রিভিকাউন্সিলের জুডিসিয়্যাল কমিটিতে স্তর জেমস কলভিল্, লর্ড জাষ্টিস জেমস্, লর্ড জাষ্টিস মেলিশ, মিঃ জাষ্টিস উইলিস, স্তর মণ্টেগু স্মিথ, স্তর রবার্ট পি কলিয়ার ও স্তর লরেন্স পীলের চূড়ান্ত বিচারের পরে মহারাজা স্তর যতীন্দ্রমোহন উমেশচন্দ্রের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ভাবী স্বত্ব ক্রয় করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন অস্বীকৃত হন এবং তাঁহার ভাবী স্বত্ব ইংলণ্ডের এক সিণ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডেই বাস করেন এবং তথায় দেহত্যাগ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা স্তর যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালার এই বিস্তৃত জমিদারী বিদেশীয়ের অধিকারে যাইবার সম্ভাবনা হয়। বাঙ্গালার বোর্ড অব রেভিনিউ ইহা রাজনীতিক ও অন্যান্য কারণে আপত্তিজনক বিবেচনা করেন অথচ সিণ্ডিকেটের নিকট হইতে স্থায়িভাবে সম্পূর্ণ বিষয়ের স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্য বহু লক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট যতীন্দ্রমোহনের উত্তরাধিকারী মহারাজা স্তর প্রদ্যোৎকুমারকে এই অর্থ ঋণস্বরূপ দান করিয়া বাঙ্গালার এই সম্মানিত ও রাজভক্ত জমিদারবংশকে রক্ষা করেন। ক্রমশঃ

যুগবার্ত্তা

শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যুগে যুগে যুগান্তরের সংগে সংগে যুগবার্ত্তা রটে যায় ঘরে ঘরে সভায় সমিতিতে আচারে বিচারে প্রচারে চারিদিকে কত প্রথায় কতবিধ প্রণালীতে! যুগসঞ্চিত নিয়মপুঞ্জ হার মেনে যায় যুগবার্ত্তার প্রাণ-প্রবাহের স্রোতোমুখে। প্রাণ নতি স্বীকার করে না। প্রাণহীন নিয়ম শৃংখলের কাছে প্রথার ক্রুরকারাগারে! প্রথা ও নিয়ম ছলে বলে আসে প্রাণকে আক্রমণ করতে, তার মর্ম্মস্থানে হানা দিতে। কিন্তু পরিণামে প্রথাবিক্রমপরাক্রান্ত প্রাণপ্রবাহের সম্মুখে হার মানে, নত হয়। প্রাণময় যুগবার্ত্তা প্রেমময় যুগনির্দেশ চিরদিনই হানা দেয় আচারের সুবিশাল প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে। বাহিনীর পর বাহিনী এসে সুখশয়ান প্রতিষ্ঠানের সুশোভন রাজপুরী আক্রমণ করে। বিলাস হার মানে তপশ্চর্য্যার কাছে। কপটতার ধ্বংস হয় সরল মহিমতার সংঘাতে! হীনপ্রথার চিরাচরিত সমাজসৌধগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যায় প্রাণের সবুজ সেনার পরাক্রান্ত আঘাতে! জীর্ণ প্রাসাদ ভেঙে চুর হয়ে যায় নবীনের বিপুল প্লাবনে। অবশেষে প্রাণই দিগন্ত বিজয়প্রাসাদে ম্লান করে দেয় প্রথার ভ্রম অভিমান।

সার্থক হক প্রাণের দিগন্ত অভিযান! প্রাণের পসরা হেঁকে যাক ঘরে ঘরে! শিশুরা সানন্দনৃত্য করুক। কিশোর-কিশোরী মুক্তির প্রাংগণে প্রাণের পূজায় যুক্ত হক। যুক্তপ্রেমের নৌকাবিলাসে নবীন-নবীনা সুরু করুক নব অভিযান! প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার সাথে এ নব জাগরণে প্রাণের নূতন স্পন্দন উপভোগ করুক। বৃদ্ধবৃদ্ধাকে ডেকে বলবে মরা গাঙে বুঝি আবার বান ডেকেছে! জীর্ণ সমাজ হতভাগ্য হৃদকীয় সমাজ সত্যের আত্মচেতনা ফিরে পাবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়ে ব্যষ্টি ছুটে যাবে সমষ্টির কল্যাণ-যজ্ঞে আহুতি দিতে। সমষ্টির হবে পূর্ণ জাগরণ মহাজাতির পুণ্যকক্ষে। শক্তির পেষণে দলিত দমিত দৈন্য নির্বাসন খুঁজে নেবে আপন লজ্জায়! প্রাচুর্যের হীনদম্ভপংক্তি দৈন্যের জীর্ণ কলেবরকে আর ভ্রূকুটি করবে না। দেশে দেশে সর্বসংঘর্ষের হবে অবসান। জাতিতে জাতিতে মহাযোগের আসবে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই ত বিশ্বমানবের বিরাট মিলন-পর্বের সবেমাত্র সূচনা! ইহাই যুগবার্ত্তার প্রথমপর্যায়-নির্ঘোষ! ইহাই প্রাণের নির্দেশ! এইখানেই নিয়ম শৃংখলের অবসান! শুধু সুরু তরুণ-তরুণীর যাত্রা-মহানিয়মের বিরাট শৃংখলায় পথে। শৃংখল যাক্। শৃংখলা আসুক। প্রথা যাক্। প্রাণের প্রতিষ্ঠা হোক।

যুগসঞ্চিত বিভেদ হার মেনে যায় বিভাগের সুনিয়ন্ত্রিত মিলনছন্দের মহিম সাম্যে! সাম্য বিভাগ মানে। সাম্য মানেনা বিভেদকে। বিভাগ আনে শৃংখলা বা method। বিভেদ আনে শৃখলা বা handicap! অতএব মিলিত বিশ্বরাষ্ট্রতন্ত্রে চাই গুণ-বিভাগ বা কর্ম-বিভাগ। কিন্তু দূর করে দিতে চাই বিভেদ বিপর্যয়কে। এক কথায় বিভাগকে বলব বিজ্ঞানসম্মত বা স্বভাবসুলভ পর্যায় মাত্র। আর বিভেদকে দেখব বিপর্যয়ের দৃষ্টিতে অবিজ্ঞানের গর্ভে তমিস্রার অন্ধ কারাঘরে!

যুগবার্ত্তার পরিচয় সর্বত্র সর্বদা সাম্যনির্দেশে। সাম্যস্থলে বৈষম্য থাকতে পারবে না; থাকবে শুধু পর্যায়শীল বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যময় একই বিশাল সাম্যের মূর্তি। সাম্যনিষ্ঠা সাহায্যে যুগধর্ম এনে দেবে বৈষম্যের ভেতর সত্য শ্রী ও শক্তির চিরন্তনী প্রতিষ্ঠা। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে, ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে, সমষ্টিতে সমষ্টিতে, সমষ্টিতে জাতিতে, জাতিতে জাতিতে এনে দেবে মহাযোগ ব্যবস্থা। বিশ্বভুবনব্যাপী মহাযোগ সাধনাই প্রসব করবে ভবিষ্য যুগের মহাজাতির সম্ভাবনা। মহাজাতির ইতিকথাই বর্তমান যুগবার্ত্তা! মহাযোগ বা the universal unitication এ হল যুগসাধনা বা সর্বরাষ্ট্রপরিণতি।

ধর্ম কি?—সাম্য! কর্ম কি?—মহাযোগ সাধনা! উদ্দেশ্য কি? —বিশ্বমানবতা! পরিণাম কি?—বিশ্বভরা আনন্দশ্রী!

ব্রত কি?—প্রথাহীন নিয়ম-তান্ত্রিকতা বর্জিত প্রাণময়তা! অনুষ্ঠান কি?—সর্বজাতি সম্মেলন ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা! ইহাই হল যুগবার্ত্তা। এর নামই যুগনির্দেশ। ইহাই সাম্য-বাণী! বিশেষত এই সাম্য ও মৈত্রী সংবাদই যুদ্ধোত্তর বিশ্বের পক্ষে বিশ্বমানবের একান্ত যুগনির্দেশ। ইহা বাস্তব। ইহা শুধু স্বপ্ন নয়।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে যুদ্ধ এখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। প্রাচ্য অঞ্চলেও যুদ্ধ এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছে। জার্ম্মান সমর বিশেষজ্ঞ ক্লসউইৎস্ বলিয়াছেন—War is the continuation of politics by other means. কাজেই যুদ্ধকে কখনই রাজনীতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। অবশ্য, যুদ্ধের দারুণ উত্তেজনায় ইহার অপরিহার্য্য রাজনৈতিক দিকটা সময় সময় অস্পষ্ট হইয়া ওঠে। এখন যুদ্ধের গতি সুনির্দ্দিষ্ট দিকে চলিয়াছে; কাজেই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতির দিকটা এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধোত্তর রাজনীতি কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহার ক্ষীণ আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে।

খাস জার্ম্মানীতে অভিযান

পূর্ব্বদিক হইতে লালফৌজ জার্ম্মানীর অভিজাত সামরিক শ্রেণীর প্রাচীন আবাসভূমি পূর্ব্ব প্রুসিয়ায় এখন প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে; সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, এখানে জার্ম্মানীর দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহশ্রেণী বিদীর্ণ হইয়াছে। আরও দক্ষিণে লালফৌজ চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। হাঙ্গেরিতে লালফৌজ বুডাপেষ্ট বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। যুগোস্লেভিয়ার লালফৌজ ও মার্শাল টিটোর সেনাবাহিনী মিলিত হইয়া হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, এমন কি অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে। পশ্চিম রণাঙ্গণে মিত্রপক্ষ জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে আকেন্ অধিকার করিয়াছে। প্রায় সমগ্র বেলজিয়াম্ এখন শত্রুর কবলমুক্ত। হল্যাণ্ডেও মিত্রপক্ষের সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে খাস জার্ম্মানীতে প্রবল আঘাত করিবার জন্য মিত্রপক্ষের বিশাল সেনাবাহিনী এখন প্রস্তুত। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষের ২০ হইতে ৩০ লক্ষ সৈন্য জার্ম্মানী আক্রমণের জন্য সমবেত হইয়াছে।

ইংলিশ প্রণালীর প্রধান বন্দরগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত এই সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রবল অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য, খাস জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক হইতে পরিচালিত অভিযানের সমন্বয় এখনও হয় নাই।

জার্ম্মানী তাহার নিজ ভূমিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সজ্ঞবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান হইলে গেরিলা যুদ্ধ চালাইবার জন্যও জার্ম্মান সমরনায়কগণ আয়োজন করিতেছেন। নিয়মিত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য হিম্‌লার ভোক্‌ষ্টুর্ম বা দেশরক্ষী বাহিনী গড়িয়াছেন; বেশী বয়স বা শারীরিক অপটুতার জন্য যাহারা সামরিক বিভাগে প্রবেশ করে নাই, তাহারা এই আধা-সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

মিত্রপক্ষ যেভাবে খাস জার্ম্মানীকে ঘিরিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মানীর সজ্ঞবদ্ধ প্রতিরোধ অতি সত্বর ভাঙ্গিয়া পড়া অসম্ভব নয়। তবে, জার্ম্মান জনসাধারণের মনোবল ক্ষুণ্ণ হইবার সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; জার্ম্মান সৈন্যও হিংস্রভাবে যুদ্ধ করিতেছে। অর্থনৈতিক দিক হইতেও জার্ম্মানী যে বেশ কিছু কাল যুদ্ধ চালাইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই, সঙ্কীর্ণ রণক্ষেত্রে জার্ম্মানীর প্রতিরোধ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। তবে, এই কথা সত্য যে, সজ্ঞবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান হইলে নাৎসী গেরিলা বাহিনীর কোন সামরিক গুরুত্ব থাকিবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সহায়ক হিসাবে গেরিলাবাহিনী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। কিন্তু নিয়মিত সেনাবাহিনী বিপর্য্যস্ত হইলে তখন স্বতন্ত্রভাবে গেরিলা তৎপরতার কোন সামরিক গুরুত্ব আর থাকিতে পারে না।

নাৎসী জার্ম্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্র

এক হাঙ্গেরি ছাড়া নাৎসী জার্ম্মানীর সমস্ত তাঁবেদার রাষ্ট্র তাহার দল ছাড়িয়াছে। হাঙ্গেরিতেও হিট্‌লারের পুরাতন মিত্র এড্‌মির্যাল্ হর্থি রুশিয়ার সহিত স্বতন্ত্র সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নাৎসীদের দালাল ফেরেঞ্জ সেলেজীকে নাকি তাঁহার স্থানে নিয়োগ করা হইয়াছে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া কেবল জার্ম্মানীর দলই ত্যাগ করে নাই; তাহারা সকলেই এখন জার্ম্মানীর শত্রুর শিবিরে সমবেত। যুদ্ধের অবস্থা নৈরাশ্যজনক হইলে স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করা এক কথা; আর অল্পকাল পূর্ব্বের শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া বহুকালের মিত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ অন্য কথা। শেষোক্ত অবস্থার রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের ম্যানারহিম্-ট্যানার-রাইতি, রুমানিয়ার এণ্টোনেস্কু ও বুলগেরিয়ার বোরিস্ গণ-শক্তির প্রবল শত্রু। কাজেই, সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি তাঁহারা স্বভাবতঃ বিরূপ; নাৎসী জার্ম্মানী ও ফ্যাসিস্ত ইতালী তাঁহাদের স্বাভাবিক মিত্র। ইঁহাদের মধ্যে রাজা বোরিস্, সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি তাঁহার দেশের জনসাধারণের অনুরক্তির জন্য প্রকাশ্যে সোভিয়েট-বিরোধী নীতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বুল্‌গেরিয়ার গণ-শক্তির বিরুদ্ধে তিনি নির্ম্মমভাবে দমননীতি চালাইয়াছেন।

এই সব দেশের সোভিয়েট-বিরোধী শিবিরে যোগদান আকস্মিক ব্যাপার নয়; ইহার পশ্চাতে এই সব দেশের গণ-বিরোধী রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা নাৎসীদের প্রতিকূল হওয়ায় ইহাদের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার স্বতন্ত্র সন্ধি হইলেই এই ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ পড়িত না। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াকে নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত করাইয়া সোভিয়েট রুশিয়া এই দুই দেশের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী শক্তিকে প্রবল হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ এই দুইটি দেশের শাসকশক্তি নাৎসী জার্ম্মানীর তাঁবেদারী করিবার সময় সেখানে যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী শক্তি গোপনে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই শক্তিই তখন বিজয়ী হইল। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধ চলিতে থাকিলে এই শক্তি ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিবে এবং নাৎসী জার্ম্মানীর অনুরক্ত প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ফিন্‌ল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর সহিত সংস্রব ত্যাগের দাবী জানাইয়া রুশিয়া ঐ দেশ হইতে জার্ম্মান সৈন্য অপসারণের সর্ত্ত উপস্থাপিত করিয়াছিল। জার্ম্মান সৈন্য স্বেচ্ছায় ফিন্‌ল্যাণ্ড ত্যাগ করে নাই; কাজেই, ফিন্‌ল্যাণ্ডকে তাহাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। এই নাৎসী-বিরোধী সামরিক তৎপরতার অনিবার্য্য প্রভাব ফিনিস্ রাজনীতিতে পড়িবেই।

জার্ম্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির কথা বাদ দিলে গ্রীস্, যুগোস্লেভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ জার্ম্মানীর অধিকারভুক্ত থাকিবার সময় ঐ সব দেশের প্রবল গণ-আন্দোলন প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। এই দেশগুলিতে যুদ্ধোত্তর কালে গণ-শক্তিকে যে আর ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হইবে না, তাহা সুস্পষ্ট। ইহাদের সহিত এখন বাল্টিক ও বল্‌কান্ অঞ্চলের নাৎসী তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতেও গণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হইল। বাল্টিক ও বল্‌কানের যুদ্ধোত্তর রাজনীতি সম্বন্ধে এখন এইরূপ আভাসই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ইউরোপের এই

বিস্তীর্ণ অংশে সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শগত প্রভাব বিস্তৃতি হইবে এবং জাতীয় স্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে প্রকৃত গণ-শক্তি এখানে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে।

পোল্যাণ্ডের সমস্যা

পোল্যাণ্ডের সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। তবে, লণ্ডনের পোলিস গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লুবলিনের পোলিস্ জাতীয় মুক্তি সংসদের একটা মীমাংসা এখন হওয়া সম্ভব। মিঃ চার্চ্চিল মস্কো হইতে ফিরিয়া গত ২৭শে অক্টোবর যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শীঘ্রই পোলিস্ সমস্যা মিটিবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন; মস্কোর তিনি ও মিঃ ইডেন্ এই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন।

পোলিস্ সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছিল যে, সীমান্ত সম্পর্কিত ব্যাপারে আর মতদ্বৈধ নাই; পোলিস্ জাতীয় সংসদের সহিত লণ্ডনের গভর্ণমেণ্টের মীমাংসার সব বাধাই অপসারিত হইয়াছে, কেবল মতবিরোধ ঘটিতেছে শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন সম্পর্কে। লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী; পোলিস্ জাতীয় সংসদ চান ১৯২১ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে। ১৯২১ সালের শাসনতন্ত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শে রচিত। এই শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া ১৯৩৭ সালে প্রেসিডেণ্টকে ডিক্টেটারী ক্ষমতা দিয়া এক ফ্যাসিস্ত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডে ১৯৩৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত ছিল; কাজেই, ঐ শাসনতন্ত্র পুনরায় প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের এই তৃতীয় শ্রেণীর কূটনৈতিক চালে ভুলিয়া পোল্যাণ্ডে পুনরায় ফ্যাসিস্তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট দিবেন না। মীমাংসা যদি হয়, তাহা হইলে সীমান্ত ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অনুসারেই তাহা হইবে। পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট ও পোলিস্ জাতীয় সংসদ মিলিত হইয়া যে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবে, তাহাতে পূর্ব্বের কোন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক আর স্থান পাইবে না।

ফ্রান্সের রাজনীতি

ফ্রান্স এখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের জন্য ফ্রান্সের কতকাংশে মিত্রপক্ষের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; অবশিষ্টাংশে জেনারল দ গলের নেতৃত্বে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়া এই গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইয়াছে।

জেনারল দ গলের স্বদেশানুরক্তি সন্দেহের অতীত হইলেও তিনি প্রাচীনপন্থী। তিনি ফ্রান্সকে জার্ম্মানীর কবলমুক্ত করিয়া তাহাকে আবার প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার স্বপ্নই বরাবর দেখিয়াছেন। কাজেই, স্বদেশে প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে দাঁড় করানো তাঁহার একান্ত প্রয়োজন। অথচ, জার্ম্মানীর অধিকারে থাকিবার সময় ফ্রান্সে বামপন্থীরা—বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট দল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জেনারল দ গলের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার পক্ষে তাহারা প্রবল বাধা; কারণ প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমূলে উচ্ছেদ করাই ইহাদের আদর্শ। এই বিষয়ে বামপন্থীদের একটা সুবিধাও হইয়াছে। ফ্রান্সের শিল্পপতিরা প্রায় সকলেই জার্ম্মানীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি ফরাসী জনসাধারণ অত্যন্ত বিরূপ। কাজেই, "জার্ম্মানীর সহযোগী" বলিয়া ফরাসী ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চালাইবার সুযোগ বামপন্থীরা পাইয়াছেন। দ গলের ইহা মনঃপূত না হইলেও ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি তাঁহার নাই। তবে, জেনারল দ গলকে আশ্রয় করিয়া বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীল দল ফ্রান্সের প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু জার্ম্মানীর অধিকারে থাকিবার সময় প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া ফরাসী জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, স্বদেশজাত বা বিদেশ হইতে আমদানী কোন কূটনৈতিক কৌশল ফরাসী ভূমিতে আর সফল হইবে না বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে অব্যবহিত ফ্রান্সে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সহিত গণ-রাজনীতির সঙ্ঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সের স্বদেশভক্ত সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার জন্য জেনারল দ গল যে জিদ ধরিয়াছেন, তাহাতে এই বিরোধের আভাস সুস্পষ্ট। নিয়মতান্ত্রিকতার ধুয়া তুলিয়া গণ-বাহিনীকে নিরস্ত্র করিবার এই চেষ্টা গণশক্তিকে পঙ্গু করিবার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যাহা হউক, প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের এই সঙ্ঘর্ষের ফলাফলের উপর কেবল ফ্রান্সের নয়—সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কাজেই ফরাসী রাজনীতির গতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করা উচিত।

স্পেনে গোলযোগ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তোষণ-নীতির পাঁকের মধ্যে ফ্রাঙ্কো-স্পেনের উদ্ভব হইয়াছিল। তোষণ-নীতিতে পুষ্ট হিট্‌লার ও মুসোলিনীর কৃপাশ্রিত জীব এই ফ্রাঙ্কো। তাঁহার মুরুব্বিদের পতনের পরও তিনি টিকিয়া থাকিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন আরম্ভ হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিল জেনারল ফ্রাঙ্কোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বৃটিশ জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সময় রাজনৈতিক জটিলতা এড়াইবার কূটবুদ্ধি যদি এই ফ্রাঙ্কো-স্তুতির কারণ হয়, তাহা হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। আর, জিব্রল্টরের নিরাপত্তার জন্য স্পেনের গণ-শক্তিকে দাবাইয়া রাখিবার চেম্বারলেনী বুদ্ধি যদি ফ্রাঙ্কো-প্রীতি সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আশঙ্কার বিষয়।

সে যাহা হউক, ৭ বৎসর পূর্ব্বে স্পেনের যে গণ-শক্তিকে দাবাইয়া ফ্রাঙ্কো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের সময় সেই শক্তি স্পেনে ও স্পেনের বাহিরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখন, ফ্রাঙ্কোর মুরুব্বিরা যখন অপসারিত হইতেছেন, ফ্রাঙ্কোর আদর্শ যখন নিশ্চিহ্ন হইতে যাইতেছে, তখন এই গণ-শক্তি স্বভাবতঃই উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্পেনীয় অঞ্চলে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ক্রমে সমগ্র স্পেনে এই তৎপরতা ছড়াইয়া পড়িবে এবং ইউরোপের ভূমি হইতে ফ্যাসিজমের এই ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সে তৎপরতা বন্ধ হইবে না। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ রাজনীতির সহিত স্পেনের রাজনীতি বিশেষভাবে জড়িত। ফ্রান্সে গণ-শক্তি যতই ক্ষমতা লাভ করিবে, স্পেনে গণ-আন্দোলন ততই প্রবল হইয়া উঠিবে।

সুদূর প্রাচী

প্রাচ্য অঞ্চলে ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ সৈন্যের অবতরণ এবং দক্ষিণ চীন সাগরে জাপানী নৌবহরের সহিত মার্কিণ নৌবহরের সঙ্ঘর্ষ উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। এই নৌ-যুদ্ধে জাপানী নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকায় এখন আসন্ন নির্ব্বাচন সম্পর্কে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই, সেখান হইতে পরিবেশিত সংবাদে কিছু অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়। তবে, এ কথা সত্য যে, জাপ-নৌবহর দারুণ আঘাত পাইয়াছে এবং জাপানের সমগ্র রক্ষা-ব্যবস্থায় ইহা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এক একটি করিয়া ইহার সমস্ত দ্বীপ যদি জাপানের হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত জাপানের সামুদ্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে, মালয় ও ব্রহ্মদেশের সহিত সংযোগও বিপন্ন হইবে। কাজেই, জাপান এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না; এই অঞ্চলে তাহাকে চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে।

৩১।১০।৪৪

ছাপাখানার ব্যবসায়

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্-সি

এদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইংরাজরাজত্বের প্রায় প্রথম হইতে—অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বৎসরের উপর। প্রথম ইংরাজেরাই ছাপাখানার পত্তন করেন; ক্রমে ভারতবাসীরা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশে ছাপাখানার কাজ যত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে এদেশে তাহা হয় নাই। শিক্ষার প্রচলন তত নাই, শিল্পের তত প্রসার নাই, তাই ছাপাখানার সংখ্যাও তত নাই।

তদুপরি ছাপাখানার কাজ তত ভদ্র কাজ বলিয়া এদেশের অধিবাসীরা গণ্য করেন না। ইহা যেন একটি শ্রম-শিল্প মাত্র। ইহাতে যে বুদ্ধি, বিদ্যা ও শিক্ষা প্রয়োজন এবং তদ্বারা যে ছাপার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহাও যেন স্বীকৃত হয় না।

মোটামুটি সকলের ধারণা এই যে ভাষা কম্পোজ করায় কিছু অক্ষর পরিচয় আবশ্যক, প্রুফ দেখায়ও কিছু দক্ষতা চাই—কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার 'জমাদারের' কাগজ, কালি ও যন্ত্রের খুঁটিনাটি জানা না থাকিলেও চলিবে।

ছাপাখানার কালি সম্বন্ধীয় আমেরিকার একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়াছে—'একজন ছাপার কালির রাসায়নিক চাই, যাঁহার বিভিন্ন রকম কাগজ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে,' ইহা হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে বিভিন্নরূপ কাগজের জন্য বিভিন্নরূপ কালি প্রয়োজন; সব রকম কালি দিয়া সব রকম কাগজে ছাপা ভাল হয় না।

এখানে প্রশ্ন এই যে এত রকম রকম কাগজ কেন তৈরী হয়? আর্ট পেপার, ব্যাঙ্ক পেপার, আইভরি ফিনিস, ক্রিমলেড, ডেলা কাগজ, ক্রাফট্ পেপার, নিউজ প্রিন্ট—কেউ চকচকে, কেউ অল্প স্বচ্ছ, কোনটি পালিস, কেউ অল্প পালিস, কোনটি খসখসে, কেউ বা স্বচ্ছ, কেউ নরম, কোনটি শক্ত, কোনটি বা রোঁয়া ওঠা। ইহার কোনটিতে কেবল ছবি ছাপা হয়, কোনটিতে বা চিঠি লেখা ভাল চলে। কোনটিতে হইবে প্যাকের কাজ ভাল, কোনটি বা সংবাদপত্র ছাপার কাগজ।

এই রকম রকম কাগজে হয় রকম রকম ছাপা এবং ছাপার যন্ত্রও সমান নয়। কোনটি ছাপে ঘণ্টায় ৬০ খানা, কোনটি ছাপে ঘণ্টায় ৬০০, কেউ বা ৬০০০।

ছাপার পদ্ধতি আর আগের মত একরূপ নাই। এখন আরও নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে—লিথো, অফ্‌সেট, ফটোগ্রেভিওর। টাইপের সঙ্গে কাগজের সংস্পর্শ না ঘটাইয়া বিদ্যুতের যোগে ছাপার জন্য আমেরিকায় পরীক্ষা হইতেছে।

বস্তুত এই বিজ্ঞানের যুগে শিল্পমাত্রেরই অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। প্রতি শিল্পদ্রব্যের তৈরীর পদ্ধতিই পরিবর্তিত হইয়াছে। তৎকালে শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ছাপাখানার শিল্পেও অনুরূপ উন্নতি হইয়াছে। ছাপার যন্ত্র ও কাগজের উৎকর্ষের কথা আগেই বলিয়াছি। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় কাগজ শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং এই রকম রকম কাগজের প্রয়োজন অনুসরণ করিয়া ছাপাখানার কালিও রকম রকম প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য বিশেষ অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও যত্ন আবশ্যক হইয়াছিল। এইরূপ যত্ন ও অনুসন্ধান করা হইয়াছে বলিয়াই যোগ্য কালি দ্বারা ছাপিয়া উপযুক্ত কাগজ হইতে অভিলষিত ছাপা পাওয়া যাইতেছে।

ফলত কোন্ বিষয়বস্তু কি কাগজে ছাপিলে দেখিতে ভাল হইবে, এবং সে কাগজে কোন্ কালি দিয়া তাহা ছাপিলে ভাল হইবে তাহা ছাপার পূর্বেই নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা কাগজ বা কালি উপযুক্ত না হওয়ায় দরুণ ছাপা ভাল হইবে না। এই বিষয়টির গুরুত্ব অধিকাংশ ছাপাখানাই বোঝেন না। বেশী দামী কালি কম দামী কাগজে ছাপিয়া তাহারা ভাল ফল চান। অথচ কম দামী কালি দ্বারা ঐ কাগজ ছাপিলে হয়তো আরও ভাল ফল পাওয়া যাইত। যে কাগজে কালি শুষিয়া যাইতে পারে তাহাতে চকচকে ছাপা সাধারণ কালিতে হয় না। কিন্তু ঐ কালিতেই চকচকে ছাপা হয় সেই কাগজে, যাহা কালি কম শুষিয়া খায়। কম শুষিয়া খাওয়া কাগজে যদি কালি শুকাইতে দেরী হয় তবে যে শোষক (Drier) ব্যবহার করিতে হয় তাহা অনেক ছাপাখানা না জানিয়া কালির উপর দোষ চাপান। নারিকেল তৈল যে হাওয়ায় শুকায় না, সে খেয়াল না করিয়াই অনেক ছাপাখানা তাহা কালিতে মিশান। অথচ আবশ্যক মত তরল করায় জন্য যে ঘনীভূত তিসির তৈল মিশান উচিত, আমরা দেখিয়াছি, ৫০ বৎসর ছাপাখানা চালাইয়া আজও সে জ্ঞান হয় নাই। নারিকেল তৈল দিবার ফলে ছাপা হয় অমসৃণ, অক্ষর অস্পষ্ট এবং কখনও কখনও কাগজ হয় দাগধরা। কেহ কেহ কালো কালিতে কেরোসিন মিশান। সংবাদপত্র ছাপার কালিতে কেরোসিন মিশাইলে এত মারাত্মক হয় না বটে, কিন্তু উহাতে কালির বর্ণক্ষমতা যে হ্রাস পায়, ইহা বলাই বাহুল্য।

ছাপাখানার কালির বর্ণ নানারূপ। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, প্রভৃতি নানা রঙ। এক নীলকে অন্য নীলে পরিণত করা সহজ নহে। উহার উপাদান না জানিয়া অন্য বস্তু উহাতে মিশাইলে সে ফল স্থায়ী না হইতে পারে এবং এইরূপ করিয়া অনেক ছাপখানা পরে বিপন্ন হইয়া কালির উপর দোষ আরোপ করেন।

বস্তুত এখন অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের কালির কারখানা অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক দ্বারা পরিচালন করিয়া থাকেন। কারণ নব নব কারণ উদ্ভাবন হেতু তাহার সহিত সমপাদে চলার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সর্বদা সজাগ রাখা প্রয়োজন। ছাপাখানার কাগজও তেমনি শিক্ষিতজনের উপেক্ষার বস্তু হইয়া রহিতে আর

চলে না। শিক্ষিতজন ছাপাখানার মালিক হইলেই চলিবে না—তাহার হাতে কলমে কাজ জানা চাই। গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া তাঁহাকে বিভিন্ন ছাপার যন্ত্র, কাগজ ও কালির বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া তদনুযায়ী কার্য পরিচালন করিতে হইবে—অন্যথা যোগ্যতরেরা তাহাদের পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে।

ছাপার কাজের কতখানি উন্নতি বর্তমানকালে হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা এই প্রবন্ধে আমরা করিয়াছি। এ অবস্থায় ছাপাখানার কাজ আর এখন অজ্ঞদের নহে। বস্তুত ছাপার কাজের আধুনিক জ্ঞান না থাকিলে ভালভাবে ছাপাখানা পরিচালন করা বা ছাপার উৎকর্ষ সাধন করা যে সম্ভব নয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে উচ্চশিক্ষিত অনেক ভদ্রসন্তান ছাপাখানার কাজই জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা যথার্থই ছাপার কাজ ভাল জানেন। তাহাদের অনেকের শিক্ষা বিদেশে। সেখানে তাঁহারা হাতে কলমে কাজ করিয়া দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন এদেশে নিজ নিজ ছাপাখানায় এমন সুন্দর ছবি, পুস্তক, কার্ড ইত্যাদি ছাপিতেছেন যে অনেক বিদেশী ব্যবসায়ী আর স্বদেশ হইতে ঐ সব ছাপাইয়া না আনিয়া এদেশেই তাহাদের দ্বারা ছাপাইয়া নিতেছেন।

বস্তুত আমাদের আশা এই যে এদেশে ছাপাখানার প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। বঙ্গদেশে জেলায় জেলায় শিক্ষাকর বসিতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হইবে এবং ইহা লোক-শিক্ষার্থে ব্যয়িত হইবে। পুস্তক আবশ্যক হইবে এবং শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মুদ্রিত বস্তু আবশ্যক হইবে। এই সময় শিক্ষিতজন এই কাজকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিলে এই শিল্পের উন্নতি হইবে এবং এই কাজ আর অপাংক্তেয় রহিবে না।

ক্রুক্‌স্ সাহেবের আধ্যাত্ম ও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

দশম শ্রেণী

সরাসরি লেখা (Direct writing)—অর্থাৎ উপস্থিত কোন ব্যক্তির দ্বারায় লিখিত নয় এইরূপ লেখার আবির্ভাব হওয়া

পূর্ব্ব হইতে গোপনে চিহ্নিত কাগজে বিশেষ কড়াকড়ি বন্দোবস্তের মধ্যে অনেক বার অনেক লেখা, অনেক লিখিত সংবাদ অন্ধকারে পাইয়াছি এবং তৎকালে কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া লিখিলে যেরূপ খস্‌খস্ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হইতে শুনিয়াছি। যেরূপ অবস্থায় ও আমার সর্ত্ত অনুযায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে এরূপ লেখা বাহির হইয়াছে তাহাতে আমার চক্ষের সম্মুখে লিখিত অক্ষরগুলি আপনা আপনিই লিখিত হইলে যেরূপ বিশ্বাসজনক হয় এইরূপ লেখা সেইরূপই বিশ্বাসজনক। স্থানাভাবে তাহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় কেবল দুইটি মাত্র ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি—সেই দুইটি ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে আমার চক্ষু ও কর্ণ উভয়েই সাক্ষ্য দিয়াছে।

প্রথম ঘটনাটি অন্ধকারে হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা আলোতে হওয়ার অপেক্ষা কম বিশ্বাসজনক নয়। আমি মিডিয়াম মিস্ ফক্সের পার্শ্বেই বসিয়াছিলাম—আর কেবল দুইজন সেখানে উপস্থিত ছিল—একজন আমার স্ত্রী—অপর, আমার সম্পর্কিত মহিলা। আমি মিডিয়ামের দুই হাত আমার এক হাতে ধরিয়া ছিলাম, আর তাহার দুই পা আমার পায়ের উপর ছিল। আমাদের সম্মুখে টেবিলের উপর কাগজ ছিল আর আমার মুক্ত হাতে একটি পেন্সিল আমি ধরিয়াছিলাম।

একটি জ্যোতির্ম্ময় হস্ত ঘরের ছাতের দিক হইতে নামিয়া আসিয়া আমার কাছে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া আমার হাত হইতে পেন্সিলটি লইল ও দ্রুতভাবে কাগজের উপর লিখিল ও পেন্সিলটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তৎপরে আমাদের সকলের মাথার উপর উঠিয়া ক্রমে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়া গেল।

দ্বিতীয় ঘটনা যাহা উল্লেখ করিতেছি তাহা ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত বলা যায়। তবে অনেক পরীক্ষায় (experiment) সাফল্যের অপেক্ষা ভাল বিফলতা, সাফল্যের অপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ। এই ঘটনাটি আমার নিজের ঘরে আলোতে ঘটে—সেখানে কেবল আমার কয়েকজন বন্ধু মিডিয়ম হোম্ (medium) ছিল। অনেক দিন হইতে, যাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, বোঝা গিয়াছিল যে সে সন্ধ্যায় যে শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা বিশেষ শক্তিশালী। তজ্জন্য আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একবন্ধু যেরূপ তাঁহার সম্মুখে আপনাআপনিই লিখিত সংবাদ পাইয়াছিলেন শুনিয়া ছিলাম সেইরূপ আমার সম্মুখে কোন লেখা বাহির হউক এই ইচ্ছা প্রকাশ করি। তৎক্ষণাৎ অক্ষরে লিখিত উত্তর পাইলাম—"আমরা চেষ্টা করিব।" টেবিলের উপর তাহার মধ্যস্থলে কয়েক তক্তা কাগজ ও একটি পেন্সিল ছিল। তখন পেন্সিলটা তাহার সরু শীষের (point) উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাগজের দিকে কয়েকবার যেন ইতস্ততঃ করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া পড়িয়া গেল। পেন্সিলটা আবার উঠিল কিন্তু আবার পড়িয়া গেল। তৃতীয়বার আবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। এইরূপ তিনবার নিষ্ফল চেষ্টার পর সেই পেন্সিলটার নিকটে যে একটা ছোট পাতলা কাষ্ঠ খণ্ড (lath) টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল তাহা পেন্সিলের কাছে সরিয়া যায় ও টেবিল থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠিল ; পেন্সিলটি আবার শীষের উপর ভর দিয়া উঠিল ও তাহার পর সেই কাষ্ঠখণ্ডের গায়ে হেলান দিয়া ও দুইটিতে মিলিয়া কাগজের উপর যেন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পড়িয়া গেল—আবার দুইটিতে মিলিয়া চেষ্টা করিল। তৃতীয়বার চেষ্টার পর সেই কাঠের টুকরাটি লিখিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল ও ঐ পেন্সিলটি কাগজে পড়িয়া রহিল। তখন লেখার অক্ষরে আমাদিগকে জানাইল—'আপনি যেরূপ বলেছিলেন তাহা করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমাদের শক্তি নিঃশেষ হইয়াছে।'

একাদশ শ্রেণী

ছায়ামূর্ত্তি ও মুখ

এরূপ ঘটনা আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি। ইহাদের আবির্ভাব হওয়া এমন সূক্ষ্ম (delicate) পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যে পরীক্ষার্থে সন্তোষজনক ব্যবহার মধ্যে আমি কয়েকবার মাত্র উহা প্রত্যক্ষ করেছি। আমি দুইটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করিব।

একদিন সন্ধ্যার গোধূলি আলোতে আমার গৃহে মিয়াদে মিষ্টার হোম্ আছেন—ঐ সময়ে মিষ্টার হোম্ হইতে ৮ ফুট দূরে একটি জানালার পর্দা নড়িতে দেখা গেল। একটি কালো অর্দ্ধ স্বচ্ছ ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া

তাহার হাত দিয়া পর্দা নাড়িতেছে তাহা আমরা উপস্থিত সকলেই দেখিতে পাইলাম। আমরা দেখিতে দেখিতে সেই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল ও পর্দা নড়া বন্ধ হইল।

নিম্নোক্ত ঘটনাটি আরও বিস্ময়কর। এবারেও মিষ্টার হোম্ মিডিয়াম ছিলেন। ঘরের এক কোণ হইতে একটি ছায়ামূর্ত্তি (phantom form) আসিয়া একটি একর্ডিয়ন্ (ছোট হাত হারমোনিয়ামের মত একটি বাদ্য যন্ত্র) তুলিয়া লইয়া তাহা বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেখানে উপস্থিত সকলেরই সেই ছায়ামূর্ত্তি কয়েক মিনিট ধরিয়া দৃষ্টিগোচর ছিল এবং সেই সময়ে মিষ্টার হোম্‌কেও দেখা যাইতে ছিল। উপস্থিত সকলের কাছ থেকে ঈষৎ দূরে উপবিষ্ট মহিলার কাছে ঐ ছায়ামূর্ত্তি যাওয়ায় তিনি মৃদু চীৎকার করিয়া উঠায় উহা অন্তর্ধান করিল।

দ্বাদশ শ্রেণী

কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্ত—যাহা কোন বাহিরের বুদ্ধিমান কর্ত্তার অস্তিত্ব জ্ঞাপক

ইতিপূর্ব্বে অনেক ঘটনারই উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা বুদ্ধির দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত। এখন এই বুদ্ধির উৎপত্তির স্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন উঠিতেছে। এই বুদ্ধি কি মিডিয়ামের,—না, ঘরে কোন উপস্থিত ব্যক্তির—না, বাইরের অন্য কাহারও ? এ বিষয়ে এস্থলে কোনরূপ সুনিশ্চিত মত বলিতে চাহি না, তবে বহু সময়ে যদিও আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে সেই সকল ঘটনা ঘটার উপর মিডিয়ামের ইচ্ছা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক আছে, * তথাপি কতকগুলি ঘটনা ঘটার কালে এমন কিছু ছিল যাহা বাহিরের কোন বুদ্ধিমান কর্ত্তার অস্তিত্ব সপ্রমান করে। স্থানাভাবে আমার সিদ্ধান্তের সাপেক্ষ সকল যুক্তি এখানে সন্নিবেশ করিতে পারিলাম না। অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে দুই একটি মাত্র ঘটনা আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

যখন অনেকগুলি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটিতেছে—যাহার মধ্যে কতকগুলি ঘটনা মিডিয়ামের অজ্ঞাত এরূপ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি এক সময়ে মিস্ ফক্সের সহিত একস্থলে উপস্থিত ছিলাম যখন মিস্ ফক্স্ একজনের সহিত এক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তৎকালে অন্য একজনের জন্য তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে আর এক লিখিত সংবাদ বহির্গত হইতেছিল—এবং সেই সময়ে আর ব্যক্তির জন্য টেবিলের ঠক্‌ঠকানির দ্বারায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতে অন্য বিষয়ে একটি সংবাদ দেওয়া হইতেছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটি বোধহয় আরও চিত্তাকর্ষক।

একদিন মিষ্টার হোমের সহিত সিয়ান্সে, আলোতে, সেই পূর্ব্বোক্ত কাঠের পাতলা ছোট তক্তাখণ্ড টেবিলের উপর দিয়া আমার কাছে সরিয়া আসে ও আমার হাতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া যেন সাঙ্কেতিক লেখায় আমাকে একটি সংবাদ দেয়—আমি অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিতে ছিলাম এবং যে অক্ষরটি ঠিক তাহার মনঃপূতঃ সেই অক্ষরটি উচ্চারণ কালে আমার হাতে মৃদু আঘাত হইতে ছিল। অর্থাৎ যে যে অক্ষর আবৃত্তিকালে আমার হাতে সেই কাঠের টুকরা আঘাত করিতে ছিল সেই অক্ষরগুলি পরে পরে লিখিয়া লইয়া তাহাতে একটি সংবাদ হইল। সেই কাঠের টুকরার অপরপ্রান্ত মিষ্টার হোম্ থেকে কিছু দূরে টেবিলে সংলগ্ন ছিল।

আমার হাতের উপর আঘাতগুলি এত সুস্পষ্টভাবে হয় যে সেই কাঠের টুকরা যে কোন অদৃশ্য শক্তির সম্পূর্ণবশে পরিচালিত হইতেছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায়, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারায় এই কাঠের টুকরা চালিত হইতেছে তাহা কি এইরূপ আঘাতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া মর্স অক্ষরে (morse alphabet) টেলিগ্রামের সংবাদের মত আমার হাতে আঘাত করিয়া কোন সংবাদ দিতে পারে ?" (গৃহের মধ্যে উপস্থিত কেহই মর্স অক্ষর জানিত না একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল—আমিও তাহা ভাল জানিতাম না।) এই কথা বলিবামাত্র আঘাতের প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়া আমি যে ভাবে চেয়ে ছিলাম সেইভাবে আমাকে সংবাদ জানাইল। মর্স অক্ষরগুলি এত দ্রুতভাবে আমার হাতে হইতে ছিল যে আমি মাঝে মাঝে দুই একটি কথা ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারি নাই সুতরাং সেই সংবাদটি বুঝিতে পারি নাই কিন্তু ঐ সাঙ্কেতিক শব্দগুলি এত সুস্পষ্ট যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে অপর প্রান্তের সেই সংবাদদাতা একটি দক্ষ টেলিগ্রামকারী।

আর একবার একটি মহিলা প্ল্যান্‌চেটের দ্বারায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হাতে লিখিতে ছিলেন। সেই প্ল্যান্‌চেটে লেখা যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহারই মস্তিষ্কের কাজ নয় (unconscions cerebration) তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে ছিলাম। কিন্তু প্ল্যান্‌চেট্ যেমন সর্ব্বদাই করিয়া থাকে জেদ করিয়া বলে যে যদি ও তাহা ঐ মহিলার হস্ত ও বাহুর দ্বারায় নড়ান হইতেছে তথাপি যে বুদ্ধি দ্বারায় উহা পরিচালিত হইতেছে তাহা একটি অদৃশ্য সত্তার এবং সেই সত্তাই যেমন কোন বাদ্যযন্ত্রের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করে সেইরূপভাবে তাঁহার মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া তাঁহার হস্তের পেশীগুলিকে নাড়িতেছে। আমি তজ্জন্য সেই অদৃশ্য সত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি এই ঘরের মধ্যের সকল জিনিষ দেখিতে পাইতেছেন ?" প্ল্যান্‌চেট্ লিখিয়া উত্তর দিল—"হ্যাঁ"। তখন আমার পশ্চাতে একটি টেবিলের উপর একখানি 'টাইম্‌স্' নামক খবরের কাগজ পড়িয়াছিল তাহার উপর তাহা না দেখিয়া আমার আঙ্গুল দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি দেখিয়া এই খবরের কাগজ পড়িতে পার কি ?" প্ল্যান্‌চেট্ উত্তর করিল—"হ্যাঁ"। আমি বলিলাম "বেশ, তুমি যদি দেখিতে পাও তো আমার আঙ্গুল দিয়া যে কথাটি ঢাকা আছে তাহা লিখিলে আমি বিশ্বাস করিব। প্ল্যান্‌চেট্ ধীরে ধীরে নড়িতে আরম্ভ করিল ও অতি কষ্টে লিখিল "হাউএভার" (however)। আমি আঙ্গুল তুলিয়া দেখিলাম আঙ্গুলের টিপের নীচেয় "হাউএভার" কথাটি ঢাকা আছে।

আমি যখন পরীক্ষা করিতেছিলাম তখন আমি ইচ্ছা করিয়াই খবরের কাগজটি দেখি নাই। সেই মহিলাটির পক্ষে চেষ্টা করিয়া তাহা দেখা অসম্ভব—কারণ তিনি এক টেবিলে বসিয়া আছেন—(তাঁহার সম্মুখে আমি ছিলাম) আমার পশ্চাতে আর একটি টেবিলের উপর খবরের কাগজখানা ছিল—মধ্যে আমার শরীরের ব্যবধান ছিল।

* ইহা হইতে কেহ যেন না ভুল করেন যে আমি বলিতেছি যে মিডিয়ামরা জ্ঞাতসারে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ঘটনা ঘটাইয়াছেন কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় যেন মিডিয়ামের অজ্ঞাতসারে তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছে।



দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতে শিল্পপ্রসার ও ভারতের আমদানী বাণিজ্য

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কল্যাণে কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে কোন উৎসাহ না পাইয়াও ভারতে কিছু কিছু শিল্পপ্রসার হইয়াছে। এই সকল শিল্প যদিও যুদ্ধের অনিবার্য্য প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে তবু শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনেই এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ভারতের শিল্পবিপ্লব সমাগতপ্রায় এবং এখন আর বাহিরের কোন শক্তির পক্ষেই এদেশের নবজাগ্রত শিল্পপ্রসারের ইচ্ছা দমাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। বাস্তবিক প্রকৃতি ভারতবর্ষকে যে ভাবে দুহাতে আপনার সম্পদ ঢালিয়া দিয়াছেন তাহাতে এদেশের পক্ষে চিরকাল 'Hewer of wood and drawer of water' হইয়া থাকা লজ্জার কথা এবং সেদিক হইতে বর্ত্তমানে আমরা নূতন আশার আলো দেখিতে পাইতেছি বলা চলে। ভারত সরকারের মূলধন নিয়ন্ত্রণ নীতি যতই প্রতিক্রিয়াশীল হউক, ভারতের গণচেতন শাসনযন্ত্রের সাত হাজার মাইল দূরে প্রসারিত দৃষ্টির কিছু পরিমাণ বিকলতা সৃষ্টি করিয়াছে, তাই বালচাঁদ হীরাচাঁদ, বিড়লা, ডালমিয়া প্রভৃতির শিল্পোৎসাহ গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও অবদমিত হইতেছে না।

ব্রিটিশ জনসাধারণের একাংশ ভারতের শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনেরই সুবিধার কথা সম্যকভাবে অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ব্রিটেনবাসী ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আজও অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকীর্ণ মনোভাব জোর করিয়া আঁকড়াইয়া আছেন। ভারতে শিল্প প্রসারিত হইবে না, ভারতের লোক অশিক্ষিত থাকিবে, ব্রিটেন ভারতে নির্বিরোধে বাণিজ্য চালাইয়া যাইবে,—এই যে দুর্নীতি বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই নীতি তাহারা আজও ত্যাগ করে নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ভারতের মত বিপুলায়তন দেশে অসংখ্য জনমণ্ডলীর হাতে পণ্য পৌঁছাইয়া দিবার লোভে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র ভারতকে এমন অসহায় ভাবে নিঃস্ব করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন যে ভারতে বাণিজ্য চালাইয়া ব্রিটেনের পক্ষে আশানুরূপ লাভবান হওয়া কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। প্রয়োজন তাহার অসামান্য সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থাভাব এমনি নিদারুণ যে ভারতবাসীর পক্ষে বেশী টাকার বিলাতী মাল কেনা অসম্ভব। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির চেয়ে আমেরিকা বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতে কলকারখানাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বেতন দানের মধ্য দিয়া অথবা শিল্পপ্রসারে সাহায্যের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এদেশের সাধারণ জীবনমান বাড়াইবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর। অবশ্য আমেরিকাও যে আমাদের শোষণ করিতে চাহে না তাহা নয়, বরং ব্রিটেনের চেয়ে এদিক হইতে তাহার পক্ষে অধিকতর লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে, তবু ভারতবাসীর কাছে আমেরিকার অনুসৃত নীতি বেশী পরিমাণ সমাদৃত হইতেছে। ভারতে যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় এবং কলকারখানাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের জনসাধারণের অর্থস্বাচ্ছল্য দেখা দেয়, তাহা হইলে চল্লিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত এই দেশে যে অধিক পরিমাণ বিদেশী মাল বিক্রয় হইবে তাহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাথাপিছু মাসে এক টাকা আয় বাড়িলে এদেশে বৎসরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার নূতন বাজার সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই ভাবে যে কোন আয় বৃদ্ধিই বৃহত্তর বাজারের সুযোগ সৃষ্টি করিবে। ইংলণ্ডের সরকারীমহল যদিও ভারতে শিল্পপ্রসারের ফলে এদেশের বাজার বেহাত হইবার আশঙ্কায় অত্যধিক শঙ্কিত এবং এ সম্পর্কে একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া তাহারা বলিয়াছেন :—'The intensive development and diversification of Indian industries now occurring in expected to reduce united kingdom post war export to still lower level' তবু আসন্ন ভারতীয় শিল্পবিপ্লবকে স্মরণ করিয়া আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ব্রিটেন ভারতের সব চেয়ে ঘনিষ্ট পরিচয় দাবী করে এবং ভারতের বাজারে তাহার মাল চালাইবার যে সুবিধা আছে, অন্য কোন দেশের পক্ষেই সে সুবিধা লাভ করা সম্ভব নহে। ভারতে শিল্পাদি প্রসারিত হইলে ভারতবাসীর আয় বাড়িবে এবং তাহার ফলে তাহার নিজ দেশে উৎপন্ন মালও যেমন সে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে, বিদেশের রপ্তানী মালের পরিমাণও তেমনি বাড়িয়া যাইবে। এই সম্পর্কে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশীয় পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সহিত আমদানী বাণিজ্য বৃদ্ধির দুইটি উদাহরণ অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

জাপান—	১৯১৩ (১০ লক্ষ ইয়েন হিসাবে)	১৯৩৪ (১০ লক্ষ ইয়েন হিসাবে)
জাতীয় আয়—	২,৭০০	১২,৫০০
দেশীয় শিল্পজাত পণ্যের মূল্য	১,২৫০	৬,১০০
আমদানীকৃত পণ্য	৭২৯	২,২৭৭
রপ্তানীকৃত পণ্য	৬৪৩	১,৮৬২

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—	১৯০০ সাল (১০ লক্ষ ডলার হিসাবে	১৯২৬—৩০ (১০ লক্ষ ডলার হিসাবে)
জাতীয় আয়—	১৯,৩৬০	৭৮,৭০০
দেশীয় শিল্পজাত পণ্যের মূল্য	৬,৮০০	৩৫,০০০
আমদানীকৃত পণ্য	৮৫০	৪,০৩৩
রপ্তানীকৃত পণ্য	৪৮৫	২,৭৮৮*

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৩৪ সালের জাপানে প্রায় ৫০০ কোটী ইয়েন অধিক মূল্যের পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইলেও সেই তুলনায় রপ্তানি বাড়িয়াছে মাত্র ১৪০ কোটী ইয়েন, অর্থাৎ দেশেই প্রায় সমস্ত পণ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; অথচ শিল্প সম্প্রসারণের ফলে টাকা বাড়ার জন্য আমদানীকৃত পণ্যের পরিমাণও ৭০ কোটি ইয়ান হইতে ২২৮ কোটি ইয়েনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের জীবন-মান বৃদ্ধি পাইলে এই কথা ভারতের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হইবে। বস্ত্রাদির ব্যাপারে এই যুক্তির কিছুটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে অন্যান্য শিল্প যদি সম্প্রসারিত হইত এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্র কিনিবার সঙ্গতি যদি সত্যই থাকিত তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান প্রসার আমদানী-বস্ত্রের যুগ অপেক্ষা সমৃদ্ধ হইলেও এখনকার মিলের উৎপাদনে ভারতবর্ষের কিছুতেই কুলাইত না এবং হয় বাহির হইতে

* অধ্যাপক ইউজিন ষ্ট্যালির World Economic development গ্রন্থের হিসাব।

অধিক পরিমাণ কাপড় আনিতে হইত, আর না হয় এদেশে কাপড়ের মিলের সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়াইতে হইত। ভারতে শিল্প প্রসার করিতে এদেশের অপর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই এবং শিল্প প্রসারের প্রচেষ্টা এখানে ব্যর্থ হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। জাপান সরকারী উৎসাহে বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ বা সুবিধার দিক হইতে তাহার সহিত ভারতের তুলনাই করা চলে না। নিম্নে অধ্যাপক ব্রাউনের Industrialisation and Trade গ্রন্থ হইতে উভয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল :—

	কয়লা সম্পদ (১০ লক্ষ টন হিসাবে)	সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ (১০ লক্ষ অশ্বশক্তি হিসাবে)	লৌহমাক্ষিকে লৌহের অস্তিত্ব (১০ লক্ষ টন হিসাবে)	কর্ষণযোগ্য ভূমি (হাজার একর হিসাবে)	জনসংখ্যা (১০ লক্ষ হিসাবে)
জাপান	১৬,৪০০	৭·২	৩০	১৬,৫০০	৭২
ভারতবর্ষ	২০,৬০০	৩৯	২,৩৩০	৫০৪,০০০	৩৯০

যুদ্ধের পরে বৃটেনকে যদি বাঁচিতেই হয় তাহা হইলে তাহার রপ্তাণি বাণিজ্য বাড়াইতেই হইবে এবং মোটামুটি যুদ্ধের পূর্ব্বের দ্বিগুণ মূল্যের (৬০ কোটির স্থলে ১২০ কোটি পাউণ্ড) পণ্য বিদেশে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা না করিলে বৃটেনের পক্ষে আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এদিকে আমেরিকাও যুদ্ধের সময় তাহার পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি এমনি বাড়াইয়া ফেলিয়াছে যে তাহার পক্ষেও যুদ্ধের পরে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় রপ্তানী বাড়ান অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। আমেরিকার জনসাধারণের বেকারত্ব সম্পূর্ণভাবে ঘুচাইতে হইলে বা দেশে এখনকার মত সব লোকের কাজের ব্যবস্থা বজায় রাখিতে গেলে (full employment) আমেরিকাকে আগেকার ৭ শত কোটি ডলারের স্থানে ১২ হইতে ১৪ শত কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করিতে হইবে। এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি এখনকার মত থাকে তাহা হইলে এই যুদ্ধের শেষের পরে কাহারও পক্ষেই বাড়তি পণ্য ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না এবং ফলে ১৯৩২—৩৩ সালের চেয়ে ভয়াবহ আকারে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দিবে। আমেরিকা তাহার ভবিষ্যত বাণিজ্য স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত বলিয়াই যে সকল দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া পরিচিত এবং যেখানকার অসংখ্য জনমণ্ডলী শিল্পে পিছাইয়া থাকিবার ফলে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, শিল্প প্রভৃতির বিস্তারের দ্বারা আমেরিকা তাহাদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিয়া ক্রয় ক্ষমতা বাড়াইয়া দিতে চায়। ভারতবর্ষ, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি এদিক হইতে আমেরিকার বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। ১৯৩৮ সালের ৪৭ কোটি পাউণ্ড হইতে ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্য কমিতে কমিতে ১৯৪৩ সালে ২৩ কোটি পাউণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যুদ্ধের উত্তেজনায় জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ হয়তো তেমনভাবে রাষ্ট্রপরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনকেও যে বাঁচিতে হইবে একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সেদিন ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে বাঁচাইতে পারে যদি ভারতবাসীর আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভারতে শিল্পাদি প্রসারিত হইলে এবং এখন হইতে ব্রিটেন সে বিষয়ে ভারতকে সাগ্রহে যন্ত্রপাতি যোগাইয়া সাহায্য করিলে যুদ্ধের আগেকার তুলনায় বহু গুণ বেশী বিলাতী মাল তাহারা অনায়াসেই এদেশে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ষ্টার্লিং পাওনার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ আজ শিল্পপ্রসারের জন্য ব্রিটেনের নিকট হইতে যে যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ কামনা করিতেছে ব্রিটেনের উচিত আর বিলম্ব না করিয়া ভারতের দাবী পূরণ করা। এই দাবী পূরণের ফলে ভারতের সহিত ব্রিটেনের যে বন্ধুভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার দৌলতে আগামী দিনের স্বচ্ছল ভারতবর্ষ স্বদেশী জিনিষ বহু গুণ বেশী ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে বহু গুণ বেশী বিলাতী অথবা বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী

ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হয় তো প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন মুনাফা ভোগ করেন না, কিন্তু ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কাজকারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের স্বজাতি এখান হইতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্বদেশে লইয়া যায় তাহা রাজার সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাত সমুদ্র পারের ঘরের কথা পাটকলের সাহেবদের স্মৃতিপটে সদাজাগ্রত না থাকিলে এতদিন বাংলার পাটকলগুলির ইঁট তাহারা সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কারবার ফাঁদিয়া আমাদেরই পরিশ্রমের সুবিধা লইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা ভোগ করিতেছেন, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী তাহাদের অন্যতম। কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি করিয়া এই কোম্পানী ১৮৯৯ সালে কলিকাতার ট্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং সেই চুক্তি অনুসারেই ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন এই সহরে ট্রাম পরিচালনার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার অধিকার পাইয়াছেন। এই উপলক্ষে গত জুন মাসে কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়াছেন যে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে চুক্তি অনুযায়ী তাহারা ট্রামওয়ে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। ট্রাম কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ কর্পোরেশনকে অনেকটা নিরুৎসাহ করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক পত্রে কর্পোরেশনের নানা আইনগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে হাওড়া, টালিগঞ্জ, বেহালা ময়দান প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাম চালাইবার অধিকার কর্পোরেশনের নাই। তাছাড়া কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবার পর ট্রাম পরিচালনায় অক্ষমতা জানানো হইলে বিরাট আর্থিক ক্ষতির দায়িত্বও কর্পোরেশনকে বহন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এ ধরণের উপদেশ কর্পোরেশনের মত সমৃদ্ধ পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছে মূল্যহীন এবং সম্প্রতি কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত কর্ম্মচারীর বেতন ও স্থায়ীত্বের চুক্তি স্বীকার করিয়া এবং সর্ব্ববিধ আর্থিক ক্ষতির দায়িত্ব লইয়া কর্পোরেশন কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের হাত হইতে ট্রাম চালাইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন। এই দায়িত্ব ভার কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বহন করিতে পারেন এমনি অর্থবান ও যোগ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের সন্ধানে কর্পোরেশন সম্প্রতি টেণ্ডার চাহিয়াছেন।

বলা বাহুল্য কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই সমীচীন হইয়াছে এবং ইহার ফলে এদেশের বহু টাকা অতঃপর এদেশেই থাকিয়া যাইবে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর মোট মূলধন প্রায় ৪ কোটি টাকা, আর ৮০ লক্ষ টাকা আয়ের মাত্র ৫ লক্ষ ৬ লক্ষ টাকা লাভ হইলেও বৎসরে যে টাকা শ্বেত হস্তী পুষিতে ব্যয় হয় তাহাও অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়। বেতন ভাতা ইত্যাদি করিয়া শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা ট্রাম কোম্পানী হইতে যথেষ্ট টাকা লইয়া যান। উপস্থিত এই সব কর্ম্মচারীদের বহাল রাখিলেও ইহাদের কর্ম্মকাল শেষ হইলে এই ধরণের ব্যয়বহুল নিয়োগ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব হইবে। বিদেশী অংশীদারগণ যে শেয়ারসমূহ ধরিয়া আছেন এবং সেইগুলির জন্য তাহারা যে লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন, সমুদয় অর্থ-ই অতঃপর এদেশে বিতরিত হইবে। তাছাড়া বিদেশে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি অর্ডার দেওয়ার জন্য যে রাশীপ্রমাণ অর্থবিতরণের ব্যবস্থা আছে তাহাও এখন কিছু পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার আশা আছে। কর্পোরেশন এজেন্ট নিয়োগ করিয়া

গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করিলে ট্রাম পরিচালনার লাভ হইতে একাংশ পাইয়া কর্পোরেশন যেমন লাভবান হইবে, সেই সঙ্গে একেণ্ট বা এদেশের অংশীদারগণ বহু টাকা লভ্যাংশ হিসাবে পাইয়া নূতন নূতন শিল্প প্রসারের উপযোগী মূলধন সংগ্রহে অবশ্যই সাহায্য করিতে সক্ষম হইবেন। কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশীয় পরিচালনাধীনে থাকিয়া ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপারে বহু বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তাহাতে যাত্রীদের ক্লেশের আর সীমা থাকিবে না। অবশ্য অজ্ঞকার ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বলা একথার উত্তর এখন হইতে ঠিক দেওয়া যায় না এবং বর্ত্তমানে কোম্পানী পরিচালিত ট্রাম গাড়ীতে আমরা যে অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহাও সহ্য করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। দেশীয় পরিচালনায় ইহার চেয়ে ব্যবস্থা খারাপ হইবে একথা এখন হইতেই প্রচার করার কোন যৌক্তিকতা নাই। আর তাহাড়া আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এই ব্যবস্থার ফলে বিদেশী শোষণের হাত হইতে কিছু পরিমাণে ভারতবর্ষ রেহাই পাইবে এবং আমাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ আমাদের দেশের মধ্যেই নূতন অর্থের আমদানী করিতে সক্রিয় সাহায্য করিবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কর্পোরেশনের আমলে খুব ভাল পরিচালনা নাও হয় তবু বিদেশী সুপরিচালনার জন্য গর্ব্ব করা আমাদের পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত নহে। কর্পোরেশন আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করিব, ইহাও কম আনন্দের কথা নয়। ট্রাম কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ যত ভাল কাজই করুন, তাঁহারা বিদেশী,—'A goo.l Government can never be substitute for self Government.'

আমরা আশা করি বিশেষ বিশেষ স্থানে ট্রাম চালনায় যে সামান্য বাধা আছে বাংলা সরকার আবশ্যকমত আইন করিয়া কর্পোরেশনের সে অন্তরায় দূর করিয়া দিবেন। এই সঙ্গে কর্পোরেশনের দিক হইতেও আমরা আশা করি যে টেণ্ডারের আবেদন খোলার সময় তাঁহারা দেশীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর একটু কৃপাশীল হইবেন এবং এদের কেহ যদি আবেদন করেন, সামান্য টাকার তফাতের জন্য বিদেশী একেণ্ট নিয়োগ না করিয়া তাঁহারা যেন বাঙ্গালীকে না করুন অন্ততঃ কোন ভারতীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একেণ্ট নিযুক্ত করেন।

শিল্পপ্রসার ও গভর্ণমেণ্ট

কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে অনেকে ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার তুলনা করেন। অষ্ট্রেলিয়া কৃষিজীবি দেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু লোকসংখ্যা কম হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকায় সে দেশের লোককে কখনো অর্থের অস্বাচ্ছল্য ভোগ করিতে হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা এক কোটিরও কম কিন্তু সেখানে এক কোটির বেশী গো মহিষাদি আছে। স্বদেশে প্রচুর ব্যবহৃত হইবার পর অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রতি বৎসর ১ কোটি পাউণ্ড পশম, ৯৩ কোটি পাউণ্ড ভেড়ার মাংস, ২ লক্ষ টন মাখন, ৩৫ হাজার টন পনীর, ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড শূকরের মাংস, ১৭ কোটি বুসেল (এক বুসেল প্রায় ৯।০ সের) গম বিদেশে রপ্তানী হয়।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবি দেশ হইলেও তাহার কৃষিজীবনে বৈজ্ঞানিক আলোক সম্পাত না হওয়ায় বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়াও ভারতীয় কৃষক অষ্টাদশ শতাব্দীতে পড়িয়া আছে এবং স্বাভাবিক অন্ন উৎপাদন নিম্নগ উৎপাদনের নীতি অনুসারে ক্রমেই হ্রাস করিয়া যাইতেছে। এ দেশের যে ১৩ কোটি একর পতিত বা অজন্মা জমি আছে, সেখানে কিছু অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া চাষ করিলে ভারতবর্ষকে খাদ্যের দিক হইতে অবশ্যই স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যাইত। সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছন্ন জমিতে যদি শস্য ফলান সম্ভব হয় ভারতের তথাকথিত অনুর্ব্বর জমিগুলির বন্ধ্যা থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত অজস্র কৃষিজাত আয় থাকা সত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কৃষি হইতে যথেষ্ট অর্থ আসে সত্য, কিন্তু কোন অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে যুদ্ধ প্রভৃতি বিপর্য্যয়ের সময় দেশের অসুবিধার আর শেষ থাকে না। অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট একথা সম্যকভাবে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই সে দেশে শিল্প প্রসারে সরকারী উৎসাহ অসাধারণ। অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার দরকারী শিল্প ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম ও পশম শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে দেশে প্রসারিত করা বর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য। গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেসরকারী জনসাধারণ যদি এই সকল শিল্প-প্রসারে শেষ পর্য্যন্ত উৎসাহ না দেখায় তাহা হইলে হয় গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিল্পাদি পরিচলেনা করিবেন অথবা জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সহিত সহযোগিতায় তাঁহারা শিল্পাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয় শিল্প প্রসারে উৎসাহ না দিবারও যে কারণ আছে সে কথা আমরা অস্বীকার করিবার সাহস রাখি না। তবে অষ্ট্রেলিয়ার সহিত তুলনা করিয়া এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এক দেশের গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর প্রভূত স্বাচ্ছল্য থাকা সত্বেও তাহাদের স্বাচ্ছল্য আরও বাড়াইতে যদি এভাবে আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে ভারত সরকারের দিক হইতে ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য দূর করিবার ব্যাপক কোন চেষ্টাই কি আশা করা যায় না? শিল্প প্রসারে উৎসাহ-দেওয়া দূরে থাক, নানা চাপে পড়িয়া যখন এদেশে কোন শিল্প প্রসারে তাঁহারা অনুমতি দেন তখনও সেই শিল্পটিও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবার উপক্রম করিলেও তাঁহারা সে বিষয়ে মনোযোগী হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, অনেক চেষ্টা ও তদ্বিরের পর ভারতে দুইটি মোটর গাড়ী তৈয়ারী কারখানা স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে, এদিকে এই সন্ধিক্ষণে আমেরিকা হইতে হাজার হাজার অল্প মূল্যের মোটর গাড়ী অসামরিক ব্যবহারের জন্য ভারতে চালান আসিতেছে, এই সকল চালানী গাড়ীর দ্বারা এদেশের সামান্য প্রয়োজন মিটিয়া গেলে নূতন কারখানা চালানো যে কঠিন হইবে সেকথা বিবেচনা করার কোন লক্ষণ ভারত সরকারের দিক হইতে দেখা যাইতেছে না।

স্বাপ্নিক

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

দেখেছি তোমারে প্রভাত আলোকে, সুদূরের পথে যেতে,
সমীরণ তব কাঁপায় অলকে, অরুণ-কিরণে মেতে।
দ্বিপ্রহরের রবির কিরণে, আকাশের তলে বসি'
ধ্যান-মৌন স্থির নয়নে, প্রখর তাপসী।

গোধূলি বেলায় অস্ত-রেখায়, স্বপন পারেরি দেশে,
দেখেছি তোমারে সাগর-বেলায় নবীনা বধূর বেশে।
ফুলের সুবাসে দেখেছি তোমারে, আর দেখি শতদলে,
জীবন-নদীর এপার-ওপারে, তোমারি প্রদীপ জ্বলে।

সাময়িকী

সহরে ম্যালেরিয়া—

বাঙ্গালার গ্রামগুলিতে যখন ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল, তখন লোক গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইয়া আসিল। ম্যালেরিয়ার ভয়ে এখনও সহরের লোক সহজে গ্রামে যাইতে চাহে না। ১৯৪১ সালের শেষে কলিকাতায় বোমা পড়ার পর সহরের বহু লোক বোমার ভয়ে গ্রামে পলাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাহাদের এমন ব্যস্ত করিল যে প্রায় সকলেই সহরে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়—পলায়নের সময় তাহাদের প্রত্যেক পরিবারকেই ২।৪ জন করিয়া গ্রামে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা আর ফিরে নাই। এবার কিন্তু কলিকাতা সহরে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। নারিকেল ডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা, ট্যাংরা, ইটালী, বেলগেছিয়া ও টালা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসক নাই, ঔষধ নাই, মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী যে শবদাহের ব্যবস্থা করাও কষ্টকর হইয়াছে। এমন কি বহু চিকিৎসক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে ও কয়েকজন চিকিৎসক মারা গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ইহার প্রতিকার ও নিবারণের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু রোগ এত ব্যাপক যে উহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। উহা সহরের সর্ব্বত্র যাহাতে বিস্তৃতি লাভ না করে, সেজন্ত সকলের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ওজনে জুয়াচুরি—

কলিকাতায় তরিতরকারী, মাছ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর এক অসুবিধা ধরা পড়িয়াছে, প্রায় প্রত্যেক বাজারেই প্রত্যহ কয়েকটি ওজনের জুয়াচুরি ধরা পড়িতেছে। এক আনা সের বেগুন কিনিয়া কেহ বাড়ীতে যাইয়া তাহার ওজন পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিত না, কিন্তু ১২ আনা সের বেগুন কিনিতে হইলে ওজন সম্বন্ধে সজাগ হওয়া ক্রেতার পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির জন্ত ক্রেতা সাবধান হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে এই ওজনের জুয়াচুরি ধরা পড়িতেছে। অবশ্য ইহা নিবারণের জন্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই জুয়াচুরি চলিতেছে। বর্ত্তমানে ইহা বন্ধ না হইলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের দুর্ভোগ আরও বাড়িবে।

সুন্দরবনে বন্যা—

সুন্দরবন অঞ্চলে সম্প্রতি যে বন্যা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ২৪পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ও বসিরহাট মহকুমার বহু স্থান জলমগ্ন হইয়াছিল। এক প্রকার দুইটি মহকুমায় প্রায় এক লক্ষ বিঘা জমীর চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই এক লক্ষ বিঘা জমীর প্রতি বিঘাতে যদি ৫।৬ মণ করিয়া ধান হইত ধরা যায়, তাহা হইলেও ৫।৬ লক্ষ মণ ধান পাওয়া যাইত। এই দুর্দ্দিনে ঐ ক্ষতি সমগ্র বাঙ্গালাকে কি ভাবে কষ্ট দিবে, তাহা চিন্তা করাই কঠিন। অথচ পূর্ব্ব হইতে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বিত হইলে ঐ দুর্দ্দৈব হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইত।

বিচারের নমুনা—

কথায় আছে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—তাহার একটি নমুনা আমরা এখানে দিতেছি। গত ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে সাহেবগঞ্জ হইতে ট্রেণ হাওড়া আসিবার পথে রাত্রি ৮টার সময় ট্রেণ নিমতিতা ষ্টেশনে পৌঁছিলে একদল যাত্রী একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিবার চেষ্টা করে। প্রকাশ ঐ কামরায় একজন ভারতীয় সৈনিক শুইয়াছিল। অনেক যাত্রী ঐ কামরায় প্রবেশ করিলে একজন সৈনিক গুলী চালায় ও ফলে মনোরঞ্জন দাস নামক একজন যাত্রী মারা যায়। আসামী দায়রা সোপর্দ্দ হয় ও দায়রার বিচারে তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আসামী আপীল করায় বিচারপতিরা দণ্ড কমাইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন।—এ বিষয়ে মন্তব্যের প্রয়োজন নাই।

সদস্যদের ভাতা—

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সকল লোকের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে, কাজেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-গণ নিজেদের ভাতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের মাসিক ভাতা ১৫০ টাকা স্থলে ২৫০ টাকা ও দৈনিক ভাতা ১০ টাকা স্থলে ১৫ টাকা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ ব্যবস্থার ভার তাঁহাদের নিজেদের উপর—কাজেই ইহাতে একদিকে যেমন আপত্তি করিলে চলিবে না—অপরদিকে তেমনই আপত্তি বা আন্দোলনের কোন সার্থকতা নাই।

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া—

গত ১১ই অক্টোবর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (উচ্চতর পরিষদ) সদস্য শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস একটি মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন—এ বৎসর বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া যেরূপ ব্যাপক-ভাবে দেখা দিয়াছে, এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। তাহাতে মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন জানাইয়াছেন যে ম্যালেরিয়া ভগবানের দান, কাজেই গভর্ণমেণ্ট তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ। উত্তর চমৎকার হইয়াছে বটে, মন্ত্রীদের এই নির্ভরতা স্থায়ী হইলে দেশ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

হিন্দুদল ও শ্রীযুক্ত সাভারকর—

শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি। তিনি হিন্দুদিগের সম্বন্ধে একটি অতি সত্য

কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সারা ভারতে হিন্দুরা সংখ্যায় অন্ত সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক বটে, কিন্তু দল হিসাবে তাহারা এত বিচ্ছিন্ন যে তাহাদের দ্বারা কোন কাজ করানো যায় না। সাম্প্রদায়িক অধিকার রক্ষার বেলায় যেমন সকল হিন্দু দলবদ্ধ হন না, জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সময়েও তেমনই তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় না। যদি ভারতবাসী সকল হিন্দু সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করেন তবে কংগ্রেস আন্দোলনের সাফল্যের জন্তও তাহাদের অন্ত সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কবে এই হিন্দুর দল সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবে ?

মূল্যবৃদ্ধি—

অনেকের বিশ্বাস যে শুধু কলিকাতা সহরে ও সহরগুলিতে দুধ, মাছ, তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য অন্তায়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ ধারণা সত্য নহে। বাঙ্গালার মফঃস্বলের সর্ব্বত্র দুধ দুর্লভ, মাছের সের ২ টাকার কম নহে, তরিতরকারীর মূল্যও কলিকাতার মত। কিন্তু ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কলিকাতায় না হয়, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ইহার কারণ কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মূলা, বেগুন, কচু প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি ? গভর্ণমেণ্ট যে গত ২।৩ বৎসর ধরিয়া 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন চালাইয়াছে, তাহা কি একেবারে বিফল হইয়াছে ? যদি অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কখনই এত অধিক পরিমাণে জিনিষের দাম বাড়িত না। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন, কাজেই কে এই সমস্তার সমাধান করিবে ?

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

এবার বড়দিনের ছুটীতে যুক্তপ্রদেশের কানপুর সহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া তথায় একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। কানপুর এখন কারখানাবহুল সহর—তথায় সম্প্রতি ৩৫ হাজার বাঙ্গালী চাকরীর জন্ত সমবেত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে এবারকার সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা—

স্যর আর্দেশীর দালাল বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের পুনর্গঠন বিভাগের সদস্ত। তিনি সম্প্রতি লাহোরে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। তিনি বলেন—"যুদ্ধের পরবর্ত্তী পুনর্গঠনের কাজে বর্ত্তমান ভারত গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতায় অধিকাংশ ভারতবাসীর বিশ্বাস নাই। কারণ বর্ত্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনের বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট মাত্র। বৃটিশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বার্থকে প্রাধান্ত দেওয়ার কোন ক্ষমতা বর্ত্তমান ভারত গভর্ণমেণ্টের নাই।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নাই। মহাত্মা গান্ধী ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে ভারতবাসীদের দুঃখ দূর করিবার জন্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন। এখন খবর আসিয়াছে, জোহান্সবার্গ সহর হইতে ৮ মাইল দূরে ১১ শত একর জমীতে ভারতীয়দের বাসের জন্ত গৃহ নির্ম্মিত হইবে। শ্বেতাঙ্গদের সহর হইতে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীদের দূরে রাখাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এইরূপ অপমানজনক ব্যবস্থায় সেখানকার ভারতীয়গণ সম্মত হন নাই এবং স্থানীয় কংগ্রেস এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেশে ও বিদেশে আমাদের অপমানের শেষ নাই। সমানাধিকারবাদীরা এ বিষয়ে কি বলিবেন ?

খাদ্যদ্রব্য অপচয়—

ঢাকা হইতে খবর আসিয়াছে যে গম, আটা, চাউল, ছোলা প্রভৃতিতে প্রায় ৮০ হাজার মণ খাদ্যদ্রব্য ঢাকা জেলার হাজিগঞ্জ, লোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ, শীতলক্ষা প্রভৃতি স্থানের গুদামগুলিতে পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জে রেশনের দোকান গুলিতে ঐ পচা খাদ্যদ্রব্যই বিক্রয়ের জন্ত প্রেরিত হইয়াছে। যে সময়ে মানুষ খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়, সে সময়ে যাহাদের দোষে এইভাবে এত অধিক খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া গেল, তাহাদের প্রকাশ্যে বিচার ও দণ্ড হওয়া প্রয়োজন।

মাছ প্রেরণের অসুবিধা—

চাঁদপুর হইতে প্রত্যহ কয়েক শত মণ মাছ বরফ দিয়া কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানে চালান দেওয়া হইত। সেখানে যে বরফের কল আছে, কিছুদিন হইতে তথায় উৎপন্ন বরফের অর্দ্ধেক পরিমাণ সামরিক প্রয়োজনে গ্রহণ করা হইত ও বাকী অর্দ্ধেক মৎস্য ব্যবসায়ীদিগকে দেওয়া হইত। সম্প্রতি বরফ আর মৎস্য ব্যবসায়ীদিগকে দেওয়া হইবে না ঠিক হইয়াছে। কাজেই কলিকাতায় মাছের অভাব ও মূল্য যে বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কোথায় ?

দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার—

স্যর সফোত আমেদ খাঁ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনার ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় গোয়ালিয়রের অর্থসচিব ব্যারিষ্টার মিঃ রামরাও দেশমুখ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্ব্বদা ভারতবাসীকে এখনও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে, তথায় এই লোক দেখানো হাই কমিশনার নিয়োগের প্রয়োজন কোথায় ?

চাউলের দাম—

গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের মণ ৪০ টাকা হইলে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্ত চাউলের দর বাঁধিয়া দেন এবং কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে রেশন প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাউলের মণ ১৬৷০ স্থির করা হয়। তখন শুনা গিয়াছিল যে চাউলের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ দরও কমান হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। অথচ কিছুদিন হইতে যে সকল স্থানে রেশন প্রথা প্রচলিত নাই, সে সকল স্থানে ৮ বা ১০ টাকা মণ দরে ভাল চাউল পাওয়া যাইতেছে। নূতন আউস ধানও উঠিয়াছে, আউস চাউলের দামও ৭৷৮ টাকা মণ। বাঙ্গালা দেশে চাউলের অভাব বেশী থাকিলে রেশন বিহীন এলাকায় কখনই চাউলের মণ ৭৷৮ টাকা হইত না। গভর্ণমেণ্ট

রেশনের দোকানগুলির মারফত যে চাউল ১৬।॰ মণ দরে বিক্রয় করেন, তাহা কোথায় কত টাকা দরে ক্রয় করা হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, রেশন প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে লোকের সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই বাড়িয়াছে। রেশনের দোকানে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহার গুণের কথা না হয় নাই বলিলাম। রেশনের দোকানে যে দিন যে চাল দেওয়া হইবে—তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমাদের লইতেই হইবে। ইহা যেন "ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া"র অবস্থা।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্মিলন—

আমেরিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই নভেম্বর মাসেই একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্মিলন হইবে। ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য প্রতিনিধির সহিত কলিকাতার শ্রীযুক্ত জি-এন্-মেটা ও মিঃ এ-আর-সিদ্দিকী ঐ সম্মিলনে যোগদান করিতে যাইবেন। এই সম্মিলনে যে সকল বিষয় আলোচিত হইবে, তাহাদের সহিত ভারতের বাণিজ্যের ও ভারতীয় জনসাধারণের সম্বন্ধ যথেষ্টই আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের উক্তির পিছনে যেমন সরকারী সমর্থন থাকে, আমাদের দেশের প্রতিনিধিরা কি সেইরূপ সমর্থন লাভ করিবেন? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অন্যান্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া আছে; তাহার প্রকৃত কারণ কোথায়, তাহা যদি প্রতিনিধিরা বিশ্ববাসী ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের এই যাত্রা সার্থক হইবে।

পরলোকে অমৃতলাল ওঝা—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী অমৃতলাল ওঝা গত ১লা কার্ত্তিক মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৪০ সালে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি হন। তিনি একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী এবং জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

নারীশিক্ষায় সাহায্য—

ময়মনসিংহের স্বর্গত মহারাজা শশিকান্ত আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য কলিকাতা উইমেন্স কলেজকে অনার্স ক্লাস খুলিবার জন্য ১০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা করিয়া ধারাবাহিক সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নারী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে শ্রীযুক্ত আচার্যের এই দান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এল্-এ (কেন্দ্রীয়) সম্প্রতি তাঁহার নিজস্ব লাইব্রেরীটি কলিকাতা উইমেন্স কলেজকে দান করিয়াছেন। উক্ত লাইব্রেরীতে যে ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি আছে তাহার মূল্য কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা।

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কাশিমবাজার) মহাশয়কে ৭নং রাজাবাগান লেনে কবি প্রভাতকিরণ বসুর ভবনে সাহিত্য বাসরের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় সভায় পৌরহিত্য করেন। শৌরীন্দ্রনাথকে সর্ব্বাগ্রে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করা হয়। তারপর তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া অনেকেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কবি শৌরীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। পরিশেষে কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

পরলোকে কবিরাজ গণনাথ সেন—

কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্-এ, এল্-এম্-এস্ সরস্বতী মহাশয় গত ২৫শে অক্টোবর বুধবার ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমণ করিয়াছেন। তিনি একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত তাঁহার পাণ্ডিত্য খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত ছিল। তিনি কয়েকখানি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন সুচিকিৎসক ও সুপণ্ডিতের তিরোধান ঘটিল।

লণ্ডনে জহরলালের মুক্তির দাবী—

লণ্ডনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বন্ধুবান্ধবগণ শীঘ্রই এক জনসভার আয়োজন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান' পত্রিকার 'লণ্ডন ডায়েরী' লেখক ইহা সঙ্গতই হইয়াছে বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। বক্তাদের মধ্যে চীনা, হিন্দু, মুসলমান এবং ব্রিটীশও আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। অথচ সকলেই তাঁহাকে একনিষ্ঠ এবং রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া জানেন। তিনি কারাগারে ১৫ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

রুজভেল্টের পুনর্নির্ব্বাচন—

নিয় ইয়র্কের গত ৮ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ মিঃ রুজভেল্ট গবর্ণর ডিউইকে পরাজিত করিয়া চতুর্থ বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সর্ব্বমোট ১৯,৭০০,০০০ ভোট পাইয়াছিলেন এবং গবর্ণর ডিউই মোট ১৭,২৯৯,০০০ ভোট পাইয়াছিলেন।

নির্ব্বাচনে জয়লাভের পর প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—"আশী বৎসরের মধ্যে এই প্রথম যুদ্ধকালেই আমাদের জাতীয় নির্ব্বাচন হইল। বর্ত্তমানে নানারূপ বিবর্ত্তন ও রদবদলের মধ্যেও সবচেয়ে বড় কথা হইল, আমরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছি গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি আছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রের প্রতি সমবেত অটুট আস্থা এবং বিবেকই মানুষের শাসন শক্তির উৎস ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

এম্-এ পরীক্ষায় ছাত্রীগণের কৃতিত্ব—

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সংস্কৃত ও উড়িয়া এই চারটী বিষয়ে চারিজন ছাত্রী এবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত আরো তিনজন ছাত্রী দর্শন, সংস্কৃত ও মনোবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আটার নমুনা বিক্রয়ে অসম্মতি—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ফুড্ ইন্সপেক্টর ডাঃ আর চন্দকে আটার নমুনা বিক্রয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় সম্প্রতি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের রেশন সপের দুইজন ম্যানেজার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪২৪ ও ৪৮৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে মামলা বিচারাধীন আছে। কলিকাতাবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের। সুতরাং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীকে খাদ্যসামগ্রী পরীক্ষা করিতে দিতে রেশন দোকানের কর্ম্মচারীদের আপত্তির কারণ কি? ইহা উপরওয়ালাদের নির্দ্দেশে অথবা রেশন দোকানের কর্ম্মচারীদের ইচ্ছানুসারে হইয়াছে তাহা জনসাধারণ জানিতে চাহে।

কমলাঘাটে অগ্নিকাণ্ড—

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় কমলাঘাট বন্দরে গত ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর রাত্রে আগুন লাগার ফলে এক সর্ব্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই বন্দরটি পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিশিষ্ট ব্যবসায় কেন্দ্র। এখান হইতে বিভিন্ন জেলায় এবং সুদূর আসামে পর্য্যন্ত বিবিধ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ হইয়া থাকে। প্রকাশ যে, দুর্ঘটনার সময় সরকারী গুদামে প্রায় লক্ষ মণ ধান, চাউল, বহু শত বস্তা চিনি, কয়েক হাজার মণ লবণ, প্রচুর পরিমাণ গুড়, ডাল, বিভিন্ন শ্রেণীর তৈল ও বেনেতি মশলা প্রভৃতি মজুত ছিল। সে সমস্তই অগ্নিসাৎ হইয়াছে। নয়টি ব্যাঙ্কের কাজ চলিত এই অঞ্চলে; তাহাদের অফিসগুলি পুড়িয়া গিয়াছে, বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় যে ক্ষতি হইয়াছে, খুব কম করিয়া ধরিলেও তাহার পরিমাণ নাকি ঘর বাড়ীর মূল্য সমেত আড়াই কোটি টাকারও অধিক। ক্ষতির এই অঙ্ক শুনিয়া গত বৈশাখ মাসে সংঘটিত বোম্বাই বন্দরের ভয়াবহ ক্ষতির কথাই মনে পড়ে। কাজেই বলা যায় যে, কমলাঘাটের ক্ষতির পরিমাণ তাহার কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি এবং দুর্ঘটনার সময় গুদামের অনাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব কথা প্রচারিত হইয়াছে, নানা কারণে তাহা আরও বেদনাদায়ক। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, এই দুর্ঘটনায় যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছেন। ব্যাপারটির তদন্ত চলিয়াছে। কোনরূপ লুটতরাজ হয় নাই বা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের কোন চিহ্নই এ ব্যাপারে নাই। প্রচারিত নানাপ্রকার মন্তব্য বা বিবৃতি জনের পক্ষে ব্যাঘাত কটায় এবং তাহা পরস্পরের সৌহার্দ্য রক্ষার পক্ষেও অন্তরায় হইয়া উঠে ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এত বিলম্ব না করিয়া দুর্ঘটনায় অব্যবহিত কাল পরেই সরকার যদি প্রকৃত বিবরণী প্রচারিত করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণ আশ্বস্ত হইতে পারিতেন এবং নানারূপ অপ্রীতিকর মন্তব্য ও বিবৃতি আত্মপ্রকাশের অবকাশ পাইত না।

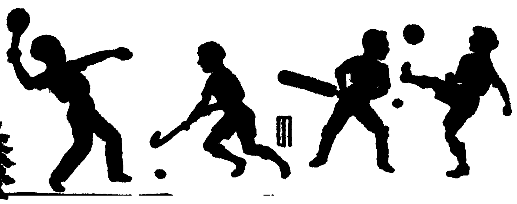
এবারকার নোবেল পুরস্কার—

১৯৪৩ এবং ৪৪ অব্দে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে যাঁহারা নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৩-এর পদার্থ-বিদ্যায় এই পুরস্কার পাইয়াছেন পেনসেলভেনিয়ার পিটস্‌বার্গ কার্ণেসি ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক মিঃ ও, ষ্টার্ণ। ইনি অণুরশ্মি পদ্ধতির উন্নতি ও প্রোটোনের চৌম্বক আবেগ সম্বন্ধে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অব্দের রসায়ন শাস্ত্রে পুরস্কার পাইয়াছেন ষ্টকহলমের অধ্যাপক মিঃ জর্জ্জ ফন হেভেসি। ইঁহার আবিষ্কারের বিষয়বস্তু হইতেছে—রাসায়নিক প্রক্রিয়া উপলব্ধি করিতে আইসোটোপ ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা। আর, ১৯৪৪-এর পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন নিউইয়র্ক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ রেবি, পরমাণুসমূহের চৌম্বক-ধর্ম্ম নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য।

পল্লী বাংলার হাল চাল—

বর্ত্তমানে কি সহর, কি পল্লী উভয়েরই অবস্থা সমান হইয়াছে। নানারূপ অভাব অনাটনের মধ্য দিয়া লোককে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। রোগের প্রাবল্য এ বৎসর অধিক রূপেই দেখা দিয়াছে। অধিকন্তু ম্যালেরিয়া মহামারীর আকার ধারণ করিয়া কি সহর কি পল্লী উভয় স্থানেরই অধিবাসীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন যে বিশাল নগরী কলিকাতা সেখানেও এবার ম্যালেরিয়ার কিরূপ প্রকোপ হইয়াছে তাহা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি। এই ম্যালেরিয়া রোগে প্রধানতম প্রতিষেধক ও ঔষধ কুইনাইন। তাহাও যথারীতি মিলিতেছে না। অথচ ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল দেহভার লইয়াই আলু হইতে আরম্ভ করিয়া সাংসারিক বহু জিনিষের জন্যই লাইনে সারিবন্দী অবস্থায় না দাঁড়াইলে দিন চলা ভার। এ সমস্যার সমাধান যে কতকালে হইবে তাহা 'দেবা ন জানন্তি'। সুতরাং আমরা ত মানুষ, আমরা তাহার দিন গণিয়া সময় নষ্ট করিতে পারি কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারি না। সমস্যার সমাধানকল্পে যাহা আমরা কার্য্যকরী করিয়াছি তাহা শারীরিক সুস্থতার সমাধান করাই কষ্টসাধ্য—এখন ত দুর্ব্বল দেহভার, সুতরাং সমাধান করিব কি উপায়ে? সম্প্রতি এইরূপ বহুপ্রকার অভাব, অনটন ও সমস্যা লইয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু মহাশয় যে দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার দেশবাসীর বিবরণ হইলেও আমরা সারা বাংলার আংশিক বিবরণ রূপেও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীযুক্ত কুণ্ডু মহাশয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে এই সকল প্রশ্নের কি জবাব পাইবেন তাহা আমরা জানি না কিন্তু যাহাই জবাব তিনি পান না কেন স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীমহোদয়ের জবাবের ভার তাহা আমাদের ভগবানের দান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বোম্বাই ঃ ৪৩২ ও ১৬ (১ উইকেট)

সিন্ধু ঃ ২৬৪ ও ২৪৪ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম রাউণ্ডে বোম্বাইপ্রদেশ প্রথম ইনিংসের ১৬৮ রানে সিন্ধুপ্রদেশকে পরাজিত করেছে।

৩রা নভেম্বর বোম্বাই টসে জিতে ব্যাটিং আরম্ভ করে। প্রথম দিনের খেলায় ২ উইকেটে বোম্বাইয়ের ২০১ রান উঠল। ইব্রাহিম ৫৫ এবং মন্ত্রী ৩২ রান ক'রে আউট হলেন। আর মোদী ৫৬ এবং ভি এম মার্চেন্ট ৫১ রান করে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনে খেলা শেষ হবার নির্দ্ধারিত সময়ের কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৪৩২ রানে শেষ হ'ল। আর এস মোদী ১৬০ রান করলেন। ভি এম মার্চেন্ট করলেন ৮৪ রান।

তৃতীয় দিনে সিন্ধুপ্রদেশ তাদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ ক'রে দিনের শেষে ৬ উইকেটে২৩৮ রান তুললে। সিম্পসন ৮৮ রানে আউট হলেন। দায়ুদ খাঁ ৫১ এবং এনায়েৎ খাঁ ৪৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

চতুর্থ দিনে সিন্ধু পুনরায় খেলা আরম্ভ করলে। হাতে আর মাত্র চার উইকেট। ১১৫ রান তুলতে পারলে তারা বোম্বাইকে প্রথম ইনিংসের রানে পিছনে ফেলতে পারবে। কিন্তু তাদের ইনিংস খোরের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারলো না এক ঘণ্টায় শেষ হ'ল। ঐ দিন খোর ৩টে উইকেট পেলেন ৮ ওভার বল দিয়ে মাত্র ২০ রানে। খোরের বোলিংয়ের ফাইনাল ফলাফল দাঁড়াল, ৪৫ ওভার বল, ১০টা মেডেন এবং ৪০ রানে ৬টা উইকেট। সিন্ধুর প্রথম ইনিংসে রান উঠল ২৬৪। ১৬৮ রানে অগ্রগামী থাকায় বোম্বাই দল সিন্ধু দলকে 'ফলো অন' করাল। সিন্ধু ৪ উইকেটে ২৪৪ রান তুলে বোম্বাইকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে দিলে। বোম্বাই ২৫ মিনিটে কোন উইকেট না হারিয়ে ১৬ রান তুললে পর খেলা বন্ধ হ'ল। বোম্বাই প্রথম ইনিংসের ১৬৮ রানে জয়ী হ'ল।

প্রদর্শনী ফুটবল ঃ

আই এফ এ-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নিখিল ভারতীয় দলের সঙ্গে আই এফ এ একাদশ দলের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা হয়। এই খেলায় আই এফ এ ৩-২ গোলে ভারতীয় ফুটবল দলকে পরাজিত করে। ফুটবল খেলায় আই এফ এ দলের যে সুনাম তার কোন পরিচয় উক্ত প্রদর্শনী খেলায় লক্ষিত হয় নি। সত্য কথা বলতে কি ভারতীয় দলের এ পরাজয়ে কোন অগৌরব ছিল না। তাদের রক্ষণ এবং আক্রমণভাগের খেলা অনেক সময়ই আই এফ এ দলের খেলোয়াড়দের অতিক্রম করে চলেছিল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মনোনীত খেলোয়াড় দিয়ে গঠিত এই দলটির খেলায় বোঝাপড়া, ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং স্পীড আই এফ এ দলের তুলনায় অনেকখানি উন্নত ছিল। আই এফ এ দলের আক্রমণভাগের খেলা আশারূপ হয় নি, খেলোয়াড় মনোনয়নের পরিবর্ত্তন হ'লে খেলাটি উন্নত হ'তে পারতো। তাদের খেলায় বোঝাপড়ার সব থেকে বেশী অভাব চোখে পড়েছিল। ফুটবল মরসুমে যতখানি উত্তম খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রকাশ পায় তার অভাবও কম দেখা দেয় নি।

* * *

বিলাতী পেশাদার খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত ইউনাইটেড সার্ভিসেস দল ২-০ গোলে আই এফ এর বাছাই দলকে পরাজিত করেছে। খেলার প্রথমার্দ্ধে সার্ভিসেস দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েও গোল করতে সক্ষম হয় নি। একদিকে যেমন তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায় অন্যদিকে আই এফ এ রক্ষণ ভাগের দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রীড়ানৈপুণ্য লক্ষিত হয়। প্রথমার্দ্ধে আই এফ এ দল গোল দেবার এক সহজ সুযোগ পেয়েও অকৃতকার্য্য হয়। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে আই এফ এ দলের আক্রমণভাগের খেলায় শৈথিল্য দেখা দিলে সার্ভিসেস দল প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। কিন্তু কে দত্তের অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্যের গুণে তাদের বেশীর ভাগ চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। সব থেকে দুঃখের কথা যে, আই এফ এ দলের কোন খেলোয়াড়ই সার্ভিসেস দলের গোলে একটিও প্রচণ্ড সট করতে পারে নি। খেলার সর্ব্বক্ষণই তাদের গোলরক্ষককে নিশ্চিন্ত মনে অপরের খেলা দেখতে দেখা যায়। এই দিনের খেলায় বিলাতী পেশাদার দলের পাশিং এবং [illegible] পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। মাটি উঁচু বলগুলি না থামিয়ে [illegible] মাথা দিয়ে সহযোগীদের নির্ভুল পাস দেওয়ার পদ্ধতি আমাদের চোখে নূতন। তাদের খেলায় আর এক উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান প্রদানে নির্ভুল বোঝাপড়া। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ব্যাক পাশ করে খেলতে দেখা যায়। বিপক্ষের গোলের মুখে দলের খেলোয়াড়দের 'থ্রু পাস' দেওয়ার রীতি কম দেখা গেল। আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে [illegible]

সময়ই তারা একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিপক্ষের গোলে হানা দেয় নি। আই এফ এ-র খেলায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য তাদের আত্মরক্ষামূলক খেলা। এই খেলায় বিখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন, বার্কেট এবং কার্টিস ও পরাস্ত হয়েছেন বলা চলে। ডেনিস কম্পটন কোন সুবিধা না করতে পেরে বিশ্রামের পর স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'ন।

আই এফ এ-র সুবর্ণ জয়ন্তী ঃ

বাঙ্গলায় ফুটবল ক্রীড়ামহলে ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাতেই বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলা এতখানি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সে সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই। এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের গুরুত্ব বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদীদের কাছেই নয় সমস্ত বাঙ্গলা দেশবাসীর নিকটে। যার প্রচেষ্টায় এতদিন আমরা নির্দোষ আমোদ লাভ ক'রে জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা পরিকল্পনার ব্রতী ছিলাম তার প্রতি কেবল আমাদের শ্রদ্ধা জানালেই কর্তব্যসম্পন্ন হবে না। আমরা আগামী কালের যুব শক্তিকে এই প্রতিষ্ঠানে নব প্রাণসঞ্চার করতে আহ্বান করছি। এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের মধ্যেও আমরা এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরিচালকমণ্ডলীর ত্রুটির উল্লেখ না করে পারি না। এই উৎসবের সমস্ত গুরুত্ব পরিচালকমণ্ডলী এক সাধারণ অনুষ্ঠান তালিকার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করায় জনসাধারণের থেকে বিশেষ কোন আগ্রহের সাড়া দেয় নি। ফুটবল মরসুমে জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা করলে সত্যই উৎসবের সার্থকতা বজায় থাকতো। তবে অকালবোধন বাঙ্গলায় নূতন নয়, আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী সেই বোধনেই এবার পূজা শেষ করলেন।

আই এফ এ দলের উল্লেখযোগ্য খেলা হয়েছিল কে দত্ত, এস মান্না, পি দাশগুপ্ত, অনিল দে, টি আও এবং বীপেন। ফরওয়ার্ড লাইনে কারও নাম উল্লেখযোগ্য নয় এর জন্ত খেলোয়াড়দের খেলার দোষের থেকে খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির মনোনয়ন ব্যাপারে ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে।

বেঙ্গল জিমখানার ক্রিকেট খেলা ঃ

বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট পরিচালনা ব্যাপারে ছুটি দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একটি বেঙ্গল জিমখানা অপরটি ক্রিকেট ক্লাব অফ্ বেঙ্গল। ক্রিকেট খেলায় কোন দল অপরকে অতিক্রম করতে পারে এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছে। ক্রিকেট ক্লাব অফ্ বেঙ্গল পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রিকেট খেলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। এইবার বেঙ্গল জিমখানা দক্ষিণ ভারত অভিমুখে ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্তে যাত্রা করবেন। নাগপুর, সেকেন্দ্রবাদ, বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজ এই চারটি স্থানে এই দলটি খেলবে। কমল ভট্টাচার্য্যের অধিনায়কত্বে নিম্নলিখিত খেলোয়াড় দ্বারা এই দলটি শক্তিশালী করা হয়েছে। অসিত চ্যাটার্জি, সন্তোষ গাঙ্গুলী ও জি চ্যাটার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন); এ দাস, জে ঘোষ ও ডি ঘোষ (ভবানীপুর); আর মজুমদার, আর মিত্র, ডি দে, এ দে, ও মণ্টু সেন (মোহনবাগান); সি মামুদ ও এ গণী (মহমেডান স্পোর্টিং) এবং টি ভট্টাচার্য্য (বি এণ্ড রেলওয়ে)।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে। ৪১ পয়েন্টে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় এবং ১৮ পয়েন্টে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয়স্থান অধিকার করেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপুষ্পলতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "মরু-তৃষা"—৩
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাত্রির আকাশে সূর্য"—১।০
রাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরী সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ "সাতনরী"—১।০
অবলাকান্ত মজুমদার প্রণীত নাটক "রাজা সীতারাম রায়"—১।০

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩॥/০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

ভারতবর্ষ

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

সূচীপত্র

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫১

লেখ সূচী—বর্ণানুক্রমিক



অলকা মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস